

রবীন্দ্র রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীবিষ্ণুনাথশাস্ত্রী



Dr. J. K. Singh



রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

নাটক



सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯১
মার্চ ১৯৮৫

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সভাপতি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

শ্রীক্ষুদিরাম দাশ

শ্রীভবতোষ দত্ত

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

পর্দালিনবিহারী সেন

শ্রীভূদেব চৌধুরী

শ্রীনেপাল মজুমদার

শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

শ্রীশুভেন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

সচিব

প্রকাশক

শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাকরণ। কলিকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রাকর

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

নিবেদন	[৭]
নাটক খন্দবয় প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য	[৯]
চিরকুমার-সভা	১
শোধবোধ	১০৩
নটীর পূজা	১৪১
শেষ বর্ষণ	১৭৭
রক্তকরবী	১৯১
নবীন	২৩৭
কালের যাত্রা	২৫৭
রথের রশি ২৬১	
কবির দীক্ষা ২৮৫	
পরিশিষ্ট : রথযাত্রা ২৯৩	
চন্ডালিকা	৩০৫
তাসের দেশ	৩২৩
বাঁশরি	৩৫৩
শ্রাবণগাথা	৩৮৯
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪০৩
নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা	৪২৯
নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৪৯
শ্যামা	৪৬৫
পরিশিষ্ট : পরিশোধ ৪৮১	
মুক্তির উপায়	৪৯৩
পরিশিষ্ট : ১	
গুরু	৫১৯
অরুপরতন	৫৪৯
পরিশিষ্ট : শাপমোচন ৫৮৭	
ঋণশোধ	৬১১
শেষরক্ষা	৬৪৭
পরিগ্রাণ	৬৯৯
তপতী	৭৪৫
পরিশিষ্ট : ২	
ভগ্নহৃদয়	৭৯৯
রত্নচন্ড	৯১১
কাল-মৃগয়া	৯৪১
নলিনী	৯৫৭
প্রথম ছত্ৰের সূচী	৯৭৩

চিত্রসূচী

সম্মুখীন পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ : শশিকুমার হেস-অঙ্কিত	মুখপত্র
নটীর পূজা : শান্তিনিকেতন চীনাভবন ভিত্তিগাত্র 'ফ্রেন্স্কা'। নন্দলাল বসু-অঙ্কিত	১৪১
নটীর পূজা : উপালি-বেশে রবীন্দ্রনাথ	১৪৫
নটীর পূজা : নন্দলাল বসু-অঙ্কিত	১৭৩
'তাসের দেশ' : প্রচার-চিত্র। নন্দলাল বসু-অঙ্কিত	৩২৩
চন্দালিকা : প্রকৃতি ও আনন্দ। নন্দলাল বসু-অঙ্কিত	৪৩৪
পান্ডুলিপিচিত্র	
'রক্তকরবী'-পান্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা	২৩৪
'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম রূপান্তর 'ভৈরবের বলি'র স্টেজ-কাপিতে কবি-কৃত ভূমিকা	৭৪৭
'ভগ্নহৃদয়'-পান্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা	৮১৫

নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দুল্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই নিবেদনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আয়োজন।

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং সুসম্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত। যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংবলিত বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ষোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনাকর্মে যে-যত্ন প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সৌষ্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কাগজ মদ্রণ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ ‘মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে’ না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

বর্তমান খণ্ডের প্রস্তুতিপর্বে সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য
পুলিনবিহারী সেনের জীবনাবসান ঘটেছে। রচনাবলীর বর্তমান
সংস্করণের সূচনা থেকে পরিকল্পনা এবং সম্পাদনাকর্মে তিনি বিশেষ
ভূমিকা পালন করেছেন। শোকাতর্পিত্তে আমরা সে কথা স্মরণ করি।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
রবীন্দ্রভবন, কলাভবন। শান্তিনিকেতন
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
শ্রীবিশ্বরূপ বসু
শ্রীকানাই সামন্ত

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনাকার্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের
নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
ও মুদ্রণকার্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্মীগণ সহযোগিতা ও
বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষত চিত্র
নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া
গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

‘নাটক’ খণ্ডদ্বয় প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য

‘আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হইল’—১৮৯৬ সালে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত ‘কাব্য গ্রন্থাবলী’র ভূমিকায় এই উল্লেখ থাকলেও সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বে রচিত কোনো কাব্যগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে এ গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নি। ‘কৈশোরক’ আখ্যায় সন্ধ্যা-সংগীত-পূর্ববর্তী পর্যায়ের কিছু কবিতা সংকলিত হলেও নাটক সংকলন ক্ষেত্রে ভিন্ন বিচার দেখা যায়। ‘বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য লেখকের বাল্যরচনা’ হওয়া সত্ত্বেও ‘গ্রন্থাবলী’র অসম্পূর্ণতা নিবারণার্থে গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। পরবর্তী সংকলনগ্রন্থগুলিতেও বাল্মীকি-প্রতিভা গৃহীত হয়েছে। এমন-কি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও বাল্মীকিপ্রতিভা পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাল্মীকিপ্রতিভার পরে রচিত ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), রুদ্ধচণ্ড (১৮৮১), কাল-মৃগয়া (১৮৮২) এবং নলিনী (১৮৮৪) পরবর্তীকালে আর স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় নি। ‘কাব্য গ্রন্থাবলী’-তেও সংকলিত হয় নি, এগুলি সংকলনযোগ্য বলে প্রথম বিবেচিত হয় বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী অর্চলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৯৪০)।

রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে নাটক খণ্ডদ্বয়ে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ) ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ থেকে ‘মুর্ছুর উপায়’ পর্যন্ত নাটকসমূহ গ্রন্থপ্রকাশের কালানুক্রমে সংকলিত। কেবল যে-সকল নাটক পরবর্তীকালে অভিনয়যোগ্য সংস্করণহেতু অথবা সংশোধনের উদ্দেশ্যে পুনর্লিখিত ও নতুন নামে প্রচারিত হয়েছে সেই রূপান্তরিত নাটকগুলি এবং উপরে বর্ণিত অর্চলিত সংগ্রহভুক্ত চারটি নাটক দুটি পৃথক পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে। নৃত্যনাট্যগুলির ক্ষেত্রে একই আখ্যানভিত্তিতে পূর্বে নাটক রচিত হলেও গঠন বিচারে পৃথক নাটক বিধায় এগুলি রূপান্তরিত নাটকরূপে বিবেচিত হয় নি। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে কোনো কোনো নাটকের অব্যবহিত পরিশিষ্টে সেই নাটকের আদিরূপ, অভিনয়পত্রীর পাঠ বা একই আখ্যানের আভাসে রচিত নাটক সংযোজিত; এই প্রসঙ্গে নবীনের পরিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য। ‘কালের যাত্রা’র পরিশিষ্টে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ‘রথের রশ্মি’র আদিরূপ ‘রথযাত্রা’ সংকলিত। ‘শ্যামা’র পরিশিষ্টে ‘পরিশোধ’ কবিতা অবলম্বনে রচিত ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যের আদিরূপ ‘পরিশোধ (নাট্যগীতি)’ সংকলিত। এবং প্রথম ‘পরিশিষ্ট’ভুক্ত ‘অরূপরতন’-এর পরিশিষ্টে ‘একই আখ্যানের আভাসে রচিত’ ‘শাপমোচন’ এবং তার সংযোজনে নাট্যকাটির জন্য বিশেষ-ভাবে রচিত দশটি গান সংকলিত।

বর্তমান রচনাবলীর প্রথম খণ্ড সম্পাদকীয় নিবেদনে বলা হয়েছে, ‘এ-যাবৎ প্রকাশিত সংস্করণসমূহে রচনার পাঠে যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা যতদূর সাধ্য নিরসনের’ চেষ্টা করা হবে। নাটকের ক্ষেত্রে পাঠের বিভিন্নতা কোনো কোনো স্থলে প্রায় স্বতন্ত্র নাটকের রূপ নিয়েছে। নাটকের খণ্ডদ্বয়ে বিভিন্ন নাটকের সূচনায় প্রয়োজনবোধে প্রকাশের ইতিহাসসহ পাঠসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তথ্য সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। পাঠান্তর বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ ‘গ্রন্থপরিচয়’ অংশে লিপিবদ্ধ হবে আশা করা যায়। এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য কয়েকটি নাটকের প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ বিশদ মন্তব্য করা হল।

গ্রন্থাকারে নাটকগুলির প্রকাশ বর্ষ প্রত্যেকটি নাটকের আখ্যাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘বাল্মীকিপ্রতিভা’র দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৬) পাঠ পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছে, কিন্তু প্রথম সংস্করণের পাঠের স্বাভাবিক বিচারে এই পাঠটি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় অর্চলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত। বর্তমান সংস্করণের ‘গ্রন্থপরিচয়’ অংশে এই প্রথম সংস্করণের পাঠটি সংকলন করা হবে।

কতকগুলি গান বর্জন করে এবং পরবর্তীকালে রচিত গান যোগ করে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ‘মায়ার খেলা’র যে নতুন নৃত্যনাট্য সংস্করণ প্রস্তুত করেন অংশত তা অভিনীত হয়েছিল; এটি ‘নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা’ নামে কালানুক্রমে ষষ্ঠ খণ্ডে যথাস্থানে সংকলিত হল।

‘শারদোৎসবে’র প্রথম অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে একটি ‘নান্দী’ রচনা করেন,

স্বতন্ত্র গ্রন্থে অসংযোজিত তার পাণ্ডুলিপিচিত্র পঞ্চম খণ্ডে শারদোৎসবের সূচনায় মূদ্রিত
হল। পরবর্তীকালে শারদোৎসবের অপর অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লিখেছিলেন
তা শারদোৎসবে সংযোজিত না হলেও তার বহুল পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ 'ঋণশোধের'
'ভূমিকা' অংশ।

অভিনয়ের কারণে প্রস্তুত 'রাজা ও রানী'র 'যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত' রূপ
'ভৈরবের বলি' গ্রন্থাকারে মূদ্রিত হয় নি। তবে 'রাজা ও রানী'র সংশোধিত কপির সূচনায়
যে ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখে দেন তার পাণ্ডুলিপিচিত্র 'তপতী'র সূচনায় সন্নিবেশিত হল।
'ভৈরবের বলি'র জন্য 'রাজা ও রানী'র সংশোধন ও পরিবর্ধনের বিবরণ 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে
লিপিবদ্ধ হবে আশা করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনার ফলে যে কয়টি উপন্যাসের নাট্যরূপ
প্রকাশিত হয়েছে তা বর্তমান নাটক খণ্ডদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হল না।

৭ মার্চ ১৯৮৫

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
সম্পাদকমণ্ডলী

চিরকুমার-সভা

প্রকাশ : ১৯২৬

ভারতী (১৩০৭-০৮)-তে প্রকাশিত 'চিরকুমার-সভা' উপন্যাস রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী (১৩১১)-ভুক্ত হয় এবং পরে 'প্রজাপতির নিবন্ধ' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে (গদ্যগ্রন্থাবলী ৮, ১৩১৪) প্রকাশিত।

উপন্যাসটির কিছু অংশের পরিবর্তন, কিছু সংযোজন এবং অনেকগুলি নতুন গান যুক্ত হয়ে 'চিরকুমার-সভা' নাটকটির প্রকাশ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। 'প্রজাপতির নিবন্ধ' গ্রন্থাকারে আর প্রচলিত না থাকায় এর কিছু বর্ণনাংশ নাটকে সংকলিত হয়েছিল। বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে উপন্যাস ও নাটক দুটি গ্রন্থই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সেই বর্ণনাংশ নাটকে বর্জিত হয়। একই কারণে বর্তমান সংস্করণে এই পাঠ অনুসৃত।

কাব্যের জীবদ্দশায় প্রকাশিত কোনো সংস্করণে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মণ্ডনির্দেশে পূর্ণের প্রবেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐ দৃশ্যে শ্রীশ এবং বিপিনের সংলাপ থেকে মনে হয় দৃশ্যের প্রথমার্ধে পূর্ণ উপস্থিত নেই। একটি প্রোড় ব্যক্তির প্রবেশ এবং চন্দ্রমাধববাবুর প্রবেশ-এর মধ্যবর্তী কোনো সময়ে পূর্ণের প্রবেশ।

চিরকুমার-সভার কোনো পাণ্ডুলিপি দেখা যায় নি।

নাটকের পাত্রপাত্রীগণ

চন্দ্রমাধববাবু

কালিকাতার কোনো কলেজের অধ্যাপক

চিরকুমার-সভার সভাপাত

শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ

চিরকুমার-সভার সভাগণ

অক্ষয়কুমার

জগন্তারিণীর বড়ো জামাতা

রসিকদাদা

জগন্তারিণীর দূরসম্পর্কীয় খুড়া

বনমালী

ঘটক

গুরুদাস

ওস্তাদ

দারুকেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়

কুলীন যুবকদ্বয়

জগন্তারিণী

বিধবা হিন্দু মহিলা

পূরবালা

জগন্তারিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, অক্ষয়কুমারের স্ত্রী

শৈলবালা

জগন্তারিণীর বিধবা কন্যা

নৃপবালা, নীরবালা

জগন্তারিণীর দুই অবিবাহিতা কন্যা

নির্মলা

চন্দ্রমাধববাবুর অবিবাহিতা ভাগিনেয়ী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বৈঠকখানা

অক্ষয় ও পুরবালা

পুরবালা। তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে। এত দিনে এক-একটির তিনটি চারটি করে পাশ জুড়িয়ে আনতে। ওরা আমার বোন কিনা—

অক্ষয়। মানবচরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, শ্বশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না—এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।

পুরবালা। দেখো, তোমার সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো মন্ত্র পড়ে বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে, আবার আর একটা!

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক নয়। এটা হয়তো তেমন অসহ্য না হতেও পারে।

অক্ষয়। সখী, তবে খুলে বলো।

গান

কী জানি কী ভেবেছ মনে,
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হয় ভেসে যায় ওই
ছলছল নয়নে।

পুরবালা। ওস্তাদজি, থামো। আমার প্রস্তাব এই যে দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করো যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাকবে, যখন তোমার সঙ্গে দুটো-একটা কাজের কথা হতে পারবে।

অক্ষয়। গরীবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা বলতে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ্ করে বাজুবন্ধ চেয়ে বসে।

গান

পাছে চেয়ে বসে আমার মন
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।

পুরবালা। তবে যাও।

অক্ষয়। না না, রাগারাগি না। আচ্ছা, যা বল তাই শুনব। খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব। তোমার সামনে কোনো রকমের বেয়াদবি করব না। তা, কী কথা হচ্ছিল। শ্যালীদের বিবাহ। উত্তম প্রস্তাব।

পুরবালা। দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন। তোমারই কথা শুনবে

এখনো তিনি বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সংপাত না জুটিয়ে দিতে পার তা হলে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি।

অক্ষয়। আমি তো তোমাকে বলেছি তোমরা কোনো ভাবনা কোরো না। আমার শ্যালী-পতিরা গোকুলে বাড়ছেন।

পূরবালা। গোকুলটি কোথায়।

অক্ষয়। যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্তি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।

পূরবালা। প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই।

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন। তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র। সেইজন্যে ভগবান প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ঐ সভার উপরেই। সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুণিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন, দিব্য বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন—এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এক কালে ঐ সভার সভাপতি ছিলাম।

পূরবালা। তোমার কী রকম দশাটা হয়েছিল।

অক্ষয়। সে আর কী বলব। প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রী শব্দ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে মনে হত শ্রীকৃষ্ণের ষোলো-শো গোপিনী যদি-বা সম্প্রতি দুঃপ্রাপ্য হন অন্তত মহাকালীর চৌষটি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমলাপটা করে নিই—ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আর-কি।

পূরবালা। চৌষটি হাজারের শখ মিটল?

অক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সামনে বলব না। জাঁক হবে। তবে ইশারায় বলতে পারি, মা কালী দয়া করেছেন বটে।

পূরবালা। তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দীভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুদ্ধি তিনি দয়া করেছিলেন।

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যেই কার্তিকটি পেয়েছ।

পূরবালা। আবার ঠাট্টা শুরু হল?

অক্ষয়। কার্তিকের কথাটা বুদ্ধি ঠাট্টা? গা ছুঁয়ে বলছি, ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মুখুন্ডেজমশায়, এইবার তোমার ছোটো দুটি শ্যালীকে রক্ষা করো।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয় হয়ে থাকেন তো আমি আছি। ব্যাপারটা কী।

শৈলবালা। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিকদাদা কোথা থেকে একজোড়া কুলীনের ছেলে এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয়। ওরে বাস রে! একেবারে বিয়ের এপিডেমিক! প্লেগের মতো! এক বাড়িতে একসঙ্গে দুই কন্যাকে আক্রমণ! ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে।

গান

বড়ো থাকি কাছাকাছি,

তাই ভয়ে ভয়ে আছি।

নয়ন বচন কোথায় কখন বাজিলে বাঁচি না-বাঁচি।

শৈলবালা। এই কি তোমার গান গাবার সময় হল।

অক্ষয়। কী করব ভাই। রোশনচৌকি বাজাতে শিখি নি, তা হলে ধরতুম। বল কী। শুবকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্‌বাহবন্ধন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন।

শৈলবালা। বৈশাখ মাসের পর আসছে বছরে অকাল পড়বে, আর বিয়ের দিন নেই।
পূরবালা। তোরা আগে থাকতে ভাবিস কেন শৈল, পাঠ আগে দেখা যাক তো।

জগন্তারিণীর প্রবেশ

জগন্তারিণী। বাবা অক্ষয়।

অক্ষয়। কী মা।

জগন্তারিণী। তোমার কথা শুনেন আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে।

শৈলবালা। মেয়েদের রাখতে পার না বলেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা।

জগন্তারিণী। ঐ তো! তাদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে, পাস করিয়ে, কী হবে বলো দেখি। ওর এত বিদ্যার দরকার কী।

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়েমানুষের একটা-না-একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই—হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিন্দিরীয়া। দেখো-না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যার দরকার হয় নি, তাই স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন; আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়।

জগন্তারিণী। তা, যা বল বাবা, আসছে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই।

পূরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়েমানুষের সকাল সকাল বিয়ে হওয়াই ভালো।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) তা তো বটেই। বিশেষত যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ তখন সকাল সকাল বিয়ে করে সময়ে পূর্ণিয়ে নেওয়া চাই।

পূরবালা। আঃ কী বকছ। মা শুনতে পাবেন।

জগন্তারিণী। রসিককাকা আজ পাঠ দেখাতে আসবেন। তা, চল্ মা পূর, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখি গে।

[জগন্তারিণী ও পূরবালার প্রস্থান]

শৈলবালা। আর তো দেরি করা যায় না মৃদুজ্জেশায়। এইবার তোমার সেই চিরকুমার-সভার বিপিনবাবু শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চলছে না। আহা, ছেলে দুটি চমৎকার! আমাদের নেপো আর নীরর সঙ্গে দিবি্য মানায়। তুমি তো চৈত্রমাস যেতে না-যেতে আপিস ঘাড়ে করে সিমলে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।

অক্ষয়। কিন্তু, তাই বলে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চমকে যাবে। ডিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না। যথোচিত তা দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈলবালা। বেশ তো, তা দেবার ভার আমি নেব মৃদুজ্জেশায়।

অক্ষয়। আর-একটু খোলসা করে বলতে হচ্ছে।

শৈলবালা। ঐ তো দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পূরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেকে আমি দেখে নেব।

অক্ষয়। তা হলে জন্মটা বদলে নিয়ে আর-একবার সভ্য হব। একবার তোমার দিদির হাতে নাকাল হয়েছি, এবার তোমার হাতে। কুমার হবার সুখটাই ঐ—কটাক্ষবাণগুলোকে লক্ষ্যভেদ করবার সুযোগ দেওয়া যায়।

শৈলবালা। হি মৃদুজ্জেশায়, তুমি সেকলে হয়ে যাচ্ছ। ঐ-সব নয়নবাণ-টানগুলোর এখন কি আর চলন আছে। যুদ্ধবিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে।

নূপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নূপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীর তাহার বিপরীত—কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত

নীরবালা। (শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া) মেজদিদিভাই, আজ কারা আসবে বল্ তো।

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল

দারুকেশ্বর। তা নয় তো কী। শূভস্য শীঘ্রং।

অক্ষয়। (গম্ভীর হইয়া) মর্দগি না মটন?

মৃত্যুঞ্জয় অস্বাক হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল

দারুকেশ্বর কিছু না বুঝিয়া অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল

আরে মশায়, নাম শুনাই হাসি। তা হলে তো গন্ধে অজ্ঞান এবং পাতে পড়লে মারাই যাবেন। তা, যেটা হয় মনস্থির করে বলুন—মর্দগি হবে না মটন হবে।

তখন দুজনে বুঝিল আহারের কথা হইতেছে। ভীরা মৃত্যুঞ্জয় নিরন্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল,

দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল

ভয় কিসের মশায়। নাচতে বসে ঘোমটা?

দারুকেশ্বর। (দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া, হাসিয়া) তা মর্দগিই ভালো, কটলেট, কী বলেন।

মৃত্যুঞ্জয়। (সাহস পাইয়া) মটনটাই বা মন্দ কী ভাই। চপ!

অক্ষয়। ভয় কী দাদা, দু-ই হবে। দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না। (চাকরকে ডাকিয়া) ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমন্দি খানসামাকে ডেকে আন দেখি। (বুড়ো আঙুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে) বিয়ার না শেরি?

মৃত্যুঞ্জয় লম্জিত হইয়া মৃথ বাঁকাইল

দারুকেশ্বর। হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি?

অক্ষয়। (পিঠ চাপড়াইয়া) নেই তো কী। বেঁচে আছি কী করে।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

একটি ছটাক সোডার জলে পার্কি তিন পোয়া হুইস্কি।

ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্তব্য বোধ করিল

এবং দারুকেশ্বর ফস করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ বাজাইতে আরম্ভ করিল

দারুকেশ্বর। দাদা, ওটা শেষ করে ফেলো।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া) ধরো-না হে, তুমিও ধরো।

সলম্ব মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল

অক্ষয় ডেস্ক চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন—এক জায়গায় হঠাৎ থামিয়া, গম্ভীর হইয়া

হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এ দিকে তো সব ঠিক, এখন আপনারা কী হলে রাজি হন।

দারুকেশ্বর। আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।

অক্ষয়। সে তো হবেই। তার না কাটলে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে। দেশে আপনাদের মতো লোকের বিদোবুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাটলেই একেবারে নাকে মৃখে চোখে উছলে উঠবে।

দারুকেশ্বর। (অত্যন্ত খুশি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্ছে। বদলে?

অক্ষয়। সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্টাইজ্ আজই তো হবেন?

দারুকেশ্বর। (হাসিতে হাসিতে) সেটা কিরকম।

অক্ষয়। (কিণ্ণ বিন্ময়ের ভাবে) কেন, কথাই তো আছে, রেভারেন্ড বিশ্বাস আজ রাগেই আসছেন। ব্যাপ্টাইজ্ না হলে তো ক্রিষ্টান মতে বিবাহ হতে পারে না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীত হইয়া) ক্রিষ্টান মতে কী মশায়।

অক্ষয়। আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন। সে হচ্ছে না— ব্যাপ্টাইজ্ যেমন করে হোক, আজ রাগেই সারতে হচ্ছে। কিছুতেই ছাড়ব না।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনারা ক্রিষ্টান নাকি।

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীতভাবে) মশায়, আমরা হিন্দু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোয়াতে পারব না।

অক্ষয়। (হঠাৎ অত্যন্ত উদ্বেগের) জাত কিসের মশায়। এ দিকে কলিমন্দির হাতে মর্দিগী খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত?

মৃত্যুঞ্জয়। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) চুপ, চুপ, চুপ করুন। কে কোথা থেকে শুনতে পাবে।

দারুকেশ্বর। ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ করে দেখি।

(মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া) বিলেত থেকে ফিরে সেই তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে—তখন ডবল প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘটে উঠবে না। দেখলি তো কোনো শ্বশুরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিষ্টানের হুকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিষ্টান হতে আর বাকি কী রইল।

(অক্ষয়ের কাছে আসিয়া) বিলেত যাওয়াটা তো নিশ্চয় পাকা? তা হলে ক্রিষ্টান হতে রাজি আছি।

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আজ রাতটা থাক্।

দারুকেশ্বর। হতে হয় তো চটপট্ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভালো; গোড়াতেই বলেছি, শ্রুভস্য শীঘ্রং।

ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম

দুই থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ-জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

দারুকেশ্বর। কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মর্দিগী বেটা উড়েই গেল নাকি। কট্লেট কোথায়।

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে) আজকের মতো এইটেই চলুক।

দারুকেশ্বর। সে কি হয় মশায়। আশা দিয়ে নৈরাশ? শ্বশুরবাড়ি এসে মটন চপ খেতে পাব না? আর, এ যে বরফ-জল মশায়, আমার আবার সর্দির খাত, সাদা জল সহ্য হয় না। (গান জুড়িয়া) অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে টিপিয়া) ধরো-না হে, তুমিও ধরো-না—চুপচাপ কেন। (গানের উচ্ছ্বাস থামিলে আহা-পাত্র দেখাইয়া) নিতান্তই কি এটা চলবে না।

দারুকেশ্বর। (ব্যস্ত হইয়া) না মশায়, ও-সব রোগীর পথ্য চলবে না। মর্দিগী না খেয়েই তো ভারতবর্ষ গেল।

অক্ষয়। (কানের কাছে আসিয়া লক্ষ্মী ঠুংরিতে গান)

কত কাল রবে বলো ভারত রে

শুদ্ধ ডাল ভাত জল পথ্য করে।

দারুকেশ্বর উৎসাহ-সহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া
সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল

অক্ষয়। (আবার কানে কানে ধরাইয়া দিয়া)

দেশে অন্তরালের হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি-সোডা আর মর্গি-মটন।

দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উদ্ভ্রম্বরে ঐ পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে
মৃত্যুঞ্জয়ও কোনো মতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে)

যাও ঠাকুর চৈতন-চুট্‌কি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমন্দি মিঞা।

যতই উৎসাহ-সহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উস্‌খুস্‌ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল এবং
অক্ষয় নিরীহ ভালোমানুষটির মতো মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন।
এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমন্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

দারুকেশ্বর। (কলিমন্দিকে) এই যে চাচা। আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি। অক্ষয়বাবু,
কারি না কট্‌লেট।

অক্ষয়। (অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া) সে আপনারা যা ভালো বোঝেন।

দারুকেশ্বর। আমার তো মত, রান্নাণেভ্যা নমঃ বলে সব-কটাকেই আদর করে নিই।

অক্ষয়। তা তো বটেই, ওরা সকলেই পূজ্য।

কলিমন্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

অক্ষয়। (কিণ্ণ গলা চড়াইয়া) মশায়রা কি তা হলে আজ রাতেই ক্রিস্‌চান হতে চান।

দারুকেশ্বর। আমার তো কথাই আছে, শ্রুতস্য শীয়ং। আজই ক্রিস্‌চান হব, এখনই ক্রিস্‌চান
হব, ক্রিস্‌চান হয়ে তবে অন্য কথা। মশায়, আর ঐ পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না।
আনুন আপনার পাদরি ডেকে।

উচ্চস্বরে গান

যাও ঠাকুর চৈতন-চুট্‌কি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমন্দি মিঞা।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। (অক্ষয়ের কানে কানে) মাঠাকরুন একবার ডাকছেন।

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেলে

জগন্তারিণী। এ কী। কান্ডটা কী।

অক্ষয়। (গম্ভীরমুখে) মা সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হুইস্কি চাচ্ছে, কী করি। তোমার
পায়ের মালিশ করবার জন্যে সেই-যে ব্রান্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে।

জগন্তারিণী। (হতবুদ্ধি হইয়া) বল কী বাছা। ব্রান্ডি খেতে দেবে?

অক্ষয়। কী করব মা, শ্রুতস্য তো, ওর মধ্যে একটি ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দি
হয়, মদ না খেলে আর-একটির মূখে কথাই বের হয় না।

জগন্তারিণী। ক্রিস্‌চান হবার কথা কী বলছে ওরা।

অক্ষয়। ওরা বলছে হিন্দু হয়ে খাওয়া-দাওয়ার বড়ো অসুবিধে, পুঁইশাক কলায়ের ডাল খেলে ওদের অসুখ করে।

জগন্তারিণী। (অবাক হইয়া) তাই বলে কি ওদের আজ রাতেই মর্গি খাইয়ে ক্রিস্চান করবে নাকি।

অক্ষয়। তা, মা, ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দুটি পাঠ এখনই হাতছাড়া হবে। তাই ওরা যা বলছে তাই শুনতে হচ্ছে। (পদ্রবালার প্রতি) আমাকে-সুস্থ মদ ধরাবে দেখাছি।

পদ্রবাল। বিদায় করো, বিদায় করো, এখনই বিদায় করো।

জগন্তারিণী। (বাস্ত হইয়া) বাবা, এখানে মর্গি খাওয়া-টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিককাকাকে পাঠ সন্ধান করতে দিয়েছিলুম। তাঁর দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়।

[রমণীগণের প্রস্থান]

অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে
এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।
অক্ষয়ের অবর্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে

মৃত্যুঞ্জয়। (অক্ষয়কে রাগের স্বরে) না মশায়, আমি ক্রিস্চান হতে পারব না। আমার বিয়ে করে কাজ নেই।

অক্ষয়। তা মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করছে।

দারুকেশ্বর। আমি রাজি আছি মশায়।

অক্ষয়। রাজি থাকেন তো গিজের যান মশায়। আমার সাত পদ্রবে ক্রিস্চান করা ব্যাবসা নয়।

দারুকেশ্বর। ঐ যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বললেন—

অক্ষয়। তিনি টেরিটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দারুকেশ্বর। তা হলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায়? খাওয়াটাও কি—

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্তত হোটেল?

অক্ষয়। সে কথা ভালো।

টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া দুটিকে বিদায় করিয়া দিলেন।

নৃপ হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দম্কা হাওয়ার মতো ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল

নীরবালা। মদুখুজ্জমশায়, দিদি তো দুটির কোনোটিকেই বাদ দিতে চান না।

নৃপবালা। (নীরের কপোলে গুটি দুই-তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া) ফের মিথ্যে কথা বলছিঁস!

অক্ষয়। বাস্ত হোস নে ভাই, সত্যমিথ্যের প্রভেদ আমি একটু-একটু বুঝতে পারি।

নীরবালা। আচ্ছা মদুখুজ্জমশায়, এ দুটি কি রসিকদাদার রসিকতা না আমাদের সেজদিদিরই ফাঁড়া?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে। প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্টিস করছিলেন, এ দুটো ফসকে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্বে তোমার দিদির ছিঁপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বড়শি বঁধল কেবল আমারই কপালে।

কপালে চপেটাঘাত

নৃপবালা। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্টিস চলবে নাকি মৃদুজ্যৈষ্ঠমশায়। তা হলে তো আর বাঁচা যায় না।

নীরবালা। কেন ভাই দঃখ করিস। রোজই কি ফসকাবে। একটা-না-একটা এসে ঠিকমতন পৌঁছবে।

রসিকের প্রবেশ

নীরবালা। রসিকদাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্ছি।

রসিক। সে তো স্নেহের বিষয়।

নীরবালা। হাঁ। স্নেহ দেখিয়ে দেব। তুমি থাক হোগলার ঘরে, আর পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও? আমাদের হাতে টিকে নেই? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ তা হলে তোমার দু-দুটো বিয়ে দিয়ে দেব; মাথায় যে-কটি চুল আছে সামলাতে পারবে না।

রসিক। দেখ্ দিদি, দুটো আস্ত জন্তু এনোছিলুম বলেই তো রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রকমের হত তা হলেই তো বিপদ ঘটত। যাকে জন্তু বলে চেনা যায় না সেই জন্তুই ভয়ানক।

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলোবামাত্রই চটপট শব্দ লেজ নড়ে উঠল। কিন্তু, মা বলছেন কী।

রসিক। সে যা বলছেন সে আর পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনার মতো নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম। যা হোক, শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীরবালা। বল কী রসিকদাদা। তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নতুন নতুন নমুনো দেখা বন্ধ?

নৃপবালা। তোর এখনো শখ আছে নাকি।

নীরবালা। এ কি শখের কথা হচ্ছে। এ হচ্ছে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে জিনিসটা সহজ হয়ে আসবে; যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে বৃদ্ধিতে কষ্ট হবে না।

নৃপবালা। তোমার প্রাণীকে তুমি বৃদ্ধে নিয়ো, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

নীরবালা। সেই কথাই ভালো—তুইও নিজের জন্যে ভাবিস, আমিও নিজের জন্যে ভাবব, কিন্তু রসিকদাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান]

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

অক্ষয়। অ্যাঁ, শৈল, এই বৃদ্ধি! আজ রসিকদা হলেন রাজমন্ত্রী! আমাকে ফাঁকি!

শৈলবালা। (হাসিয়া) তোমার সঙ্গে আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মৃদুজ্যৈষ্ঠমশায়। পরামর্শ যে বৃদ্ধো না হলে হয় না।

অক্ষয়। তবে রাজমন্ত্রীপদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম।

হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে খাম্বাজে গান

আমি কেবল ফুল জোগাব

তোমার দুটি রাঙা হাতে,

বৃন্দ আমায় খেলে নাকো

পাহারা বা মন্ত্রণাতে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, আমরা যে চিরকুমার-সভার সভ্য হব—তুমি আমার বাহন হবে।

রসিক। ভগবান হরি নারীছদ্মবেশে পদ্রুদকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পদ্রুদ-

ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস তা হলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ বয়সটা কাটাও। কিন্তু, মা যদি টের পান?

শৈলবালা। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখতে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু, সভায় কিরকম করে সভ্যতা করতে হয় সে আমি কিছুই জানি নে।

শৈলবালা। আচ্ছা, সে আমি চালিয়ে নেব। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি। রসিকদা, তোমার তো মার সঙ্গে কাশী গেলে চলবে না।

অক্ষয়। মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সেজন্যে ভাবনা নেই।

শৈলবালা। মধুজ্ঞেয়শায়, তুমি তাদের কী বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে—শেষকালে বেচারাদের জন্যে আমার মায়া করছিল।

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই। যেমন কবি হওয়া আর-কি। লেজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।

পুরুষালার প্রবেশ

পুরুষালা। (কেরোসিন ল্যাম্পটা লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া) বেহারা কিরকম আলো দিয়ে গেছে.. মিটমিট করছে। ওকে ব'লে ব'লে পারা গেল না।

অক্ষয়। সে বেটা জানে কিনা অন্ধকারেই আমাকে বেশি মানায়।

পুরুষালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্ছে নাকি। এটা তো নতুন দেখছি।

অক্ষয়। আমি বলছিলাম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেছে।

পুরুষালা। ওঃ, তাই ভালো। তা, ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও।—কিন্তু রসিকদাদা, আজ কী কান্ডটাই করলে।

রসিক। ভাই, বর টের পাওয়া যায়, কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুরুষালা। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দুটো-একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই তো ভালো হত।

শৈলবালা। সে ভার আমি নিয়েছি দিদি।

পুরুষালা। তা আমি বুঝেছি। তুমি আর তোমার মধুজ্ঞেয়শায় মিলে কদিন ধরে যেরকম পরামর্শ চলছে একটা কী কান্ড হবেই।

অক্ষয়। কিঞ্চিন্ধ্যাকান্ড তো আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্ছে, চিরকুমার-সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলছি।

পুরুষালা। শৈল তার মধ্যে কে।

রসিক। হনুমান তো নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হচ্ছেন স্বয়ং আগুন।

রসিক। এক ব্যক্তি ঠুকে লেজে করে নিয়ে যাবেন।

পুরুষালা। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। শৈল, তুই চিরকুমার-সভায় যাবি নাকি।

শৈলবালা। আমি যে সভ্য হব।

পুরুষালা। কী বলিস তার ঠিক নেই। মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কী।

শৈলবালা। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপকান ধরব ঠিক করেছি।

পূরবালা। বদ্বোছি, ছন্মবেশে সভ্য হতে যাচ্ছিস বদ্বি। চুলটা তো কেটেইছিস, ঐটেই বাকি ছিল। তোমাদের যা খুশি করো, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না না, তুমি এ দলে ভিড়ো না। আর যার খুশি পূরদুষ হোক, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকে—নইলে ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট—সে বড়ো ভয়ানক মকদ্দমা—

গান

চির-পূরানো চাঁদ,
চিরদিবস এমনি থেকে আমার এই সাধ।
পূরানো হাসি পূরানো সূধা মিটায় মম পূরানো ক্ষুধা,
নতুন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ।

[পূরবালার প্রস্থান]

শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া

ভয় নেই! রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে—একটু অননুতাপও হবে—সেইটেই সুযোগের সময়।

রসিক। কোপো যত্র ভ্রুকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং,
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি তো দিব্য শ্লেোক আউড়ে চলেছ—কোপ জিনিসটা কী, তা মূখদুজ্জেশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি। মূখদুজ্জেশাই যদি শ্লেোক আওড়াতে আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বর্ধিয়ে রাখতুম।

শৈলবালা। মূখদুজ্জেশায়।

অক্ষয়। (অত্যন্ত রসতভাবে) আবার মূখদুজ্জেশায়! এই বালখিল্য মূর্নিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

শৈলবালা। ধ্যানভঙ্গ আমরা করব। কেবল মূর্নিকুমারগর্ভলিকে এই বাড়িতে আনা চাই।

অক্ষয়। সভাসমুদ্র এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে? যত দুঃসাধ্য কাজ সব এই একটিমাত্র মূখদুজ্জেশায়কে দিয়ে?

শৈলবালা। (হাসিয়া) মহাবীর হবার ঐ তো মূর্শকিল। যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল নীল অঙ্গদকে তো কেউ পৌঁছেও নি।

অক্ষয়। ওরে পোড়ারমুখী, ত্রেতাযুগের পোড়ারমুখকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!

শৈলবালা। হাঁ গো, এত প্রেম!

অক্ষয়।

গান

পোড়া মনে শুধু পোড়া মূখখানি জাগে রে।
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে।

অক্ষয়। আচ্ছা, তাই হবে। পঙ্গপাল-ক'টাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব। তা হলে চুট করে আমাকে একটা পান এনে দাও। তোমার স্বহস্তের রচনা।

শৈলবালা। কেন, দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আরে, দাঁদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে। এখন অন্য পদ্মহস্তগর্দুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে।

শৈলবালা। আচ্ছা গো মশায়। পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুন মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ার মূখ আবার পুড়বে।

অক্ষয়।

গান

যারে মরণদশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শৈলবালা। মৃদুজ্জেশমশায়, ও কাগজের গোলাটা কিসের।

অক্ষয়। তোমাদের সেই সভা হবার আবেদনপত্র এবং প্রবেশিকার দশ টাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এমনি পরিষ্কার করে দিয়েছে একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছি নে। ও বেটা বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ঐ পত্রটা একেবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈলবালা। এই বুদ্ধি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মরণশক্তি জুড়ে বসে আছ, আর কিছুর কি মনে রাখতে দিলে?

গান

সকলি ভুলেছে ভোলা মন,
ভোলে নি ভোলে নি শূদ্ধ ওই চন্দ্রানন।

[শৈল ও রসিকের প্রস্থান]

পূরবালার প্রবেশ

অক্ষয়। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না।

পূরবালা। আমি কি পণ্ডিতমশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি। আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সুখবর নয়—শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বর্কশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে না।

পূরবালা। ইস্, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে? না? সহ্য করতে পারছ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদটার কথা ভাবছি নে। এখন তুমি দুদিন না রইলে, আরো কজন রয়েছেন, এক রকম করে এই হতভাগ্যের চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কী হবে। দেখো, ধর্মে-কর্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না; স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাকব—তোমাকে বিষ্ণুদত্তে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদত্তে কানে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে।

গান

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,
পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে,
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে
বিষ্ণুদত্তের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে।

পূরবালা। আচ্ছা আচ্ছা, থামো।

অক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চলবে? উনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত? নিতান্তই চললে?

পূরবালা। চললুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে।

পূরবালা। রসিকদাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়েমানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না। সেইজন্যই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পূরবালা। তোমাকে তো বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অক্ষয়। তা হবে না।

গান

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ

তাই ভাবতে বেলা অবসান।

ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন,

বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ধনার গুটি দই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি—

বিরহযামিনী কেমনে যাপিবে,

বিচ্ছেদতাপে যখন তাপিবে

এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,

মকরকেতনে কেবলি শাপিবে—

পূরবালা। রক্ষ করো, ও মিলটা ঐখানেই শেষ করো!

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থামতে পারি নে, কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাস অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি ‘আতর্নাদ বধ কাব্য’ বলে একটা কাব্য লিখব। সখী, তার আরম্ভটা শোনো—

(সাড়ম্বরে) বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচুড়ামণি
পূরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীগ্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয়!

পূরবালা। (সগর্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়। তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখো-না।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথা যদি বললে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুদ্ধোচ্চি ওটা সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ঐ কাব্য লেখা, ও কার্যটাও সুসাধ্য বলে জ্ঞান করি নে। বুদ্ধিতে আমার এক জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জমতে পারে না—ফস্ ফস্ করে বোরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে—

যেমন ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।

কিন্তু, আমার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর পেলুম না? কোতূহলে মরে যাচ্ছি। কাশীতে যে চলেছ, উৎসাহটা কিসের জন্যে। আপাতত সেই বিষ্ণুদত্তটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারি সন্দেহ হচ্ছে। শুনোছি নন্দী ও ভৃঙ্গী অনেক বিষয়ে আমাকেও জেতে, ফিরে এসে হয়তো এই ভৃত্যটিকে পছন্দ না হতেও পারে।

পূরবালা। আমি কাশী যাব না।

অক্ষয়। সে কী কথা। ভূতভাবনের যে ভূত্যাগর্ভি একবার মরে ভূত হয়েছে তারা যে দ্বিতীয়বার মরবে।

রসিকের প্রবেশ

পূরবালা। আজ যে রসিকদার মুখ ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

রসিক। ভাই, তোর রসিকদার মুখের ঐ রোগটা কিছতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে—বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে মনে রাগ করে।

পূরবালা। শুনলে তো বিবাহিত লোক? এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও।

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃন্দ কোথা থেকে জানবে? সে এত রহস্যময় যে তা উদ্বেদ করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারলে না, সে এত গভীর যে আমরাই হাতড়ে খুঁজে পাই নে—ইঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পূরবালা। এই বৃন্দ!

[রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম]

অক্ষয়। (তাহাকে ফিরাইয়া) দোহাই তোমার, এই লোকটির সামনে রাগারাগি কোরো না—তা হলে ওর আত্মপর্থা আরো বেড়ে যাবে। দেখো দাম্পত্যতত্ত্বানভিজ্ঞ বৃন্দ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবত আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, সেইটেই তোমাদের কণ্ঠগোচর হয়; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কানের কাছে মুখ আনতে গিয়ে মুখ বারংবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে থাকে—তখন তো খবর পাও না।

পূরবালা। আঃ, চুপ করো।

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে স্যাকরা পর্যন্ত সেটা কারো অবিদিত থাকে না, কিন্তু বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী—

পূরবালা। আঃ, থামো।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে প্রেয়সী—

পূরবালা। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জন করে বলেন, আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই—আমার হাড় কালি হল—আমার—

পূরবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব বলে বসন্তনিশীথে গর্জন করেছে।

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই? আবার সন তারিখ-সুন্দর মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে? আমি কি এতবড়ো প্রতিভাশালী।

রসিক। (পূরবালার প্রতি) বৃন্দেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বলতে পারে না—ওর এত ক্ষমতাই নেই—তাই উল্টে বলে; আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়।

পূরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।

রসিক। তা, বেশ তো, এতে আর ভয়ের কথাটা কী। তীর্থে যাবার তো বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোলকটাক্ষে এ বৃন্দের কিছই করতে পারবে না—এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে

মুগ্ধান্ধিগ্ধবিদগ্ধলব্ধমধুরৈলৌলৈঃ কটাক্ষৈরলং

চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ততে।

পূরবালা। সে তো খুব ভালো কথা, তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাই নে, এখন চন্দ্রচূড়চরণে চলো—তা হলে মাকে ডাকি।

রসিক। (করজোড়ে) বড়দিদিভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা করেছেন,

কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছেন—এখন তাঁর শাসনে কোনো ফল হবে না। বরঞ্চ এখনো নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোল কটাক্ষটা শেষকাল পর্যন্ত থাকে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্ছেন, কিছদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বৃদ্ধিবৃদ্ধির উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ করে শান্তিতে থাকুন—কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা, তা হলে আসি।

অক্ষয়। চললে নাকি মা? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ করছিলেন যে তুমি—

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা। মা, আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি কেন দুঃখ করতে যাব।

অক্ষয়। বলছিলেন না যে ‘বড়োমা একলাই কাশী যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না’?

রসিক। হাঁ, সে তো ঠিক কথা। মনে তো লাগতেই পারে, তবে কিনা মা যদি নিতান্তই—

জগত্তারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সামলাবে কে। ঠুকে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

পূরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে-শুনতে পারতেন।

জগত্তারিণী। রক্ষে করো, আমাকে আর দেখে-শুনে কাজ নেই। তোমার রসিকদাদার বৃদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা, মা, যেটুকু বৃদ্ধি আছে তার পরিচয় সবদাই দিচ্ছি, ও তো চেপে রাখবার জো নেই—ধরা পড়তেই হবে। ভাঙা চাকাটাই সব চেয়ে খড়্‌খড়্‌ করে, তিনি যে ভাঙা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেইজন্যেই বড়োমা, চুপচাপ করে থাকতেই চাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না।

জগত্তারিণী। আমি তা হলে হারানের বাড়ি চললুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠব; এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরা তো দিনক্ষণ মানিস নে, ঠিক সময়ে ইন্সটেশনে যাস।

পূরবালা। মা, আমি কাশী যাব না।

হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগত্তারিণী তাহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন

অক্ষয়। (শাশুড়ির মনের ভাব বুঝিয়া) সে কি হয়। তুমি মার সঙ্গে না গেলে ঠুর অসুবিধে হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে স্টেশনে নিয়ে যাব।

জগত্তারিণী নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিকদাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদায়কালীন বিমর্ষতা মুখে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

পুরুষবেশধারী শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। কে মশায়। আপনি কে?

শৈলবালা। আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। (অক্ষয়ের সঙ্গে শেকহ্যান্ড) মধুজ্জৈমশায়, চিনতে তো পারলে না?

পূরবালা। অবাক করলি। লজ্জা করছে না?

শৈলবালা। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ—পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মধুজ্জৈমশায় যদি মেয়ে সাজেন উনি লজ্জায় মূখ দেখাতে পারবেন না। রসিকদাদা, চুপ করে রইলে যে?

রসিক। আহা, শৈল যেন কিশোর কন্দর্প। যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এসে। ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আসছি, চোখের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল; ও সুন্দরী কি

মাঝারি কি চলনসই সে কথা কখনো মনেও ওঠে নি—আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই তো ওর রূপখানি ধরা দিলে। পুরোদিদি, লজ্জার কথা কী বলছিঁস, আমার ইচ্ছে করেছে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি।

অক্ষয়। (স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীৰ্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া) সত্যি বলছি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোটো ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।

শৈলবালা। (ঈষৎ বিচলিত হইয়া) আমিও না মৃদুজ্জেশমশায়।

পুরবালা। (শৈলকে বৃকের কাছে টানিয়া) এই বেশে তুই কুমার-সভার সভা হতে যাচ্ছিঁস?

শৈলবালা। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি। কী বল রসিকদাদা।

রসিক। তা তো বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে। ভগবান পার্গিনি বোপদেব এঁরা কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভাই, শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষা হয়।

অক্ষয়। নতুন মৃদুধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে-পড়ে দিতে পারি, চিরকুমার-সভার মৃদুধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কিনা।

পুরবালা। (একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তোর মৃদুজ্জেশমশায়কে আর এই বৃড়ো সমবয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর—আমি মার সৎগে কাশী চললুম।

পুরবালা জিনিসপত্র গুছাইতে গেল, এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল।

নীর দরজার আড়াল হইতে আর-একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া ‘মেজদিদি’ বলিয়া ছুটিয়া আসিল

নীরবালা। মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করেছে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন্ রূপকথার রাজপুত্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছ।

নীরর সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃদুধনেত্রে চাহিয়া রহিল

নীরবালা। (তাহাকে টানিয়া লইয়া) অমন করে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিঁস কেন। যা মনে করছিঁস তা নয়, ও তোর দৃষ্টিমন্ত নয়—ও আমাদের মেজদিদি।

রসিক।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অক্ষয়। মৃঢ়ে, তোরা কেবল চাপকানটা দেখেই মৃদুধ। গিল্টির এত আদর? এ দিকে যে খাঁটি সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার করেছে।

নীরবালা। আজকাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশি, আমাদের এই গিল্টিই ভালো। কী বল ভাই মেজদিদি।

শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তায় যাচ্ছে ভাই, এখনো কোনো টাঁকশালে গিয়ে কোনো মহারানীর ছাপটি পর্যন্ত পড়ে নি।

নীরবালা। আচ্ছা বেশ, মেজদিদিকে দান করলুম। (রসিকদাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিঁস তো ভাই?

নৃপবালা। তা আমি রাজি আছি।

রসিকদাদাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া সে তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

শৈলবালা। আঃ, কী করছিঁস, আমার গোঁফ পড়ে যাবে।

রসিক। কাজ কী, এ দিকে আয়-না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই পড়বে না।

নীরবালা। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সপে দিলুম কী করতে। আচ্ছা রসিকদাদা, তোমার মাথার দুটো-একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কী করে।

রসিক। কারো কারো মাথা পাকবার আগে মূখটা পাকে।

অক্ষয়। তা হলে আমি একবার চিরকুমার-সভার মাথায় হাত বুলিয়ে আসি।

নীরবালা।

গান

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব।

মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব।

আঁচল বিছায়ে রাখি পথধূলা দিব ঢাকি—

ফিরে এলে হে বিজয়ী, হৃদয়ে বরিয়া লব।

অক্ষয়। রথ প্রস্তুত, এখন কী আনব বলো।

নীরবালা।

গান

আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে—

নববসন্তশোভা এনো এ শূন্যবনে।

সোনার প্রদীপে জ্বালো আঁধার ঘরের আলো,

পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব।

অক্ষয়। আর সব ভালো, কেবল তোমার ফর্দের মধ্যে সোনার প্রদীপটাই আক্কারা ঠেকছে। চেষ্টার ঘূটি হবে না।

নীরবালা। দিদিদের সভাটা কোন্ ঘরে বসবে মৃখুজ্জেশমশায়।

অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে।

নীরবালা। তা হলে সে ঘরটা একটু সাজিয়ে-গুঁজিয়ে দিই গে।

অক্ষয়। যতদিন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করছি একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি?

নীরবালা। তোমার জন্যে ঝড়ু বেহারা আছে, তবু বুঝি আশ মিটল না?

পূরবালার প্রবেশ

পূরবালা। কী হচ্ছে তোমাদের।

নীরবালা। মৃখুজ্জেশমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা, উনি বলছেন গুঁর বাইরের ঘরটা ভালো করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে গুঁর ঘর সাজাতে যাচ্ছি। আয় ভাই।

পূরবালা। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা-না—আমি যাব না।

নীরবালা। বাঃ, আমি একা খেটে মরব, আর তুমি-সুন্দর তার ফল পাবে সে হবে না।

নৃপকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল

পূরবালা। সব গুঁছিয়ে নিয়েছি। এখনো ট্রেন যাবার দেরি আছে বোধ হয়।

অক্ষয়। যদি মিস করতে চাও তা হলে ঢের দেরি আছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি। চিরকুমার-সভার ঘর

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। তা, যাই বল, অক্ষয়বাবু যখন আমাদের সভায় ছিলেন তখন আমাদের চিরকুমার-সভা জমেছিল ভালো। আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবু কিছু কড়া।

বিপিন। তিনি থাকতে রস কিছু বেশি জমে উঠেছিল—চিরকোমারব্রতের পক্ষে রসাদিক্যটা ভালো নয়, আমার তো এই মত।

শ্রীশ। আমার মত ঠিক উল্টো। আমাদের ব্রত কঠিন বলেই রসের দরকার বেশি। রন্ধ মাটিতে ফসল ফলাতে গেলে কি জলসিঙনের প্রয়োজন হয় না। চিরজীবন বিবাহ করব না এই প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট, তাই বলেই কি সব দিক থেকেই শূন্য হয়ে মরতে হবে।

বিপিন। যাই বল, হঠাৎ কুমার-সভা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ করে অক্ষয়বাবু আমাদের সভাটাকে যেন আলুগা করে দিয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেছে।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার প্রতিজ্ঞার বল আরো বেড়েছে। যে ব্রত সকলে অনায়াসেই রক্ষা করতে পারে তার উপরে শ্রদ্ধা থাকে না।

বিপিন। একটা সুখবর দিই শোনো।

শ্রীশ। তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে নাকি।

বিপিন। হয়েছে বৈকি—তোমার দৌহিত্রীর সঙ্গে। ঠাট্টা রাখো, পূর্ণ কাল কুমার-সভার সভ্য হয়েছে।

শ্রীশ। পূর্ণ! বল কী। তা হলে তো শিলা জলে ভাসল।

বিপিন। শিলা আপনি ভাসে না হে। তাকে আর-কিছুতে অকূলে ভাসিয়েছে।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, পূর্ণ যে খামকা চিরকুমার-সভার সভ্য হল তার তো কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সভায় কৈশিকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি কোনো আকর্ষণের বালাই নেই।

বিপিন। কে বললে নেই। পর্দার আড়ালে আছে।

শ্রীশ। আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা কিরকম শূন্য।

বিপিন। পূর্ণ এ সভার সভ্য হবার পর থেকে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে তার দুটি চক্ষু সর্বদা ঐ দরজার দিকের পর্দাটার রহস্যভেদ করবার জন্যই নিবিষ্ট। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি পর্দার নীচের ফাঁক দিয়ে দুখানি চরণ দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা গেল, সেই চরণের দিকে যার মন বিচরণ করে কুমার-ব্রত রক্ষা করতে গিয়ে সে বিরত হবে।

শ্রীশ। সেই চরণদুগলের চরম তত্ত্বটা ধরতে পারলে? যাকে একটু করে জানলে মন উতলা হয় অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ জানলে মন শান্তি পায়। চরণ দুটি কার শূন্য।

বিপিন। তবে ইতিহাসটা বলি শোনো। জানই তো, পূর্ণ সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রবাবুর কাছে পড়ার নোট নিতে যায়। সেদিন আমি আর পূর্ণ একসঙ্গেই একটু সকাল-সকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় এসে-ছিলেম। তিনি একটা মিটিং থেকে সবে এসেছেন। বেহারা কেরোসিন জেদলে দিয়ে গেছে, পূর্ণ বইয়ের পাত ওলটাচ্ছে, এমন সময়—কী আর বলব ভাই, সে যেন ষ্টিফেনবাবুর কোন্ এক অলিখিত নভেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক কন্যা, পিঠে দুলছে বেণী—

শ্রীশ। বল কী, বল কী বিপিন!

বিপিন। শোনোই-না। এক হাতে থালায় করে চন্দ্রবাবুর জন্যে জলখাবার, আর-এক হাতে

জলের গ্লাস নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের দেখেই তো কুণ্ঠিত, সচকিত, লজ্জায় মুখ রক্তিমবর্ণ। হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর খাবার রেখেই ছুট। পূর্ণের মুখ দেখেই বোঝা গেল, তার মনটা দোদুল্যমান বেণীর পিছন পিছন ছুটছে। ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু তেঁরিশ কোটির সঙ্গে লজ্জাকে বিসর্জন দেয় নি এবং সত্য বলছি শ্রীকেও রক্ষা করেছে।

শ্রীশ। বল কী বিপিন, দেখতে ভালো বড়ি।

বিপিন। দাঁড়া দেখতে। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো এসে পড়ে পড়াশুনোয় বজ্রাঘাত করে গেল।

শ্রীশ। আহা, কই, আমি তো একদিনও দেখি নি। মেয়েটি কে হে।

বিপিন। আমাদের সভাপতির ভাণ্ডারী, নাম নির্মালা।

শ্রীশ। ভাণ্ডারী? সর্বনাশ! এইখানেই থাকেন?

বিপিন। সন্দেহমাত্র নেই। সভাপতিমশায় নিজের নীরোগ, কিন্তু রোগের ছোঁয়াচ নিয়ে ফেরেন।

শ্রীশ। কিন্তু ভাণ্ডারীমশায় বলে বালাই নেই বড়ি?

বিপিন। সে বালাইটি অপরিণীত আকারে চিরকুমার-সভায় ঢুকে পড়েছে। পূর্ণ পরিণত আকারে যখন বেরিয়ে পড়বে তখন প্রজাপতি কুমার-সভার গুঁটি বিদীর্ণ করে দেবেন।

শ্রীশ। তিনি তবে কুমারী?

বিপিন। কুমারী বৈকি? কুমার-সভার মহামারী। এই ঘটনার ঠিক পরেই পূর্ণ হঠাৎ আমাদের কুমার-সভায় নাম লিখিয়েছে।

শ্রীশ। পূজারী সেজে ঠাকুর চুরি করবার মতলব। আমাকেও তো ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বিপিন। নারী-তত্ত্বের গবেষণা স্বাস্থ্যকর না হতে পারে।

শ্রীশ। তোমার স্বাস্থ্যের যদি ব্যাঘাত না হয়ে থাকে তা হলে আমারও---

বিপিন। আরম্ভেতে রোগের প্রবেশ ধরা পড়ে না। কিন্তু, কুমারের মার যখন ভিতর থেকে ফুটে উঠবে তখন অশ্বিনীকুমারেরও সাধ্য নেই রক্ষা করে। গোড়ায় সাবধান হওয়া ভালো।

একটি প্রোড় ব্যক্তির প্রবেশ

বিপিন। কী মশায়, আপনি কে।

প্রোড় ব্যক্তি। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য, ঠাকুরের নাম 'রামকমল' ন্যায়চণ্ড, নিবাস—

শ্রীশ। আর অধিক আমাদের ঔৎসুক্য নেই। এখন কী কাজে এসেছেন সেইটে—

বনমালী। কাজ কিছুই নয়। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়—

শ্রীশ। কাজ আপনার না থাকে আমাদের আছে। এখন, অন্য কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আলাপ-পরিচয় করতে যান তা হলে আমাদের একটু—

বনমালী। তবে কাজের কথাটা সেরে নিই।

শ্রীশ। সেই ভালো।

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরী-মশায়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে— তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে—

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী।

বনমালী। সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শক্ত কী। আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাঠে অপব্যয় করছেন।

বনমালী। অপাত্ত! বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সৎপাত্ত পাব কোথায়। আপনাদের বিনয়গুণে আরো মৃগ্ধ হলেম।

শ্রীশ। এই মৃগ্ধভাব যদি রাখতে চান তা হলে এইবেলা সরে পড়ুন। বিনয়গুণে অধিক টান সয় না।

বনমালী। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছেন।

শ্রীশ। শহরে ভিক্ষুরের তো অভাব নেই। ওহে বিপিন, তোমার আমোদ বোধ হচ্ছে, কিন্তু এরকম সদালাপ আমার ভালো লাগে না।

বিপিন। পালাই কোথায়। ভগবান একেও যে লম্বা একজোড়া পা দিয়েছেন।

শ্রীশ। যদি পিছু ধরেন তা হলে ভগবানের সেই দান মানুষের হাতে পড়ে খোয়াতে হবে।

বনমালী। আমিই যাই।

[প্রস্থান]

চন্দ্রমাববাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। পূর্ণ!

শ্রীশ। আজ্ঞে, আমি শ্রীশ।

চন্দ্রবাবু। আমাদের এই সভায় সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারো হতাশ্বাস হবার কোনো কারণ নেই—

শ্রীশ। হতাশ্বাস? সেই তো আমাদের সভার গৌরব। এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্বসাধারণের উপযুক্ত। আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।

চন্দ্রবাবু। (কার্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া) কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্তব্য; সর্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকল্পসাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখো পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যারা হয়তো আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আমাদের কয়জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করেছে তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব এবং কোনো রকম শপথও বন্ধ হতে চাই নে। আমাদের মত এই যে, কোনো কালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হওয়া ভালো।

পাশের ঘরে ঈষৎ-মুগ্ধ দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া

উঠিল, তাহার অঙ্গুলবন্ধ চাবির গোছায় দুই-একটা চাবি যে একটু ঠুনু শব্দ করিল

তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না

চন্দ্রবাবু। আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন; অনেকেই বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্য কৌমার্যব্রত গ্রহণ করছ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হলে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাকবে যার জন্য কোনো কাজ করা কারো দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরন্তরে এই-সকল পরিহাস বহন করি; কিন্তু এর কি কোনো উত্তর নেই?

তিনি তাহার তিনটিমাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন

পূর্ণ। (নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে) আছে বৈকি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই-কীটকে আকর্ষণ করে এক উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা—সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্যব্রতে দীক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি-চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরাই কি সেই দুটি-চারটি লোক তবে স্পর্ধাপূর্বক কে নিশ্চয়রূপে বলতে পারে। হাঁ, আমরা

জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্যন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত টিকতে পারব কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা টিকতে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্থলিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারো নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতিমহাশয় একলমাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃপ্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনোই ব্যর্থ হবে না।

কুণ্ঠিত সভাপতি কার্যবিবরণের খাতাখানি পুনর্বার তাহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যান্যনস্কভাবে কী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণের এই বস্তুতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পের্পিছিল। চন্দ্রমাধববাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্মলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পূরস্কৃত করিল

বিপিন। আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য, কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোনো-এক সময়ে শুরুর করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই, কী করতে হবে।

চন্দ্রবাবু। (উৎসাহিত হইয়া) এই প্রশ্নের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম, কী করতে হবে। এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কী করতে হবে। বন্ধুগণ, কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। একসঙ্গে যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিনবাবু আজ এই যে প্রশ্ন করছেন ‘কী করতে হবে’, এই প্রশ্নকে নিবতে দেওয়া হবে না। সভ্যমহাশয়গণ, আপনারা উত্তর করুন কী করতে হবে।

শ্রীশ। (অস্থির হইয়া) আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন ‘কী করতে হবে’ আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতরত নিয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট করে তুলতে হবে, আমাদের সভাটিকে সুক্ষ্ম সুদৃশ্বরূপ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গঞ্জে ফেলতে হবে।

বিপিন। (হাসিয়া) সে ঢের সময় আছে, যা কালই শুরুর করা যেতে পারে এমন একটা-কিছু কাজ বলা। ‘মারি তো গন্ডার, লুঠি তো ভান্ডার’ যদি পণ করে বস তবে গন্ডারও বাঁচবে, ভান্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি, আমরা প্রত্যেকে দুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়াশুনো এবং শরীরমনের সমস্ত চর্চার ভার আমাদের উপর থাকবে।

শ্রীশ। এই তোমার কাজ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি? শেষকালে ছেলে মানুষ করতে হবে! তা হলে নিজের ছেলে কী অপরাধ করেছে।

বিপিন। (বিরক্ত হইয়া) তা যদি বল তা হলে সন্ন্যাসীর তো কর্মই নেই; কর্মের মধ্যে ভিক্ষে আর ভ্রমণ আর ভণ্ডামি।

শ্রীশ। (রাগিয়া) আমি দেখছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এ সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি বাদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তান-পালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল।

বিপিন। (আরক্তবর্ণ হইয়া) নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই নে, কিন্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন যারা সন্ন্যাসগ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগস্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের—

চন্দ্রবাবু। (চোখের কাছ হইতে কার্যবিবরণের খাতা নামাইয়া) উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর অপ্রিয় জানতে পারলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।

পূর্ণ। অদ্য বিশেষরূপে সভার ঐক্য-বিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কিরকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে

চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বসি তা হলে বিরোধানে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে—অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, সভাপতিমশায় আমাদের কাজ নির্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব, কার্যসাধন এবং ঐক্যসাধনের এই একমাত্র উপায় আছে।

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল
এবং তাহার চাঁচি ঝন্ করিয়া উঠিল

চন্দ্রবাবু। আমাদের প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন, এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে বড়ো বাণিজ্য চালাতে পারি নে, কিন্তু তার সূত্রপাত করতে পারি। মনে করো আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হলে দেশে সস্তা দেশলাই নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না। আমি বলছি শুধু ও জিনিসটা প্রস্তুত করার প্রণালী জানলেই তো হবে না। আমাদের দেশে যত রকম কাঠ মেলে তার মধ্যে কোন্ কাঠটা সব চেয়ে দাহ্য তার সন্ধান করা চাই।

বিপিন। দাহনতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর কিছু অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়।

চন্দ্রবাবু। তাই নাকি। কী পূর্ণ, তুমি কি দাহ্য পদার্থের পরীক্ষা করেছ নাকি।

পূর্ণ। আমার মনে হয় খ্যাংরা কাঠি জিনিসটা সস্তাও বটে অথচ—

বিপিন। হাঁ, অথচ ওটা সহজেই জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কুমার-সভায় তার পরীক্ষা সহজ নয়।

চন্দ্রবাবু। কী বলছেন বিপিনবাবু। কথাটা শুনতে পেলুম না।

বিপিন। আমি বলছিলুম, আমাদের দেশে দাহ্য পদার্থ যথেষ্ট আছে, যাতে দাহন করে এমন জিনিসেরও অভাব নেই; কিন্তু পরীক্ষাটা খুব বিবেচনাপূর্বক করা চাই।

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা বলেছেন। অনেক কাঠ আছে, যেমন শীঘ্র জ্বলে ওঠে তেমনি শীঘ্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বিপিন। আছে বৈকি।

চন্দ্রবাবু। শীঘ্র জ্বলবে, অল্প অল্প করে জ্বলবে, অনেকক্ষণ ধরে শেষ পর্যন্ত জ্বলবে, এমন জিনিসটি চাই। খুঁজলে পাওয়া যাবে না কি?

শ্রীশ। খুব পাওয়া যাবে, হয়তো দেখবেন হাতের কাছেই আছে।

পূর্ণ। পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। মশায়, প্রবেশ করতে পারি?

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া
দ্রু কুণ্ঠিত করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন

অক্ষয়। মশায়, ভয় পাবেন না এবং এমন ভ্রুকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না। আমি অভূতপূর্ব নই, এমন-কি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব—আমার নাম—

চন্দ্রবাবু। আর নাম বলতে হবে না। আসুন, আসুন অক্ষয়বাবু—

তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল।

বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সদ্যোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল

পূর্ণ। মশায়, অভূতপূর্বের চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।

অক্ষয়। পূর্ণবাবু বুদ্ধিমানের মতো কথাই বলেছেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্য লোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে

মানুষ ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার-সভার ভূতটিকে সভা থেকে ঝাড়াবেন, না পূর্বসম্পর্কের মমতা-বশত একখানি চৌকি দেবেন—এই বেলা বলুন।

চন্দ্রবাবু। চৌকি দেওয়াই স্থির।

একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন

অক্ষয়। সর্বসম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলুম। আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা করে বসতে বললেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাকব আমাকে এমন অসভ্য মনে করবেন না। বিশেষত পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ঐ তিনটে বদ্ অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে, সুতরাং চটপট কাজের কথা সেরেই বাড়িমুখো হতে হবে।

চন্দ্রবাবু। (হাসিয়া) আপনি যখন সভ্য নন তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম নাই খাটালেম : পান-তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব, কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই—

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়।

চন্দ্রবাবু পান-তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন।

পূর্ণ 'আমি ডাকিয়া দিতেছি' বলিয়া উঠিল—

পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল

অক্ষয়। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার, কোনো প্রভেদ নেই। এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন।

চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া
পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন

অক্ষয়। আমার কোনো মফস্বলের ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমার-সভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেছেন।

চন্দ্রবাবু। (বিস্মিত হইয়া) বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিত থাকুন—বিবাহ সে কোনোক্রমেই করবে না, আমি তার জামিন রইলুম। তার দূর সম্পর্কের এক দাদা-সুদৃশ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মতো সুকুমার নন, কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশি কুমার, তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে—সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সৌভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

চন্দ্রবাবু। সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণ—

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই, সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যাবে না—সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ-সুদৃশই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই এক তলার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়; আপনাদের এই চিরকুমার-ক'টির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

চন্দ্র। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া) অক্ষয়বাবু, আপনি জানেন তো আমাদের আয়—

অক্ষয়। আয়ের কথাটা আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিন্তাপ্রফুল্লকর নয়। ভালো ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে, সেজন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চলুন-না, আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

বিমর্ষ বিপিন-শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের
মধ্য দিয়া বার বার আঙুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া
তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল

পূর্ণ। সভার স্থান-পরিবর্তনটা কিছ্ নয়।

অক্ষয়। কেন, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি করলেই কি আপনাদের চিরকৌমাৰ্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে।

পূর্ণ। এ ঘরটি তো আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ঘর শহরে দুষ্প্রাপ্য হবে না।

পূর্ণ। আমার তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে থানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।

শ্রীশ। সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।

বিপিন। একটা কাজে প্রবৃত্ত হলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মৃঢ়তা।

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোনো, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমাৰ্য-ব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়ে না। আলোক এবং বাতাস স্বীজাতীয় নয়, অতএব সভার মধ্যে ও দূটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে না। আরো বিবেচনা করে দেখো, এ স্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত নয়। বাতকের চর্চা করছ করো, কিন্তু বাতের চর্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কী বল শ্রীশবাবু। বিপিনবাবুর কী মত।

শ্রীশ ও বিপিন। ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক-না।

পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নিরন্তর রহিল। পাশের ঘরেও চাঁবি একবার ঠুন্ করিল
কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এখনই আসুন-না দেখিয়ে আনি।

চন্দ্রবাবু। চলুন।

[চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়ের প্রস্থান]

বিপিন। দেখো পূর্ণবাবু, সত্যি কথা বলছি তোমাকে, চিরকুমার-সভার ফ্রন্টিয়ার পলিসিতে আমরা পর্দা জিনিসটার অনুমোদন করি নে। ঐখান থেকেই শত্রুপ্রবেশের পথ।

পূর্ণ। মানে কী হল।

বিপিন। পর্দার মতো উড়ুক্ষু জিনিস, অল্প একটু হাওয়াতে চঞ্চল হয়ে ওঠে, কুমার-সভার সে যোগ্য নয়।

শ্রীশ। এখানকার সীমানা-রক্ষার জন্য পাকা ইন্টের দেওয়ালের মতো অচল পদার্থ চাই। ঐ পর্দাটা ভালো ঠেকছে না।

পূর্ণ। তোমাদের কথাগুলো কিছ্ রহস্যময় শোনাচ্ছে।

বিপিন। সে কথা ঠিক। রহস্য পদার্থটাই সর্বনেশে। চিরকুমারদের সকলের চেয়ে যে বড়ো শত্রু, পর্দা-বেণ্টনীর মধ্যেই তার বাস।

শ্রীশ। আমাদের ব্রত হচ্ছে পর্দাটাকে আক্রমণ করা, তাকে ছিন্ন করে ফেলা। পর্দার ছায়ায় ছায়ায় ফেরে যে মায়ামগ্নী আলো ফেললেই মরীচিকার মতো সে মিলিয়ে যাবে।

পূর্ণ। শ্রীশবাবু, মরীচিকা মেলাতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণা তো মেলায় না।

শ্রীশ। কেন মেলাবে। ওটা থাকা চাই। তৃষ্ণা না থাকলে আমাদের ছোটাবে কিসে। কেবল জানা দরকার কোন পথে ছুটলে ফল পাওয়া যাবে।

নেপথ্যে গান

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।

বিপিন। একটু আস্তে। গান শুনতে পাচ্ছ না? খাসা গান বটে।

পূর্ণ। ঐ গানটাও কি পর্দা নয়। ওর আড়ালে যে রহস্য গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, পথে বিপথে ছোটাবার ক্ষমতা তারও আছে।

বিপিন। থাক্ ভাই। তত্বকথাটা এখন থাক্। একটু শুনতে দাও। খুব কাছেই বাড়ি থেকেই গানটা আসছে, শুনোই অক্ষয়বাবুর বাসা ঐখানেই।

শ্রীশ। গানের কথাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

নেপথ্যে গান

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।

আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে।

ও পারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে,

এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে।

এইবেলা বেলা আছে, আয়, কে যাবি।

মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।

সূর্য পাটে যাবে নেমে, সন্ধ্যাস যাবে থেমে,

খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে।

শ্রীশ। গানটা বোধ হচ্ছে যেন কুমার-সভাকেই ভয় দেখাবার গান। খেয়া বন্ধ হয়ে গেলেই তো মূর্শকিল।

বিপিন। ঐ শুনলে না, বললে—‘এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে’।

পূর্ণ। তা হলে আর দেরি কেন। পারে যাবার জোগাড় করো।

শ্রীশ। গানটা শুনে বোধ হচ্ছে পারে নিয়ে যাবে না, অতলে তলিয়ে দেবে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীশের বাসা

শ্রীশ তাহার বাসায় দক্ষিণের বারান্দায় একখানা বড়ো হাতাওয়ালা কেদারার দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শূক্ৰসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে টিপায়ের উপর রেকাবিতে একটি গ্লাসে বরফ-দেওয়া লেমনেড ও স্তূপাকার কুন্দফুলের মালা

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। কী গো সন্ন্যাসীঠাকুর।

শ্রীশ। (উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) এখনো বুঝি ঝগড়া ভুলতে পার নি? আচ্ছা ভাই শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সন্ন্যাসী হতে পারি নে।

বিপিন। কেন পারবে না। কিন্তু অনেকগুলি তল্লিপদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য এই যে, কেউ-বা আমার বেলফুলের মালা গাথে দেবে, কেউ-বা বাজার থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আনবে, এই তো? তাতে ক্ষতিটা কী। যে সন্ন্যাসধর্মে বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠান্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উঁচুদের সন্ন্যাস।

বিপিন। সাধারণ ভাষায় তো সন্ন্যাসধর্ম বলতে সেই রকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ঐ শোনো, তুমি কি মনে কর ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই। একজনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ, আর-একজনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থই হয়, তা হলে মন বলে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কী করতে।

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কী অর্থ করছেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এই রকম— গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুন্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত-আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না থাকলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি বৃদ্ধি কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ, একদল কার্তিককে ময়ূরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরোতে হবে।

শ্রীশ। ময়ূর না পাওয়া যায় ট্রাম আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমার-সভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন। তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটিমাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিনজোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্থ পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিনগুণ বেশি বলেই জানতেন। আমিও পালোয়ানিকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানি নে।

বিপিন। ওটা বুদ্ধি আমার উপর হল?

শ্রীশ। ঐ দেখো। মানুষকে অহংকারে কী রকম মাটি করে। তুমি ঠিক করে রেখেছ পালোয়ান বললেই তোমাকে বলা হল। তুমি কলিযুগের ভীমসেন। আচ্ছা, এসো, যুদ্ধং দেহি। একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক।

এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্য লীলাচ্ছলে হাত-কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল।

বিপিন হঠাৎ 'এইবার ভীমসেনের পতন' বলিয়া ধপ করিয়া শ্রীশের কেরাটা অধিকার করিয়া তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল এবং 'উঃ অসহ্য তৃষ্ণা' বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিল। তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি কুন্দফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া 'কিন্তু বিজয়মালাটি আমার' বলিয়া সেটা মাথায় জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া পড়িল।

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো, একদল শিক্ষিত লোক যদি এই রকম সংসার পরিত্যাগ করে পরিপাটি সজ্জায়, প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে, গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে বেড়ায়, তাতে উপকার হয় কি না।

বিপিন। আইডিয়াটা ভালো বটে।

শ্রীশ। অর্থাৎ, শুনতে সুন্দর, কিন্তু করতে অসাধ্য। আমি বলছি, অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে; তার ছাই ঝেড়ে, তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে, তার জটা মুড়িয়ে, তাকে সৌন্দর্য্যে এবং কর্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে-পড়ানো এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের রত অবলম্বন করে নি। বলো বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না।

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যেরকম চেহারা গলা এবং আসবাবের প্রয়োজন আমার তো তার কিছুই নেই। তবে তল্লিপদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি। কানে যদি সোনার কুন্ডল, অন্তত চোখে যদি সোনার চশমাটা পরে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হলে একটা প্রহরীর দরকার, সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চলতে পারবে।

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা!

বিপিন। না ভাই, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি, তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে তুলতে পার তা হলে খুব ভালোই হয়। তবে এরকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে তো ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্বীকৃতির কোনো সংশয় রাখব না।

বিপিন। মালাচন্দন অঙ্গদকুন্ডল সবই রাখতে চাও, কেবল ঐ একটা বিষয়ে এত বেশি দৃঢ়তা কেন।

শ্রীশ। ঐগুলো রাখছি বলেই দৃঢ়তা। যেজন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্থ্রীলোকের সঙ্গ

থেকে কঠিন শাসনে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম অনুরাগ এবং সৌন্দর্যের ধর্ম, সেজন্যেই তাঁর পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়টুকুও আছে!

শ্রীশ। আমার নিজের জন্যে লেশমাত্র নেই। আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনো-একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য, কিন্তু তোমরা যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক, তোমরা একবার পড়লে ব্যাটবল গুলিভাঙা সবসুদ্ধ ঘাড়-গোড় ভেঙে পড়বে।

বিপিন। আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও কথা ভালো নয়। সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না। সময় তো রথে চড়ে আসেন না, আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি; কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা বলছ তাকে বাহন-অভাবে ফিরতেই হবে।

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

উভয়ে। এসো পূর্ণবাবু।

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্নাটি তো মন্দ রচনা কর নি, মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভালো।

শ্রীশ। ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব হতেই আমার আছে। কিন্তু দেখো পূর্ণবাবু, ঐ দেশলাই করা-টরা ওগুলো আমার ভালো আসে না।

পূর্ণ। (ফুলের মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে নাকি।

শ্রীশ। সেই কথাই তো হচ্ছিল। সন্ন্যাসধর্ম তুমি কাকে বল শুন।

পূর্ণ। যে ধর্মে দীর্জ ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করতে হয়, পিয়াস সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃকপাত করতে হয় না—

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম তো বড়ো হয়ে মরে গেছে। এখন নবীন সন্ন্যাসী বলে একটা সম্প্রদায় গড়তে হবে—

পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন, কিন্তু তিনি তো চিরকুমার-সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চলতেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পারতেন। সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হতে হবে—

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে। এই তো? বিনি সুতার মালা গাঁথতে হবে, কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে!

শ্রীশ। স্বদেশের। কথাটা কিছ্ উচ্চ শ্রেণীর হয়ে পড়ল, কী করব বলো, মালিনী মাসি এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ—কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণবাবু—

পূর্ণ। ঠাট্টার মতো মোটেই শোনাচ্ছে না—ভয়ানক কড়া কথা, একেবারে খটখটে শুনকো।

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার-সভা থেকে এমন-একটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি শিক্ষা ও কর্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অম্বিতীয় হবে, আবার লাঠি তলোয়ার-খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদর্শী হবে—

পূর্ণ। অর্থাৎ, মনোহরণ এবং প্রাণহরণ দুই কর্মেই মজবুত হবে। পুরুষ দেবীচৌধুরানীর দল আর-কি!

শ্রীশ। বঙ্কিমবাবু আমার আইডিয়াটা পূর্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন, কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতিমশায় কী বলেন।

শ্রীশ। তাঁকে কদিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু, তিনি তাঁর দেশলাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে, এক টাকা করে শেরার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড়ো বড়ো পল্লীতে নতুন নিয়মে এক-একটা দোকান বসিয়ে আসবে—ভারতবর্ষের চারি দিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিনবাবুর কী মত।

বিপিন। যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ বলে জ্ঞান করি নে, কিন্তু দল যদি গড়ে ওঠে তো আমিও সন্ন্যাসী সাজতে রাজি আছি।

পূর্ণ। কিন্তু সাজতে খরচ আছে মশায়। কেবল কৌপীন নয় তো, অঙ্গদ কুণ্ডল আভরণ কুন্তলীন দেলখোশ—

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, চিরকুমার-সভা সন্ন্যাসী-সভা হবেই। আমরা এক দিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্য দিকে মনুষ্যত্বের কোনো উপকরণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব না। আমরা কঠিন শৌর্য এবং ললিত সৌন্দর্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব, সেই দূরদৃষ্টি সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে—

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু—কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়। এবং তাঁকে উপেক্ষা করলে ললিত সৌন্দর্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে। তার কী উপায় করলে।

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ, নরজাতিকে তিনি লতার মতো বেঁটন করে ধরেন। যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাকত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করতে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দূর করতে চাই—পাণিগ্রহণ করে ফেললে নিজের পাণিকেও বন্ধ করে ফেলতে হবে, সে হলে চলবে না পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই, আমি আমার শূভবিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসি নি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি, মনুষ্যজন্ম আর পাব কি না সন্দেহ, অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর কিছুর জুটবে কি। মুসলমানের স্বর্গে হুঁরি আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অংসরার অভাব নেই, চিরকুমার-সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমহাশয়দের চেয়ে মনোরম আর-কিছুর পাওয়া যাবে কি।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, বল কী। তুমি বে—

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনো মরিয়া হয়ে উঠি নি। তোমার এই ছাদ-ভরা জ্যোৎস্না আর ঐ ফুলের গন্ধ কি কৌমার্যব্রত-রক্ষার সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছ্বাসিত করে দেওয়াই ভালো বোধ করি; চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্‌দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে। যাই হোক, যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির কর তো আমিও যোগ দেব—কিন্তু আপাতত সভাটাকে তো রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন। কী হয়েছে।

পূর্ণ। অক্ষয়বাবু আমাদের সভাকে বে স্থানান্তর করবার ব্যবস্থা করছেন, এটা আমার ভালো ঠেকছে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিসটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নষ্ট হবে, এ-সব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিই নে। ভালোই হবে, যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে, চিরকুমার-সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি—অক্ষয়বাবু সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার কী অনিষ্ট করতে পারেন। কেবল গলির এক নম্বর থেকে আর-এক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে-পথে দেশে-দেশে সঞ্চার করে বেড়াতে হবে। সন্দেহ শঙ্কা উদ্বেগ এগুলো মন থেকে দূর করে দাও পূর্ণবাবু—বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড়ো কাজ হয় না।

বিপিন। দিনকতক দেখাই থাক-না। যদি কোনো অসুবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে—আমাদের সেই অন্ধকার বিবরণটি ফস্ করে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

অকস্মাৎ চন্দ্রমাববাবুদের সবেগে প্রবেশ। তিনজনের সম্মুখে উত্থান

চন্দ্রবাবু। দেখো, আমি সেই কথাটা ভাবছিলাম—

শ্রীশ। বসুন।

চন্দ্রবাবু। না না, বসব না, আমি এখনই যাচ্ছি। আমি বলছিলাম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটলে, কিংবা সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কিরকন চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে—ডাক্তার রামরতনবাবু ফি-রবিবারে আমাদের দু'ঘণ্টা করে বস্তুতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্রবাবু। বিলম্ব তো হবেই, কাজটি তো সহজ নয়। কেবল তাই নয়—আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসুন—

চন্দ্রবাবু। না শ্রীশবাবু, বসতে পারছি নে, আমার একটু কাজ আছে। আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে—গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাৱশ্যক জিনিসগুলিকে একটু-আধটু সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সস্তা বা মজবুত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবার গ্রীষ্মের অবকাশে কৈদারবাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—

চৌকি অগ্রসর-করণ

চন্দ্রবাবু। না না, আমি এখনই যাচ্ছি। দেখো, আমার মত এই যে, এই-সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য সামান্য জিনিসগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যেরকম আন্দোলন হবে বড়ো বড়ো সংস্কারকার্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকালের ঢেঁকি-ঘানির কিছু পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে—

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসবেন না কি।

চন্দ্রবাবু। থাক-না। একবার ভেবে দেখো, আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আসছি, উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড়ো বড়ো কল-কারখানা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম, না তার সম্বন্ধে চিন্তা করলাম। যা ছিল তা তেমনই রয়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিসপত্র পিছিয়ে থাকছে, এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি—ইংরেজ আমাদের কাঁধে করে বহন করছে, তাকে এগোনো বলে না। ছোটোখাটো সামান্য গ্রাম্য জীবনযাত্রা পল্লীগামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বন্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে। আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে—কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক্। কটা বাজল শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। সাড়ে-আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্রবাবু। তা হলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য-সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং—

পূর্ণ। আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু, তা হলে আমার দুই-একটা কথা বলবার আছে—

চন্দ্রবাবু। না, আজ আর সময় নেই—

পূর্ণ। বেশি কিছু নয়, আমি বলছিলাম আমাদের সভা—

চন্দ্রবাবু। সে কথা কাল হবে পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। কিন্তু কালই তো সভা বসছে—

চন্দ্রবাবু। আচ্ছা, তা হলে পরশু। আমার সময় নেই—

পূর্ণ। দেখুন, অক্ষয়বাবু যে—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, আমাকে মাপ করতে হবে, আজ দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু দেখো, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার-সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তা হলে আমাদের সকল সভাই কিছু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না, অতএব ওর মধ্যে দু'টি বিভাগ রাখা দরকার হবে—

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্রবাবু। তা সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাবু সেদিন একটা কথা যা বললেন সেও আমার মন্দ লাগল না। তিনি বলেন, চিরকুমার-সভার সংস্রবে আর-একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ-সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোকদেরও তো দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। সকলেরই সাধ্যমত কোনো-না-কোনো হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে—এইটে হচ্ছে সাধারণ রত। আমাদের একদল কুমাররত ধারণ করে দেশে-দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমাররত ধারণ করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর-একদল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য-অনুসারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যারা পর্যটক-সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ-প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে; তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন করে সংগ্রহ করবেন—তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে, হন্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না—

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, যদি বসেন তা হলে একটা কথা—

চন্দ্রবাবু। না, আমি বলছিলাম, যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রুতি এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে; শিলালিপি তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান করতে হবে—অতএব প্রাচীনলিপি-পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যিক।

পূর্ণ। সে-সব তো পরের কথা, আপাতত—

চন্দ্রবাবু। না না, আমি বলছি নে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোনো কালে শেষ হবে না। অভিরুচি-অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউ-বা একটা কেউ-বা দুটো-তিনটে শিক্ষা করব—

শ্রীশ। কিন্তু, তা হলেও—

চন্দ্রবাবু। ধরো, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরোতে পারব। যারা চিরজীবনের রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে; যারা টিকে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্ছে—

চন্দ্রবাবু। না পূর্ণবাবু, আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। পূর্ণবাবু, আমার কথাগুলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আপাতত মনে হতে পারে অসাধ্য, কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য বটে—তা, ভালো কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু, আপনি যে বলছিলেন গোরুর গাড়ির চাকার প্রভৃতি ছোটো ছোটো জিনিস—

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোটো মনে করে উপেক্ষা করি নে এবং বড়ো কাজকেও অসাধ্য জ্ঞান করে ভয় করি নে—

পূর্ণ। কিন্তু, সভার অধিবেশন সম্বন্ধে—

চন্দ্রবাবু। সে-সব কথা কাল হবে পূর্ণবাবু। আজ তবে চললুম।

[প্রস্থান]

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে। এক মাতালের মাতলামি দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকাবকি করে। কখনো-বা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাবু, হঠাৎ পালাচ্ছ যে?

পূর্ণ। সভাপতিমশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্ছি, পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো-একটা কথায় কণ্ঠপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উল্টো হবে। তাঁর যে-ক'টা কথা বাকি আছে সেইগুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভুলেই যাবেন।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। ভালো আছেন শ্রীশবাবু? বিপিনবাবু, ভালো তো? এই যে পূর্ণবাবুও আছেন দেখছি। তা, বেশ হয়েছে। আমি অনেক ব'লে-ক'য়ে সেই কুমারটুলির পাত্রী দুটিকে ঠেকিয়ে রেখেছি।

শ্রীশ। কিন্তু আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। আমরা একটা গুরুতর কিছু করে ফেলব।

পূর্ণ। আপনারা বসুন শ্রীশবাবু। আমার একটা কাজ আছে।

বিপিন। তার চেয়ে আপনি বসুন পূর্ণবাবু। আপনার কাজটা আমরা দুজনে মিলে সেরে দিয়ে আসছি।

পূর্ণ। তার চেয়ে তিনজনে মিলে সারাই তো ভালো।

বনমালী। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন দেখছি। আচ্ছা, তা আর-এক সময় আসব।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি

চন্দ্রমাধববাবু, নির্মলা

চন্দ্রবাবু। নির্মলা।

নির্মলা। কী মামা।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্ছি নে।

নির্মলা। বোধ হয় ঐখানেই কোথাও আছে।

চন্দ্রবাবু। (নিশ্চিন্তভাবে) একবার খুঁজে দেখো তো ফেনি।

নির্মলা। তুমি কোথায় কী ফেল আমি কি খুঁজে বের করতে পারি!

চন্দ্রবাবু। (মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হওয়ায়, স্নিগ্ধকণ্ঠে) তুমিই তো পার নির্মল। আমার সমস্ত ঘুঁটি সম্বন্ধে এত ধৈর্য আর কার আছে?

নির্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল—

নিঃশব্দে সংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাকে নিরন্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু নির্মলার কাছে

আসিলেন। নির্মলার মূখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন

(মৃদুহাসে) নির্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখছি যেন। কী হয়েছে বলো দেখি।

নির্মলা। (ক্ষুধস্বরে) এতদিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার-সভা থেকে বিদায় দিচ্ছ কেন। আমি কী করেছি।

চন্দ্রবাবু। (আশ্চর্য হইয়া) চিরকুমার-সভা থেকে তোমাকে বিদায়! তোমার সঙ্গে সে সভার যোগ কী।

নির্মলা। দরজার আড়ালে থাকলে বুঝি যোগ থাকে না? অন্তত সেই যতটুকু যোগ তাই বা কেন যাবে।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, তুমি তো এ সভার কাজ করবে না, যারা কাজ করবে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই—

নির্মলা। আমি কেন কাজ করব না। তোমার ভাগ্নে না হয়ে ভাগ্নী হয়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্যে যোগ দিতে পারব না। তবে আমাকে এতদিন শিক্ষা দিলে কেন। নিজের হাতে আমার সমস্ত মন প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কী বলে।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, এক সময়ে তো বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে, চিরকুমার-সভার কাজ—

নির্মলা। বিবাহ আমি করব না।

চন্দ্রবাবু। তবে কী করবে বলো।

নির্মলা। দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।

চন্দ্রবাবু। আমরা তো সন্ন্যাসরত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি।

নির্মলা। ভারতবর্ষে কি কেউ কখনো সন্ন্যাসিনী হয় নি।

চন্দ্রমাধববাবু নিরন্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের ব্রত-গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্য-ভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না। আমি তোমাদের কৌমার্য-সভার কেন সভা না হব।

চন্দ্রবাবু। (স্বধাকুণ্ঠিতভাবে) অন্য যারা সভ্য আছেন—

নির্মলা। যারা সভ্য আছেন, যারা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যারা সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন, তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসংকোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না। তা যদি হয় তা হলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে বদ্ধ থাকুন, তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

চন্দ্রমাধববাবু চুলগুলোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল ঢালাইয়া অত্যন্ত উষ্ণাধুষ্ণা করিয়া তুলিলেন।

এমন সময় হঠাৎ তাহার আশ্রিতনের ভিতর হইতে হারানো বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল।

নির্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধববাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া

দিল—চন্দ্রমাধববাবু তাহার কোনো খবর লইলেন না—চুলের মধ্যে

অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ককুলায়ের চিন্তাগুলিকে

বিস্তৃত করিতে লাগিলেন।

[নির্মলার প্রস্থান]

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, সে কথাটা কি ভেবে দেখলেন। আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভালো হচ্ছে না।

চন্দ্রবাবু। আজ আর-একটি কথা উঠেছে, সেটা পূর্ণবাবু তোমার সঙ্গে ভালো করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জান?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী!

চন্দ্রবাবু। হাঁ, তাঁর নাম নির্মলা। আমাদের চিরকুমার-সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে।

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কী।

চন্দ্রবাবু। আমার বিশ্বাস, তার অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

পূর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শুনলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে। স্ত্রীলোক হয়ে তিনি—

চন্দ্রবাবু। আমিও সেই কথা ভাবছি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে—আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করছি।

পূর্ণ। (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমারও কি ঐ মত।

পূর্ণ। কী মত বলছেন?

চন্দ্রবাবু। অর্থাৎ, যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন।

পূর্ণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর, তাঁদের উৎসাহে আমাদের উদ্দীপনা। পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মতো মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। তা তো পারে পূর্ণবাবু, কিন্তু, সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্ছে।

চন্দ্রবাবু। না না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে।

শ্রীশ। গলায় তো একটা বোতাম লাগানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, আরো কি প্রয়োজন আছে। যদি-বা থাকে। আর ছিদ্র পাবেন কোথা।

চন্দ্রবাবু। (গলায় হাত দিয়া) তাই তো!—আমরা সকলেই তো উপস্থিত আছি, এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভালো, কী বল পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। সে বেশ কথা, কিন্তু এ দিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

চন্দ্রবাবু। না, এখনো সময় আছে। শ্রীশবাবু, তোমরা একটু বোসো-না, কথাটা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য। আমার একাটি ভাঙ্গনী আছেন, তাঁর নাম নির্মলা—

পূর্ণ হঠাৎ কাশিয়া লাল হইয়া উঠিল

আমাদের কুমার-সভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত মনের মিল।

শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুকভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল

এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাঁর উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে কিছুমাত্র সাড়া না পাইয়া

চন্দ্রবাবুও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন

এ কথা আমি ভালোরূপ বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি, স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্যের মহৎ অবলম্বন। কী বল পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। (নিস্তেজভাবে) তা তো বটেই।

চন্দ্রবাবু। (হঠাৎ সবেগে) নির্মলা যদি কুমার-সভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে, তা হলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন।

পূর্ণ। বলেন কী চন্দ্রবাবু।

শ্রীশ। আমরা কখনো কল্পনা করি নি যে, কোনো স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিয়ম নেই—

বিপিন। নিষেধও নেই।

শ্রীশ। স্পষ্ট নিষেধ না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সভার যে-সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয়।

বিপিন। আমাদের সভার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ নয়, এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যেরকম পারবেন তুমি সেরকম পারবে না, এবং তুমি যেরকম পারবে একজন স্ত্রীলোক সেরকম পারবেন না—অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও যেমন দরকার স্ত্রীসভারও তেমন দরকার।

শ্রীশ। যারা কাজ করতে চায় না তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করতে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশ্চিত আছ আমি তত বৃহৎ মনে করি নে।

বিপিন। আমাদের সভার কার্যক্ষেত্র অন্তত এতটা বৃহৎ যে তোমাকে গ্রহণ করেছে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। তোমার আমার উভয়েরই যদি এখানে স্থান হয়ে থাকে, আমাদের দুজনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যিকতা থাকে, তা হলে আরো-একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কী কঠিন।

শ্রীশ। উদারতা অতি উত্তম জিনিস, সে আমি নীতিশাস্ত্রে পড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট করতে চাই নে, বিভ্রান্ত করতে চাই মাত্র। স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করতে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না, এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্। নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মরুক, উদরটা পরিপাক করতে থাক্—পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশচেষ্টা না করলেই বস্।

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিন্ন করে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর-এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না।

শ্রীশ। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) উপমা তো আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হল। উপমা কেবল খানিক দূর পর্যন্ত খাটে—

বিপিন। অর্থাৎ, যতটুকু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

পূর্ণ। (অত্যন্ত বিম্বিত হইয়া) বিপিনবাবু, আমার মত এই যে, আমাদের এই-সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মাধুর্য নষ্ট হয়।

চন্দ্রবাবু। (একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া) মহৎ কার্যে যে মাধুর্য নষ্ট হয় সে মাধুর্য সম্বন্ধে রক্ষা করবার যোগ্য নয়।

শ্রীশ। না চন্দ্রবাবু, আমি ও-সব সৌন্দর্য-মাধুর্যের কথা আনিছিই নে। সৈন্যদের মতো এক চালে আমাদের চলতে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দুর্বলতাবশত যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে।

এমন সময় নির্মালা অকুণ্ঠিত মর্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অগ্রপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র

নির্মলা। আপনাদের কী উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাজে কত দূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানি নে, কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি—তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছেন।

শ্রীশ নিরন্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত-অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত-গম্ভীর, চন্দ্রবাবু সুগভীর চিন্তামগ্ন

নির্মলা। (পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি অগ্রদুর্জলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া) আমি যদি কাজ করতে

চাই, যিনি আমার আশৈশবের গুরু, মৃত্যু পর্যন্ত যদি সকল শব্দচেষ্টায় তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন। আপনারা আমাকে কী জানেন।

শ্রীশ স্তম্ভ। পূর্ণ ঘর্মান্ত

নির্মলা। আমি আপনাদের কুমার-সভা বা অন্য কোনো সভা জানি নে, কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি তিনি যখন কুমার-সভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমার-সভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্রাবাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই তা হলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এঁরা আমাকে কী জানেন। এঁরা কেন আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে তর্ক করছেন।

শ্রীশ। (বিনীত মৃদুস্বরে) মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোনো তর্ক করি নি, আমি সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই বলছিলাম।

নির্মলা। আমি স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার করতে চাই নে—আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশি আমার আর-কিছু জানবার দরকার নেই।

চন্দ্রাবদু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা-কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল,
কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না

পূর্ণ। (মনে মনে অনেক আবৃত্তি করিয়া) দেবী, এই পৃথিবী পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন।

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না, পূর্ণ বলিয়াই বদ্বিধিতে পারিল কথাটা
গদ্যের মধ্যে পদ্যের মতো কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল—
লজ্জায় তাহার কান লাল হইয়া উঠিল

বিপিন। (স্বাভাবিক সুগম্ভীর শান্ত স্বরে) পৃথিবী যত বেশি পৃথিবী পৃথিবীর সংশোধন-কার্য তত বেশি পবিত্র।

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভা লওয়া সম্বন্ধে নিয়মমত প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্মলা এক মূহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল

চন্দ্র। (হঠাৎ) ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা ?

নির্মলা। (সলজ্জ হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে) গলাতেই আছে।

চন্দ্র। (গলায় হাত দিয়া) হাঁ হাঁ, আছে বটে।

তিন ছাত্তের দিকে চাহিয়া হাসিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

নৃপবালা ও নীরবালা

নৃপবালা। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গম্ভীর হচ্ছিস বল্ তো নীরদ।

নীরবালা। আমাদের বাড়ির যত কিছু গম্ভীর্য সব বুঝি তোর একলার? আমার খুশি আমি গম্ভীর হব।

নৃপবালা। তুই কী ভাবছিস আমি বেশ জানি।

নীরবালা। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কী ভাই। এখন তোর নিজের ভাবনা ভাববার সময় হয়েছে।

নৃপবালা। (নীরব গলা জড়াইয়া) তুই ভাবছিস, মাগো মা, আমরা কী জঞ্জাল—আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা এত ঝঞ্জাট।

নীরবালা। তা, আমরা তো ভাই, ফেলে দেবার জিনিস নয় যে অমনি ছেড়ে দিলেই হল। আমাদের জন্যে যে এতটা হাঙ্গামা হচ্ছে সে তো গৌরবের কথা। কুমারসম্ভবে তো পড়েছিস গৌরীর বিয়ের জন্যে একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যদি কোনো কবির কানে ওঠে তা হলে আমাদের বিবাহের একটা বর্ণনা বোরিয়ে যাবে।

নৃপবালা। না ভাই, আমার ভারি লজ্জা করছে।

নীরবালা। আর, আমার বুঝি লজ্জা করছে না? আমি বুঝি বেহায়া? কিন্তু কী করবি বল্। ইন্সকুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা করেছিল, আবার তার পর বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলুম। লজ্জাও করে, প্রাইজও ছাড়ি নে, আমার এই স্বভাব।

নৃপবালা। আচ্ছা নীরদ, এবারে যে প্রাইজটার কথা চলছে সেটার জন্যে তুই কি খুব ব্যস্ত হয়েছিস।

নীরবালা। কোন্টা বল্ দেখি। চিরকুমার-সভার দুটো সভ্য।

নৃপবালা। যেই হোক-না কেন, তুই তো বুঝতে পারছিস।

নীরবালা। তা ভাই, সত্যি কথা বলব? (নৃপব গলা জড়াইয়া কানে কানে) শুনছি কুমার-সভার দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দুজনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হলেও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। তাই তো সেই যুগল দেবতার জন্যে এত পূজোর আয়োজন করছি ভাই। জোড়হস্তে মনে মনে বলছি, হে কুমার-সভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি বোনকে এক বোঁটার দুই ফুলের মতো তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ করো।

বিরহসম্ভাবনার উল্লেখমাতে দুই ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল

এবং নৃপ কোনোমতে চোখের জল সামলাইতে পারিল না

নৃপবালা। আচ্ছা নীরদ, মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্ দেখি। আমরা দুজনে গেলে ঠুর আর কে থাকবে।

নীরবালা। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাকতে যদি দেন তা হলে কি ছেড়ে যাই। ভাই, ঠুর তো স্বামী নেই, আমাদেরও নাহয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশি সুখে আমাদের দরকার কী।

পদ্রুপবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ

নীরবালা। (টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া শৈলবালার গলায় পরাইয়া) আমরা দুই স্বয়ংবরা তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করলুম।

শৈলবালাকে প্রণাম করিল

শৈলবালা। ও আবার কী।

নীরবালা। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতিনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি সেজদিদি আমায় সঙ্গে পারবে না—আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। না, সত্যি বলছি মেজদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি আর কোথাও পাব। কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস।

নৃপর দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরু ঝরু করিয়া জল পড়িতে লাগিল

শৈলবালা। (তাহার চোখ মুছিয়া দিয়া) ও কী ও নৃপ, ছি। তোদের কিসে সুখ তা কি তোরা জানিস। আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর-কারো হাতে তোদের দিতে পারতুম।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। ভাই, আমার মতো অসভ্যটাকে তোরা সভা করলি—আজ তো সভা এখানে বসবে, কিরকম করে চলব শিখিয়ে দে।

নীরবালা। ফের পুরোনো ঠাট্টা? তোমার ঐ সভ্য-অসভ্যের কথাটা এই পরশু থেকে বলছ।

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না? ঠাট্টা একবার মুখ থেকে বের হলেই কি রাজপুত্রের কন্যার মতো তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। হয়েছে কী, যতদিন চিরকুমার-সভা টিকে থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দু বেলা শুনতে হবে।

নীরবালা। তবে ওটাকে তো একটু সকাল-সকাল সেরে ফেলতে হচ্ছে। মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়—রসিকদাদার রসিকতাকে পুরোনো হতে দেব না, চিরকুমার-সভার চিরস্থ আমরা অঁচরে ঘুঁচিয়ে দেব। তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে। কিরকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছুর প্ল্যান ঠাউরেছিস?

শৈলবালা। কিছুরই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যেরকম মাথায় আসে।

নীরবালা। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব। ‘আমি কি ডরাই সখী কুমার-সভারে। নাই কি বল এ ভুজমংগালে।’

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। অদ্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

শৈলবালা। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বলো দেখি যে দুটি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ডাল কাটতে চেয়েছিলেন কে।

নৃপবালা। আমি জানি মৃধুজ্জেশমশায়, কালিদাস।

অক্ষয়। না, আরো একজন বড়োলোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৃধোপাধ্যায়।

নীরবালা। ডাল দুটি কে।

অক্ষয়। (বামে নীরকে টানিয়া) এই একটি (দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া) এই আর-একটি।

নীরবালা। আর, কুড়ুল বৃদ্ধি আজ আসছে?

অক্ষয়। আসছে কেন, এসেছে বললেও অত্যাশ্চর্য হয় না। ঐ-যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দৌড় দৌড়। শৈল পালাইবার সময় রসিকদাদাকে টানিয়া লইয়া গেল।

চুড়ি-বালায় ঝংকার এবং দ্রুত পদপল্লবকরেকটির দ্রুতপতনশব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই
শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

অক্ষয়। পূর্ণবাবু এসেন না যে?

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে আজ আর আসতে পারলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন, আমি চন্দ্রবাবুর অপেক্ষায় স্নায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধ মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই। কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমার-সভার অধিবেশন কোনোমতেই প্রার্থনীয় নয়।

[অক্ষয়ের প্রস্থান]

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। ঘরে দুটি দীপ জ্বলিতেছে। সেই দুটিকে বেষ্টন করিয়া ফিরোজ রঙের রেশমের অবগুণ্ঠন। সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি মৃদু এবং রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো

বিপিন। (স্বয়ং হাসিয়া) যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার-সভার উপযুক্ত নয়।

শ্রীশ। (চকিত হইয়া) কেন নয়।

বিপিন। ঘরের সজ্জাগুণি তোমার নবীন সম্মানসীদের পক্ষেও যেন বেশি বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। আমার সম্মানসধর্মের পক্ষে বেশি কিছু হতে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া।

শ্রীশ। হাঁ, ঐ একটিমাত্র।

অন্য দিনের মতো কথাটার তেমন জোর পেরিছিল না

বিপিন। দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচ রকমে এ ঘরটিতে সেই নারীজাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় তো সর্বত্রই আছে।

বিপিন। তা তো বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তা হলে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোনোখানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষমানুষের নিষ্কৃতি পাবার জো নেই।

শ্রীশ। (হাসিয়া) কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্রবাবুর বাসায় সেই একতলার ঘরটিতে রমণীর কোনো সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

বিপিন। বেচারী চিরকুমার কণ্ঠের জন্যে একটা কোনো ফাঁক রাখে নি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ। এই দেখো-না।

কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল

বিপিন। (কাঁটা-দুটি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া) ওহে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

শ্রীশ। ফুলও আছে, কাঁটাও আছে।

বিপিন। সেইটেই তো বিপদ। কেবল কাঁটা থাকলে এড়িয়ে চলা যায়।

শ্রীশ অপর কোণের ছোটো বইয়ের শেল্ফ হইতে বইগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল—কতগুলি নভেল

কতগুলি ইংরাজি কাব্যসংগ্রহ। প্যালেস্ট্রার গীতিকাব্যের স্বর্ণভান্ডার তুলিয়া দেখিল

মার্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা—তখন গোড়ার পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল,

দেখিয়া একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল

বিপিন। নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষমানুষের নয়। কী বোধ কর।

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্যজাতীয় বলে ঠেকছে হে।

আর-একটা বই দেখাইল

বিপিন। নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমার-সভায়—

শ্রীশ। কুমার-সভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি
এত বড়ো বলবান তো আমাদের মধ্যে কাউকে দেখি নে।

বিপিন। পূর্ণ তো একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল, রক্ষা পায় কি না সন্দেহ।

শ্রীশ। কিরকম।

বিপিন। লক্ষ্য করে দেখ নি বুঝি?

শ্রীশ। না না, ও তোমার অনুমান।

বিপিন। হৃদয়টা তো অনুমানেরই জিনিস—না যায় দেখা, না যায় ধরা।

শ্রীশ। পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়?

বিপিন। না, এ-সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোনো লেকচার চলে না।

শ্রীশ। এ বাড়ির দরজায় ঢুকতেই রসিক চক্রবর্তী বলে যে বৃদ্ধ যুবকটির সঙ্গে দেখা হল
তাকে চিরকুমার-সভার দ্বারীর উপযুক্ত বলে বোধ হল না।

বিপিন। মনে হল শিবের তপোবন আগলাবার জন্য স্বয়ং পঞ্চশর নন্দীর ছদ্মবেশে এসেছেন,
লোকটাকে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রাবদু। আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণাবদুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে, আমি
তাকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ করলাম।

বিপিন। পূর্ণাবদুর যেরকম দুর্বল অবস্থা দেখাচ্ছি পূর্ব হতেই তাঁর বিশেষ সাবধান হওয়া
উচিত ছিল।

চন্দ্রাবদু। পূর্ণাবদুকে তো বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না।

অক্ষয় ও রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। মাপ করবেন। এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি
চলে যাচ্ছি।

রসিক। (হাসিয়া) আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়—

অক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন—ক্রমশ পরিচয় পাবেন।
ইনিই হচ্ছেন সার্থকনামা শ্রীরসিক চক্রবর্তী।

রসিক। পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন
পিতৃসত্যপালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা করতে হয়, তার পরে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি
কোহহ দোষঃ'।

[অক্ষয়ের প্রস্থান]

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ

শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল। ক্ষণদৃষ্ট চন্দ্রমাধবাবদু আপসাভাবে তাহাকে দেখিলেন—

বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

শৈলের পশ্চাতে দুইজন ভৃত্য কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল।

শৈল ছোটো ছোটো রূপার থালাগদাল লইয়া সাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল

রসিক। ইনি আপনাদের সভার আর-একটি নবীন সভ্য। এ'র নবীনতা সম্বন্ধে কোনো তর্ক
নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বৃদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেছেন।

আপনারা কিছু বিস্মিত হয়েছেন দেখছি—হবার কথা। একে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম—ইনি বালক নন।

চন্দ্রবাবু। এর নাম?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ। অবলাকান্ত?

রসিক। নামটি আমাদের সভায় চলতি হবার মতো নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই—যদি পরিবর্তন করে বিক্রমসিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে ‘স্বনামা পদরূষো ধন্য’—কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ। বলেন কী মশায়। নাম তো আর গায়ের বস্ত্র নয় যে, বদল করলেই হল।

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশবাবু, নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন-না কেন, অর্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী ঠিক করে বলা শক্ত—পার্থ, ধনঞ্জয়, সবাসাটী, লোকের যখন যা মুখে আসত তাই বলেই ডাকত। দেখুন, নামটাকে আপনারা বেশি সত্য মনে করবেন না; ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত নাও বলেন, উনি লাইবেলের মকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ। (হাসিয়া) আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্ছেন তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম—কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না, নাম ভুল করব না মশায়।

রসিক। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন; সেইজন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক বলতে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি এ-সমস্ত কী আয়োজন করেছেন। আমাদের সভার কার্যাবলীর মধ্যে মিস্টার্সটা ছিল না।

রসিক। (উঠিয়া) সেই এটি যিনি সংশোধন করেছেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শৈল। (খালা সাজাইতে সাজাইতে) শ্রীশবাবু, আহা-টাও কি আপনাদের নিয়মবিবরণী।

শ্রীশ। (বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিয়া) এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।

বিপিন। নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্তবাবু, সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিসমাত্রই নিজের নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে; ক্ষমতালালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিস্টার্সগুলি সংগ্রহ করেছেন এ সম্বন্ধেও কোনো সভার নিয়ম খাটতে পারে না; এর একমাত্র নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা। ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। তোমার হল কী বিপিন। তোমাকে খেতে দেখছি বটে, কিন্তু এক নিশ্বাসে এত কথা কইতে শুনিনি নি তো।

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরস বাকা বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায়।

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।

নতুন ঘরের বিলাসসজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধববাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহম্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্যবিবরণের খাতা, ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠী অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন

শৈলবালা। (চন্দ্রবাবুর সম্মুখে গিয়া) সভার কার্যের যদি কিছু ব্যাঘাত করে থাকি তো মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, কিছু জলযোগ—

চন্দ্রবাবু। এ-সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নেই।

রসিক। আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখুন, মিন্টোম্বে যদি সভার কার্য রোধ হয় তা হলে—

বিপিন। (মৃদুস্বরে) তা হলে ভবিষ্যতে নাইয় সভাটা বন্ধ রেখে মিন্টোম্বেটা চালালেই হবে।

শ্রীশ। আসুন রসিকবাবু। আপনি উঠছেন না যে?

রসিক। রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার-সভার সভ্যরূপে আপনাদের সংসর্গগৌরবে কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু—

শৈলবালা। ‘কিন্তু’ আবার কী রসিকদাদা। তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছুর খাবে নাকি।

রসিক। দেখছেন মশায়! নিয়ম আর-কারো বেলায় নয়, কেবল রসিকদাদার বেলায়। নাঃ, ‘বলং বলং বাহুবলম্’। উপরোধ-অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়।

বিপিন। (চারটিমাত্র ভোজনপাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না?

শৈলবালা। না, আমি পরিবেশন করব।

শ্রীশ। সে কি হয়।

শৈলবালা। আমাকে পরিবেশন করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশি খুশি হব।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এটা কি ঠিক হচ্ছে।

রসিক। ভিন্নরুচিহঁ লোকঃ। উনি পরিবেশন করতে ভালোবাসেন, আমরা আহাৰ করতে ভালোবাসি, এরকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সন্নিবিধা আছে।

সকলের আহাৰ

শৈলবালা। চন্দ্রবাবু, ওটা মিষ্টি, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারি আছে। জলের গ্লাস খুঁজছেন? এই-বে গ্লাস।

চন্দ্রবাবুর পাতে আম ছিল, তিনি সেটাকে ভালোরূপে আয়ত্ত করিতে পারিতোছিলেন না—অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময় যেটি আবশ্যক আস্তে আস্তে হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাহার ভোজনব্যাপারটি নির্বিঘ্ন করিতে লাগিল।

চন্দ্রবাবু। শ্রীশবাবু, স্ত্রীসভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা করেছেন?

শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিন। সমাজকে অনেক সময় শিশুর মতো গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চললে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

শ্রীশ। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতির আয়োজন অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে-সকল কার্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিকবাবু কী বলেন।

রসিক। অবস্থাগতিক যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবু এটুকু জেনেছি—স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়। অতএব ঠুঁদের দলে টেনে অন্য সন্নিবিধা যদি-বা নাও হয় তবু বাধার হাত এড়ানো যায়। বিবেচনা করে দেখুন, চিরকুমার-সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তা হলে গোপনে এই সভাটিকে নষ্ট করবার জন্যে ঠুঁদের উৎসাহ থাকত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—

শৈলবালা। কুমার-সভার উপর স্ত্রীজাতির আক্রোশের খবর রসিকদাদা কোথায় পেলে।

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই। একচক্ষু হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিক থেকেই তো তীর খেয়েছিল। কুমার-সভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কানা হন তা হলে সেই দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদুস্বরে) একচক্ষু হরিণ তো আজ একটা তীর খেয়েছেন, একটা সভ্য ধূলিশায়ী।

চন্দ্রবাবু। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায় তারা এক-পায়ে চলতে চায়। সেইজন্যই খানিক দূর গিয়েই তাদের বসে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। সেইজন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি। দেখো অবলাকান্তবাবু, এখনো তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভালো করে মনে করে রেখো—স্ট্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ট্রীজাতিকে যদি আমরা নিচু করে রাখি তা হলে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন; তা হলে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়, দু'পা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি তা হলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব করতে লজ্জাবোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাম্বরে পরিণত হয়।

শৈলবালা। আশীর্বাদ করুন আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। আমার ভাগ্নী নির্মলাকে কুমার-সভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই?

রসিক। আর-কোনো আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমার-সভায় কেউ যদি কুমারীবেশে আসেন তা হলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈলবালা। বোপদেবের অভিশাপ এ কালে খাটে না।

রসিক। আচ্ছা, অন্তত লোহারামকে তো বাঁচিয়ে চলতে হবে। আমি তো বোধ করি, স্ট্রী-সভারা যদি পুরুষসভ্যদের অঙ্গ্রাসারে বেশ ও নাম পরিবর্তন করে আসেন তা হলে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তা হলে একটা কৌতুক এই হয় যে, কে স্ট্রী কে পুরুষ নিজেদের এই সন্দেহটা থেকে যায়—

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার নাতনি বলে কারো হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

শৈল অদূরবর্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল

চন্দ্রবাবু। দেখুন রসিকবাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। স্ট্রীসভ্য গ্রহণ করলে চিরকুমার-সভার অর্থের যদি পরিবর্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কী।

রসিক। কিছ্‌ না। আমি পরিবর্তনের বিরোধী নই—তা নাম-পরিবর্তন বা বেশ-পরিবর্তন যাই হোক-না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ট্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি হইল না

রসিক। আশা করি সভার কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

শ্রীশ। কিছ্‌ না—অন্যদিন কেবল মৃধেরই কাজ চলত, আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে।

বিপিন। তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছ্‌ বেশি হয়েছে। আজ তা হলে এইখানেই সভা ভঙ্গ করা হোক, কারণ এর পরে আর-কোনো আলোচনা চলবে না। এ ~~দিক~~ দোরিও হয়ে গেছে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয়, নীর ও নৃপ

নীরর গান

যেতে দাও গেল যারা।

তুমি যেয়ো না, যেয়ো না—

আমার বাদলের গান হয় নি সারা।

কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার,

নিভৃত রজনী অন্ধকার,

বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল—

অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।

অক্ষয়। হল কী বলো দেখি। আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড় বোহার ঝড়নের তাড়নে নির্মল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দু বেলা তোমাদের দুই বোনের অঞ্চল-বীজনে চঞ্চল হয়ে উঠছে যে।

নীরবালা। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ বলে দয়া করে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তার উপরে আবার জবাবদিহি?

অক্ষয়। দয়াময়ী চোর, শূন্য হৃদয়টা চুরি করবার জন্যে শূন্য ঘরে উর্পকবুর্পক? মতলব কি বুঝি নে।

গান

ওগো দয়াময়ী চোর! এত দয়া মনে তোর!

বড়ো দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর!

বড়ো দয়া করে চুরি করে লও শূন্য হৃদয় মোর!

নীরবালা। আমাদের এমন বোকা চোর পাও নি। এখন হৃদয় আছে কোথায় যে চুরি করতে আসব!

অক্ষয়। ঠিক করে বলো দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কত দূরে।

নৃপবালা। আমি জানি মৃগজ্যোতিষশাস্ত্র। বলব? ৪৭৫ মাইল।

নীরবালা। সেজদিদি অবাক করলি। তুই কি মৃগজ্যোতিষশাস্ত্রের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছুটোছুটি নাকি।

নৃপবালা। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইমটেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়।

গান

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া,

বেগে বহে শিরা ধমনী।

হায় হায় হায় ধরিবারে তায়

পিছে পিছে ধায় রমণী।

বাস্তবগতরে উড়ে অঞ্চল,
লটপট বেগী দুলে চঞ্চল—
এ কী রে রঙ্গ, আকুল-অঙ্গ
ছুটে কুরঙ্গগমনী।

নীরবালা। কবিবর, সাধু সাধু। কিন্তু, তোমার রচনায় কোনো কোনো আধুনিক কবির ছায়া দেখতে পাই যেন।

অক্ষয়। তার কারণ, আমিও অত্যন্ত আধুনিক। তোরা কি ভাবিস তাদের মৃদুহৃদয়শায় কৃত্তিবাস ওয়ার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুনে দিচ্ছিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল? তা হলে আর বিদুষী শ্যালী থেকে ফল হল কী। এতবড়ো আধুনিকটাকে তাদের প্রাচীন বলে ভ্রম হয়?

নীরবালা। মৃদুহৃদয়শায়, শিব যখন বিবাহসভায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর শ্যালীরাও ঐ রকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে তো অন্য রকম ঠেকেছিল। তোমার ভাবনা কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন।

অক্ষয়। মৃদু, শিবের যদি শ্যালী থাকত তা হলে কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ্য করবার জন্যে অনঙ্গ-দেবের দরকার হত। আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা?

নৃপবালা। আচ্ছা মৃদুহৃদয়শায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কী করছিলে।

অক্ষয়। তাদের গয়লাবাড়ির দূধের হিসেব লিখাচ্ছিলাম।

নীরবালা। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি ভুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লাবাড়ির হিসেব? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর-নবনীর অংশটাই বেশি।

অক্ষয়। (বাস্তবসমস্ত) না না, ওটা নিয়ে গোল করিস নে, আহা, দিয়ে যা—

নৃপবালা। নীরু ভাই, জ্বালাস নে, চিঠিখানা ঠুকে ফাঁরয়ে দে—ওখানে শ্যালীর উপদ্রব সহ না। কিন্তু মৃদুহৃদয়শায়, তুমি দিদিকে চিঠিতে কী বলে সম্বোধন কর বলো-না।

অক্ষয়। রোজ নতুন সম্বোধন করে থাকি—

নৃপবালা। আজ কী করেছ বলো দেখি।

অক্ষয়। শুনবে? তবে সখী, শোনো। চঞ্চলচকিতচিহ্নচকোরচৌর চঞ্চুচুন্নিবতচারুচন্দ্রিকরুচি-রুচির চিরচন্দ্রমা।

নীরবালা। চমৎকার চাটুচাভূষ।

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌষবৃন্ত নেই, চার্বতচর্ষণশূন্য।

নৃপবালা। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মৃদুহৃদয়শায়, রোজ রোজ তুমি এই রকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরি হয়?

অক্ষয়। ঐজন্যেই তো নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না। ভগবান যে আমাকে সদ্য সদ্য বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটাতে দিলে না। ভগ্নীপতির কথা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বলো দেখি।

নীরবালা। রাগ কোরো না, শান্ত হও মৃদুহৃদয়শায়, শান্ত হও। সেজদিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখো, আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পরসোও বিশ্বাস করি নে, এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না?

নৃপবালা। আচ্ছা মৃদুহৃদয়শায়, সত্যি করে বলো, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা করে গান করে-ছিলুম—

নৃপবালা। তার পরে?

অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উলটো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল—সেই অবধি স্তব রচনা ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপবালা। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লাবাড়ির হিসেব লিখছ? কী স্তব লিখেছিলে মৃদুজ্জ-মশায়, আমাদের শোনাও-না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবি।

নৃপবালা। না, আমরা দিদিকে বলে দেব না।

অক্ষয়। তবে অবধান করো।

গান

মনোমন্দির সুন্দরী।

স্থলদণ্ডলা

চলচণ্ডলা

অগ্নি মঞ্জুলা মঞ্জরী।

রোষারুণরাগরঞ্জিতা।

গোপন হাস্য-

কুটিল আস্য

কপটকলহরঞ্জিতা।

সংকোচনত-অগ্নিনী।

চকিতচপল

নবকুরঙ্গ

ষৌবনবনরঞ্জিনী।

অগ্নি ধল, ছলগদগ্ধিতা।

লব্ধ-পবন-

ক্ষুব্ধ লোভন

মল্লিকা অবলগ্ধিতা।

চুম্বনধনবর্জিনী।

রুদ্ধ-কোরক-

সংগত-মধু

কঠিনকনককঞ্জিনী।

কিন্তু আর নয়। এবারে মশায়রা বিদায় হোন।

নীরবালা। কেন, এত অপমান কেন। দিদির কাছে তাড়া খেয়ে আমাদের উপরে বৃষ্টি তার ঝাল ঝাড়তে হবে?

অক্ষয়। এরা দেখছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না। আরে দুর্বৃত্তে, এখনই লোক আসবে।

নৃপবালা। তার চেয়ে বলো-না দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে।

নীরবালা। তা, আমরা থাকলেমই বা, তুমি চিঠি লেখো-না, আমরা কি তোমার কলমের মৃদু থেকে কথা কেড়ে নেব নাকি।

অক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এইখানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্যন্ত আর পৌঁছয় না। না, ঠাট্টা নয়, পালাও। এখনই লোক আসবে—ঐ একটি বৈ দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

নৃপবালা। এই সম্ভেবেলায় কে তোমার কাছে আসবে।

অক্ষয়। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো, তারা নয়।

নীরবালা। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না, তুমি আজকাল সেটা বেশ বৃদ্ধিতে পারছ, কী বল মৃদুজ্জমশায়। দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়।—

গান

ও আমার ধ্যানেরই ধন,
তোমার হৃদয়ে সোনার বীজ
সেই হৃদয়ে রোদন।

আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,
কুঞ্জে পূর্ণিমা-চাঁদ হেসে আকুল—
তারা তোমায় খুঁজে না পায়,
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন।

অক্ষয়। সংগ্রহ হল কোথা থেকে।

নীরবালা। তোমারই শ্রীমুখ থেকে।

অক্ষয়। অবশেষে বিরহের দিনে আমারই শ্রীবক্ষে হানতে এসেছি। আচ্ছা, তা হলে দয়া করিস নে, একেবারে শেষ করে দে।

নীরবালা।

আঁখিরে ফাঁকি দাও এ কী ধারা—
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা।
পায়ের ধ্বনি শুনিনি, পথ নিরালা।
বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়—
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাবু আছেন?

সহসা শ্রীশের প্রবেশ

‘মাপ করবেন’ বলিয়া পলায়নোদ্যম। নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান

অক্ষয়। এসো এসো শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি, কিন্তু অপরাধটা কী আগে বলো।

শ্রীশ। খবর না দিয়েই—

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য ম্যুনিসিপালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন নাই খবর না দিয়েই এলে শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি, তা হলেই হল।

অক্ষয়। তাই বললেন। তুমি যখনই আসবে তখনই সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার। শ্রীশবাবু, স্বয়ং বিধাতা সর্বত্র তোমাকে পাস্‌পোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একটু বোসো, অবলাকান্তবাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই। (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না।

[প্রস্থান

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক জোড়া মায়াম্বর্ণমৃগী ছুটে পালাল। ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ, তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই। নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল।

রসিকের প্রবেশ

শ্রীশ। সন্ধ্যাবেলায় এসে আপনাদের তো বিরক্ত করি নি রসিকবাবু?

রসিক। ভিক্ষুকক্ষে বিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ? শ্রীশবাবু, আপনাকে দেখে বিরক্ত হব আমি কি এতবড়ো হতভাগ্য?

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু বাড়ি আছেন তো?

রসিক। আছেন বৈকি। এলেন বলে।

শ্রীশ। না না, যদি কাজে থাকেন তা হলে তাঁকে ব্যস্ত করে কাজ নেই—আমি কুণ্ডে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে সেরা লোকেরাই কুণ্ডে, এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ের সন্মিলন হলেই মণিকাণ্ডনযোগ। এই কুণ্ডে-বেকারের মিলনের জন্যেই তো সন্ধেবেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকালবেলা, রোগীদের জন্যে রাশি, কাজের লোকের জন্যে দশটা-চারটে। আর সন্ধেবেলাটা, সত্যি কথা বলছি, চিরকুমার-সভার অধিবেশনের জন্যে চতুর্মুখ সৃজন করেন নি। কী বলেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈকি। সন্ধ্যা চিরকুমার-সভার অনেক পূর্বেই সৃজন হয়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবুর নিয়ম মানে না—

রসিক। সে যে-চন্দ্রের নিয়ম মানে তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুঁলে বলি, হাসবেন না শ্রীশবাবু, আমার একতলার ঘরে কার্যক্লেশে একটি জানলা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে; শব্দরসন্যায় সেই জ্যোৎস্নার শব্দ রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো। শব্দ একটি হংসদ্রুত কেন্ বিরাহিণীর হয়ে এই চিরবিবাহীর কানে কানে বলছে—

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুস্রভা কুঞ্জবসন্তের—
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোঙ্গারচিকুরাং।
হৃদৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাম্বীং পূর্নারিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপবাজিননী॥

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিকবাবু, চমৎকার। কিন্তু, ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অনুস্বার-বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

রসিক। বাংলায় একটা তর্জমাও করেছি; পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয়, তাই লুকিয়ে রেখেছি— শুনবেন শ্রীশবাবু?

কুঞ্জকুটীরের সিন্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর—
লীনা হবে মদিরাম্বী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, করে হবে হাস,
কিসলয় পাখাখানি দোলাইব গায়?

শ্রীশ। বা, বা, রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত আছে তা তো জানতুম না।

রসিক। কী করে জানবেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু, এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই।

শ্রীশ। আহা! রসিকবাবু, যমুনাতীরে সেই সিন্ধ-অলিন্দ-ওয়ালা কুঞ্জকুটীরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি প্যারোনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রি হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু। শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কী। সেই মদমুকুলিতাম্বীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে পড়ে রয়েছে।

রসিক। দেখি দেখি। তাই তো। দুর্লভ জিনিস আপনার হাতে ঠেকে দেখছি। বাঃ, দিব্য গন্ধ। শ্লেকের লাইনটা বদলাতে হবে মশায়, ছন্দ ভঙ্গ হয় হোক গে—বাসন্তীনবপরিমলোঙ্গার-রুমলাং। শ্রীশবাবু, এ রুমালটাতে তো আমাদের কুমার-সভার পতাকা নির্মাণ চলবে না। দেখছেন কোণে একটি ছোট্ট 'ন' অক্ষর লেখা রয়েছে?

শ্রীশ। কী নাম হতে পারে বলুন দেখি। নলিনী? না, বড় চলিত নাম। নীলাম্বুজা? ভয়ংকর মোটা। নীহারিকা? বড়ো বাড়াবাড়ি। বলুন-না রসিকবাবু, আপনার কী মনে হয়।

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে, অভিধানে যত 'ন' আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, 'ন'য়ের মালা গণ্ঠে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে—নির্মলনবনীনিন্দিতনবীন—বলুন-না শ্রীশবাবু, শেষ করে দিন-না—

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ—নির্মলনবনীনিন্দিতনবীননবমল্লিকা। গীতগোবিন্দ মাটি হল। আরো অনেকগুলো ভালো ভালো 'ন' মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, মিলিয়ে দিতে পারছি নে—নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনন্দনরনিকুণ, নিবিড়নীরদনির্মল—অক্ষয়দাদা থাকলে ভাবতে হত না। মাস্টারমশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেগে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে তেমনি অক্ষয়দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।—শ্রীশবাবু, বড়ো মানুষকে বণ্ডনা করে রুমালখানা চুপি চুপি পকেটে পুরবেন না—

শ্রীশ। আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপর—

রসিক। আমার ঐ রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশবাবু। আপনাকে তো বলছি আমার নিজের ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে একটুমাত্র চাঁদের আলো আসে, আমার একটি কবিতা মনে পড়ে—

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শূচীস্মিতানি,
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীষ চন্দ্রঃ।

কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কী দিয়ে ভোলাই বলুন তো। কাব্যশাস্ত্রের রসালো জায়গা যা-কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায় চিড়ে ভেজে না। সেই দুর্ভিক্ষের সময় ঐ রুমালখানি বড়ো কাজে লাগবে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য দৈবাৎ কখনো দেখেছেন রসিকবাবু?

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ঐ রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি। আর ঐ-যে 'ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঐ মগজটি একটি মোচাক-বিশেষ, ওর ফুকোরে ফুকোরে কবিত্বের মধু। আমাকে সুস্থ মাতাল করে দেবেন দেখছি।

[দীর্ঘনিশ্বাসপতন]

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধ্যাবেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাবু।

শৈলবালা। রোজ সন্ধ্যাবেলায় যদি এই রকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈলবালা। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়ান কেন। বড়ো বয়সে গাটকাটা ব্যাবসা ধরবে নাকি।

রসিক। না ভাই, সে ব্যাবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তক্রর চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈলবালা। কিরকম।

রসিক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি করবার মূলধন আমার নেই। আমি খুচরো মালের কারবারী—রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শ্রীশবাবুর ঘেরকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজার-সুন্দ পাইকের দরে কিনে নিতে পারেন—রুমাল কেন, সমস্ত নীলাঞ্জে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন। আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগদুল্ফবিলাসিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উজ্জ্বল করিতে আসেন কেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈলবালা। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি 'ন' অক্ষর লাল সূতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ঐ অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এ কী রকম জ্বরদস্তি। আর 'ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর।

রসিক। শুনছি বিলিতি শাস্ত্র ন্যায়ধর্মও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ। এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে।

শৈলবালা। শ্রীশবাবু, যার রুমাল আপনি তো তাকে দেখেন নি তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করছেন।

শ্রীশ। দেখি নি কে বললে।

শৈলবালা। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। 'ন' তো দুটি আছে—

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি—তা, এ রুমাল দুজনের যারই হোক দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দের আয়োজন করবেন না; একচন্দ্রস্তুমোহিনী।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন? চন্দ্রবাবুর বাড়ি কাছেই—আমি একবার চট করে দেখা করে আসব।

শৈলবালা। পালাবেন না তো?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওথানা খালাস না করে যাচ্ছি নে।

[প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমার-সভার সভ্যগুলিকে যেরকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্যা ভংগ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারো দরকার হয় না, এই বড়ো রসিকই পারে।

শৈলবালা। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান? যিনি দার্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এঁরা এতকাল চন্দ্রাবদুর বাসায় বস্তু নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা। এখানকার রুমালে বইয়ে চৌকিতে টেবিলে যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে—আহা, শ্রীশবাবুটি গেল।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যাস হয়ে গেছে।

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার পিলে যকুৎ যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কান্ডটাই করলে। সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈলবালা। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর।

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়্দিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নমুনা দেখতে পারি কি।

নীরবালা। 'দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের থেয়া—

চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া-নেয়া।'

রসিক। দিদি ভারি ব্যস্ত যে! পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই। যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

নীরবালা।

গান

জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।
তোমার বাঁশি আমার বাজে বৃকে
কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।
চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে!

আশা জাগে কেন অকারণে

আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে—

ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাবু আছেন?

বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচাঁকিত হইয়া দণ্ডায়মান
নীরবালা মূহূর্ত হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতবেগে বহিষ্কান্ত

শৈলবালা। আসুন বিপিনবাবু।

বিপিন। ঠিক করে বলুন, আসব কি। আমি আসার দরুন আপনাদের কোনো রকম লোকসান নেই?

রসিক। ঘর থেকে কিছুর লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিনবাবু, ব্যাবসার এই রকম নিয়ম। যা গেল তা আবার দুনো হয়ে ফিরে আসতে পারে, কী বল অবলাকান্ত।

শৈলবালা। রসিকদাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হয়ে আসছে।

রসিক। গুড় জমে যেরকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু, বিপিনবাবু কী ভাবছেন বলুন দেখি।

বিপিন। ভাবছি কী ছুতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না।

শৈলবালা। বন্ধুত্বে যদি বাধে?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোনো দরকারই হয় না।

শৈলবালা। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভালো হয়ে বসুন।

রসিক। মূখখানা প্রসন্ন করুন বিপিনবাবু। আমাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না। আমি তো বৃন্দ, যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর, আমাদের সুকুমারমূর্তি অবলাকান্তবাবুকে কোনো স্ত্রীলোক পুরুষ বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী কিশোরী ব্রহ্মহরিশ্রী মতো পলায়ন করে থাকেন তা হলে মনকে এই বলে সান্ধনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মন্ত খাতিরটা করেছেন। হায় রে হতভাগ্য রসিক, তাকে দেখে কোনো তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না।

বিপিন। রসিকবাবু আপনাকেও যে দলে টানছেন অবলাকান্তবাবু। এ কিরকম হল।

শৈলবালা। কী জানি বিপিনবাবু, আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে—কোনো অবলা তো এ পর্যন্ত আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনো সময় আছে।

শৈলবালা। সে আশা এবং সে সময় যদি থাকত তা হলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এ'র মনের মধ্যে একটা কী বেদনা রয়েছে, নইলে এত অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণ ভাব থাকত না। এটা কিসের খাতা। গান লেখা দেখছি। 'নীরবালা দেবী'। (পাঠ)

শৈলবালা। কী পড়ছেন বিপিনবাবু।

বিপিন। কোনো একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করছি, হয়তো তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার সুযোগ পাব না এবং হয়তো তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না, কিন্তু এই গানগুলি মানিক এবং হাতের অক্ষরগুলি মন্থো। যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন।

শৈলবালা। বিধাতা মাপ করতে পারেন, কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির 'পরে আমার লোভ আছে বিপিনবাবু।

রসিক। আর, আমি বুদ্ধি লোভ মোহ সমস্ত জয় করে বসে আছি? আহা, হাতের অক্ষরের মতো জিনিস আর আছে? মনের ভাব মূর্তি ধরে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে—অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে। অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়ো না ভাই। তোমাদের চণ্ডলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরনার মতো দিনরাত বারে পড়ছে, তাকে তো ধরে রাখতে পার না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারই একটি গুঁড়ু ভরে উঠেছে—এ জিনিসের

দাম আছে। বিপিনবাবু, আপনি তো নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কী করবেন।

বিপিন। আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন, খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কী। এই খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন।

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়। সেদিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলেম, নৃপবালা, নীরবালা—এ কী, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলুম আমার সেই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে। ঠুঁর ঘেরকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ঠুঁর ঐ চন্দ্রকলার মতো কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা প'রে, হাতে একটা বীণা নিয়ে সকালবেলায় একটা পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন।

রসিক। বুদ্ধিতে পারছি নে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুরি দরকার হয়েছে।

শ্রীশ। চিরকুমার-সভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কী। তবে আমার দ্বারা কী কাজ পাবেন।

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যেরূপ উদ্ভাপ আছে আপনি উত্তরমেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন।—বিপিন, উঠছ নাকি।

বিপিন। যাই, আমাকে রাত্রে একটু পড়তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরত পাওয়া যাবে।

বিপিন। (জনান্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক্।

শৈলবালা। (মৃদুস্বরে) শ্রীশবাবু ইতস্তত করছেন কেন, আপনার কিছুর হারিয়েছে নাকি।

শ্রীশ। (মৃদুস্বরে) আজ থাক্, আর-একদিন খুঁজে দেখব।

[শ্রীশ ও বিপিনের প্রস্থান]

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কী রকমের ডাকাতি দিদি। আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল! আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীরবালা। আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, তোমার অভিধান জাহির করতে হবে না—আমার খাতা ফিরিয়ে আনো।

রসিক। পুঁলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যাবসা নয়।

নীরবালা। কেন দিদি, তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে।

শৈলবালা। এমন অমূল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস কেন।

নীরবালা। আমি বুঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি?

রসিক। লোকে সেই রকম সন্দেহ করছে।

নীরবালা। না রসিকদাদা, তোমার ও ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা।

[নীরবালার সঙ্কোচে প্রস্থান]

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ

রসিক। কী নৃপ, হারাধন খুঁজে বেড়াচ্ছিস?

নৃপবালা। না, আমার কিছু হারায় নি।

রসিক। সে তো অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস। (শৈলর হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিসটা কার ভাই।

নৃপবালা। ও আমার নয়।

[পলায়নোদ্যত]

রসিক। (নৃপকে ধরিয়া) যে জিনিসটা খোয়া গেছে নৃপ তার উপরে কোনো দাবিও রাখতে চায় না।

নৃপবালা। রসিকদাদা, ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

বতীর দৃশ্য

গোলদিঘির পথ

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিবিয়া, আজ যদি এখনই ঘুমোতে কিংবা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তা হলে দেবতারা ধিক্কার দেবেন।

বিপিন। তাঁদের ধিক্কার খুব সহজে সহ্য হয়, কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিংবা—

শ্রীশ। দেখো, ঐজন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিণে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় বলে মলয়-সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদুরিটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমার ফুল ভালো লাগে, জ্যোৎস্না ভালো লাগে—

বিপিন। এবং—

শ্রীশ। এবং যা-কিছু ভালো লাগবার মতো জিনিস সবই ভালো লাগে।

বিপিন। বিধাতা তো তোমাকে ভারি আশ্চর্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখছি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরো আশ্চর্য। তোমার লাগে ভালো, কিন্তু বল অন্য রকম—আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো—সে চলে ঠিক, বাজে ভুল।

বিপিন। কিন্তু শ্রীশ, তোমার যদি সব মনোরম জিনিসই মনোহর লাগতে লাগল তা হলে তো আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি তো কিছুই বিপদ বোধ করি নে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই তো সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনাবোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি ভাই, স্পষ্টই কবুল করছি, স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে—চিরকুমার-সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তা হলে তাঁকে খুব তফাত দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল। তুমি তফাতে থাকলে কী হবে, তাঁরা তো তফাতে থাকেন না। সংসার-রক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্টি করতে হয়েছে যে তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ঐ যে স্ত্রীসভা নেবার নিয়ম হয়েছে, এতদিন পরে কুমার-সভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন

করেছে। কিন্তু, কেবল একটিমাত্র মহিলা হলে চলবে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভা চাই। বন্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠান্ডা লাগালে সর্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাকলে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ঐ খোলা-হাওয়া বন্ধ-হাওয়া বন্ধি নে ভাই। যার সর্দির ধাত তাকে সর্দি থেকে রক্ষা করতে দেবতা মনুষ্য কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কী বলছে হে।

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বললেই বন্ধুতে পারবে তোমার ধাতের সঙ্গে তার চমৎকার মিল আছে। নাড়ীটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ীর মতো চলে তা জাঁক করে বলতে পারব না।

শ্রীশ। ঐটে তোমার আর-একটা ভুল। চিরকুমারের নাড়ীর উপরে ঊনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও—কোনো ভয় নেই, বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের মতো রত যাদের তারা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মৃদে রাখতে পারে। তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সঙ্গে লড়াই করো।

বিপিন। ও কে হে। পূর্ণ দেখছি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরোবার জো নেই। ঐ বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্ছে। ওকে একবার ডাক দেব?

শ্রীশ। ডাকো। ও কিন্তু আমাদেরই দুজনকে অন্তর্দৃষ্টি করে গলিতে গলিতে ঘুরছে বলে বোধ হচ্ছে না?

বিপিন। পূর্ণবাবু, খবর কী।

পূর্ণের প্রবেশ

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল-পরশু যে খবর চলছিল আজও তাই চলছে।

শ্রীশ। কাল-পরশু শীতের হাওয়া বীছিল, আজ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে—এতে দুটো-একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে।

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে-সব খবরের সৃষ্টি হয় কুমার-সভার খবরের কাগজে তার স্থান নেই। তপোবনে একদিন অকালে বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল, তাই নিয়ে কার্লিডাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হয়েছে—আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় তো হোক-না পূর্ণবাবু—সে কাব্যে যে দেবতা দগ্ধ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার-সভা দগ্ধ হোক। যে দেবতা জ্বলেছিলেন তিনি জ্বালান। না, আমি ঠাট্টা করছি নে শ্রীশবাবু, আমাদের চিরকুমার-সভাটি একটি আস্ত জতুগৃহবিশেষ। আগুন লাগলে রক্ষা নেই। তার চেয়ে বিবাহিত সভা স্থাপন করো, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাকবে। যে ইন্ট পাঁজায় পুড়েছে তা দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে।

শ্রীশ। যে-সে লোক বিবাহ করে বিবাহ জিনিসটা মাটি হয়ে গেছে পূর্ণবাবু। সেইজন্যই তো কুমার-সভা। আমার যতদিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আসুন তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাসু, আর ভয় নেই।

পূর্ণ। দেখো শ্রীশবাবু—

শ্রীশ। দেখব আর কী। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক চোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংসরিক্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া।

কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি।

পুড়িয়ে বলিয়া রয়েছে আশার
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া।

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

পূর্ণ। ওহে শ্রীশবাবু, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখে নি—
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

ঘরটি সাজানো রয়েছে— থালায় মালা, পালকে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবনপ্রদীপটি জ্বলছে না, সন্ধ্যা
ক্রমে রাত্রি হতে চলল। বাঃ, দিব্য লিখেছে। কোন্ বইটাতে আছে বলো দেখি।

শ্রীশ। বইটার নাম ‘আবাহন’।

পূর্ণ। নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভালো। (আপন মনে)—
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

[দীর্ঘনিশ্বাস]

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেছ।

শ্রীশ। বাড়ি কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই।

পূর্ণ। আজ পথ ভোলবার মতোই রাতটা হয়েছে বটে। কী বল বিপিনবাবু।

শ্রীশ। বিপিনবাবু এ-সকল বিষয়ে কোনো কথাই কন না, পাছে গুর ভিতরকার কবিত্ব ধরা
পড়ে। কৃপণ যে জিনিসটার বেশি আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুতে রাখে।

বিপিন। অস্থানে বাজে খরচ করতে চাই নে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি। মরতে হলে একেবারে
গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভালো।

পূর্ণ। এ তো উত্তম কথা, শাস্ত্রসংগত কথা। বিপিনবাবু একেবারে অন্তিম কালের জন্যে
কবিত্ব সঞ্চয় করে রাখছেন, যখন অন্যো বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নিরুদ্ভর। আশীর্বাদ করি
অন্যের সেই বাক্যগুলি যেন মধুমাখা হয়—

শ্রীশ। এবং তার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে—

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ না হয়—

পূর্ণ। বাক্যের বিরামস্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। সেদিন নিদ্রা যেন না আসে—

পূর্ণ। রাত্রি যেন না যায়—

বিপিন। চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়—

পূর্ণ। বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জবাসীর কাছে এসে উঁকিঝুঁকি না মারে।

পূর্ণ। দূর হোক গে শ্রীশবাবু, তোমার সেই ‘আবাহন’ থেকে আর-একটা কিছু কবিতা
আওড়াও। চমৎকার লিখেছে হে—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

আহা! একটি জীবনপ্রদীপের শিখাটুকু আর-একটি জীবনপ্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু

ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়—দুটি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে দীপখানি একটু হেলিয়ে একটু ছুঁইয়ে যাওয়া, তার পরেই চকিতের মতো সমস্ত আলোকিত। (আপন মনে)

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, যাও কোথায়।

পূর্ণ। চন্দ্রবাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি, সেইটে খুঁজতে যাচ্ছি।

বিপিন। খুঁজলে পাবে তো? চন্দ্রবাবুর বাসা বড়ো এলোমেলো জায়গা—সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া যায় না।

[পূর্ণর প্রস্থান]

শ্রীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন।

বিপিন। ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওআটারের ছিপির মতো একেবারে টপ্ করে উড়ে না যায়।

শ্রীশ। যায় তো যাক-না। কোনোমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম পদার্থ। মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাত দিন মূর্টের বোঝার মতো মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি কেন। দাও ভাই, তার কেটে, একবার উড়ুক। সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম—

ওরে সাবধানী পৃথক, বারেক
পথ ভুলে মরু ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে দে
আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো হিরার বুঞ্জ—
ঝরে পড়ে আছে কাঁটাতরু-তলে
রক্তকুসুমপুঞ্জ,
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূলসিন্ধুতীরে।
ওরে সাবধানী পৃথক, বারেক
পথ ভুলে মরু ফিরে।

বিপিন। আজকাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মদ্রাকিলে পড়বে দেখছি।

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে করে মদ্রাকিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার জন্যে কেউ ভেবো না। মদ্রাকিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মদ্রাকিলের মধ্যে পা ফেললেই বিপদ। আসুন আসুন রসিকবাবু, রাতে পথে বেরিয়েছেন যে!

রসিকের প্রবেশ

রসিক। আমার রাতই বা কী, আর দিনই বা কী—

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনে ন যত্র সমাগমঃ।

শ্রীশ। অসম্যর্থঃ?

রসিক। অসম্যর্থ হচ্ছে—

আসে তো আসুক রাত, আসুক বা দিবা,

যায় যদি যাক নিরবধি।

তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা

প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

অনেকগুলো দিন রাত এ পর্যন্ত এসেছে এবং গেছে কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন না—তাই, দিনই বলুন আর রাতই বলুন, ও দুটোর 'পরে আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, প্রিয়জন এখনই যদি হঠাৎ এসে পড়েন?

রসিক। তা হলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন।

শ্রীশ। তা হলে তদুৎপত্তি তিনি অরসিক বলে প্রমাণ হয়ে যাবেন।

রসিক। এবং পরদণ্ডেই পরমানন্দে কালযাপন করতে থাকবেন। তা, আমি ঈর্ষা করতে চাই নে শ্রীশবাবু। আমার ভাগ্যে যিনি আসতে বহু বিলম্ব করলেন আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করলুম। দেবী, তোমার বরমালা গণ্ডে আনো। আজ বসন্তের শুক্লরজনী, আজ অভিসারে এসো—

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং

বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমগ্ধলেন।

মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-

দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,

অণ্ডলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মধুর।

কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত-অংশু-রুচি

পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মূর্ছি।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা। এমন কত তর্জমা করে রেখেছেন?

রসিক। বিস্তর। লক্ষ্মী তো এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করছি।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, অভিসার-ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্বীর চালাবার জন্যে চিরকুমার-সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখে-না।

শ্রীশ। কতগুলো জিনিস আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মূক্কা ছিঁড়ে ছিঁড়িয়ে পড়ে, সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙা স্ট্রীট। সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বরী পরে মনোরাজ্যের পথে ঐরকম করে বোরিয়ে থাকে—বক্ষের উপর থেকে মূক্কা ছিঁড়ে পড়ে, চেয়েও দেখে না—সত্যিকার মূক্কা হলে কুড়িয়ে নিত। কী বলেন রসিকবাবু।

রসিক। সে কথা মানতেই হয়—অভিসারটা মনে মনেই ভালো, গাড়িঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বেমানান। আশীর্বাদ করি শ্রীশবাবু, এই রকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রি কোনো-একটি জালনা থেকে কোনো-এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাবু, আপনার আশীর্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্ছি। বিশেষ ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতি করত আমার অজানা অভিসারিকা তেমনি পূর্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা, আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর-একটি চৌকি সাজানো থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধুভাবে গুড়ুং দদ্যাৎ, অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আসবেন তখন হতভাগার ভাগ্যে লগুড়ুং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশবাবু, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে যে পতাকা ওড়ানো আবশ্যিক সেটা যে ফেলে এলেন।

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে?

রসিক। চেষ্টা করতে দোষ কী।

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা কও, আমি চট্ করে আসছি।

[প্রস্থান

বিপিন। আচ্ছা রসিকবাবু, রাগ করবেন না—

রসিক। যদি বা করি আপনার ভয় করবার কোনো কারণ নেই, আমি ভারি দুর্বল।

বিপিন। দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নয় তো?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন, ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সেদিন যে মহিলাটিকে দেখলুম, তিনি—

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সংকোচ করবেন না বিপিনবাবু—তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না, আমরাও ঠিক ঐ কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাবু বৃষ্টি—

রসিক। তাঁর কথা বলবেন না, তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি—

রসিক। হাঁ, তাই বটে। তবে হয়েছে কী, তিনি নৃপালা নীরালা দুজনের কাকে যে বেশি ভালোবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না—তিনি দুজনের মধ্যে সর্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু, তাঁদের কেউ কি গুঁর প্রতি—

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে গুঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে তো কোনো গোলই ছিল না।

বিপিন। তাই বৃষ্টি অবলাকান্তবাবু কিছ—

রসিক। কিছ— যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরালা বৃষ্টি গান ভালোবাসেন?

রসিক। বাসেন বটে, আপনার পকেটের মধ্যেই তো তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে—

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না করলে আমরা কেউ-না-কেউ করতাম।

বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জনা করতেন, কিন্তু আমি—বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিলেও তো—

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব—

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষটুকু হয়েছে রক্ষণে নাহয় তাতে আর-একটু যোগ হল।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন।

রসিক। বলেছেন অল্পই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কিরকম।

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারই।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় উষা রঞ্জিত।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু।

রসিক। দলে টানছি মশায়।

বিপিন। (খাতা পুনর্বার পকেটে পুরিয়া) ইংরেজিতে বলে, দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম-পালনটাই সাব্যস্ত করলেন।

বিপিন। দেবীর ধর্মে যা বলে তিনি তাই করবেন।

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সম্মানসূচী করতে চাও নাকি।

শ্রীশ। যা হোক, অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি গে।

রসিক। (জনান্তিকে) পুনর্বার কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুদ্ধি? মানবধর্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরছে।

[বিপিনের প্রস্থান]

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে।

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুদ্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সেদিন যে দুটি মহিলাকে দেখেছিলেম তাঁদের দুজনকেই আমার সুন্দরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশক্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই তো ঐ এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি তা হলে কি—

রসিক। তা হলে আমি খুশি হব, আপনারও সেটা ভালো লাগতে পারে, এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লি যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে—

রসিক। তাতে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রারোগ জন্মাতে পারে, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ তো তাই বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বলতে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্‌টি।

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলুন দেখি।

শ্রীশ। যাঁর সেই লাল রঙে রেশমের শাড়ি পরা ছিল?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন, অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ করছিলেন—তাই মৃহদূর্তকালের জন্য হঠাৎ দ্রুত হরিণীর মতো থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, সামনের দুই-এক গুচ্ছ চুল

প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল—চাবির-গোচ্ছা-বাঁধা চ্যুত অঙলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তাঁর পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো ছুটে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ তো নৃপবালাই বটে। পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি রম্য, চুলগুঁলি কুণ্ঠিত, দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি—সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকোনো মধুটুকুর মতো মধুর, শিশিরটুকুর মতো করুণ।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত যে কবিত্বরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক। ধরা পড়েছি শ্রীশবাবু—

কবীন্দ্রাণং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীং।
বিরিণ্ডিপ্রেয়সাস্তরুণতরুণার্জারলহরীং
গভীরান্ভির্বাগ্ভির্বিদধতি সভারঞ্জনময়ীং।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে যারা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্য দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণ লীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্তকমলবনের কিরণলেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অল্প দিন হল একটু পরিচয় পেয়েছি, তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে।

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখাছি। একটি তো গিয়ে চোরের মতো আমার ঘরের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন—ধরা পড়ে ভালো রকম জবাবদিহি করতে পারলে না, শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুঁলি নিয়ে উল্টেপাল্টে নিরীক্ষণ করছে। তফাত থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মতো করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না।—আহা, চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

শ্রীশ। এই যে অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়। ঐ রে। একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর-একটা ডাকাত পথের ধারে। হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করছে তারা মেনকা উর্বশী রম্ভা হলে আমার কোনো খেদ ছিল না—মনের মতো ধ্যানভঙ্গও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই, কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশি হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে।

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। এই যে অক্ষয়বাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম।

অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল।—

In such a night as this,
When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise, in such a night
Troilus methinks mounted the Trojan walls
And sighed his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night.

শ্রীশ। In such a night আপনি কী করতে বেরিয়েছেন অক্ষয়বাবু।

রসিক।

অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী

রজনীরিয়ং চ ন য়াতি নৈতি নিদ্রা।

চক্ষু-পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে—

রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে।

অক্ষয়বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায়।

অক্ষয়। তুমি কে হে।

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র—দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবনসাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিকদাদা।

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা তো জানি নে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশবাবু, আপনার কিরকম বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। এখনো সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি।

রসিক। আমার মতো পরিণত বয়সের জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি?—অক্ষয়দা, আজ তোমাকে বড়ো অনামনস্ক দেখাচ্ছে।

অক্ষয়। তুমি তো অনামনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই।—বিপিনবাবু, তুমি আমাকে খুঁজছিলে বললে বটে, কিন্তু খুব যে জরুরি দরকার আছে বলে বোধ হচ্ছে না, অতএব আমি এখন বিদায় হই—একটু বিশেষ কাজ আছে।

[প্রস্থান]

রসিক। বিরহী চিঠি লিখতে চলল।

শ্রীশ। অক্ষয়বাবু আছেন বেশ। রসিকবাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড়ো বোন। তাঁর নাম?

রসিক। পূরবালা।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কী নাম বললেন।

রসিক। পূরবালা।

বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়ো?

রসিক। হাঁ।

বিপিন। সব-ছোটোটির নাম?

রসিক। নীরবালা।

শ্রীশ। আর নৃপবালা কোন্টি।

রসিক। তিনি নীরবালার বড়ো।

শ্রীশ। তা হলে নৃপবালাই হলেন মেজো।

বিপিন। আর নীরবালা ছোটো।

শ্রীশ। পূরবালার ছোটো নৃপবালা।

বিপিন। তাঁর ছোটো হচ্ছেন নীরবালা।

রসিক। (স্বগত) এরা তো নাম জপ করতে শুরু করলে। আমার মূর্খকিল। আর তো হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। এই যে আপনারা এখানে। আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলুম।

শ্রীশ। এইবার আপনি এখানে থাকুন, আমরা বাড়ি যাই।

বনমালী। আপনারা সর্বদাই ব্যস্ত দেখতে পাই।

বিপিন। তা, আপনাকে দেখলে একটু বিশেষ ব্যস্ত হয়েই পড়ি।

বনমালী। পাঁচ মিনিট যদি দাঁড়ান—

শ্রীশ। রসিকবাবু, একটু ঠান্ডা বোধ হচ্ছে না?

রসিক। আপনাদের এতক্ষণে বোধ হল, আমার অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হচ্ছে।

বনমালী। চলুন-না, ঘরেই চলুন-না।

শ্রীশ। মশায়, এত রাতে যদি আমার ঘরে ঢোকেন তা হলে কিন্তু—

বনমালী। যে আজ্ঞে, আপনারা কিছু বাস্তব আছেন দেখছি, তা হলে আর-এক সময় হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

রসিক ও শৈলবালা

রসিক। ভাই শৈল।

শৈলবালা। কী রসিকদাদা।

রসিক। একি আমার কাজ। মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন, আর আমি বৃন্দ—

শৈলবালা। তুমি তো বৃন্দ, তেমনি যুবক দুটিও তো যুগল মহাদেব নন।

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাণ্ডা করেই দেখেছি। সেইজন্যেই তো নির্ভয়ে এসেছিলাম। কিন্তু, তাদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত রসালাপ করবার মতো উত্তাপ আমার শরীরে তো নেই।

শৈলবালা। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চার করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্যের তাপে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মরা কাঠ তাতেই ফেটে যায়, যৌবনের উত্তাপ বৃদ্ধি মানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈলবালা। কই, তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে তো বোধ হচ্ছে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখলে বুঝতে পারতিস ভাই।

শৈলবালা। কী বল রসিকদা। তোমারই তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কী করবে।

রসিক। শব্দেকেন্দ্রনে বহিরুপৈতি বৃন্দম্। যৌবনের দাহ বৃন্দকে পেলেই হৃদয়ঃশব্দে জ্বলে ওঠে—সেইজন্যেই তো ‘বৃন্দস্য তরুণী ভাষা’ বিপত্তির কারণ। কী আর বলব ভাই।

নীরবালার প্রবেশ

রসিক। আগছ বরদে দেবি। কিন্তু, বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানি নে, আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত করে মরিছি। শিব তো কিছুই করছেন না, তবু তোমাদের পূজো পাচ্ছেন; আর এই যে বৃদ্ধো খেটে মরছে, এ কি কিছুই পাবে না।

নীরবালা। শিব পান ফুল, তুমি পাবে তার ফল—তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিকদাদা।

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে, সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া

যায়—আমাকেও নির্ভয়ে বরমালা দিতে পারিস, যখনই দরকার হবে তখনই ফিরে পারি। তার চেয়ে ভাই, আমাকে একটা গলাবন্ধ বন্ধে দিস, বরমাল্যের চেয়ে সেটা বড়োমানুষের কাজে লাগবে।

নীরবালা। তা দেব—একজোড়া পশমের জুতো বন্ধে রেখেছি সেও শ্রীচরণেষু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে। কিন্তু নীরু, আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট—আপাদ-মস্তক নাই হল। সেজন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তাঁরই জন্যে রেখে দে।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার বক্তৃতাও তুমি রেখে দাও।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে—লক্ষণ খারাপ।

শৈলবালা। নীরু, তুই করছিস কী। আবার এ ঘরে এসেছিস? আজ যে এখানে আমাদের সভা বসবে—এখনই কে এসে পড়বে, বিপদে পড়িবি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও একবার পেয়েছে, এখন বার বার বিপদে পড়বার জন্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

নীরবালা। দেখো রসিকদাদা, তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা হলে গলাবন্ধ পাবে না বলছি। দেখো দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ঐরকম করে হাস, তা হলে গুর আত্মপর্থা আরো বেড়ে যাবে।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, নীরু আজকাল ঠাট্টাও সহিতে পারছে না, মন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। নীরুদিদি, কোনো কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে এই রকম শাস্ত্রে আছে। তোর রসিকদাদার ঠাট্টাকেও কি তোর আজকাল কুহুতান বলে ভ্রম হতে লাগল।

নীরবালা। সেইজন্যেই তো তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্ছি—তানটা যদি একটু কমে।

শৈলবালা। নীরু, আর ঝগড়া করিস নে—আয়, এখনই সবাই এসে পড়বে।

[নীর ও শৈলের প্রস্থান]

পূর্ণের প্রবেশ

রসিক। আসুন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। এখনো আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বুদ্ধি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন? আরো সকলে আসবেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিকবাবু।

রসিক। তা কেমন করে বলব বলুন। কিন্তু ঘরে যেই ঢুকলেন আপনার দুটি চক্ষু দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে সে ব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষুতত্ত্বে আপনার এত দূর অধিকার হল কী করে।

রসিক। আমার পানে কেউ কোনোদিন তাকায় নি পূর্ণবাবু, তাই এই প্রাচীন বয়স পর্যন্ত পরের চক্ষু পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মতো শুভাদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টিলাভ করতে পারতুম। কিন্তু, যাই বলুন পূর্ণবাবু, চোখ দুটির মতো এমন আশ্চর্য সৃষ্টি আর-কিছু হয় নি—শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিকবাবু। ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিংবা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ঐ দুটি চোখে।

রসিক। নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাংগ্যা নয়নম্বয়ং

অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চণ্ডলং।

—বুঝেছেন পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক। আনতাঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল
না দেখিয়ে পরস্পরে তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হল না। ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখতে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় তো? সেই রকম অর্থ করেই নিন-না। শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিকবাবু।

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

অথচ সে বেচারী বন্দী—খাঁচার পাখির মতো কেবল এ পাশে ও পাশে ছট্‌ফট্‌ করে—প্রিয়চক্ষু যেখানে, সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না।

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কিরকম নিদারুণ তাও শাস্ত্রে লিখছে—

হস্তা লোচনবিশিষ্টৈর্গঙ্গা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যদ্বা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি।

বিশিষ্টা দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

পূর্ণ। রসিকবাবু, বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে যাবার কোনো অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ঐরকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত পূর্ণবাবু। এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না।

পূর্ণ। (সনিশ্বাসে) বড়ো বিস্তী জায়গা রসিকবাবু। কিন্তু ওটা আপনি বেশ বলেছেন—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

রসিক। আহা পূর্ণবাবু, নয়নের কথা যদি উঠল ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না—

লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদ্যয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পদুর্নিহি গরলেন লেপিতঃ।

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ে না, সরলে।

এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ
কী কাজ লেপিয়া গরলে।
পূর্ণ। থামুন রসিকবাবু। ঐ বুদ্ধি কারা আসছেন।

চন্দ্রবাবু ও নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্র। এই যে অক্ষয়বাবু।

রসিক। আমার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর সাদৃশ্য আছে শুনলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

চন্দ্র। মাপ করবেন রসিকবাবু, হঠাৎ ভ্রম হয়েছিল।

রসিক। মাপ করবার কী কারণ ঘটেছে মশায়। আমাকে অক্ষয়বাবু ভ্রম করে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন। পূর্ণবাবুতে আমাতে এতক্ষণ বিজ্ঞানচর্চা করছিলেন। চন্দ্রবাবু।

চন্দ্র। আমাদের কুমার-সভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান-আলোচনার জন্যে স্থির করব মনে করছিলেন। আজ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। না, সে কিছুই না চন্দ্রবাবু।

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারি শক্ত রসিকবাবু।

রসিক। শক্ত বৈকি। পূর্ণবাবুরও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিষের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে-সম্বন্ধে কোনো মতই আমার সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন করে। সোজা দেখা, বাঁকা দেখা, এই-সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। বিষয়টা বড়ো সংকটময়।

চন্দ্র। নির্মলার সঙ্গে রসিকবাবুর পরিচয় হয় নি? ইনিই আমাদের কুমার-সভার প্রথম স্ত্রীসভ্য।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধিবিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রসিক। একই কথা চন্দ্রবাবু। শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্ভূত হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না। কী বলেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণবাবু ও শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে।

চন্দ্র। (ঘাড়ি দেখিয়া) না, এখনো সময় হয় নি। অবলাকান্তবাবু, আমার ভাগ্নী নির্মালা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন।

শৈলবালা। (নির্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন, পূর্ণবাবুরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যই বিশেষ করে বন্ধ করে রাখতে চায়। চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নির্মলা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই। আমি যদি আপনাদের সভার কোনো উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে।

শৈলবালা। আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রবাবুকে ভালো করে জানবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য।

নির্মলা। আমি ঠুকে জানব না তো কে জানবে।

শৈলবালা। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটোকে বড়ো করে তোলে বটে, তেমনি বড়োকেও ছোটো করে আনে। চন্দ্রবাবুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্মলা। কিন্তু, আমার মামাকে যথার্থভাবে জানা খুব সহজ, ঠুঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে।

শৈলবালা। দেখুন, সেইজন্যেই তো ঠুকে ঠিকমত জানা শক্ত। দুর্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে বুঝতে পারে। তাকে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্মলা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এত দিন পরে আপনার কাছে আমার কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সে কী বলব।

শৈলবালা। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেই রকম আনন্দ দিচ্ছে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্তবাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলাম সেটা পড়েছ?

শৈলবালা। পড়েছি এবং তার থেকে সমস্ত নোট করে আপনার ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারি উপকার হবে, আমি বড়ো খুশি হলুম অবলাকান্তবাবু। পূর্ণা নিজে আমার কাছে ঐ বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, ঠুঁর শরীর ভালো ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে?

শৈলবালা। এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

রসিক। পূর্ণাবাবু, আপনাকে কেমন ম্লান দেখছি, অসুখ করেছে কি।

পূর্ণা। না, কিছুই না। রসিকবাবু, যিনি গেলেন ঐরই নাম অবলাকান্ত?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণা। আমার কাছে ঠুঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো ঠেকছে না।

রসিক। অল্পবয়স কিনা সেইজন্যে—

পূর্ণা। মহিলাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ঠুঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি। মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার করতে জানেন না—কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব। ওটা হয়তো অল্প বয়সের ধর্ম।

পূর্ণা। আমাদেরও তো বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা তো—

রসিক। তা তো দেখছি, আপনি খুব দূরে দূরেই থাকেন—কিন্তু উনি হয়তো সেটাকে ঠিক ভদ্রতা বলেই গ্রহণ করেন না। ঠুঁর হয়তো ভ্রম হচ্ছে আপনি ঠুকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণা। বলেন কী রসিকবাবু। কী করব বলুন তো। আমি তো ভেবেই পাই নে, কী কথা বলবার জন্যে আমি ঠুঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন, তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণা। না রসিকবাবু, আমার একটা কথাও বেরোয় না। কী বলব আপনিই বলুন-না।

রসিক। এমন কোনো কথাই বলবেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কিরকম গরম পড়েছে।

পূর্ণা। তিনি যদি বলেন ‘হাঁ গরম পড়েছে’ তার পরে কী বলব।

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। (চন্দ্রবাবুকে ও নির্মলাকে নমস্কার করিয়া, নির্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘাড়ির চেয়ে এগিয়ে চলছে। এই দেখুন, এখনো সাড়ে-ছটা বাজে নি।

নির্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন, সেইজন্যে সভা বসবার পূর্বেই এসেছি—প্রথম সভা হবার সংকোচ ভাঙতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু, আপনার কাছে নিবেদন এই যে, আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ করে চলবেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন। লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ সভ্যগুলিকে অনুগ্রহ করে দেখবেন শুনবেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

রসিক। যান পূর্ণবাবু, আপনিও একটা কথা বলুন গে।

পূর্ণ। কী বলব।

নির্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন।

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কী আছে। কিন্তু, আগুন তো লোহাকে চালাচ্ছে—আমাদের মতো ভারী জিনিসগুলোকে চলনসই করে তুলতে আপনাদের মতো দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুনছেন তো পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। আমি কী বলব বলুন-না।

রসিক। বলুন, লোহাকে চালাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই।

বিপিন। কী পূর্ণবাবু, রসিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি?

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝা-মাঝি একেবারে খপ করে থেমে গেল।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই যে পূর্ণবাবু, গেল বারে আপনার শরীর খারাপ ছিল, এবারে বেশ ভালো বোধ হচ্ছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতদিন কুমার-সভার যে কী একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুদ্ধিতে পেরেছি, সোনার মুকুটের মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল—আজ সেইটি বসানো হয়েছে, কী বলেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। আপনাদের মতো এমন রচনাশক্তি আমার নেই—আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারি নে, বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হলেম পূর্ণবাবু, আশা করি ক্রমে উন্নতি লাভ করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীরপুরুষে যুদ্ধ চলুক, এখন আসুন রসিকবাবু, আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথা আছে। দেখুন, সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোনো কথা উঠেছিল?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম আর ক্ষমা করা দেবীর—সে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলেছিলাম—

বিপিন। তাতে কী বললেন।

রসিক। কিছু না বলে বিদ্যুতের মতো চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন!

রসিক। কিন্তু, সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জন?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে?

রসিক। এক প্রান্তে কিংবা অন্য প্রান্তে একটু হয়তো বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ?

রসিক। কী জানি মশায়। অর্থও থাকতে পারে, অনর্থও থাকতে পারে।

বিপিন। রসিকবাবু, আপনি কী বলেন আমি কিছু বুঝতে পারি নে।

রসিক। কী করে বুঝবেন—ভারি শক্ত কথা।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কী কথা শক্ত মশায়।

রসিক। এই বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের কথা।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তার চেয়ে শক্ত কথা যদি শুনতে চাও তা হলে পূর্ণের কাছে যাও।

বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি শখ নেই ভাই।

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশি দরুহ—সেটা তোমার আসে।
দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠান্ডা করে এসো গে। আমি বরং ততক্ষণ রসিকবাবুর সঙ্গে
বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের আলোচনা করে নিই।

[বিপিনের প্রস্থান]

রসিকবাবু, ঐ যে সেদিন আপনি যার নাম নৃপবালা বললেন তিনি—তিনি—তার সম্বন্ধে
বিস্তারিত করে কিছু বলুন। সেদিন চকিতের মধ্যে তার মুখে এমন একটি স্নিগ্ধভাব দেখেছি,
তার সম্বন্ধে কোতূহল কিছুতেই থামাতে পারছি নে।

রসিক। বিস্তারিত করে বললে কোতূহল আরো বেড়ে যাবে। এরকম কোতূহল ‘হবিষা
কৃষ্ণবর্ণে’ব ভূয় এবাভিবর্ধতে’। আমি তো তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আসছি, কিন্তু সেই কোমল
হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে ‘ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি’।

শ্রীশ। আচ্ছা, তিনি—আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করছি—

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারছি।

শ্রীশ। তা, তিনি—কী আর প্রশ্ন করব। তার সম্বন্ধে যা হয় কিছু বলুন-না—কাল কী
বললেন, আজ সকালে কী করলেন, যত সামান্য হোক আপনি বলুন—আমি শুনছি।

রসিক। (শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড়ো খুশি হলুম শ্রীশবাবু, আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন—
আপনি তাঁকে কেবল চকিতের মধ্যে দেখে এটুকু কী করে ধরতে পারলেন যে তার সম্বন্ধে তুচ্ছ
কিছুই নেই। তিনি যদি বলেন ‘রসিকদা, ঐ কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উস্কে দাও তো’,
আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম আদি-কবির প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো। কী
বলব শ্রীশবাবু, আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন, সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে
সুতো পরাচ্ছেন, কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে—আমার মনে হল এক আশ্চর্য
দৃশ্য। কতবার কত দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো মূখ তুলে দেখি নি,
কিন্তু—

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন?

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদার সঙ্গে কী পরামর্শ করছেন।

রসিক। কিছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে, যত দূর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাবু, কৃষি-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ করো।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘাড়ের চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ—আজ—(কাশি)

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা—

পূর্ণ। আজ এই সভা—

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদুস্বরে) বলে যান পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কী পূর্ণবাবু, বলে যান।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব (কাশি)—যে নূতন সৌন্দর্য (পুনরায় কাশি)—
অভিনন্দন—

রসিক। (উঠিয়া) সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণবাবু সকল সভ্যের পূর্বেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সংবরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখি প্রত্যুষেই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছে। কিন্তু দেহ রুগ্ন, তাই পূর্ণহৃদয়ের আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করবার শক্তি নেই, অতএব ঠুকে আজ আমাদের নিন্দুতি দান করতে হবে। এবং আজ নবপ্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণবাবু, আজ বরং আমাদের সভার কার্য বন্ধ থাকে সেও ভালো, তথাপি বর্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারি নে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।

চন্দ্রবাবু। আমি জানি কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভালো নেই, এ অবস্থায় আমরা ঠুকে ক্রেশ দিতে পারি না। বিশেষত অবলাকান্তবাবু ঘরে বসে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। এ-পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে গবর্নেন্ট থেকে যতগুলি রিপোর্ট বাহির হয়েছে সবগুলি আমি ঠুর কাছে দিয়েছিলাম, তার থেকে উনি জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সংকলন করে রেখেছেন—সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্ব-সাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করতেও প্রস্তুত হয়েছেন। ইনি ঘেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্যে যোগদান করেছেন সেজন্য ঠুকে প্রচুর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিপিনবাবু মুরোপীয় ছাত্রাগার-সকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী-সংকলনের ভার নিয়েছিলেন, এবং শ্রীশবাবু স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লন্ডন নগরে কত বিচিত্র লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছে তার তালিকা সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ-রচনায় প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—বোধ হয় এখনো তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি—সকলেই জানেন আমাদের দেশের গোরুর গাড়ি এমনভাবে নির্মিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই উঠে পড়ে এবং গোরুর গলায় ফাঁস লেগে যায়, আবার কোনো কারণে গোরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাই-সুন্দর গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে—এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি, কৃতকার্য হব বলে আশা করি। আমরা মূখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি

—আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর-কিছুই নেই। আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাহে গাড়োয়ান-পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝানো নিতান্ত কঠিন বলে বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পণ্ডায়েত করবার চেষ্টায় আছি। শ্রীমতী নির্মালা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগীচর্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করছেন—ভদ্রলোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত করবার জন্যে তিনি দুই-একটি অন্তঃপদে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমার-সভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফলতা লাভ করতে থাকবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ তো আমি আরম্ভও করি নি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু, করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চলছে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবছি।

শ্রীশ। কিন্তু, অবলাকান্তবাবুকে ধন্য বলতে হবে—উনি যে কখন আপনার কাজটি করে যাচ্ছেন কিছু বোঝবার জো নেই।

বিপিন। তাই তো বড়ো আশ্চর্য। অথচ মনে হয় যেন ঠুর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই ঠুর সঙ্গে একবার আলোচনা করে আসি গে।

[শৈলীর নিকট গমন]

পূর্ণ। রসিকবাবু, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।

রসিক। কিছু বলবেন না, আমি এমনি বুঝে নেব। কিন্তু, সকলে আমার মতো নয় পূর্ণবাবু—আন্দাজে বুঝবেন না, বলা-কওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাবু—আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কী করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ঠুর কাছে গিয়ে যা হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ করে দিন-না।

পূর্ণ। ঐ দেখুন-না, অবলাকান্তবাবু আবার ঠুর কাছে গিয়ে বসেছেন—

রসিক। তা হোক-না, তিনি তো ঠুকে চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে তো বাহুর মতো ভেদ করে যেতে হবে না। আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান-না।

পূর্ণ। আচ্ছা, আমি দেখি।

শৈলবালা। (নির্মালার প্রতি) আমাকে এত করে বলবেন না—আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করছেন। কিন্তু, বেচারী পূর্ণবাবুর জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। আপনি আসবেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন, অথচ সেটা ব্যস্ত করতে না পেয়ে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি ঠুকে—

নির্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক করে দেখছেন বলে আমি বড়ো সংকোচ বোধ করছি—আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন, মহিলা বলে স্বতন্ত্র করবেন না।

শৈলবালা। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে সর্বিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে যত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হলে তার

চেয়ে বেশি কাজ হবে। যে লোক গুণের দ্বারা নোকোকে অগ্রসর করে দেবে তাকে নোকো থেকে কতকটা দূরে থাকতে হয়। চন্দ্রবাবু আমাদের নোকোর হাল ধরে আছেন, তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন। আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ করতে হবে, সুতরাং আপনাকে পৃথক থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ির দলে বসে গেছি।

নির্মলা। আপনাকেও কর্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক বোধ হয়। একদিন মাত্র দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, এ সভার মধ্যে আপনি আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈলবালা। সে তো আমার সৌভাগ্য। এই-যে আসুন পূর্ণবাবু। আমরা আপনার কথাই বলছিলাম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা, ঠিক হয়েছে—পুরাতনের মধ্যে প্রাণস্ফোর করবার জন্যেই নূতনের প্রয়োজন।

শৈলবালা। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। কিন্তু, আমার সেই রুমালটি? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খুইয়েছি, আবার রুমালটিও খোয়াতে পারি নে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেশমের রুমাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে। এ যে তার উচিত মূল্য তা বলতে পারি নে—তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈলবালা। মশায়, এ ছলনাটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। এ উপহার আমার জন্যে আসেও নি, যার রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ করে এগুনি—

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, ভগবান বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হচ্ছে—হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্কটুকু একেবারে দূর হয়।

শৈলবালা। আচ্ছা, আমি দয়ার পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু আপনি সভার জন্য যে প্রবন্ধ লিখতে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব—রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।

ঘরের অন্তর

বিপিন। বন্ধুছেন রসিকবাবু, আমি তাঁর গানের নির্বাচনচাতুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই গানের নির্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারি একটি সৌকুমার্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন, নির্বাচনের ক্ষমতাই ক্ষমতা। লতায় ফুল তো আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপুণ্য এবং সূরুচি তো তারই।

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে?

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।
নবীন তরী নতুন চলে,
দিই নি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।
ভেসেছিল স্রোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধরে—
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।

সদুখে ছিলাম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে, ছিলাম সেই আশায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

রসিক। যাক ডুবে, কী বলেন বিপিনবাবু।

বিপিন। যাক গে, কিন্তু কোথায় ডুবেল তার একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিকবাবু, এ গানটা কেন তিনি খাতায় লিখে রাখলেন।

রসিক। স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না। এই রকম একটা প্রবাদ আছে, রসিকবাবু তো তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্রবাবুর কাছে একবার যাও। বাস্তবিক, আমাদের কর্তব্যে আমরা ঢিল দিয়েছি—ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করলে উনি খুশি হবেন।

বিপিন। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই যে সেলাইয়ের কথা বলছিলেন—উনি বড়ি নিজের হাতে সমস্ত গৃহকর্ম করেন?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বড়ি সেদিন গিয়ে দেখলেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো পড়ে রয়েছে আর তিনি—

রসিক। মাথা নিচু করে ছুঁচে সদুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সদুতো পরাচ্ছিলেন। তখন স্নান করে এসেছেন বড়ি?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে। তিনি বড়ি তাঁর খাটের উপর বসে—

রসিক। না, খাটে নয়, বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে—

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছুঁচে সদুতো পরাচ্ছিলেন—

রসিক। হাঁ, ছুঁচে সদুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর তো পারা যায় না।

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—পা দুটি ছড়ানো, মাথা নিচু, খোলা চুল মদুখের উপর এসে পড়েছে, বিকেল বেলার আলো—

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান।

[শ্রীশের প্রস্থান]

রসিক। (স্বগত) আর কত বকব।

অন্য প্রান্তে

নির্মলা। (পূর্ণের প্রতি) আপনার শরীর আজ বড়ি তেমন ভালো নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে—হাঁ, একটু ইয়ে হয়েছে বটে, বিশেষ কিছু নয়—তবু একটু ইয়ে বৈকি—তেমন বেশ (কাশি)—আপনার শরীর বেশ ভালো আছে?

নির্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি—জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আপনি—আপনি—আপনার ইয়ে কিরকম বোধ হয়—ঐ যে—মিলটনের আরিয়োপ্যার্জটিকা—ওটা কিনা আমাদের এম.এ. কোর্সে আছে, ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না?

নির্মলা। আমি ওটা পড়ি নি।

পূর্ণ। পড়েন নি? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হয়েছে—আপনি—এবারে কিরকম গরম পড়ছে—আমি একবার রসিকবাবু—রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

[নির্মলার নিকট হইতে প্রস্থান]

ঘরের অন্যান্য

বিপিন। রসিকবাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, ও গানটা তিনি বিশেষ কিছুর মনে করে লিখেছেন।

রসিক। হতেও পারে। আপনি আমাকে সুস্থ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে। পূর্বে ওটা ভাবি নি।

বিপিন। তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়

কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

—আচ্ছা রসিকবাবু, এখানে তরী বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে।

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ঐ পাথরটা কোথায় আর পাষাণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) বিপিনবাবু, মাপ করবেন—রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে—যদি—

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্ছি।

[রসিকের নিকট হইতে প্রস্থান]

পূর্ণ। আমার মতো নির্বোধ জগতে নেই রসিকবাবু।

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জানে—যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরালো পাই যদি আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙে গেলে আজ রাতে একটু অবসর করতে পারেন?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে, গোলদিঘির ধারে—কী বলেন।

রসিক। (স্বগত) কী সর্বনাশ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ, পূর্ণবাবু কথা কচ্ছেন বুঝি! আচ্ছা, এখন থাক্। রাতে আপনার

স্বঃ

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মতো—কী বলেন। কাল দেখলেন তো ঘরের চেয়ে পথে জমে ভালো।

রসিক। জমে বৈকি। (স্বগত) সর্দি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জমে যায়।

[শ্রীশের প্রস্থান]

পূর্ণ। আচ্ছা রসিকবাবু, আপনি হলে কী বলে কথা আরম্ভ করতেন।

রসিক। হয়তো বলতুম—সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি।

পূর্ণ। তিনি যদি বলতেন, হাঁ—

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়েছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি, শরীরকে বন্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন—

পূর্ণ। বুঝেছি রসিকবাবু—চমৎকার—এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে, থাক্ তবে, আমাদের সেই যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাতে হবে, কী বলেন।

রসিক। সেই ভালো।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্য আরামে—কী বলেন।

রসিক। খুব আরাম। (স্বগত) কিন্তু বেয়ারামটা তার পরে।

অন্য

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ঐ বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারি আমি অল্প অল্প চর্চা করেছি—বেশি নয়—কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনি কি ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন।

নির্মলা। বেলুন?

পূর্ণ। হাঁ, ঐ বেলুন (সকলে নিরুত্তর)—রসিকবাবু বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমাকে মাপ করবেন—আপনাদের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলুম—আমি অত্যন্ত হতভাগ্য।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয় ও পূরবালা

অক্ষয়। দেবী, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন আছে।

পূরবালা। কী শুন।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গে কৃশতার তো কোনো লক্ষণ দেখছি নে!

পূরবালা। শ্রীঅঙ্গ তো কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিসটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেছে।

পূরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখছি।

অক্ষয়। হতে দিল কই। তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল—বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোনোমতেই বুঝতে দিলে না।

গান

বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ—

কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ।

ভেবেছিলুম অশ্রুজলে ডুবিব অকূল-তলে,

কাহার সোনার তরী করিল তারণ।

—প্রিয়ে, কাশীধামে বৃষ্টি পণ্ডশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না।

পূরবালা। তা হতে পারে, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁর যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে—কোম্পানির শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নূপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি।

অক্ষয়। এখন দিদি বৈ আর কথা নেই, অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদদহনে উত্তরোত্তর তপ্ত-

কাণ্ডনের মতো শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের ক'টিকে স্নান করিয়ে রেখেছিল কে।

নীরবালা। শুনছ দিদি। এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি, কেবল চিঠি লিখেছেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়েছেন। তুমি এসেছ, এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন—

নৃপবালা। দিদি, তুমিও তো ভাই, এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখ নি।

পদ্রবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই। মাকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বলতে 'তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম' তা হলে কি লোকে নিন্দে করত।

নীরবালা। তা হলে ভগ্নীপতির আশ্রয় আরো বেড়ে যেত। মুখুজেজমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও-না। দিদি এতদিন পরে এসেছেন, আমরা কি ঠুকে নিয়ে একটু গল্প করতে পার না।

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মৃদলধারাবর্ষণ-দ্বারা প্রিয়র চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জে আনন্দরূপ কিসলয়োদ্গম করে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ—

নীরবালা। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব—

শৈলবালার প্রবেশ

অক্ষয়। এসো এসো—উত্তমাদমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার—

নীরবালা। উত্তমমধ্যম হয় না।

শৈলবালা। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই, একটু যা তো, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কী বুদ্ধিতে পারছিস তো নীরু? হরিনাম-কথা নয়।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার আর বকতে হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান]

শৈলবালা। দিদি, নৃপ-নীরর জন্যে মা দুটি পাত্র তা হলে স্থির করেছেন?

পদ্রবালা। হাঁ, কথা এক রকম ঠিক হয়ে গেছে। শুনোছি ছেলে দুটি মন্দ নয়— তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈলবালা। যদি পছন্দ না করে?

পদ্রবালা। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দুটির অদৃষ্ট ভালো।

শৈলবালা। নৃপ নীরু যদি পছন্দ না করে?

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব।

পদ্রবালা। পছন্দ আবার না করবে কী? তোদের সব বাড়াবাড়ি, স্বয়ংবরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না। স্বামী হলেই তাকে ভালোবাসতে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্তমান ভগ্নীপতির কী দুর্দশাই হত শৈল!

জগন্নারিণীর প্রবেশ

জগন্নারিণী। বাবা অক্ষয়, ছেলে দুটিকে তা হলে তো খবর দিতে হয়। তারা তো আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ তো মা, রসিকদাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

জগন্নারিণী। পোড়া কপাল! তোমার রসিকদাদার ঘেরকম বুদ্ধি। তিনি কাকে আনতে কাকে আনবেন ঠিক নেই।

পদ্রবালা। তা মা, তুমি কিছুর ভেবো না। ছেলে দুটিকে আনবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগত্তারিণী। মা পুরী, তুই একটু মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যাভার করতে হয় না-হয় আমি কিছুই বুঝি নে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরীর হাতযশ আছে। পুরী তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে। আজকালকার ছেলে কী করে বশ করতে হয় সে বিদ্যো—

পুরবালা। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজকালকার ছেলে।

জগত্তারিণী। মা, তোমরা পরামর্শ করো। কায়েৎদিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় করে আসি।

শৈলবালা। মা, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো, ছেলে দুটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখে নি, হঠাৎ—

জগত্তারিণী। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল, আর বিবেচনা করতে পারি নে—

অক্ষয়। বিবেচনা সময়মত এর পর করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক।

জগত্তারিণী। বলো তো বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলো তো।

[প্রস্থান]

পুরবালা। মিথ্যে তুই ভাবছিছ শৈল—মা যখন মনস্থির করেছেন ঠুঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নিবন্ধ আমি মানি ভাই। যার সঙ্গে যার হবার, হাজার বিবেচনা করে মলেও সে হবেই।

অক্ষয়। সে তো ঠিক কথা—নইলে যার সঙ্গে যার হয়ে থাকে তার সঙ্গে না হয়ে আর-একজনের সঙ্গে হত।

পুরবালা। কী যে তর্ক কর তোমার অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তার কারণ আমি নিবোধ।

পুরবালা। যাও, এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠান্ডা করে এসো গে।

[প্রস্থান]

রসিকের প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, শুনছে তো সব? মূর্শকিলে পড়া গেছে।

রসিক। মূর্শকিল কিসের। কুমার-সভারও কোমার্য রয়ে গেল, নৃপ-নীরুও পার পেলে, সব দিক রক্ষা হল।

শৈলবালা। কোনো দিক রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্তত এই বড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে—দুটো অর্বাচীর সঙ্গে মিশে আমাদের রায়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লেথ আওড়াতে হবে না।

শৈলবালা। মূখুজ্জমশায়, তুমি না হলে রসিকদাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না—উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মানতেন সে বয়স পেরিয়েছে কিনা। তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করছে। আচ্ছা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। চলো তো রসিকদা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিপিনের বাসা

বিপিন ও গুরুদাস

তানপুরা হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেসরুরো গলায় সা রে গা মা সাধিতেছে

বিপিন। ভাই গুরুদাস, তুমি তো ওস্তাদ মানুষ, আমার এই উপকারটি তোমার করে দিতেই হবে। এই খাতার সব গানগুলিই তোমাকে সুন্দর বসিয়ে দিতে হবে। যেটা গাইলে ওটা খাসা হয়েছে। যদি কষ্ট না হয় তো আর-একবার—আগে ঐ গানের কথা দেখেই মজে গিয়েছিলুম, এখন দেখি কথাটি মানস-সরোবরের পশ্চিম, আর তার উপরে গানটি বসেছে যেন বীণাপাণি স্বয়ং। ভাই আর-একবার—

গুরুদাস।

গান

তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে।

জমল ধূলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে।

নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে। কাল্যারই গান বীণায় এনেছি সে,

দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে।

দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে।

মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে।

শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি, রঙিন পালে কবে আসবে তরী—

পাড়ি দেব কবে সুধারসের পারাবারে সুন্দর হে।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। একটি বাবু এসেছেন।

বিপিন। বাবু? কিরকম বাবু রে।

ভূত্য। বড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে?

ভূত্য। আছে।

বিপিন। (তানপুরা রাখিয়া) নিয়ে আর, এখনই নিয়ে আর। ওরে ওরে, তামাক দিয়ে যা। বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টানতে বলে দে। আর দেখ, চট করে গোটাকতক মিঠে পানের দোনা কিনে আন তো রে। দেরি করিস নে, আর আধ সের বরফ নিয়ে আসিস—বুঝেছিস?

[ভূত্যের প্রস্থান]

(পদশব্দ শুনিয়া) রসিকবাবু, আসুন।

বনমালীর প্রবেশ

বিপিন। রসিকবাবু—এ যে সেই বনমালী!

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য।

বিপিন। সে পরিচয় অনাবশ্যক। আমি একটু বিশেষ কাজে আছি।

বনমালী। মেয়ে দুটিকে আর রাখা যায় না—পাত্রও অনেক আসছে—

বিপিন। শুনেন খুশি হলেম—দিয়ে ফেলুন, দিয়ে ফেলুন—

বনমালী। কিন্তু আপনাদেরই ঠিক উপযুক্ত হত—

বিপিন। দেখুন বনমালীবাবু, এখনো আপনি আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি—যদি একবার পান তা হলে আমার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনার ভয়ানক সন্দেহ হবে।

বনমালী। তা হলে আমি উঠি, আপনি ব্যস্ত আছেন, আর-এক সময় আসব।
বিপিন। (তানপুঁরা তুলিয়া লইয়া) সারেগা রেগামা গামাপা—

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। কী হে বিপিন, একি। কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ? গুরুদাস যে?

বিপিন। ওস্তাদজি, আজ ছুটি। কী করব বলো, গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসী-দলে আমল পাওয়া যাবে না। গুরুদাসকে গুরু মেনেছি। ওর কাছে নবীনসন্ন্যাস-রতের দীক্ষা নিচ্ছি।

শ্রীশ। সে কিরকম।

বিপিন। রস ভরে উঠলে তবেই তো ত্যাগ সহজ হয়। মেঘ যখন জলে ভারী হয় তখনই জল বর্ষণ করে।

শ্রীশ। রাখো তোমার নতুন ফিলসফি, কুমার-সভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?

বিপিন। না ভাই, সেটাতে এখনো হাত দিতে পারি নি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাকি।

শ্রীশ। না, আমিও হাত দিই নি। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই, ভারি অন্যায় হচ্ছে। ক্রমেই আমরা আমাদের সংকল্প থেকে যেন দূরে চলে যাচ্ছি।

বিপিন। অনেক সংকল্প ব্যাঙাচির লেজের মতো, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্ধান করে। কিন্তু যদি লেজটুকুই থেকে যেত, আর ব্যাঙটা যেত শূন্যকিয়ে, সে কিরকম হত। এক সময়ে একটা সংকল্প করেছিলাম বলেই যে সেই সংকল্পের খাতিরে নিজেকে শূন্যকিয়ে মারতে হবে আমি তো তার মানে বুঝি নে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সংকল্প আছে যার কাছে নিজেকে শূন্যকিয়ে মারাও শ্রেয়। অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত পরিমাণ রসসঞ্চার হচ্ছে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি ভুল করেছিলাম ভাই বিপিন—সব বড়ো কাজেই তপস্যা চাই, নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আনতে পারলে, চিত্তকে কোনো মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না। এবার থেকে রসচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব, এই রকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু, সব তুণেই তো ধান ফলে না—শূন্যকোতে গেলে কেবল নাহক শূন্যকিয়ে মরাই হবে, ফল ফলবে না। কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করেছি সে সংকল্প আমাদের দ্বারা সফল হবে না—অতএব আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোনো রকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোনো কাজের কথা নয়। বিপিন তোমার তম্বুদুরা ফেলো—

বিপিন। আচ্ছা, ফেললাম, তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক—

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দুজনে মিলে রসিকবাবুকে একটু সংযত করে রাখব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেন।

গুরুদাস। সংযমচর্চা যদি আরম্ভ করেন তা হলে আমাকে আর দরকার নেই।

বিপিন। দরকার আরো বেশি। রৌদ্র যত প্রখর হবে, জলের প্রয়োজন ততই বাড়বে। এই দুঃসময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ করো না—সকাল-সন্ধ্যায় যেন দর্শন পাই। সেই গানটা যদি এর মধ্যে তৈরি হয়ে যায় তো আজ সন্ধ্যাবেলায়—কী বল?

গুরুদাস। আচ্ছা, তাই হবে।

[প্রস্থান]

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। একটি বড়ো বাবু এসেছেন।

বিপিন। বড়ো বাবু? জ্বালালে দেখছি। বনমালী আবার এসেছে।

শ্রীশ। বনমালী? সে যে এই খানিকক্ষণ হল আমার কাছেও এসেছিল।

বিপিন। ওরে, বড়োকে বিদায় করে দে।

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে আনুক, আমরা দুজনে মিলে বিদায় করে দিই। (ভূত্যের প্রতি) বড়োকে নিয়ে আয়।

[ভূত্যের প্রস্থান]

রসিকের প্রবেশ

বিপিন। একি। এ তো বনমালী নয়, এ যে রসিকবাবু।

রসিক। আজে হাঁ—আপনাদের আশ্চর্য চেনবার শক্তি—আমি বনমালী নই। ‘ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—’

শ্রীশ। না রসিকবাবু, ও-সব নয়, রসলাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

রসিক। আঃ, বাঁচিয়েছেন।

শ্রীশ। অন্য সকল-প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্তমনে কুমার-সভার কাজে লাগব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী বলে একজন বড়ো, কুমোরটুলির নীলমাধব চৌধুরীর দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, আমরা তাকে সংক্ষেপে বিদায় করে দিয়েছি—এ-সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসংগত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত।

বিপিন। রসিকবাবু, কিছু জলযোগ করে যেতে হবে।

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দুটো-একটা বিশেষ কথা ছিল, কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনেনে সাহস হচ্ছে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না না, তাই বলে কথা থাকলে বলবেন না কেন।

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ংকর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সঙ্গে।

বিপিন। না, সেদিন যে রসিকবাবু বলছিলেন আমারই সঙ্গে গুর দুটো-একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই, থাক্।

শ্রীশ। বলেন তো আজ রাতে গোলদিঘির ধারে—

রসিক। না শ্রীশবাবু, মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও ঘরে যাও-না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিকবাবু—

রসিক। না না, দরকার কী—

বিপিন। তার চেয়ে রসিকবাবু, তেতালার ঘরে চলুন—শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা করবেন এখন।

রসিক। না, আপনারা দুজনেই বসুন, আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়। কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না, আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে। সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা নীরবালার কথা তো পূর্বেই আপনারা শুনেনে—

শ্রীশ। শুনোছি বৈকি—তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু—

বিপিন। নীরবালার কোনো বিশেষ সংবাদ—

রসিক। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় তো?

রসিক। তার চেয়ে বেশি। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ—

শ্রীশ। বলেন কী রসিকবাবু। বিবাহের তো কোনো কথা শোনা যায় নি—

রসিক। কিছন্ন না—হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দুটো অকালকুস্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে দুটির বিবাহ স্থির করেছেন—

বিপিন। এ তো কিছন্নতেই হতে পারে না রসিকবাবু।

রসিক। মশায়, পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশি। ফুলগাছের চেয়ে আগাছাই বেশি সম্ভবপর।

বিপিন। কিন্তু মশায়, আগাছা উৎপাটন করতে হবে—

শ্রীশ। ফুলগাছ রোপণ করতে হবে—

রসিক। তা তো বটেই, কিন্তু করে কে মশায়।

শ্রীশ। আমরা করব। কী বল বিপিন।

বিপিন। নিশ্চয়ই।

রসিক। কিন্তু, কী করবেন।

বিপিন। যদি বলেন তো সেই ছেলে দুটোকে পথের মধ্যে—

রসিক। বুদ্ধোচ্ছিন্ন, সেটা মনে করলেও শরীর পলকিত হয়। কিন্তু, বিধাতার বরে অপাত্ত জিনিসটা অমর—দুটো গেলে আবার দশটা আসবে।

বিপিন। এদের দুটোকে যদি ছলে বলে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি তা হলে ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

রসিক। ভাববার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই শুক্রবারে তারা মেয়ে দেখতে আসবে।

বিপিন। এই শুক্রবারে?

শ্রীশ। সে তো পরশু।

রসিক। আজ্ঞে, পরশুই তো বটে। শুক্রবারকে তো পথের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শ্রীশ। আচ্ছা, আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

রসিক। কিরকম শুন।

শ্রীশ। সেই ছেলে দুটোকে বাড়ির কেউ চেনে?

রসিক। কেউ না।

শ্রীশ। তারা বাড়ি চেনে?

রসিক। তাও না।

শ্রীশ। তা হলে বিপিন যদি সেদিন তাদের কোনো রকম করে আটকে রাখতে পারে তো আমি তাদের নাম নিয়ে নৃপবালাকে—

বিপিন। জানই তো ভাই, আমার কোনো রকম কৌশল মাথায় আসে না। তুমি ইচ্ছে করলে কৌশলে ছেলে দুটোকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে—আমি বরঞ্চ নিজেকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে নীরবালাকে—

রসিক। কিন্তু মশায়, এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না। দুটি ছেলে আসবার কথা আছে, আপনাদের একজনকে দুজন বলে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে—

শ্রীশ। ও, তা বটে।

বিপিন। হাঁ, সে কথা ভুলেছিলাম।

শ্রীশ। তা হলে তো আমাদের দুজনকেই যেতে হয়। কিন্তু—

রসিক। সে দুটোকে ভুল রাস্তায় চালান করে দিতে আমিই পারব। কিন্তু, আপনারা—

বিপিন। আমাদের জন্যে ভাববেন না রসিকবাবু।

শ্রীশ। আমরা সব-তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। আপনারা মহৎ লোক, এরকম ত্যাগস্বীকার—

শ্রীশ। বিলক্ষণ! এর মধ্যে ত্যাগস্বীকার কিছুই নেই।

বিপিন। এ তো আনন্দের কথা।

রসিক। না না, তবু তো মনে আশঙ্কা হতে পারে যে, কী জানি নিজের ফাঁদে যদি নিজেই পড়তে হয়।

শ্রীশ। কিছু না মশায়, কোনো আশঙ্কায় ডরাই নে।

বিপিন। আমাদের যাই ঘটুক তাতেই আমরা সুখী হব।

রসিক। এ তো আপনাদের মহত্বের কথা, কিন্তু আমার কর্তব্য আপনাদের রক্ষা করা। তা, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি—এই শুক্রবারের দিনটা আপনারা কোনোমতে উদ্ধার করে দিন, তার পরে কখনো আপনাদের আর বিরক্ত করব না।

শ্রীশ। আমাদের বিরক্ত করবেন না এই কথা শুনে দর্পিত হলেম রসিকবাবু।

রসিক। আচ্ছা, করব।

বিপিন। আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জন্যেই কেবল ব্যস্ত। আমাদের এতই স্বার্থপর মনে করেন?

রসিক। মাপ করবেন—আমার ভুল ধারণা ছিল।

শ্রীশ। আপনি যাই বলুন, ফস্ করে ভালো পাত্র পাওয়া বড়ো শক্ত।

রসিক। সেইজন্যেই তো এতদিন অপেক্ষা করে শেষে এই বিপদ। বিবাহের প্রসঙ্গমাত্রই আপনাদের কাছে অপ্রিয়, তবু দেখুন আপনাদের সুন্দর—

বিপিন। সেজন্যে কিছু সংকোচ করবেন না—

শ্রীশ। আপনি যে আর-কারণও কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, সেজন্যে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না। সেই কন্যা দুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে, পাখাটা টান্।

শ্রীশ। রসিকবাবুর জন্যে জলখাবার আনাবে বলেছিলে—

বিপিন। সে এল বলে। ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান—

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না। (পকেট হাতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন রসিকবাবু, পান খান।

বিপিন। ও দিকে হাওয়া পাচ্ছেন? এই তাকিয়াটি নিন-না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, নৃপবালা বদ্বি খুব বিষয় হয়ে পড়েছেন—

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব—

রসিক। সে আর বলতে।

শ্রীশ। নৃপবালা বদ্বি কান্নাকাটি করছেন?

বিপিন। আচ্ছা, নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভালো করে বদ্বিয়ে বলেন না—

রসিক। (স্বগত) ঐ রে, শূরু হল! আমার লেমনেডে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায় কিন্তু এখনই উঠতে হচ্ছে।

শ্রীশ। বলেন কী।

বিপিন। সে কি হয়।

রসিক। সেই ছেলে দুটোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আসতে হবে, নইলে—

শ্রীশ। বদ্বি, তা হলে এখনই যান।

বিপিন। তা হলে আর দেরি করবেন না।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি

নির্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। (স্বগত) বেচারী নির্মলা বড়ো কঠিন রূত গ্রহণ করেছে। আমি দেখছি কদিন ধরে ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। স্ত্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে। (প্রকাশ্যে) নির্মলা।

নির্মলা। (চমকিয়া) কী মামা।

চন্দ্রবাবু। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবছ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দুই-একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলাম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই কদিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিণে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি নে—ভারি অন্যায় হচ্ছে, আজ আমি যেমন করে হোক—

চন্দ্রবাবু। না না, জোর করে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্মলা, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই-একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে—

নির্মলা। অবলাকান্তবাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেছেন—আমি তাঁকে রোগী-শুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরাজি বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেছেন। বোধ হয় এখনই পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্রবাবু। ঐ ছেলেটি বড়ো ভালো—

নির্মলা। খুব ভালো—চমৎকার—

চন্দ্রবাবু। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্যতৎপরতা—

নির্মলা। আর, এমন সুন্দর ন্যূনস্বভাব—

চন্দ্রবাবু। ভালো প্রস্তাবমাগ্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

নির্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখবামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য মূখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্রবাবু। এত অল্প কালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করি নি। আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকল প্রকার লেখাপড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি।

নির্মলা। তা হলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি। আচ্ছা, এরকম প্রস্তাব করে একবার দেখেই-না। ঐ যে বেহারা আসছে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এই দিকে নিয়ে আস।

বেহারার প্রবেশ

ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি প্রদান

মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও।

চন্দ্রবাবু। না ফেরি, এটা আমার চিঠি।

নির্মলা। তোমার চিঠি? অবলাকান্তবাবু বুঝি তোমাকেই লিখেছেন? কী লিখেছেন।

চন্দ্রবাবু। না, এটা পূর্ণের লেখা।

নির্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণ লিখেছেন—‘গুরুদেব, আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য; আপনার

মতো বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।’

নির্মলা। হয়েছে কী। বোধ হয় পূর্ণবাবু চিরকুমার-সভা ছেড়ে দেবেন, তাই এত ভূমিকা করছেন। লক্ষ্য করে দেখেছি বোধ হয়, পূর্ণবাবু আজকাল কুমার-সভার কোনো কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্রবাবু। ‘দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়েছেন তাহা অত্যাচ্ছ, যে উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়েছেন তাহা গুরুভার—সে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা চরণসমীপে সর্বিনয়ে স্বীকার করিতেছি।’

নির্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড়ো কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে, শ্রান্ত মন এক-একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে কি বরাবর থাকে।

চন্দ্রবাবু। ‘সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্যে হাত দিতে যাই তখন সহসা নিজেকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।’—নির্মল, আমরা তো ঠিক এই কথাই বলছিলাম।

নির্মলা। পূর্ণবাবু যা লিখেছেন সেটা সত্য—মানুষের সংগ না হলে কেবলমাত্র সংকল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্রবাবু। ‘আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া এ কথা স্থির বুদ্ধিয়াছি, কুমাররত সাধারণ লোকের জন্য নহে—তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত—তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।’ তোমার কী মনে হয় নির্মল। (নির্মলা নিরুত্তর) অক্ষয়বাবুও এই কথা নিয়ে সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন, তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি নি।

নির্মলা। তা, হতে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্রবাবু। ‘গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।’

নির্মলা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাবু বেশ বলেছেন।

চন্দ্রবাবু। আমিও কিছুদিন থেকে মনে করছিলাম কুমাররত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব।

নির্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। কী বল মামা। অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন। অবলাকান্তবাবু, শ্রীশবাবু—

চন্দ্রবাবু। আপত্তির কোনো কারণ নেই।

নির্মলা। তবু একবার অবলাকান্তবাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্রবাবু। মত তো নিতেই হবে।

(পত্রপাঠ) ‘এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।’

নির্মলা। মামা, পূর্ণবাবু হয়তো কোনো গোপনীয় কথা লিখছেন, তুমি চেষ্টা করে পড়ছ কেন।

চন্দ্রবাবু। ঠিক বলেছি ফেনি। (আপন মনে পাঠ) কী আশ্চর্য, আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ। এতদিন তো আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। নির্মল, পূর্ণবাবুর কোনো ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে—

নির্মলা। হাঁ, পূর্ণবাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্বোধের মতো ঠেকেছিল।

চন্দ্রবাবু। অথচ পূর্ণবাবু খুব বুদ্ধিমান। তা হলে তোমাকে খুলে বলি—পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন—

নির্মলা। তুমি তো তাঁর অভিভাবক নও, তোমার কাছে প্রস্তাব—

চন্দ্রবাবু। আমি যে তোমার অভিভাবক, এই পড়ে দেখো—

নির্মলা। (পদ পড়িয়া রক্তিমমুখে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্রবাবু। আমি তাঁকে কী বলব।

নির্মলা। বোলো, কোনোমতে হতেই পারে না।

চন্দ্রবাবু। কেন নির্মল, তুমি তো বলছিলে কুমারব্রত-পালনের নিয়ম সভা হতে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু তো যে-সে নয়, অমন ভালো ছেলে—

নির্মলা। মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না—আমার কাজ আছে।

[প্রস্থানোদ্যম]

মামা, তোমার পকেটে ওটা কী উঁচু হয়ে আছে।

চন্দ্রবাবু। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ, ভুলে গিয়েছিলেম, বেহারা আজ সকালে তোমার নামে লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে—

নির্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখো দেখি মামা, কী অন্যায়, অবলাকান্তবাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে, আমাকে দাও নি! আমি ভাবিছিলেম তিনি হয়তো ভুলেই গেছেন। ভারি অন্যায়।

চন্দ্রবাবু। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু, এর চেয়ে ঢের বেশি অন্যায় ভুল আমি প্রতিদিনই করে থাকি ফেনি—তুমিই তো আমাকে প্রত্যেক বার মাপ করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্মলা। না, ঠিক অন্যায় নয়—আমিই অবলাকান্তবাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায় করছিলাম, ভাবিছিলেম—এই-যে, রসিকবাবু আসছেন। আসুন রসিকবাবু, মামা এইখানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। এই যে, রসিকবাবু এসেছেন ভালোই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভালো হয় চন্দ্রবাবু, তা হলে আপনাদের পক্ষে ভালো অত্যন্ত সুন্দর। যখনই বলবেন তখনই আসব, না বললেও আসতে রাজি আছি।

চন্দ্রবাবু। আমরা মনে করছি আমাদের সভা থেকে চরকুমারব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব—আপনি কী পরামর্শ দেন।

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারব, কারণ, এ ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দুই সমান। আমার পরামর্শ এই যে, উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোন্‌দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, বাবা-সকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব। স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছিল।

চন্দ্রবাবু। ঠিক বলেছেন রসিকবাবু, যে-জিনিস বলপূর্বক আসবেই তাকে বলপ্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভালো। আসছে রবিবারের পূর্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

রসিক। আচ্ছা, শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন, আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্রবাবু। রসিকবাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হলে আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে—

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে, কিন্তু সময় খুব যে বেশি—

নির্মলা। না রসিকবাবু, আপনি ও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ করো, আমরা থাকলে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তা হলে চলুন।

নির্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্তবাবু আমাকে তাঁর সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন— আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সেজন্যে আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থ।

চতুর্থ দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

জগন্নারিণী, পুরবালা ও অক্ষয়

জগন্নারিণী। বাবা অক্ষয়, দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি। নেপো বসে বসে কাঁদছে; নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনোমতেই বেরোবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনই আসবে, তাদের এখন কী বলে ফেরাব। তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমিই ওদের সামলাও।

[প্রস্থান]

পুরবালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক হয়ে গেছি, ওরা কি মনে করেছে ওরা—

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর-কাউকে ওরা পছন্দ করেছে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারই মতো।

পুরবালা। ঠাট্টা রাখো, এখন ঠাট্টার সময় নয়। তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কিনা বলো। তুমি না বললে ওরা শুনবে না।

অক্ষয়। এত অনুগত! একেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শ্যালী। আচ্ছা, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও—দেখি।

[পুরবালার প্রস্থান]

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। না, মুখুজেমশায়, সে কোনোমতেই হবে না।

নৃপবালা। মুখুজেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের যার-তার সামনে ওরকম করে বের কোরো না।

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হলে একজন বলেছিল আমাকে বেশি উঁচুতে চড়িয়ে না, আমার মাথা ঘোরা ব্যামো আছে। তাদের যে তাই হল। বিয়ে করতে যাচ্ছি, এখন দেখা দিতে লজ্জা করলে চলবে কেন।

নীরবালা। কে বললে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু হৃদয় দুর্বল এবং দৈব বলবান, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়—

নীরবালা। না, ভঙ্গ হবে না।

অক্ষয়। হবে না তো? তবে নির্ভয়ে এসো; যুবক দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও—হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে মরে থাকুক।

নীরবালা। অকারণে প্রাণীহত্যা করবার জন্যে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কী দয়া! কিন্তু, সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দরকার কী। তোদের মা দিদি যখন ধরে পড়েছেন এবং ভদ্রলোক দুটি যখন গাড়িভাড়া করে আসছে তখন একবার মিনিট-পাঁচেকের মতো দেখা দিস, তার পরে আমি আছি—তোদের অনিচ্ছায় কোনোমতেই বিবাহ দিতে দেব না।

নীরবালা। কোনোমতেই না?

অক্ষয়। কোনোমতেই না।

পদুরবালার প্রবেশ

পদুরবালা। আয়, তোদের সাজিয়ে দিই গে।

নীরবালা। আমরা সাজব না।

পদুরবালা। ভদ্রলোকদের সামনে এই রকম বেশেই বেরোবি! লজ্জা করবে না!

নীরবালা। লজ্জা করবে বৈকি দিদি, কিন্তু সেজে বেরোতে আরো বেশি লজ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনীবেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন, শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল—কালিদাস বলেন, সেও কিছুর আঁট হয়ে পড়েছিল—তোমার বোনেরা সেই-সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সাজতে চায় না।

পদুরবালা। সে-সব হল সত্যযুগের কথা। কালকালের দুষ্মন্ত মহারাজার সাজ-সজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা—

পদুরবালা। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে, মা বন্ধু আমাকে সাজিয়ে দেন নি?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্যে না জানি কত শোভা হবে।

পদুরবালা। আচ্ছা, তুমি থামো। নীরু, আয়।

নীরবালা। না ভাই দিদি—

পদুরবালা। আচ্ছা, সাজ নাই করলি, চুল তো বাঁধতে হবে?

অক্ষয়।

গান

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুদ্ধ শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।
আকুল আঁচলে পৃথকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো।

পদুরবালা। তুমি আবার গান ধরলে! আমি কখন কী করি বলো দেখি। তাদের আসবার সময় হল—এখনো আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে।

[নূপবালা ও নীরবালাকে লইয়া প্রস্থান]

রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধের সমস্তই প্রস্তুত?

রসিক। সমস্তই। বীরপুরুষ দুটিও সমাগত।

অক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র দুটি সাজতে গেছেন। তুমি তা হলে সেনাপতির ভার গ্রহণ করো, আমি একটু অন্তরালে থাকতে ইচ্ছা করি।

রসিক। আমিও প্রথমটা একটু আড়াল হই।

[রসিক ও অক্ষয়ের প্রস্থান]

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। বিপিন, তুমি তো আজকাল সংগীতবিদ্যার উপর চীৎকারশব্দে ডাকাতি আরম্ভ করেছ—কিছু আদায় করতে পারলে?

বিপিন। কিছু না। সংগীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তসদর অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোকবার জো আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হল।

শ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সদর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়ছিলাম—

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে।
চলে যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে।

—মনে হচ্ছিল এর সদরটা যেন জানি, কিন্তু গাবার জো নেই।

বিপিন। জিনিসটা মন্দ নয় হে—তোমার কবি লেখে ভালো। ওহে, ওর পরে আর-কিছু নেই? যদি শুরুর করলে তবে শেষ করো।

শ্রীশ।
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া
যেতে হয় যদি চলো নিরবধি
সেই ফুলবন তলাশিয়া।

বিপিন। বাঃ, বেশ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্ফের কাছে তুমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছ।

শ্রীশ। সেই যে সেদিন যে বইটাতে নাম লেখা দেখেছিলাম সেইটে—

বিপিন। না ভাই, আজ ও-সব নয়।

শ্রীশ। কী-সব নয়।

বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোনো রকম—

শ্রীশ। কী আশ্চর্য বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে আমি কি এমন কোনো আলোচনা করতে পারি যাতে—

বিপিন। রাগ কোরো না ভাই—আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি, এই ঘরেই আমি অনেক সময় রসিকবাবুর সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে যে ভাবে আলাপ করেছি, আজ সে ভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে—বুঝছ না—

শ্রীশ। কেন বুঝব না। আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখবার ইচ্ছে করেছিলাম মাত্র—একটি কথাও উচ্চারণ করতুম না—

বিপিন। না, আজ তাও না। আজ তাঁরা আমাদের সম্মুখে বেরোবেন, আজ আমরা যেন তার যোগ্য থাকতে পারি।

শ্রীশ। বিপিন, তোমার সঙ্গে—

বিপিন। না ভাই, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, আমি হারলুম—কিন্তু বইটা রাখো।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। এই যে, আপনারা এসে একলা বসে আছেন—কিছু মনে করবেন না—

শ্রীশ। কিছু না। এই ঘরটি আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে নিয়েছিল।

রসিক। আপনাদের কত কষ্টই দেওয়া গেল।

শ্রীশ। কষ্ট আর দিতে পারলেন কই। একটা কষ্টের মতো কষ্ট স্বীকার করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতুম।

রসিক। যা হোক, অল্পক্ষণের মধ্যে চুকে যাবে এই এক সুবিধে। তার পরেই আপনারা স্বাধীন। ভেবে দেখুন দেখি, যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত তা হলেই ‘পরিণামে বন্ধনভয়ম্’। বিবাহ জিনিসটা মিষ্টান্ন দিয়েই শুরু হয়, কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না। আচ্ছা, আজ আপনারা দুঃখিতভাবে এরকম চুপচাপ করে বসে আছেন কেন বলুন দেখি। আমি বলছি, আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা বনের বিহঙ্গ, দুটিখানি সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন—কেউ আপনাদের বাঁধবে না! নাহ ব্যাধশরাঃ পতন্তি পরিতো নৈবাত্র দাবানলঃ।—দাবানলের পরিবর্তে ডাবের জল পাবেন।

শ্রীশ। আমাদের সে দুঃখ নয় রসিকবাবু, আমরা ভাবছি—আমাদের দ্বারা কতটুকু উপকারই বা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা তো দূর করতে পারছি নে।

রসিক। বিলক্ষণ! যা করছেন তাতে আপনারা দুটি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ করছেন—অথচ নিজেরা কোনো প্রকার পাশেই বন্ধ হচ্ছেন না।

জগন্তারিণী। (নেপথ্যে মৃদুস্বরে) আঃ, নেপো কী ছেলেমানুষি করছি। শিগ্গির চোখের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা, লক্ষ্মী মা আমার—কেঁদে চোখ লাল করলে কী রকম ছিঁরি হবে ভেবে দেখ্ দেখি। নীরো, যা-না। তাদের সঙ্গে আর পারি নে বাপু। ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখি। কী মনে করবেন।

শ্রীশ। ঐ শুনছেন রসিকবাবু? এ অসহ্য। এর চেয়ে রাজপুত্রদের কন্যাহত্যা ভালো।

বিপিন। রসিকবাবু, এঁদের এই সংকট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যে আপনি আমাদের যা বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। কিছু না, আপনাদের আর অধিক কষ্ট দেব না। কেবল আজকের দিনটা উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান, তার পরে আপনাদের আর-কিছুই ভাবতে হবে না।

শ্রীশ। ভাবতে হবে না? কী বলেন রসিকবাবু। আমরা কি পাষণ। আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এঁদের জন্যে ভাববার অধিকার পাব।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এঁদের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপুরুষ।

শ্রীশ। এখন থেকে এঁদের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয়—গৌরবের বিষয়।

রসিক। তা বেশ, ভাববেন, কিন্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর-কোনো কষ্ট করতে হবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্ছে কেন।

বিপিন। এঁদের জন্যে যদিই আমাদের কোনো কষ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দু দিন ধরে, রসিকবাবু, বেশি কষ্ট পেতে হবে না বলে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন—এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ করবেন—আমি আর কখনো এমন অবিবেচনার কাজ করব না। আপনারা কষ্ট স্বীকার করবেন।

শ্রীশ। আপনি কি এখনো আমাদের চিনলেন না।

রসিক। চিনেছি বৈকি, সেজন্যে আপনারা কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিকবাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দৃঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না, সেজন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে—

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের অপরাধ আরো বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স, মান্য অতিথিদের কিরকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তা হলে আপনাদের প্রতি অসম্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরো লজ্জিত করবেন না। নৃপদিদি, নীরদিদি, কী বল ভাই। যদিও এখনো তোমাদের চোখের পাতা শুকোয় নি তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি।

নৃপ ও নীর, লজ্জিত নিরন্তর

না, একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনান্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কী বলি বলো তো ভাই। বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও।

নীরবালা। (মৃদুস্বরে) রসিকদাদা, কী বক তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি— আমরা কি জানতুম এঁরা এসেছেন।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন—

সখা, কী মোর করমে লেখি—
তাপন বলিয়া তপনে ডরিনু,
চাঁদের কিরণ দেখি।

—এর উপরে আপনাদের আর-কিছু বলবার আছে?

নীরবালা। (জনান্তিকে) আঃ রসিকদাদা, কী বলছ তার ঠিক নেই। ও কথা আমরা কখন বললুম।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারি নি বলে এঁরা আমাকে ভৎসনা করছেন। এঁরা বলতে চান চাঁদের কিরণ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না— তার চেয়ে আরো যদি—

নীরবালা। (জনান্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব।

রসিক। সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসংকারম্ অতিথির্বিশেষম্ উজ্জ্বিত্বা দ্বচ্ছন্দতো গমনম্। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এঁরা লজ্জায় এ ঘর থেকে চলে যাবেন।

[নীরবালা ও নৃপবালার প্রস্থানোদ্যম]

শ্রীশ। রসিকবাবুর অপরাধে আপনারা নির্দোষদের সাজা দেবেন কেন। আমরা তো কোনো প্রকার প্রগল্ভতা করি নি।

নৃপবালা ও নীরবালার 'ন যযৌ ন তস্থ্য' ভাব

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্বকৃত কোনো অপরাধ যদি থাকে তো ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না।

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বোচারা অনেক দিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা করছে।

নীরবালা। (জনান্তিকে) অপরাধ কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে যাব।

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বলছেন আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষ্যই করেন নি। কিন্তু, আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতাম তবে সেটা অপরাধ হত—আইনের বিশেষ ধারায় এই রকম লিখছে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাবু। আপনারা সর্বদাই অপরাধ করবার সুযোগ পান এবং সেজন্যে দণ্ডভোগ করে কৃতার্থ হন। আমি দৈবক্রমে একটা অপরাধ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু এতই অধম যে দণ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না।

রসিক। বিপিনবাবু, একেবারে হতাশ হবেন না। শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে, কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্ করে মৃদুস্তি না পেতেও পারেন।

ভূতের প্রবেশ

ভূত্য। জলখাবার তৈরি।

[নৃপবালা ও নীরবালার প্রস্থান]

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছি রসিকবাবু। জলখাবারের জন্যে এত তাড়া কেন।

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেঁদে) কিন্তু সমাপনটা তো মধুর নয়। (জনান্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এদের তো প্রতারণা করে যেতে পারব না।

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড।

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্তব্য কী।

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে।

রসিক। আপনারা দেখছি ভয় পেয়ে গেছেন। কোনো আশঙ্কা নেই, শেষকালে যেমন করেই হোক আমি আপনাদের উদ্ধার করবই।

শ্রীশ ও বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল

ঘরের অন্য দিকে অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। দেখলে তো বাবা, কেমন ছেলে দুটি?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভালো, এ কথা তো আমি অস্বীকার করতে পারি নে।

জগত্তারিণী। মেয়েদের রকম দেখলে তো বাবা? এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। ঐ তো ওদের দোষ। কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্বাদ করে ছেলে দুটিকে দেখতে হচ্ছে।

জগত্তারিণী। সে কি ভালো হবে অক্ষয়। ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে।

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্বাদ করে গেলেই চটপট স্থির হয়ে যায়।

জগত্তারিণী। তা বেশ, তোমরা যদি বল, তা যাব, আমি ওদের মা'র বয়সী—আমার নাজি কিসের।

পদ্রবালার প্রবেশ

জগত্তারিণী। কী আর বলব পদ্রো, এমন সোনার চাঁদ ছেলে।

পদ্রবাল। তা জানতুম। নীর-নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে।

অক্ষয়। তাদের বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর-কি।

পূরবালা। আচ্ছা, থামো। যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করো গে, কিন্তু শৈল গেল কোথায়।

অক্ষয়। সে খুঁশি হয়ে দরজা বন্ধ করে পূজোয় বসেছে।

শ্রীশ ও বিপিনের নিকট আসিয়া

ব্যাপারটা কী। রসিকদা, আজকাল তো খুব খাওয়াচ্ছ দেখছি। প্রত্যহ যাকে দু বেলা দেখছ তাকে হঠাৎ ভুলে গেলে?

রসিক। এঁদের নতুন আদর, পাতে যা পড়ছে তাতেই খুঁশি হচ্ছেন। তোমার আদর পুরোনো হয়ে এল, তোমাকে নতুন করে খুঁশি করি এমন সাধ্য নেই ভাই।

অক্ষয়। কিন্তু শুনোছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এ পরিবারের সমস্ত অনান্বাদিত মধু উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে—এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাত্তে নাকি। ওহে রসিকদা, ভুল কর নি তো?

রসিক। ভুলের জন্যেই তো আমি বিখ্যাত। বড়োমা জানেন তাঁর বড়ো রসিকবাবু যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কী রসিকদাদা। করেছে কী। সে দুটি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাঁদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি।

অক্ষয়। সে বেচারাদের কী গতি হবে।

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরীর বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করেছেন। বনমালী ভট্টাচার্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বদ্বলদম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকম হবে। এইবেলা ভ্রম সংশোধন করে নাও। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু, কিছু মনে কোরো না—এর মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরলপ্রকৃতি রসিকবাবু সে রহস্য আমাদের নিকট ভেদ করেই দিয়েছেন। আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি।

বিপিন। মিষ্টান্নের থালায় আমরা অনধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কী বিপিনবাবু। তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে এসেছ? জেনেশুনে, ইচ্ছাপূর্বক?

রসিক। না না, তুমি ভুল করছ অক্ষয়।

অক্ষয়। আবার ভুল? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল নাকি।

গান

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়।

ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে

ফুলে ফুলে হোক ফুলময়।

আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে উছলিয়া হোক কুলময়।

রসিক। এ কী, বড়োমা আসছেন যে!

অক্ষয়। আসবারই তো কথা। উনি তো কুমারটুলির ঠিকানায় যাবেন না।

জগন্নারায়ণীর প্রবেশ

শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

দুইজনকে দুই মোহর দিয়া জগন্নারায়ণীর আশীর্বাদ। জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগন্নারায়ণীর আলাপ

অক্ষয়। মা বলছেন, তোমাদের আজ ভালো করে খাওয়া হল না, সমস্তই পাতে পড়ে রইল।

শ্রীশ। আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি।

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে ওটা তৃতীয় কিস্তি।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত।

জগন্তারিণী। (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা গুঁদের বসিয়ে কথাবার্তা কও বাছা, আমি আসি।

[প্রস্থান

রসিক। না, এ ভারি অন্যায় হল।

অক্ষয়। অন্যায়টা কী হল।

রসিক। আমি গুঁদের বার বার করে বলে এসেছি যে, গুঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছুটি পাবেন, কোনো রকম বধবন্ধনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু—

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিস্তুটা কোথায় রসিকবাবু। আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন—

বিপিন। তা বেশ তো, এমনিই কী মহাবিপদে ফেলেছেন।

শ্রীশ। মা আমাদের যে আশীর্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই।

রসিক। না না, শ্রীশবাবু, সে কোনো কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদ্রতার খাতিরে—

বিপিন। রসিকবাবু, আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না—দায়ে পড়ে—

রসিক। দায় নয় তো কী মশায়। সে কিছুতেই হবে না। আমি বরঞ্চ সেই ছেলে দুটোকে বনমালীর হাত ছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনো ফিরিয়ে আনব, তবু—

শ্রীশ। আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি রসিকবাবু।

রসিক। না না, এ তো অপরাধের কথা হচ্ছে না। আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন—আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে—

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এটুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না—এমনি হিতৈষী বন্ধু!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সৌভাগ্য বলে স্বীকার করছি, আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করছেন কেন।

রসিক। শেষকালে আমাকে দোষ দেবেন না।

বিপিন। নিশ্চয় দেব, যদি না আপনি স্থির হয়ে শূভকর্মে সহায়তা করেন।

রসিক। আমি এখনো সাবধান করছি—

গতং তদ্গাম্ভীৰ্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ
সখে হংসোত্তিষ্ঠ স্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ।

সে গাম্ভীৰ্য গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস, ওঠো ওঠো, সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে।

শ্রীশ। কিছুতেই না। তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুড়ে মারলেও সখা হংসরা কিছুতেই এখান থেকে নড়ছেন না।

রসিক। স্থান খারাপ বটে, নড়বার জো নেই। আমি তো অচল হয়ে বসে আছি—হায় হায়—

অগ্নি কুরঙ্গ তপোবনবিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপদুরীমিমাম্।

ভূতের প্রবেশ

ভূত। চন্দ্রবাবু এসেছেন।

অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

[ভূতের প্রস্থান

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর দুটিকে সমর্পণ করে দেওয়া হোক।

চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। এই-যে, আপনারা এসেছেন। পূর্ণবাবুকেও দেখাছি।

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তবু অক্ষয় বটে।

চন্দ্রবাবু। অক্ষয়বাবু! তা, বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল।

অক্ষয়। আমার মতো অদরকারি লোককে যে-দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি—বলুন কী করতে হবে।

চন্দ্রবাবু। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে রাখা হচ্ছে। শ্রীশবাবু বিপিনবাবুকে এই কথাটা একটু ভালো করে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারি কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কিনা সন্দেহ।

চন্দ্রবাবু। একবার একটা মতকে ভালো ব'লে গ্রহণ করেছি ব'লেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়ো। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু—

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য—

চন্দ্রবাবু। কেন বাহুল্য। আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত করবেন না?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে—

চন্দ্রবাবু। আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনো সেই মতেই—

রসিক। এই-যে পূর্ণবাবু আসছেন। আসুন আসুন।

পূর্ণের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমারব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। কিন্তু, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এখন তাঁদের বোঝাতে পারলেই—

রসিক। তাঁদের বোঝাতে আমি ব্রুটি করি নি চন্দ্রবাবু—

চন্দ্রবাবু। আপনার মতো বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে—

রসিক। ফল যা পেয়েছি তা 'ফলেন পরিচীয়ে'।

চন্দ্রবাবু। কী বলছেন ভালো বুঝতে পারছি নে।

অক্ষয়। ওহে রসিকদা, চন্দ্রবাবুকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আমি দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই এনে উপস্থিত করছি।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ভালো আছেন তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে।

পূর্ণ। না, কিছু না।

শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর তো দেরি নেই।

পূর্ণ। না।

নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (নৃপবালা ও নীরবালার প্রতি) ইনি চন্দ্রবাবু, ইনি তোমাদের গুরুজন, এঁকে প্রণাম করো। (নৃপ ও নীরব প্রণাম) চন্দ্রবাবু, নতুন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দুটি সভ্য বাড়ল।

চন্দ্রবাবু। বড়ো খুশি হলেম। এঁরা কে।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এঁরা আমার দুটি শ্যালী। শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরো ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রতি দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিকবাবু এই যুবক দুটির যে মতের পরিবর্তন করিয়েছেন সে কেবলমাত্র বাণিমতার দ্বারা নয়।

চন্দ্রবাবু। বড়ো আনন্দের কথা।

পূর্ণ। শ্রীশবাবু, বড়ো খুশি হলুম। বিপিনবাবু, আপনাদের বড়ো সৌভাগ্য। আশা করি অবলাকান্তবাবুও বঞ্চিত হন নি, তাঁরও একটি—

নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। নির্মলা, শুনো খুশি হবে, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। তা হলে কুমাররত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য।

নির্মলা। কিন্তু অবলাকান্তবাবুর মত তো নেওয়া হয় নি—তাকে এখানে দেখছি নে—

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম—তিনি আজ এখনো এলেন না কেন।

রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্তন দেখলে আপনারা আরো আশ্চর্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

চন্দ্রবাবু। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ করবেন না—বাসরঘরে ভূতপূর্ব কুমার-সভাটিকে সাধ্যমতে পিণ্ডদান করে তার পরে যদি দেখা দেন। এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। (চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন।

শ্রীশ। এ কী, অবলাকান্তবাবু—

অক্ষয়। আপনারা মত-পরিবর্তন করেছেন, ইনি বেশ-পরিবর্তন করেছেন মাত্র।

রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাতবেশ ধারণ করেছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনী-বেশ গ্রহণ করলেন।

চন্দ্রবাবু। নির্মলা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

নির্মলা। অন্যায়! ভারি অন্যায়! অবলাকান্তবাবু—

অক্ষয়। নির্মলা দেবী ঠিক বলেছেন—অন্যায়। কিন্তু, সে বিধাতার অন্যায়। এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কী মঙ্গল সাধন করছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কি হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাবুর পক্ষে আমি যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল—আমার মতো অযোগ্য—

চন্দ্রবাবু। কিছ্ অন্যায্য হয় নি পূর্ণবাবু, আপনার যোগ্যতা যদি নির্মলা না বুঝতে পারেন
তো সে নির্মলারই বিবেচনার অভাব।

[নির্মলার নতমুখে নিরদ্বন্দ্বেরে প্রস্থান

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণবাবু, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর—প্রজাপতির
আদালতে ডিক্রি পেয়েছেন—কাল প্রত্যুষেই জারি করতে বেরোবেন।

শ্রীশ। (শৈলবালার প্রতি) বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন।

বিপিন। সম্বন্ধের পূর্বেই পরিহাসটা করে নিয়েছেন।

শৈলবালা। পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না।

বিপিন। নিষ্কৃতি চাই নে।

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল। এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ করে দেওয়া যাক—

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।

সর্বঃ কামানবাপ্নোত সর্বঃ সর্বত্র নন্দত ॥

শোধবোধ

প্রকাশ : ১৯২৬

প্রথম দৃশ্য

মিস্টার লাহিড়ির ড্রয়িংরুম

তাঁর কন্যা নলিনী ও নলিনীর বন্ধু চারুবালা

চারু। ভাই নেলি, তোর হয়েছে কী বল্ তো।

নলিনী। মরণদশা।

চারু। না, ঠাট্টা নয়। তোকে কেমন এক রকম দেখছি।

নলিনী। কিরকম বল্ তো।

চারু। তা বলতে পারব না। রাগ না অনুরাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই; কেবল এইটুকু বদ্বি, তোর ঈশেন কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

নলিনী। শিলাবৃষ্টি না জলবৃষ্টি, না ফাঁকা ঝড়, কী আন্দাজ করছিস বল্ তো।

চারু। তোমার আলিপদ্যের ওয়েদার রিপোর্ট, ভাই, আমার হাতে নেই। আজ পর্যন্ত তোমাকে বদ্বিতেই পারলুম না।

নলিনী। তবে বদ্বিয়ে দিই কেন যে মন চঞ্চল হয়েছে। ধৈর্য আর রাখতে পারছি নে। ওরে পদ্মলাল, ডেকে দে তো লালবাজার থেকে কে চিঠি নিয়ে এসেছে।

চারু। মিস্টার নন্দীর চিঠি? কী লিখেছে।

নলিনী।

গান

সে আমার গোপন কথা, শূনে যা ও সখী।

ভেবে না পাই বলব কী।

চারু। হাঁ ভাই, বল্ ভাই বল্, কিন্তু সাদা কথায়।

নলিনী। অবস্থাগতিক সাদা কথা যে রাঙা হয়ে ওঠে।

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে

নীল গগনে,

গান হয়ে যায় মনে মনে যাহাই বাকি।

চারু। তুই ভাই এই-সব সখীকে-ডাক-পাড়া সেকেলে ধরনের গান কোথা থেকে জোগাড় করিস বল্ তো।

নলিনী। খুব একেলে ধরনের কবির কাছ থেকেই।

চারু। মিস্টার লাহিড়ি রাগ করেন না?

নলিনী। বাংলা সাহিত্যে কোন্টা একেলে কোন্টা সেকেলে, সে তাঁর খেয়ালই নেই। একটি গান সব চেয়ে তাঁর পছন্দ, সেইটে তাঁকে শুনিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বোঝেন যে, ইহকাল পরকাল কোনো কালই যদি আমার না থাকে, অন্তত মডার্ন কালটা আছে—

Love's golden dream is done

Hidden in mist of pain.

চারু। তোর মতো অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখি নি—সবই উলটো-পালটা। তুই যদি ভাটপাড়ার পন্ডিতের ঘরে জন্মাতিস, তা হলে চটেমটে মেমসাহেব হয়ে উঠতিস। মিস্টার লাহিড়ির ঘরে জন্মেছিস বলেই বড়ি ঠাকুরমার চাল প্র্যাকটিস চলছে। কোন্দিন এসে দেখব জ্যাকেট ছেড়ে নামাবলী ধরেছিস।

নলিনী। তাতে আগাগোড়া ছুঁবিয়ে রাখব—মিস্টার নন্দী বার-অ্যাট-ল—

চাপরাশির প্রবেশ

তোমারা সার্বকো বোলো, জবাব পিছে ভেজ দেউঙ্গী।

[সেলাম করিয়া চাপরাশির প্রস্থান

দেখিলি, একবার চাপরাশের ঘটা দেখিলি?—গিলটি তক্‌মার ঝলমলানিতে চোখ ঝলসে গেল। চারু। ভয় করিস নে নেলি। গিলটি সোনার চাপরাশ জোটে চাপরাশির ভাগ্যে, কিন্তু—
নলিনী। হাঁ গো, আর খাঁটি সোনার চাপরাশ পরবেন মিসেস নন্দী। তাঁর কী সৌভাগ্য!
চারু। দেখ্‌ নেলি, ন্যাকামি করিস নে। মিস্টার নন্দীর মতো পাত্র যেন অমনি—

মিসেস লাহিড়ির প্রবেশ

মিসেস লাহিড়ি। নেলি, ছি ছি, তুই এই কাপড় পরে মিস্টার নন্দীর বেয়ারার—

নলিনী। কেন, এ তো মন্দ কাপড় নয়।

মিসেস লাহিড়ি। কী মনে করবে বল্‌ তো। ওদের বাড়িতে সব—

নলিনী। বেহারা হয়ে জন্মেছে বলেই কি এত শাস্তি দিতে হবে। বেচারি মানিবর্ডিতে চত্বিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছ্‌ দেখে বেঁচে গেল। এত খুঁশি হল যে বর্কশিশ চাইতে ভুলে গেল।

মিসেস লাহিড়ি। চিঠি দিতে এসে আবার বর্কশিশ চাইবে কী। তোর সব অদ্ভুত কথা।

নলিনী। এমন আশ্চর্য চিঠি মা, তাতে এত—

মিসেস লাহিড়ি। এত কী।

নলিনী। সোনালি ক্রেস্ট আঁকা—আর তাতে লেখা আছে তিনি স্বয়ং এখানে আসবেন—
আমাকে—

মিসেস লাহিড়ি। কী করতে।

নলিনী। বেশি আশা করে বোসো না, মা। প্রোপোজ করতে না, আমার জন্মদিনের জন্যে কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে। সেই বা কজনের ভাগ্যে—

মিসেস লাহিড়ি। যা, আর বকিস নে—শীঘ্র যা, ড্রেস করে নে—এখনি লোক আসতে আরম্ভ হবে। মিস্টার নন্দী তোর সেই ধূপছায়া রঙের শাড়িটা খুব অ্যাড্‌মায়ার করেন, সেটা—

নলিনী। সে হবে মা, আমি এখনি যাচ্ছি।

মিসেস লাহিড়ি। যাই, হোটেল থেকে খানসামাগুলো এল কি না দেখি গে।

[প্রস্থান

নলিনী। দেখবি? এই দেখ চিঠি। সশরীরে আসবেন তার অ্যানাউন্সমেন্ট। সেকালে বিশ্‌ ডাকাত এই রকম খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত।

চারু। ডাকাতি?

নলিনী। নয় তো কী। একজন সরলা অবলার হৃদয়ভাণ্ডার লুট! তার সিঁধকাঠিটা দেখবি? এই দেখ।

চারু। ইস্‌। এ যে হীরে-দেওয়া ব্রেসলেট! যা বলিস, তোর কপাল ভালো। এ বর্ষি তোর জন্মদিনের—

নলিনী। হাঁ হাঁ, জন্মদিনের উপহার—আমার জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনকেই ঘিরে ফেলবার সুদর্শন চক্র।

চারু। সুদর্শন চক্র বটে। যা বলিস, মিস্টার নন্দীর টেস্ট আছে।

নলিনী। ব্রেসলেটও তার প্রমাণ, আর ব্রেসলেট পরাবার জন্য যে মৃণালবাহু বেছে নিয়েছেন তাতেও প্রমাণ।

চারু। আজ যে বড়ো ঠাট্টার সুর ধরেছিল।
নলিনী। তা হলে গম্ভীর সুর ধরি।

গান

সে যেন আসবে আমার মন বলেছে।
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।
দেখ্ লো তাই দেয় ইশারা
তারায় তারা;
চাঁদ হেসে ওই হল সারা তাহাই লখি।
শুনে যা ও সখী।

চারু। আমি যদি পুরুষ হতুম নেলি, তা হলে তোর ঐ পায়ের কাছে প'ড়ে—
নলিনী। জুতোর লেস লাগাতিস বুঝি? আর ব্রেসলেট পরাত কে।

মিস্টার লাহিড়ির প্রবেশ

মিস্টার লাহিড়ি। আজ বরুণ নন্দীর আসবার কথা আছে না?

নলিনী। হাঁ, তাঁর চিঠি পেয়েছি।

মিস্টার লাহিড়ি। তা হলে এখনো যে ড্রেস কর নি?

নলিনী। কী ড্রেস পরব, তাই তো এতক্ষণ চারুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম।

মিস্টার লাহিড়ি। দেখো, ভুলো না, সার হার্কোর্ট তোমাকে কী চিঠি লিখেছেন সেইটে বরুণ নন্দী দেখতে চেয়েছিল—সেটা—

নলিনী। হাঁ, সেটা আমি বের করে রাখব, আর জেনেরাল্ পর্কিন্সের ভাইঝি তার অটোগ্রাফ-ওয়ালা যে ফোটো আমাকে দিয়েছিল, সেটাও—

মিস্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ সেটা, আর সেই যে—

নলিনী। বুঝেছি, গবর্নেন্ট হাউসে নেমন্তন্ন গিয়েছিলুম, তার নাচের প্রোগ্রামটা।

মিস্টার লাহিড়ি। আজ কোন্ গানটা গাবে বলো তো।

নলিনী। সেই যে ঐটে—

Love's golden dream is done

Hidden in mist of pain.

মিস্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ, ফস্ট ক্লাস। ওটা তোমার গলায় খুব মানায়, আর সেইটে—মনে আছে তো? In the gloaming, O my darling.

নলিনী। আছে।

মিস্টার লাহিড়ি। আর সব-শেষে গেলো Goodbye, sweetheart।

নলিনী। কিন্তু ওগুলো যে পুরুষের গান।

মিস্টার লাহিড়ি। (হাসিয়া) তাতে ক্ষতি কী, নেলি—আজকাল মেয়েরা তো—

নলিনী। ভুলতে আরম্ভ করেছে যে তারা মেয়ে। কিন্তু মর্শাকিল এই যে, তাতে পুরুষদের একটুও ভুল হচ্ছে না।

মিস্টার লাহিড়ি। Bravo, well said। যাও, এবার ড্রেস করতে যাও। অর্মানি সেই তোমার অটোগ্রাফ বইটা, সেই যেটাতে—

নলিনী। বুঝিছি, যেটাতে লর্ড বেরেস্ফোর্ডের কার্ড আঁটা আছে। আচ্ছা, বাবা, সে হবে এখন। তুমি তৈরি হও গে, আমি এখনি যাচ্ছি।

[লাহিড়ির প্রস্থান]

লাহিড়ি। (ফিরিয়া আসিয়া) দেখো, একটা জিনিস নোটিস করছি নেলি, সেটা তোমাকে বলা

ভালো। তুমি অনেক সময়ে বরুণের সঙ্গে এমন তৌনে কথা কও যে সে মনে করে, তুমি তাকে একটুও সীরিয়াস্‌লি নিচ্ছ না, তাই সে ভেবে পায় না যে তুমি—

নলিনী। বরুণে, বাবা। সর্বাধিক পেনেই বরুণে দেব আমি খুব সীরিয়াস্‌।

লাহিড়ি। আর-একটা কথা। আমি ঠিক বরুণে পারি নে তুমি সতীশকে কেমন যেন একটু-খানি ইন্ডাল্‌জেন্স দাও।

চারু। না মিস্টার লাহিড়ি, নেলি তো তাকে কথায় কথায় নাকের জলে চোখের জলে করে। পৃথিবীতে ওর কুকুর টম্কে ছাড়া নেলি আর যে কাউকে একটুও ইন্ডাল্‌জেন্স দেয়, এ তো আমি দেখি নি।

লাহিড়ি। কিন্তু সে আসতেও ছাড়ে না। সেদিন চা-পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে এসেছিল যে তার মচ্ মচ্ শব্দে দেয়ালের ইন্টগুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক-এক সময় ভারি অক্‌ওয়ার্ড হয়। তা ছাড়া ওর ট্রাউজারগুলো—থাক্‌গে, লোরেটোতে ছোটোবেলায় তোমার সঙ্গে ও একসঙ্গে পড়েছিল, ওকে আমি কিছু বলতে চাই নে, কিন্তু যেদিন বরুণরা আসবে, সেদিন বরুণ ওকে—

নলিনী। ভয় কী বাবা, সেদিন বরুণ সতীশকে ট্রাউজার না পরে ধূতি পরে আসতে বলব, আর দিল্লির জুতো—সে মচ্ মচ্ করবে না।

লাহিড়ি। ধূতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

নলিনী। পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সহিয়ে নেওয়া ভালো।

চারু। ওর সঙ্গে কথায় পারবেন না। এ দিকে লোক আসবার সময় হয়ে আসছে। নেলি, তুই যা ভাই, কাপড় পরে আয়, যদি কেউ লোক আসে, আমি তাদের সামলাব।

[নলিনীর প্রস্থান]

লাহিড়ি। এই বরুণ ওর সব জন্মদিনের প্রেজেন্ট? বরুণের ব্রেসলেটটা কি এমনি টেবিলের উপরেই থাকবে।

চারু। থাক্‌-না, আমি ওর উপর চোখ রাখব।

লাহিড়ি। এটা কার? একটা মক্‌মলের মলাটের অ্যালবম। এ দেখাচ্ছি সতীশের! দাম লেখা আছে, মূছে ফেলতেও হুঁশ ছিল না। এক টাকা বারো আনা। ইন্সল্‌ভেন্সের মামলা আনতে হবে না। সেকেন্ড-হ্যান্ড সেলে কেনা। এটাও কি এখানে থাকবে নাকি।

চারু। সরাতে গেলে নেলি রক্ষা রাখবে না।

লাহিড়ি। থাক্‌ তবে, তুমি এখানে একটু বোসো, আমি ড্রেস করে আসি।

[প্রস্থান]

সতীশের প্রবেশ

চারু। এত সকাল-সকাল যে?

সতীশ। (লজ্জিত হইয়া) দেখাচ্ছি আমার ঘড়িটা ঠিক চলছিল না। যাই, বরুণ আমি একটু ঘুরে আসি গে।

চারু। না, আপনি বসুন, সময় হয়ে এসেছে। নেলির প্রেজেন্টগুলো দেখুন-না। এই দেখেছেন?

সতীশ। এ যে হীরের ব্রেসলেট! এ কে দিয়েছে।

চারু। মিস্টার নন্দী। চমৎকার না?

সতীশ। তাই তো। বেশ।

চারু। এই মনুষ্য-দেওয়া হেয়ারপিনটা আমার ভাই অম্ল্যার দেওয়া। আর এই রূপোর দোয়াতদান—ও কি সতীশবাবু, যাচ্ছেন নাকি?

সতীশ। ভাবছি এইবেলা আমার কাজ সেরে আসি।

চারু। আপনার অ্যালবমটি নেলির কাজে লাগবে। এই দেখুন-না মিস্টার নন্দী ওকে তাঁর সেই-করা ফোটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সতীশ। হাঁ, তাই তো দেখছি। আমার কিন্তু বিশেষ কাজ আছে, আমি যাই। আর দেখুন, এখনকার মতো এই অ্যালবমটা আমি নিয়ে যাচ্ছি—তার পরে—

চারু। কী করবেন।

সতীশ। না, ওটা—একবার—একটুখানি ঐ—আপনি দয়া করে নেলিকে বলবেন যে, বিশেষ একটু কারণে এখনকার মতো—তার পরে আবার—এখন যাই—কাজ আছে।

[প্রস্থান

চারু। যাক, বিদায় করে দেওয়া গেল। মা গো, কী টাই প'রেই এসেছে। অ্যালবমটাও গেল। এই-যে মিস্টার লাহিড়ি, শুনেন যান, সুখবর আছে, বকশিশ চাই।

নেপথ্যে। একটু পরেই যাচ্ছি, আমার বাট্‌ন-হুক্‌টা খুঁজে পাচ্ছি নে।

সতীশকে লইয়া নলিনীর প্রবেশ

চারু। ও কী, নেলি, তোর ভালো করে তো সাজা হল না।

নলিনী। হঠাৎ কোতোয়ালি করতে হল। ড্রেসিংরুমের জানলা দিয়ে দেখি, চোর পালাচ্ছে একটা মাল বগলে নিয়ে, তখনি নেমে গিয়ে বমালসুন্দর গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছি।

চারু। বাস্ রে, কী কড়া পাহারা। মালটা কি খুবই দামি, আর চোরটাও কি খুবই দাগি।

নলিনী। (সতীশকে) তুমি এসেই তখনি পালাচ্ছিলে যে—আর আমার একখানা অ্যালবম নিয়ে?

সতীশ নিরুত্তর

চারু। ওঃ বদ্বোঁছ, প্রাইভেট কামরায় বিচার হবে। নেলি, আমি তা হলে তৈরি হয়ে আসি গে। তোর নাবার ঘরে টয়লেট ভিনিগার আছে তো?

নলিনী। আছে।—

[চারুর প্রস্থান

তোমার এ কী রকম দুর্বুদ্ধি। আমার অ্যালবম নিয়ে—

সতীশ। লক্ষ্মীছাড়ার দান লক্ষ্মীকে পেঁপঁছয় না। যেটা যার যোগ্য নয়, সে জিনিসটা তার নয়, আমি এই বুদ্ধি।

নলিনী। আর বগলে করে যে নিয়ে যায় সেটা যে তারই, এই-বা কোন্ শাস্ত্রে লেখে?

সতীশ। তবে সত্যি কথাটা বলি। আমি যে ভীরু, বেশ জোরের সঙ্গে কিছুই দিতে পারি নে। সেইজন্যে দিয়ে লজ্জা পাই।

নলিনী। তোমার এই অ্যালবমের মধ্যে কম জোরের লক্ষণটা কী দেখলে। এ তো টক্টকে লাল।

সতীশ। লজ্জায় লাল। কতবার মনে হয়েছিল, এই অ্যালবমের মধ্যে নিজের একখানা ছবি পুরে দিই, 'আমাকে মনে রেখো' এই করুণ দাবিটুকু বোঝাবার জন্যে। কিন্তু ভয় হল, তুমি মনে করবে ওটা আমার স্পর্ধা; খালি রেখে দিলুম, তুমি নিজে ইচ্ছে করে যার ছবি রাখবে, ওর মধ্যে তারই স্থান থাক্।

নলিনী। খুব ভালো বলছ, সতীশ, ইচ্ছে করছে বইয়ে লিখে রাখি।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না।

নলিনী। আমার আর-একজনের কথা মনে পড়ছে। সে দিয়েছিল একখানা খাতা—তোমার অ্যালবমের মধ্যে যে-কথাটা না-লেখা অক্ষরে আছে, সেইটে সে গানে লিখে দিয়েছিল—শুধু তাই নয়, পাছে চোখে না পড়ে, তাই নিজে এসে গেয়ে শুনিয়েছিল—

পাতাখানি শূন্য রাখিলাম,

নিজের হাতে লিখে রেখো শুধু আমার নাম।

সতীশ। কে, লোকটা কে।

নলিনী। তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাবে নাকি। আমাদের কবি গো—কিন্তু কবিহে তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গেছ—তোমার এ যে আন্‌হার্ড মেলডি। আমি শুনতে পাচ্ছি—

এই অ্যাল্‌বম শূন্য রইল সবি,

নিজের হাতে ভরে রেখো শূন্য আমার ছবি।—

কিন্তু তোমার সব কথা বলা হয় নি।

সতীশ। না, হয় নি। বলি তা হলে। এসে দেখলুম—সবাই আমার মতো ভীরু নয়। যার জোর আছে, সে নিজের ছবিতে নিজের নাম লিখে পাঠাতে সংকোচ করে না। মনে বুকুলুম, আমি দিয়েছি শূন্য পাতা, আর তারাই দিলে পূর্ণ করবার জিনিস।

নলিনী। তোমাকে এখনি বুকিয়ে দিচ্ছি ভুল করেছে সে। ছবি দিতে সবাই পারে, ছবি রাখবার জায়গা দিতে কজন পারে। ভীরু, তোমার অদৃশ্য ছবিরই জিত থাক। (নন্দীর ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিল) ও কী, অমন করে লাফিয়ে উঠলে কেন। মৃগীরোগে ধরল নাকি।

সতীশ। কোন্‌ রোগে ধরেছে তা অন্তর্যামী জানেন। নেলি, একবার তুমি আমাকে স্পষ্ট করে—

নলিনী। এই বুকি নাটক শুরুর হল? চোখের সামনে দেখলে তো যে-ছবি চেঁচিয়ে কথা কয়, তার কী দশা। যে মানুষ চুপ করে থাকতে জানে না, তারও—

সতীশ। আর কাজ নেই, নেলি, থাক্। তোমাকে কত ভয় করি, তুমি জান না।

নলিনী। ভয় যদি কর তা হলে অ্যাল্‌বম চুরি কোরো না। আমি কাপড় ছেড়ে আসি গে।

সতীশ। একটি অনুরোধ। আন্‌হার্ড মেলডি আমার মুখে খুবই মিষ্টি, কিন্তু তোমার মুখে নয়। তোমার জন্মদিনে তোমার মুখে একটি গান শুনবে যাব।

নলিনী। আচ্ছা।

গান

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,

নিয়ো হে নিয়ো।

হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা,

পিয়ো হে পিয়ো।

ভরা সে পাত্র, তারে বৃকে ক'রে

বেড়ানু বহিয়া সারা রাত ধরে—

লও তুলে লও আজি নিশিভোরে,

প্রিয় হে প্রিয়।

বাসনার রঙে লহরে লহরে

রঙিন হল।

করুণ তোমার অরুণ অধরে

তোলো হে তোলো।

এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস,

নবীন উষার পুষ্পসুবাস—

এরই 'পরে তব আঁখির আভাস

দিয়ে হে দিয়ে।

চারুর প্রবেশ

চারু। এ কী করেছিস, নেলি। মিস্টার নন্দীর ফোটো—

নলিনী। যে-মাটির গর্ভে হীরে থাকে, যে-মাটির বৃকে ভুঁইচাঁপা ফুল ফোটে, সেই মাটির হাতে ওকে সমর্পণ করে দিয়েছি। এর চেয়ে আর কত সম্মান হবে?

চারু। ছি ছি, নেলি, মিস্টার নন্দী জানতে পারলে কী মনে করবেন। এ যে একেবারে ছিঁড়ে ফেলোঁছিস।

নলিনী। ইচ্ছে করিস তো তোর ঘরের আটা দিয়ে তুই জোড়া দিয়ে নিতে পারিস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধুমুখী ও সতীশ

সতীশ। মা, কোনোমতে টাকাটা পেয়েছি, নেকলেসও নেলির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেকালের আমলের সোনার গুড়গুড়িটা সিঁদুরেপটির মতি পালদের ওখানে যে বাঁধা রেখে এলুম, নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে।

বিধুমুখী। তোর কোনো ভয় নেই, সতীশ। তিনি এ-সব জিনিসের 'পরে কোনো মমতাই রাখেন না। কেবল ঠুর ঠাকুরদাদার জিনিস বলেই আজ পর্যন্ত লোহার সিঁদুরকে ছিল। একদিনের জন্যে খবরও রাখেন নি। সেটা আছে কি গেছে, সে তাঁর মনেও নেই।

সতীশ। সে আমি জানি। কিন্তু ভারি ভয় হচ্ছে, যারা বন্ধক রেখেছে তারা হয়তো বাবাকে চিঠি লিখে খোঁজ করবে। তুমি কোনোমতে তোমার গহনাপত্র দিয়ে সেটা খালাস করে দাও।

বিধুমুখী। হায় রে কপাল, গহনাপত্র কিছুর কি বাকি আছে। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে। যাই হোক, আমি ভয় করি নে—প্রজাপতির আশীর্বাদে নলিনীর সঙ্গে আগে তোর কোনোমতে বিয়ে হয়ে যাক, তার পরে তোর বাবা যা বলেন, যা করেন, সব সহ্য হবে। কথাবার্তা কিছুর এগিয়েছে?

সতীশ। সর্বদা ঘেরকম লোক ঘিরে থাকে, কথা কব কখন। জান তো সেই নন্দী—সে যেন বিলিতি কাঁটাগাছের বেড়া। তার বুলিগুলো সর্বাপেক্ষে বিধিতে থাকে। সেই দৈত্যটার হাত থেকে রাজকন্যার উদ্ধার করি কী উপায়ে।

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, মেয়ের মন বুঝতে পারি—মনে মনে সে তোকে ভালোবাসে।

সতীশ। সে আমি জানি নে। কিন্তু বরুণ নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাবা একটু দয়া করলেই কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু—

বিধুমুখী। তোর কী চাই বল্-না।

সতীশ। ভালো বিলিতি সূট। চাঁদনির কাপড় পরলেই ভরসা কমে যায়; নন্দীর মতো করে সজোরে নলিনীর সঙ্গে কথাই কইতে পারি নে। বাড়িসুদ্ধ সম্বাই আমার দিকে এমন করে তাকায় যেন আমার গায়ে কাপড়ই নেই, আছে নর্দমার পাক।

বিধুমুখী। আমি তোর কাপড়ের দৃশ্য তোর মাসিকে আভাসে জানিয়ে রেখেছি। আজ এখনি তাঁর আসবার কথা। আজই হয়তো একটা কিনারা হয়ে যাবে।

সতীশ। ঐ যে মেসোমশায়কে নিয়েই তিনি আসছেন মা, যেমন করে পার আজই যেন—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি—বাবা যদি জানতে পারেন, মেরে ফেলবেন।

বিধুমুখী। আমি বলি কী—কোনো ছুতোয় সেই নেকলেসটা যদি নলিনীর কাছ থেকে—

সতীশ। সে কথাও ভেবেছি। তা হলেই আমার লজ্জা পুরো হয়। এক-একবার মনে করি, সংসারে যত মুশকিল সব আমারই? বরুণ নন্দীর বাপ কি কোনোকালে ছিল না। ঘেরকম দেখছি, একটা কোনো গল্প বলে নেকলেসটা ফিরিয়ে আনতে হবে, তার পরে আমার নিজের গলায় পরবার জন্যে গয়না মিলবে।

বিধুমুখী। সে আবার কী।

সতীশ। একগাছা দাঁড়ি।

বিধুমুখী। দেখ, আমাকে আর রোজ রোজ কাঁদাস নে। আমার রক্ত শুকিয়ে গেল, চোখের জলও বাকি নেই। এক দিকে তোর বাবা, আর-এক দিকে তুই— উপরে সরার চাপ, আর নীচে আগুন, আমি যে গদমে গদমে—

সতীশের মাসি সুকুমারী ও মেসোমশায় শশধরবাবুর প্রবেশ

এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল। দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।

শশধর। এতেই বুঝবে, তোমার দিদির শাসন কী কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাক ডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এই রকম ধূতি পরে কলেজে যাস নাকি। বিধু, ওকে যে লাউঞ্জ সুটটা কিনে দিয়েছিলাম, সে কী হল।

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে।

সুকুমারী। তা তো ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতদিন টেকে। তা, তাই বলে কি আর নতুন সুট তৈরি করাতে নেই। তাদের ঘরে সকলই অনাসৃষ্টি।

বিধুমুখী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতাম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘূর্নাসি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মা গো, এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারো দেখি নি।

সুকুমারী। মিছে না। এক বৈ ছেলে নয়, একটু সাজাতে-গোজাতেও ইচ্ছা করে না? এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, আমি তোর জন্য একসুট কাপড় রায়মজের ওখানে অর্ডার দিয়ে রেখেছি। আহা, ছেলেমানুষের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক সুটে আমার কী হবে, মাসিমা। লাহিড়ি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—সে আমাকে তাদের বাড়িতে টেনিস খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে, আমি নানা ছুতো করে কাটিয়ে দিই। আমার তো কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে, তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত, তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা চোখ বুজে কল্পনা করাই ভালো।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। কর্তাবাবু লোহার সিঁদুকের চাবি চেয়েছেন।

সতীশ। (কানে কানে) সর্বনাশ মা, সর্বনাশ। নিশ্চয় গুড়গুড়ির খোঁজ পড়েছে।

বিধুমুখী। একটু চুপ কর তুই। কেন রে, চাবি কেন।

ভূত্য। কাল কোথায় যাবেন, চেক-বইটা চান।

বিধুমুখী। আচ্ছা, একটু সবুজ করতে বল, চাবি নিয়ে এখনি যাচ্ছি।

[ভূত্যের প্রস্থান]

সতীশ। মা, লোহার সিঁদুক খুললেই তো—

বিধুমুখী। একটু থাম। আমাকে একটু ভাবতে দে।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

সুকুমারী। সতীশ বাস্ত হয়ে পালাল কেন, বিধু।

বিধুমুখী। খালায় করে তার জলখাবার আনাছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্।

সতীশের প্রবেশ

—তোর মেসোমশায় তোকে পেলেরটির বাড়ি থেকে আইস্ক্রিম খাইয়ে আনবেন, তুই ঠুঁর সঙ্গে যা।
ওগো, যাও-না—ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সতীশ। চাপকান তো পেলেরটির খানসামাদেরও আছে। বেমালদুম দলে মিশে যাব।

সুকুমারী। আর যাই হোক বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি, তাই রক্ষা।
বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিংবা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড়
আর নেই।

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপি চুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্থ নিজের পছন্দমতো
ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না?

শশধর। সর্বনাশ! কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত
আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেরটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, লোহার সিন্দুকের চাবি বাবাকে কিছতেই দিয়ে না—বরঞ্চ
আমার সেই ঘড়ির কথাটা তুলে ঠুঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ভুলিয়ে রেখো।

সুকুমারী। এই-যে মন্থ আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকার্বাক করে অস্থির করে
তুলবেন। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা পালাই।

[প্রস্থান]

মন্থের প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কদিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে
একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন। আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

মন্থ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব।—শোনো, লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধুমুখী। তুমি একলা বসে বসে রাগ করো। আমি চললুম, আমি আর সহিতে পারছি নে।

[প্রস্থান]

মন্থ। শশধর, সে-ঘড়িটা তোমায় ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি যে লোহার সিন্দুক খুলতে যাচ্ছিলে, যাও-না।

মন্থ। সে পরে হবে, কিন্তু ঘড়িটা এখনি তুমি নিয়ে যাও।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। ঘড়ি তো নিয়ে গেলুম; তার পর থেকে আমার সময়টা
কাটবে কী রকম? ঘরের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে গিয়ে আমাকে যে ঘরছাড়া হতে হবে।

মন্থ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়। সংসারের এই নিয়ম।

মন্থ। নিজের সম্বন্ধে হলে নিঃশব্দে সহ্য করতেম। ছেলেকে মাটি করতে পারি না।

শশধর। সে তো ভালো কথা। কিন্তু স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে খাড়া উলটোমুখে চলতে

গেলে বিপদে পড়বে। তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘুরে গেলে ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উলটো বয়, জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীর্দ!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যাঁর ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করতে হয়, তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলোও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাটা বলে কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সংপরামর্শ—গোঁয়াতর্কি করতে গেলেই মর্শাকিল বাধে। আমি চললেম, যা ভালো বোঝা করো।

[শশধরের প্রস্থান]

বিধুমুখীর প্রবেশ

মন্মথ। তোমার ছেলোটিকে যে বিলাতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।

বিধুমুখী। পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।

মন্মথ। (হাসিয়া) সকলের মতেই যদি চলবে, তবে সকলকে ছেড়ে একটিমাত্র আমাকেই বিয়ে করলে কেন।

বিধুমুখী। তুমি যদি একমাত্র নিজের মতেই চলবে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিয়ে করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধুমুখী। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে—কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আবার সংসারমরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক। তোমার ছেলোটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধুমুখী। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

মন্মথ। লোহার সিন্দূকের চাবিটা—

বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাই, তোমরা এখানে ভালো হয়ে বসেই কথা কও-না। দাঁড়িয়ে কেন। আমি পাশের ঘরে আছি বলে বুঝি আলাপ জমছে না? ভয় নেই ভাই, আমি নীচের ঘরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

সতীশের প্রবেশ ও বাপকে দেখিয়াই পলায়ন

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলোটিকে কী মাখিয়েছ।

বিধুমুখী। মূর্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছন্ন নয়, একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বার বার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শোঁখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধুমুখী। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল থেকে মাথায় কেরোসিন মাখাব, আর গায়ে কাস্টার-অয়েল।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। কেরোসিন কাস্টার-অয়েল গায়-মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধুমুখী। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ বয়সে হয়তো সহ্য হবে না। যাই হোক, এ কথা আমি তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে, তাতে তার শখের খরচ চলবে না।

বিধুমুখী। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কপনি পরানো অভ্যাস করাতেম।

মন্মথ। আমিও তা জানি। তোমার ভগিনীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছি, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে-পড়ে দিয়ে যাবে। সেই-জন্যই যখন-তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও! আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি; কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।

বিধুমুখী। ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি, সে তো পূর্বে বদ্বতে পারি নি!

বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাবলুম এতক্ষণে কথা ফুরিয়ে গেছে, এইবার ঘরে এসে পানগুলো সেজে রাখি। কিন্তু এখনো ফুরোল না। মেজোবউ, তোদের ধন্য। আজ সে তোরা ন-বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে, তবু তোদের কথা যে আর ফুরোল না! রাতে কুলোয় না, শেষকালে দিনেও দুই জনে মিলে ফিস্ ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিনরাতি জোগান কোথা থেকে, আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না।

বিধুমুখী। না দিদি, আমাদের মধুরালাপ লোকালয় থেকে অনেক দূরে গিয়েই করতে হবে, নইলে সবাই দৃষ্টি দেবে। ওগো, এসো—ছাতে এসো, গোটাকতক কথা বলে রাখি। তুমি আবার নাকি হঠাৎ কাল লঙ্কান্বীপে যাচ্ছ—এখানকার হাওয়া তোমার সহ্য হচ্ছে না?

[উভয়ের প্রস্থান]

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কী বাপ!

সতীশ। বাবা কাল ভোরে জাহাজে করে কলম্বো যাবেন, তাই কালই লাহিড়িসাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াতে ডেকেছেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কী, সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ-কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোরা কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোরা বন্ধুর চা খাওয়া না হয় আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার ঐ সামনের ঘরটাতেই তাকে চা খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিঁদুক-ফিন্দুক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমার ও ঘরেও তো জিনিসপত্র—

সতীশ। ওগুলো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার ঐ বর্টি-চুপিড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন লাহিড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। ষ্পঁট-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে ভাইবোনে মিলে গল্প করতে তো শুন নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে, জেঠাইমা—আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালিগায়ে ফস্ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি-গায়ে---

সতীশ। তিনি তো কাল কলম্বোয় যাবেন।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগুলো---

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

[জেঠাইমার প্রস্থান]

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। পারলুম না।—জান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয় শুন নি।

সতীশ। একটা মনিং সুট তো মাসি অর্ডার দিয়েছেন, আর একটা লাইঞ্জ সুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধুমুখী। বল কী, সতীশ। এ তো আড়াইশো টাকার ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফাঁকির করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তো খরচ করতে হবে। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে বনের বাঁদররা ড্রেস কোট পরে না।—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি! একটা প্ল্যান ভেবেছি, তুমি বাবাকে বলো যে কাল রাতে তোমার লোহার সিঁদুরের চাবি চুরি গেছে।

বিধুমুখী। দেখ্ সতীশ, এদিকে তোর বাবার বিষয়বুদ্ধি একটুও নেই—কিন্তু ঠুকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ধরা পড়ে যাবি।

সতীশ। ধরা তো এক সময় পড়বই। আপাতত কোনো রকম ক'রে—তা ছাড়া কাল তো উনি কলম্বোয় যাচ্ছেন, ইতিমধ্যে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। যথেষ্ট সময় পেলে নেকলেসটা চাই কি ফিরিয়েও নিতে পারি। অনেক ভেবে দেখলুম শেষকালে—ঐ যে বাবা আসছেন। মা, এখনি, আর দৌর কোরো না।

[সতীশের প্রস্থান]

শশধর ও মন্মথের প্রবেশ

বিধুমুখী। ওগো শুনছ, সর্বনাশ হয়েছে। কাল রাতে লোহার সিঁদুরের চাবি চুরি গেছে।

শশধর। সে কী কথা, বউ। কোথায় চাবি রেখেছিলে, কে করলে এমন কাজ।

বিধুমুখী। তাই তো ভাবছি, হয়তো নতুন বেহারাটা—

শশধর। মন্মথ, তুমি যে একেবারে অবিচলিত? একবার খোঁজ করে দেখো।

মন্মথ। কোনো লাভ নেই।

শশধর। কী গেল না-গেল, সেটা তো একবার দেখাও চাই।

মন্মথ। কিছু নিশ্চয় গেছে, শূন্য চাবি নিয়ে ঝাম্‌ঝামিয়ে বেড়াবে, চোরের এমন শখ প্রায় থাকে না।

শশধর। কিন্তু কে চোর, সেটাও তো বের করা চাই।

মন্মথ। সাধুর চেয়ে যার দরকার অনেক বেশি, সেই হয় চোর।

শশধর। আমি কি তোমার কাছে চোরের ডেফিনিশন চাচ্ছি। বলছি—সন্ধান করা চাই তো?

মন্মথ। (উত্তেজনার সহিত) না, চাই নে, চাই নে। ভিতরে যে আছে তাকে বাইরে সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শশধর। কী বলছ, মন্মথ। চলো-না একবার দেখেই আসা যাক।

মন্মথ। নিষ্ফল, নিষ্ফল, আমার দেখাশোনা হয়ে গেছে।

শশধর। অন্তত কালকে কলম্বো যাওয়াটা স্থগিত রাখো, একটা পুন্ডলিস-তদন্ত করাও।

মন্মথ। কলম্বোর চেয়ে আরো অনেক দূরে যাওয়া দরকার—সাউথ পোলে যেখানে থাকে পেঙ্গুইন পাখি, যেখানে থাকে সিন্ধুঘোটক—সেখানে চাবিও চুরি যায় না, আর পুন্ডলিস-তদন্তের ঠাট বসাতে হয় না।

শশধর। বউ, তুমি যে একেবারে চুপ, মুখ হয়ে গেছে সাদা। চলো বরঞ্চ তোমাতে আমাতে একবার—

ভূতোর প্রবেশ

ভূতা। সাহেববাড়ি থেকে এই কাপড় এসেছে।

মন্মথ। নিয়ে যা, কাপড় নিয়ে যা, এখন নিয়ে যা।

[ভূতোর প্রস্থান

শশধর। আহা, আহা, করছ কী মন্মথ। কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে তুমি আমাকেই—

মন্মথ। ঐ কাপড়গুলোতেই আছে চাবি-চুরির ব্যাকটিরিয়া—টাকা-চুরির বীজ—এই আমি তোমাকে বলে গেলুম।

[মন্মথের প্রস্থান। বিধুমুখীর মেজের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া কান্না

শশধর। বউ, ছি ছি, এমন করে কাঁদতে নেই। ওঠো ওঠো।

বিধুমুখী। রায়মশায়, আমার বেঁচে সুখ নেই।

শশধর। কিছুই বুঝতে পারছি নে। মন্মথ কাকে সন্দেহ করছে? সতীশকে নাকি?

বিধুমুখী। নিজের ছেলেকে যদি সন্দেহ না করবে, তবে বাপ কিসের। যদি মা হত, ছেলেকে গর্ভে ধারণ করত, তা হলে বুঝত, ছেলে বলতে কী বুঝায়। গেছে তো গেছে, নাইয় সোনার গুড়-গুড়িটাই গেছে, আমার সতীশ কি ঠুঁর সোনার গুড়গুড়ির চেয়ে কম দামের।

শশধর। সোনার গুড়গুড়ির কথা কী বলছ। সিন্দুক থেকে কী গেছে, দেখেছ নাকি।

বিধুমুখী। হাঁ, তা—না দেখি নি। আমি বলছি ঠুঁর সিন্দুকে সেই গুড়গুড়ি ছাড়া আর তো দামি জিনিস নেই—তা সেটা যদি চুরি হয়েই থাকে, তাই বলেই কি ছেলেকে সন্দেহ।

শশধর। তোমার সন্দেহটা কাকে, বউ।

বিধুমুখী। কেন। ঠুঁর তো সেই বড়ো ভালোবাসার উড়ে বেয়ারা আছে—বনমালী। তার হাতেই তো ঠুঁর সব। সে হল ভারি সাধু, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। একটু ইশারাতেও বলো দেখি পুন্ডলিস দিয়ে তার বাস্তু তল্লাস করতে, হাঁ-হাঁ করে মারতে আসবেন—সে তো ঠুঁর ছেলে নয়, ঠুঁর বেয়ারা, তাই তার 'পরে এত ভালোবাসা।

শশধর। কিছু মনে কোরো না বউ, আমি খাচ্ছি, ওকে বুঝিয়ে বলছি।

[প্রস্থান

সতীশের দ্রুত প্রবেশ

সতীশ। মা, ভয়ানক বিপদ।

বিধুমুখী। আবার কী হল। বুকের ধড়ধড়ানি এক মূহূর্ত থামতে দিল না।

সতীশ। সেই যে মতি পাল, যার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে বাবার কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছে দেখলুম—এতক্ষণে বোধ হয়—

বিধুমুখী। সর্বনাশ! যা, তুই রায়মশায়কে শিগগির আমার কাছে পাঠিয়ে দে, এখনো তিনি যান নি।

[সতীশের প্রস্থান]

মন্মথর প্রবেশ

মন্মথ। এই দেখো চিঠি। পড়ে দেখো।

বিধুমুখী। না, আমি পড়তে চাই নে।

মন্মথ। পড়তেই হবে।

বিধুমুখী। (চিঠি পড়িয়া) তা কী হয়েছে।

মন্মথ। বেশ কিছু না, চুরি হয়েছে, আমার গুড়গুড়ি চুরি।

বিধুমুখী। নিজের ছেলে নিয়েছে, তাকে বল চুরি? বলতে তোমার জিব টাক্রায় আটকে গেল না?

মন্মথ। যে কথা বলতে জিব আটকে যাওয়া উচিত ছিল, সে কথা তুমিই বলেছ।

বিধুমুখী। কী বলেছি।

মন্মথ। সেই চাবি-চুরির মিথ্যে গল্প।

বিধুমুখী। বেশ করেছি। নিজের ছেলের জন্যে বলেছি—তার বাপের হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বলেছি।

মন্মথ। প্রাণ বাঁচালেই কি বাঁচানো হল।

বিধুমুখী। অনেক হয়েছে; আর ধর্ম-উপদেশ শুনতে চাই নে। এখন ছেলের উপর কোন্ জল্পাদি করতে চাও, খোলসা করে বলো।

মন্মথ। পুন্লিসে খবর দেব।

বিধুমুখী। দাও-না। চাবি আমার হাতে ছিল, আমিই তো চুরি করে ওকে দিয়েছি। যাক আমাকে নিয়ে জেলে, সেখানে আমি সুখে থাকব। অনেক সুখে, এর চেয়ে অনেক সুখে; মনে হবে স্বর্গে গেছি।

মন্মথ। দরকার নেই; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেকদিন আগেই যার যাওয়া উচিত ছিল, সে-ই একলা যাবে।

[প্রস্থান]

শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। ওর আবার বুকের ব্যামো, ভয় হয় পাছে আমাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওর বিপদ ঘটে। যা হোক, আজ এ ব্যাপারটা কী হল। তুমি বললে চাবি-চুরি, ঘেরকমটা দেখা যাচ্ছে তাতে কথাটা—

বিধুমুখী। সবই তো শুনছে। বলতে গেলে সতীশেরই জিনিস, ওরই আপন প্রপিতামহের। আজ বাদে কাল ওরই হাতে আসত, সেইটে নিয়েছে বলেই—

শশধর। তা যা বল বউ, কাজটা ভালো হয় নি, ওটা চুরিই বটে।

বিধুমুখী। তাই যদি হয়, তবে প্রপিতামহের দান সতীশকে নিতে না দিয়ে উনি সেটা তালাবন্ধ করে রেখেছেন, সেও কি চুরি নয়। এ-গুড়গুড়ি কি ওঁর আপন উপার্জনের টাকায়।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না, এখন কী মর্শাকিলে পড়েছ দেখো দেখি।

সতীশ। মূর্খকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি? ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত।

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধুমুখী। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি-বা কখনো মনেও আসে, তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, তোমাকেও বলে রাখি, আমি যেমন করে পারি সেই নেকলেসটা ফিরিয়ে এনে বাবার গুড়গুড়ি উদ্ধার করে তাঁর হাতে দিয়ে তবে এ বাড়ি থেকে ছুটি নেব। বাবার সম্পত্তি যে আমার নয়, এ কথাটা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি। আর যাই হোক, আমার প্রাণটা তো আমার, এটা তো বাবার লোহার সিন্দকে বাঁধা পড়ে নি, এটা তো রাখতেও পারি ফেলতেও পারি।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধুমুখী। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্ দিন কী করে বসে। আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে, শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। কী সর্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল, এমন-সব কথা মনেও আনিব নে। চুপ করে রইলি যে? লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কত বড়ো পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলে-মানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্থ আমার মাথায় ইন্ট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশাই, সে-ইন্ট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে এক্জামিনে ফেল করেছি, তার উপর দেনা; এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায়, তবে বাবা আমার সে-অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধুমুখী। সত্যি দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শুনে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমিই নাহয় ওকে মানুষ করি? কী বলো গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মূখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই, এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কী বলেন; বাচ্ছাই বা কী বলে।

সুকুমারী। যা বলে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

বিধুমুখী। দিদি!

সুকুমারী। আর দিদি-দিদি করে কাঁদতে হবে না। চল্ তোর চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিরি করে তোর ভগ্নীপতির সামনে বার হতে লজ্জা করে না?

[শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

মন্মথর প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মথ। তা জানি নে, কিন্তু যার যেটা প্রাপ্য, সে তাকে পেতেই হবে।

শশধর। প্রাপ্যের চেয়েও বড়ো জিনিস আছে, তার 'পরেও মানুষের দাবি থাকা অন্যায় নয়।

মন্মথ। মিথ্যে আমাকে বলছ। হয়তো সব দোষ আমারই, একলা আমারই! তার শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েছি। এখন তোমরাই যদি সংশোধনের ভার নাও তো নাও, আমি নিষ্কৃতি নিলুম।

[উভয়ের প্রস্থান]

সতীশের বেগে প্রবেশ

সতীশ। (উচ্চস্বরে) মা, মা!

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। কী সতীশ, কী হয়েছে।

সতীশ। ঠিক করেছি, যেমন করে হোক নেকলেসটা নেলির কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবই।

বিধুমুখী। কী ছুতো করবি।

সতীশ। কোনো ছুতোই না। সত্যি কথা বলব। নেলির কাছে আমি কিছু লুকোব না।

বিধুমুখী। না না, সে কি হয়।

সতীশ। বলব গুড়গুড়ির কথা—বলব আমার অবস্থা কত খারাপ। আমি নেলিকে ফাঁকি দিতে পারব না।

বিধুমুখী। সতীশ, আমার কথা শোন, বিয়েটা আগে হোক, তার পরে সত্যি মিথ্যে যা ইচ্ছে তোর তাই বলিস।

সতীশ। সে আমি কিছুতে পারব না। আমি জানি, নেলি একটুও মিথ্যে সহিতে পারে না। আমি কিছু লুকোব না। আগাগোড়া সব বলব।

বিধুমুখী। তার পরে?

সতীশ। (ললাট আঘাত করিয়া) তার পরে কপাল!

তৃতীয় দৃশ্য

মিস্টার লাহিড়ির বাড়িতে টেনিস ক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়।

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিসপার্টি জানতেম না, আমি টেনিসসুট পরে আসি নি।

নলিনী। জন্মবলের যত বাছুর আছে সকলেরই তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার নাহয়

ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্ছি।—মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন-না—আমি আপনারই সেবার্থে।

নলিনী। যদি একেবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিসসুট প'রে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন, জাল, ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি। টেনিসসুট না প'রে এলেই যদি আপনার এত দয়া হয়, তবে আমার এই টেনিসসুটটা মিস্টার সতীশকে দান ক'রে তাঁর এই—এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী সুট, সতীশ। খিচুড়ি-সুটই বলা যাক্—তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি-সুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তবে লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার নিতান্তই আপত্তি থাকে, তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস লাহিড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।

নলিনী। শোনো, শোনো সতীশ, শুনেন রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক-ডাচেস ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথাও কন নি! মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শুনছ সতীশ, রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিসসুট সম্বন্ধে তোমার যেরকম সুক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান, তাতে আশা হয়।

[অন্য গমন]

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলেম না।

চারুবালা নন্দীর কাছে আসিয়া

চারু। মিস্টার নন্দী, সুশীলের সঙ্গে আমার একটা কথা নিয়ে ঘোর তর্ক হয়ে গেছে, আপনাকে তার নিষ্পত্তি করে দিতে হবে—আমি বাজি রেখেছি—

নন্দী। যদি আমার উপরেই নিষ্পত্তির ভার থাকে তা হলে বাজিতে আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন।

চারু। না না, আগে কথাটা শুনুন—তার পরে বিচার ক'রে—

নন্দী। যাদের ফেথ্ নেই সেই নাস্তিকরাই সব কথা আগাগোড়া শোনে, বিচার করে—কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি জিনিস আছে, শাস্ত্র যাদের বলে অন্ধ। আমি দেবী-ওয়ারশিপার, অন্ধভক্ত।

চারু। আপনার কথা শুনলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি, আপনি অক্সফোর্ডে পড়েছেন। এখন আমাদের বাজির কথাটা শুনুন। সুশীল বলতে চায়, আমার এই শাড়ির রঙের সঙ্গে আমার এই জুতোর রঙ মানায় না।

নন্দী। সুশীল নিশ্চয় রঙকানা। আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর চমৎকার ম্যাচ হয়েছে। যদি মাপ করেন তো বলি, আপনার এই রুমালটার রঙ—

চারু। এ বুঝি আমার রুমাল? এ-যে নেলির—সে জোর করে আমাকে দিলে—বহরমপুর না কোথা থেকে এই ফুলকাটা মুসলমানি ফ্যাশানের রুমাল কিনেছে। আমাকে বললে, সাজের মধ্যে অন্তত একটা দিশি জিনিস থাক।

নন্দী। আই সী—মিস বোস, আপনি টেনিসের নেক্‌স্ট সেটে পার্টনার ঠিক করেছেন?

চারু। না।

নন্দী। আমাকে যদি সিলেট করেন, তা হলে দেখতে পাবেন, আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর ঘেরকম ম্যাচ হয়েছে, টেনিসে আপনার সঙ্গে আমার তার চেয়ে খারাপ ম্যাচ হবে না।

চারু। আপনাকে পার্টনার পেলে তো জিতবই। আমি ভেবেছিলাম, নেক্‌স্ট সেটে আপনি বুদ্ধি নেলির সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড্‌।

নন্দী। না, she wanted to be excused।

চারু। ওঃ, বোধ হয় সতীশের সঙ্গে কথা আছে। আমি তো বুঝতে পারি নে সতীশের মধ্যে নলিনী কী-যে দেখেছে!

নন্দী। দেখেছে ওর মনুমেন্টাল অ্যাবসার্ভিটি, আর তার চেয়ে অ্যাবসার্ড ওর—থাক্, সে-কথা থাক্‌।

চারু। কিন্তু ওর মতো অতবড়ো অযোগ্য লোককে—

নন্দী। অযোগ্যতা হচ্ছে শূন্যপেয়াদা, কৃপা দিয়ে ভরা সহজ।

চারু। শূন্য কেবল কৃপা! ছি! শ্রদ্ধা কি তার চেয়ে বড়ো নয়। চলুন খেলতে। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি ভারি বিদ্রী খেলি।

নন্দী। খেলায় আপনি হারতে পারেন, কিন্তু বিদ্রী খেলাতে কিছুতেই পারেন না।

চারু। থ্যাঙ্ক্‌স্‌।

[উভয়ের প্রস্থান]

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিসকোর্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায় হায়, কোর্তাহারা অভাগা হৃদয়ের সান্ধনা জগতে কোথায় আছে—দরজির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার ঠিকানা যদি জানতে, তা হলে খুব বেশি দূরে তাকে খুঁজে বেড়াতে হত না।

নলিনী। (করতালি দিয়া) হ্যাভো! মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিস্ট কথার আমদানি শুরুর হয়েছে। উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে। এসো, একটু কেক খেয়ে যাবে; মিস্ট কথার পুরস্কার মিস্টান।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো—টেনিসকোর্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা বুলিয়ে বেড়ানোর সর্বাধিকার হয় না।

সতীশ। নেলি, আজ তোমাকে একটা খুব বিশেষ কথা বলতে এসেছি—

নলিনী। না না, বিশেষ কথার চেয়ে সাধারণ কথা আমি ভালোবাসি।

সতীশ। যেমন করে হোক বলতেই হবে, নইলে বাঁচব না, তার পরে যদি বিদায় করে দাও তবে মাথা হেঁট করে জন্মের মতোই—

নলিনী। সর্বনাশ! সহজে বলবার কথা পৃথিবীতে এত আছে যে, চমক-লাগানো কথা না বললেও সময় কেটে যায়। আমরাও বলবার কথা একটা আছে, তার পরে যদি সময় থাকে তুমি বোলো।

সতীশ। আচ্ছা, তাই আগে বলে নাও, কিন্তু আমার কথা শুনতেই হবে।

নলিনী। বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি, বলে নিই; রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেছ বলে রাগ করব, আমি এত বড়ো স্যাক্‌স্‌?

নলিনী। সকল সময়েই নন্দীসাহেবের চেলারিগিরি কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে। সেই তোমার নেকলেস?

সতীশ। নেকলেস? সেটা কি তবে—

নলিনী। ভুল বুঝো না—জিনিসটা খুব ভালো। কিন্তু তুমি যে এটে কেনবার জন্যে—

সতীশ। নেলি, চুপ চুপ, তোমার মুখে আমি সে কথা শুনতে পারব না। কে তোমাকে কী বলেছে, সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—

নলিনী। হঠাৎ অমন খেপে উঠলে কেন। কী মিথ্যে কথা? নেকলেসটা তুমিই আমাকে দিয়েছ, সেও কি মিথ্যে কথা।

সতীশ। না, না। হাঁ, তা হতেও পারে, এক রকম করে দেখলে হয়তো—

নলিনী। নেকলেস এক রকম করে ছাড়া আর ক'রকম করে দেখা যায়? কথা উঠতে না উঠতেই আগে থাকতেই তুমি যেন—

সতীশ। আচ্ছা, তা বলো, কী বলছিলে বলো।

নলিনী। কিছু না, খুব সাদা কথা, অমন দামি জিনিস আমাকে কেন দিলে।

সতীশ। আচ্ছা বেশ, তা হলে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

নলিনী। ঐ দেখো, আবার অভিমান।

সতীশ। আমার মতো অবস্থার লোকের অভিমান কিসের। দাও, তবে ফিরিয়েই দাও।

নলিনী। ভয়ানক সূর কর যদি তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা কওয়াই শক্ত হয়। একটু শান্ত হয়ে শোনো আমার কথা। মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি রেসলেট পাঠিয়ে-ছিলেন, তুমি অমানি নির্বোধিতার সূর চাড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেকলেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। সেটা বোঝবার শক্তি থাকলেই তো মানুষের কোনো মূর্খকিল ঘটে না। যে-অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে-অবস্থাটা তোমার একেবারে জানা নেই বলে তুমি রাগ কর, নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু ও নেকলেস তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্য যে-দান, আমার কাছে সে-দানের মূল্য নেই।

সতীশ। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে! এমন কথা তুমি বললে? অন্যায় বলছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতাম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছু বলি নি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেকলেস।

সতীশ। আচ্ছা, তবে নিলুম।

হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধূলোয় ফেলিয়া দিল

নলিনী। ও কী হল।

সতীশ। ভেবেছিলুম ওর দাম আছে, ওর কোনো দাম নেই।

নলিনী। (তুলিয়া লইয়া) তুমি রাগই কর আর যাই কর, আমার যা বলবার তোমাকে বলবই। আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ে না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। (চমকিয়া উঠিয়া) কে বললে ধার হয়েছে। কে বললে তোমাকে। একজন কেউ আছে, সে লাগালিগি করছে। তার নাম বলো; আমি তাকে—

নলিনী। আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো।

সতীশ। বলতেই হবে তোমাকে কে বলেছে আমার ধারের কথা। আমি তাকে দেখে নিতে চাই।

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে; আজকালকার দিনে

প্রাণ দেবার ভদ্র উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তত ধার করার দঃখটুকু স্বীকার করবার যে-সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা মৃত্যুর চেয়েও দঃসাধ্য, আমি তোমার জন্যে তাই করতে চাই নেলি, একে যদি তুমি নন্দীসাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা করবার তা তো করেছ—তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। তবে দাও, তাই দাও। যদি আমার অন্তরের কথাটা বুঝে থাক, তা হলে—

নলিনী। থাক্ থাক্, অন্তরের কথা অন্তরমহলেই থাক্। নেকলেসটা এই নিয়ে যাও।

সতীশ। (হাতে লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সেই ভালো, তবে যাই। (কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) দয়া করো নেলি, দয়া করো—যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে ওটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ থেকে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন, আমার জন্যেই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে। সতীশ, তোমার এই নেকলেসটা হাতে করে নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি করে নিয়েছি, এই কথাটা তোমাকে বুঝে দেখতে হবে। নইলে কখনোই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতুম না। দিলে অপমান করা হত। বুঝতে পারছ?

সতীশ। সম্পূর্ণ না।

নলিনী। তোমার দান-করা কেই আমি বেশি মান দিয়েছি বলেই তোমার দানের জিনিসকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি। মনে করো-না, এটা হারিয়ে গেছে, সেই হারানোতে তোমার দান তো একটুও হারায় না।

সতীশ। ঠিক বলছ, নেলি?

নলিনী। ঠিক বলছি। আমি যেমন সহজে এটি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিছি, তেমনি সহজে তুমি এটি আমার হাত থেকে ফিরে নাও। তা হলে আমি ভারি খুশি হব।

সতীশ। খুশি হবে? তবে দাও। (নেকলেস লইয়া) কিন্তু যে-হাত দিয়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, সেই হাতেই তুমি আর-একজনের ব্রেসলেট পরেছ, সে যেন আমাকে—

নলিনী। ওতে কন্যার হাত নেই সতীশ, আছে কন্যাকর্তার হাত। বাবা বিশেষ করে বলেছিলেন, আজ—

সতীশ। আচ্ছা, ঐ ব্রেসলেট চিরদিনই তোমার হাতে থাক্—এই নেকলেস কেবল কিছুক্ষণের জন্যে গলায় পরো, তার পরে আমি নিয়ে যাব।

নলিনী। পরলে বাবা রাগ করবেন।

সতীশ। কেন।

নলিনী। তা হলে এই ব্রেসলেট পরার দাম কমে যাবে—ফের মূখ গম্ভীর করছ?

সতীশ। কথাটা কি খুব প্রফুল্ল হবার মতো।

নলিনী। নয় তো কী। তোমার কাছে যে আমি এত খুলে কথা বলি, তার কোনো দাম নেই? অকৃতজ্ঞ! মিস্টার নন্দীর সঙ্গে আমি এমন করে কইতে পারতুম? এবার কিন্তু টেনিসকোর্ট থেকে যাও।

সতীশ। কেন যেতে বলছ, নেলি। এখানে আমাকে মানায় না?

নলিনী। না, মানায় না।

সতীশ। চাঁদনির কাপড় পরি বলে?

নলিনী। সে একটা কারণ বৈকি।

সতীশ। তুমি আমাকে এমন কথা বললে?

নলিনী। আমি যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি, খুশি হোয়ো, অন্যে বললে রাগ করতে পার।

সতীশ। তুমি আমাকে অযোগ্য বলে জান, এতে আমি খুশি হব?

নলিনী। এই টেনিসকোর্টের অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে লজ্জা পাও? এতেই আমি নব চেয়ে লজ্জা বোধ করি। তুমি তো তুমি, এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দুই হাত জোড় করে পায়ের ধুলো নিয়েই তাঁকে বলতুম, ভগবান, লাহিড়ীদের বাড়ির এই টেনিসকোর্টে আপনাকে মানায় না, মিস্টার নন্দীকে তার চেয়ে বেশি মানায়। শুনেন কি তখনি তিনি হার্মানের বাড়ি ছুটতেন টেনিসসুট অর্ডার দিতে।

সতীশ। বুদ্ধদেবের সঙ্গে—

নলিনী। তোমার তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি বলতে চাই, টেনিসকোর্টের বাইরেও একটা মস্ত জগৎ আছে—সেখানে চাঁদনির কাপড় পরেও মনুষ্যত্ব ঢাকা পড়ে না। এই কাপড় পরে যদি এখনি ইন্দ্রলোকে যাও তো উর্বশী হয়তো একটা পারিজাতের কুঁড়ি ওর বাট্‌ন্থোলে পরিষে দিতে কুণ্ঠিত হবে না—অবিশ্যি তোমাকে যদি তার পছন্দ হয়।

সতীশ। বাট্‌ন্থোল তো এই রয়েছে, গোলাপের কুঁড়িও তোমার খোঁপায়—এবারে পছন্দের পরিচয়টা কি ভিক্ষে করে নিতে পারি।

নলিনী। আবার ভুলে যাচ্ছ, এটা স্বর্গ নয়, এটা টেনিসকোর্ট।

সতীশ। এটা যে স্বর্গ নয়, সেইটে ভুলতে পারি নে বলেই তো—

নলিনী। এইবার তো নন্দীর সুর লাগছে গলায়—

সতীশ। তার একটিমাত্র কারণ—আমি টেনিসকোর্টেরই যোগ্য হতে চাই। উর্বশীর হাতের পারিজাতের কুঁড়ির 'পরে আমার একটুও লোভ নেই।

নলিনী। বড়ো দুঃসাধ্য তোমার তপস্যা, সতীশ—স্বর্গে তোমার কম্পিটিশন কার্তিককে নিয়ে, চাঁদকে নিয়ে—এখানে আছেন স্বয়ং মিস্টার নন্দী। পেরে উঠবে না, কন্যাকর্তাদের সব দামি দামি অর্কিড গুঁরই বাট্‌ন্থোলে গিয়ে পেরিচ্ছে। ছেড়ে দাও আশা।

সতীশ। অর্কিডের আশা ছেড়েছি, কিন্তু ঐ গোলাপের কুঁড়ি—

নলিনী। ওটা বাবা যখন দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কামনা করেছিলেন, ওর সম্ভাতি হয় যেন—

সতীশ। অর্থাৎ—

নলিনী। ঐ অর্থাতের মধ্যে অনেকখানি অর্থ আছে।

সতীশ। আর আমি যে তোমার স্তব করে মরি, তার মধ্যে যতটা শব্দ আছে ততটা অর্থ নেই?

নলিনী। যদি কিছু থাকে, সে কন্যাকর্তাদের অমরলোকের উপযুক্ত নয়।

সতীশ। অতএব আমাকে সদ্য স্বর্গপ্রাপ্তির চেষ্টা করতে হবে। চললেম তবে সেই তপস্যায়।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। হ্যালো সতীশবাবু! ও কী ও! সেই নেকলেসটা নিয়ে চলেছ যে! সেদিন তো অ্যালবুম নিয়ে সরে পড়েছিলে, আজ নেকলেস? Bravo! You know how to eat your pudding and yet to keep it.

সতীশ। বুদ্ধতে পারছি নে আপনার কথা।

নন্দী। আমরা যা দিই তা ফিরে নিই নে, তার বদলেও কিছু ফিরে পাই নে। দেবার হাত, নেবার হাত, দুই হাতই খালি থাকে। You are lucky, বিনা মূলধনে ব্যাবসা করে এত এনর্জাস প্রফিট।

নলিনী। ও কী সতীশ, হাতের আঙ্গিটন গুটোচ্ছে যে, মারামারি করবে নাকি। তা হলে মাঝের থেকে আমার নেকলেসটা ভাঙবে দেখছি। দাও ওটা গলায় পরে নিই।—

নেকলেস লইয়া গলায় পরা

অর্মনি নেব না, সতীশ, এর দাম দেব।—

গোলাপের কুণ্ডি সতীশের বাট্‌ন-হোলে পরাইয়া

মিস্টার নন্দী, আপনার রেসলেট আপনি নিয়ে যান।

নন্দী। কেন।

নলিনী। এর দাম আমার কাছে নেই।

নন্দী। বিনা দামেই তো আমি—

নলিনী। আপনার খুব দয়া। কিন্তু আমার তো আত্মসম্মান আছে। এসো সতীশ, তোমাদের দুজনের লড়াই দেখবার সময় আমার নেই। তার চেয়ে এসো বেড়াতে বেড়াতে গল্প করি, সময়টা কাটবে ভালো।

[উভয়ের প্রস্থান]

চারুদ্বালার প্রবেশ

চারু। মিস্টার নন্দী, আপনার নৈবেদ্য দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সামনে দেবতা নেই যে।

নন্দী। কে বললে নেই।

চারু। সাকার দেবতার কথা বলছি, নিরাকারের খবর জানি নে।

নন্দী। পূজা যদি নেন, তা হলে করকমলে—

চারু। আপনি মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখেন নাকি! আমি তো—

নন্দী। হাঁ, ভুল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছই--

চারু। তার পরে রিডাইরেক্টেড্ হয়ে—

নন্দী। ঘুরে আসতে হয়।

চারু। আজ আপনার কপালে তারই ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

নন্দী। ছাপের সংখ্যা আর বাড়াবেন না, তা হলে কলঙ্কের চিহ্নটাই জাগবে: ঠিকানাটাই পড়বে চাপা।

চারু। আপনার মতো আলাপ করতে আমি কাউকে শুনিনি—চমৎকার কথা কইতে পারেন।

নন্দী। শুধু যে কেবল কানে শোনার কথাই আমার সম্বল তা নয়, হাতে সোনাও জোগাতে পারি, এইটে প্রমাণ করতে দিন।

চারু। আপনি বাংলাতেও pun করতে পারেন—ক্ষমতা আছে। কিন্তু মিস্টার নন্দী, ও রেসলেট তো নেলির—

নন্দী। সেইটেই তো হয়েছিল মস্ত ভুল। শোধরাবার অপর্চুনিটি যদি না দেন, তা হলে উদ্ধার হবে কী করে।

চারু। ঐ নেলি আসছে, চলুন আমরা ঐদিকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

নলিনী ও সতীশের প্রবেশ

নলিনী। যথেষ্ট হয়েছে সতীশ, আজ যদি মিষ্টি কথা বলবার চেষ্টা কর তা হলে কিন্তু রসভঙ্গ হবে।

সতীশ। আচ্ছা, আমাকে যদি একেবারে চুপ করিয়ে রাখতে চাও, তা হলে ঐ গানটা আমাকে শোনাও।

নলিনী। কোন্‌টা।

সতীশ। সেই-যে—উজাড় করে দাও হে আমার সকল সম্বল।

নলিনীর গান

উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল।
শুদ্ধ ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।

চৈত্ররাতের বেলায়

নাহয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরমদিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে,
তবে ভাঙা খেলার ঘরে
নাহয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

লাহিড়িসাহেবের প্রবেশ

লাহিড়ি। নেলি, এই দিকে এসো। শূনে যাও। (জনান্তিকে) সতীশের বাপ মারা গেছেন।
নলিনী। সে কী কথা।

লাহিড়ি। মাদ্রাজে। সেও আজ তিন দিন হল। হার্টের উইক্‌নেস থেকে।

নলিনী। সতীশ জানে না?

লাহিড়ি। না—মন্মথ বাড়ির লোককে কাছে ডাকতে মানা করেছিলেন। সেখানে গুঁর বাড়ির ঠিকানাও কেউ জানত না। দৈবাৎ পূজোর ছুটিতে একজন বাঙালি উকিল সেখানে ছিল, মৃত্যু-শয্যায় সেই তাঁর উইল তৈরি করেছে। সে আজ এসে পৌঁছেছে। আমাকে সে জানে—আমার কাছেই প্রথম এসেছিল, আমি মন্মথর বাড়িতে তাকে এইমাত্র রওনা করে দিলুম। তুমি সতীশকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দাও।

[প্রস্থান]

নলিনী। সতীশ, চা পড়ে রয়েছে, খেয়ে নাও।

সতীশ। আমার ইচ্ছে করছে না।

নলিনী। আমার কথা শোনো, শূদ্ধ চা নয়, কিছুর খাও। এই নাও রুটি।

সতীশ। মনে রেখো নেলি, গরিব বলেই আমার দানের দাম অনেক বেশি।

নলিনী। দেখো, ও কথা আজ থাক্। কাল হবে। এখন তুমি খেয়ে নাও।

সতীশ। তাড়া দিচ্ছ কেন—আমার তো আপিস নেই।

নলিনী। চুপ চুপ, কথা কোয়ো না, খাও। আরেকটু খাও। এই নাও।

সতীশ। আর পারছি নে—আমার হয়েছে। আমার খাবার রুচি চলে গেছে।

নলিনী। আচ্ছা, তা হলে এসো—শোনো। তোমাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই।

সতীশ। আমার এমন সৌভাগ্য তো আর কখনো—

নলিনী। চুপ চুপ। চলে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান]

লাহিড়ি ও লাহিড়ি-জায়ার প্রবেশ

লাহিড়ি-জায়া। সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে?

লাহিড়ি। হাঁ।

জায়া। কে যে বললে সমস্ত সম্পত্তি অনাথ-আশ্রমে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মায়ের জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ। এখন কী করা যায়!

লাহিড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি। তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে, সেটা বদ্বি তুমি দুই চক্ষু খেয়ে দেখতে পাও না। তোমার নেলি এ দিকে লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে নন্দীকে দেশছাড়া করে দিয়েছে। নন্দী তো ভয়ে ওর কাছেই ঘেঁষতে চায় না। জানো বোধ হয়, চারদুই সঙ্গে সে এন্‌গেজড্‌।

লাহিড়ি। সেদিন টেনিসকোর্টেই সেটা বোঝা গিয়েছিল।

জায়া। এখন উপায় কী করবে।

লাহিড়ি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর কোনোদিন নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির উপর নির্ভর করে বসেছিলে। অন্যবস্ত্রটা বদ্বি অনাবশ্যক?

লাহিড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষুধাশান্তি হয় না।

লাহিড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল—অগাধ টাকা। ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চটপট নিক্‌-না। তুমি একটু তাড়া দাও-না।

লাহিড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে—এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও-না।

লাহিড়ি। ব্যস্ত হোয়ো না—পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলাম সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার আমাদের নেলি যেরকম জেদালো মেয়ে, সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখো, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

লাহিড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে, সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। এক সময় আমি ভাবতুম, নন্দীর ওপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো-না, বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কান্ডটাই করে। কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

শশধরের ঘর। সম্মুখেই বাগান

সতীশ। বাবার শাপ এখনো ছাড়ে নি মা, এখনো ছাড়ে নি। তিনি আমার ভাগ্যের উপরে এখনো চেপে বসে আছেন।

বিধুমুখী। আমাদের যা করবার তা তো করেছি, গয়াতে তাঁর সর্পিণ্ডকরণ হয়ে গেল—তোর মাসির কল্যাণে ব্রাহ্মণবিদায়েরও ভালো আয়োজন হয়েছিল।

সতীশ। সেই পুণ্যফল মাসির কপালেই ফলল। নইলে—

বিধুমুখী। তাই তো। নইলে এত বয়সে তাঁর ছেলে হবে, এমন সর্বনেশে কথা স্বপ্নেও ভাবি নি।

সতীশ। অন্যায় অন্যায়! বাবার সম্পত্তি পেতে পারতুম, তার থেকে বঞ্চিত হইলাম; তার পরে আবার—কী অন্যায়।

বিধুমুখী। অন্যায় নয় তো কী। নিজের বোনপোকে এমন করেও ঠকালে? শেষকালে দয়াল-ডাক্তারের ওষুধ তো খাটল; আমরা কালীঘাটে এত মানত করলাম, তার কিছুই হল না। একেই বলে কলিকাল। একমনে ভগবানকে ডাক—তিনি যদি এখনো—

সতীশ। মা, এদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল—কিন্তু যেরকম অন্যায় হল, তাতে—ঈশ্বরের কাছে—তিনি দয়া করে যেন—

বিধুমুখী। আহা, তাই হোক—নইলে তোর উপায় কী হবে, সতীশ। হে ভগবান তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় ঈশ্বরকে আমি আর মানব না; কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব। কে বলে তিনি মঙ্গলময়।

বিধুমুখী। আরে চুপ চুপ, এখন এমন কথা মনে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কী না ঘটতে পারে।—সতীশ, আজ বুঝি ওদের ওখানে যাচ্ছিস?

সতীশ। হাঁ।

বিধুমুখী। তোর সেই সাহেবের দোকানের কাপড় পরিস নি যে বড়ো?

সতীশ। সে-সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিধুমুখী। সে আবার কবে হল।

সতীশ। অনেক দিন। টেনিসপার্টিতে নলিনীকে কথা দিয়ে এসেছিলাম।

বিধুমুখী। সে যে অনেক দামের!

সতীশ। নইলে পোড়বার মজুরি পোষাবে কেন। স্বর্ণলঙ্কারও তো অনেক দাম ছিল।

বিধুমুখী। তোমাদের বোঝা আমার কর্ম নয়। যাই, দিদির খোকাকে নাওয়াতে হবে।

[প্রস্থান]

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। সতীশ!

সতীশ। কী মাসিমা।

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বুঝি!

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা। কাল লাহিড়িসাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই—

সুকুমারী। লাহিড়িসাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেব মানুষ; তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে। আমি তো শুনলেম, তোমাকে তারা পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিঙ পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই। এ দিকে একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে ক'রে ভুল করে। কিন্তু সরকারও তো ভালো—সে খেটে উপার্জন ক'রে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো অনেক আগেই তা পারতাম, কিন্তু তুমিই তো—

সুকুমারী। তাই বটে! জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন বুঝছি, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। আমি আরো ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই যত দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই নাহয় যত দোষ, তবু যে-কদিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্ছ, দরকারমত দুটো কাজই নাহয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি।

সুকুমারী। আজ তোমার আঁপসের ছুটি আছে, তোমাকে দোকানে যেতে হবে। খোকার জন্য সাড়ে-সাত গজ রেন্‌বো সিল্ক চাই—আর একটা সেলার স্‌ট।

[সতীশের প্রস্থানোদ্যম]

শোনো শোনো, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো। জুতো চাই।—

[সতীশ প্রস্থানোদ্যম]

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—সবগুলো ভালো করে শূনেই যাও। আজও বদ্বি লাহিড়িসাহেবের রুটি-বিস্কিট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে? খোকার জন্য স্ট্র-হ্যাট এনো—আর তার রুমালও এক ডজন চাই।—

[সতীশের প্রস্থান। পুনরায় ডাকিয়া]

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শুনলেম তোমার মেসোর কাছ থেকে তুমি নতুন স্‌ট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত-খুশি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সায় লাহিড়িসাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে-টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

সুকুমারী। এখনো দোকান খুলতে দেরি আছে। কিন্তু টাকা বাকি যা থাকে, ফেরত দিয়ো যেন। একটা হিসাব রাখতে ভুলো না।—

[সতীশের প্রস্থানোদ্যম]

শোনো সতীশ, এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজন্যে তোমাকে কিছুর আনতে বলতে ভয় করে। দু পা হেঁটে চলতে হলেই অর্মানি তোমার মাথায়-মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষমানুষ এত বাবু হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুনবাজার থেকে মাছ কিনে আনতেন—মনে আছে তো? মূটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে—আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মূটে-ভাড়া, বেহারার মাইনে, যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে।—

সেই চিঠিটা এইবেলা শেষ করি, নইলে সময় পাব না।

[সুকুমারীর প্রস্থান]

চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত

হরেনের প্রবেশ

হরেন। দাদা, ও কী লিখছ, কাকে লিখছ, বলো-না।

সতীশ। যা যা, তোর সে খবরে কাজ কী, তুই খেলা করগে যা।

হরেন। দেখি-না কী লিখছ—আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি—যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা—ভালবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ, বলো-না। কাঁচা পেয়ারা?

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যা কথা বলছ! ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার—ভালবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী, দাদা। এ-যে ফুলের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস নে—হাত দিস নে, ছিঁড়ে ফেলবি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। আঁ, মিথ্যে কথা। আমি তোমাকে লজ্জাস আনতে বলেছিলাম, তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ—তাই বৈকি, আরেকজনের জিনিস বৈকি!

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, একটুখানি চুপ কর, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজ্জাস কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি। (স্টেট লইয়া চীৎকারস্বরে) ভয়ে আকার ভা—

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস নে।—আঃ, থাম্ থাম্।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, খবরদার ছিঁড়িস নে।—ও কী করলি। যা বারণ করলেম তাই, ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি। এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি। (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা এখান থেকে—যা বলছি! যা!

[হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন ও সতীশের সবেগে প্রস্থান]

বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ বন্ধু হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধুমুখী। আচ্ছা, চুপ কর, চুপ কর, আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধুমুখী। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি। [হরেনের ক্রন্দন] এমন ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আদর দিয়ে ছেলের মাথা খাচ্ছেন। যখন ঘোঁট চায় তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একেবারে নবাবপুত্র! ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়। (সতর্কনে) খোকা, চুপ কর বলছি, ঐ হাম্‌দোবুড়ো আসছে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু ও কী ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভুতের ভয় দেখাতে হয়। আমি ঢাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভুতের কথা বলতে সাহস করে না।—আর, তুমি বন্ধু মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ। কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দৃষ্টি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ করলেম, আর তুমি বন্ধু আজ তারই শোধ নিতে এসেছ।

বিধুমুখী। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে সতীশ আর তোমার হরেনের প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধুমুখী। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না, তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ, দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে-পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ বন্ধু। ওকে তোমাদের

সহ্য হচ্ছে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, থোকা রোজ ডাক্তার-কবরেজের বোতল-বোতল ওষুধ গিলছে, তবু দিন-দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

[সকলের প্রস্থান]

সতীশ ও নলিনীর প্রবেশ

সতীশ। এ কী, তুমি যে এ বাড়িতে?

নলিনী। শশধরবাবু বাবাকে কী একটা আইনের কাজে ডেকেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।

সতীশ। আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে চাই, নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে।

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। যে-লোক সন্ধান জানে সে-তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বদলি ঠিক হাল ফ্যাশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাঁও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সতাই বলছি, নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দণ্ড কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হুংকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার লাহিড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। এতবড়ো অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাথে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিই।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, এমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনেন রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না।

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায় সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বয়ং নন্দী-সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের এক চুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফ্যাশানের টাই নই—কলার নই—দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান।

নলিনী। ঐ-যে, বাবা ডাকছেন। তাঁর কাজ হয়ে গেছে। যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

সুকুমারী ও শশধরের প্রবেশ

সুকুমারী। দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, আমার হরেনকে মারবার জন্যেই ওরা মায়ে-পোয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে।

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি!

সুকুমারী। আমি পাগল, না তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই, দেখ নি, ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে? সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুড়র ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোলো। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শূনি।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখ-না, আমরা হরেনকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কী রকম, সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ, তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

সুকুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো—পুরুষমানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়। আর, যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্থমথ সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বদ্বিষিয়েছিলাম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হতে পারে! সব দোষ আমারই। তুমি তো আর-কারো কোনো দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই—

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন—আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও আর লম্বা কেন্দারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

সুকুমারী। সে জামি যা ভালো বোঝ তাই করো। কিন্তু আমি বলছি, সতীশ যতক্ষণ এ-বাড়িতে থাকবে খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে। কিন্তু আমি ওকে এক মূহুর্তের জন্য বিশ্বাস করি নে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না, মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে-অনিষ্ট করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শোখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো, শুনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ও মা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না—তা থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে তুমি যে-দুধকলা আমাকে খাইয়েছ, তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্য কথাই বলছ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি তোর মা, সতীশ।

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমাকে জেল থেকে ফিরিয়ে আনলে। সে কি মাসির ঘরের চেয়ে ভয়ানক।

শশধর। আঃ সতীশ! চলো চলো—কী বকছ, থামো।

সুকুমারী। নাও, তোমরা বোঝাপড়া করো—আমার কাজ আছে।

[প্রস্থান]

শশধর। সতীশ, একটু ঠান্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মুখে কী বলছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত শোধ করে দিতে না পারি তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ—একটু স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো; তোমার সম্বন্ধে আমরা যে-অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব, সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি—পরশু শুক্লবারে রেজিস্ট্রি করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধূলা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক্ থাক্! ও-সব স্নেহ-ফেহ আমি কিছু বদ্বি নে, রসকষ আমার কিছুই নেই। যা কর্তব্য তা কোনো রকমে পালন করতেই হবে, এই বদ্বি। সাড়ে-আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিম্ভিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও।—সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি

মিস্টার লাহিড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—তোমার প্রতি যে টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন। আরো-একটা সুখবর আছে সতীশ, তোমাকে যে-আপিসে কাজ করিয়ে দিয়েছি সেখানকার বড়োসাহেব তোমার খুব সুখ্যাতি করছিলেন।

সতীশ। সে আমার গুণে নয়। তোমাকে ভক্তি করেন বলেই আমাকে এত বিশ্বাস করেন।

[প্রস্থান]

শশধর। ওরে রামচরণ, তোর মাঠকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কী স্থির করলে।

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি।

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করেছ তো?

শশধর। তাই যদি না করব, তবে আর প্ল্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি, সতীশকে আমাদের তরফ মানিকপুর লিখে-পড়ে দেব—তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা, কী সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মূগ্ধ! না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলাম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না?

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই করো-না কেন তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝি নে—তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব—এই আমি বলে গেলেম।

[প্রস্থান]

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশায়, আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার লাহিড়ির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তালুক নেব না।

শশধর। কেন সতীশ।

সতীশ। নিজের কোনো মূল্য থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব। তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না, সে তিনি—অর্থাৎ, বুঝেছ—সে এক রকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—যদিই বা—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বৈকি। বিলম্বণ! তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে—ধৈর্য ধরে থাকলেই—
সতীশ। বৃথা চেষ্টা, মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাই নে।
তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি যে অল্প খাইয়েছেন তা উদ্ধার না করে আমি বাঁচব না।
তাঁর সমস্ত ঋণ সদৃশ শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই, সতীশ। তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। মাসিমাকে বোলো, আজই এখনি তাঁর কাছে
হিসাব চুকিয়ে তবে জলগ্রহণ করব।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

বাগান

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো
সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন
নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। ভালোই তো, যা মাইনে পাবে তাতেই বেশ চলে যাবে। তার উপরে যদি তোমার
জমিদারিটা তাকে দিয়ে বস, তবে একদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে
দেবে। আমার পরামর্শ নিয়ে যদি চলতে তবে সতীশ এতদিনে মানুষের মতো হত।

শশধর। বিধাতা আমাদের বৃদ্ধি দেন নি, কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন; আর তোমাদের বৃদ্ধি
দিয়েছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলোকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন—
আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন
যে-টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত, তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

সুকুমারী। রইল। সে তো বরাবরই ঐরকম লম্বাচোড়া কথা বলে থাকে। তুমি বুঝি সেই
ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ।

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ঐ-যে তোমার
সতীশবাবু আসছেন। আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না, এই দেখো, আমার হাতে অস্ট্রশস্ত্র কিছুই নেই—কেবল
খানকয়েক নোট আছে।

শশধর। ইস্, এ যে একতাজা নোট। যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সঙ্গে নিয়ে
বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা।
বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে, তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পরিশোধের

অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গুনে নাও। তোমার হরেনের পোলাও-পরমানে একটি তন্দুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কী কান্ড, সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গুনচট আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মুনফা পেয়েছি।

শশধর। সতীশ, এ-যে জুয়াখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ, আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি, মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ, তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী সুরু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুনে খাতাঞ্জির হাতে দাও-না, ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

নোটগুলি তুলিয়া গুনিয়া দেখা

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। আঁ, সে কী কথা। বেলা-যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয়, মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অল্পঋণ আর নতুন করে ফাঁদতে পারব না।

[প্রস্থান]

সুকুমারী। বাপের হাত থেকে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে পরিচয় মানদ্রব করলেম, আজ হাতে দুপয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ? কৃতজ্ঞতা এমনি বটে! ঘোর কলি কিনা!

[উভয়ের প্রস্থান]

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। এই পিস্তলে দুটি গুলি পুরেছি—এই যথেষ্ট। আমার অন্তিমের প্রেয়সী। ও কে ও? হরেন! কী করছিস? এই সন্ধ্যার সময় বাগানে অন্ধকার যে, চারি দিকে কেউ নেই—পালা, পালা, পালা। (কপালে আঘাত করিয়া) সতীশ, কী ভাবছিস তুই—ওরে সর্বনেশে, চুপ চুপ—না না না, এ কী বকছি। আমি কি পাগল হয়ে গেলুম—কে আছিস ওখানে। বেহারা, বেহারা! কেউ না, কেউ কোথাও নেই। মাসিমা! শুনতে পাচ্ছ? ইঃ, একেবারে লুটোপুটি করতে থাকবে। আঃ! হাতকে আর সামলাতে পারছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

[ছাড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সবেগে আঘাত করিল, কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না, শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।]

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা নাকি! তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কাঁচা পেয়ারা পাড়িছিলুম, বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়, মেসোমশায়, এই বেলা রক্ষা করো, আর দৌর কোরো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

হরেন। কিছুই হয় নি, মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

সুকুমারী। এ কী রকম বিস্তী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাসৃষ্টি। দেখো দেখি! আমার বুক এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে। সতীশ, মদ ধরেছ বুঝি!

র ৬। ৫ক

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও! নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

[হরেনকে লইয়া দ্রুতপদে সন্ধুমারীর পলায়ন]

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত থেকে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো, এই দেখো, মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্ দেখি! আপিসের সাহেব পদলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাস করতে এসেছে। যদি পালাতে হয়, এই বেলা পালা। হায় ভগবান, আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়, যা সন্দেহ করছ, তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, তুমি শূনে খুশি হবে, আমি চোর, আমি খুনী! তোমার কীর্তি পুরো হল। এখন আর কাঁদতে হবে না—যাও তুমি, যাও তুমি, যাও যাও, আমার সম্মুখ থেকে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বলো কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি।

শশধর। ঐ পিস্তলটা।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন থেকে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জানো না—

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে ক্ষমা করো।

বিধুমুখী। বাবা, আমার কপালে ক্ষমা না থাকে নাই থাক্, ভগবান তাকে যেন ক্ষমা করেন। দিদির কাছে যাই। তাঁর পাশে ধরি গে।

[প্রস্থান]

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উলটো হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্বেক করবার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলাম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে—

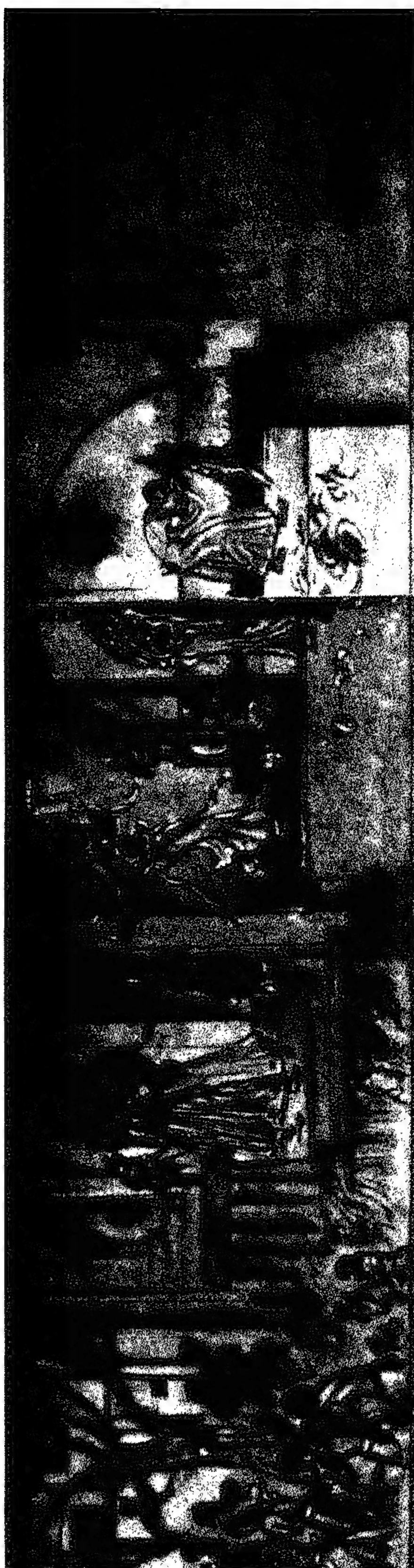
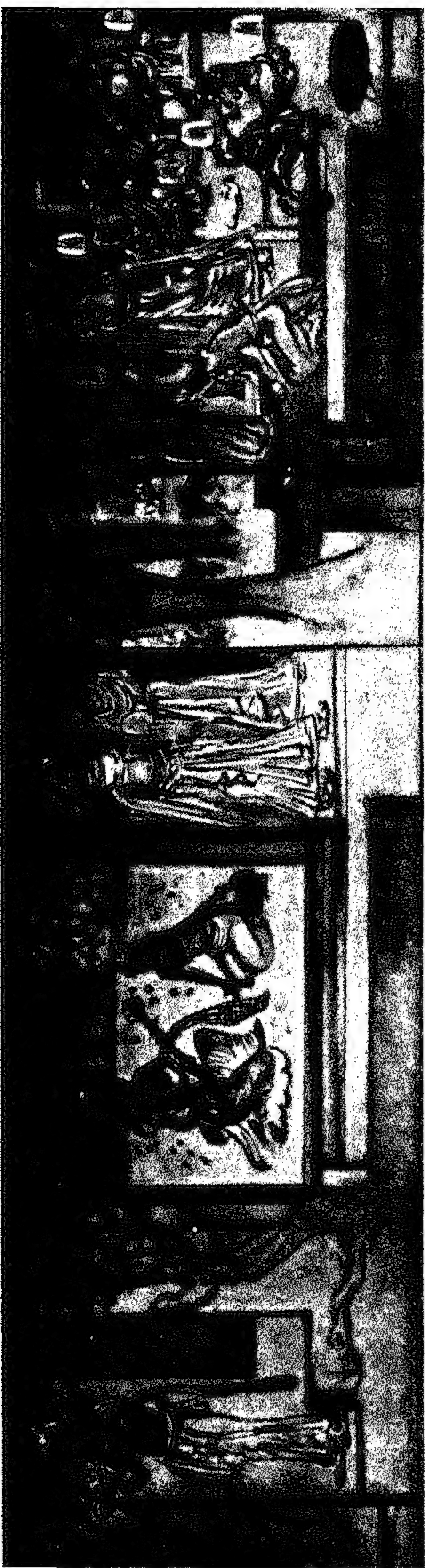
সতীশ। যেজন্য আমি এই সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী—আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর শ্রদ্ধা আছে।

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐজন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা—ছি ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে-কাজ করেছ আমিও তাই করেছি—তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগুলি সব এনেছি—এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদের না বলে চুরি করেই এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না।

শশধর। উদ্ধার হবে, এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে-ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই যে শশধরবাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না।—সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখাছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসি। ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে অতিথিসংকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।



নটীর পূজা : শান্তিনিকেতন চীনাভবন ভিত্তিগাত্র 'ফ্রেস্কো' নন্দনাল বসু - অঙ্কিত

নটীর পূজা

প্রকাশ . ১৯২৬

একই আখ্যানবস্তু অবলম্বনে 'কথা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের “পূজারিনী” কবিতা লিখিত। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে নটীর পূজার দ্বিতীয় অভিনয়কালে নাটকের 'সূচনা' প্রথম যোজিত হয় এবং উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন; অভিনয়পত্রীতে একটি ভূমিকা এবং নাট্যবিষয়সারও মন্দিরিত ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে গ্রন্থে 'সূচনা' অংশ সন্নিবিষ্ট।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ

ভিক্ষু উপালি

লোকেশ্বরী
মল্লিকা
বাসবী নন্দা রত্নাবলী
অজিতা ভদ্রা
উৎপলপর্ণা
শ্রীমতী
মালতী

রাজমহিষী, মহারাজ বিশ্বসারের পত্নী
মহারানী লোকেশ্বরীর সহচরী

রাজকুমারীগণ

বোধ ভিক্ষুণী

বোধধর্মরতা নটী

বোধধর্মনুরাগিণী পল্লীবালা :

শ্রীমতীর সহচরী

রাজকিংকরী ও রক্ষিণীগণ



নটীর পূজা : উপালি-বেশে রবীন্দ্রনাথ

সূচনা

ভিক্ষু উপালির প্রবেশ

গান

পূর্বগগনভাগে

দীপ্ত হইল সুপ্রভাত

তরুণারুণরাগে।

শুভ্র শুভ মুহূর্ত আজি

সার্থক করো রে,

অমৃতে ভরো রে,

অমিতপুণ্যভাগী কে

জাগে, কে জাগে।

কে আছ? ভিক্ষা চাই, ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা আমার।

নটীর প্রবেশ ও প্রণাম

শুভম্ভবতু কল্যাণম্। বৎসে, তুমি কে?

নটী। আমি এই রাজবাড়ির নটী।

উপালি। এই পুরীতে আজ একা কেবল তুমিই জেগে?

নটী। রাজকন্যারা সকলেই ঘুমিয়ে আছেন।

উপালি। ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই।

নটী। প্রভু, অনুমতি করুন, রাজকন্যাদের ডেকে আনি।

উপালি। আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি।

নটী। আমি যে অভাগী। প্রভুর ভিক্ষাপাত্র আমার দান কুণ্ঠিত হবে। কী দেব অনুমতি করুন।

উপালি। তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান।

নটী। আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী সে তো আমি জানি নে।

উপালি। না, ভগবান তোমাকে দয়া করেছেন, তিনি জানেন।

নটী। প্রভু, তা হলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন যা আছে আমার।

উপালি। তাই নেবেন, তোমার পূজার ফুল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে পুষ্প-বনের আশ্রয়দানকে আপনিই জাগিয়ে তোলেন। তোমার সেইদিন এসেছে আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী।

নটী। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

[প্রস্থান

রাজকন্যাদের প্রবেশ

প্রভু, ভিক্ষা নিয়ে যান। ফিরে যাবেন না, ফিরে যাবেন না। এ কী হল? চলে গেলেন? রজাবলী। ভয় কী তোমাদের বাসবী? ভিক্ষা নেবার লোকের অভাব নেই—ভিক্ষা দেবার লোকই কম।

নন্দা। না রজা, ভিক্ষা নেবার লোককেই সাধনা করে খুঁজে পেতে হয়। আজকের দিন ব্যর্থ হল।

[প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

মগধপ্রাসাদ-কুঞ্জবনে

মহারানী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা

লোকেশ্বরী। মহারাজ বিম্বিসার আজ আমাকে স্মরণ করেছেন?

ভিক্ষুণী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। আজ তাঁর অশোকচৈত্রে পূজা-আয়োজনের দিন—সেইজন্যেই বৃষ্টি?

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমা।

লোকেশ্বরী। পূজা? কার পূজা?

ভিক্ষুণী। আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মাৎসব—তাঁর উদ্দেশে পূজা।

লোকেশ্বরী। আর্ঘ্যপুত্রকে বোলো গিয়ে আমার সব পূজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউ-বা ফুল দেয় দীপ দেয়—আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি।

ভিক্ষুণী। কী বলছ মহারানী?

লোকেশ্বরী। আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র—রাজপুত্র আমার—তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে, তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।

ভিক্ষুণী। যাকে দিয়েছ তাকে হারাও নি। কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ।

লোকেশ্বরী। নারী, তোমার ছেলে আছে?

ভিক্ষুণী। না।

লোকেশ্বরী। কোনোদিন ছিল?

ভিক্ষুণী। না। আমি প্রথম বয়সেই বিধবা।

লোকেশ্বরী। তা হলে চুপ করো। যে কথা জান না সে কথা বোলো না।

ভিক্ষুণী। মহারানী, সত্যধর্মকে তুমিই তো রাজান্তঃপদ্রে সকলের প্রথমে আহ্বান করে এনেছিলে। তবে কেন আজ—

লোকেশ্বরী। আশ্চর্য—মনে আছে তো দেখি। ভেবেছিলেম সে-কথা বৃষ্টি তোমাদের গুরু ভুলে গিয়েছেন। ভিক্ষু ধর্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপণ্ডবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, একশো ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতিবৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার রত। বুদ্ধের ধর্মবৈরী দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলমল, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই পুরস্কার আমারই! যে-মহিষীরা বিদ্রোহে জ্বলেছিল, আমার অন্নে বিষ মিশিয়েছে যারা, তাদের তো কিছুই হল না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

ভিক্ষুণী। সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয় মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

লোকেশ্বরী। যেদিন দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কুমার অজাতশত্রু আমি নির্বোধ সেদিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সমুদ্র পার হতে চায়। দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভয়ে সগর্বে বললেম, দেবদত্তের চেয়েও যে-গুরুর পুণ্যের জোর বেশি তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার। ভগবান বুদ্ধকে—শাক্যসিংহকে—আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্ঘ্যপুত্রকে আশীর্বাদ করালেম। তবু জয় হল কার?

ভিক্ষুণী। তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিয়ে না।

লোকেশ্বরী। আমারই!

ভিক্ষুণী। নয় তো কী! পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় যৌদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে রাজ্য জয় করেছিলেন—

লোকেশ্বরী। সে রাজ্য মূখের কথা, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সে বিদ্রূপ; আর আমার দিকে তাকাও দেখি। আমি আজ স্বামীসত্ত্বে বিধবা, পুত্রসত্ত্বে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা। এটা তো মূখের কথা নয়। যারা তোমাদের ধর্ম কোনোদিন মানে নি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে। তোমরা যাঁকে বল শ্রীবজ্রসত্ত্ব, আজ কোথায় তিনি— পড়ুক-না তাঁর বজ্র এদের মাথায়।

ভিক্ষুণী। মহারানী, এর মধ্যে সত্য আছে কোথায়? এ তো ক্ষণকালের স্বপ্ন— যাক-না ওরা হেসে।

লোকেশ্বরী। স্বপ্ন বটে! তা এই স্বপ্নটা আমি চাই নে। আমি চাই অন্য স্বপ্নটা যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে বলে মান। সেই স্বপ্নে বিকশিত হয়ে ঐ দিকে যাঁরা মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছেন, বলো-না তাঁদের গিয়ে। পুজো দিন-না তাঁরা।

ভিক্ষুণী। যাই তবে।

লোকেশ্বরী। যাও, কিন্তু আমার মতো নির্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছুই হারাবে না, সবই থাকবে। ওরা তো বুদ্ধকে মানে নি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়ে নি, তাই বেঁচে গেল, বেঁচে গেল ওরা। অমন স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ধৈর্যের ভান করতে শিখেছ?

ভিক্ষুণী। কেমন করে বলব? এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী। ধৈর্য ভঙ্গ হয় তবু মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করছ। তোমাদের এই নীরব স্পর্ধা অসহ্য। যাও।

[ভিক্ষুণীর প্রস্থানোদ্যম]

শোনো শোনো, ভিক্ষুণী। চিত্র কী-একটা নতুন নাম নিয়েছে।—জান তুমি?

ভিক্ষুণী। জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী। যে নামে তার মা তাকে ডেকেছে সেটা আজ তার কাছে অশুচি! তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল।

ভিক্ষুণী। মহারানী, যদি ইচ্ছা কর তাঁকে একদিন তোমার কাছে আনতে পারি।

লোকেশ্বরী। আমি ইচ্ছা করতে যাব কোন্ লজ্জায়। আর আজ তুমি আনবে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেছে তাকে এই পৃথিবীতে!

ভিক্ষুণী। তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী। একটু থামো। তোমার সঙ্গের তার দেখা হয়?

ভিক্ষুণী। হয়।

লোকেশ্বরী। আচ্ছা, একবার নাহয় তাকে—যদি সে—না, থাক্।

ভিক্ষুণী। আমি তাঁকে বলব। হয়তো তাঁর সঙ্গের তোমার দেখা হবে।

[প্রস্থান]

লোকেশ্বরী। হয়তো, হয়তো, হয়তো! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে 'হয়তো' ছিল না। এতদিনের সেই মাতৃস্নেহের দাবি আজ এই একটুখানি 'হয়তো'য় এসে ঠেকল। একেই বলে ধর্ম! মল্লিকা।—

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। দেবী!

লোকেশ্বরী। কুমার অজাতশত্রুর সংবাদ পেলে?

মল্লিকা। পেয়েছি। দেবদত্তকে আনতে গেছেন। এ রাজ্যে ত্রিরত্ন-পূজার কিছুই বাকি থাকবে না।

লোকেশ্বরী। ভীর্নু! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে। বুদ্ধধর্মের কত যে শক্তি তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তবু ঐ অপদার্থ দেবদত্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হল না।

মল্লিকা। মহারানী, যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ উনি দেবদত্ত-শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরো বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী। আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্বল বুদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা। দেবী, ভিক্ষুগণী উৎপলপর্ণার মতোই তোমার এ কথা। তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারানীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে-সব খোঁটায় মানুষকে বাঁধে, ভগবান মহাবোধির কৃপায় সেই-সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী। দেখো, ঐ-সব বানানো কথা শুনলে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতিনির্মল ফাঁকা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ঐ মাটিতে-মাথা খুঁটি-কটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তা হলে আবার নাইয় অশোকচৈত্যে দীপ জ্বালব, একশো শ্রমণকে অন্ন দেব, ওদের যত মন্ত্র আছে সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর, তা যদি না হয় তো আসুন দেবদত্ত, তা তিনি সাঁচাই হোন আর ঝুটোই হোন। যাই, একবার প্রাসাদশিখরে গিয়ে দেখি গে এঁরা কত দূরে।

[উভয়ের প্রস্থান]

বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ

শ্রীমতী। (লতাবিতানতলে আসন বিছাইয়া, দূরে চাহিয়া) সময় হল, এসো তোমরা।

আপন-মনে গান

নিশীথে কী করে গেল মনে
কী জানি, কী জানি!
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি, কী জানি!

মালতীর প্রবেশ

মালতী। তুমি শ্রীমতী?

শ্রীমতী। হাঁ গো, কেন বলো তো।

মালতী। প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে।

শ্রীমতী। প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্বে কখনো দেখি নি।

মালতী। নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী।

শ্রীমতী। কেন এলে বাছা? সেখানে কি দিন কাটাচ্ছিল না? ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুঁশি; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে। ব্যর্থ হবে তোমার বসন্ত। গান শিখতে এসেছ? এইটুকু তোমার আশা?

মালতী। সত্যি বলব? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বলতে সংকোচ হয়।

শ্রীমতী। ও, বুঝেছি। রাজরানী হবার দুরাশা। পূর্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি করে থাক

তো হতেও পার। বনের পাখি সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দৃষ্টবৃন্দ।
যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী। কী তুমি বলছ দিদি, ভালো বৃদ্ধিতে পারছি নে।

শ্রীমতী। আমি বলছি—

গান

বাধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায়

হায় অভাগী!

মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,

হায় অভাগী!

মালতী। তুমি আমাকে কিছুই বোঝ নি। তবে স্পষ্ট করে বলি। শুনোছি একদিন ভগবান বৃন্দ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায়। মহারাজ বিম্বিসার সেইখানেই নাকি বেদী গড়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী। হাঁ, সত্য।

মালতী। রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন। আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধূলা ঝাঁট দেব এই আশা করে এখানে গায়িকার দলে ভর্তি হয়েছি।

শ্রীমতী। এসো এসো বোন, ভালো হল। রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোঁয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম। তোমার নির্মল হাত-দুখানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু, এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে?

মালতী। কেমন করে বলব দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চলে। তার বরস আঠারো। হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, ‘কোথায় যাচ্ছিস ভাই’, সে বললে, ‘খুঁজতে।’

শ্রীমতী। নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ এক ডাকে ডেকেছে। পূর্ণচাঁদ উঠল।—এ কী! তোমার হাতে যে আংটি দেখি! কেমন লাগছে যে। স্বর্গের মন্দারকুঁড়ি তো ধুলোর দামে বিকিয়ে গেল না?

মালতী। তবে খুলে বলি—তুমি সব কথা বৃদ্ধবে।

শ্রীমতী। অনেক কেন্দ্রে বোঝবার শক্তি হয়েছে।

মালতী। তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চুপ করে তাঁকে দেখেছি। একদিন নিজে এসে বললেন, ‘মালতীকে আমার ভালো লাগে।’ বাবা বললেন, ‘মালতীর সৌভাগ্য।’ সব আয়োজন সারা হল যেদিন এলেন তিনি দ্বারে। বরের বেশে নয়, ভিক্ষুর বেশে। কাষারবস্ত্র, হাতে দণ্ড। বললেন, ‘যদি দেখা হয় তো মুক্তির পথে, এখানে নয়।’—দিদি, কিছু মনে কোরো না—এখনো চোখে জল আসছে, মন যে ছোটো।

শ্রীমতী। চোখের জল বয়ে যাক-না। মুক্তিপথের ধূলো ঐ জলে মরবে।

মালতী। প্রণাম করে বললেম, ‘আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয় নি। যে-আংটি পরাবে কথা দিয়েছিলে, সেটি দিয়ে যাও।’ এই সেই আংটি। ভগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খসে পড়বে সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী। কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চাঁবর পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে না পথিকের টানে! কতবার হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি—বলি, ‘মহাপুরুষ, উদাসীন থেকে না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।’ রাজবাড়ির মেয়েরা ঐ আসছেন।

বাসবী নন্দা রত্নাবলী অঙ্কিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ

বাসবী। এ মেয়েটি কে! দেখি দেখি, চুল চূড়া করে বেঁধেছে, অলকে দিয়েছে জবা! নন্দা,

দেখে যাও, আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কী রকম উঁচু করে জড়িয়েছে। গলায় বর্ষা কুঁচফলের হার? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এল?

শ্রীমতী। গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী। পেয়েছ একটি শিকার! ওকে শিষ্যা করবে বর্ষা? আমাদের উদ্ধার করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধরে মদুস্তির ব্যাবসা চালাবে!

শ্রীমতী। গ্রামের মেয়ের মদুস্তির ভাবনা কী? ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়ে নি, না ধুলায়, না মণিমাণিক্যে; স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী। স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো, কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাই নে। গণেশের ইন্দুরের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই; বরুণ যমরাজের মহিষটাকে মানতে রাজি আছি।

নন্দা। রত্না, তোমার বাহন তো তৈরিই আছে, লক্ষ্মীর পেঁচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিদ্রুপ? ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী। ওর চুপ করে থাকাই তো রাশীকৃত উপদেশ। ঐ দেখো-না, চুপি চুপি হাসছে। ওটা কি উপদেশ হল না?

রত্নাবলী। মহৎ উপদেশ! অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে জয় করবে, হাস্যের দ্বারা ভাষাকে।

বাসবী। একটু ঝগড়া কর-না কেন, শ্রীমতী? এত মধুর কি সহ্য হয়! মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী। ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভান করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কের ভান করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু, অমাবস্যা! সে যদি মেঘের মূখোশ পরে!

অজিতা। ঐ দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে, রাজবাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই, কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম, ভুলে গেছি।

মালতী। মালতী।

অজিতা। কী ভাবছিলে বলো-না।

মালতী। দিদিকে ভালোবেসেছি, তাই ব্যথা লাগছিল।

অজিতা। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলংকার-শাস্ত্রের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা। মালতী, কী একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিলে? বলেই ফেলো-না। আমাদের তুমি কী ভাব জানতে ভারি কৌতূহল হয়।

মালতী। আমি বলতে চাচ্ছিলেম, 'হাঁ গা, তোমরা নিজের কথা শুনতেই এত ভালোবাস, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।'

সকলের উচ্ছ্বাস

বাসবী। হাঁ গা! হাঁ গা! রাজবাড়ির ব্যাকরণচণ্ডকে ডাকো, তাঁর শিক্ষা সম্বোধনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

রত্নাবলী। হাঁ গা বাসবী! হাঁ গা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা!

বাসবী। হাঁ গা রত্নাবলী! হাঁ গা ভুবনমোহনলাবণ্যকৌমুদী! ব্যাকরণের এ কী নতুন সম্পদ! সম্বোধনে হাঁ গা!

মালতী। দিদি, এ'রা কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

নন্দা। ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্‌বালিকারা শিউলিবনে ষখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ করে করে না, তাদের আদর করবার প্রথাই ঐ।

অজিতা। ঐ দেখো, শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্ছে। আমাদের কথা ওর কানেই পৌঁচছে না। শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাও-না, আমরাও যোগ দেব!

শ্রীমতীর গান

নিশীথে কী করে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি!
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি, কী জানি!
নানা কাজে নানা মতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে—
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি!
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়—
একি ভয়, একি জয়!
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
'আর নয়', 'আর নয়'!
সে কথা কি নানা সুরে
বলে মোরে, 'চলো দূরে'—
সে কি বাজে বদকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি!

বাসবী। মালতী, তোমার চোখে যে জল ভরে এল। এ গানের মধ্যে কী বদলে বেলো তো।

মালতী। শ্রীমতী ডাক শুনেছে।

বাসবী। কার ডাক?

মালতী। যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—

বাসবী। কে, কে তোমার?

শ্রীমতী। মালতী, বোন আমার, চুপ, আর বলিস নে। চোখ মুছে ফেল, এ কাঁদবার জায়গা নয়।

বাসবী। শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন? তুমি কি মনে ভাব আমরা কেবল হাসতেই জানি?

ভদ্রা। আমরা কি একেবারেই জানি নে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না?

মালতী। রাজকুমারী, আজ তো বাতাসে বাতাসে কথা চলছে, তোমরা শোন নি?

নন্দা। সকালের আলোতে পশ্চিমের পাপড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল তো খোলে না।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ। সকলের প্রণাম

লোকেশ্বরী। আমি সহ্য করতে পারছি নে। ঐ শুনছ না রাস্তায় রাস্তায় স্তবের ধ্বনি—
ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরুবে, নমঃ সংঘায় মহত্তমায়। শুনলে এখনো আমার বৃকের ভিতর দুলে ওঠে।

(কানে হাত দিয়া) আজই থামিয়ে দেওয়া চাই। এখনই! এখনই!

মল্লিকা। দেবী, শান্ত হোন।

লোকেশ্বরী। শান্ত হব কিসে? কোন্ মন্ত্রে শান্ত করবে? সেই, নমঃ পরমশান্তায়
মহাকর্নগিকায়—এ মন্ত্র আর নয়, আর নয়। আমার মন্ত্র, নমো বজ্রকোষডাকিন্যে, নমঃ
শ্রীবজ্রমহাকালায়। অম্র দিয়ে, আগুন দিয়ে, রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল

ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের মতো খসে খসে পড়বে—তোমরা কুমারীরা এখানে কী করছ?

রত্নাবলী। (হাসিয়া) অপেক্ষা করছি উদ্ধারের। মলিন মনকে নির্মল করে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু করে এগোচ্ছি।

বাসবী। অশ্রাব্য তোমার এই অত্যাশ্রিত।

লোকেশ্বরী। এই নটীর শিষ্যা! শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিগ্রাহের উপদেশ নিয়ে! শ্রীমতী বুদ্ধি আজ হঠাৎ সাধবী হয়ে উঠেছে? যেদিন ভগবান বুদ্ধ অশোকবনে এসেছিলেন রাজপুত্রীর সকলেই তাঁকে দেখতে এল, একেও দয়া করে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য এলই না। তবু, আজ নাকি ভিক্ষু উপালি রাজবাড়িতে একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায়। মূঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম! যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে—একে ধর্ম বলিস তোরা আত্মঘাতিনীরা? উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর দেখি নটী। দেখি কতবড়ো সাহস। পাপরসনায় পক্ষাঘাত হবে না?

শ্রীমতী। (করজোড়ে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

লোকেশ্বরী। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—থাক্ থাক্, থাম্ থাম্।

শ্রীমতী। মন্দিরায় অনাথায় অনুকম্পায় যে বিভো—

লোকেশ্বরী। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) ওরে অনাথা, অনাথা! শ্রীমতী, একবার বলো তো, মহাকারুণিকো নাথো—

উভয়ে আবৃত্তি

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সর্বপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সৰ্ব্বা সপত্তোসম্বোধিমুত্তমম্।

লোকেশ্বরী। হয়েছে হয়েছে, থাক্, আর নয়। নমো বজ্রকোষডাকিন্যে!

অনুচরীর প্রবেশ

অনুচরী। মহারানী, এই দিকে আসুন নিভুতে।

(জনান্তিকে) রাজকুমার চিত্র এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লোকেশ্বরী। কে বলে ধর্ম মিথ্যা! পুণ্যমন্দের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল। ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি। মহাকারুণিকো নাথো—তাঁর করুণার কতবড়ো শক্তি। পাথর গলে যায়। এই আমি তোদের সবাইকে বলে যাচ্ছি, পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করেছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধর্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

[বলিতে বলিতে অনুচরীসহ প্রস্থান]

রত্নাবলী। মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্ দিক থেকে বইল?

মল্লিকা। আজকাল আকাশ জুড়ে এ-যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির স্থিরতা আছে? হঠাৎ কাকে কোন্ দিকে নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। সেই-যে কলন্দক আজ চম্পিশ বছর

জুয়ো খেলে কাটালে, সে হঠাৎ শূনি নাকি ওদের অহং হয়ে উঠেছে! আবার নন্দিবর্ধন, যজ্ঞে যে সর্বস্ব দিতে পণ করলে আজ স্বাক্ষণ দেখলে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী। তা হলে রাজকুমার চিত্র ফিরে এলেন?

মল্লিকা। দেখো-না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মালতী। ভগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন সেদিন শ্রীমতীদিদি, তাঁকে দেখতে যাও নি, এ কি সত্য?

শ্রীমতী। সত্য। তাঁকে দেখা দেওয়াই যে পূজা দেওয়া। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না।

মালতী। হয় হয়, তবে কী হল দিদি?

শ্রীমতী। অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখলেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুনলেই কি শোনা যায়?

রত্নাবলী। ইস, এটা আমাদের 'পরে' কটাক্ষপাত হল। একটু প্রশ্নের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্যের আবরণ উড়ে যায়।

শ্রীমতী। কৃত্রিম সৌজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পষ্টই বলব, তোমাদের চোখ যাকে দেখেছে তোমরা তাঁকে দেখ নি।

রত্নাবলী। বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্ধা সহ্য করছ কেমন করে!

বাসবী। বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তা হলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর-একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার খয়ে যাক।

শ্রীমতী।

ওঁ নমো বৃন্দায় গুরবে

নমো ধর্মায় তারিণে

নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা। ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেন আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী। বিনয় ভুলেছ নটী! এ কথার প্রতিবাদ করবে না?

শ্রীমতী। কেন করব রাজকুমারী? তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই?

বাসবী। থাক্ থাক্, মূখের কথায় কথা বেড়ে যায়। তুমি গান গাও।

শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর স্ফারে

খুঁজিতে আমার আপনারে?

তোমারি যে ডাকে

কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নন্দ শাখে শাখে,

সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।

তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে,

শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।

সে-ডাকে তোমারি

সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,

দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।

নেপথ্যে। ওঁ নমো রত্নরায় বোধিসত্ত্বায় মহাসত্ত্বায় মহাকারুণিকায়!

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

সকলে। ভগবতী, নমস্কার!

ভিক্ষুণী। ভবতু সম্বৎসরং রক্ষন্তু সম্বদেবতা।
সম্বৎসরানুভাবেন সদা সোখী ভবন্তু তে॥

শ্রীমতী!

শ্রীমতী। কী আদেশ!

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।

রত্নাবলী। বোধ হয় ভুল শুনলেম। কোন্‌ শ্রীমতীর কথা বলছেন?

ভিক্ষুণী। এই-যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী। রাজবাড়ির এই নটী?

ভিক্ষুণী। হাঁ, এই নটী।

রত্নাবলী। স্থাবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন?

ভিক্ষুণী। তাঁদেরই এই আদেশ।

রত্নাবলী। কে তাঁরা? নাম শুন।

ভিক্ষুণী। একজন তো উপালি।

রত্নাবলী। উপালি তো নাপিত।

ভিক্ষুণী। সুনন্দও বলেছেন।

রত্নাবলী। তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষুণী। সুনীতেরও এই আদেশ।

রত্নাবলী। তিনি নাকি জাতিতে পুঙ্কদুস।

ভিক্ষুণী। রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।

রত্নাবলী। নিশ্চয় জানি নে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন?

ভিক্ষুণী। সে কথা সত্য। রাজপিতা বিম্বিসার রাজগৃহ-নগরীর নির্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে রত্নপালন করবেন। তাঁকে সংবর্ধনা করে আনি গে।

[প্রস্থান

অজিতা। কোথায় চলেছ শ্রীমতী?

শ্রীমতী। অশোকবনের আসনবেদী ধোঁত করতে যাব।

মালতী। দিনি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

নন্দা। আমিও যাব।

অজিতা। ভাবছি গেলে হয়।

বাসবী। আমিও দেখি গে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কিরকম।

রত্নাবলী। কী শোভা! শ্রীমতী করবে পূজার উদ্‌যোগ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবা

বাসবী। আর, এখান থেকে তুমি অভিশাপের উষ্ণ নিশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দগ্ধ হবে না, শ্রীমতীর শান্তিও থাকবে অক্ষুণ্ণ।

[রত্নাবলী ও মল্লিকা ব্যতীত আর-সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। সইবে না! সইবে না! এ একেবারে সমস্তের বিরুদ্ধ। মল্লিকা, পুরুষ হয়ে জন্মালুম না কেন! এই কঙ্কণপরা হাতের 'পরে ধিক্কার হয়। যদি থাকত তলোয়ার! তুমিও তো মল্লিকা

সমস্তক্ষণ চুপ করে বসে ছিলে, একটি কথাও কও নি। তুমিও কি ঐ নটীর পরিচারিকার পদ কামনা কর?

মল্লিকা। করলেও পাব না। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী। চুপ করে সহ্য কর কী করে বৃদ্ধিতে পারি নে। ধৈর্য নিরুপায় ইতর লোকের অশ্রু, রাজার মেয়েদের না।

মল্লিকা। আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপব্যয় করি নে।

রত্নাবলী। নিশ্চিত জান?

মল্লিকা। নিশ্চিত।

রত্নাবলী। গোপন কথা যদি হয় বোলো না। কেবল এইটুকু জানতে চাই ঐ নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় পূজা করবে আর রাজকন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে?

মল্লিকা। না, কিছুতেই না। আমি কথা দিচ্ছি।

রত্নাবলী। রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সার্থক করুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

লোকেশ্বরী ও মল্লিকা

মল্লিকা। পুত্রের সঙ্গে তো দেখা হল মহারানী। তবে এখনো কেন—

লোকেশ্বরী। পুত্রের সঙ্গে? পুত্র কোথায়? এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি। আগে বৃদ্ধিতে পারি নি।

মল্লিকা। এমন কথা কেন বলছেন।

লোকেশ্বরী। পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মার কাছে আসে তার মতো দুঃখ আর নেই। কিরকম করে সে চাইলে আমার দিকে! তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে—কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই! নিজের এতবড়ো নিঃশেষে সর্বনাশ কল্পনাও করতে পারতুম না।

মল্লিকা। রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘৃণিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্মল নতুন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী। হায় রে রক্তমাংস! হায় রে অসহ্য ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা! রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম!

মল্লিকা। কিন্তু যাই বল দেবী, তাঁকে দেখলেম—সে কী রূপ! আলো দিয়ে ধোয়া যেন দেবমূর্তিখানি।

লোকেশ্বরী। ঐ রূপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল! যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হৃদয়ে, তাকে ঐ রূপ ধিক্কার দিলে! যে জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে জন্মের সঙ্গে তার এ জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ। দেখ্ মল্লিকা, আজ খুব স্পষ্ট করে বৃদ্ধিতে পারলেম এ ধর্ম পুত্রদুষের তৈরি। এ ধর্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না পুত্র, না স্বামী, না ভাই, সেই-সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে শূন্যকিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব! মল্লিকা, এই পুত্রদুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব।

মল্লিকা। কিন্তু দেবী, দেখ নি? মেয়েরাই যে দলে দলে চলেছে বৃদ্ধকে পূজা দেবার জন্যে!

লোকেশ্বরী। মৃদু ওরা, ভক্তি করবার ক্ষুধার ওদের অন্ত নেই। যা ওদের সব চেয়ে মারে তাকেই ওরা সব চেয়ে বেশি করে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিই নে।

মল্লিকা। মৃদু বলছ মহারানী, নিশ্চয় জানি, তোমার ঐ পুত্র আজ তোমার সেবাক্ষেত্র দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার পূজাক্ষেত্র দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তোমার মানব-পুত্র কোল থেকে নেমে আজ দেবতা-পুত্র হয়ে তোমার হৃদয়ের পূজাবেদীতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী। চুপ চুপ! বলিস নে! আমি হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করলেম; বললেম, ‘একরাত্রির জন্যে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।’ সে বললে, ‘আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই—আছে আকাশ।’ মল্লিকা, যদি মা হতিস তো বুদ্ধতিস কতবড়ো কঠিন কথা! বজ্র দেবতার হাতের, কিন্তু সে তো বজ্র। বুদ্ধ বিদীর্ণ হয়ে যায় নি! সেই বিদীর্ণ বুদ্ধের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঐ-যে রাস্তার শ্রমণদের গর্জন আমার পাঁজরগুলোর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

মল্লিকা। ঐকি মহারানী, মন্তোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজও আপনি যে নমস্কার করেন!

লোকেশ্বরী। ঐ তো বিপদ। মল্লিকা, দুর্বলের ধর্ম্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। রাক্ষসকে বলবে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বলবে ভিক্ষা করো। এই ধর্ম্মের বিষ অনেকদিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেছি। সেইজন্যে আজ আমিই একে সব চেয়ে ভয় করি। ঐ কে আসছে?

মল্লিকা। রাজকুমারী বাসবী। পূজাস্থলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

বাসবীর প্রবেশ

লোকেশ্বরী। পূজায় চলেছ?

বাসবী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। তোমাদের তো বয়স হয়েছে?

বাসবী। আমাদের ব্যবহারে তার কি কোনো বৈলক্ষণ্য দেখছেন?

লোকেশ্বরী। শিশু! তোমরা নাকি বলে বেড়াচ্ছ, অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ!

বাসবী। আমাদের চেয়ে যাঁদের বয়স অনেক বেশি তাঁরাই বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা তো কেবল মৃদুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী। নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইত্যরের ধর্ম্ম! হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।

বাসবী। শক্তির কি কোমল রূপ নেই?

লোকেশ্বরী। আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় করে বাঁধে তখন না। পর্বতকে সৃষ্টি-কর্তা নির্দয় পাথর দিয়ে গড়েছেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুদ্বর কৃপায় উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সবই কি হবে পাঁক? রাজবাড়িতে মানুষ হয়েও এই কথাটা মানতে ঘৃণা হয় না? চুপ করে রইলে যে?

বাসবী। ভেবে দেখছি, মহারানী।

লোকেশ্বরী। ভাববার কী আছে। চোখের সামনে দেখলে তো রাজপুত্র এক মৃদুহৃতে রাজা হতে ভুলে গেল! বলে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব! শোন নি বাসবী?

বাসবী। শুনছি।

লোকেশ্বরী। তা হলে নির্দয়তা করবার গুরুদ্বর কাজ গ্রহণ করবে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি? যত-সব মাথা-হেঁট-করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্নিমল্লান নিজীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে? তোরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেকছে কেন বাসবী!

বাসবী। এই পুরোনো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিনে ঢাকা পড়ে গেছে, বসন্তে নিষ্পত্তি কিংশুকের শাখা যেমন করে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী। কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম ভুলে যায়, কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুলতে দেয় তা হলে মরণ যে সেই নারীর। মহালতার জন্যে কি মহাবৃক্ষের দরকার নেই! সব গাছই গুল্ম হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো? বল-না। মুখে যে উত্তর নেই!

বাসবী। মহাবৃক্ষ চাই বৈকি।

লোকেশ্বরী। কিন্তু, বনস্পতি নির্মূল করবার জন্যেই এসেছেন তোমাদের গুরু। তাও যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের পোকা তলায় তলায় লাগিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মজ্জাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মর্দিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে! তার আগেই যেন মর, আমার এই আশীর্বাদ। কী ভাবছ? কথাটা মনে লাগছে না?

বাসবী। ভালো করে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী। ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্যপুত্র বিশ্বিসার, ক্ষত্রিয় রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিস নয়, তাতেই তাঁর ধর্মসাধনা। কিন্তু, কোন্ মরুর ধর্ম কানের মন্ত্র দিল অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খসে পড়লেন—অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, একদিন তুমিও রাজার মহিষী হবে এ আশা কি ত্যাগ করেছে?

বাসবী। কেন ত্যাগ করব?

লোকেশ্বরী। তা হলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান, তাকে শ্রদ্ধা করে বরণ করতে পারবে?

বাসবী। না।

লোকেশ্বরী। আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিশ্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবছ ঠুর জন্যে সাজব! যে-মানুষ রাজাও নয় ভিক্ষুও নয়, যে-মানুষ ভোগেও নেই ত্যাগেও নেই, তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না। বাসবী, তোমাকে বার বার বলছি, এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্মকে কিছুতে স্বীকার কোরো না।

মল্লিকা। রাজকুমারী, কোথায় চলেছ?

বাসবী। ঘরে।

মল্লিকা। এদিকে নটী যে প্রস্তুত হয়ে এল।

বাসবী। থাক্ থাক্।

[প্রস্থান]

মল্লিকা। মহারানী, শুনতে পাচ্ছ?

লোকেশ্বরী। শুনছি বৈকি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা। নিশ্চয় এঁরা এসে পড়েছেন।

লোকেশ্বরী। কিন্তু ঐ-যে এখনো শুনছি, নমো—

মল্লিকা। সদর বদলেছে। ‘নমো বুদ্ধায়’ গজর্ন আরো প্রবল হয়ে উঠেছে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ঐ শোনো—‘নমঃ পিনাকহস্তায়’! আর ভয় নেই।

লোকেশ্বরী। ভাঙল রে ভাঙল! যখন সব ধুলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলাম! হায় রে, কত ভক্তি! মল্লিকা, ভাঙার কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে বাঁচি—ওর ভিতরটা যে আমার বুদ্ধের মধ্যে।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্না, তুমিও চলেছ পুজায়?

রত্নাবলী। ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার অপরাধ আমার শ্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী। তবে কোথায় যাচ্ছ?

রত্নাবলী। মহারানীর কাছেই এখানে এসেছি। আবেদন আছে।

লোকেশ্বরী। কী, বলো।

রত্নাবলী। ঐ নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায় তা হলে এই অশুচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী। আশ্বাস দিচ্ছি আজ এ পূজা ঘটবে না।

রত্নাবলী। আজ না হোক কাল ঘটবে।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই কন্যা, পূজ্যকে সমুদলে উচ্ছেদ করব।

রত্নাবলী। যে অপমান সহ্য করেছি তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী। তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্বাসন, এমন-কি, প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

রত্নাবলী। তাতে ওর গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী। তবে তোমার কী ইচ্ছা?

রত্নাবলী। ও যেখানে পূজারিনী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চুপ করে রইলে যে। তুমি কী বল?

মল্লিকা। প্রস্তাবটা কোতুকজনক।

লোকেশ্বরী। আমার মন সায় দিচ্ছে না রত্না।

রত্নাবলী। ঐ নটীর 'পরে মহারানীর এখনো দয়া আছে দেখছি।

লোকেশ্বরী। দয়া! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়াতে পারি। আমার দয়া! অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েছি। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে সেও সহ্যে পারি। কিন্তু রাজ-রানীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত!

রত্নাবলী। প্রগল্ভতা মাপ করবেন। ঐটুকু ব্যথাকে যদি প্রশ্রয় দেন তবে ঐ ব্যথার উপরেই ভাঙা পূজার বেদী বারে বারে গড়ে উঠবে।

লোকেশ্বরী। সে ভয় মনে একেবারে নেই তা নয়।

রত্নাবলী। মোহে পড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান করুন তবে মনুষ্ট পাবেন।

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, ঐ শোনো। উদ্যানের উত্তর দিক থেকে শব্দ আসছে। ভেঙে ফেললে, সব ভেঙে ফেললে! ঐ নমো—যাক যাক ভেঙে যাক।

রত্নাবলী। চলো-না মহারানী, দেখে আসি গে।

লোকেশ্বরী। যাব যাব, কিন্তু এখনো না।

রত্নাবলী। আমি দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, বাঁধন ছিঁড়তে বড়ো বাজে।

মল্লিকা। তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে!

লোকেশ্বরী। ঐ শোনো-না, 'জয় কালী করালী'—অন্য ধ্বনিটা শ্রীণ হয়ে এল, এ আমি সহ্যে পারছি নে।

মল্লিকা। বুদ্ধের ধর্মকে নির্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে; অন্য ধর্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নৃতন মন্ত্র নেবে তখনই সান্ধুনা পাবে।

লোকেশ্বরী। ছি ছি, বোলো না, বোলো না, মূখে এনো না। দেবদত্ত ক্রুর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসারত নিয়েছিলাম তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দণ্ড করেছি, বিম্ব করেছি। আর

আজ! যে আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব! (জান্দু পাতিয়া) ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। দ্বারপ্রবেশে কৃতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো।

(উঠিয়া) ভয় নেই, মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে, সে ভিতরেই থাক্, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা, আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বসি গে, যখন ধূলার সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো।

[উভয়ের প্রস্থান]

ধূপ দীপ গন্ধমালা মঙ্গলঘট প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া রাজবাটীর
একদল নারীর প্রবেশ। পূজাপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে

বল্ল-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মূর্ধনন্দস্ স সিরিপাদ-সরোরুহে।

প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি। ধূপপাত্রকে ঘিরিয়া
গন্ধ-সম্ভার-যন্ত্ৰেণ ধূপেনাহং সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেষ্যন্ত্যং পূজাভাজনমুত্তমং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম
শ্রীমতী প্রদীপের থালা ঘিরিয়া
ঘনসারস্পাদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা
তিলোকদীপং সম্বদধং পূজয়ামি তমোনুদং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম। আহাৰ্য নৈবেদ্য ঘিরিয়া
অধিবাসে তু নো ভন্তে ভোজনং পরিকম্পিতং
অনুকম্পং উপাদায় পতিগণ্হাতুমুত্তমং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম। জান্দু পাতিয়া
যো সন্মিসিনো বরবোধিমূলে
মারস্ সেনং মহতিং বিজেক্সা
সম্বেদধি মার্গাঙ্ক অনন্তঃপ্রাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বদধং।

বনের প্রবেশপথে পূজা সমাধা হল। এবার চলো স্তূপমূলে।
মালতী। কিন্তু শ্রীমতীদিদি, ঐ দেখো, এ দিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ।
শ্রীমতী। বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো।
নন্দা। বোধ হচ্ছে রাজার নিষেধ!
শ্রীমতী। কিন্তু প্রভুর আদেশ আছে।
নন্দা। কী ভয়ংকর গর্জন! একি রাষ্ট্রবিপ্লব!
শ্রীমতী। গান ধরো।

গান

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে।
ছেড়ে যাব তীর মাঠেঃ রবে।

যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্ধদাহের বহিজদালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে।
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে।

একদল অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। ফেরো তোমরা এখান থেকে।
শ্রীমতী। আমরা প্রভুর পূজায় চলেছি।
রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।
মালতী। আজ প্রভুর জন্মোৎসব।
রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।
শ্রীমতী। এও কি সম্ভব!
রক্ষিণী। পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানি নে। দাও তোমাদের অর্ঘ্য।

[পূজার থালা প্রভৃতি ছিনাইয়া লইল]

শ্রীমতী। এ কী পরীক্ষা আমার! অপরাধ কি ঘটেছে কিছু!

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুবরদন্তমং।

বৃন্দেধ যো খলিতো দোসো বৃন্দেধা খমতু তং মম।

রক্ষিণী। বন্ধ করো স্তব।

শ্রীমতী। দ্বারের কাছেই অবরোধ! প্রবেশ আমার ঘটল না, ঘটল না!

মালতী। কাঁদ কেন শ্রীমতীদিদি। বিনা অর্ঘ্যে বিনা মন্ত্রে কি পূজা হয় না? ভগবান তো আমাদের মনের ভিতরেও জন্মলাভ করেছেন।

শ্রীমতী। শূদ্ধ তাই নয় মালতী, তাঁর জন্ম আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মোৎসব।

নন্দা। শ্রীমতী, হঠাৎ একমুহূর্তে আজ এমন দুর্দিন ঘনিয়ে এল কেন?

শ্রীমতী। দুর্দিনই যে সুদিন হয়ে ওঠবার দিন আজ। যা ভেঙেছে তা জোড়া লাগবে, যা পড়েছে তা উঠবে আবার।

অজিতা। দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যে পূজার ভার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে নিশ্চয় ভুল আছে। সব তাই নষ্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

শ্রীমতী। আমি ভয় করি নে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।

ভদ্রা। রাজার বাধাও সরাতে পারবে?

শ্রীমতী। সেখানে রাজার রাজদণ্ড পৌঁছয় না।

রজাবলীর প্রবেশ

রজাবলী। কী বলছিলে, শূন্যেই শূন্যে। তুমি রাজার বাধাও মান না এতবড়ো তোমার সাহস!

শ্রীমতী। পূজাতে রাজার বাধাই নেই।

রত্নাবলী। নেই রাজার বাধা? সত্যি নাকি! যেয়ো তুমি পূজা করতে, আমি দেখব দুই চোখের আশ মিটিয়ে।

শ্রীমতী। যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখবেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে। এখন—

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সৰ্বদা।

রত্নাবলী। তোমার দিন এবার হয়ে এসেছে, অহংকার ঘুচবে।

শ্রীমতী। তা ঘুচবে। কিছুই বাকি থাকবে না, কিছুই না।

রত্নাবলী। এখন আমার পালা, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

[প্রস্থান

ভদ্রা। কিছুই ভালো লাগছে না। বাসবী বুদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় সরে পড়েছে।

অজিতা। আমার কেমন ভয় করছে।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

নন্দা। ভগবতী, কোথায় চলেছেন?

উৎপলপর্ণা। উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষা-মন্ত্র পড়তে চলেছি।

শ্রীমতী। ভগবতী, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?

উৎপলপর্ণা। কেমন করে নিয়ে যাই? তোমার উপরে যে পূজার আদেশ আছে।

শ্রীমতী। পূজার আদেশ এখনো আছে দেবী?

উৎপলপর্ণা। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে আদেশের তো অবসান নেই।

মালতী। মাতঃ, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে!

উৎপলপর্ণা। ভয় নেই, ধৈর্য ধরো। সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে।

[প্রস্থান

ভদ্রা। শুনছ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন না গজ্জন?

নন্দা। আমার তো মনে হচ্ছে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর করছে। শ্রীমতী, শীঘ্র চলো রাজমহিষী-মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিই গে।

[প্রস্থান

ভদ্রা। এসো অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

[রাজকুমারী প্রভৃতির প্রস্থান

মালতী। দিদি, বাইরে ঐ যেন মরণের কান্না শুনতে পাচ্ছি! আকাশে দেখছ ঐ শিখা! নগরে আগুন লাগল বুদ্ধি? জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তান্ডব কেন!

শ্রীমতী। মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।

মালতী। মনে ভয় আসছে বলে বড়ো লজ্জা পাচ্ছি দিদি। পূজা করতে যাব, ভয় নিয়ে যাব—এ আমার সহ্য হচ্ছে না।

শ্রীমতী। তোর ভয় কিসের বোন?

মালতী। বিপদের ভয় না। কিছুই যে বন্ধতে পারছি নে, অন্ধকার ঠেকছে, তাই ভয়।

শ্রীমতী। আপনাকে এই বাইরে দেখিস নে। আজ যার অন্ধয় জন্ম তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখ, তোর ভয় ঘুচে যাবে।

মালতী। তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

শ্রীমতীর গান

আর রেখো না আঁধারে আমায়
দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখতে দাও।
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি নয় না যে আর,
যাক-না ধূয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে,
আমায় দেখতে দাও।
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন
ঘনায় বিবম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও।

একজন অন্তঃপদরক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। শোনো, শোনো, শ্রীমতী।

মালতী। কেন নিষ্ঠুর হচ্ছে তোমরা! আর আমাদের যেতে বোলো না। আমরা দুটি মেয়ে এই উদ্যানের কাছে মাটির 'পরে বসে থাকি-না—তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে?

রক্ষিণী। তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন?

মালতী। ভগবান বুদ্ধ যে-উদ্যানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন তার শেষপ্রান্তেও তাঁর পদধূলা আছে। তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও তা হলে আমরা এইখানে সেই ধূলায় বসে মনের মধ্যে তাঁর জন্মাৎসব গ্রহণ করি—মন্ত্রও বলব না, অর্ঘ্যও দেব না।

রক্ষিণী। কেন বলবে না মন্ত্র? বলো বলো! শুনতেও পাব না এত কী পাপ করেছি! অন্য রক্ষিণীরা দূরে আছে, এইবেলা আজ পূর্ণ্যদিনে শ্রীমতী, তোমার মধুর কণ্ঠ থেকে প্রভুর স্তব শুনে নিই। তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোকছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপচোখে দেখেছি, তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন।

শ্রীমতী।
নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গৌতম-চন্দ্রমায়,
নমো নমো নন্তগুণমবায়,
নমো নমো সাক্ষিনন্দনায় ॥

রক্ষিণী, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো।

রক্ষিণী। আমার মনে কি পূর্ণ্যমন্ত্র বের হবে?

শ্রীমতী। ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই পূর্ণ্য হবে। বলো—
নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়।

[ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া গেল]

রক্ষিণী। আমার বন্ধুর বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক হল। যে

কথা বলতে এসেছিলেন এবার বলে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী। কেন?

রক্ষিণী। মহারাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোকতলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েছেন।

মালতী। হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হল না! আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেল সব!

শ্রীমতী। কী বলিস মালতী! তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিম্বিসার যা গড়েছিলেন তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে! ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।

রক্ষিণী। রাজা প্রচার করেছেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী, তা হলে তুমি আর কী করবে এখানে?

শ্রীমতী। অপেক্ষা করে থাকব।

রক্ষিণী। কতদিন?

শ্রীমতী। যতদিন না পূজার ডাক আসে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই।

রক্ষিণী। পূর্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কিসের ক্ষমা?

রক্ষিণী। হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী। কোরো আঘাত।

রক্ষিণী। সে আঘাত হয়তো রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী। আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। বৃদ্ধো থমতু! বৃদ্ধো থমতু!

অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ

দ্বিতীয় রক্ষিণী। রোদিনী!

প্রথম রক্ষিণী। কী পাটলী?

পাটলী। ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে ফেলেছে।

রোদিনী। কী সর্বনাশ!

শ্রীমতী। কে মারলে?

পাটলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা।

রোদিনী। রক্তপাত তবে শূন্য হল। তাই যদি হলই তা হলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সহ্যে না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। শ্রীমতী, ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।

শ্রীমতী। লোভ দেখিয়ে না রোদিনী। আমি নটী, তোমার ঐ তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী। তা হলে এই নাও। (তরবারি দান)

শ্রীমতী। (শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না না! প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলছে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হোক, প্রভুর জয় হোক।

পাটলী। চল্ রোদিনী, ভগবতীর দেহ বহন করে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে।

[উভয়ের প্রস্থান]

কয়েকজন রক্ষিণী সহ রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। এই-যে এখানেই আছে। ওকে রাজ্যদেশ শূন্যে দাও।

রক্ষিণী। মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী, তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে।

শ্রীমতী। নাচ! আজ!

মালতী। তোমরা এ কী কথা বলছ গো! মহারাজের ভয় হল না এমন আদেশ করতে?

রত্নাবলী। ভয় হবারই তো কথা! সেই দিনই তো এসেছে। তাঁর নটীদাসীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর! গ্রাম্য বর্বর!

শ্রীমতী। কখন নাচ হবে?

রত্নাবলী। আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী। প্রভুর আসনবেদীর সামনে?

রত্নাবলী। হাঁ।

শ্রীমতী। তবে তাই হোক।

[সকলের প্রস্থান]

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব

ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী

করো দ্রাণ মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী,

বিকশিত করো প্রেমপন্থ চির-মধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূণ্য,

করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

এসো দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,

মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকার ভিক্ষা।

লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন করো মোহ,

উজ্জ্বল হোক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ,

প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন লভুক অন্ধ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূণ্য,

করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

ক্লদনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,

বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ দীর্ণ অপরিভূষিত।

দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি,

তব মঙ্গলশঙ্খ আনো তব দক্ষিণ পাণি,

তব শূভসংগীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূণ্য,

করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

তৃতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

মালতী ও শ্রীমতী

মালতী। দিদি, শান্তি পাচ্ছি নে।

শ্রীমতী। কী হয়েছে।

মালতী। তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করাতে নিয়ে গেল আমি চুপি চুপি ঐ প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেম। দেখি ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে, আর—

শ্রীমতী। থামলে কেন? বলো।

মালতী। রাগ করবে না দিদি? আমি বড়ো দুর্বল।

শ্রীমতী। কিছতে না।

মালতী। দেখলেম অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

শ্রীমতী। কে যাচ্ছিলেন?

মালতী। দূর থেকে মনে হল যেন তিনি।

শ্রীমতী। অসম্ভব নেই।

মালতী। পণ করেছিলাম, মৃত্তি যতদিন না পাই তাঁকে দূর থেকেও দেখব না।

শ্রীমতী। রক্ষা করিস সেই পণ। সমুদ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকলেই তো পার দেখা যায় না। দূরাশায় মনকে প্রশ্রয় দিস নে।

মালতী। তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করছি মনে কোরো না। ভয় হচ্ছে ওঁকে তারা মারবে তাই কাছে থাকতে চাই। পণ রাখতে পারছি নে বলে আমাকে অবজ্ঞা কোরো না দিদি।

শ্রীমতী। আমি কি তোর ব্যথা বুঝি নে?

মালতী। তাঁকে বাঁচাতে পারব না কিন্তু মরতে তো পারব। আর পারলুম না দিদি, এবারকার মতো সব ভেঙে গেল। এ জীবনে হবে না মৃত্তি।

শ্রীমতী। যাঁর কাছে যাচ্ছিস তিনিই তোকে মৃত্তি দিতে পারেন। কেননা তিনি মৃত্তি। তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলুম।

মালতী। কী বুঝলে দিদি?

শ্রীমতী। এখনো আমার মনের মধ্যে পুরানো ক্ষত চাপা আছে, সে আবার ব্যথিয়ে উঠল। বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।

মালতী। রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মানুষ আর কেউ নেই, তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু যেতে হল। যখন সময় পাবে আমার জন্যে ক্ষমার মন্ত্র পোড়ো।

শ্রীমতী। বৃন্দে যো খলিতো দোসো বৃন্দো খমতু তং মম।

মালতী। (প্রণাম করিতে করিতে) বৃন্দো খমতু তং মম। যাবার মুখে একটা গান শুনিয়ে দাও। তোমার ঐ মৃত্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না। একটা পথের গান গাও।

শ্রীমতীর গান

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে,
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে!
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।

ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।

মনে করি আছ কাছে,

তবু ভয় হয় পাছে

আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে।

মালতী। শোনো দিদি, আবার গর্জন। দয়া নেই, কারো দয়া নেই। অনন্তকারুণিক বৃদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না! আর দেরি করতে পারি নে। প্রণাম দিদি! মৃত্তি যখন পাবে আমাকে একবার ডাক দিয়ে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো।

শ্রীমতী। চল, তোকে প্রাচীরদ্বার পর্যন্ত পেরঁছিয়ে দিয়ে আসি গে।

[উভয়ের প্রস্থান]

রত্নাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ

রত্নাবলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষুণীকে মেরেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের? ও তো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা। কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।

রত্নাবলী। মন্ত্র পড়ে কি রক্ত-বদল হয়!

মল্লিকা। আজকাল তো দেখছি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী। রেখে দে ও-সব কথা। প্রজারা উত্তেজিত হয়েছে বলে রাজার ভাবনা! এ আমি সহিতে পারি নে। তোমার ভিক্ষুধর্ম রাজধর্মকে নষ্ট করেছে।

মল্লিকা। উত্তেজনার আরো একটু কারণ আছে। মহারাজ বিম্বিসার পূজার জন্য যাত্রা করে বেরিয়েছেন কিন্তু এখনো পেরঁছন নি, প্রজারা সন্দেহ করেছে!

রত্নাবলী। কানাকানি চলছে আমিও শুনছি। ব্যাপারটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু কর্ম-ফলের মূর্তি হাতে হাতে দেখা গেল।

মল্লিকা। কী কর্মফল দেখলে?

রত্নাবলী। মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে যে-যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন, সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ঠুকে খাবে।

মল্লিকা। চুপ চুপ, আস্তে। জান তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কিরকম অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

রত্নাবলী। কার অভিশাপ?

মল্লিকা। বৃদ্ধের। মনে মনে মহারাজ ঠুকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী। বৃদ্ধ তো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মল্লিকা। তাই তার এত মান। দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় দামি অর্ঘ্য।

রত্নাবলী। যে-দেবতা হিংসা করতে জানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।

মল্লিকা। যাই হোক এই বলে যাচ্ছি, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঐ অশোকচৈত্যে পূজো হবেই।

রত্নাবলী। তা হয় হোক, কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্ছি।

[মল্লিকার প্রস্থান]

বাসবীর প্রবেশ

বাসবী। প্রস্তুত হয়ে এলোম।

রত্নাবলী। কিসের জন্যে?

বাসবী। শোধ তুলব বলে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ঐ নটী।

রত্নাবলী। উপদেশ দিয়ে?

বাসবী। না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী। তাই ছুরি হাতে এসেছ?

বাসবী। সেজন্যে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা ঘটেছে। বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী। নটীর উপর শোধ তুলবে কী দিয়ে?

বাসবী। (হার দেখাইয়া) এই হার দিয়ে।

রত্নাবলী। তোমার হীরের হার!

বাসবী। বহুদূল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে, ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রত্নাবলী। ও যদি তিরস্কার ক'রে ফিরে ফেলে দেয় তোমার গায়ে? যদি না নেয়?

বাসবী। (ছুরি দেখাইয়া) তখন এই আছে।

রত্নাবলী। শীঘ্র ডেকে আনো মহারানী লোকেশ্বরীকে, তিনি খুব আমোদ পাবেন।

বাসবী। আসবার সময় খুঁজেছিলেম তাঁকে। শুনলেম ঘরে দ্বার দিয়ে আছেন। একি রাষ্ট্র-বিপ্লবের ভয়ে, না স্বামীর 'পরে অভিমানে? বোঝা গেল না।

রত্নাবলী। কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য, তাতে মহারানীর উপস্থিত থাকা চাই।

বাসবী। নটীর নতিনাট্য! নামটি বেশ বানিয়েছ।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। যা মনে করেছিলেম তাই ঘটেছে। রাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে মহারাজ অজাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েছেন। এমনি করে গ্রহপূজা চলছেই, কখনো-বা শনিগ্রহ কখনো-বা রবিগ্রহ।

রত্নাবলী। ভালোই হয়েছে। বুদ্ধের সব-ক'টি শিষ্যকেই দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে একসঙ্গে সমর্পণ করে দিন। তাতে সময়-সংক্ষেপ হবে।

মল্লিকা। সেজন্যে নয়। ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আসছে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

বাসবী। কেন এই দুর্বলতা?

মল্লিকা। লোকে কী বলছে শোন নি বুঝি? দেবদত্তের শিষ্যদের মহারাজ এখন আর নিজেই সামলাতে পারছেন না।

বাসবী। তাতে কী হয়েছে?

মল্লিকা। কী আশ্চর্য! এখনো জনশ্রুতি তোমার কানে পৌঁছয় নি! সবাই অনুমান করছে, পথের মধ্যে ওরা বিম্বিসার মহারাজকে হত্যা করেছে।

বাসবী। সর্বনাশ! এ কখনো সত্য হতেই পারে না।

মল্লিকা। কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কোন্-একটা অনুশোচনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।

বাসবী। হায় হায়, এ কী সংবাদ!

রত্নাবলী। লোকেশ্বরী মহারানী কি শুনছেন?

মল্লিকা। এতবড়ো অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে তাকে তিনি দূখানা করে ফেলবেন। কেউ সাহস পাচ্ছে না।

বাসবী। সর্বনাশ হল! এতবড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ির কেউ বাঁচবে না। ধর্মকে নিয়ে যা খুঁশি করতে গেলে কি সহ্য হয়!

রত্নাবলী। ঐ রে! বাসবী আবার দেখছি নটীর চেলা হবার দিকে ঝুঁকছে। ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে।

বাসবী। কখনো না। আমি কিছু ভয় করি নে। ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে আসি গে।

রত্নাবলী। মিথ্যা ছুতো করে পালিয়ে না। ভয় তুমি পেয়েছ। তোমাদের এই অবসাদ দেখলে আমার বড়ো লজ্জা করে। এ কেবল নীচসংসর্গের ফল।

বাসবী। অন্যায় বলছ তুমি, আমি কিছুই ভয় করি নে।

রত্নাবলী। আচ্ছা, তা হলে অশোকবনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী। কেন যাব না? তুমি ভাবছ আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ?

রত্নাবলী। আর দেরি নয়, মল্লিকা, শ্রীমতীকে এখনই ডাকো, সাজ হোক বা না হোক। রাজকন্যারা যদি না আসতে চায় রাজকিংকরীদের সবাইকে চাই, নইলে কোঁতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী। ঐ-যে শ্রীমতী আসছে। দেখো দেখো, যেন চলছে স্বপ্নে। যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই।

ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ— লইনু শরণ!
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ।

রত্নাবলী। এই দিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পৌঁচছে না? ঐ-যে এই দিকে।

শ্রীমতী। পরশরতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।

রত্নাবলী। বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো।

বাসবী। না, আমি যাব না।

রত্নাবলী। কেন যাবে না?

বাসবী। তবে সত্য কথা বলি। আমি পারব না।

রত্নাবলী। ভয় করছে?

বাসবী। হ্যাঁ, ভয় করছে।

রত্নাবলী। ভয় করতে লজ্জা করছে না?

বাসবী। একটুমাত্রও না। শ্রীমতী, সেই ক্ষমার মন্ত্রটা।

শ্রীমতী। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুবরনুত্তমং
বন্দেধ যো খলিতো দোসো বন্দেধা খমতু তং মম।
বাসবী। বন্দেধা খমতু তং মম! বন্দেধা খমতু তং মম!
বন্দেধা খমতু তং মম!

শ্রীমতীর গান

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
 ক্ষীণ হাতে জ্বালা
 ম্লান দীপের থালা
 হল খান খান।
 এবার তবে জ্বালো
 আপন তারার আলো,
 রঙিন ছায়ার এই গোখর্দিল হোক অবসান।
 এসো পারের সাথী—
 বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
 আজি বিজন বাটে
 অন্ধকারের ঘাটে
 সব-হারানো নাটে
 এনেছি এই গান।

[সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

সকলকলুষতামসহর,
 জয় হোক তব জয়।
 অমৃতবারি সিঞ্জন করো
 নিখিল ভুবনময়।
 মহাশান্তি মহাক্ষেম
 মহাপদ্য মহাপ্রেম!
 জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
 ধ্বংস করুক তিমিররাতি।
 দঃসহ দঃস্বপ্ন ঘাতি
 অপগত করো ভয়।
 মহাশান্তি মহাক্ষেম
 মহাপদ্য মহাপ্রেম!
 মোহমলিন অতিদুর্দিন
 শঙ্কিত-চিত পান্থ
 জটিলগহনপথসংকট-
 সংশয়-উদ্ভ্রান্ত।
 করুণাময়, মাগি শরণ—
 দুর্গতিভয় করহ হরণ,
 দাও দঃখবন্ধতরণ
 মুক্তির পরিচয়।
 মহাশান্তি মহাক্ষেম
 মহাপদ্য মহাপ্রেম!

চতুর্থ অঙ্ক

অশোকতল। ভাঙা স্তূপ। ভগ্নপ্রায় আসনবেদী

রত্নাবলী। রাজকিংকরীগণ। একদল রক্ষিণী

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হচ্ছে।

রত্নাবলী। আর-একটু অপেক্ষা করো। মহারানী লোকেশ্বরী স্বয়ং এসে দেখতে চান। তিনি না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না।

দ্বিতীয় কিংকরী। আপনার আদেশে এসেছি। কিন্তু অধর্মের ভয়ে মন ব্যাকুল।

তৃতীয় কিংকরী। এইখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা। ছি ছি, কেমন করে এ পাপের ক্ষালন হবে?

চতুর্থ কিংকরী। এতবড়ো বীভৎস ব্যাপার এখানে হবে জানতেন না। থাকতে পারব না আমরা, কিছুতে না।

রত্নাবলী। মন্দভাগিনী তোরা শুনিস নি, বৃন্দেধর পূজা এ রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ কিংকরী। রাজাকে অমান্য করা আমাদের সাধ্য নেই। ভগবানের পূজা নাই করলেম কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারি নে।

প্রথম কিংকরী। রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্যা-রাজবধূদেরই জন্যে। এ সভায় আমাদের কেন? চলো তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান সেখানে যাই।

রত্নাবলী। (রক্ষিণীদের প্রতি) যেতে দিয়ো না ওদের। এইবার শীঘ্র নটীকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, এ পাপ নটীকে স্পর্শ করবে না। এ পাপ তোমারই।

রত্নাবলী। তোরা ভাবিস তোদের নতুন ধর্মের নতুন-গড়া পাপকে আমি গ্রাহ্য করি!

দ্বিতীয় কিংকরী। মানুষের ভক্তিকে অপমান করা এ তো চিরকালের পাপ।

রত্নাবলী। এই নটীসাধবীর হাওয়া তোমাদের সবাইকে লাগল দেখছি। আমাকে পাপের ভয় দেখিয়ে না, আমি শিশু নই।

রক্ষিণী। (প্রথম কিংকরীর প্রতি) বসুমতী, আমরা শ্রীমতীকে ভক্তি করেছি কিন্তু ভুল করেছি তো। সে তো নাচতে রাজি হল।

রত্নাবলী। রাজি হবে না! রাজার আদেশকে ভয় করবে না!

রক্ষিণী। ভয় তো আমরাই করি, কিন্তু—

রত্নাবলী। নটীর পদ কি তোমাদেরও উপরে?

প্রথম কিংকরী। আমরা তো ওকে নটী বলে আর ভাবতুম না। আমরা ওর মধ্যে স্বর্গের আলো দেখেছি।

রত্নাবলী। নটী স্বর্গে গিয়েও নাচে তা জানিস নে!

রক্ষিণী। শ্রীমতীকে পাছে রাজার আদেশে আঘাত করতে হয় এই ভয় ছিল কিন্তু আজ মনে হচ্ছে রাজার আদেশের অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

প্রথম কিংকরী। ও পাপীয়সীদের কথা থাক্। কিন্তু এই পাপদৃশ্যে দুই চোখকে কলঙ্কিত করলে আমাদের গতি হবে কী!

রত্নাবলী। এখনো নটীর সাজ শেষ হল না। দেখছ তো তোমাদের নটীসাধবীর সাজের আনন্দ কত।

প্রথম কিংকরী। ঐ-যে এল! ইস, দেখেছিস ঝলমল করছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। পাপদেহে একশো বাতির আলো জ্বালিয়েছে।

শ্রীমতীর প্রবেশ

প্রথম কিংকরী। পাঁপিষ্ঠা! শ্রীমতী! ভগবানের আসনের সম্মুখে, নিলজ্জ, তুই আজ নাচবি!
তোর দুখানা পা শূন্যকিয়ে কাঠ হয়ে গেল না এখনো!

শ্রীমতী। উপায় নেই, আদেশ আছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। নরকে গিয়ে শতলক্ষ বৎসর ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে তাকে দিনরাত নাচতে হবে এ আমি বলে দিলেম।

তৃতীয় কিংকরী। দেখো একবার! পাতকিনী আপাদমস্তক অলংকার পরেছে। প্রত্যেক অলংকারটি আগুনের বেড়ি হয়ে তোর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাকবে, তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার স্রোত বইয়ে দেবে তা জানিস?

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। (জনান্তিকে, রত্নাবলীকে) রাজ্যে বৃন্দপূজার যে-নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দুন্দুভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলছে। হয়তো এখনই এখানেও আসবে তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরো একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

রত্নাবলী। একবার দৌড়ে যাও তা হলে মল্লিকা—শীঘ্র মহারানী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এসো।

মল্লিকা। ঐ-যে তিনি আসছেন।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ

রত্নাবলী। মহারানী, এই আপনার আসন!

লোকেশ্বরী। থামো। শ্রীমতীর সঙ্গে নিভূতে আমার কথা আছে। (শ্রীমতীকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া) শ্রীমতী!

শ্রীমতী। কী মহারানী?

লোকেশ্বরী। এই লও, তোমার জন্যে এনেছি।

শ্রীমতী। কী এনেছেন?

লোকেশ্বরী। অমৃত।

শ্রীমতী। বৃদ্ধিতে পারছি নে।

লোকেশ্বরী। বিষ। খেয়ে মরো, পরিহ্রাণ পাবে।

শ্রীমতী। পরিহ্রাণের আর উপায় নেই ভাবছেন?

লোকেশ্বরী। না। রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার জন্যে নাচের আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছুতেই ফিরবে না জানি।

রত্নাবলী। মহারানী, আর সময় নেই, নৃত্য আরম্ভ হোক।

লোকেশ্বরী। এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল। এখানে মলে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচলে যাবি অবীচি নরকে।

শ্রীমতী। সর্বাগ্রে আদেশ পালন করে নিই।

লোকেশ্বরী। নাচবি?

শ্রীমতী। হাঁ, নাচব।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই তোর?

শ্রীমতী। না, কিছু না।

লোকেশ্বরী। তবে তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

শ্রীমতী। যিনি উদ্ধারকর্তা তিনি ছাড়া।



নটীর পূজা

নন্দলাল বসু-অঙ্কিত

রত্নাবলী। মহারানী, আর এক মূহূর্ত দেঁরি চলবে না। বাইরে গোলমাল শুনছ না? হয়তো বিদ্রোহীরা এখনই রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে। নটী, নাচ শুরু হোক।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো—
তোমায় স্মরি হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভিগ্নিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচ! এ তো নাচের ভান। আর এই গানের অর্থ কী!
লোকেশ্বরী। না না, বাধা দিয়ো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়,
কাঁপন বক্ষে লাগে।
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়,
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভিগ্নিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী হচ্ছে! গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ঐ স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে! ঐ গেল কঙ্কণ, ঐ গেল কেয়ূর, ঐ গেল হার! মহারানী, দেখছেন এ-সমস্ত রাজ-বাড়ির অলংকার! এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলংকার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনই।

লোকেশ্বরী। শান্ত হও, শান্ত হও। ওর দোষ নেই, এমনি করে আভরণ ফেলে দেওয়া, এই নাচের এই তো অঙ্গ। আনন্দে আমারও শরীর দুলে উঠছে। (গলা হইতে হার খুলিয়া ফেলিয়া)
শ্রীমতী, থেমো না, থেমো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমি কানন হতে তুলি নি ফুল,
মেলে নি মোরে ফল।
কলস মম শূন্যসম,
ভরি নি তীর্থজল।

আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
 হৃদয় ঢালে অধরা ধারা,
 তোমার চরণে হোক তা সারা,
 পূজার পুণ্য কাজে।
 তোমার বন্দনা মোর ভাগিতে আজ
 সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচের বিড়ম্বনা! নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে! দেখছ তো মহারানী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। একেই কি পূজা বলে না? রক্ষিণী, তোমরা দেখছ! মহারাজ কী দণ্ড বিধান করেছেন মনে নেই?

রক্ষিণী। শ্রীমতী তো পূজার মন্ত্র পড়ে নি।

শ্রীমতী। (জানু পাতিয়া) বৃন্দং সরণং গচ্ছামি—

রক্ষিণী। (শ্রীমতীর মূখে হাত দিয়া) থাম্ থাম্ দঃসাহসিকা, এখনো থাম্!

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী। বৃন্দং সরণং গচ্ছামি
 ধম্মং সরণং গচ্ছামি—

কিংকরীগণ। সর্বনাশ করিস নে শ্রীমতী, থাম্ থাম্!

রক্ষিণী। যাস নে মরণের মূখে উন্মত্তা!

দ্বিতীয় রক্ষিণী। আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।

কিংকরীগণ। চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা।

[পলায়ন]

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী। বৃন্দং সরণং গচ্ছামি
 ধম্মং সরণং গচ্ছামি
 সংঘং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। (জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে)

বৃন্দং সরণং গচ্ছামি
 ধম্মং সরণং গচ্ছামি
 সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্বাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল। ‘ক্ষমা করো ক্ষমা করো’,
 বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ে ধূলো লইল।

লোকেশ্বরী। (শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া) নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে
 গেলি। (বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।

[রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল]

মল্লিকা। কী ভাবছ?

রত্নাবলী। (বস্ত্রাণ্ডলে মূখ আচ্ছন্ন করিয়া) এইবার আমার ভয় হচ্ছে।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী। মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের পূজা নিয়ে কাননম্বারে অপেক্ষা করছেন,
 দেবীদের সম্মতি চান।

মল্লিকা। চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসি গে।

[প্রস্থান]

লোকেশ্বরী। বলো তোমরা সবাই,

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। ধর্মং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। ধর্মং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নাথি মে সরণং অত্রঃত্রঃ বুদ্ধো মে সরণং বরং

এতেন সচ্চব্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। মহারাজ এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী। কেন?

মল্লিকা। সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী। কাকে তাঁর ভয়?

মল্লিকা। ঐ হতপ্রাণ নটীকে।

লোকেশ্বরী। চলো পালঙ্ক নিয়ে আসি। এর দেহকে সকলে বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

[রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। (শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম। জানু পাতিয়া বসিয়া)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধর্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি।

শেষ বর্ষণ

প্রকাশ : ১৯২৬

১৩৩২ সালের ভাদ্রমাসে যখন প্রথম শেষ-বর্ষগ গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন গানগর্দল পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে গীতিনাট্য আকারে অভিনীত হয়। সবুজপত্রে (কার্তিক ১৩৩২) প্রকাশকালে পূর্বের গানগর্দল ছাড়া নতুন গানও স্থান পায়। ঋতু-উৎসব (১৯২৬)-এ প্রথম গ্রন্থভুক্ত।

রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকা

গান আরম্ভ

রাজা। ওহে থামো তোমরা, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও-না।

নটরাজ। (পুঁথি দিয়া) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভালো বুঝতে পারি নে। কী লিখছে? 'শেষ বর্ষণ'।

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা বেশ ভালো। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ। কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে খেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালস, তার পরে জগতে তার মতো অদরকারি আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না; তাই সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালাল কেন?

নটরাজ। পাছে মহারাজ বলে বসেন, ভাব অর্থ সূর তান লয়, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না সেই ভয়ে। লোকটা বড়ো ভিত্তু।

রাজকবি। এ তো বড়ো কৌতুক। পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ বলে বসে তাঁর আলো ঝাপসা।

রাজা। তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপসুনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ। ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুন্দর পালান নি। অস্তসূর্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘে রঙ ছাড়িয়ে আছে।

রাজকবি। তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড়ো সাদা।

নটরাজ। ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে রঙ খুলতে থাকবে।

রাজা। কিন্তু আমার রাজবৃন্দ, কবির বৃন্দের সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে?

নটরাজ। সে ভার আমার উপর। ইশারায় বুঝিয়ে দেব।

রাজা। আমার কাছে ইশারা চলবে না। বিদ্যুতের ইশারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে?

নটরাজ। বর্ষাকে আহ্বান করে।

রাজা। বর্ষাকে আহ্বান! এই আশ্বিন মাসে!

রাজকবি। ঋতু-উৎসবের শবসাধনা? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া করে তুলবেন। অদ্ভুত রসের কীর্তন।

নটরাজ। কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তার পরে আলো।

রাজা। (পারিষদের প্রতি) মানে কী হে?

পারিষদ। মহারাজ, আমি ঙ্গদের দেশের পরিচয় জানি। ঙ্গদের হেয়ালি বরণ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজকবি। যেন দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, টানলে আরো বাড়তে থাকে।

নটরাজ। বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তা হলেই সহজে বুঝবেন। জুই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা। রোসো রোসো। বর্ষাকে ডাকা কী রকম? বর্ষা তো নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ। সে তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা। গানের সুদূরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরই বাঁধা?

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। 'এই আর-এক বিপদ।

রাজকবি। নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপদুরের গন্ধর্ব-দলকে খবর দিন-না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক তা হলে কবির পক্ষে 'শেষ বর্ষণ' নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ। রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিততা মেনে চলে। উলটে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খত দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ট্রেনতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এরকম নয়।

রাজা। ওহে নটরাজ, রস জিনিসটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিসটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা না পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তা হলে তো আমার মতো লোকের মূর্শকিল।

নটরাজ। মহারাজ, গাঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুদূরে হয় একাত্ম।

পারিষদ। অলমতিবিস্তরণে। তোমাদের ধর্মে যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মতো সহ্য করব।

নটরাজ। (গায়কগায়িকাদের প্রতি) ঘনমেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাতো, সুদূরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘোর মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে ষুধীমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘন বরিষনে জল-কলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি প্রাণের আকাশের পদ্বি হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝরো ঝরো'।

ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শব্দরী।

ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চারি।

নটরাজ। শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারায়
একভারায় একই সুর সে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না।
ঐ শূন্য মহারাজ মেঘমল্লার।—

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে।

রাজা। পূর্ব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আসে?

নটরাজ। শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজকবি। শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে
ইশারায়।

রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি।
শ্রাবণের শুরু রাতে হাসি বলছে আমার জিত, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার
মালাবদল। ওগো কলস্বর, পূর্ণিমার ডালারিট খুলে দেখো, ও কী আনলে।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এর্নোইস বল,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল।
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যুথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপনলোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

রাজা। বেশ, বেশ, এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

রাজা। ঐ দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা
কথার চলন নেই বুঝি?

নটরাজ। মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের
গানটা ধরো।

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা
 আষাঢ় তোমার মালা।
 তোমার শ্যামল শোভার বুক
 বিদ্যুতের জ্বালা।
 তোমার মন্ত্রবলে
 পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
 মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।
 মরো মরো পাতায় পাতায়
 ঝরো ঝরো বারির রবে,
 গুরু গুরু মেঘের মাদল
 বাজে তোমার কণী উৎসবে।
 সবুজ সুধার ধারায়
 প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
 বামে রাখ ভয়ংকরী
 বন্যা মরণ-ঢালা।

রাজা। সব রকমের খ্যাপামিই তো হল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী?

নটরাজ। বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কার্লিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে “অন্যথাবৃত্তি চেতঃ”, সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আনমনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য, ধরো হে—

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
 হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
 পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
 বিনা কাজে সময় কাটে,
 পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী।
 ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
 পরান আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
 মিলবে যে আজ অকূল পানে,
 তোমার গানে আমার গানে,
 ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।

নটরাজ। বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়াল, ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল কিন্তু ওর বাণীটি আছে তোমার কণ্ঠে, মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
 আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
 বাজে কার কামনা।
 চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
 ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
 করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

রাজা। আর নয় নটরাজ, বিরহের পালাটাই বড়ো বেশি হয়ে উঠল, ওজন ঠিক থাকছে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে,

তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারি দিকে ছলছল করছে, মিলনপদ্মটি তারই বৃকের একটি দলুভ ধন।

রাজকবি। তাই নাই হ'ল কিন্তু অশ্রুবাপ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেললে তো চলবে না।

নটরাজ। মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য একবার শুনিয়ে দাও তো।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা-মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপছে বনের হিয়া
বরষনে মধুরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।

রাজা। আঃ, এতক্ষণ একটু উৎসাহ লাগল। থামলে চলবে না। দেখো-না, তোমাদের মাদল-ওআলার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। বালি ও ওস্তাদ, ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল, ওরা যে খ্যাপার মতো চলেছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো-না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বৃক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক-না সুরে কথায় মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পাখিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গে নে।
দিক-হারানো দঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে;
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

রাজকবি। ঐ রে, আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরি নেই, আবার কান্না নামল বলে।

নটরাজ। ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্ছে চোখের জলেরই জিত। বর্ষার রাতে সাথীহারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো; আজ বৃষ্টি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে করুণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।

ছিলে কি মোর স্বপনে
 সাথীহারা রাতে।
 বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে।
 আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
 কথা কও মোর হৃদয়ে
 হাত রাখো হাতে।

রাজা। কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য, তবে ঐটে শুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
 জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
 ঘনগোরবে নবযৌবনা বরষা,

শ্যাম গম্ভীর সরসা।

গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
 উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে,
 নিখিল-চিহ্ন-হরষা

ঘনগোরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
 জনপদবধু তড়িৎ-চকিত-নয়না,
 মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
 কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
 ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
 আনো বীণা মনোহারিকা।

কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
 বাজাও শঙ্খ, হুল্লুরব করো বধুরা,
 এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
 ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।

কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
 ভূজপাতায় নবগীত করো রচনা
 মেঘমল্লার রাগিণী।

এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
 ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
 কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
 অঞ্জন আঁকো নয়নে।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া,
 ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
 স্মিত-বিকশিত বয়নে;

কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
 গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
 দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা,
 গীতময় তরুলতিকা।
 শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
 ধ্বনিয়া তুলিছে মন্তমদির বাতাসে
 শতেক যুগের গীতিকা,
 শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

রাজা। বাঃ, বেশ জমেছে। আমি বলি আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক।
 নটরাজ। কিন্তু মহারাজ দেখছেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব। শেষ কেয়াফুলের
 গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভরে উঠল। ঐ যে 'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।

একলা বসে বাদলশেষে শূনি কত কী।
 'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।
 বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে
 ডেকে গেল আকাশপারে,
 তাই তো সে যে উদাস হল
 নইলে যেত কি।
 ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
 উঠত কে'পে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।
 শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
 গন্ধ যেত অভিসারে,
 সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
 খবর পেত কি।

রাজা। নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।
 নটরাজ। তা হলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।
 রাজা। তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মান, রাজার কথা মান না?
 আমি যদি বলি যেতে দেব না?

নটরাজ। তা হলে আমিও তাই বলব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো করুণিকা,
 বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য। নটরাজ, ও বলছে ওর সময় গেল।

নটরাজ। গেলই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনই তো শূন্য হয় অকাজের খেলা।
 শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোর কালোয় যুগলমিলন।

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
 সজল বিলোল আঁচল মেলে।
 পদ হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে',
 শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল বলে,
 বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
 অসময়ের খেলা খেলে।
 কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
 ও যে হল সাথীহীন।

পদ হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো',
শরৎ বলে, 'মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুঁচিয়ে ফেলে।'

নটরাজ। শরতের প্রথম প্রত্যুষে ঐ যে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দয়া করবেন, কথা কবেন না।

রাজা। নটরাজ, তুমিও তো কথা কইতে কসদুর কর না।

নটরাজ। আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা। আর আমার হল তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার নাইয় হল নদীড়ি, দুইয়ে মিলেই তো ঝরনা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ। এবার বুঝেছি আপনি ছন্দরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইল না। গীতাচার্য গান ধরো।

দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো, সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ওই শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়
আয় আয় আয়।

নটরাজ। ঐ দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌঁছেছে। আকাশের আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিল ঐ শেফালি। সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্যে, তার ব্যথা কজন বোঝে? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওলো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিল একে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি।
বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
কাননবীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি।

রাজা। নটরাজ, অমন শূকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে?

নটরাজ। আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়ারূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপণীর নৃপদর বাজল, কঙ্কণ চমক দিল কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলাম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন।
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শূনি তার নৃপদরগুঞ্জন।
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসাযাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ।

নটরাজ। শূদ্র শান্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকশিবে চরণ ফিরে।
বিরহ-তরণে অকূলে সে যে দোলে
দিবায়ামিনী আকুল সমীরে।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন। রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোররাগিকেও নিশীথরাগি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে, তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা
কেন সূদর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না।
আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জলে ছায়াছবি সৃজনে,

এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
 আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে,
 মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না
 ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা।
 কত আকুল হাসি ও রোদনে,
 রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
 জ্বালি জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
 ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা,
 প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
 সাজে ঝিল্লি-ঝঝির বাজায়ে,
 কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা,
 ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
 ওই বসেছ শূদ্র আসনে
 আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
 আহা শ্বেতচন্দনতিলকে
 আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে?
 আহা বরিল তোমারে কে আজি
 তার দঃখ-শয়ন তেরাজি,
 তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।

নটরাজ। প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগদুন্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগদুন্ঠন খোলো।
 গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
 তোমার আলসে অবলুন্ঠন সারা হল।
 শিউলি-সুর্ভাতি রাতে
 বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
 মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী বোলো।
 গোপন অশ্রুজলে মিলুক শরম-হাসি—
 মালতীবিতানতলে বাজুক বন্ধুর বাঁশি।
 শিশিরসিক্ত বায়ে
 বিজড়িত আলোছায়ে
 বিরহমিলনে গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো।

অবগদুন্ঠন মোচন

নটরাজ। অবগদুন্ঠন তো খুলল। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে?

তোমার নাম জানি নে সুর জানি।
 তুমি শরৎপ্রাতের আলোর বাণী।
 সারাবেলা শিউলিবনে
 আছি মগন আপন মনে,

কিসের ভুলে রেখে গেলে
 আমার বদকে ব্যথার বাঁশিখানি!
 আমি যা বলিতে চাই হল বলা,
 ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
 আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
 সেই মূর্তি এই বিরাজে,
 ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
 আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি।

রাজা। শরৎস্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে? বলো তো এবার কে আসবে?

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের
 ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

সুন্দরের প্রবেশ

কার বাঁশি নিশিভরে বাজিল মোর প্রাণে?
 ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা।
 শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
 ধরণীর অঁখি যে শিশিরে ভাসে।
 হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
 মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চণ্ডল হয়ে উঠলেন কেন?

নটরাজ। শিশির শূন্যকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে।
 ক্ষণিকের অর্তিথ স্বর্গ থেকে মর্ত্য আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গ-
 মর্ত্যের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অর্তিথ,
 এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
 ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
 কোন্ অমরার বিরহিণীরে
 চাহ নি ফিরে,
 কার বিষাদের শিশিরনীরে
 এলে নাহিয়া।
 ওগো অকরুণ, কী মায়া জান,
 মিলনছলে বিরহ আন।
 চলেছ পৃথক আলোক-যানে
 অঁধারপানে,
 মন-ভুলানো মোহন তানে
 গান গাহিয়া।

নটরাজ। এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে
 স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে।
 বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।
 তোমার বদকে বাজল ধ্বনি

বিদায়গাথা, আগমনী, কত যে,
 ফাঙ্গুনে প্রাণে, কত প্রভাতে রাতে।
 যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
 গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
 সময় যে তার হল গত
 নিশিশেষের তারার মতো
 তারে শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ সাথে।

রাজা। ও কী। একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি? কেবল দুদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হল, গান সারা হল! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা—তার পরে?

নটরাজ। ‘তার পরে’ প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চূপ। এই তো সৃষ্টির লীলা, এ তো কৃপণের পূর্জি নয়। এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মনুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তার পরে? কেউ চূপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়,
 চাস নে ফিরে দে তারে বিদায়।
 সে যে দখিন হাওয়ায় মনুকুল ঝরা,
 ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,
 সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঁঙিনায়।
 কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
 মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
 ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
 গেল চলে কতই তরী
 উজানবায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।

রাজা। উত্তম হয়েছে।

রাজকবি। আরো অনেক উত্তম হতে পারত।

ରକ୍ତକରବୀ

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୨୬

রচনাকালে নামকরণ 'যক্ষপদুরী'; পান্ডুলিপি আকারেই পরিবর্তিত নাম 'নন্দিনী'। প্রবাসী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩১) রক্তকরবী নামে প্রকাশিত। গ্রন্থপ্রকাশকালে (১৩৩৩) প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখে প্রকাশিত কবির একটি 'অভিভাষণ' 'প্রস্তাবনা'-রূপে মর্দিত হয়। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থে ১৩৬৭-সংস্করণে পান্ডুলিপি-ধৃত নাট্যপরিচয় গ্রন্থ-সূচনায় সংযোজিত।

বর্তমান সংস্করণে 'প্রস্তাবনা'র পরে নাট্যপরিচয় মর্দিত হল।

প্রস্তাবনা

আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতুহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুস্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তক্ষুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গদ্য অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গদ্য তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হুৎপিণ্ডটা পাজিরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। দশমুণ্ড বিশ-হাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর লেজে ক'রে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা হলে তার গদ্য অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমুণ্ডে একটা কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন কোনো-একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থাকে বুদ্ধি বিদ্রুপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দ্বিগ্ন লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ করে এলেন—গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেন। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। দ্রোণায়ুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানব-কন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। গদ্য নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যারা শ্রদ্ধা ক'রে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা-যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ

সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তা হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপদুরী বলে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখনকার রাজা পাতালে সন্ডুগ খোদাই করে সে ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পদুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপদুরী বলে। লক্ষ্মীপদুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বল প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি-রকম কোঁশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধু মহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপদুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদুর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল।

আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্ম-বিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বস্ত্রান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পণ্ডবটছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাণ্মীকির পক্ষে এ-সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরম্ব।

বারোয়ারির প্রবীণমন্ডলীর কাছে এ-কথা বলে ভালো করলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথাসম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান বলেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বলতে পারি নে, বিধাতা তাঁদের এইরকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কোঁতুক করবার জন্যেই। পুণ্যশ্লোক বাণ্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করলুম বলে পুনর্বীর হয়তো তাঁরা আমাকে একঘরে করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার কথা আমার দলের লোক আছেন, কৃষ্ণিবাস নামে আর-এক বাঙালী কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারি প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তারপরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্মবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্মবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সন্দেহের

আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাবুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর-একটিতে শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মূল্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহমিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ এক দিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণীগত মানুষের; রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি ‘নন্দিনী’ বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্ব উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,—মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।

নাট্যপরিচয়

এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বণ্ডিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুত্রী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুত্রীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ-খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর করে একে যক্ষপুত্রী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার সুড়ঙ্গ-খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপুত্রীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে, এর একটি ডাকনাম আছে—মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে।

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতরো অদ্ভুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেটুকু আলাপ-আলোচনা করেছেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যারা সদাঁর তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুত্রীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা এক সময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্ম-নিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সদাঁরদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুত্রীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।

এ ছাড়া একজন গোসাঁইজি আছেন, তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অল্প গ্রহণ করেন সদাঁরের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুত্রীর অনেক উপকার ঘটে।

জৈলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক-ভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন সেইটেকে এই মেয়ে টিকতে দেয় না বরাবর।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানলার বাহির-বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানলাটি যে কি রকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।

এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপদুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বাহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।

নন্দিনী ও কিশোর (সুড়ঙ্গ-খোদাইকার বালক)

কিশোর। নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!

নন্দিনী। আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শুনতে পাই নে।

কিশোর। শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।

নন্দিনী। যা যা, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর। সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী। ওরে কিশোর, জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর। তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে-পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর। অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী। কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর। সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী। কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সহিব কী করে!

কিশোর। কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।

নন্দিনী। তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্ তো, কিশোর।

কিশোর। এই সত্যটি কর্, নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।

[প্রস্থান]

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক। নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী। কী অধ্যাপক।

অধ্যাপক। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন নাহয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী। আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক। দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকারের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গার ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই

যক্ষপদ্রে আমাদের যা-কিছু ধন সব এই ধুলোর নাড়ীর ধন—সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী। বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক। সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপদ্রে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুঁদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক। আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁচাতে পারলে পৃথিবীকে পাব মৃত্যুর মধ্যে।

নন্দিনী। তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুঁলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রভাপ।

নন্দিনী। এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক। বানিয়ে-তোলাই তো। উল্লেগের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরি। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুঁদে খুঁদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পৃথিবীর মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।

অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ-গতের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সের্ধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী। না না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক। সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী। আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক। জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রজনকে সঙ্গে আনলে না কেন।

অধ্যাপক। সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।

নন্দিনী। আমার রজনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক। একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপদ্রীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রজনকে আনলে তাদের হবে কী।

নন্দিনী। ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তা হলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রজন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক। দেবতার হাসি সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শিখিনীনদীর মতো। ঐ নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক। জানলে কী করে।

নন্দিনী। হবে হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক। সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে!

নন্দিনী। যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক। তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।

নন্দিনী। যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক। রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্ গে, আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহবরের মধ্যে ঢুকে পড়ি গে, আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুত্রীকে তোমার ভয় করছে না?

নন্দিনী। ভয় করবে কেন।

অধ্যাপক। গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুত্রী গ্রহণ-লাগা পুত্রী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকে না। তুমি চলে গেলে ঐ গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে; তবু বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকো গে। (কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ঐ যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে?

নন্দিনী। কেন, কী করবে তুমি।

অধ্যাপক। কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী। আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক। হয়তো তোমার ভাগ্যপুত্রুষ জানে। ঐ রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

নন্দিনী। আমার মধ্যে ভয়?

অধ্যাপক। সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে। জান, মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়?

নন্দিনী। রঞ্জন আমাকে কখনো-কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বদকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক। তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী। এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলাম।

সুদৃগ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।—তোমাকে বদ্বতেই পারলুম না। তুমি কে।

নন্দিনী। আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী।

গোকুল। না বদ্বলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে।

নন্দিনী। অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল। একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ঐ কী ঝুলছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরী।

গোকুল। ওর মানে কী।

নন্দিনী। ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল। আমি কিছুর তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছে। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছুর বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী!

নন্দিনী। আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন।

গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বদ্বিয়ে বলি গে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান।'

[প্রস্থান

নন্দিনী। (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে। না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী। কুন্দফুলের মালা গণ্ঠে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে। নিজে পরো।

নন্দিনী। আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে। আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী। সেই চূড়ার বৃকেও ঝরনা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে। আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী। দূর থেকে ঐ গান শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কিসের গান।

নন্দিনী। পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চলে,

আয় আয় আয়।

ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,

মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে

দিগ্বধূরা ধানের খেতে,

রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—

মরি, হায় হায় হায়।

তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শব্দে শব্দে আকাশ খুঁশি হল—

ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দরজা খোলো।

নেপথ্যে। আমি মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগব।

নন্দিনী। মাঠের কাজ তোমার যক্ষপদুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে। সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নদুপদুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে। যাও যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী। অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছন্দ্র আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপদুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগদুলোকে নিয়ে চড়ে করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড় দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

নেপথ্যে। কেন, ভয় কিসের।

নন্দিনী। পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুঁশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে?

নেপথ্যে। অভিসম্পাত?

নন্দিনী। হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে। শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুঁশি হও, নন্দিনী?

নন্দিনী। ভারি খুঁশি লাগে। তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুঁশি হয়ে উঠুক।

আলোর খুঁশি উঠল জেগে
ধানের শিশে শিশির লেগে,
ধরার খুঁশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

নেপথ্যে। নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মূঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী। ও কী বলছ তুমি।

নেপথ্যে। তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে পরতে পারি নে কেন। সামান্য পাপড়িকটা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে—কোমল বলেই কঠিন। আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী। সে আর-এক দিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে। না না, যেয়ো না, বলে যাও; আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো—দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী। সে কথা থাক, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে। আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী। সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বদ্ববে না।

নেপথ্যে। বদ্বব। বদ্বতে চাই।

নন্দিনী। সব কথা ঠিক বদ্বিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না।

নন্দিনী। হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে। রঞ্জনের মতোই?

নন্দিনী। ঘুরে-ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে। কিছু কিছু বদ্বি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী। জাদু বলছ কাকে।

নেপথ্যে। বদ্বিয়ে বলব? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে—সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী। তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন।

নেপথ্যে। আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমাণি হয় না—শক্তি যতই বাড়াই ঘোবনে পেঁপঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই। রঞ্জনের মতো ঘোবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী। তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছটফট করছ বদ্বতে পারি নে।

নেপথ্যে। বদ্বতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নন্দিনী। তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে। নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বদ্বতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দ্বঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুম্‌রে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বদ্বেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি—সে এর উলটো।

নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখছ।

নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী। বদ্বতে পারলুম না।

নেপথ্যে। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী। তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বাঁশিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।

নেপথ্যে। নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি

করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মন্দির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বন্ধ মন্ঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী। তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। আচ্ছা যেয়ো, কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী। না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে। কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি নন্দিনী।

নন্দিনী। তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ।

নেপথ্যে। আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যদি পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয় নি।

নন্দিনী। আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রজন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে। তোমার রজন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানি নে। নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব।

নন্দিনী। আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে। না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী। ছুটি কী করে মধুতে ভরে, তার জবাব রজনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

নেপথ্যে। সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে যাও—নইলে বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার রজন আসবে, আসবে, আসবে—কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।

[প্রস্থান]

ফাগদুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগদুলাল। আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা। ওকি কথা। সকাল থেকেই মদ?

ফাগদুলাল। আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর রত গেছে। আজ ধ্বজাপূজা, সেই সঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা। বল-কি। ওরা কি ঠাকুর-দেবতা মানে।

ফাগদুলাল। দেখ নি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা। তা ছুটি পেয়েছ বলেই মদ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটিতে তো—

ফাগদুলাল। বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুত্রে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা। কাজ ছেড়ে দাও-না, চলো-না ঘরে ফিরে।

ফাগদুলাল। ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?

চন্দ্রা। কেন বন্ধ।

ফাগদুলাল। আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মনফা নেই।

চন্দ্রা। আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুষ? ফালতো কিছুই নেই?

ফাগদুলাল। আমাদের বিশদুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার; যারা তাকে খায়, তার হাড়গোড় খুরলেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভাঁ করে ডাকে, সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে। ঐ যে বিশদুপাগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

চন্দ্রা। কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেছে।

ফাগদুলাল। তাই তো দেখছি।

চন্দ্রা। ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগদুলাল। তাতে আর আশ্চর্যটা কী।

চন্দ্রা। না, আশ্চর্য কিছুই নেই। ওগো সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে—সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে। মায়াবিনী মায়াজানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগদুলাল। বিশদুর বিপদ আজ ঘটে নি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা। বিশদুবেয়াই, শূনে যাও, শূনে যাও। যাও কোথায়। গান শোনার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশদুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।

লাগল পালে নেশার হাওয়া,

পাগল পরান চলে গেয়ে।

আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা

তোর দুলিয়ে দিয়ে না,

তোর সুন্দর ঘাটে চল রে বেয়ে।

চন্দ্রা। তবে তো আশা নেই, আমরা যে বড়ো কাছে।

বিশদু।

আমার ভাবনা তো সব মিছে,

আমার সব পড়ে থাক পিছে।

তোমার ঘোমটা খুলে দাও,

তোমার নয়ন তুলে চাও,

দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে।

চন্দ্রা। তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশদু। বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখ নি।

চন্দ্রা। তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।

গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল। দেখো বিশদু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না।

বিশদু। কেন, কী করেছে।

গোকুল। কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনাতে কেন। ওর রকমসকম কিছুই বদ্বি নে।

চন্দ্রা। বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা; ও যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরীপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখতে পারি নে।

গোকুল। আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।

বিশ্বদু। যক্ষপদুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বন্ধুতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মর্খদু কিন্তু এখানকার সদাঁর পর্যন্ত ওকে দৃচক্ষে দেখতে পারে না, তা জান?

বিশ্বদু। দেখো দেখো চন্দ্রা, সদাঁরের দু চক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে, তা হলে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষু লাল হয়ে উঠবে।—আচ্ছা, তুই কী বলিস ফাগুলাল।

ফাগুলাল। সত্যি কথা বলি দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।

গোকুল। বিশ্বদুভাই, ঐ মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেছে। সেইজন্যে দেখতে পাচ্ছ না ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বন্ধুতে বেশি দেরি হবে না, বলে রাখলুম।

ফাগুলাল। বিশ্বদুভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশ্বদু। স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চার দিকেই, এমন কি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে আমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে।

চন্দ্রা। তাই বৈকি। তোমাদের মতো জন্ম-মাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভান্ড উপড় করে দিয়েছেন।

বিশ্বদু। একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছুটি ছুটি।

চন্দ্রা। এইগুলোকে মদ বলে নাকি।

বিশ্বদু। প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিংহকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

গান

তোর প্রাণের রস তো শূন্যকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
 সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অটু হেসে দেয় যে রঙিন করে।

চন্দ্রা। এসো-না বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশ্বদু। সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদ-খানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।

তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে,
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
 লুপ্তনেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক-ভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্রা। যাই বল বিশদুবেয়াই, যক্ষপদুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশদু। হয় নি তো কী। তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন সোনা সোনা করে প্রাণটা খাঁচি খাচ্ছে।

চন্দ্রা। কখখনো না।

বিশদু। আমি বলছি—‘হাঁ’। ঐ যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ করে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, তা চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশদু। সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুন্দর আটকেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগদুলাল। আচ্ছা ভাই বিশদু, তুমি তো একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মদুখুদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন।

চন্দ্রা। এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াইয়ের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগদুলাল। অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশদু। কী বলো দেখি।

ফাগদুলাল। আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশদু। সবাই জানতিস যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন।

ফাগদুলাল। এও জানি এ কাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা। এমন আরামের কাজেও টিকতে পারলে না বেয়াই?

বিশদু। আরামের কাজ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা! বললুম, ‘দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।’ সর্দার বললেন, ‘আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে। তবু চেষ্টা দেখো।’ চেষ্টা দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপদুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে-আমাতে তফাত এই যে, সর্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়েও বেশি। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগদুলাল। দঃখ কী বিশদুদাদা। আমরা তো তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশদু। প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই, সোনাব্যাপ্ত যতই মক্‌মক্‌ শব্দে কোলাব্যাপ্তের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়া-সাপের।

চন্দ্রা। কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরবে?

বিশদু। পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দু দিন, দু দিনের পর তিন দিন; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনিছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপদুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগদুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা।

ফাগদুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ফ।

বিশদু। আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পাঁচিশের ছক। বুকুর উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলেছে।

চন্দ্রা। বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কি দরকার।

বিশ্ব। দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বদ্বাতে পারলে না?

চন্দ্রা। না।

বিশ্ব। মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পৌঁছয় না, অসাধারণের আসমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা। নবান্নের সময় এল ব'লে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশ্ব। স্ত্রীবৃদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুদ্ধি?

চন্দ্রা। কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ—

বিশ্ব। হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলাগা করতে পারে না।

চন্দ্রা। ঐ যে সর্দার।

বিশ্ব। তবেই হয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয় শুনছে।

চন্দ্রা। কেন, এমন তো কিছু বলি নি যাতে—

বিশ্ব। বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্‌ কথার টিকে কোন্‌ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

সর্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা। সর্দারদাদা!

সর্দার। কী নাতনি, খবর ভালো তো?

চন্দ্রা। একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দার। কেন। যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে। কী হে ৬৯৬, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশ্ব। সর্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুন্যে আমোদ লাগছে না। নাচাবার মতো পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যাবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

সর্দার। নাতনি, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনার জন্যে কেনারাম গোসাঁইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোসাঁইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধ্যাবেলায় এরা—

ফাগদুলাল। না না, সে হবে না সর্দারজি। এখন সন্ধ্যাবেলায় মদ খেয়ে বড়োজোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশ্ব। চুপ চুপ ফাগদুলাল।

গোসাঁইয়ের প্রবেশ

সর্দার। এই যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন—ভারি দরকার।

গোসাঁই। এই এদের কথা বলছ? আহা, এরা তো স্বয়ং কুর্ম-অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিংকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার

ঠাউরে দেখো, যে মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্য জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। একি কম কথা। আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবচলিত থাকো, তা হলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে' অবচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

চন্দ্রা। আহা, কী মধুর। বাবা, অনেকদিন এমন কথা শুনিনি। দাও দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।

ফাগদুলাল। এতক্ষণ অবচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারি নে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভন্ডামি সইব না।

বিশদু। ফাগদুলাল খেপলে আর রক্ষে নেই, চুপ চুপ।

চন্দ্রা। ইহকাল পরকাল তুমি দু-ই খোয়াতে বসেছ? তোমার গতি হবে কী। এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ঐ নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই। যাই বল সর্দার, কী সরলতা। পেটে-মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুদ্ধেছ?

সর্দার। বুদ্ধেছি বৈকি। এও বুদ্ধেছি উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরণ ওপাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিটখিট শুরু করছে।

গোঁসাই। কোন্ পাড়া বললে সর্দারবাবা।

সর্দার। ঐ যে ট-ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্খন্য-গয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোঁসাই। বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, মূর্খন্য-গরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফোঁজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফোঁজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আঁস।

চন্দ্রা। প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন সন্মতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই। ভয় নেই মা লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাবে।

[প্রস্থান]

সর্দার। ওহে ৬৯ঙ, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি!

বিশদু। তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বৈরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা। বিশদুবোয়াই, একটু থামো। সর্দারদাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দার। কিছুতেই না। শুনেনে রাখলুম, মনেও রাখব।

[প্রস্থান]

চন্দ্রা। আহা দেখলে? সর্দার লোকটি কী সরেস। সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশদু। মকরের দাঁতের শুরুরূতে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা। কামড়টা এর মধ্যে কোথায়।

বিশদু। জান না, ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না?

চন্দ্রা। কেন।

বিশদু। সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা। ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই। তারা কী বলে।

বিশ্বদু। তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়ি নে।

চন্দ্রা। বিশ্বদেবুয়াই, তোমার ঘরে তো স্ত্রী ছিল, তার হল কী। অনেকদিন খবর পাই নি।

বিশ্বদু। যতদিন চরের উচ্চপদে ভর্তি ছিলুম, সর্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাসখেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে যোগ দিলুম, ও পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্রা। ছি, এমন পাপও করে।

বিশ্বদু। এ পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা। বিশ্বদেবুয়াই, দেখো দেখো, ঐ কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খী, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ? বলমল করছে। কী চমৎকার ঘোড়-সওয়ার। বর্ষার ডগায় যেন এক-এক টুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশ্বদু। ঐ তো সর্দারনীর ধ্বজাপুজার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্রা। আহা, কী সাজের ধুম। কী চেহারা। আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অর্মানি ধুম করে বেরতে? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশ্বদু। হাঁ, আমাদেরও ঐ দশা ঘটত।

চন্দ্রা। এখন আর ফেরবার পথ নেই? একেবারে না?

বিশ্বদু। আছে, নর্দমার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে। পাগলভাই!

বিশ্বদু। কী পাগলি।

ফাগুলাল। ঐ তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মতো বিশ্বদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা। তোমার বিশ্বদাদার আশা আর রেখো না। কোন্‌ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি বেয়াই।

বিশ্বদু। ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা। বেয়াই অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।

বিশ্বদু। তোরা বুঝবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল। বিশ্বদাদা, পস্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশ্বদু। বলছি শোন, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা। এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই, একটা কথা বুঝি যে, যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ঐ মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

[চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান]

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। পাগলভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেনিহিলে?

বিশ্বদু। আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাব। এ যে ক্লান্ত রান্ধুরটারই ঝোঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছ্বাস।

নন্দিনী। আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশদ। আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশদ। তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে।

নন্দিনী। কেন।

বিশদ। যক্ষপদরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পার্কিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বদ্বতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী। পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশদ। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনার তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ,

ওগো ঘুমভাঙানিয়া।

বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক,

ওগো দুখজাগানিয়া।

এল আঁধার ঘিরে,

পাখি এল নীড়ে,

তরী এল তীরে,

শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,

ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী। বিশদপাগল, তুমি আমাকে বলছ ‘দুখজাগানিয়া’?

বিশদ। তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দাতী। যেদিন এলে যক্ষপদরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে

কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।

আমায় পরশ ক’রে

প্রাণ সুধায় ভ’রে

তুমি যাও যে সরে,

বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক,

ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী। তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশদ। কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী। না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরু মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে

থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না—তার পরে কতকাল খোঁজ পাই নি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।

বিশদ।

গান

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খূলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী। সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপদীর সড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে।

বিশদ। একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে; আমি নিজেকে ভুলে ছিলাম।

নন্দিনী। তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে।

বিশদ। তুমি জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলাম মেঘের স্বর্ণপদরী, সে দেখছিল সদাঁরের সোনার চুড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, 'ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।' আমি স্পর্ধা করে বললাম, 'যাব নিয়ে।' আনলাম তাকে সোনার চুড়ার নীচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী। আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশদ। তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে। আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না?

নন্দিনী। এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখছি।

বিশদ। কী রকম দেখলে।

নন্দিনী। দেখলাম মানুষ, কিন্তু প্রকান্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহু দুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশদ। ঘরে ঢুকে কী দেখলে।

নন্দিনী। ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে, যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না?' আমি বললাম, 'একটুও না।' তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।

বিশদ। তোমার কেমন লাগল।

নন্দিনী। ভালো লাগল। কি রকম বলব? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মঞ্জার মধ্যে খুঁশি লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খুঁশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশদ। তার পরে ও কী বললে।

নন্দিনী। একসময় ঝঞ্ঝে উঠে ওর বর্ষাফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললাম, 'জানবার কী

আছে। আমি কি তোমার পুঁথি।' সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কিরকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কী রকম ভালোবাস।' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে—পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?' আমি বললুম, 'এখুঁনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখুঁখনো না।' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী।' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছটফট করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট কোরো না।' মানে বদ্বতে পারলুম না।

বিশদু। সব কথার পস্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও বদ্বতে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী। পাগলভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশদু। যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী। না না, তুমি জান না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কিরকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশদু। ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে; জানি নে সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী। ঐ দেখো পাগলভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনছে।

বিশদু। এখানে তো চার দিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী।—সর্দারকে কেমন লাগে?

নন্দিনী। ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে।

বিশদু। প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী। চুপ করো, শুনতে পাবে।

বিশদু। চুপ করাটাকেও যে শুনতে পায়, তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথায়বর্তায় সর্দারকে সামলে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ বলে অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু পাগলি, তোর সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী। না না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। ঐ যে সর্দার এসে পড়েছে।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কিগো ৬৯৬, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছবিচার নেই?

বিশদু। এমন কি, তোমার সঙ্গেও শূরু হয়েছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দার। কী নিয়ে আলাপ চলছে।

বিশদু। তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সর্দার। বল কী, এত সাহস? কবুল করতেও ভয় নেই?

বিশদু। সর্দার, মনে মনে তো সব জানই। খাঁচার পাখি শলাগদুলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবুল করলেই কী, না করলেই কী।

সর্দার। আদর করে না, সে জানা আছে; কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না, সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান দিচ্ছে।

নন্দিনী। সর্দারজি, তুমি যে বলেছিলেন, আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই কথা রাখলে না?

সর্দার। আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী। সে আমি জানতুম। তবু আশা দিলে যখন, জয় হোক তোমার সর্দার, এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশদু। ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে। রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন।

নন্দিনী। তার জন্যে মালা আছে।

সর্দার। আছে বৈকি, ঐ বর্ষা গলায় দুলছে? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান—আর বরণমালা ঐ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে; হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।

[প্রস্থান]

নন্দিনী। (জানলার কাছে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কী বলতে চাও বলো।

নন্দিনী। একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে। এই এসেছি।

নন্দিনী। ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে। বার বার কেন মিছে অনুরোধ করছ। এখনো সময় হয় নি। ও কে তোমার সঙ্গে।
রঞ্জনের জুড়ি নাকি।

বিশদু। না রাজা, আমি রঞ্জনের ওপিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে। তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার। নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে।

নন্দিনী। ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়। ঐ তো শিখিয়েছে—

গান

‘ভালোবাসি ভালোবাসি’

এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে। ঐ তোমার সাথী? ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা হলে কী হয়।

নন্দিনী। তোমার গলার সুর ও কী রকম হয়ে উঠল। থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি।

নেপথ্যে। আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?

নন্দিনী। আচ্ছা, থাক্ ও কথা। মা গো, তোমার হাতে ওটা কী।

নেপথ্যে। একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী। কী করবে ওকে নিয়ে।

নেপথ্যে। এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোর্টরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিংকে। এইভাবে কী করে টিংকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিংকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী। আমারও চারি দিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে। তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে। ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

নন্দিনী। তাতে কী হবে।

নেপথ্যে। আমি জানতে চাই।

নন্দিনী। তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। মনে হয়, যে জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে' তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না।
—না না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ঐ যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী। এ নিয়ে কী হবে।

নেপথ্যে। ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারি রক্ত-আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হলে—

নন্দিনী। তা হলে কী হবে।

নেপথ্যে। তা হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী। একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে ঐ ফুলে আমার কানের দুল করেছি।

নেপথ্যে। তা হলে বলে দিচ্ছি, ও আমারও শনিগ্রহ তারও শনিগ্রহ।

নন্দিনী। ছি ছি, ও কী কথা বলছ। আমি যাই।

নেপথ্যে। কোথায় যাবে।

নন্দিনী। তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। রজন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে। রজনকে যদি দলে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়।

নন্দিনী। আজ তোমার কী হয়েছে। আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন।

নেপথ্যে। মিছিমিছি ভয়? জান না, আমি ভয়ংকর?

নন্দিনী। হঠাৎ তোমার এ কী ভাব। লোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে—সে যখন আসবে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুশি হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব? রাগ করবে না?

নেপথ্যে। কী বলো দেখি।

নন্দিনী। ভয় দেখাবার ব্যাবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অশুভ সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পদতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না?

নেপথ্যে। কী বলছ নন্দিনী।

নন্দিনী। এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রজন এখানে যদি থাকত, তোমার মূখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারই রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী। তার পরে কী।

নেপথ্যে। তার পরে আমার শেষ ভাঙটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে—যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি।

নন্দিনী। এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কী করতে পার করো। অমন বিদ্রী করে গর্জন করছ কেন।

নেপথ্যে। আমি যে কী অশুভ নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আতর্নাদ শোন নি?

নন্দিনী। শুনছি, সে কিসের আতর্নাদ।

নেপথ্যে। সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা

ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই-সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী। কেন তুমি নিষ্ঠুর।

নেপথ্যে। আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব এক রকম করে পাওয়া।

নন্দিনী। ও কী, অমন মূঠো পার্কিয়ে হাত বের করছ কেন।

নেপথ্যে। আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

নন্দিনী। আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্যে। শোনো শোনো, ফিরে এসো তুমি। নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী। কী বলো।

নেপথ্যে। সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তত্ব ঝরনা। আমার এই হাত-দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর-কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গদুছ গদুছ কালোচুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী। তুমি কি কখনো ঘুমোও না।

নেপথ্যে। ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী। তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—

‘ভালোবাসি ভালোবাসি’

এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

আকাশে কার বৃকের মাঝে

ব্যথা বাজে,

দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে। থাক্ থাক্ থামো তুমি, আর গেলো না।

নন্দিনী। সেই সুরে সাগরকূলে

বাঁধন খুলে

অতল রোদন উঠে দূলে।

সেই সুরে বাজে মনে

অকারণে

ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদনহাসি।

পাগলভাই, ঐ যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভয় পায়।

বিশদ। ওর বৃকের মধ্যে যে বৃড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।—পাগলি, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে?

নন্দিনী। মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁছেছে, আজ নিশ্চয় রজন আসবে।

বিশদ। নিশ্চয় খবর এল কোন্ দিক থেকে।

নন্দিনী। তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে। আমি সন্ধ্যা হলেই ধুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রজন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তরে-হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বৃকের আঁচলে।

বিশদু। তাই তো দেখছি, আর দেখছি কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ পরেছ।

নন্দিনী। দেখা হলে এই পালক আমি তার চুড়ায় পরিয়ে দেব।

বিশদু। লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শূভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী। রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশদু। পাগলি, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী। না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশদু। কী করব বলো।

নন্দিনী। গান করো।

বিশদু। কী গান করব।

নন্দিনী। পথ-চাওয়ার গান।

বিশদু।

গান

যুগে যুগে বদ্বি আমার চেয়েছিল সে।

সেই বদ্বি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন তারে চোখের কোণে

দেখেছিলাম অফুট প্রদোষে,

সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,

রাতের মৃথের আঁধারখানি খুলবে ইঞ্জিতে।

শুরু রাতে সেই আলোকে দেখা হবে, এক পলকে

সব আবরণ যাবে বে খসে।

সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

নন্দিনী। পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।

বিশদু। তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।—এখন কোথায় যাবি।

নন্দিনী। পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুনব।

[উভয়ের প্রস্থান]

সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দার। না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল। ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সড়ঙ্গের কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দার। তা কী হল।

মোড়ল। কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, ‘হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যাস নেই।’

সর্দার। অভ্যাস এখনি শূন্য করাতে দোষ কী।

মোড়ল। সে চেষ্টা করা গেল। বড়ো মোড়ল এল কোর্টালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সূর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ‘গাম্ভীর্য নির্বোধের মৃথোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি।’

সর্দার। ওকে সড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন।

মোড়ল। দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উলটো হল, খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে, বললে, ‘আজ আমাদের খোদাইনৃত্য হবে।’

সর্দার। খোদাইনৃত্য? তার মানে কী।

মোড়ল। রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে, ‘মাদল পাই কোথায়’, ও বললে, ‘মাদল না থাকে, কোদাল আছে।’ তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, ‘এ কেমন তোমার কাজের ধারা।’ রঞ্জন বললে, ‘কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।’

সদর। লোকটা পাগল দেখছি।

মোড়ল। ঘোর পাগল। বললুম, ‘কোদাল ধরো।’ ও বলে, ‘তার চেয়ে বেশি কাজ হবে যদি একটা সারোঙ্গি এনে দাও।’

সদর। তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে।

মোড়ল। কী জানি প্রভু। শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে—ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সদর। ও কী। ঐ-না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে? একটা ভাঙা সারোঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল। তাই তো। কখন গারদের ভিতরে কেটে বেরিয়ে এসেছে। ভেলকি জানে।

সদর। যাও, এই বেলা ধরো গে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল। দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন আমাদের সন্ধান নাচিয়ে তুলবে।

ছোটো সদরের প্রবেশ

সদর। কোথায় চলেছ।

ছোটো সদর। রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সদর। তুমি কেন। মেজো সদর কোথায়।

ছোটো সদর। ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, ‘আমরা সদররা কিরকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।’

সদর। শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটো সদর। ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সদর। ওকে বলো গে, রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।

ছোটো সদর। কিন্তু রাজা যদি—

সদর। কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান]

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ

পুরাণবাগীশ। ভিতরে এ কী প্রলয়কান্ড হচ্ছে বলো তো। ভয়ংকর শব্দ যে!

অধ্যাপক। রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরি একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ। মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শিথিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অটুহাসির মতো খল্‌খল্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সপ্তসরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

পূরাণবাগীশ। বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কী করতেই বা আনলে।

অধ্যাপক। জগতে যা-কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে, এখন থেকে থেকে রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যা তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপূরুষের অন্তরমহল কোথায়।' ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পূরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক—আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন পূরাবস্তুর গাঁঠকাটা চলুক। ঐ দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে?

পূরাণবাগীশ। একটি মেয়ে ধানীরঙের কাপড়-পরা।

অধ্যাপক। পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুত্রে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেথাপ। চার দিকে হাটের চেঁচামেঁচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা। এক-একদিন ওর চলে-যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখির মতো হুশ করে উড়ে পালায়।

পূরাণবাগীশ। বল কী হে, তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুর্কি বাধে নাকি।

অধ্যাপক। জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পূরাণবাগীশ। এখন বলো তো, তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়।

অধ্যাপক। দেখার উপায় নেই, ঐ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পূরাণবাগীশ। বল কী হে। এই জালের আড়াল থেকে?

অধ্যাপক। তা নয় তো কী। ঘোমটার আড়াল থেকে ঘেরকম রসলাপ হতে পারে সে ধরনের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পূরাণবাগীশ। বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

অধ্যাপক। কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিস সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিসকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসিকে।

পূরাণবাগীশ। আজকাল দেখছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানীরঙের দিকে একটানা ছুটে চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কী করে।

অধ্যাপক। সত্যি কথা বলব? আমি ওকে ভালোবাসি।

পূরাণবাগীশ। বল কী হে।

অধ্যাপক। তুমি জান না, ও এত বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট করতে পারে না।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছ বৃদ্ধি! ওঁর বিদ্যার বিবরণ শুনাই আমাদের রাজা খেপে উঠেছে।

অধ্যাপক। কিরকম।

সর্দার। রাজা বলে, পূরাণ বলে কিছু নেই। বর্তমানকালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পূরাণবাগীশ। পূরাণ যদি নেই তা হলে কিছু আছে কী করে। পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে।

সর্দার। রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে, মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। নন্দিনী! নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীর মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না, রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্ব উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার, সর্দার, ও কী! ও কারা!

সর্দার। কিগো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী। চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপদীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে?

সর্দার। ওদের আমরা বলি রাজার এংটো।

নন্দিনী। মানে কী।

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বদ্বাবে, আজ থাক্।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে।

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনো দিন ছিল?

সর্দার। হয়তো ছিল।

নন্দিনী। এখন গেল কোথায়।

সর্দার। বস্তুবাগীশ, পার তো বদ্বায়ে দাও, আমি চললুম।

[প্রস্থান]

নন্দিনী। ও কী, ঐ-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনূপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আশাচতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে। ঐ যে দেখি শক্লু, তলোয়ার খেলায় সবার আগে পেত মালা। অনূ—প, শক্লু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী-পাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ওকি, কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল; যে ঘাটে জল আনতে যেতুম, তারই কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভান করত যেন তাঁর বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টু'মি করে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি! এমন কেন হল।

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে।

নন্দিনী। তোমার কথা বদ্বাতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী। হয়েছে বৈকি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিন্ডুতটি হল তার খরচ। ঐ ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ঐ বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক। তত্ত্বের উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী। এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তা হলে চাই নে আমি হওয়া—আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক। 'রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। দেখো-না, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন সরে পড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বৃষ্টিবেন বেড়াজাল এখান থেকে শূন্য করে বহু যোজন দূর পর্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ করছ তুমি। তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলের মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

নন্দিনী। (জানলা ঠেলে) শোনো, শোনো!

অধ্যাপক। কাকে ডাকছ তুমি।

নন্দিনী। জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক। ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে। ডাক শুনতে পাবে না।

নন্দিনী। বিশুপাগল, পাগলভাই!

অধ্যাপক। তাকে ডাকছ কেন।

নন্দিনী। এখনো যে সে ফিরল না। আমার ভয় করছে।

অধ্যাপক। একটু আগেই তোমার সঙ্গেই তো দেখেছি।

নন্দিনী। সর্দার বললে, রজনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না।—ও কিসের আত্ননাদ।

অধ্যাপক। এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী। কে সে।

অধ্যাপক। সেই যে জগন্নিবখ্যাত গজ্জ, যার ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল, তার পরে তার লঙাটির একটা ছেঁড়া সূতো কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জ এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'এ রাজ্যে সূড়ঙ্গ খুঁদতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও তো একমুহূর্ত সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।'

নন্দিনী। দিনরাত এই মানুষধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একটুও কি ভালো থাকে।

অধ্যাপক। ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনী। থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী।

অধ্যাপক। আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝংকার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে, এ কথা বলে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে, এ কথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বল এতে মনুষ্যত্বের দুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

পালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী। আহা, ঐ দেখো, কিরকম টলতে টলতে আসছে। পালোয়ান, এইখানে শূন্যে পড়ো।
অধ্যাপক, দেখো-না কোথায় চোট লেগেছে।

অধ্যাপক। বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান। দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক। কেন হে।

পালোয়ান। কেবল ঐ সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক। সর্দার তোমার কী করেছে।

পালোয়ান। সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো লড়তে চাই নি। আজ বলে বেড়াচ্ছে, আমারই দোষ।

অধ্যাপক। কেন। ওর কী স্বার্থ।

পালোয়ান। সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখ-দুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী। তোমার কিরকম বোধ হচ্ছে, পালোয়ান।

পালোয়ান। বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শব্দ জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শব্দে নেয়।—যদি কোনো উপায়ে একবার—হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার—তোমার দয়া হলে কী না হতে পারে। সর্দারের বন্ধু যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।

নন্দিনী। অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক। সাহস করি নে নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী। মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক। যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা পাপ হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মূঠো মেলে গাছ মাটির নীচে হরণ-শোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটার না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।—ঐ যে সর্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সহিতে পারে না।

নন্দিনী। আমার উপরে কেন এত রাগ।

অধ্যাপক। আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ; যতই সুর মিলছে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চোঁচিয়ে উঠছে।

[প্রস্থান]

সর্দারের প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার!

সর্দার। নন্দিনী, তোমার সেই কুন্দফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোসাইজির দুই চক্ষু—এই যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম! প্রভু, সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

গোসাইয়ের প্রবেশ

গোসাই। আহা, শব্দ প্রাণের দান, ভগবানের শব্দ কুন্দফুল। বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শব্দতা স্তান হল না। এতেই তো পদ্যের শক্তি আর পাপীর দ্রাণের আশা দেখতে পাই।

নন্দিনী। গোসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি।

গোসাই। সব দিক ভেবে যে পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মূখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করি নে।

নন্দিনী। এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুদ্ধি পরিমাণ-বিচার আছে?

গোসাই। আছে বৈকি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বন্ধে তার ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা

বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন।

গোঁসাই। যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার অংশভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী। তবে কি এ লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এই রকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে।

গোঁসাই। পড়েই বা থাকবে কেন। কী বল সর্দার।

সর্দার। সে তো ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন। এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। ওরে গজ্জু!

পালোয়ান। কী প্রভু।

গোঁসাই। হরি হরি, এরই মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীর্তনের দলে টেনে নিতে পারব।

সর্দার। হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে যা সেখানে।

নন্দিনী। ও কী কথা! চলতে পারবে কেন।

সর্দার। দেখো নন্দিনী, মানুষ-চালানোই আমাদের ব্যাবসা। আমরা জানি, মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ খুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু।

পালোয়ান। যে আদেশ।

নন্দিনী। পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

পালোয়ান। না না, থাক্, সর্দার রাগ করবে।

নন্দিনী। আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।

পালোয়ান। আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না।

[প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশদুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ।

সর্দার। আমি নিয়ে যাবার কে। বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।

নন্দিনী। এ কোন্ সর্বনেশে দেশ গো। তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জান, কোথায় আমার বিশদুপাগল আছে।

গোঁসাই। আমি নিশ্চয় জানি, যে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী। কার ভালোর জন্যে।

গোঁসাই। সে তুমি বুঝবে না।—আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা। ঐ গেল ছিঁড়ে। ওহে সর্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দার। কে জানে ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

গোঁসাই। ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা-সুন্দর ছিঁড়বে। বিপদ করলে। আমি চললুম।

[প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গিয়েছ বিশদুপাগলকে।

সর্দার। তাকে বিচারশালায় ডেকেছে—এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী। আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চুড়া।

সর্দার। তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশ্ণুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই।

নন্দিনী। আমি!

সর্দার। হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী। তাই হোক, কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি।

সর্দার। কিছুতে না।

নন্দিনী। কিছুতে না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম।

[সর্দারের প্রস্থান]

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো শোনো, রাজা। কোথায় তোমার বিচারশালা। তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি। ও কে ও! কিশোর যে! বল্ তো আমায়, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশ্ণু।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর। হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখো। জানি নে, প্রহরীদের কতটা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশ্ণুকে নিয়ে যেতে রাজি হল।

নন্দিনী। প্রহরীদের কতটা? তবে কি—

কিশোর। হাঁ, ঐ যে আসছে।

নন্দিনী। ও কী! তোমার হাতে হাতকড়ি! পাগলভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেছে।

বিশ্ণুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ

বিশ্ণু। ভয় নেই, কিছু ভয় করিস নে। পাগলি, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী। কী বলছ বুঝতে পারছি নে।

বিশ্ণু। যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী। কী দোষ করেছে যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশ্ণু। এতদিন পরে আজ সত্য কথা বলেছিলুম।

নন্দিনী। তাতে দোষ কী হয়েছে।

বিশ্ণু। কিছু না।

নন্দিনী। তবে এমন করে বাঁধলে কেন।

বিশ্ণু। এতেই বা ক্ষতি কী হল। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি—এ বন্ধন তারই সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী। ওরা তোমাকে পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরই লজ্জা করছে না? ছি ছি, ওরাও তো মানুষ।

বিশ্ণু। ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে যে—মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।

হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ঐ রোগটি আছে আমাদের তেঁদিশের। তার তো দেখি আর-কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চলছেই। ভয় হয়, কার নামে কী বানিয়ে বসে। অথচ গুর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দার।, আজ আর সময় নেই, শিগ্গির যাও।

মোড়ল। তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথা, ও পাড়ার অষ্টআশি সেদিন মাত্র তিরিশ তনখায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার-দেড়হাজার তো হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সান্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখেই—

সর্দার। আচ্ছা আচ্ছা, সে কথা কাল হবে।

মোড়ল। আমার তো দয়াধর্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলি নে; কিন্তু তাকে খাতাগিথানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কিনা ভেবে দেখবেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়িনক্ষত্র জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

সর্দার। আজই ডাকাব, তুমি যাও।

মোড়ল। প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়োই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধুমাতা নিজের হাতে তৈরি ছাঁচিকুমড়োর—

সর্দার। আচ্ছা, পরশু আসতে বোলো, দেখা মিলবে।

। মোড়লের প্রস্থান

মেজো সর্দারের প্রবেশ

মেজো সর্দার। নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দার। আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দার। এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

সর্দার। রাজা কি—

মেজো সর্দার। রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। দশজনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে—কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করি নে।

সর্দার। রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ঐ মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দার। না না, এ-সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনো রকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

সর্দার। কেনারাম গোসাঁই কি জানে রঞ্জনের কথা।

মেজো সর্দার। আন্দাজে সবই জানে, পস্ট জানতে চায় না।

সর্দার। কেন।

মেজো সর্দার। পাছে ‘জানি নে’ এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দার। হলই বা।

মেজো সর্দার। বুঝছ না? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা। কিন্তু ওর যে এক পিঠে গোসাঁই, আর-এক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারিধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা হলে নামজপের বেলায় খুব বেশি বাধে না।

সর্দার। নামজপটা নাহয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দার। কিন্তু এদিকে যে ওর মনটা ধর্মভীরু, রক্তটা যাই হোক। তাই স্পষ্টভাবে

নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারি করতে পারলে ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাত না।

সর্দার। মেজো সর্দার, তোমারও দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয় নি।

মেজো সর্দার। রক্ত শূন্যকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে আশা আছে। কিন্তু আজও তোমার ঐ তিনশো-একশকে সহিতে পারি নে। যাকে দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে, তাকে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ বলে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শূন্য বোধ হয় না।—ঐ যে নন্দিনী আসছে।

সর্দার। চলে এসো, মেজো সর্দার।

মেজো সর্দার। কেন। ভয় কিসের।

সর্দার। তোমাকে বিশ্বাস করি নে; আমি জানি, তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দার। কিন্তু তুমি জান না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রক্তের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছূ যেন মিশেছে, তাতেই রক্তমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার। তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান]

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোখুঁলি রাঙা হয়ে উঠল। ঐ কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে। (জানালায় ঘা দিয়ে) শোনো, শোনো, শোনো। দিনরাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। ঠেলছ কাকে।

নন্দিনী। তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোঁসাই। হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন তখন তার ছোটো মুখে বড়ো কথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী। তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই। এসো আমার ঠাকুরঘরে, তোমাকে নাম শোনাই গে।

নন্দিনী। শূন্য নাম নিয়ে করব কী।

গোঁসাই। মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী। শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোঁসাই। দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশি?

নন্দিনী। তোমাদের ঐ ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনো দিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে। যাও যাও, যাও। মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যাবসা তোমার।

[গোঁসাইয়ের প্রস্থান]

ফাগদুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগদুলাল। বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়। সত্য করে বলো।

নন্দিনী। তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা। রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস। তুই ওদের চর।

নন্দিনী। কোন্ মুখে এমন কথা বলতে পারলে।

চন্দ্রা। নইলে এখানে তোর কী কাজ। কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস।

ফাগদুলাল। এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। মনে মনে তোমাকে—সে কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকছে যে।

নন্দিনী। হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত, সে কথা নিজেই বললে।

চন্দ্রা। তবে কেন আনলি ওকে ভুলিয়ে। সর্বনাশী!

নন্দিনী। ও যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা। ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে।

নন্দিনী। আমি তো ওর সব কথা বুঝতে পারি নে, চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি। ফাগদুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে মানুষ, আমি তাকে বাঁচাব কী করে।

চন্দ্রা। ও-সব কথা বুঝি নে। ওকে ফাঁসিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ঐ সুন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে।

ফাগদুলাল। চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে। কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব।

নন্দিনী। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগদুলাল। কী করতে যাবে।

নন্দিনী। ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা। ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ, মায়াবিনী। আর কাজ নেই।

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। সবার আগে ঐ ডাইনীকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা। মারবে? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে, সেই রূপটা দাও ঘুঁচিয়ে। খুরপো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়ায়, তেমনি করে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল। তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগদুলাল। খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তা হলে—

নন্দিনী। ফাগদুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করি নে। কী করতে পারে করুক কাপুরুষ।

গোকুল। ফাগদুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি! সদাঁরকেই তুমি শত্রু বলে জান! তা হোক, যে শত্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী। সদাঁরকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যেরকম। যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

ফাগদুলাল। গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে।

[ফাগদুলাল, চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান]

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা।

প্রথম। ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।

নন্দিনী। রজনকে দেখেছ?

দ্বিতীয়। তাকে পাঁচ দিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখি নি। ঐ ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয়তো বলতে পারবে।

নন্দিনী। ওরা কারা।

তৃতীয়। ওরা সর্দারের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে।

[এই দলের প্রস্থান]

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো লাল-টুপিরা, রজনকে তোমরা দেখেছ?

প্রথম। সেদিন রাতে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী। এখন কোথায় আছে সে?

দ্বিতীয়। ঐ যে সর্দারনীদেব ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

[এই দলের প্রস্থান]

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, রজনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জান।

প্রথম। চুপ চুপ।

নন্দিনী। তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বলতেই হবে।

দ্বিতীয়। আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মদ্য দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিপ্তে আছি। ঐ যে অশ্বের ভার নিয়ে আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো।

[এই দলের প্রস্থান]

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, একটু থামো, বলে যাও রজন কোথায়।

প্রথম। শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা শূরুটা জানি, শেষটা জানি নে।

[প্রস্থান]

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে। আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী। অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা!

নেপথ্যে। কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী। বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে। আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখনি যাও।

নন্দিনী। আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে। রজনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। পূজায় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। দেবতার সময়ের অভাব নেই, পূজার জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

নেপথ্যে। আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী। বৃকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে। নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী। আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে। ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বার উদ্ঘাটন) ও কী! ঐ কে প'ড়ে! রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

রাজা। কী বললে। রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী। হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

রাজা। ও কেন বললে না ওর নাম। কেন এমন স্পর্ধা করে এল।

নন্দিনী। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন।

রাজা। ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জান, ওকে জাগিয়ে দাও।

রাজা। আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুঁচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী। তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সহিতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে।

রাজা। আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী। ও কি আমার নাম বলে নি।

রাজা। এমন করে বলেছিল, সে আমি সহিতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

নন্দিনী। (রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিণয়ে দিলুম তোমার চুড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরূ হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।—আহা, এই যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরী। তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল। রাজা, কোথায় সেই বালক।

রাজা। কোন্ বালক।

নন্দিনী। যে বালক এই ফুলের মঞ্জরী রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা। সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ভূত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী। তার পরে? কী হল তার। বলো কী হল। বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না।

রাজা। বৃদ্ধবৃদ্ধের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী। রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা। কিসের সময়।

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মৃহদেতেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তার পর থেকে মৃহদেতে মৃহদেতে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা। তা হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন।

নন্দিনী। কোথায় যাব?

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বৃদ্ধিতে পারছ না?

সেই লড়াই শুরুর হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মৃত্তি।

দলের লোক। মহারাজ, এ কী কান্ড। এ কী উন্মত্ততা। ধ্বজা ভাঙলেন! আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিন্ধ করেছে, সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পূজার দিনে কী মহাপাতক! চল, সর্দারদের খবর দিই গে।

[প্রস্থান]

রাজা। এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী। যাব আমি।

ফাগদুলালের প্রবেশ

ফাগদুলাল। বিশুদ্ধে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে। এই বুঝি রাজা? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! বিশ্বাসঘাতিনী!

রাজা। কী হয়েছে তোমাদের। কী করতে বেরিয়েছ।

ফাগদুলাল। বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা। ফিরবে কেন। ভাঙার পথে আমিও চলছি। ঐ তার প্রথম চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগদুলাল। নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছি নে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ে না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী। ফাগদুলাল, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছুই বাকি রাখলে না।

ফাগদুলাল। নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী। আমি তো সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগদুলাল, আমি চেয়েছিলুম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ঐ দেখো, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে।

ফাগদুলাল। সর্বনাশ! ঐ কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নন্দিনী। নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শব্দেতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মরতে পারে না!

ফাগদুলাল। হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে।

নন্দিনী। ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে।—চন্দ্রা কোথায়, ফাগদুলাল।

ফাগদুলাল। সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাঁটি করতে। সর্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস।—কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো? আমরা তোমারই বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা। হাঁ, আমারই বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগদুলাল। সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা। তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগদুলাল। সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা। একলা লড়াই, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগদুলাল। জিততে পারবে?

রাজা। মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।

ফাগদুলাল। রাজা, শুনতে পাচ্ছ গজর্ন?

রাজা। ঐ যে দেখাছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগুর্গির কী করে সম্ভব হল। আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারি নি। ঠিকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

ফাগদুলাল। আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা। সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী। মনে ছিল, বিশু পাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না।

রাজা। উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি।

ফাগদুলাল। তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

নন্দিনী। একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে? ফাগদুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে। সর্দার, সর্দার!—দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুর্লিয়েছে। ঐ মালাকে আমার বৃকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।—সর্দার! আমাকে দেখতে পেয়েছে। জয় রঞ্জনের জয়!

[দ্রুত প্রস্থান

রাজা। নন্দিনী।

[প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগদুলাল। কোথায় ছুটেছ, অধ্যাপক।

অধ্যাপক। কে যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে—পৃথিবী ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

ফাগদুলাল। রাজা তো ঐ গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনছে।

অধ্যাপক। তার জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায়।

ফাগদুলাল। সে গেছে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক। এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব।

[প্রস্থান

বিশু প্রবেশ

বিশু। ফাগদুলাল, নন্দিনী কোথায়।

ফাগদুলাল। তুমি কী করে এলে।

বিশু। আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়।

ফাগদুলাল। সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু। কোথায়।

ফাগদুলাল। শেষ মর্জিতে।—বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শূয়ে আছে?

বিশু। ও যে রঞ্জন!

ফাগদুলাল। ধূলায় দেখছ ঐ রক্তের রেখা?

বিশু। বৃঝেছি, ঐ তাদের পরম মিলনের রক্তরাখী। এবার আমার সময় এল একলা মহা-যাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে। আমার পাগলি! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল।

ফাগদুলাল। নন্দিনীর জয়।

বিশু। নন্দিনীর জয়।

ହାତୁମାନ

ଓ ମାୟାବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅସିଥିଲୁ।

ସିନ୍ଧୁ

କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନାହିଁ! ନାହିଁ!

ହାତୁମାନ

ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ।

ସିନ୍ଧୁ

କିଏ ଆମ ଗିରି କେଉଁ ହାତୁମାନ!

ହାତୁମାନ

ସିନ୍ଧୁ ଗିରି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣୁ।

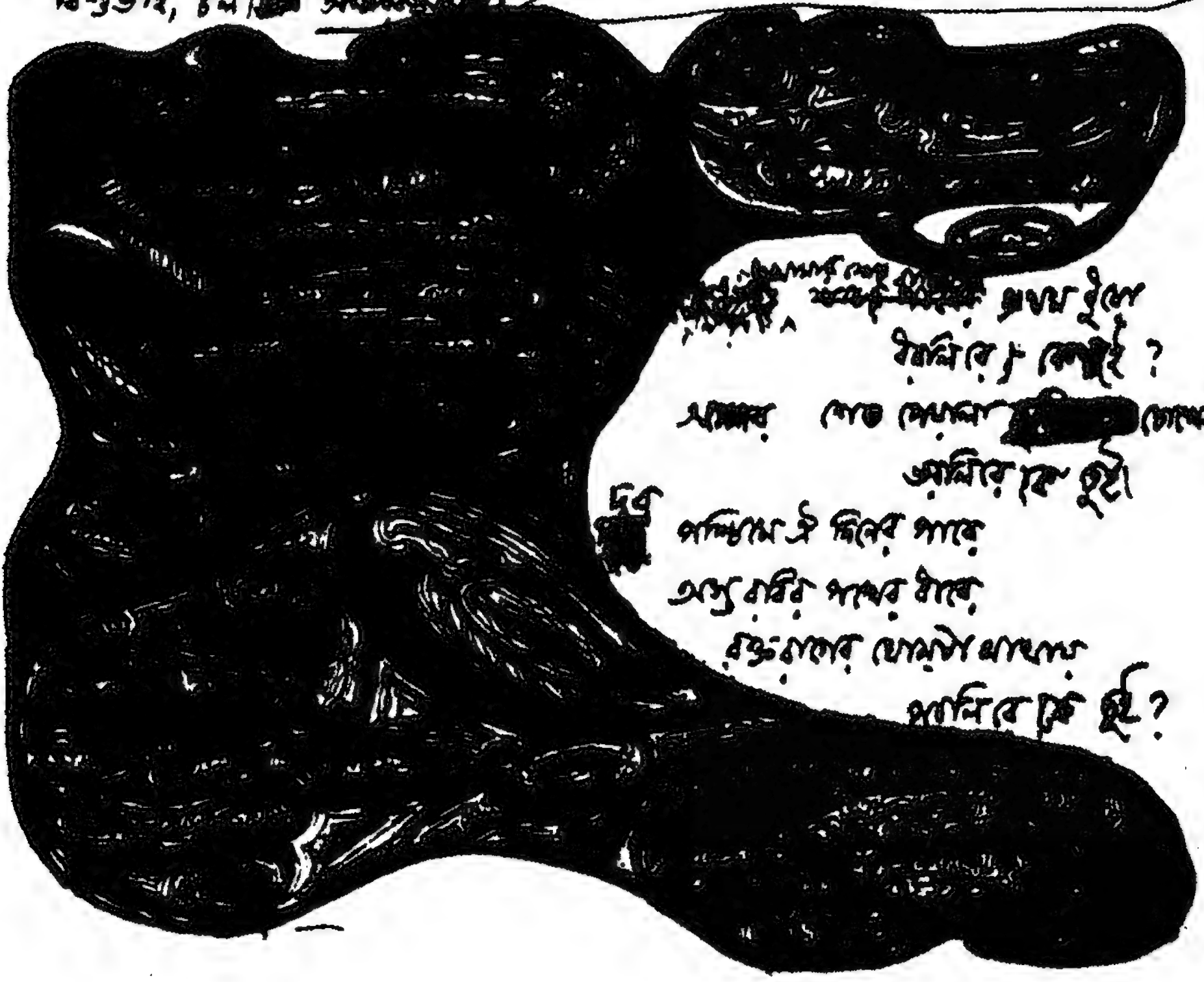
ସିନ୍ଧୁ

କିଲେ ଜାଣିଲୁ?

ମୁଁ ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ।

ସିନ୍ଧୁ

କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ।



କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ନାହିଁ।

ফাগদুলাল। আর, ঐ দেখো, ধূলায় লুটছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন
থসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্ব। তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান।

[প্রস্থান]

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,

আয় আয় আয়।

ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,

মরি হয় হয় হয়।

ନବୀନ

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୭୨

অভিনয়পত্ৰীৰূপে প্ৰথম প্ৰকাশ (চৈত্ৰ ১৩৩৭)। বনবাণী-গ্ৰন্থভুক্তিকালে পাঠেৰ পৰিবৰ্তন ঘটে। প্ৰথমে 'বনবাণী'ৰ পাঠ এবং পৰিশিষ্টে অভিনয়-পত্ৰীৰ পাঠ মন্দ্ৰিত হল। 'নবীন' গ্ৰন্থে বা অন্য গ্ৰন্থে যে-সব গান স্থান পেয়েছে তাৰ প্ৰথম ছত্ৰ উল্লিখিত; 'হৃদয় আমাৰ ওই বদৰি তোৰ বৈশাখী ঝড় আসে' গানেৰ পাঠান্তৰ এবং নবৰচিত 'বেদনা কী ভাষায় রে' গানটি সম্পূৰ্ণ মন্দ্ৰিত হল।

প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনপ্রান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আশ্রয়ে,
সরোবরতীরে, নদীতীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।

নগরে গ্রামে কাননে,
দিনে নিশীথে,
পিকসংগীতে নৃত্যগীতকলনে
বিশ্ব আনন্দিত—

ভবনে ভবনে

বীণাতান রণ-রণ ঝংকৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে।

শব্দনেছ অলিমাল্লা, ওরা ধিক্কার দিচ্ছে ঐ ও পাড়ার মল্লের দল; তোমাদের চাপল্য তাদের ভালো লাগছে না। শৈবালগুচ্ছবিলম্বী ভারী ভারী সব কালো কালো পাথরগুলোর মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা গুহাম্বারে ভ্রুকুটি পূজিত করে বসে আছে। কলহাস্যচণ্ডলা নিষ্করীণী ওদের নিষেধ লঙ্ঘন করেই বেরিয়ে পড়ুক এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে; চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গের অঞ্জলিবিক্ষেপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের অনুপ্রেরণা আছে সেটা ও পাড়ার শাস্ত্রবচনের বেড়া এড়িয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা, যে রসরাজের নিমন্ত্রণে এসেছ তাঁর প্রসন্নতা যেমন আজ নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে ঐ অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে, তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্মনটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁরই চরণে তোমাদের নৃত্যের নৈবেদ্য আজ নিষ্করিত করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা—
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা
উষার শুকতারা
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা।

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।

কোলাহলের বেগে
ঘর্নি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা।

—

তুমি সুন্দর যৌবনঘন,
রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয়পরিপূর্তি।
নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ
মরণহীন চিরনবীন
তব মহিমাম্বুদীপ্তি।

ও দিকে আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে, উৎসবে নতুন কিছুর চাই। কোণা-কাটা ত্যাড়াবাকা দুম্-দাম্-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হলে তাদের শূকনো মেজাজে জোর পেঁচছে না। কিন্তু, যাঁদের রসবেদনা আছে তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। এঁরা বলেন, মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসংকোচে বারে বারে রঙিন। চিরপুরাতন ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, ‘লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল!’ সেই নিত্যনন্দিত সহজশোভন নবীনের উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান শুরুর করে দাও।

আনু গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে—
এই সুসময় ফুরায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেগুনের শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে।

প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মোঁমাছিয়া ধ্বনি উড়ায় বাতাস-পরে।
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় ‘জাগো জাগো’,
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্তরঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে।

আজ বরবর্ণিনী অশোকমঞ্জরী তার চেলাগুল-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে রক্তরঙের কিঙ্কণীঝংকার বিকীর্ণ করে দিলে; কুঞ্জবনের শিরীষবীথিকায় আজ সৌরভের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য। ললিতিকা, আমরাও তো শূন্য হাতে আসি নি। মাধুর্যের অতল সমুদ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেছে, আমরাও ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই তরীর রশি খসিয়ে দিয়েছি। যে নাচের তরঙ্গে তারা ভেসে পড়ল সেই নাচের ছন্দটা, কিশোর, দেখিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি-যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ।
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের স্নেহে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান।

পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
তোমার রজনীগন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মৃগচোখের রঙিন স্বপন-মাথা—
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখস্নেহের সকল অবসান।

ভরে দাও, একেবারে ভরে দাও গো, 'পালা ভর ভর লায়ী রে'। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে কেবলই পাওয়া অদ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে কেবলই দেওয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রের দিকপানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও সেই আবৃত্তি, কেননা, গান তো আমরা শুধু কেবল গাই নে, গান-যে আমরা দিই, তাই গান আমরা পাই।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে।
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুন্দের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি বলে।

কমলবরন গগনমাঝে
কমলচরণ ওই বিরাজে।
ওইখানে তোর সুর ভেসে যাক,
নবীন প্রাণের ওই দেশে যাক,
ওই যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে।

মধুরিমা, দেখো দেখো, চন্দ্রমা তিথির পর তিথি পেরিয়ে আজ তার উৎসবের তরণী পূর্ণিমার ঘাটে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শূদ্র সুকুমার পারিজাতস্তবকে তার ডালি ভরে আনল। সেই ডালিখানিকে ঐ কোলে নিয়ে বসে আছে কোন্ মাদুরীর মহাশ্বেতা। রাজহংসের ডানার মতো তার লঘু মেঘের শূদ্র বসনাঙ্গুল প্রস্তুত হয়ে পড়েছে ঐ আকাশে, আর তার বীণার রূপোর তন্তুগর্দিলিতে অলস অঙ্গুলিক্ষেপে থেকে থেকে গুঞ্জরিত হচ্ছে বেহাগের তান।

নিবিড় অমা-তিমির হতে
 বাহির হল জোয়ারস্রোতে
 শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
 ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
 সাজালো ডালা অমরাকূলে
 আলোর মালা চামেলিবরনী
 শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।

তিথির পরে তিথির ঘাটে
 আসিছে তরী দোলের নাটে,
 নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
 উৎসবের পসরা নিয়ে
 পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
 ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী
 শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক প্রান্তে মিলন আর-
 এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের
 মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির
 থেকে অন্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার দ্বার খোলা রেখে দেয়।
 কিন্তু, ঐ-যে হিসাবি মানুষটা দ্বারে শিকল দিয়ে আঁক পাড়ছে তার শিকল-নাড়া দাও তোমরা।
 ঘরের লোককে অন্তত আজ একদিনের মতো ঘরছাড়া করো।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
 লাগল-যে দোল।
 স্থলে জলে বনতলে
 লাগল-যে দোল।
 খোল্ দ্বার খোল্।

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
 রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
 নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
 খোল্ দ্বার খোল্।

বেগুন মর্মরে দখিনবাতাসে,
 প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে—
 মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
 পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা,
 মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
 খোল্ দ্বার খোল্।

আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়,
 আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।
 যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
 ভালোবাসে আড়াল থেকে,
 আমার মন মজেছে সেই গভীরের
 গোপন ভালোবাসায়।

সর্বনাশের রত যাদের তাদের ভয় ভাঙিয়ে দাও। কারো কারো যে দ্বিধা ঘোচে না। ঐ দেখো-না পাতার আড়ালে মাধবী। ঐ অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। শুনছ না বকুলগুলো ঝরতে ঝরতে বলছে 'যা হয় তা হোক গে', আমার মুকুল বলে উঠছে 'কিছু হাতে রাখব না'। যারা কৃপণতা করবে তাদের সময় বয়ে যাবে।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন—আসিবে কি ফিরিবে কি—
 আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।
 বাতাসে লুকায়ে থেকে
 কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
 পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লেখি।

কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
 চমকি উঠিল জাগি চামেলি নহন মেলি।
 বকুল পেয়েছে ছাড়া,
 করবী দিয়েছে সাড়া,
 শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে করে দেখি।

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুদ্রুত রাতে,
 আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে।

নন্দিনী, ঐ দেখে নাও শিশুর লীলা, ঐ-যে কচি কিশলয়—

শ্যামল কোমল চিকন রূপের নবীন শোভা—দেখে যা—
 কল-উতরোল চঞ্চলদোল ওই-যে বোবা।

শিশু হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিঝিকি করছে। সেই তো তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুর্যোটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল।
 ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে
 নবপল্লবদল।
 ছড়ায় ছড়ায় ঝিকিঝিকি আলো

দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো—

মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে

কৈশোরকোলাহল।

ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে

নীরবের কানাকানি,

নীলিমার কোন্ বাণী।

ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার

ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,

চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা

শ্যামশিখা হোমানল।

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম।
পাথককে সে তো অবশেষে এনে পেরিছিয়ে দিলে। কিন্তু, ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে
আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়—তাই মনে হয়, ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে মিলন স্থায়ী হয় না,
পথে বেরিয়ে পড়লে তবেই পাথকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ানো যায়। তাই আজ পথকেই প্রণাম।

মোর পাথকেরে নুঁকি এনেছ এবার

করুণ রঙিন পথ।

এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর

দুয়ারে লেগেছে রথ।

সে-যে সাগরপারের বাণী

মোর পরানে দিয়েছে আনি,

তার আঁখির তারায় যেন গান গায়

অরণ্য পর্বত।

দুঃখসুখের এপারে ওপারে

দোলায় আমার মন,

কেন অকারণ অশ্রুদর্শিলে

ভরে যায় দুনয়ন।

ওগো নিদারুণ পথ, জানি,

জানি, পুন নিয়ে যাবে টানি

তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া

যাবে সে স্বপনবৎ।

বাতাসের চলার পথে যে মুকুল পড়ে ঝরে,

তা নিয়ে তোমার লাগি রেখেছি ডালি ভরে।

টুকরো টুকরো সুখদুঃখের মালা গাঁথব—সাতনরী হার পরাব তোমাকে মাধুর্যের মদন্তোগর্দলি
চুনে নিয়ে। ফাগুনের ভরা সাজির উদ্ভূত থেকে তুলে নেব বনের মর্মর, বাণীর সূত্রে গেঁথে বেঁধে
দেব তোমার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বাসন্তেও সেই আমার দেওয়া ভূষণ পরেই তুমি আসবে।
আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে তোমার দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে
 গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
 দিল তারে বনবীথি
 কোকিলের কলগীতি,
 ভরি দিল বকুলের গন্ধে।

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
 রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
 বাণী মম নিল তুলি
 পলাশের কলিগুলি,
 বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে।

দ্বিতীয় পর্ব

কেন ধরে রাখা, ও-যে যাবে চলে
 মিলনলগন গত হলে।
 স্বপনশেষে নয়ন মেলো,
 নিবু নিবু দীপ নিবাসে ফেলো,
 কী হবে শুকানো ফুলদলে।

এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো শিরীষবনের পদুপাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তবু এই চঞ্চলতার
 অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। বিদায়দিনের প্রথম হাওয়া অশথগাছের পাতায়
 পাতায় ঝর ঝর করে উঠছে। সভার বীণা বদ্বি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারার সুর বাঁধা
 হচ্ছে—মনে হচ্ছে, যেন বসন্তী রঙ ম্লান হয়ে গেরদুয়া রঙে নামল।

চলে যায়, মরি হয়, বসন্তের দিন।
 দূর সাথে পিক ডাকে বিরামবিহীন।
 অধীর সমীরভরে
 উচ্ছ্বাসি বকুল ঝরে,
 গন্ধসনে হল মন সুদূরে বিলীন।

পুলকিত আম্রবীথি ফাগুনেরই তাপে,
 মধুকরগুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
 কেন জানি অকারণে
 সারাবেলা আনমনে
 পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন।

বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আলোকে,
 রাতের কালো আঁধার যেন নামে না ওই চোখে।

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটি মঞ্জুর হল। তার প্রণাম

তুমি নাও। তার আপন গানের বন্ধনেই চিরদিন সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে। তার সুরের রাখী
তুমি গ্রহণ করেছ আমি জানি; তার পরিচয় রইল তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত
শ্যামল শঙ্খবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক—
যায় যদি সে যাক।
রইল তাহার বাণী, রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে—
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্বাক।
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক।

তবে শেষ করে দাও শেষ গান,
তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলো না গো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে।

এর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না। এ দিকে বসন্তের পালা সাঙ্গ হল। স্বরা কর্ গো,
স্বরা কর্—বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এইবেলা রিক্ত হবার আগে অঞ্জলি পূর্ণ করে দে—তার পরে
আছে করুণ ধূলি তার আঁচল বিছিয়ে।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি বন্ধ,
বেঁধেছিল অঞ্জলি।
তখনো কুহেলিজালে
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা
উঠিতেছে ছলছল।

এখনো বনের গান
বন্ধ, হয় নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বঙ্গিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল, এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস বলি।

‘শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে’ বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন আগমনীর

গানে তাল দিয়েছিল, আজ তারা যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সম্ম্যাসীর বেশ পরিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর।'

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র
আমার হিয়াতলে।
ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কী এ!
খেলিলে হোলি ধুলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ে রঙিন করি,
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে।

সে-যে কাছে এসে চলে গেল তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!

মন ছিল সুপ্ত, কিন্তু দ্বার ছিল খোলা, সেইখান দিয়ে কার নিঃশব্দ চরণের আনাগোনা।
জেগে উঠে দেখি ভুইচাপা ফুলের ছিন্ন পাপড়ি লুটিয়ে আছে তার যাওয়ার পথে। আর দেখি,
ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেছে বরণমালা, তার শেষ দান, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণমালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে
অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা।
গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে
বাঁধিল মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা।

হে বনস্পতি শাল, অবসানের অবসাদকে তুমি দূর করে দিলে। তোমার অক্লান্ত মঞ্জরীর মধ্যে
উৎসবের শেষবেলাকার ঐশ্বর্য, নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। অরণ্যভূমির শেষ
আনন্দিত বাণী তুমি শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'। তোমার
আনন্দের সাহস বিচ্ছেদের সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াল।

ক্লান্ত যখন আত্মকলির কাল,
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,

সৌরভধনে তখন তুমি হে শাল,
 বসন্তে কর ধন্য।
 সান্ধনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
 রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য—
 বনসভাতলে সবার উর্ধ্ব তুমি,
 সব অবসানে তোমার দানের পদ্য।

এইবার শেষ দেওয়া-নেওয়া চুকিয়ে দাও। দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, উত্তরীয়ের স্দগন্ধ,
 বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও আমার অন্তরের বেদনা নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও
 মোর প্রাণে গোপনে গো।
 ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
 মর্মরমুখরিত পবনে।
 তুমি কিছু নিয়ে যাও
 বেদনা হতে বেদনে—
 যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন,
 যে বাণী নীরব নয়নে।

দূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে গেল পথিক। এমনি করেই বারে বারে সে কাছের বন্ধন আল্গা
 করে দেয়। একটা অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশে বলে দিয়ে যায় কানে কানে, সাহসের স্দর এসে
 পৌঁছয় বিচ্ছেদসমুদ্রের পরপার থেকে—মন উদাস হয়ে যায়।

বাজে করুণ স্দরে (হায় দূরে)
 তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।
 মম পান্থচিত চণ্ডল
 জানি না কী উদ্দেশে।

যুথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
 ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
 তেমনি চিত্ত উদাসী রে
 নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে।

পরিশিষ্ট

প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী

শূনেছ অলিমালা, ওরা বড়ো ধিক্কার দিচ্ছে, ঐ ও পাড়ার মল্লের দল, উৎসবে তোমাদের চাপল্য ওদের ভালো লাগছে না। শৈবালপূর্ণিত গৃহদ্বারে কালো কালো শিলাখণ্ডের মতো তিমিস্রগহন গাম্ভীৰ্য্যে ওরা নিশ্চল হয়ে দ্রুতকূটি করছে, নির্ঝরিশী ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে কলহাস্যে—চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিকীর্ণ করে দিতে। এই আনন্দ আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের অনুপ্রেরণা আছে, সেটা ওদের শাস্ত্র-বচনের বেড়ার বাইরে দিয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা; যে রসরাজের নিমন্ত্রণে তোমরা এসেছ, তাঁর প্রসন্নতা যেমন নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধ নটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁর চরণে তোমাদের নৃত্যের অর্ঘ্য নিবেদন করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা

একটা ফরমাশ এসেছে বসন্ত-উৎসবে নতুন কিছুর চাই—কিন্তু যাদের রসবেদনা আছে তারা বলছে, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। তারা বলে, মাধবী বছরে বছরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ পুরাতন রঙেই বারে বারে রঙিন। এই চিরপুরাতন ধরণী সেই চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, ‘লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।’ সেই নবীনের উদ্দেশ্যে তোমাদের গান শুরুর করে দাও।

আন গো তোরা কার কী আছে

অশোকবনের রঙমহলে আজ লাল রঙের তানে তানে পঞ্চমরাগে সানাই বাজিয়ে দিলে, কুঞ্জবনের বীথিকায় আজ সৌরভের অব্যাহত দানসর। আমরাও তো শূন্যহাতে আসি নি। দানের জোয়ার যখন লাগে অতল জলে তখন ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাইতরী রশি খুলে দিয়ে ভেসে পড়ে। আমাদের ভরা নৌকো দাঁখন হাওয়ায় পাল তুলে সাগর-মুখো হল, সেই কথাটা কণ্ঠ খুলে জানিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি-যে দান

ভরে দাও একেবারে ভরে দাও, কোথাও কিছুর সংকোচ না থাকে। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া একই কথা। বর্নার এক প্রান্তে পাওয়া রয়েছে অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে দেওয়া রয়েছে অতলস্পর্শ সাগরের দিকে, এর মাঝখানে তো কোনো বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার আবর্তন নিয়ে এই বিশ্ব।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে

মধুরিমা, দেখো দেখো, চাঁদের তরণীতে আজ পূর্ণতা পরিপূর্ণিত। কত দিন ধরে এক তিথি থেকে আর-এক তিথিতে এগিয়ে এগিয়ে আসছে। নন্দনবন থেকে আলোর পারিজাত ভরে নিয়ে এল—কোন মাধুরীর মহাশ্বেতা সেই ডালি কোলে নিয়ে বসে আছে; ক্ষণে ক্ষণে রাজহংসের ডানার মতো তার শূন্য মেঘের বসনপ্রান্ত আকাশে এলিয়ে পড়ছে। আজ ঘুমভাঙা রাতের বাঁশিতে বেহাগের তান লাগল।

নিবিড় অমা-তিমির হতে

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ, আর প্রান্তে মিলন, স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে—জীবন থেকে মরণে, মরণ থেকে জীবনে, অন্তর

থেকে বাহিরে, আবার বাহির থেকে অন্তরে। এই দোলার তালে না মিলিয়ে চললেই রসভঙ্গ হয়। ও পাড়ার ওরা-যে দরজার আগল এঁটে বসেই রইল—হিসেবের খাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে। একবার ওদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দোলের ডাক দাও।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্

কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ-যে ধ্যানস্তিমিতলোচন পুরোহিতের মতো আকাশের বেদীতে বসে উৎসবের মন্ত্র জপ করতে লাগল। ওকে দেখাচ্ছে যেন জ্যোৎস্নাসমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনপুঞ্জের মতো—কিন্তু সে ঢেউ-যে চিত্রাঙ্গিতবৎ স্তম্ভ। এ দিকে আজ বিশ্বের বিচলিত চিত্ত দক্ষিণের হাওয়ায় ভেসে পড়েছে, চণ্ডলের দল মেতেছে বনের শাখায়, পাখির ডানায়—আর ঐ কি একা অবিচলিত হয়ে থাকবে নিবর্তনিস্কম্পমিবপ্রদীপম্? নিজে মাতবে না আর বিশ্বকে মাতাবে, সে কেমন হল? এর একটা যা-হয় জবাব দিয়ে দাও।

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা

আজ সব ভীরুদের ভয় ভাঙানো চাই। ঐ মাধবীর শ্বিধা-যে ঘোচে না। এ দিকে আকাশে আকাশে প্রগল্ভতা অথচ ওরা রইল সসংকোচে ছায়ার আড়ালে। ঐ অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। বোরিয়ে পড়বার হাওয়া বইল যে—বকুলগুলো রাশি রাশি ঝরতে ঝরতে বলছে ‘যা হয় তা হোক গে’, আমার মুকুল নির্ভয়ে বলে উঠছে ‘দিয়ে ফেলব একেবারে শেষ পর্যন্ত’। যে পাখিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই পথে বোরিয়েছে তার কাছে আত্মনিবেদনের থালি উপুড় করে দিয়ে তবে তাকে আনতে পারবে নিজের আঙিনায়। ক্লপণতা করে সময় বইয়ে দিলে তো চলবে না।

হে মাধবী, শ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি

দেখতে দেখতে ভরসা বেড়ে উঠছে, তাকে পাব না তো কী। যখন দেখা দেয় না তখনো যে সাড়া দেয়। যে পথে চলে সেখানে-যে তার চলার রঙ লাগে। যে আড়ালে থাকে তার ফাঁক দিয়ে আসে তার মালার গন্ধ। দুয়ারে অন্ধকার যদি-বা চুপচাপ থাকে, আঙিনায় হাওয়াতে চলে কানাকানি। পড়তে পারি নে সব অক্ষর, কিন্তু চিঠিখানা মনের ঠিকানায় এসে পৌঁছয়। লুকিয়েই ও ধরা দেবে এমনিতরো ওর ভাবখানা।

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া

এইবার বেড়া ভাঙল, দুর্বীর বেগে। অন্ধকারের গুহায় অগোচরে জমে উঠেছিল বন্যার উপক্রমণিকা, হঠাৎ ঝর্না ছুটে বেরোল, পাথর গেল ভেঙে, বাধা গেল ভেসে। চরম যখন আসেন তখন এক-পা এক-পা পথ গুনে গুনে আসেন না। একেবারে বজ্র-শান-দেওয়া বিদ্যুতের মতো, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের বক্ষ এক আঘাতে বিদীর্ণ করে আসেন।

হৃদয় আমার, ওই বৃষ্টি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে,
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।

তোমার মোহন এল মোহন বেশে,

কুয়াশাভার গেল ভেসে,

এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে।

অরণ্যে তোর সুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা।

জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, পুষ্পবিহীন ধরা।

এবার জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে

অবসাদের বাঁধন টুটে,

বৃষ্টি এল তোমার পথের সাথী উতল উচ্ছ্বাসে।

উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছুঁয়েছে, চোখ খুলেছে; এইবার সময় হল চার দিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে ঐ, শিশু হয়ে এসেছে চির নবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা

সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। ঐ তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মর্ম্মরিত হয়ে উঠল প্রাণ-গীতিকার প্রথম ধুর্য্যোট।

ওরা অকারণে চণ্ডল

আবার একবার চেয়ে দেখে—অবজ্ঞায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে, আজ সেই কুয়াশা যদি কেটে যায় তবে যাকে তুচ্ছ বলে দিনে দিনে এড়িয়ে গেছে তাকে দেখে নাও তার আপন ম'হিমায়। ঐ দেখো ঐ বনফুল, মহাপাথিকের পথের ধারে ও ফোটে, তাঁর পায়ের করুণ স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে ওর প্রণতি। সূর্যের আলো ওকে আপন বলে চেনে; দখিন হাওয়া ওকে শূন্যে যায় 'কেমন আছ'। তোমার গানে আজ ওকে গৌরব দিক। এরা যেন কুরুরাজের সভায় শূদ্রার সন্তান বিদুরের মতো, আসন বটে নীচে, কিন্তু সম্মান স্বয়ং ভীষ্মের চেয়ে কম নয়।

আজ দখিন বাতাসে

কাব্যলোকের আদরিণী সহকারমঞ্জরীকে আর চিনিতে দিতে হবে না। সে আপনাকে তো লুকোতে জানে না। আকাশের হৃদয় সে অধিকার করেছে, মৌমাছির দল বন্দনা করে তার কাছ থেকে অজস্র দক্ষিণা নিয়ে যাচ্ছে। সকলের আগেই উৎসবের সদারত ও শূরু করে দিয়েছিল, সকলের শেষ পর্যন্ত ওর আমন্ত্রণ রইল খোলা। কোকিল ওর গুণগান দিনে রাতে আর শেষ করতে পারছে না—তোমরাও তান লাগাও।

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমার মঞ্জরী

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পাথিককে সে তো অবশেষে এনে পেঁপ'ছিয়ে দিলে। তারই সঙ্গে এনে দিলে অসীম সাগরের বাণী। দুর্গম উঠল সেই পাথিকের মধ্যে গান গেয়ে। কিন্তু আনন্দ করতে করতেই চোখে জল আসে-যে। ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়। পাথিককে ঘরে আটক করে না। বাঁধন ছিঁড়ে নিজেও বেরিয়ে না পড়লে ওর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঠেকাবে কি করে। আমার ঘর-যে ওর যাওয়া-আসার পথের মাঝখানে; দেখা দেয় যদি-বা, তার পরেই সে দেখা আবার কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

মোর পাথিকের বৃষ্টি এনেছ এবার করুণ রঙিন পথ

তবু ওকে ক্ষণকালের বাঁধন পরিয়ে দিতে হবে। টুকরো টুকরো সুখের হার গাঁথব—পরাব ওকে মাধুর্যের মন্তোগুলি। ফাগুনের ভরা সাজি থেকে যা-কিছু ঝরে ঝরে পড়ছে কুড়িয়ে নেব, বনের মর্ম্মর, বকুলের গন্ধ, পলাশের রক্তমা—আমার বাণীর সূত্রে সব গেঁথে বেঁধে দেব তার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার-দেওয়া ভূষণ পরেই সে আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি, আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে ওর দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে

দ্বিতীয় পর্ব

বেদনা কী ভাষায় রে

মর্মে মর্ম্মর গুঞ্জরি বাজে।

সে বেদনা সমীরে সমীরে সগুণে,

চণ্ডল বেগে বিশ্ব দিল দোলা।

দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে

তব নন্দনবন-অগ্ন-দ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,

আকুল প্রাণে

পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে।

বিদায়দিনের প্রথম হাওয়াটা এবার উৎসবের মধ্যে নিঃশ্বাসিত হয়ে উঠল। এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো বকুলবনের সম্বল অজস্র, এখনো আশ্রমগুরুর নিমন্ত্রণে মৌমাছিদের আনাগোনা, কিন্তু তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। সভার বীণা বৃষ্টি নীরব হবে, পথের একতরায় এবার সুর বাঁধা হচ্ছে। দূর দিগন্তের নীলিমায় দেখা যায় অশ্রুর আভাস—অবসানের গোধূলিছায়া নামছে।

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটির দিন এল। তার প্রণাম তুমি নাও। যে গানগূলি এতদিন গ্রহণ করেছে সেই তার আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে—তোমার উৎসবলীলায় সে চিরদিন রয়ে গেল তোমার সাথের সাথী। তোমাকে সে তার সুরের রাখী পরিয়েছে—তার চিরপরিচয় তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শম্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

ওর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না বৃষ্টি, এ দিকে বসন্তের পালা তো সাঙ্গ হয়ে এল। ওর মল্লিকাবনে এখনি তো পাপড়িগূলি সব পড়বে ঝরে—তখন বাণী পাবে কোথায়। দ্বরা কর্ গো, দ্বরা কর্। বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে তোর শেষ অঞ্জলি পূর্ণ করে দে; তার পরে আছে করুণ ধূলি, তার আঁচলে সব ঝরা ফুলের বিরাম।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি

সুন্দরের বীণার তারে কোমল গান্ধারে মীড় লেগেছে। আকাশের দীর্ঘনিশ্বাস বনে বনে হায় হায় করে উঠল, পাতা পড়ছে ঝরে ঝরে। বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগূলি একদিন শাখায় শাখায় আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, তারাই আজ যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ধ্যাসীর বেশ পরিয়ে দিলে; বললে, তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর হোক।

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে

মন থাকে সুপ্ত, তখনো দ্বার থাকে খোলা, সেইখান দিয়ে কার আনাগোনা হয়; উত্তরীর গন্ধ আসে ঘরের মধ্যে, ভুঁইচাপা ফুলের ছিন্ন পাপড়িগূলি লুটিয়ে থাকে তার যাওয়ার পথে; তার বীণা থেকে বসন্তবাহারের রেশটুকু কুড়িয়ে নেয় মধুকরগুঞ্জরিত দক্ষিণের হাওয়া; কিন্তু জানতে পাই নে, সে এসেছিল। জেগে উঠে দেখি তার আকাশপারের মালা সে পরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন দিলে পরায়ে

বনবন্ধুর যাবার সময় হল, কিন্তু হে বনস্পতি শাল, অবসানের দিন থেকে তুমি অবসাদ ঘুচিয়ে দিলে। উৎসবের শেষ বেলাকে তোমার অক্লান্ত গুঞ্জরী ঐশ্বর্বে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। সেই ধ্বনি আজ আকাশকে পূর্ণ করল, বিষাদের ম্লানতা দূর করে দিলে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমিই শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'। তোমার আনন্দের সাহস কণ্ঠের বিচ্ছেদের সমুখে দাঁড়িয়ে।

ক্লান্ত যখন আশ্রমকলির কাল

দূরের ডাক এসেছে। পথিক, তোমাকে ফেরাবে কে। তোমার আসা আর তোমার যাওয়াকে আজ এক করে দেখাও। যে পথ তোমাকে নিয়ে আসে সেই পথই তোমাকে নিয়ে যায়, আবার সেই পথই ফিরিয়ে আনে। হে চিরনবীন, এই বীথিকম পথেই চিরদিন তোমার রথযাত্রা; যখন পিছন ফিরে চলে যাও সেই চলে যাওয়ার ভিজিটি আবার এসে মেলে সামনের দিকে ফিরে আসায়—শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই নে, হায় হায় করি।

এখন আমার সময় হল

বিদায়বেলার অঞ্জলি যা শূন্য করে দেয় তা পূর্ণ হয় কোন্‌খানে সেই কথাটা শোনা যাক।

এ বেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে

আসন্ন বিরহের ভিতর দিয়ে শেষ বারের মতো দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাক। তুমি দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, তোমার উত্তরীয়ার সুগন্ধ, তোমার বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও এই অন্তরের বেদনা আমার নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছ্‌র দিয়ে যাও

খেলা-শুরুও খেলা, খেলা-ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভ হল বাঁধন, খেলার শেষে হল বাঁধন খোলা। মরণে বাঁচনে হাতে হাতে ধরে এই খেলার নাচন। এই খেলায় পুরোপুরি যোগ দাও—শুরুর সঙ্গে শেষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি করে চলে যাও।

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়

পাখি চলে গেল সুদূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে। এমনি করে কাছের বন্ধনকে বারে বারে সে আলাদা করে দেয়। একটা কোন্‌ অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ্য বৃকের ভিতর রেখে দিয়ে যায়—জানলায় বসে দেখতে পাই, তার পথ মিলিয়ে গেছে বনরাজিনীলা দিগন্তরেখার ওপারে। বিচ্ছেদের ডাক শুনতে পাই কোন্‌ নীলিম কুহেলিকার প্রান্ত থেকে—উদাস হয়ে যায় মন—কিন্তু সেই বিচ্ছেদের বাঁশিতে মিলনেরই সুর তো বাজে করুণ সাহানায়।

বাজে করুণ সুরে, (হায় দূরে)

এই খেলা-ভাঙার খেলা বীরের খেলা। শেষ পর্যন্ত যে ভগ্ন দিল না তারই জয়। বাঁধন ছিঁড়ে যে চলে যেতে পারল, পাখির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পথে, তারই জন্য জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার টুকরো কুড়োতে গেল যে কৃপণ তার খেলা পুরো হল না—খেলা তাকে মৃষ্টি দিল না, খেলা তাকে বেঁধে রাখলে। এবার তবে ধুলোর সপ্তয় চুকিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে বেরিয়ে পড়ো।

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা

এবার প্রলয়ের মধ্যে পূর্ণ হোক লীলা, শমে এসে সব তান মিলুক, শান্তি হোক, মৃষ্টি হোক।

ওরে পাখি, ওরে প্রেমিক

কালের যাত্রা

প্রকাশ : ১৯৩২

‘কালের যাত্রা’ (১৯৩২) শিরোনাম গ্রন্থের অন্তর্গত ‘রথের রশি’ ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত ‘রথযাত্রা’ নাট্যকার পরিবর্তিত ও আগাগোড়া-পুনর্লিখিত রূপ। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-রচিত কোনো রচনার ভাব অবলম্বনে লিখিত ‘রথযাত্রা’ বর্তমান সংস্করণে পরিশিষ্টভুক্ত। ‘কবির দীক্ষা’র পূর্বপাঠ ‘শিবের ভিক্ষা’ নামে ‘মাসিক বসুমতী’ (বৈশাখ ১৩৩৫) পত্রিকায় প্রকাশিত।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
৫৭ বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে
কবির সন্মেল উপহার

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

রথের রশি

রথযাত্রার মেলায় মেয়েরা

প্রথমা

এবার কী হল ভাই!
উঠেছি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকে নি।
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দূটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল—
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

দ্বিতীয়া

চারি দিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে,
ছম্‌ছম্‌ করছে গা।

তৃতীয়া

দোকানি-পসারিরা চুপচাপ বসে,
কেনাবেচা বন্ধ। রাস্তার ধারে ধারে
লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে
কখন আসবে রথ। যেন আশা ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথমা

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ—
বেরবেন ব্রাহ্মণঠাকুর শিষ্য নিয়ে—
বেরবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত—
পাণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে।
কোলের ছেলে নিয়ে মেয়েরা বেরবে,
ছেলেদের হবে প্রথম শ্রুভযাত্রা—
কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে।

দ্বিতীয়া

ঐ দেখ, পুরুতঠাকুর বিড়্‌ বিড়্‌ করছে ওখানে।
মহাকালের পাণ্ডা বসে মাথায় হাত দিয়ে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

প্রথমা

এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর!
উৎসবে এসেছি মহাকালের মন্দিরে—
আজ রথযাত্রার দিন।

সন্ন্যাসী

দেখতে পাচ্ছ না—আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিথের মতো।
ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।
বন্ধরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না—লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র,
তার প্রসাদধারা শুষ্ক নিচ্ছে মরুভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল।

তৃতীয়া

হাঁ ঠাকুর, তাই তো দেখি।

সন্ন্যাসী

তোমরা কেবলই করেছে ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিস্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ যে, পথের বৃক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দাঁড়িটা।

প্রথমা

তাই তো, বাপ রে, গা শিউরে ওঠে—
এ যে অজগর সাপ, খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে আর নড়ে না।

সন্ন্যাসী

ঐ তো রথের দড়ি, যত চলে না ততই জড়ায়।
যখন চলে, দেয় মর্শ্চি।

দ্বিতীয়া

বুঝেছি আমাদের পূজো নেবেন বলে
হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা।
পূজো পেলেই হবেন তুষ্ট।

প্রথমা

ও ভাই, পূজো তো আনি নি। ভুল হয়েছে।

তৃতীয়া

পূজোর কথা তো ছিল না—
ভেবেছিলাম রথের মেলায় কেবল বেচব কিনব,
বাজি দেখব জাদুকরের,
আর দেখব বাঁদর-নাচ।
চল্-না শিগগির, এখনো সময় আছে,
আনি গে পূজো।

[সকলের প্রস্থান

নাগরিকদের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক

দেখ্ দেখ্ রে, রথের দড়িটা কেমন করে পড়ে আছে।
ষড়্গষড়্গান্তরের দড়ি, দেশদেশান্তরের হাত পড়েছে ঐ দড়িতে,

আজ অনড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে
সর্বাঙ্গ কালো করে।

দ্বিতীয় নাগরিক

ভয় লাগছে রে। সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া।
মনে হচ্ছে ওটা এখনি ধরবে ফণা, মারবে ছোবল।

তৃতীয় নাগরিক

একটু একটু নড়ছে যেন রে। আঁকুবাঁকু করছে বৃষ্টি।

প্রথম নাগরিক

বলিস্ নে অমন কথা। মৃখে আনতে নেই।
ও যদি আপনি নড়ে তা হলে কি আর রক্ষে আছে।

তৃতীয় নাগরিক

তা হলে ওর নাড়া খেয়ে সংসারের সব জোড়গুলো
বিজোড় হয়ে পড়বে। আমরা যদি না চালাই—
ও যদি আপনি চলে, তা হলে পড়বে যে চাকার তলায়।

প্রথম নাগরিক

ঐ দেখ্ ভাই, পদ্রুতের গেছে মৃখ শূন্যকিয়ে,
কোণে বসে বসে পড়ছে মন্তর।

দ্বিতীয় নাগরিক

সোদিন নেই রে
যোদিন পদ্রুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।

তৃতীয় নাগরিক

তবু আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে—
কিন্তু একেবারেই উলটো দিকে, পিছনের পথে।

প্রথম নাগরিক

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ।
সেই পথ থেকে দূরে এসেই তো কালের মাথার ঠিক থাকছে না।

দ্বিতীয় নাগরিক

মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠলি দেখি। এত কথা শিখলি কোথা।

প্রথম নাগরিক

ঐ পণ্ডিতেরই কাছে। তাঁরা বলেন—
মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।
নইলে তিনি পিছন হটতে হটতে একেবারে পেঁছতেন
অনাদি কালের অতল গহ্বরে।

তৃতীয় নাগরিক

ঐ রশিটার দিকে চাইতে ভয় করে।
ওটা যেন যুগান্তের নাড়ী—
সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্দব্দ করছে।

সম্মাসীর প্রবেশ

সম্মাসী

সর্বনাশ এল।

গুরুগুরু শব্দ মাটির নীচে।

ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।

গুহার মধ্য থেকে আগুন লক্লক্ মেলছে রসনা।

পূর্বে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ।

প্রলয়দীপ্তির আঙুটি পরেছে দিক্‌চক্রবাল।

। প্রস্থান

প্রথম নাগরিক

দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ।

ধরুক-না এসে দাড়িটা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এক-একটি পুণ্যাত্মাকে খুঁজে বের করতেই

এক-এক যুগ যায় বয়ে—

ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

তৃতীয় নাগরিক

পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক

সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই।

তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়।

পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে,

আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গলে গুহায়।

প্রথম নাগরিক

দাড়িটার রঙ যেন এল নীল হয়ে।

সামলে কথা কোস।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—

রথ না চললে কিছুই চলবে না।

চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।

এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি,

তার বউটা শূন্যে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।

প্রথম নাগরিক

মেয়েমানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।

কালের রথযাত্রায় কোনো হাত নেই তোমাদের।

কুটনো কোটো গে ঘরে।

দ্বিতীয়া

কেন, পুজো দিতে তো পারি।

আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা।

গড় করি তোমায় দাড়ি-নারায়ণ! প্রসন্ন হও।
 এনেছি তোমার ভোগ। ওলো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি,
 ঢাল্ দধি, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়,
 টেলে দে-না জল। পশুগব্য রাখ্ ঐখানে,
 জ্বালা পশুপ্রদীপ। বাবা দাড়ি-নারায়ণ,
 এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে
 মাথা মর্দিয়ে চুল দেব ফেলে।

তৃতীয়া

এক মাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শুদ্ধ রুটি।
 বলো-না ভাই, সবাই মিলে—জয় দাড়ি-নারায়ণের জয়।

প্রথম নাগরিক

কোথাকার মূর্খ তোরা—
 দে মহাকালনাথের জয়ধ্বনি।

প্রথমা

কোথায় তোমাদের মহাকালনাথ। দেখি নে তো চক্ষু।
 দাড়ি-প্রভুকে দেখিছি প্রত্যক্ষ—
 হনুমান-প্রভুর লঙ্কা-পোড়ানো লেজখানার মতো—
 কী মোটা, কী কালো, আহা দেখে চক্ষু সার্থক হল।
 মরণকালে ঐ দাড়ি-ধোয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায়।

দ্বিতীয়া

গালিয়ে নেব আমার হার, আমার বাজুবন্দ,
 দাড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে।

তৃতীয়া

আহা, কী সুন্দর রূপ গো!

প্রথমা

যেন যমুনানদীর ধারা।

দ্বিতীয়া

যেন নাগকন্যার বেণী।

তৃতীয়া

যেন গণেশঠাকুরের শৃঙ্গ চলেছে লম্বা হয়ে,
 দেখে জল আসে চোখে।

সম্মাসীর প্রবেশ

প্রথমা

দাড়ি-ঠাকুরের পূজো এনেছি ঠাকুর।
 কিন্তু পূরত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সম্মাসী

কী হবে মন্তরে।
 কালের পথ হয়েছে দুর্গম।

কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তৃতীয়া

বাবা, সাতজন্মে শূনি নি এমন কথা।
‘চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেছে নিচু মাথা হেঁট করে।
উঁচু-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সন্ন্যাসী

দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠছে বেড়ে।
হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিংকছে না।
ভেঙে পড়ল বলে।

[প্রস্থান

প্রথমা

চল্ ভাই, তবে পূজো দিই গে রাস্তা-ঠাকুরকে।
আর গর্ত-প্রভুকেও তো সিন্ধি দিয়ে করতে হবে খুঁশি,
কী জানি গুঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন,
আছেন দু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর।
নমো নমো দাড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর,
ঘরে আছে ছেলেপুলে।

[মেয়েদের প্রস্থান

সৈন্যদলের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

ওরে বাস্ রে। দাড়িটা পড়ে আছে পথের মাঝখানে—
যেন একজটা ডাকিনীর জটা।

দ্বিতীয় সৈনিক

মাথা দিল হেঁট করে।
স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।
একটু ক্যাঁচকোঁচও করলে না চাকাটা।

তৃতীয় সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয়, তাই।
ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।
চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে।
চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা—যাদের নাম করতে নেই।

প্রথম নাগরিক

শোনো ভাই, আমার কথা।
কালের অপমান করেছি আমরা, তাই ঘটেছে এ-সব অনাসুর্দেহ।

তৃতীয় সৈনিক

এ মানুষটা আবার বলে কী।

প্রথম নাগরিক

দ্রোণদ্রুপে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান—
চাইলে তপস্যা করতে, এত বড়ো আত্মপরিচয়—

সেদিনও অকাল লাগল দেশে, অচল হল রথ।
দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা,
তবে তো হল আপদ শান্তি।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেই শত্রুরা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল,
হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।

তৃতীয় নাগরিক

মানুষ নই! বটে! কতই শুনব কালে কালে।
কোনদিন বলবে, ঢুকব দেবালয়ে।
বলবে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নাইব এক ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে।
চললে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রথম সৈনিক

আজ শত্রু পড়ে শাস্ত্র,
কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ!

দ্বিতীয় সৈনিক

চল-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি—
ওরাই মানুষ না আমরা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এ দিকে আবার কোন্ বুদ্ধিমান বলেছে রাজাকে---
কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শাস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে।

প্রথম সৈনিক

রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।

দ্বিতীয় সৈনিক

দাদা, রাগ কর মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা।
এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার।
তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে
ঠিক জায়গায় বাজে না বৃকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সত্যি। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

এই যে সন্ন্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

সম্যাসী

তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।
 যেখানে যত তীর ছুঁড়েছ, বিধেছে ওর গায়ে।
 ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলাগা হয়েছে বাঁধনের জোর।
 'তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
 বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
 সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে।

[প্রস্থান

ধনপতির অনুচরবর্গের প্রবেশ

প্রথম ধনিক

এটা কী গো, এখনি হুঁচট খেয়ে পড়েছিলুম।

দ্বিতীয় ধনিক

ওটাই তো রথের দড়ি।

চতুর্থ ধনিক

বীভৎস হয়ে উঠেছে, যেন বাসুঁকি ম'রে উঠল ফুলে।

প্রথম সৈনিক

কে এরা সব।

দ্বিতীয় সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিৎড়েগুলো
 লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।

প্রথম নাগরিক

ধনপতি শেঠির দল এরা।

প্রথম ধনিক

আমাদের শেঠাজিকে ডেকেছেন রাজা।
 সবাই আশা করছে, তাঁর হাতেই চলবে রথ।

দ্বিতীয় সৈনিক

সবাই কলতে বোঝায় কাকে বাপু?
 আর তারা আশাই বা করে কিসের।

দ্বিতীয় ধনিক

তারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছু
 সব ধনপতির হাতেই চলছে।

প্রথম সৈনিক

সত্যি নাকি! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক

তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।

প্রথম সৈনিক

চুপ, দুর্বির্নীত!

দ্বিতীয় ধনিক

চুপ করব আমরা বটে।

আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক

মনে ভাবছ, আমাদের শতঘণ্টা ভুলেছে তার বজ্রনাদ।

দ্বিতীয় ধনিক

ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম

ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আর-এক হাটে সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

ওদের সঙ্গে পারবে না তর্কে।

প্রথম সৈনিক

কী বল পারব না!

সব চেয়ে বড়ো তর্কটা বন্-বন্ করছে খাপের মধ্যে।

প্রথম নাগরিক

তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক,

কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘৃষ।

প্রথম ধনিক

শুনলেম, নর্মদাতীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল

দাঁড়িতে হাত লাগাবার জন্যে। জান খবর?

দ্বিতীয় ধনিক

জানি বৈকি।

রাজার চর পৌঁছল গৃহস্থ,

তখন প্রভু আছেন চিত হয়ে বৃকে দুই পা আটকে।

তুরী ভেরী দামামা জগবম্পের চোটে ধ্যান যদি বা ভাঙল,

পা-দুখানা তখন আড়ষ্ট কাঠ।

নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কী দাদা!

পংখ্যটি বছরের মধ্যে একবারও নাম করে নি চলাফেরার।

বাবাজি বললেন কী।

দ্বিতীয় ধনিক

কথা কওয়ার বালাই নেই।

জিভটার চাঞ্চল্যে রাগ করে গোড়াতেই সেটা ফেলেছেন কেটে।

ধনিক

তার পরে?

দ্বিতীয় ধনিক

তার পরে দশ জোয়ানে মিলে আনলে তাঁকে রথতলায়।

দাঁড়িতে যেমনি তাঁর হাত পড়া,

রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নীচে।

ধনিক

নিজের মনটা যেমন ডুবিয়েছেন রথটাকেও তেমনি তলিয়ে দেবার চেষ্টা।

দ্বিতীয় ধনিক

একদিন উপবাসেই মানুষের পা চায় না চলতে—
পয়ষটি বছরের উপবাসের ভার পড়ল চাকার 'পরে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি

ডাক পড়ল কেন, মন্ত্রীমশায়?

মন্ত্রী

অর্থপাত হলেই সর্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ করি।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার, আমার দ্বারা তাই সম্ভব।

মন্ত্রী

মহাকালের রথ চলছে না।

ধনপতি

এ পর্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েছি,
রশিতে টান দিই নি।

মন্ত্রী

অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন,
তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

ধনপতি

চেষ্টা করা যাক।
দৈবক্রমে চেষ্টা যদি সফল হয়, অপরাধ নিয়ো না তবে।

দলের লোকের প্রতি

বলো সিদ্ধিরস্তু!

সকলে

সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি

লাগো তবে ভাগ্যবানেরা। টান দেও।

ধনিক

রশি তুলতেই পারি নে। বিষম ভারী।

ধনপতি

এসো কোষাধ্যক্ষ, ধরো তুমি কষে।
বলো সিদ্ধিরস্তু! টানো, সিদ্ধিরস্তু!
টানো, সিদ্ধিরস্তু!

দ্বিতীয় ধনিক

মন্ত্রীমশায়, রশিটা যেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,
আর আমাদের হাতে হল যেন পক্ষাঘাত।

সকলে

দুয়ো দুয়ো!

সৈনিক

যাক, আমাদের মান রক্ষা হল।

পুরুহিত

আমাদের ধর্মরক্ষা হল।

সৈনিক

যদি থাকত সেকাল, আজ তোমার মাথা যেত কাটা।

ধনপতি

ঐ সোজা কাজটাই জান তোমরা।

মাথা খাটাতে পার না, কাটতেই পার মাথা।

মন্ত্রীমশায়, ভাবছ কী।

মন্ত্রী

ভাবছি, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল—

এখন উপায় কী।

ধনপতি

এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।

তার নিজের ডাক যেখানে পৌঁছবে

সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে।

আজ যারা চোখে পড়ে না

কাল তারা দেখা দেবে সব চেয়ে বেশি।

ওহে খাতাণ্ড, এই বেলা সামলাও গে খাতাপত্র—

কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান]

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

হাঁ গা, রথ চলল না এখনো, দেশসুন্দর রইল উপোস করে!

কলিকালে ভিক্ষু নেই যে।

মন্ত্রী

তোমাদের ভিক্ষুর অভাব কী বাছা,

দেখি-না তার জোর কত।

প্রথমা

নমো নমো,

নমো নমো বাবা দড়ি-ঠাকুর, অন্ত পাই নে তোমার দয়ার।

নমো নমো!

দ্বিতীয়া

তিনকড়ির মা বললে, সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে—

ঠিক দুস্কুর বেলা, বোম ভোলানাথ ব'লে

তালপুরুরে—ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—

এক ডুবে তিন গোছা পাট-শিয়াল তুলে
 ভিজ়ে চুল দিয়ে বেঁধে দাড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে
 প্রভুর টনক নড়বে। জোগাড় করেছি অনেক যত্নে,
 সময়ও হয়েছে পোড়াবার।
 আগে দাড়ি-বাবার গায়ে সিঁদুর-চন্দন লাগা;
 ভয় কিসের, ভক্তবৎসল তিনি—
 মনে মনে শ্রীগুরুর নাম করে গায়ে হাত ঠেকালে
 অপরাধ নেবেন না তিনি।

প্রথমা

তুই দে-না ভাই চন্দন লাগিয়ে, আমাকে বলিস কেন।
 আমার দেওরপো পেট-রোগা,
 কী জানি কিসের থেকে কী হয়।

তৃতীয়া

ঐ তো ধোঁয়া পার্কিয়ে পার্কিয়ে উঠছে।
 কিন্তু জাগলেন না তো।
 দয়াময়!
 জয় প্রভু, জয় দাড়ি-দয়াল প্রভু, মুখ তুলে চাও।
 তোমাকে দেব পরিণে প'য়তাল্লিশ ভরির সোনার আংটি-
 গড়াতে দিয়েছি বেণী স্যাকরার কাছে।

দ্বিতীয়া

তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা।
 ওলো বিনি, পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর্-না—
 দেখছিস্ নে রোদ্দুরে তেতে উঠেছে ঔর মেঘবরন গা।
 ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে।
 ঐখানকার কাদাটা দে তো ভাই আমার কপালে মাখিয়ে।
 এই তো আমাদের খেঁদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ।
 বেলা হয়ে গেল, আহা, কত কষ্ট পেলেন প্রভু!
 জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর,
 গড় করি তোমায়, টলুক তোমার মন।
 মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
 পাখা কর্ লো; পাখা কর্, জোরে জোরে।

প্রথমা

কী হবে গো, কী হবে আমাদের—
 দয়া হল না যে! আমার তিন ছেলে বিদেশে,
 তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

চরের প্রবেশ

মন্ত্রী

বাছারা, এখানে তোমাদের কাজ হল—
 এখন ঘরে গিয়ে জপতপ স্বতনয়ন করো গে।
 আমাদের কাজ আমরা করি।

প্রথমা

যাচ্ছি, কিন্তু দেখো মন্ত্রীবাবা,
ঐ ধোঁয়াটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে—
আর ঐ বিল্বপত্রটা যেন পড়ে না যায়।

[মেয়েদের প্রস্থান]

চর

মন্ত্রীমশায়, গোল বেধেছে শূদ্রপাড়ায়।

মন্ত্রী

কী হল।

চর

দলে দলে ওরা আসছে ছুটে— বলছে, রথ চালাব আমরা।

সকলে

বলে কী! রশি ছুঁতেই পাবে না।

চর

ঠেকাবে কে তাদের। মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে।
মন্ত্রীমশায়, বসে পড়লে যে।

মন্ত্রী

দল বেঁধে আসছে বলে ভয় করি নে—
ভয় হচ্ছে পারবে ওরা।

সৈনিক

বল কী মন্ত্রীমহারাজ, শিলা জলে ভাসবে?

মন্ত্রী

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়,
বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

সৈনিক

আদেশ করুন কী করতে হবে, ভয় করি নে আমরা।

মন্ত্রী

ভয় করতেই হবে, তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর

এখন কী আদেশ বলুন।

মন্ত্রী

বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

চর

ঐ যে এসে পড়েছে ওরা।

মন্ত্রী

কিছু কোরো না তোমরা, থাকো স্থির হয়ে।

শূদ্রদের প্রবেশ

দলপতি

আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মন্ত্রী

তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসছ চিরদিন।

দলপতি

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।
এবার সেই বলি তো নিল না বাবা।

মন্ত্রী

তাই তো দেখলেম।

সকাল থেকে চাকার সামনে ধুলোয় করলে লুটোপুটি—
ভয়ে উপরে তাকালে না, পাছে ঠাকুরের দিকে চোখ পড়ে—
তবু তো চাকার মধ্যে একটুও দেখা গেল না ক্ষুধার লক্ষণ।

একেই বলে অগ্নিমান্দ্য,
তেজ ক্ষয় হলেই ঘটে এই দশা।

দলপতি

এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত

রশি ধরতে! ভারি বুদ্ধি তোমাদের। জানলে কী করে।

দলপতি

কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।
ভোরবেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছিড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—
ডাক দিয়েছেন বাবা।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত

বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি

সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর?

পুরোহিত

স্পর্ধা দেখো একবার। কথার জবাব দিতে শিখেছে—
জাগল বলে ব্রহ্মশাপ।

দলপতি

মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।

মন্ত্রী

সে কী কথা। সংসার বলতে তো তোমরাই।

নিজগুণেই চল, তাই রক্ষে।

চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি।

আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ—

আমরাই বৃদ্ধি বন্দ, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক

সর্বনাশ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা—

তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক।

আজ ধরেছে উলটো বৃদ্ধি, এ তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী

সৈনিকের প্রতি

চুপ করো।

সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,

তোমরা নারায়ণের গরুড়।

এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।

তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয় রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচ।

মন্ত্রী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চলো।

বরাবর যে রাস্তায় রথ চলেছে যেয়ো সেই রাস্তা ধরে।

পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে।

রথে আছেন যিনি তিনিই সামলাবেন।

আয় ভাই, দেখছি রথচুড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে।

বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই। ঐ চেয়ে দেখ্ রে ভাই,

মরা নদীতে যেমন বান আসে

দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পেঁপেছে।

পুরুষোত্তম

ছুঁলো, ছুঁলো দেখছি, ছুঁলো শেষে, রশি ছুঁলো পাখণ্ডেরা।

মেয়েদের ছুঁটিয়া প্রবেশ

সকলে

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, দোহাই বাবা—

ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কোরো না।

পৃথিবী যাবে যে রসাতলে।
আমাদের স্বামী ভাই বোন ছেলে
কাউকে পারব না বাঁচাতে।
চল্ রে চল্, দেখলেও পাপ আছে।

[প্রস্থান

পরোহিত

চোখ বোজো, চোখ বোজো তোমরা।
ভস্ম হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে।

সৈনিক

এ কি, এ কি, চাকার শব্দ নাকি—
না আকাশটা উঠল আত্নাদ করে?

পরোহিত

হতেই পারে না— কিছুতেই হতে পারে না—
কোনো শাস্ত্রেই লেখে না।

নাগরিক

নড়েছে রে, নড়েছে, ঐ তো চলেছে।

সৈনিক

কী ধুলোই উড়ল— পৃথিবী নিশ্বাস ছাড়ছে।
অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ শেষে চলল যে—
পাপ, মহাপাপ!

শূদ্রদল

জয় জয়, মহাকালনাথের জয়!

পরোহিত

তাই তো, এও দেখতে হল চোখে!

সৈনিক

ঠাকুর, তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ-চলা।
বৃদ্ধ হয়েছেন মহাকাল, তাঁর বৃদ্ধিভ্রংশ হল—
দেখলেম সেটা স্বচক্ষে।

পরোহিত

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো রঞ্জুলাল।
আসছে বারে ঠুকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ঔর দেহ শোধন করতে গঙ্গা যাবে শূন্যকিয়ে।

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না।
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে,
ঢালব ওদের রক্ত।

নাগরিক

মন্ত্রীমশায়, যাও কোথায় ?

মন্ত্রী

যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।

সৈনিক

ছি ছি, ওদের হাতে হাত মেলাবে তুমি!

মন্ত্রী

ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।

স্পর্শটাই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।

এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদেরই সঙ্গে সমান হয়ে।

সৈনিক

তাই বলে ওদেরই এক সারে রশি ধরা!

ঠেকাবই আমরা, রথ চলুক আর নাই চলুক।

মন্ত্রী

এবার দেখছি চাকার তলায় পড়বার পালা তোমাদেরই।

সৈনিক

সেও ভালো। অনেক কাল চন্দালের রক্ত শুষে চাকা আছে অশ্রুটি,

এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল করুক।

পূরোহিত

কী হল মন্ত্রী, এ কোন্ শনিগ্রহের ভেলকি ?

রথটা যে এরই মধ্যে নেমে পড়েছে রাজপথে।

পৃথিবী তবু তো নেমে গেল না রসাতলে।

মাতাল রথ কোথায় পড়ে কোন্ পল্লীর ঘাড়ে, কে জানে।

সৈনিক

ঐ দেখো, ধনপতির দল আতর্নাদ করে ডাকছে আমাদের।

রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ভান্ডারের মুখে।

যাই ওদের রক্ষা করতে।

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষার কথা ভাবো।

দেখছ না, ঝুঁকেছে তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে।

সৈনিক

উপায় ?

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গে মিলে ধরো-সে রশি।

বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—

দো-মনা করবার সময় নেই।

সৈনিক

কী করবে ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরুহিত

বীরগণ, তোমরা কী করবে বলো আগে।

সৈনিক

কী করতে হবে বলো-না ভাইসকল!

সবাই যে একেবারে চুপ করে গেছে!

রশি ধরব না লড়াই করব?

ঠাকুর, তুমি কী করবে বলোই-না।

পুরুহিত

কী জানি, রশি ধরব না শাস্ত্র আওড়াব।

সৈনিক

গেল, গেল সব। রথের এমন হাঁক শুনি নি কোনো পুরুষে।

দ্বিতীয় সৈনিক

চেয়ে দেখো-না, ওরাই কি টানছে রথ

না রথটা আপনিই চলেছে ওদের ঠেলে নিয়ে।

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপ্নে—

আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত দড়িবাঁধা গোরুর মতো।

আজ চলছে জেগে উঠে। বাপ রে, কী তেজ।

মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—

একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।

পিঠের উপর চড়ে বসেছে যম।

দ্বিতীয় সৈনিক

ঐ যে আসছে কবি, ওকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী।

পুরুহিত

পাগলের মতো কথা বলছ তোমরা।

আমরাই বুঝলেম না মানে, বুঝবে কবি?

ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা—শাস্ত্র জানে কী?

কবির প্রবেশ

দ্বিতীয় সৈনিক

এ কী উলটোপালটা ব্যাপার কবি।

পুরুষের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না—

মানে বুঝলে কিছ?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,

মহাকালের রথের চড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—

নীচের দিকে নামল না চোখ,

রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।

মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।

রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরুষোত্তম

তোমার শত্রুগুলোই কি এত বদ্বিশ্বাস—
ওরাই কি দাঁড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয়তো।

একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শত্রু করবে চেষ্টাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরুষোত্তম

তখন যদি রথ আর-একবার অচল হয়
বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুষোত্তম!
রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে,
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পেঁছতে।

পুরুষোত্তম

রথ তারা জানাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

পায়ের জোরে নয়, হৃদয়ের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে গানুয় সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার একপাশে বাকা;
কুন্ডলকর্ণের মতো গড়ন যার কেমোনান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার গুজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে,
ও দিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,

যা টিংকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক

তুমি কী করবে কবি!

কবি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল?

কবি

যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।

পা যখন হয় বেতালো

তখন খুদে খুদে খালখন্দগুলো মারমর্তি ধরে।

মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

এ হল কী ঠাকুর!

তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে!

দেবতা মানলে না পূজো, ভক্তি হল মিছে।

মানলে কিনা শব্দদ্বরের টান, মেলেছে ছোঁয়া!

ছি ছি, কী ঘেন্না।

কবি

পূজো তোমরা দিলে কোথায়।

দ্বিতীয়া

এই তো এইখানেই।

ঘি ঢেলেছি, দুধ ঢেলেছি, ঢেলেছি গঙ্গাজল—

রাস্তা এখনো কাদা হয়ে আছে!

পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পূজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি।

রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।

সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।

সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

তৃতীয়া

আর ওরা—যাদের নাম করতে নেই?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—

নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,

ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,

সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।

সম্মান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

প্রথমা

তার পরে হবে কী।

কবি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন

আসবে উলটোরথের পালা।

তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।

এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—

রথের দড়িটাকে নাও বন্ধে তুলে, ধুলোয় ফেলো না ;

রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।

আজকের মতো বলো সবাই মিলে—

যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে ;

যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

জয়— মহাকালনাথের জয় !

কবির দীক্ষা

আমি তো ভরতি হয়েছিলাম তোমার দলেই।

দৌড় দিলে কেন।

ভয়ে।

ভয় কিসের।

ভবভয়নিবারিণী সভার সভাপতি—

আহা, পরম ধার্মিক—

বললেন আমাকে, ঐ লক্ষ্মীছাড়াটা—

থামলে কেন।

আমি জানি বলেছেন,

লক্ষ্মীছাড়াটা দিচ্ছে তোমাকে রসাতলে।

একেবারে ঐ শব্দটাই—

রসাতলে।

অন্যায় তো বলেন নি।

বলো কী কবি!

জীবন আমার যার সাধনায় মগ্ন

সেই দেবতা তুলিয়ে আছেন অতলে—

খুড়ো-জ্যাঠারা বলেছেন সবাই—

তোমার দীক্ষায় না আছে অর্থের আশা,

না আছে পরমার্থের।

পণ্ডিত মানুষ তোমার খুড়ো-জ্যাঠারা,

বলেন ঠিক কথাই।

সর্বনাশ তো তবে।

সত্য কথাটি বেরল মুখে—

সর্বনাশ, ঐটের থেকেই সর্বলাভ—

সর্বনেশেই মন কেড়েছে কবির।

বুঝলেম কথাটা।
মিলছে তত্ত্বানন্দস্বামী'র সঙ্গে।
শিবমন্ত্র দেন তিনি প্রলয়সাধনায়।

শিবমন্ত্র দিই আমিও।

অবাক করলে—
তুমি তো জানি কবি,
কবে হলে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বল বেঠিক কথা।
তোমরা তো মেতে আছ নাচে গানে।

জগৎজোড়া নাচগানেরই পালা আমাদের প্রভুর।
কী বলেন তত্ত্বানন্দস্বামী।

প্রলয় ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে।
তত্ত্বানন্দস্বামী'র নাচ!
শূন্যে গম্ভীর গণেশ
বৃংহিতধনি করবেন অটুহাস্যে।
ত্যাগের দীক্ষা নিয়োছি তাঁর কাছে।

যদি পরামর্শ দেন সবই ফণ্ডকে দিতে
তবে কী করবে ত্যাগ।
উপদ্রুত করবে শূন্য ঘড়াটাকে?

তুমি কাকে বল ত্যাগ কবি!

ত্যাগের রূপ দেখো ঐ ঝর্নায়ে,
নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান।
নিজেকে যে শূন্যকিয়েছে যদি সেই হল ত্যাগী,
তবে সব-আগে শিব ত্যাগ করুন অন্নপূর্ণাকে।

কিন্তু সন্ন্যাসী শিব ভিক্ষুক, সেটা তো মানো।
মহত্ব দিলেন তিনি জগতের দরিদ্রকে।

দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে।
মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়—
আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।

ভরব কেমন করে তাঁর অসীম ভিক্ষার ঝড়লি।

তিনি না চাইলে খুঁজেই পেতেম না দেবার ধন।

বুঝলেম না কথাটা।

কিছু তিনি চান নি কুকুর-বেড়ালের কাছে।

‘অন্ন চাই’ বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে।

বেরল মানুষ লাঙল কাঁধে—

যে মাটি ফাঁকা ছিল, প্রকাশ পেল তাতে অন্ন।

বললেন ‘চাই কাপড়’।

হাত পেতেই রইলেন—

বেরল ফলের থেকে তুলো,

তুলোর থেকে সূতো,

সূতোর থেকে কাপড়।

ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝড়লি অসীম।

তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের।

নইলে দিন কাটত কুকুর-বেড়ালের মতো।

তোমরা কি বলো সব চেয়ে বড়ো সম্রাসী ঐ কুকুর-বেড়াল।

তত্ত্বানন্দস্বামী কী বলেন।

তিনি বলেন, শিবের ভিক্ষার ঝড়লির টানে আমরা হব নিষ্কিণ।

যার কিছু নেই দেবার, তার নেই দেনা।

সংসারের নালিশ একেবারে বন্ধ তার নামে।

মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি,

তবে ভিক্ষু দেবতার ব্যাবসা হবে যে অচল।

তাঁর ভিক্ষের ঝড়লির টানে মানুষ হয় ধনী—

যদি দান করতেন ঘটত সর্বনাশ।

তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, মিথ্যে নয় পুরাণের কথাটা।

ভিক্ষুক শিবের বরেই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা।

কিন্তু আগুন কেন লাগে সে লঙ্কায়।

সে যে করলে ভিক্ষে বন্ধ। লাগল জমাতে।

দিতে যেমনি পারলে না, যেমনি লাগল কাড়তে,

অমনি ঘটল সর্বনাশ।

ভিক্ষু দেবতা দ্বারে বসে হাঁকেন, দেহি দেহি।

তবু আমরা কোণে বসে আছি নেংটি প’রে, দেবো কিই বা!

কেউ বা লোভে পড়ে ভাঙতে চায় না জমানো ধন।

তবে কি মুরোপখণ্ডকে বলবে শিবের চেলা।

বলতে হয় বৈকি।
 নইলে এত উন্নতি কেন।
 মেনেছে ওরা মহাভিক্ষুর দাবি।
 তাই বের করে আনছে নব নব সম্পদ—
 ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।

অশান্তিও তো কম দেখাছি নে ওদের মধ্যে।

যখন শিবের ভোগ ভেঙে নিজের দিকে চুরি করে
 উৎপাত বাধে তখন অশিবের।
 ত্যাগের ধনে মানুষ ধনী, চুরির ধনে নয়।
 আমরা কুণ্ডে, ভিক্ষুক দেবতাকে দিই নে কিছুর।
 তাই মরিছি সব দিকেই—
 খেতে ফসল যায় মরে,
 পুকুরে জল যায় শুকিয়ে,
 দেহে ধরে রোগ, মনে ধরে অবসাদ,
 বিদেশী রাজা দেয় দুই কান মলে।
 শিবের ঝুলি ভরব যেদিন, সেদিন আমাদের সব ভরবে।

কিন্তু গোড়ায় বলছিলে যে রসের কথাটা
 শিবের ঝুলিতে তো তার খবর মেলে না।

মেলে বৈকি। গাছের ত্যাগ ফল দিয়ে।
 ফল ফলে না রস না হলে।
 প্রাণের ধনই হল আনন্দ, যাকে বলি রস।
 যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু।

শ্মশানে কেন দেখি তোমার ঐ দেবতাকে।

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবেন বলে।
 যে দেবতারা অমরাবতীতে
 শ্বন্দ্বই নেই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে।
 মানুষের যিনি শিব
 তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে।
 ‘ভিক্ষা দাও’ ‘ভিক্ষা দাও’ দ্বারে দ্বারে রব উঠল তাঁর কণ্ঠে—
 সে মর্দুভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
 নিষ্করীণীর স্রোত যখন হয় অলস
 তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান।
 দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
 দেবতার তৃতীয় নেয়ে আগুন ওঠে জ্বলে।

পরিশিষ্ট

রথযাত্রা

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।

১ নাগরিক। মহাকালের রথযাত্রায় এবার যে রথ অচল হয়ে রইল। কিছতেই নড়লেন না। কার দোষে হল তা জানি, গণৎকার গুনে বলে দিয়েছেন।

২ নাগরিক। হয়তো কারো দোষ নেই, হয়তো মহাকাল ক্রান্ত, আর চলতে রাজি নন।

১ নাগরিক। আরে বল কী। চলতে রাজি না হলে আমাদের চলবে কী করে। ঐ দেখো-না, রথের দাঁড়িটা পড়ে আছে, কত যুগের দাঁড়ি—কত মানুষের হাত পড়েছে ঐ দাঁড়িতে, এমন করে তো কোনোদিন ধুলোয় পড়ে থাকে নি।

৩ নাগরিক। রথ যদি না চলে, আর ঐ দাঁড়ি যদি পড়ে থাকে, তা হলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গলায় দাঁড়ি হবে।

৪ নাগরিক। বাবা রে, ঐ দাঁড়িটা দেখে ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে ও যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হয়ে ফণা ধরে উঠবে।

৩ নাগরিক। দেখ-না ভাই, একটু একটু যেন নড়ছে মনে হচ্ছে।

১ নাগরিক। আমরা যদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে ওঠে, তা হলে যে সর্বনাশ হবে।

৩ নাগরিক। তা হলে জগতের সব জোড়গুলো বিজোড় হয়ে উঠবে রে। তা হলে রথটা চলবে আমাদের বুকের পাঁজরের উপর দিয়ে। আমরা ওকে নিজে চালাই বলেই তো ওর চাকার তলায় পড়ি নে। এখন উপায়?

১ নাগরিক। ঐ দেখ-না, পুরুতঠাকুর বসে মন্ত্র পড়ছে।

২ নাগরিক। রথযাত্রায় সব আগেই ঐ পুরুতঠাকুরের দলরাই তো দাঁড়ি ধরে প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধু মন্ত্র পড়েই কাজ সারবেন নাকি।

৪ নাগরিক। চেষ্টার দ্রুটি হয় নি। ভোরের বেলা সেই অন্ধকার থাকতে সবার আগে ওঁরাই তো একচোট টানাটানি করে নিয়েছেন। কলিযুগে ওঁদের কি আর তেজ আছে রে।

৩ নাগরিক। ঐ দেখ, আমার কেমন মনে হচ্ছে ঐ রশিটা যেন যুগ-যুগান্তরের নাড়ীর মতো দব্দব্দ করছে।

১ নাগরিক। আমার মনে হচ্ছে ঐ রথ চলবে কোনো এক পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের স্পর্শ পেলে।

২ নাগরিক। আরে, রথ চালাতে পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্যে বসে থাকলে শূভলগ্নও তো বসে থাকবে না। ততক্ষণ আমাদের মতো পাপাত্মাদের দশা হবে কী।

১ নাগরিক। পাপাত্মাদের দশা কী হবে সেজন্য ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

২ নাগরিক। বলিস কী রে। পুণ্যাত্মাদের জন্যে এ জগৎ তৈরি হয় নি। তা হলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। সৃষ্টিটা আমাদেরই জন্যে। দৈবাৎ দুটো-একটা পুণ্যাত্মা দেখা দেয়, বেশিক্ষণ টিকতে পারে না—আমাদের ঠেলা খেয়ে বনে জঙ্গলে গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়।

১ নাগরিক। তা হলে তুমিই দড়াটা ধরে টান দাও-না দাদা—দেখা যাক রথ এগোয় না দড়াটা ছেঁড়ে, না তুমিই পড় মুখ খুবড়ে।

২ নাগরিক। দাদা, আমাদের সঙ্গে পুণ্যাত্মাদের তফাতটা এই যে, গুণ্ণতিতে তারা একটা-দুটো, আমরা অনেক। যদি ভরসা করে সেই অনেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চলবেই। মিলতে পারলেম না বলে টানতে পারলেম না, পুণ্যাত্মাদের জন্যে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেম।

৪ নাগরিক। ওরে ভাই, দাঁড়িটা মনে হল যেন নড়ে উঠল, কথাবার্তা সামলে বলিস রে।

১ নাগরিক। শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মমুহুর্তে রথের প্রথম টানটা পুরোহিতের হাতে, দ্বিতীয়

প্রহরে দ্বিতীয় টানটা রাজার—সেও তো হয়ে গেল, রথ এগোল না—এখন তৃতীয় টানটা কার হাতে পড়বে।

সৈন্যদলের প্রবেশ

১ সৈন্য। বড়ো লজ্জা দিলে রে! স্বয়ং রাজা হাত লাগালে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাজার জনে ধরে টান দিলুম, চাকার একটু ক্যাঁচকোঁচ শব্দও হল না।

২ সৈন্য। আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা তো শূদ্রের মতো গোরু নই—রথ টানা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড়া।

২ সৈনিক। কিংবা রথ ভাঙা। ইচ্ছে করছে কুড়ুলখানা নিয়ে রথটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলি। দেখি মহাকাল কেমন ঠেকাতে পারেন।

১ নাগরিক। দাদা, তোমাদের অস্ত্রের জোরে রথ চলবেও না, রথ ভাঙবেও না। গণৎকার কী গুনে বলেছে তা শোন নি বুঝি?

১ সৈনিক। কী বল্ তো।

১ নাগরিক। দ্বৈতযুগে একবার যে কান্ড ঘটেছিল, এখন তাই ঘটবে।

১ সৈনিক। আরে, দ্বৈতযুগে তো লঙ্কাকান্ড ঘটেছিল।

১ নাগরিক। সে নয়, সে নয়।

২ সৈনিক। কিঙ্কিন্দ্যাকান্ড?

১ নাগরিক। তারই কাছাকাছি। সেই-যে শূদ্র তপস্যা করতে গিয়েছিল, মহাকাল তাতেই তো সেদিন খেপে উঠেছিলেন। তার পর রামচন্দ্র শূদ্রের মাথা কেটে তবে বাবাকে শান্ত করেছিলেন।

৩ সৈনিক। আজ তো সে ভয় নেই, আজ ব্রাহ্মণই তপস্যা ছেড়ে দিয়েছে, শূদ্রের তো কথাই নেই।

১ নাগরিক। এখনকার শূদ্রেরা কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করেছে। ধরা পড়লে বলে, আমরা কি মানুষ নই। স্বয়ং কলিযুগ শূদ্রের কানে মন্ত্র দিতে বসেছে যে তারা মানুষ। রথ যে চলে না তাতে মহাকালের দোষ কী—না চললেই ভালো। যদি চলতে শুরুর করে তা হলে চন্দ্রসূর্য গুঁড়িয়ে ফেলবে। শূদ্র চোখ রাঙিয়ে বলে কিনা ‘আমরা কি মানুষ নই’! কালে কালে কতই শুনব!

১ সৈনিক। আজ শূদ্র পড়ছে শাস্ত্র, কাল ব্রাহ্মণ ধরবে লাঙল! সর্বনাশ!

২ সৈনিক। তা হলে চল্, ওদের পাড়ায় গিয়ে একবার কষে হাত চালানো যাক। ওরা মানুষ না আমরা মানুষ, প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিই।

২ নাগরিক। রাজাকে কে গিয়ে বলেছে, কলিযুগে শাস্ত্রও চলে না, অস্ত্রও চলে না, একমাত্র চলে স্বর্ণমুদ্রা। রাজা তাই আমাদের ধনপতি শেঠজিকে তলব করেছেন। ধনপতি টান দিলেই রথ চলবে এই রকম সকলের বিশ্বাস।

১ সৈনিক। বেনের টানে যদি রথ চলে তা হলে আমরা অস্ত্র গলায় বেঁধে জলে ডুবে মরব।

২ সৈনিক। তা, রাগ করলে চলবে কেন। বেনের টান আজকাল সব জায়গাতেই লেগেছে। এমন-কি, পদ্মপথনুর ছিলোটা বেনের টানেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার তীরগুলো বেনের ঘরেই তৈরি।

৩ সৈনিক। তা সত্যি, আজকাল আমাদের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, কিন্তু পিছনে থাকে বেনে।

১ সৈনিক। পিছনেই থাকে তো থাক্-না—আমরা তো থাকি ডাইনে-বাঁয়ে, মান তো আমাদেরই।

৩ সৈনিক। পাশে যে থাকে তার মান থাকতে পারে, কিন্তু পিছনে যে থাকে ঠেলাটা যে তারই।

ধনপতির অনুচরদের প্রবেশ

১ সৈনিক। এরা সব কে।

২ সৈনিক। আংটির হাীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো চোখের উপর লাফ দিয়ে পড়ছে।

৩ সৈনিক। গলায় সোনার হার নয়তো, সোনার শিকল বললেই হয়। কে এরা।

১ নাগরিক। এরাই তো আমাদের ধনপতি শেঠীর দল। ঐ সোনার শিকল দিয়ে এরা মহাকালকে বেঁধে ফেলেছে বলেই তাঁর রথ চলছে না।

১ সৈনিক। তোমরা কী করতে এসেছ।

১ ধনিক। রাজা আমাদের প্রভু ধনপতিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কারো হাতে রথ চলছে না, তাঁর হাতে চলবে বলেই সবাই আশা করে আছে।

২ সৈনিক। সবাই বলতে কে রে বাপু? আর আশাই বা করে কেন।

২ ধনিক। আজকাল যা-কিছু চলছে সবই যে ধনপতির হাতে চলছে।

১ সৈনিক। এখনই দেখিয়ে দিতে পারি তলোয়ার তার হাতে চলে না, আমাদের হাতে চলে।

৩ ধনিক। তোমাদের হাত চালাচ্ছে কে সেটা বুঝি এখনো খবর পাও নি।

১ সৈনিক। চুপ বেয়াদব!

২ ধনিক। আমরা চুপ করব? আজ আমাদেরই আওয়াজ জলে স্থলে আকাশে তা জান?

১ সৈনিক। তোমাদের আওয়াজ? আমাদের শতঘণ্টা যখন বজ্রনাদ করে ওঠে—

২ ধনিক। তোমাদের শতঘণ্টা বজ্রনাদে আমাদেরই কথা এক ঘাট থেকে আর-এক ঘাটে, এক হাট থেকে আর-এক হাটে ঘোষণা করবার জন্যে আছে।

১ নাগরিক। দাদা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে পেরে উঠবে না।

১ সৈনিক। কী বল? পারব না?

১ নাগরিক। না, তোমাদের কোনো তলোয়ার ওদের নিনক খেয়েছে, কোনোটা বা ওদের ঘুষ খেয়েছে, খাপ থেকে বের করতে গেলেই তা বুঝতে পারবে।

১ ধনিক। শুনিয়েছিলাম রথের দাঁড়িতে হাত দেবার জন্যে নর্মদাতীরের বাবাজিকে আজ আনা হয়েছিল। কী হল খবর জান?

২ ধনিক। জানি বৈকি। যখন এরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল, দেখল, প্রভু পদ্মাসনে দুই পা আটকে চিত হয়ে পড়ে আছেন। সাড়াশব্দ নেই। বহুকষ্টে ধ্যান ভাঙানো হল। কিন্তু পা-দুখানা আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে, চলে না।

১ নাগরিক। শ্রীচরণের দোষ কী। তারা আজ ৬৫ বছরের মধ্যে একবারও চলার নাম করে নি। তা, বাবাজি বললেন কী?

২ ধনিক। বলা-কওয়ার বলাই নেই। চাঞ্চল্যের অপবাদ দিয়ে জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেছেন। গোঁ গোঁ করতে লাগলেন, তার থেকে যার যেরকম খেয়াল সে সেই রকমেরই অর্থ করে নিলে।

১ ধনিক। তার পরে?

২ ধনিক। তার পর ধরাধরি করে বাবাজিকে রথতলা পর্যন্ত আনা গেল। কিন্তু যেমনি দাঁড়ি ধরলেন রথের চাকা মাটির মধ্যে বসে যেতে লাগল।

১ ধনিক। হা, হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে ডুবিয়েছেন, মহাকালের রথটাকে, গুদুধ তেমনি তলিয়ে দিচ্ছিলেন বুঝি?

২ ধনিক। ঠুঁর পয়ষটি বৎসরের উপবাসের ভারে চাকা বসে গেল। একদিনের উপবাসের ধাক্কাতেই আমাদের পা চলতে চায় না।

১ নাগরিক। উপবাসের ভারের কথা বলছ, তোমাদের অহংকারের ভারটা বড়ো কম নয়।

২ নাগরিক। সে ভার আপনাকেই আপনি চূর্ণ করে। দেখব আজ তোমাদের ধনপতির মাথা কেমন হেঁট না হয়।

১ ধনিক। আচ্ছা দেখো। বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় কে। সে তো আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে দেয় তা হলে তাঁর যে চলা না-চলা দুই সমান হয়ে উঠবে। পেট চলা হল সব চলার মূলে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি। মন্ত্রীমশাই, আজ আমাকে ডাক পড়ল কেন।

মন্ত্রী। রাজ্যে যখনই কোনো অনর্থপাত হয় তখনই তো তোমাকেই সর্বাগ্রে ডাক পড়ে।

ধনপতি। অর্থপাতে যার প্রতিকার সম্ভব আমার দ্বারা তার ত্রুটি হয় না। কিন্তু আজকের সংকটটা কী রকমের।

মন্ত্রী। শুনছে বোধ হয়, মহাকালের রথ আজ কারো হাতের টানেই চলছে না।

ধনপতি। শুনছি। কিন্তু মন্ত্রী এ-সব কাজ তো এতদিন—

মন্ত্রী। জানি, এতদিন আমাদের পুরোহিত ঠাকুররাই এ-সব কাজ চালিয়েছেন। কিন্তু তখন যে এরা স্বাধীন সাধনার জোরে নিজে চলতেন, চালাতেও পারতেন। এখন এরা তোমাদেরই দ্বারে অচল হয়ে বাঁধা, এখন এদের হাতে কিছুই চলবে না।

ধনপতি। অন্য অন্য বারে রাজা সেনাপতি রাজপারিষদ সকলেই রথের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনো তো বাধা ঘটে নি। তখন আমরা তো কেবল চাকায় তেল জুগিয়ে এসেছি, রশিতে টান দিই নি তো।

মন্ত্রী। দেখো শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চলছে বাবা মহাকালের রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হয়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন তাঁরা রশি ধরতে না-ধরতে রথটা ঘুমভাঙা সিংহের মতো ধড়ফড় করে নড়ে উঠত। এবারে যে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বল, শাস্ত্রই বল, সমস্ত অর্থহীন হয়ে পড়েছে—অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই তোমার সার্থক হাতটি আজ রথের রশিতে লাগাতে হবে।

ধনপতি। আগে বরঞ্চ আমার দলের লোকে চেষ্টা করে দেখুক, যদি একটুখানি কেঁপেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে সকল লোকের সামনে—

মন্ত্রী। কেন আর দেরি করা শেঠজি। রাজ্যের সমস্ত লোক উপোস করে আছে, রথ মন্দিরে গিয়ে না পেঁছলে কেউ জলগ্রহণ করবে না। তোমার চেষ্টাতেও যদি রথ না চলে লজ্জা কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেষ্টা ব্যর্থ হল, দেশসুদ্ধ লোক তো তা দেখেছে।

ধনপতি। তাঁরা হলেন লোকপাল, আমরা হলুম পালের লোক; জনসাধারণে তাঁদের বিচার করে এক রকমে, আমাদের বিচার করে আর-এক রকমে। রথ যদি না চলে আমার লজ্জা আছে, কিন্তু রথ যদি চলে তা হলে আমার ভয়। তা হলে আমার সেই শূভাদৃষ্টের স্পর্ধা কোনো লোক ক্ষমা করতে পারবেই না। তখন কাল থেকে তোমরাই ভাবতে বসবে আমাকে খর্ব করা যায় কী উপায়ে।

মন্ত্রী। যা বলছ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তবুও রথ চলা চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দ্বিধা কর তা হলে দেশের লোক খেপে যাবে।

ধনপতি। আচ্ছা, তবে চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু যদি দৈবক্রমে আমার চেষ্টা সফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিষ্পত্তি। (দলের লোকদের প্রতি) বলো সিদ্ধিরস্তু!

সকলে। সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি। বলো, জয় সিদ্ধিদেবী!

সকলে। জয় সিদ্ধিদেবী।

ধনপতি। টানব কী! এ রশি যে তুলতেই পারি নে। মহাকালের রথও যেমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন কি সহজ লোকের কর্ম। (দলের লোকের প্রতি) এসো, তোমরাও সবাই এসো। সকলে মিলে হাত লাগাও। আমার খাতাণ্ডি কোথায় গেল। এসো, এসো। এসো কোষাধ্যক্ষ! আবার

বলো, সিঁধিরস্তু—টানো। সিঁধিরস্তু, আর-এক টান! সিঁধিরস্তু—জোরে! নাঃ, কিছুই হল না। আমাদের হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ল্ট হয়ে উঠছে।

সকলে। দুয়ো! দুয়ো!

১ সৈনিক। যাক। আমাদের মান রক্ষা হল।

ধনপতি। নমস্কার, মহাকাল! তুমি আমার সহায়, তাই তুমি স্থির হয়ে রইলে। আমার হাতে যদি তুমি চলতে, আমারই ঘাড়ের উপরে টলে পড়তে, একেবারে পিষে যেতুম।

খাতাণ্ড। প্রভু, এই যুদ্ধে আমাদের যে সম্মান সমাদর ক্রমেই বেড়ে উঠছিল সেটার বড়ো ক্ষতি হল।

ধনপতি। দেখো, এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে বড়ো হয়েছি। আজ রথের সামনে এসে পড়ে আমাদের সংকট ঘটেছে—আশেপাশে লোকের দাঁত-কিড়মিড় অনেক দিন থেকে শুনছি। এখন যদি স্পষ্ট সবাই দেখতে পায় যে, রশি ধরে আমরাই রথ চালাচ্ছি তা হলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগবে যে বৈশিষ্ট্য টিকবে না।

১ সৈনিক। যদি সেকাল থাকত তা হলে তোমার হাতে রথ চলল না বলে তোমার মাথা কাটা যেত।

ধনপতি। অর্থাৎ, তোমরা তা হলে হাতে কাজ পেতে। মাথা কাটতে না পেলেই তোমরা বেকার।

১ সৈনিক। আজ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে না; রাজাও না। এতে বাবা মহাকালেরই মান খর্ব হয়ে গেছে।

ধনপতি। সত্যি কথা বলি—যখন সবাই গায়ে হাত দিতে সাহস করত তখন ঢের বেশি নিরাপদে ছিলুম। আজ সবাই যে আমাদের মানতে বাধ্য হয়েছে এরই মধ্যে আমাদের মরণ। মন্ত্রী-মশায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছ কী।

মন্ত্রী। ভাবছি সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল, এখন কোনো উপায় তো আর বাকি নেই।

ধনপতি। ভাবনা কী। যখন তোমাদের কোনো উপায় খাটল না তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের করবেন। তাঁর চলবার গরজ তাঁরই, আমাদের নয়; তাঁর ডাক পড়লেই যেখান থেকে হোক তাঁর বাহন ছুটে আসবে। আজ যাদের দেখাই যাচ্ছে না, কাল তারা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়বে। তার আগে আমার খাতাপত্র সামলাই গে। এসো হে কোষাধ্যক্ষ, আজ সিঁধুকগুলো একটু শক্ত করে বন্ধ করতে হবে।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান]

চরের প্রবেশ

চর। মন্ত্রীমশায়, আমাদের শত্রুপাড়ায় ভারি গোল বেধে গেছে।

মন্ত্রী। কেন কী হয়েছে।

চর। দলে দলে আসছে সব ছুটে। তারা বলে, বাবার রথ আমরা চালাব।

সকলে। বলে কী। রশি ছুঁতেই দেব না।

চর। কিন্তু তাদের ঠেকাবে কে।

সৈন্যদল। আমরা আছি।

চর। তোমরা কজনই বা আছ। তাদের মারতে মারতে তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে যাবে—তবু এত বাকি থাকবে যে রথতলায় তোমাদের আর জায়গাই হবে না।

চর। মন্ত্রীমশায়, তুমি যে একেবারে বসে পড়লে?

মন্ত্রী। ওরা দল বেঁধে আসছে বলে আমি ভয় করি নে।

চর। তবে?

মন্ত্রী। আমার মনে ভয় হচ্ছে ওরা পারবে।

সৈনিক দল। বল কী, মন্ত্রী-মহারাজ, ওরা পারবে মহাকালের রথ টানতে! শিলা জলে ভাসবে!

মন্ত্রী। দৈবাৎ যদি পারে তা হলে বিধাতার নূতন বিধি শুরুর হবে। নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। ভূমিকম্পে মাটির মধ্যে সেই চেষ্টাতেই তো বিভীষিকা। যা বরাবর প্রচ্ছন্ন আছে তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তরের সময়।

সৈনিক দল। কী করতে চান, আমাদের কী করতে বলেন হুকুম করুন। আমরা কিছই ভয় করি নে।

মন্ত্রী। সাহস দেখাতে গিয়েই সংসারে ভয় বাড়িয়ে তোলা হয়। গোঁয়াতর্কি করে তলোয়ারের বেড়া তুলে দিয়েই মহাকালের বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর। তা, কী করতে হবে বলেন।

মন্ত্রী। ওদের কোনো বাধা না দেওয়াই হচ্ছে সৎপরামর্শ। বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিনতে পারে। সেই চিনতে দিলেই আর রক্ষে নেই।

সৈনিক দল। তা হলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি? ওরা আসুক?

চর। ঐ যে এসে পড়েছে।

মন্ত্রী। তোমরা কিছই কোরো না। স্থির হয়ে থাকো।

শত্রুদলের প্রবেশ

মন্ত্রী। (দলপতির প্রতি) এই যে সর্দার। তোমাদের দেখে বড়ো খুশি হলুম।

দলপতি। মন্ত্রীমশায়, আমরা বাবার রথ চালাতে এসেছি।

মন্ত্রী। চিরদিন তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে এসেছ, আমরা তো উপলক্ষমাত্র। সে কি আর জানি নে।

দলপতি। এতদিন আমরা রথের চাকার তলায় পড়েছি, আমাদের দলে দিয়ে রথ চলে গেছে। এবার তো আমাদের বলি বাবা নিল না।

মন্ত্রী। সে তো দেখতে পাচ্ছি। আজ ভোরবেলায় তোমাদের পঞ্চাশজন চাকার সামনে ধুলোয় লুটোপুটি করলে—তবু চাকার মধ্যে একটুও ক্ষুধার লক্ষণ দেখা গেল না, নড়ল না, ক্যাঁ কোঁ করে চীৎকার করে উঠল না—তাদের স্তব্ধতা দেখেই তো ভয় পেয়েছি।

দলপতি। এবারে রথের তলাটাতে পড়বার জন্যে মহাকাল আমাদের ডাক দেন নি—তিনি ডেকেছেন তাঁর রথের রশিটাকে টান দিতে।

পুরুহিত। সত্যি নাকি। কেমন করে জানলে।

দলপতি। কেমন করে জানা যায় সে তো কেউ জানে না। কিন্তু আজ ভোরবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে গেছে। ছেলেমেয়ে বড়ো জোয়ান সবাই বলছে ‘বাবা ডেকেছেন’।

সৈনিক। রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি। না, টান দেবার জন্যে।

পুরুহিত। দেখো বাবা, ভালো করে ভেবে দেখো, সমস্ত সংসার যারা চালায় মহাকালের রথের রশির জিহ্মে তাদেরই ‘পরে’।

দলপতি। ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও।

পুরুহিত। তা দেখো, কাল খারাপ বটে, তবু হাজার হোক আমরা তো ব্রাহ্মণ বটে।

দলপতি। মন্ত্রীমশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও।

মন্ত্রী। সংসার বলতে তো তোমরাই। নিজগুণে চল, আমরা চালাক লোকেরা বলে থাকি আমরাই চালাচ্ছি। তোমাদের বাদ দিলে আমরা কজনই বা আছি।

দলপতি। আমাদের বাদ দিলে তোমরা যে কজনাই থাকো-না, থাকবে কী উপায়ে?

মন্ত্রী। হাঁ, হাঁ, সে তো ঠিক কথা।

দলপতি। আমরাই তো জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ। আমরাই বুনছি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক। সর্বনাশ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত জোড় করে বলে আসছিল 'তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক'। আজ এ কী রকমের সব উলটো বুলি। আর তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী। (সৈনিকের প্রতি) চুপ করো। (দলপতিকে) সর্দার, আমরা তো তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। মহাকালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমরা বুঝি নে, আমরা কি এত মূঢ়। তোমাদের কাজটা তোমরা সাধন করে দিয়ে যাও, তার পরে আমাদের কাজ করবার অবসর আমরা পাব।

দলপতি। আয় রে ভাই, সবাই মিলে টান দে। মরি আর বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই।

মন্ত্রী। কিন্তু সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চলো। যে রাস্তায় বরাবর রথ চলেছে সেই রাস্তায়। আমাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে যেন।

দলপতি। রথের 'পরে রথী' আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে নেবেন, আমরা তো বাহন, আমরা কী বা বুঝি। আয় রে সবাই। ঐ দেখাচ্ছিস রথের চুড়ায় কেতনটা দুলে উঠেছে, স্বয়ং বাবার ইশারা। ভয় নেই, আয় সবাই।

পদুরোহিত। ছুঁলে রে ছুঁলে! রশি ছুঁলে! ছি, ছি!

নাগরিকগণ। হায়, হায়, কী সর্বনাশ!

পদুরোহিত। চোখ বোজ্ রে তোরা সব, সবাই চোখ বোজ্! ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে তোরা ভস্ম হয়ে যাবি।

সৈনিক। ও কী ও! এ কি চাকারই শব্দ না কি? না আকাশ আতর্নাদ করে উঠল?

পদুরোহিত। হতেই পারে না।

নাগরিক। ঐ তো নড়ল যেন।

সৈনিক। ধুলো উড়েছে যে। অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ চলেছে! পাপ! মহাপাপ!

শব্দদল। জয়, জয় মহাকালের জয়!

পদুরোহিত। তাই তো, এ কী কাণ্ড হল!

সৈনিক। ঠাকুর, হুকুম করো। আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই অপবিত্র রথ চলা বন্ধ করে দিই।

পদুরোহিত। হুকুম করতে তো সাহস হয় না। বাবা স্বয়ং যদি ইচ্ছে করে জাত খোয়ান, আমাদের হুকুমে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

সৈনিক। তা হলে ফেলে দিই আমাদের অস্ত্র!

পদুরোহিত। আর আমিও ফেলে দিই আমার পুঁথিপত্র!

নাগরিকগণ। আমরা যাই সব নগর ছেড়ে। মন্ত্রীমশায়, তুমি কী করবে। কোথায় যাচ্ছ।

মন্ত্রী। আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরতে।

সৈনিক। ওদের সঙ্গে মিলবে?

মন্ত্রী। তা হলেই বাবা প্রসন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখছি ওরা যে আজ তাঁর প্রসাদ পেয়েছে। এ তো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে আজ কেউ মান রক্ষা করতে পারবে না, মান ওদের সঙ্গে থেকে।

সৈনিক। কিন্তু তাই বলে ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে রশি ধরা! ঠেকাবই ওদের। দলবল ডাকতে চললাম। মহাকালের রথের পথ রক্তে কাদা হয়ে যাবে।

পদুরোহিত। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে লাগতে পারব।

মন্ত্রী। ঠেকাতে পারবে না। এবার দেখাচ্ছি চাকার তলায় তোমাদেরই পড়তে হবে।

সৈনিক। তাই সই। বাবার রথের চাকা এতদিন যত-সব চন্ডালের মাংস খেয়ে অশুচি হয়ে আছে। আজ শুদ্ধ মাংস পাবে।

পুরুষোত্তম। ঐ দেখো, ঐ দেখো মন্ত্রী! এরই মধ্যে রথটা রাজপথ থেকে নেমে পড়েছে। কোথায় কোন্ পল্লীর উপরে পড়বে কিছুই বলা যায় না।

সৈনিক। ঐ যে ধনপতির দল ওখান থেকে চীৎকার করে আমাদের ডাকছে। রথটা যেন ওদেরই ভাণ্ডার লক্ষ্য করে চলেছে। ওরা ভয় পেয়ে গেছে। চলো চলো, ওদের রক্ষা করি গে।

মন্ত্রী। নিজেদের রক্ষা করো, তার পরে অন্য কথা। আমার তো মনে হচ্ছে রথটা ঠিক তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে ঝুঁকেছে, ওর আর কিছু চিহ্ন বাকি থাকবে না। ঐ দেখো।

সৈনিক। উপায়?

মন্ত্রী। ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরো-সে— তা হলে রক্ষা পাবার পথে রথের বেগটাকে ফিঁড়িয়ে আনা সম্ভব হবে। আর দ্বিধা করবার সময় নেই।

[প্রস্থান]

সৈনিক। (পরস্পর) কী করবে। ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরুষোত্তম। বীরগণ, তোমরা কী করবে।

সৈনিক। জানি নে, রশি ধরব না লড়াই করব! ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরুষোত্তম। জানি নে, রশি ধরব না আবার শাস্ত্র আওড়াতে বসব।

১ সৈনিক। শুনতে পাচ্ছ—হুড়মুড় শব্দে পৃথিবীটা যেন ভেঙেচুরে পড়েছে।

২ সৈনিক। চেয়ে দেখো, ওরা টানছে বলে মনেই হচ্ছে না। রথটাই ওদের ঠেলে নিয়ে চলেছে।

৩ সৈনিক। পুরুষোত্তম, দেখছ রথটা যেন বেঁচে উঠেছে। কী রকম হেঁকে চলেছে। এতবার রথযাত্রা দেখেছি, ঠাঁর এরকম সজীবমূর্তি কখনো দেখি নি। এতকাল ঘূমিয়ে ঘূমিয়ে চলেছিল, আজ জেগে চলেছে। তাই আমাদের পথ মানছে না, নিজের পথ বানিয়ে নিচ্ছে।

২ সৈনিক। কিন্তু গেল যে সব। রথযাত্রার এমন সর্বনেশে উৎসব তো কোনোদিন দেখি নি। ঐ যে কবি আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করো-না, এ-সবের মানে কী।

পুরুষোত্তম। আমরাই বুঝতে পারলুম না, কবি বুঝতে পারবে? ওরা তো কেবল বানিয়ে কথা বলে, সনাতন শাস্ত্রের কথা জানেই না।

১ সৈনিক। শাস্ত্রের কথাগুলো কোন্‌কালে মরে গেছে ঠাকুর! তাই তোমাদের কথা তো আর খাটে না দেখি। ওদের যে সব তাজা কথা, তাই শুনলে বিশ্বাস হয়।

কবির প্রবেশ

২ সৈনিক। কবি, আজ রথযাত্রায় এই যে-সব উলটো-পালটা কান্ড হয়ে গেল, কেন বুঝতে পারো?

কবি। পারি বৈকি।

১ সৈনিক। পুরুষোত্তমের হাতে, রাজার হাতে রথ চলল না, এর মানে কী।

কবি। ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুদ্ধ রথকে মানলেই হল না, মহাকালের রথের দাঁড়িকেও মানা চাই।

১ সৈনিক। কবি, তোমার কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, হয়তো বা একটা মানে আছে। খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না।

কবি। ওরা বাঁধন মানতে চায় নি, শুদ্ধ চলাকেই মেনেছিল। তাই রাগী বাঁধনটা উন্মত্ত হয়ে ওদের উপর লেজ আছড়াচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাবে।

পুরুষোত্তম। আর তোমার শুদ্ধগুলোই কি এত বুদ্ধিমান যে দাঁড়ির নিয়ম সামলে চলতে পারবে।

কবি। হয়তো পারবে না। একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তা, তখনই মরবার সময় আসবে।

দেখো-না, কালই বলতে শুরু করবে, আমাদেরই হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল পাড়তে বসবে। তখন এঁরাই হয়ে উঠবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা লন্ডভন্ড হয়ে যাবে।

পুরুোহিত। তখন আবার রথ অচল হলে বোধ করি কবিদের ডাক পড়বে।

কবি। ঠাট্টা নয় পুরুতঠাকুর! মহাকাল বারেবারেই রথযাত্রায় কবিদের ডেকেছেন। তারা কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পেঁছতে পারে নি।

পুরুোহিত। তারা চালাবে কিসের জোরে।

কবি। গায়ের জোরে নয়ই। আমরা মানি ছন্দ, আমরা জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে। আমরা জানি সুন্দরকে কর্ণধার করলেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে। তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে - শাস্ত্রের কঠোর বা অশ্বের কঠোর—সেটা হল ভীরুর বিশ্বাস, দুর্বলের বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাস।

সৈনিক। ওহে কবি, তুমি তো উপদেশ দিতে বসলে, ও দিকে যে আগুন লাগল।

কবি। যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেছে। যা থাকবার তা থাকবেই।

সৈনিক। তুমি কী করবে।

কবি। আমি গান গাব, 'ভয় নেই'।

সৈনিক। তাতে হবে কী।

কবি। যারা রথ টানছে তারা চলবার তাল পাবে। বেতাল টানটাই ভয়ংকর।

সৈনিক। আমরা কী করব।

পুরুোহিত। আমি কী করব।

কবি। তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা নেই। দেখো, ভাবো। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠো। তার পরে ডাক পড়বার জন্যে তৈরি হয়ে থাকো।

চণ্ডালিকা

প্রকাশ : ১৯৩৩

রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত *The Sanskrit-Buddhist Literature*
গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে 'চন্ডালিকা' নাটিকা গ্রথিত।

প্রকাশের চার বৎসর পর কবি-কর্তৃক নাটিকাটি 'চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যে'
রূপান্তরিত হয়।

ভূমিকা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণবিদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটকের গল্পটি গৃহীত।

গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঁঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অকর্ণফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

প্রথম দৃশ্য

মা। প্রকৃতি, ও প্রকৃতি! গেল কোথায়! কী জানি কী হল মেয়েটার। ঘরে দেখতেই পাই নে।
প্রকৃতি। এই যে মা, এখানেই আছি।

মা। কোথায়!

প্রকৃতি। এই যে কুয়োতলায়।

মা। আশ্চর্য করলি তুই। বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না। ঘরের জল কোন্ সকালে তোলা হয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই জল নিয়ে গেল ঘরে। ঐ দেখ্, ঠোঁট মেলে গরমে কাক ধুকছে আমলকীগাছের ডালে। তুই এই বৈশেখের রোদ পোয়ান্ছিস বিনি কাজে। পুরাণকথা শুনোছি, উমা তপ করেছিলেন ঘর ছেড়ে বাইরে, রোদে পড়ে; তোর কি তাই হল।

প্রকৃতি। হাঁ মা, তপ করছি তো বটে।

মা। অবাক করলে! কার জন্যে।

প্রকৃতি। যে আমাকে ডাক দিয়েছে।

গান

যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক্।

যে আমারি নাম জেনেছে ওগো তারি
নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্।

মা। কিসের ডাক।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও'।

মা। পোড়া কপাল! তোকে বলেছে 'জল দাও'। কে শুনিন। তোর আপন জাতের কেউ?

প্রকৃতি। তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জাতেরই।

মা। জাত লুকোস নি? বলেছিলি যে তুই চন্ডালিনী?

প্রকৃতি। বলেছিলেন। তিনি বললেন, মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চন্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।

মা। তোর মুখে এ-সব কী শুনছি। তোর কি মনে পড়েছে পূর্বজন্মের কোনো কাহিনী।

প্রকৃতি। এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের।

মা। হাসালি তুই। নতুন জন্ম! ঘটল কবে।

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলুম দূর থেকে। ভোরবেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ। বললুম, আমি চন্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে। প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গন্ডুব জল, যাঁর পায়ে ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক।

মা। ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাৎ এতবড়ো হল তোর বুকের পাটা! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিস নে কোন্ কুলে তোর জন্ম?

প্রকৃতি। কেবল একটি গন্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।

মা। তোর মূখের কথা সুদৃঢ় বদলে গেছে যে! জাদু করেছে তোর কথাকে। কী বলিস নিজে বদ্বতে পারিস কিছ্?

প্রকৃতি। সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা। এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে। একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহাপদ্যই খুঁজছিলেন। যে জলে রত হল পূর্ণ সে জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীথেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে জল তুলে এনেছিল গৃহক চণ্ডাল। সেই অবাধ নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত—দাও জল, দাও জল।

গান

বলে দাও জল, দাও জল!
দেব আমি, কে দিয়েছে হেন সম্বল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধৈয়ে
চাতক বিহ্বল—
দাও জল, দাও জল।

ভূমিতলে হারা
উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।

কার সুগভীর বাণী
দিল হানি
কালো শিলাতল—
দাও জল, দাও জল।

মা। কী জানি বাছা, ভালো ঠেকছে না। ওদের মন্তরের খেলা আমি বুঝি নে। আজ তোর কথা চিনছি নে, কাল তোর মুখ চিনতেই পারব না। ওদের এ যে প্রাণ-বদলানো মন্তর।

প্রকৃতি। চিনতে পার নি এতদিন। যিনি চিনেছেন তিনি চেনাবেন। তাই আছি তাকিয়ে। রাজদুয়ারে দুপরের ঘণ্টা বাজে, মেয়েরা জল নিয়ে যায় ঘরে, শঙ্খচিল একলা ওড়ে দূর আকাশে, আমার ঘট নিয়ে এসে বসি কুয়োতলায় পথের ধারে।

মা। কার জন্যে।

প্রকৃতি। পৃথিকের জন্যে।

মা। তোর কাছে কোন পৃথিক আসবে, পাগলি!

প্রকৃতি। সেই এক পৃথিক মা, সেই এক পৃথিক। তাঁর মধ্যে আছে বিশ্বের সকল পথের সব পৃথিক। দিনের পর দিন চলে যায়, এলেন না তো। কোনো কথা না বলে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাখলেন না কেন কথা। আমার মন যে হল মরুভূমির মতো, ধু ধু করে সমস্ত দিন, হু হু করে তপ্ত হাওয়া, সে যে পারছে না জল দিতে। কেউ এসে চাইলে না।

গান

চক্ষু আমার তৃষ্ণা, ওগো
 তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
 আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
 সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
 ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়,
 মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়,
 অবগদুষ্ঠন যায় যে উড়ে।
 যে ফুল কানন করত আলো
 কালো হয়ে সে শুকাল।
 ঝরনারে কে দিল বাধা—
 তাপের প্রতাপে বাঁধা
 দঃখের শিখরচূড়ে।

মা। তোর আজকেকার কথা কিছ্ বদ্বতে পারছি নে, তোকে কী নেশা লেগেছে কী জানি।
 কী চাস, আমাকে সাদা করে বল্।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও
 চলণের বিধাতার সংসারে, এতবড়ো আশ্চর্য কথা! সেবিকা আমি, এই কথাটি নিন তুলে ধুলোর
 থেকে তাঁর বন্ধের কাছে, এই ধূতরো ফুলটাকে।

মা। মনে রাখিস প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে
 কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্তাও নেই কোনোখানে। অশুচি
 তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক্
 সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্রই তোর অপরাধ।

প্রকৃতি।

গান

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে,
 দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।
 জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
 দয়া করে দাও ভুলিতে,
 নাই ধূলি মোর অন্তরে।
 নয়ন তোমার নত করো,
 দলগূলি কাঁপে থরো থরো।
 চরণপরশ দিয়ে দিয়ো,
 ধূলির ধনকে করো ম্বর্গীয়,
 ধরার প্রণাম আমি
 তোমার তরে।

মা। বাছা, কিছ্ কিছ্ বদ্বতে পারি তোর কথা। তুই মেয়েমানুষ, সেবাতেই তোর পূজো,
 সেবাতেই তোর রাজত্ব। এক নিমিষে জাত ডিঙিয়ে যেতে পারে মেয়েরাই; ধরা পড়ে, সবাই তারা
 রাজরানীর অংশ, যদি হঠাৎ সরে পড়ে ভাগ্যের পর্দাটা। সুযোগ তোর তো ঘটেছিল। মৃগয়ায়
 বোরিয়ে রাজার ছেলে এসেছিল তোরই এই কুয়োতলায়। মনে পড়ে তো?

প্রকৃতি। হাঁ, মনে পড়ে।

মা। কেন গেলি নে রাজার ঘরে। রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল।

প্রকৃতি। ভুলেছিল না তো কী। ভুলেইছিল যে, আমি মানুষ। পশু মারতে বেরিয়েছিল; চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।

মা। তবু তো শিকার বলেও ঐ মুখ লক্ষ্য করেছিল সে। আর ভিক্ষু, সে কি নারী বলে চিনেছে তোমাকে।

প্রকৃতি। 'বুঝবে না তুমি বুঝবে না। আমি বুঝেছি, এতদিন পরে সেই আমাকে প্রথম চিনেছে। সে বড়ো আশ্চর্য।

গান

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি।

তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার।

আমি তরুণ অরুণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,
আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।

তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার।

তাকে চাই মা। নিতান্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই আমার এ জন্মের পূজার ডালি। অশ্রুচি হবে না তাতে তাঁর চরণ। দেখুক সবাই আমার স্পর্ধা। গৌরব করে বলতে চাই, আমি তোমার সেবিকা, নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।

মা। মিছে রাগ করিস কেন বাছা। দাসীজন্মই যে তোর। বিধাতার লিখন খণ্ডাবে কে।

প্রকৃতি। হি হি মা, আবার তাকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের - পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।

মা। তোর সঙ্গে কথা কইতে পারি এমন কথা আমি জানি নে। তা ভালো, আমি নিজে যাব তাঁর কাছে। পায়ের ধরে বলব, তুমি অন্ন নিয়ে থাক সব ঘর থেকেই, আমার ঘরে কেবল এক গন্ডুষ জল নিতে এসো।

প্রকৃতি।

গান

না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে।
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে,
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে।
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে,
গঙ্গাধারা মিশবে না কি কালো যমুনাতে।
আপনি কী সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে।

পৃথিবী যখন অনাবৃষ্টিতে ফেটে চোঁচির, কী হবে মা, এক-ঘটি জল সংগ্রহ করে। আপনি আসবে না মেঘ আপন টানে, আকাশ ভরে দিয়ে?

মা। এ-সব কথা বলে লাভ কী। মেঘ আপনি আসে তো আসে, না আসে তো আসেই না। খেত-খন্দ যদি শুকিয়ে যায় তাতে কার কিসের গরজ। আমরা আকাশে তাকিয়ে থাকি, আর কী করতে পারি।

প্রকৃতি। সে হবে না। তাকিয়ে বসে থাকব না, মন্তর জানিস তুই, সেই মন্তর হোক আমার বাহুবন্ধন, আনন্দ তাকে টেনে।

মা। ওরে সর্বনাশী, বলিস কী! সাহস কেবলই বাড়ছে দেখি! আগুন নিয়ে খেলা! এরা কি সাধারণ মানুষ! মন্তর খাটাব এদের 'পরে? শূনে বুক কেঁপে ওঠে।

প্রকৃতি। রাজার ছেলের বেলায় মন্তর পড়তে চেয়েছিলি কোন্ সাহসে।

মা। ভয় করি নে রাজাকে, সে শূলে চড়াতে পারে। কিন্তু, এরা যে কিছুই করে না।

প্রকৃতি। আমি আর-কোনো ভয় করি নে; ভয় করি, আবার যাব নেমে, আবার আপনাকে ভুলব, আবার ঢুকব অঁধার কোঠায়। সে যে মরণের বাড়ি। আনতেই হবে তাকে, এতবড়ো কথা এত জোর করে বলছি, এ কি আশ্চর্য নয়—এই আশ্চর্যই তো ঘটিয়েছে সে। আরো আশ্চর্য কি ঘটবে না, আসবে না কি আমার পাশে। আমারই আধো আঁচলে বসবে না?

মা। তাকে আনতে পারি হয়তো, তুই তার মূল্য দিতে পারবি? তোর কিছুই থাকবে না বাকি!

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না। আমার জন্মজন্মান্তরের সেই দায়, কিছুই থাকবে না, একেবারে সমস্তই মিটিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যাব। তাই তো চাই তাকে। কিছু থাকবে না আমার। আমার যুগযুগের অপেক্ষা করে থাকা এই জন্মেই সার্থক হবে, মন কেবলই তাই বলছে। সার্থক হবে। সেইজন্যেই তো শূনলুম এমন আশ্চর্য কথা—জল দাও। আজ জেনেছি, আমিও পারি দিতে। এই কথা সবাই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দেব, দেব, আজ আমার সব-কিছু দেব বলেই বসে আছি তাঁর পথ চেয়ে।

মা। তুই ধর্ম মানিস নে?

প্রকৃতি। কী করে বলব! তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন। যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ ক'রে, মূখ বন্ধ ক'রে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু, সেদিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার বারণ। কোনো ভয় আর নেই আমার—পড়্ তোর মন্তর, ভিক্ষুকে নিয়ে আয় চন্ডালের মেয়ের পাশে। আমিই দেব তাকে সম্মান। এতবড়ো সম্মান আর কেউ দিতে পারবে না।

গান

আমি তারেই জানি তারেই জানি

আমায় যে জন আপন জানে—

তারি দানে দাবি আমার

যার অধিকার আমার দানে।

যে আমারে চিনতে পারে

সেই চেনাতেই চিনি তারে,

একই আলো চেনার পথে

তার প্রাণে আর আমার প্রাণে।

আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা

আমি তাদের মধ্যে আপনহারা।

ছুইয়ে দিল সোনার কাঠি,
ঘুমের ঢাকা গেল ফাটি,
নয়ন আমার ছুটেছে তার
আলো-করা মুখের পানে।

মা। শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই?

প্রকৃতি। শাপ তো লেগেই আছে জন্মকাল থেকে। এক শাপের বিষে আর-এক শাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায়। কোনো কথাই শুনব না মা, শুনব না, শুনব না। শুরুর করে দে মন্ত্র। পারব না দেরি সহিতে।

মা। আচ্ছা, তা হলে কী নাম তাঁর বল্।

প্রকৃতি। তাঁর নাম আনন্দ।

মা। আনন্দ? ভগবান বৃদ্ধের শিষ্য?

প্রকৃতি। হাঁ, সেই ভিক্ষু।

মা। তুই আমার বৃক-চেরা ধন, আমার চোখের মণি—তোর কথাতেই এতবড়ো পাপে হাত দিচ্ছি।

প্রকৃতি। কিসের পাপ! যিনি সবাইকে কাছে আনেন তাঁকে কাছে আনব, তাতে দোষ হয়েছে কী।

মা। ঠুঁরা পদ্যের জোরে টেনে আনেন মানুষকে। আমরা মন্ত্র পড়ে টানি, পশুকে টানে যে ফাঁসে। আমরা মথন করে তুলি পাঁক।

প্রকৃতি। ভালোই সে ভালোই, নইলে পঙ্কান্ধার হয় না।

মা। ওগো, তুমি মহাপুরুষ, অপরাধ করবার শক্তি আমার যত, ক্ষমা করবার শক্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।

প্রকৃতি। কিসের ভয় তোমার মা! মন্ত্র আমিই পড়ছি মায়ের মুখ দিয়ে। আমার বেদনা যদি আনে তাঁকে টেনে, আর তাই যদি হয় অপরাধ, তবে করবই অপরাধ, করবই। যে বিধানে কেবল শাস্তিই আছে, সান্ত্বনা নেই, মানব না সে বিধানকে।

গান

দোষী করো, দোষী করো।

ধূলায়-পড়া ম্লান কুসুম

পায়ের তলায় ধরো।

অপরাধে-ভরা ডালি

নিজ হাতে করো খালি,

তার পরে সেই শূন্য ডালায়

তোমার করুণা ভরো।

তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ—

ধরব তোমার ফাঁদে

আমার অপরাধে।

আমার দোষকে তোমার পদ্য

করবে তো কলঙ্কশূন্য,

ক্ষমায় গেম্বে সকল চুটি

গলায় তোমার পরো।

মা। আচ্ছা সাহস তোর প্রকৃতি!

প্রকৃতি। আমার সাহস! ভেবে দেখ্ তাঁর সাহসের জোর! কেউ যে কথা আমার কাছে বলতে পারে নি তিনি সহজেই বললেন, জল দাও। ঐটুকু বাণী, তার তেজ কত—আলো করে দিলে আমার সমস্ত জন্ম; বৃকের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিস নি। সমস্ত সকালবেলা ভিক্ষা শেষ করলেন শ্রাবস্তীনগরে; এলেন মাঠ পেরিয়ে, শ্মশান পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, প্রথর রৌদ্র মাথায় করে। কিসের জন্যে। আমার মতো মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্যে—জল দাও! মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া, এত প্রেম! নামল সেই ভীরুর কাছে যে সবার চেয়ে অযোগ্য। আর কিসের ভয় আমার! জল দাও! সেই জল যে আমার জন্ম ভরে উপচে উঠেছে, না দিতে পারলে তো বাঁচব না। জল দাও! এক নিমেষে জেনেছি, জল আছে আমার, অফুরান জল, সে আমি জানাব কাকে। তাই তো ডাকাছি দিনরাত। শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর পড়ে। সহাবে তাঁর সহাবে।

মা। মাঠপারের রাস্তা দিয়ে ঐ যে কারা চলেছে, প্রকৃতি, পীতবসন-পরা।

প্রকৃতি। তাই তো, ও যে দেখাছি সংঘের সব শ্রমণ। শুনছ না, পড়ছেন মন্ত্র?

পথে শ্রমণেরা

লোকস্‌স পাপদুর্পাকিলেসঘাতকো

যোচ্চন্ত সদ্ধব্বর-এণনলোচনো।

লোকস্‌স পাপদুর্পাকিলেসঘাতকো

বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্।

প্রকৃতি। মা, ঐ যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে। এই কুয়োতলার দিকে ফিরে তাকালেন না। আর-একবার তো বলে যেতে পারতেন, জল দাও। মনে হয়েছিল, আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না, আমি যে ওঁর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি। (বসে পড়ে বার বার মাটিতে মাথা ঠুকে) এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন—হতভাগিনী, কে তোকে আলোতে ফুটিয়ে তুলেছিল এক মূহূর্তের জন্যে। তাকে কি দয়া বলে। শেষে পড়তে হল এই মাটিতেই—চিরদিন মিশিয়ে থাকতে হবে এই মাটিতেই, যত লোক চলে রাস্তায় তাদের পায়ের তলায়।

মা। বাছা, ভুলে যা, ভুলে যা এ সমস্ত-কিছু। তোর এক নিমেষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ওরা যাচ্ছে চলে, যাক যাক। যা টেকবার নয় তা যত শীঘ্র যায় ততই ভালো।

প্রকৃতি। এই প্রতিদিনের চাই চাই চাই, এই প্রতি মূহূর্তের অপমান, বৃকের ভিতরে এই খাঁচার পাখির পাখা-আছড়ে-মরা, একেই বলে স্বপ্ন? যা বৃকের সব শিরা কামড়ে ধরে থাকে, ছাড়তে চায় না, তাই স্বপ্ন? আর ঐ ওরা, নেই কোনো বাঁধন, নেই কোনো সুখদুঃখ, নেই কোনো সংসারের বোঝা—ভেসে চলে যায় শরৎকালের মেঘের মতো—ওরাই আছে জেগে, ওরাই স্বপ্ন নয়?

মা। তোর কষ্ট দেখতে পারি নে প্রকৃতি। ওঠ্ তুই। আনবই তাঁকে মন্ত্র পড়ে। নিয়ে আসব ধুলোর পথ দিয়েই। 'কিছু চাই না' বলার অহংকার ভাঙব তাঁর—'চাই চাই' বলেই আসতে হবে তাঁকে ছুটে।

প্রকৃতি। মা, তোমার মন্ত্র জীবসৃষ্টির আদিকালের। এদের মন্ত্র কাঁচা, এই সেদিনকার। ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে। তোমার মন্ত্রের টানে খুলবে ওদের মন্ত্রের গাঠি। ওঁকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।

মা। কোথায় যাচ্ছে ওরা।

প্রকৃতি। ওরা যায় এইমাত্র জানি, ওরা কোনোখানেই যায় না। বর্ষা আসবে কিছুদিন পরে, তখন বসবে চাতুর্মাস্যে। আবার যাবে, কী জানি কোথায়। একেই ওরা বলে জেগে থাকা!

মা। পাগলি, তবে কী বলছিঁস মন্তরের কথা। চলে যাচ্ছে কত দূরে—কোথা থেকে আনব ফিরিয়ে।

প্রকৃতি। যেখানেই যাক ফেরাতেই হবে, দূর নেই তোর মন্তরের কাছে।

গান

যায় যদি যাক সাগরতীরে।
আবার আসুক, আবার আসুক, আসুক ফিরে।
রেখে দেব আসন পেতে
হৃদয়েতে,
পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুনারীতে।
যায় যদি যাক শৈলশিরে।
আসুক ফিরে, আসুক ফিরে।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,
ডাকব উহায়—
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে।

আমাকে করলে না দয়া, আমি ওকে দয়া করব না। তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠুর মন্ত্র পড়িস তাই—পাকে পাকে দাগ দিয়ে দিয়ে জড়াক ওর মনকে। যাবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন।

মা। ভাবনা করিস নে। অসাধ্য হবে না। তোকে দেব মায়াদর্পণ। সেইটি হাতে নিয়ে নাচাবি। তার ছায়া পড়বে তাতে। সেই আয়নাতেই দেখতে পারি কী হল তার, কতদূর সে এল।

প্রকৃতি। ঐ দেখ, পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ। মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে। উড়ে যাবে শূন্যে সাধন, শূন্যে পাতার মতো। নিববে বাতি। পথ দেখা যাবে না। ঘুরে ঘুরে এসে পড়বে এই দরজায়, নিশীথরাতে ঝড়ে বাসাভাঙা পাখি যেমন করে এসে পড়ে অন্ধকার আঁঙিনায়। বুক দুর্দুর্ করে, মনের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে বিজুলি, ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঢেউ উঠছে যে সমুদ্রে তার পার দেখি নে।

মা। এখনো ভেবে দেখ। মাঝখানে তো আঁতকে উঠবি নে ভয়ে? ধৈর্য থাকবে তোর? মন্ত্রের বেগ চড়ে যাবে যখন, হঠাৎ ঠেকাতে গেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। জ্বলবার জিনিস সমস্ত যাবে ছাই হয়ে, তবে নিববে আগুন, এই কথাটা মনে রাখিস।

প্রকৃতি। তুই ডরছিঁস কার জন্যে। সে কি তেমন মানুষ। কিছুতে কিছু হবে না তার—শেষ পর্যন্তই আসুক সে চলে, আগুনের পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। আমি মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সামনে প্রলয়ের রাত্রি, মিলনের ঝড়, ভাঙনের আনন্দ।

গান

হৃদয়ে মন্দির ডমরু গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু, কুটিল কুণ্ডিত,
হল রোমাণ্ডিত বন বনান্তর;
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে।
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসর্চকিত হস্ত শব্দরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে,
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝংকৃত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি। বৃক ফেটে যাবে! আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না। কী ভয়ংকর দৃঃখের ঘূর্ণিঝড়। বনস্পতি শেষকালে কি মড়মড় করে লুটোবে খুলোয়, অদ্রভেদী গৌরব তার পড়বে ভেঙে?

মা। দেখ্ বাছা, এখনো যদি বলিস, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি আমার মন্ত্রকে। তাতে আমার নাড়ী ছিঁড়ে যায় যদি, যায় নিজের প্রাণ, সেও ভালো, কিন্তু ঐ মহাপ্রাণ রক্ষা পাক।

প্রকৃতি। সেই ভালো মা, থাক্ তোমার মন্ত্র। আর কাজ নেই।—না না না না—পথ আর কতখানিই বা! শেষ পর্যন্ত আসতে দে তাকে, আসতে দে, আমার এই বৃকের কাছ পর্যন্ত। তার পরে সব দৃঃখ দেব মিটিয়ে, আমার বিশ্বসংসার উজাড় করে দিয়ে। গভীর রাতে এসে পেঁছবে পৃথিবী, সমস্ত বৃকের জ্বালা দিয়ে জ্বালিয়ে দেব প্রদীপ, আছে সুধার ঝরনা গভীর অন্তরে, তারই জলে অভিষেক হবে তার—যে শ্রান্ত, যে তপ্ত, যে ক্ষতিবিক্ষত। আর-একবার সে চাইবে, জল দাও—আমার হৃদয়সমুদ্রের জল! আসবে সেইদিন। তোর মন্ত্র চলুক, চলুক।

গান

দৃঃখ দিয়ে মেটাব দৃঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কার্লি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার।

মা। এত দেরি হবে জানতুম না বাছা। আমার মন্ত্র শেষ হল বৃক। আমার প্রাণ যে কণ্ঠে এসেছে।

প্রকৃতি। ভয় নেই মা, আর-একটু সয়ে থাক্। একটুখানি। বেশি দেরি নেই।

মা। আষাঢ় তো পড়েছে, ঔদের চাতুর্মাস্য তো আরম্ভ হল।

প্রকৃতি। ঔরা গেছেন বৈশালীতে গৌশিরসংঘে।

মা। কী নিষ্ঠুর তুই! সে যে অনেক দূর।

প্রকৃতি। বহুদূর নয়। সাত দিনের পথ। পনেরো দিন তো কেটে গেল। এতদিনে মনে হচ্ছে, টলেছে আসন, আসছে আসছে, যা বহুদূর, যা লক্ষযোজন দূর, যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, আমার দূর হাতের নাগাল থেকে যা অসীম দূরে তাই আসছে কাছে। আসছে, কাঁপছে আমার বৃক ভূমিকম্পে।

মা। মন্ত্রের সব অঙ্গ পূর্ণ করেছি, এতে বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আনতে পারত টেনে। তবু দেরি হচ্ছে। কী মরণান্তিক যুদ্ধই চলছে। কী দেখেছিলাম তুই আয়নাতে।

প্রকৃতি। প্রথম দেখেছি, আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাকাশে মুখের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোচ্ছে আগুন। তার পরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল—ফুলে-ওঠা ফেটে-পড়া প্রকান্ড বিষফোড়ার মতো—লাল হয়ে উঠল রঙ। সেইদিন গেল। পরের দিন দেখি, পিছনে ঘন কালো মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, জ্বলছে আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে। আমার রক্ত এল হিম হয়ে। ছুটে তোকে বলতে গেলুম, ঐখনি দে তোর মন্ত্র বন্ধ করে। গিয়ে দেখি তুই শিবনেত্র, কাঠের মতো বসে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, জ্ঞান নেই। মনে হল, তোর মধ্যেও কোনোখানে দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। যে পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস্ ফোঁস্ করে তাকে ছোবল মারছে, চলছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ফিরে এসে আয়না তুলে দেখি, আলো গেছে—শুদ্ধ দৃঃখ দৃঃখ দৃঃখ, অসীম দৃঃখের মূর্তি।

মা। মরে পড়ে গেলি নে তাই দেখে। তারই তো ঝলক লেগেছিল আমার প্রাণের মধ্যে; মনে হল, আর সইবে না।

প্রকৃতি। যে দঃখের রূপ দেখেছি সে তো তাঁর একলার নয়, সে আমারও; আমাদের দুজনের। ভীষণ আগুনে গলে মিশেছে সোনার সঙ্গে তাঁরা।

মা। ভয় হল না তোর মনে?

প্রকৃতি। ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি—মনে হল দেখলুম, সৃষ্টির দেবতা প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ংকর—আগুনকে চাবকাচ্ছেন তাঁর কাজে, আর আগুন কেবলই গোমূরাচ্ছে গজাচ্ছে। সপ্তধাতুর কোঁটোতে কী আছে তাঁর পায়ের সামনে—প্রাণ না মৃত্যু? আমার মনে ফুলতে লাগল একটা আনন্দ। তাকে কী বলব? নতুন সৃষ্টির বিরাট বৈরাগ্য। ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দঃখ নেই—ভাঙছে, জ্বলে উঠছে, গলে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ। থাকতে পারলুম না, আমার সমস্ত শরীর-মন নেচে নেচে উঠল অগ্নিশিখার মতো।

গান

হে মহাদঃখ, হে রুদ্ধ, হে ভয়ংকর,
ওহে শংকর, হে প্রলয়ংকর।
হোক জটানিসূত অগ্নিভুজঙ্গম-
দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝন-ঝন, ঝন-ঝন ঝন-ঝন
পিলাক টংকরো।

মা। কী রকম দেখলি তোর ভিক্ষুকে।

প্রকৃতি। দেখলুম, তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি বহুদূরে তাকিয়ে, গোধূলি-আকাশের তারার মতো। ইচ্ছে হল, আপনার কাছ থেকে চলে যাই অনন্তযোজন দূরে।

মা। তুই আয়নার সামনে তখন নাচছিলি—তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন?

প্রকৃতি। ধিক্ ধিক্, কী লজ্জা! মনে হচ্ছিল, থেকে থেকে চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন। আবার তখনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দলে ফেলছেন রাগের অঙ্গারগুলো। শেষকালে দেখলেম, তাঁর রাগ ফিরল কাঁপতে কাঁপতে শেলের মতো নিজের দিকে, বিঞ্চল গিয়ে মর্মের মধ্যে।

মা। সমস্ত সহ্য করলি তুই?

প্রকৃতি। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমি, এই আমি, এই তোমার মেয়ে, কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই—তাঁর দঃখ আর এর দঃখ আজ এক। কোন্ সৃষ্টির যজ্ঞে এমন ঘটে--এতবড়ো কথা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারত!

মা। এই উৎপাত শান্ত হবে কতদিনে।

প্রকৃতি। যতদিন-না আমার দঃখ শান্ত হবে। ততদিন দঃখ তাঁকে দেবই। আমি মৃত্তি যদি না পাই তিনি মৃত্তি পাবেন কী করে।

মা। তোর আয়না শেষ দেখেছিস কবে।

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যাবেলায়। বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাতে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তার পরে কখনো দেখেছি, নদী পেরলেন খেয়া নৌকায়; দেখেছি দুর্গম পাহাড়ে; দেখেছি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মাঠে তিনি একা; দেখেছি অন্ধকারে, গভীর রাতে, বনের পথে। যত যাচ্ছে দিন, স্বপ্নের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোনো বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে দিয়ে। মুখে একটা বিহবলতা, দেহে একটা শৈথিল্য—দুই চোখের সামনে যেন বস্তু নেই; নেই সত্যমিথ্যা, নেই ভালোমন্দ; আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোনো অর্থ।

মা। আজ কোথায় এসেছেন আন্দাজ করতে পারিস?

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছি উপলী নদীর ধারে পাটল গ্রামে। নববর্ষায় জলের ধারা

উন্মত্ত, ঘাটের কাছে পুরোনো পিপুল গাছ, জোনাকি জ্বলছে ডালে ডালে, তলায় শেওলা-ধরা বেদী—সেইখানে এসেই হঠাৎ চম্কে দাঁড়ালেন। অনেকদিনের চেনা জায়গা; শূন্যে, ঐখানে বসে ভগবান বৃন্দ একদিন রাজা সুপ্রভাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বপ্ন বৃষ্টি ভাঙল হঠাৎ। তখনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেম আয়না, ভয় হল কী জানি কী দেখব। তার পরে গেছে সমস্ত দিন, কিছু জানতে চাই নি, আশা করছি, আশা ছাড়ছি—এমনি করে আছি বসে। এখন রাত আসছে অন্ধকার হয়ে। প্রহরী হাঁক দিয়ে চলেছে রাস্তায়, এক প্রহর গেল বৃষ্টি কেটে! আর সময় নেই, সময় নেই মা, এ রাত ব্যর্থ করিস নে। তোর সব জোরটা দে ঐ মন্ত্রে।

মা। আর পারছি নে বাছা। মন্ত্র দুর্বল হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।

প্রকৃতি। দুর্বল হলে চলবে না। দিস নে হাল ছেড়ে। ফেরবার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন বা, বাঁধনে শেষ টান পড়েছে—হয়তো টিকবে না। হয়তো বোরিয়ে যাবেন আমার এ জন্মের সংসার থেকে, আর পাব না নাগাল কিছুতেই। তখন আমারই স্বপ্নের পালা, আবার চন্ডালিনীর মায়ামূর্তি। পারব না সইতে সেই মিথ্যে। পায়ে পড়ি মা, দে একবার তোর সমস্ত শক্তি। এবার শূন্য কর তোর বসুন্ধরামন্ত্র, টলতে থাক পুণ্যবানদের তুষিত স্বর্গলোক।

গান

আমি তোমারি মাটির কন্যা,
জননী বসুন্ধরা।
তবে আমার মানবজন্ম
কেন বণ্ডিত করা।
পবিত্র জানি যে তুমি
পবিত্র জন্মভূমি—
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা
প্রাণের পুণ্যে ভরা।
কোন স্বর্গের তরে
ওরা তোমায় তুচ্ছ করে,
রাহি তোমার বক্ষ-পরে।
আমি যে তোমারি আছি
নিতান্ত কাছাকাছি—
তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে
হৃদয়প্রাণ-হরা।

মা। যেমন বলেছিলেন তেমনি প্রস্তুত হয়েছ তো?

প্রকৃতি। হয়েছি! কাল ছিল শূক্ৰান্বিতীয়ার রাত, করেছি গম্ভীরায় অবগাহনস্নান। এই তো চাল দিয়ে, দাড়িমের ফুল দিয়ে, সিঁদুর দিয়ে, সাতটি রত্ন দিয়ে, চক্রে একেছি আঙিনায়। 'পুতেছি হলদে কাপড়ের ধ্বজাগুদলি, থালায় রেখেছি মালাচন্দন, জ্বালিয়েছি বাতি। স্নানের পর কাপড় পরেছি ধানের অঙ্কুরের রঙ, চাঁপার রঙের ওড়না। পূর্ব দিকে আসন করে সমস্ত রাত ধ্যান করেছি তাঁর মূর্তি। ষোলোটি সোনারি সূতোয় ষোলোটি গ্রন্থি দিয়ে রাখী পরেছি বাঁ হাতে।

মা। আচ্ছা, তবে নাচো তোমার সেই আহবানের নাচ—প্রদক্ষিণ করো। আমি বেদীর কাছে মন্ত্র পড়ছি।

প্রকৃতি।

গান

মম রুদ্ধ মৃকুলদলে এসো
সৌরভ-অমৃতে।
মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো
গৌরবানিশীথে।
এই মূল্যহারা মম শ্রুতি,
এসো মৃগাকণায় তুমি মৃতি।
মম মৌনীর বীণার তারে তারে
এসো সংগীতে।
নব অরুণের এসো আহবান—
চিররজনীর হোক অবসান, এসো।
এসো শ্রুভস্মিত শ্রুকতারায়,
এসো শিশির-অশ্রুধারায়,
সিন্দূর পরাও উষারে
তব রশ্মিতে।

মা। প্রকৃতি, এইবার তোমার আয়নাটা নিয়ে দেখো। দেখছ—কালো ছায়া পড়েছে বেদীটার উপরে? আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, পারছি নে। দেখো আয়নাটা—আর কত দেরি।

প্রকৃতি। না, দেখব না, দেখব না, আমি শূন্য মনের মধ্যে—ধ্যানের মধ্যে। হঠাৎ সামনে দেখব যদি দেখা দেন। আর-একটু সয়ে থাকো মা—দেবেন দেখা, নিশ্চয় দেবেন। ঐ দেখো, হঠাৎ এল ঝড়, আগমনীর ঝড়, পদভরে পৃথিবী কাঁপছে থরথরিয়ে, বুক উঠছে গুরুগুরু করে।

মা। আনছে তোর অভিশাপ হতভাগিনী। আমাকে তো মেরে ফেললে! ছিঁড়ল বৃষ্টি শিরাগুলো।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে। ভাঙল দরজা, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে। ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে দুলছে আমার প্রাণ। ও আমার সর্বনাশ, ও আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ—আমার সমস্ত অপমানের চূড়ায় তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন। আমার লজ্জা দিয়ে, ভয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে।

মা। সময় হয়ে আসছে আমার। আর পারছি নে। শিগ্গির দেখ্ তোর আয়নাটা।

প্রকৃতি। মা, ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে—তার পরে? তার পরে কী। শূন্য এই আমি! আর কিছ্ না! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে? শূন্য আমি? কিসের জন্যে এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শূন্য এই আমাতে!

গান

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়,
কী আছে শেষে।
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে।
ঢেউ ওঠে-পড়ে কাঁদার,
সম্মুখে ঘন অধার—
পার আছে কোন্ দেশে।
আজ ভাবি মনে মনে,
মরীচিকা-অন্বেষণে

বুঝি তুষার শেষ নেই—
মনে ভয় লাগে সেই,
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে।

মা। ও নিষ্ঠুর মেয়ে, দয়া কর্ আমাকে। আমার আর সহ্য হয় না। শিগ্গির আয়নাটা দেখ্।
প্রকৃতি। (আয়নাটা দেখেই ফেলে দিল) মা, ওমা, ওমা, রাখ্ রাখ্ রাখ্ রাখ্, ফিরিয়ে নে,
ফিরিয়ে নে তোর মন্দ্র! এখনি, এখনি। ওরে ও রাক্ষুসী, কী করলি, কী করলি, তুই মরলি নে
কেন! কী দেখলেম! ওগো, কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শূদ্র নির্মল, সেই সুদূর
স্বর্গের আলো! কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী প্রকান্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে!
মাথা হেঁট করে এল! যাক, যাক, এ-সব যাক (পা দিয়ে মন্দের উপকরণ ভেঙে ছাড়িয়ে ফেললে)—
ওরে, তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান করিস নে বীরের। জয় হোক তাঁর জয় হোক।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে—তাই এত দৃঃখই পেলে—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম
গ্লানি পদাঘাতে দূর করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে
নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে! ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধূলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই
ধূলো-লাগা। আমার মায়্যা-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধূলো সব নেবে মূছে। জয় হোক,
তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।

মা। জয় হোক, প্রভু। আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন
ফুরল ঐখানেই—তোমার ক্ষমার তীরে এসে।

[মৃত্যু]

আনন্দ।

বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহানবো
যোচ্চন্ত সুবুদ্ধবর-গুণলোচনো।
লোকস্ স পাপপিকিলেসঘাতকো।
বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্।



তাসের দেশ : প্রচার-চিত্র

নন্দলাল বসু-অঙ্কিত

তাসের দেশ

প্রকাশ . ১৯৩৩

‘তাসের দেশ’ প্রথম প্রকাশের (ভাদ্র ১৩৪০) পাঁচ বছর পরে বহুল পরিমাণে ‘সংশোধিত ও পরিবর্ধিত’ হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ (মাঘ ১৩৪৫) প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ স্দভাষচন্দ্র বস্দকে উৎসর্গীকৃত। বর্তমানে এই সংস্করণের পাঠই গৃহীত। প্রথম সংস্করণের ‘ভূমিকা’ অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে ‘প্রথম দৃশ্যে’ পরিণত। দ্বিতীয় সংস্করণে একটি চরিত্র, একটি দৃশ্য এবং আটটি গান নতুন সংযোজিত, চারটি গান বর্জিত এবং কোনো কোনো গানের পাঠ পরিবর্তিত এবং সংক্ষেপিত।

‘তাসের দেশ’ গল্পগদ্যের ‘একটা আষাঢ়ে গল্প’ (প্রথম প্রকাশ : সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯) অবলম্বনে রচিত।

উৎসর্গ

কল্যাণীয় শ্রীমান স্ভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার
পদ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে
তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।

শান্তিনিকেতন
মাঘ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থর বায়ু বয় বেগে,
চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল---
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
শৃঙ্খলে বারবার
ঝন্ঝন্ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—
বন্ধন দ্বর্বীর সহ্য না হয় আর,
টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
গণি গণি দিন খন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, যাই কি নাহি যাই রে।
সংশয়পারাবার
অন্তরে হবে পার,
উদ্বেগে তাকায়ে না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল,
উদ্দাম জটাজাল,
ঝড়ে হয় লুপ্তিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত,
তালে তার দিয়ো তাল,
জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

প্রথম দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। আর তো চলছে না বন্ধু।

সদাগর। কিসের চাণ্ডাল্য তোমার রাজকুমার।

রাজপুত্র। কেমন করে বলব। কিসের চাণ্ডাল্য বলো দেখি ঐ হাঁসের দলের, বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে।

সদাগর। সেখানে যে ওদের বাসা।

রাজপুত্র। বাসা যদি, তবে ছেড়ে আসে কেন। না না, ওড়বার আনন্দ, অকারণ আনন্দ।

সদাগর। তুমি উড়তে চাও?

রাজপুত্র। চাই বৈকি।

সদাগর। বন্ধুতেই পারি নে তোমার কথা। আমি তো বলি অকারণ ওড়ার চেয়ে সকারণ খাঁচায় বন্ধ থাকাও ভালো।

রাজপুত্র। সকারণ বলছ কেন।

সদাগর। আমরা যে সোনার খাঁচায় থাকি শিকলে বাঁধা দানাপানির লোভে।

রাজপুত্র। তুমি বন্ধুতে পারবে না, বন্ধুতে পারবে না।

সদাগর। আমার ও দোষটা আছে, যা বোঝা যায় না তা আমি বন্ধুতেই পারি নে। একটু স্পষ্ট করেই বলো-না, কী তোমার অসহ্য হল।

রাজপুত্র। রাজবাড়ির এই একঘেয়ে দিনগুলো।

সদাগর। একঘেয়ে বল তাকে? কত রকম আয়োজন, কত উপকরণ।

রাজপুত্র। নিজেকে মনে হয় যেন সোনার মন্দিরে পাথরের দেবতা। কানের কাছে কেবল একই আওয়াজে বাজছে শঙ্খ কাঁসের ঘণ্টা। নৈবেদ্যের বাঁধা বরান্দ, কিন্তু ভোগে রুচি নেই। এ কি সহ্য হয়।

সদাগর। আমাদের মতো লোকের তো খুবই সহ্য হয়। ভাগ্যিস বাঁধা বরান্দ। বাঁধন ছিঁড়লেই তো মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হয়। যা পাই তাতেই আমাদের ক্ষুধা মেটে। আর, যা পাও না তাই দিয়েই তোমরা মনে মনে ক্ষুধা মেটাতে চাও।

রাজপুত্র। আর, রোজ রোজ ঐ যে চারণদের স্তব শুনতে হয় একই বাঁধা ছন্দে—সেই শাদুলবিষ্করীড়িত।

সদাগর। আমার তো মনে হয়, স্তব জিনিসটা বারবার যতই শোনা যায় ততই লাগে ভালো। কিছুতেই পুরোনো হয় না।

রাজপুত্র। ঘুম ভাঙতেই সেই এক বৈতালিকের দল। আর, রোজ সকালে সেই এক পুরুত-ঠাকুরের ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ। আর আসতে-যেতে দেখি, সেই বড়ো কণ্ডুকীটা কাঠের পদতুলের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। কোথাও যাবার জন্যে একটু পা বাড়িয়েছি কি 'অমনি কোথা থেকে প্রতিহারী এসে হাজির, বলে—ইত ইতৌ, ইত ইতৌ, ইত ইতৌ। সম্বাই মিলে মনটাকে যেন বুলি-চাপা দিয়ে রেখেছে।

সদাগর। কেন, মাঝে মাঝে যখন শিকারে যাও তখন বুনো জন্তু ছাড়া আর-কোনো উৎপাত তো থাকে না।

রাজপুত্র। বুনো জন্তু বলো কাকে। আমার তো সন্দেহ হয়, রাজশিকারী বাঘগুলোকে আফিম

খাইয়ে রাখে। ওরা যেন অহিংস্রনীতির দীক্ষা নিয়েছে। এ পর্যন্ত একটাকেও তো ভদ্রকম লাফ মারতে দেখলুম না।

সদাগর। যাই বল, বাঘের এই আচরণকে আমি তো অসৌজন্য বলে মনে করি নে। শিকারে যাবার ধুমধামটা সম্পূর্ণই থাকে, কেবল বুক দুর্দুর্ করে না।

রাজপুত্র। সেদিন ভালুকটাকে বহুদূর থেকে তীর বিন্ধেছিলুম, তা নিয়ে চার দিক থেকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল; বললে, রাজপুত্রের লক্ষ্যভেদের কী নৈপুণ্য! তার পরে কানাকানিতে শুনলুম, একটা মরা ভালুকের চামড়ার মধ্যে খড়্‌বিচলি ভরে দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। এতবড়ো পরিহাস সহ্য করতে পারি নি। শিকারীকে কারাদণ্ডের আদেশ করে দিয়েছি।

সদাগর। তার উপকার করেছে। তার সে কারাগারটা রানীমার অন্তরমহলের সংলগ্ন, সে দিবা সন্ধ্যা আছে। এই তো সেদিন, তার জন্য তিন মন ঘি আর তেত্রিশটা পাঁঠা পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের গদি থেকে।

রাজপুত্র। এর অর্থ কী।

সদাগর। সে ভালুকটার সৃষ্টি যে রানীমারই আদেশে।

রাজপুত্র। ঐ তো। আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াজালে। নিরাপদের খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আগাগোড়া সবই অভিনয়। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে। আমার এই রাজসাজ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ঐ যে ফসলখেতে ওদের চাষ করতে দেখি, আর ভাবি, পূর্বপুরুষের পুণ্যে ওরা জন্মেছে চাষী হয়ে।

সদাগর। আর ওরা তোমার কথা কী ভাবে সে ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখো দেখি। রাজপুত্র, তুমি কী সব বাজে কথা বলছ—মনের আসল কথাটা লুকিয়েছ। ওগো পত্নলেখা, আমাদের রাজপুত্রের গোপন কথাটি হয়তো তুমিই আন্দাজ করতে পারবে, একবার শূন্যে দেখো-না।

পত্নলেখার প্রবেশ

পত্নলেখা।

গান

গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে—

রাজপুত্র।

না না না, রবে না গোপনে।

পত্নলেখা।

বিভল হাসিতে

বাজিল বাঁশিতে,

স্ফূরিল অধরে নিভৃত স্বপনে—

রাজপুত্র।

না না না, রবে না গোপনে।

পত্নলেখা।

মধুপ গুঞ্জরিল,

মধুর বেদনায় আলোক-পিয়াসি

অশোক মৃঞ্জরিল।

হৃদয়শতদল

করিছে টলমল

অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে—

রাজপুত্র।

না না না, রবে না গোপনে।

রাজপুত্র। আছে আমার গোপন কথা, সে কথাটা গোপন রয়েছে দূরের আকাশে। সমুদ্রের ধারে বসে থাকি পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে। সেইখানে আমার অদৃষ্ট যা যক্ষের ধনের মতো গোপন করে রেখেছে যাব তারই সম্মানে।

গান

যাবই আমি যাবই ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীয়ে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীয়ে পাবই।

সদাগর। ও কী কথা। বাণিজ্য? ও যে তুমি সদাগরের মন্ত্র আওড়াচ্ছ।
রাজপুত্র।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
বিরাত কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
সোনার বালুর তীরে।

সদাগর। অকূলের নাবিকগিরি করে নিরুদ্দেশ হওয়া, এ তো বাণিজ্যের রাস্তা নয়। খবর
কিছু পেয়েছ কি।

রাজপুত্র। পেয়েছি বৈকি। পেয়েছি আভাসে, পেয়েছি স্বপ্নে।
নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগরবিহংগেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সাত রাজার ধন মানিক পাবই
সেথায় নামি যদি।

সদাগর। তোমার গানের সুরে বোঝা যাচ্ছে, এ মানিকটি তো সদাগরি মানিক নয়, এ মানিকের
নাম বলো তো।

রাজপুত্র। নবীনা! নবীনা!

সদাগর। নবীনা! এতক্ষণে একটা স্পষ্ট কথা পাওয়া গেল।

রাজপুত্র। স্পষ্ট হয়ে রূপ নিতে এখনো দেরি আছে।

গান

হে নবীনা, হে নবীনা।
প্রতিদিনের পথের ধূলায় যায় না চিনা।
শূনি বাণী ভাসে
বসন্তবাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা।

সদাগর। তোমার এ স্বপ্নের ধন কিন্তু সংগ্রহ করা শক্ত হবে।
রাজপুত্র।

স্বপ্নে দাও ধরা
কী কৌতুকে ভরা।
কোন্ অলকার ফুলে
মালা গাঁথ চুলে,
কোন্ অজানা সুরে
বিজনে বাজাও বীণা।

রাজমাতার প্রবেশ

সদাগর। রানীমা, উনি মরীচিকাকে জাল ফেলে ধরবেন, উনি রূপকথার দেশের সন্ধান পেতে চান।

মা। সে কী কথা। আবার ছেলেমানুষ হতে চাস নাকি।

রাজপুত্র। হাঁ মা, বড়োমানুষের সুবৃন্দ্বি-ঘেরা জগতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

মা। বুদ্ধোচ্ছি বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তুমি চাইতে চাও, আজ পর্যন্ত সে সুযোগ তোমার ঘটে নি।

রাজপুত্র।

গান

আমার মন বলে, 'চাই চাই গো
যারে নাহি পাই গো।'

সকল পাওয়ার মাঝে

আমার মনে বেদন বাজে,
'নাই নাই নাই গো।'

হারিয়ে যেতে হবে,

ফিরিয়ে পাব তবে,

সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে

ভোরের তারায় জাগবে ব'লে,

বলে সে, 'যাই যাই যাই গো।'

মা। বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না আরামের বোঝা, সইতে পারবে না সেবার বন্ধন। আমি ভয় করে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাব শ্বেতকরবীর গুচ্ছ। যাই কুলদেবতার পূজো সাজাতে। সন্ধ্যার সময় আরাতির কাজল পরাব চোখে। পথে দৃষ্টির বাধা যাবে কেটে।

[রাজমাতার প্রস্থান]

রাজপুত্র।

গান

হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া

বাতাস বহে বেগে।

সূর্য যেথায় অস্তে নামে

ঝিলিক মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,

ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,

যদি কোথাও কূল নাহি পাই

তল পাব তো তব্দ।

ভিটার কোণে হতাশ মনে
রইব না আর কভু।

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শূন্য একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে
যাব স্বর্গে স্বর্গপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ণ ধন যত—
ভিখারী মন ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। এক ডাঙা থেকে দিলেম পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলেম আর-এক ডাঙায়। এতদিন পরে মনে হচ্ছে, জীবনে নতুন পর্ব শুরুর হল।

সদাগর। রাজপুত্র, তুমি তো কেবলই নতুন নতুন করে অস্থির হলে। আমি ভয় করি ঐ নতুনকেই। যাই বল বন্ধু, পুরোনোটা আরামের।

রাজপুত্র। ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োয় মধ্যে। এটা বদলে না, উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন।

সদাগর। রাজতিলক তোমার ললাটে তো নিয়েই এসেছ জন্মমুহূর্তে।

রাজপুত্র। সে তো অদৃষ্টের ভিক্ষেদানের ছাপ। যমরাজ মহাসমুদ্রের জলে সেটা কপাল থেকে মদুছে দিয়ে হুকুম করেছেন, নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে, নতুন দেশে।—

গান

এলেম নতুন দেশে
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে অপূর্ণ কোন্ আশা,
বোনাবে রঙিন স্নাতোয় দঃখস্নাতের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে।
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।

যৌবনেরই নবোচ্ছ্বাসে
 ফাগুন মাসে
 বাজবে নৃপদূর ঘাসে ঘাসে,
 মাতবে দাখিনবায়
 মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়
 চঞ্চলিত এলোকেশে।

সদাগর। রাজপুত্র, তোমার গানের সুরে কথাটা শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে যৌবনের নবীন রূপ দেখলে কোথায়। চারি দিকটা তো একবার ঘুরে এসেছি। দেখে মনে হল, যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকো পিঠে চ্যাপটা, পা ফেলছে খিট্‌খুট্‌ খিট্‌খুট্‌ শব্দে, বোধ করি চৌকুনি নৃপদূর পরেছে পায়ে, তৈরি সেটা তেঁতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ।

রাজপুত্র। এর থেকেই বুঝবে, জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলস। আমরা এসেছি কী করতে—খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।

সদাগর। আমরা সদাগর মানুষ, যা পণ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর, যা দেখতে পাও না তারই উপর তোমাদের বিশ্বাস। আচ্ছা, দেখা যাক, ছাইয়ের মধ্যে থেকে আগুন বেরোয় কি না। আমার তো মনে হয়, ফুঁ দিতে দিতে দম ফুঁরিয়ে যাবে। ঐ দেখো-না, এই দিকেই আসছে—এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য।

রাজপুত্র। একটু সরে দাঁড়ানো যাক। দেখি-না কান্ডটা কী।

তাসের দলের প্রবেশ
 তাসের কাওয়াজ
 গান
 তোলন নামন,
 পিছন সামন,
 বাঁয়ে ডাইনে
 চাই নে চাই নে,
 বোসন ওঠন,
 ছড়ান গুটন,
 উলটো-পালটা
 ঘূর্ণি চালটা—
 বাস্ বাস্ বাস্।

সদাগর। দেখছ ব্যাপারটা! লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, শুচ্ছে বসছে, একেবারে অকারণে—ভারি অশুভ। হা হা হা হা।

ছক্কা। এ কী ব্যাপার! হাসি!

পজ্জা। লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!

ছক্কা। নিয়ম মান না তোমরা! হাসি!

রাজপুত্র। হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু, তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছক্কা। অর্থ? অর্থের কী দরকার। চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পার না। পাগল নাকি তোমরা!

রাজপুত্র। খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কী করে।

পঞ্জা। চালচলন দেখে।

রাজপুত্র। কী রকম দেখলে।

ছক্কা। দেখলেম, কেবল চলনটাই আছে তোমাদের, চালটা নেই।

সদাগর। আর, তোমাদের বদ্বি চালটাই আছে, চলনটা নেই?

পঞ্জা। জান না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপোগন্ড, অব্যচীন, অজাতশ্মশ্রু।

ছক্কা। গুরুদ্বন্দ্ব্যয়ের হাতে মানুষ হও নি। কেউ বদ্বিয়ে দেয় নি, রাস্তায় ঘাটে খানা আছে, ডোবা আছে, কাঁটা আছে, খোঁচা আছে—চলন জিনিসটার আপদ বিস্তর।

রাজপুত্র। এ দেশটা তো গুরুদ্বন্দ্ব্যয়েরই দেশ। শরণ নেব তাঁদের।

ছক্কা। এবার তোমাদের পরিচয়টা?

রাজপুত্র। আমরা বিদেশী।

পঞ্জা। বাস্। আর বলতে হবে না। তার মানে, তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোষ্ঠ নেই, গাঁই নেই, জাত নেই, গুরুটি নেই, শ্রেণী নেই, পণ্ডিত নেই।

রাজপুত্র। কিছু নেই, কিছু নেই—সব বাদ দিয়ে এই যা আছে, দেখছই তো। এখন তোমাদের পরিচয়টা?

ছক্কা। আমরা ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়। আমি ছক্কা শর্মণ।

পঞ্জা। আমি পঞ্জা বর্মণ।

রাজপুত্র। ঐ যারা সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে?

ছক্কা। কালো-হানো, ঐ তিরি ঘোষ।

পঞ্জা। আর, রাঙা-মতো, এই দূর দাস।

সদাগর। তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছক্কা। রক্ষা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন, পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।

পঞ্জা। এই কারণে কোনো কোনো ম্লেচ্ছভাষায় আমাদের তাসবংশীয় না বলে হাই-বংশীয় বলে।

সদাগর। আশ্চর্য।

ছক্কা। শুভ গোদ্বলিলগ্নে পিতামহ চার মুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই।

সদাগর। বাস্ রে। ফল হল কী।

ছক্কা। বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ করে ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, চিঁড়েতন। এঁরা সকলেই প্রণম্য। (প্রণাম)

রাজপুত্র। সকলেই কুলীন?

ছক্কা। কুলীন বৈকি। মদ্য কুলীন। মদ্য থেকে উৎপত্তি।

পঞ্জা। তাসবংশের আদিকবি ভগবান তাসরঙ্গনিধি দিনের চার প্রহর ঘুমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে প্রথম যে ছন্দ বানালেন সেই ছন্দের মাতা গুনে গুনে আমাদের সাড়ে-সাঁইশ রকমের পদ্ধতির উদ্ভব।

রাজপুত্র। অন্তত তার একটাও তো জানা চাই।

পঞ্জা। আচ্ছা, তা হলে মদ্য ফেরাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম। ভাই ছক্কা, ঠুং মন্ত্র পড়ে ওদের কানে একটা ফু দিয়ে দাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম।

তাসের দলের গান
 হা-আ-আ-আই।
 হাতে কাজ নাই।
 দিন যায় দিন যায়।
 আয় আয় আয় আয়।
 হাতে কাজ নাই।

রাজপুত্র। আর সহ্য করতে পারছি নে, মুখ ফেরাতে হল।

পঞ্জা। এঃ! ভেঙে দিলে মন্দির! অশ্রুচি করে দিলে!

রাজপুত্র। অশ্রুচি?

পঞ্জা। অশ্রুচি নয় তো কী। মন্দিরের মাঝখানটায় বিদেশীর দৃষ্টি পড়ল।

রাজপুত্র। এখন উপায়?

ছক্কা। বাদুড়ে-খাওয়া গাবের আঁটি পুড়িয়ে তিন দিন চোখে কাজল পরতে হবে, তবেই স্বর্গে পিতামহদের উপোস ভাঙবে।

রাজপুত্র। বিপদ ঘটিয়েছি তো। তোমাদের দেশে খুব সাবধানে চলতে হবে।

ছক্কা। একেবারে না চললেই ভালো হয়, শ্রুচি থাকতে পারবে।

রাজপুত্র। শ্রুচি থাকলে কী হয়।

পঞ্জা। কী আর হবে, শ্রুচি থাকলে শ্রুচি হয়। বদ্বতে পারছ না?

রাজপুত্র। আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ পাড়ির উপরে কী করছিলে দল বেঁধে।

ছক্কা। যুদ্ধ।

রাজপুত্র। তাকে বল যুদ্ধ?

পঞ্জা। নিশ্চয়! অতি বিশুদ্ধ নিয়মে। তাসবংশোচিত আচার-অনুসারে।

গান

আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র,
 অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র।

সদাগর। তা হোক। যুদ্ধে একটু রাগারাগি না হলে রস থাকে না।

ছক্কা। আমাদের রাগ রঙে।

আমাদের যুদ্ধ—

নহে কেহ ক্রুদ্ধ,
 ওই দেখো গোলাম
 অতিশয় মোলাম।

সদাগর। তা হোক-না, তবু কামান-বন্দুকটা যুদ্ধক্ষেত্রে মানায় ভালো।

পঞ্জা।

নাহি কোনো অস্ত্র,
 খারকি-রাঙা বস্ত্র।
 নাহি লোভ,
 নাহি ক্লেভ,
 নাহি লাফ,
 নাহি ঝাঁপ।

রাজপুত্র। নাই রইল, তবু একটা নালিশ থাকা চাই তো। তাই নিয়েই তো দুই পক্ষে লড়াই।

ছক্কা।

যথারীতি জানি,
সেইমতে মানি,
কে তোমার শত্রু, কে তোমার मित्र,
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা।

পঞ্জা। ওহে বিদেশী, শাস্ত্রমতে তোমাদেরও তো একটা উৎপত্তি ঘটেছিল?

সদাগর। নিশ্চিত। পিতামহ রক্ষা সৃষ্টির গোড়াতেই সূর্যকে যেই শানে চাঁড়িয়েছেন অমনি তাঁর নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তিনি কামানের মতো আওয়াজ করে হেঁচে ফেললেন—সেই বিশ্ব-কাঁপানি হাঁচি থেকেই আমাদের উৎপত্তি।

ছক্কা। এখন বোঝা গেল! তাই এত চণ্ডল!

রাজপুত্র। স্থির থাকতে পারি নে, ছিটকে ছিটকে পড়ি।

পঞ্জা। সেটা তো ভালো নয়।

সদাগর। কে বলছে ভালো। আদিযুগের সেই হাঁচির তাড়া আজও সামলাতে পারছি নে।

ছক্কা। একটা ভালো ফল দেখতে পাচ্ছি—এই হাঁচির তাড়ায় তোমরা সকাল-সকাল এই দ্বীপ থেকে ছিটকে পড়বে, টিকতে পারবে না।

সদাগর। টেকা শক্ত।

পঞ্জা। তোমাদের যুদ্ধাটা কী ধরনের।

সদাগর। সেটা দুই-দুই পক্ষের চার-চার জোড়া হাঁচির মাপে।

ছক্কা। হাঁচির মাপে? বাস্ রে, তা হলে মাথা ঠোকাঠুঁকি হবে তো!

সদাগর। হাঁ, একেবারে দমাদম।

ছক্কা। তোমাদেরও আদিকবির মন্ত্র আছে তো?

সদাগর। আছে বৈকি।

গান

হাঁচ্ছোঃ,

ভয় কী দেখাচ্ছ।

ধরি টিপে টুঁটি,

মুখে মারি মূঠি,

বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ।

ছক্কা। ওহে ভাই পঞ্জা, একেবারে অসবর্ণ। কী জাতি তোমরা।

সদাগর। আমরা নাশক, নাসা থেকে উৎপন্ন।

পঞ্জা। কোনো উচ্চবংশীয় জাতির অমনতরো নাম তো শুনিনি নি।

সদাগর। হাইয়ের বাষ্প তোমরা উড়ে গেছ উচ্ছে, পরলোকের পারে; হাঁচির চোটে আমরা পড়েছি নীচে, এই ইহলোকের ধারে।

ছক্কা। পিতামহের নাসিকার অসংখ্যমবশতই তোমরা এমন অশুভ।

রাজপুত্র। এতক্ষণে ঠিক কথাটাই বেরিয়েছে তোমার মুখ থেকে, আমরা অশুভ।

গান

আমরা নতুন যৌবনেরই দূত,

আমরা চণ্ডল, আমরা অশুভ।

আমরা বেড়া ভাঙি,

আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,

ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই
 আমরা বিদ্যুৎ।
 আমরা করি ভুল।
 অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
 যুঝিয়ে পাই কূল।
 যেখানে ডাক পড়ে
 জীবন-মরণ-ঝড়ে
 আমরা প্রস্তুত।

ছক্কা-পজা। (পরস্পর মুখ চেয়ে) এ চলবে না, এ চলবে না।
 রাজপুত্র। যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।
 ছক্কা। কিন্তু নিয়ম!
 রাজপুত্র। বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোব
 কী করে।
 পজা। ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে! অম্লানমুখে বলে বসল, এগোব।
 রাজপুত্র। নইলে চলা কিসের জন্যে।
 ছক্কা। চলা! চলবে কেন তুমি! চলবে নিয়ম।

গান
 চলো নিয়ম-মতে।
 দূরে তাকিয়ো নাকো,
 ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,
 চলো সমান পথে।
 রাজপুত্র। হেরো অরণ্য ওই,
 হোথা শৃংখলা কই,
 পাগল ঝরনাগুলো
 দক্ষিণ পর্বতে।
 তাসের দল। ওদিক চেয়ো না চেয়ো না,
 যেয়ো না যেয়ো না—
 চলো সমান পথে।

পজা। আর নয়, ঐ আসছেন রাজাসাহেব, আসছেন রানীবিবি। এইখানে আজ সভা। এই
 নাও ভুইকুমড়োর ডাল একটা ক'রে।
 রাজপুত্র। ভুইকুমড়োর ডাল? হা হা হা হা—কেন।
 পজা। চুপ। হেসো না, নিয়ম। বোসো ঈশান কোণে মুখ ক'রে, খবরদার বায়ুকোণে মুখ
 ফিরিয়ে না।
 রাজপুত্র। কেন।
 ছক্কা। নিয়ম।

রাজা রানী টেক্কা গোলাম প্রভৃতির
 যথারীতি যথার্ভাগে প্রবেশ

রাজপুত্র। ওহে ভাই, স্তবগান করে রাজাকে খুশি করে দিই। তুমি ভুইকুমড়োর ডালটা
 দোলাও।

গান

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস,
তন্দ্রাতীরনিবাসী,
সব-অবকাশ ধ্বংস।

তাসের দল। ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা! অকালে সভা দিলে ভেঙে, বর্বর!
রাজা। শান্ত হও, এরা কারা।
ছক্কা। বিদেশী।

রাজা। বিদেশী! তা হলে নিয়ম খাটবে না। একবার সকলে ঠাই বদল করে নাও, তা হলেই দোষ যাবে কেটে। সর্বাগ্রে তাস-মহাসভার জাতীয় সংগীত।

সকলে।

গান

চিঁড়েতন, হতর্ন, ইস্কাবন—

অতি সনাতন ছন্দে
করতেছে নর্তন

চিঁড়েতন হতর্ন।

কেউ বা ওঠে কেউ পড়ে,
কেউ বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শূয়ে শূয়ে ভূয়ে
করে কালকর্তন।

নাহি কহে কথা কিছু,
একটু না হাসে,
সামনে যে আসে
চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোনো উলটা-পালটা,
নাই পরিবর্তন।

রাজা। ওহে বিদেশী।

রাজপুত্র। কী রাজাসাহেব।

রাজা। কে তুমি।

রাজপুত্র। আমি সমুদ্রপারের দূত।

গোলাম। ভেট এনেছ কী।

রাজপুত্র। এ দেশে সব চেয়ে যা দুর্লভ, তাই এনেছি।

গোলাম। সেটা কী শূনি।

রাজপুত্র। উৎপাত।

ছক্কা। শূনলে তো রাজাসাহেব, কথাটা তো শূনলে? লোকটা এগোতে চায়, বললে বিশ্বাস করবে না, লোকটা হাসে। দুর্দিনে এখানকার হাওয়া দেবে হালকা করে।

গোলাম। এখানকার হাওয়া যেমন স্থির, যেমন ভারী, এমন কোনো গ্রহে নেই। ইন্দ্রের বিদ্যুৎ পর্যন্ত একে নাড়া দিতে পারে না, অন্যে পরে কা কথা।

সকলে। (একবাক্যে) অন্যে পরে কা কথা।

গোলাম। লঘুচিন্ত বিদেশী এই হাওয়াকে যদি হালকা করে তা হলে কী হবে।

রাজা। সেটা চিন্তার বিষয়।

সকলে। সেটা চিন্তার বিষয়।

গোলাম। হালকা হাওয়াতেই ঝড় আসে। ঝড় এলেই নিয়ম যায় উড়ে। তখন আমাদের পুরুত-ঠাকুর নহলা গোস্বামী পর্যন্ত বলতে শুরু করবেন, আমরা এগোব।

পঞ্জা। এমন-কি, ভগবান না করুন, হয়তো এখানে হাসিটা সংক্রামক হয়ে উঠবে।

রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম। কী রাজাসাহেব।

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা। তোমার পক্ষে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম। দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

রাজা। সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সহ্য না।

গোলাম। বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা। ওটা আবার কী বললে! বাধ্যতামূলক আইন!

গোলাম। কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

রাজা। আচ্ছা, পরে হবে। বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে?

রাজপুত্র। আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়।

রাজা। কার কাছে।

রাজপুত্র। এই রাজকুমারীদের কাছে।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

রাজপুত্র।

গান

ওগো, শান্ত পাষণমুরতি সুন্দরী,
চঞ্চলে হৃদয়তলে লও বরি।

কুঞ্জবনে এসো একা,
নয়নে অশ্রু দিক দেখা,
অরুণরাগে হোক রঞ্জিত

বিকশিত বেদনার মঞ্জরী।

রানী। এ কী অনিয়ম, এ কী অবিচার।

পঞ্জা। রাজাসাহেব, নির্বাসন, ওকে নির্বাসন!

রাজা। নির্বাসন! রানীবিবি, তোমার কী মত। চূপ করে রইলে যে। শুনছ আমার কথা? একটা উত্তর দাও। কী বল, নির্বাসন তো?

রানী। না, নির্বাসন নয়।

টেকাকুমারীরা। (একে একে) না, নির্বাসন নয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমাকে যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

রানী। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কেমন-কেমন।

গোলাম। টেক্কাকুমারী, বিবিসুন্দরী, মনে রেখো, আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসম্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

গোলাম। জারি করো বাধ্যতামূলক আইন।

রাজা। অর্থাৎ?

গোলাম। কানমলা মোচড়ের আইন।

রাজা। বদ্বোঁছ। রানীবিবি, তোমার কী মত। বাধ্যতামূলক আইন এবার তবে চালাই?

রানী। বাধ্যতামূলক আইন অন্তরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি—দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন।

টেক্কাকুমারীরা। (সকলে) আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।

গোলাম। এ কী হল। হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি।

রাজা। সভা ভেঙে দিলুম। এখনি সবাই চলে এসো। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

[তাসের দলের প্রস্থান]

সদাগর। ভাই সাঙাত, এখানে তো আর সহ্য হচ্ছে না। এরা যে বিধাতার ব্যঙ্গ। এদের মধ্যে পড়ে আমরা সুন্দর মাটি হয়ে যাব।

রাজপুত্র। ভিতরে ভিতরে কী ঘটছে, সেটা কি তোমার চোখে পড়ে না। পদতুলের মধ্যে প্রথম প্রাণের সঞ্চার কি অনুভব করছ না। আমি তো শেষ পর্যন্ত না দেখে যাচ্ছি নে।

সদাগর। কিন্তু, এ যে জীবন্মূর্তের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন।

রাজপুত্র। ঐ দিকে চোখ মেলে দেখো দেখি।

সদাগর। তাই তো বন্ধু, লেগেছে সমুদ্রপারের মন্ত্র। ইস্কাবনের নহলা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে—দেখাচ্ছি এখানকার নিয়ম গেল উড়ে।

রাজপুত্র। চিঁড়েতনীর পায়ের শব্দ শুনছে আকাশ থেকে। এ সময়ে বোধ হয় আমাদের সঙ্গটা ওর পছন্দ হবে না। চলো, আমরা সরে যাই।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রসাধনে রত ইস্কাবনী। টেক্কাণীর প্রবেশ

টেক্কাণী।

গান

বলো, সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
যে নাম বাজে তোমার বীণার তানে তানে।
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
সে নাম মিলে যাবে,
বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়
সে নাম মদির হবে-যে বকুলঘ্রাণে।
নাহয় সখীদের মুখে মুখে
সে নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উতলা হবে
সে নাম শুনাইব গানে গানে।

ইস্কাবনী। ভাই, এ কী হল বলো তো এই তাসের দেশে। ঐ বিদেশীরা কী খ্যাপামির হাওয়া নিয়ে এল। মনটা কেবলই টলমল করছে।

টেক্কানী। হাঁ ভাই ইস্কাবনী, আর দুদিন আগে কে জানত তাসেরা আপন জাত খুইয়ে ঠিক যেন মানুষের মতো চালচলন ধরবে। ছি ছি, কী লজ্জা।

ইস্কাবনী। বলো তো ভাই, মানুষপনা, এ-যে অনাচার। এ কিন্তু শুরু করেছে তোমাদের ঐ হরতনী। দেখিস নি, আজকাল ওর চলন ঠিক থাকে না, একেবারে হুবহু মানুষের ভঙ্গি। কার পাশে কখন দাঁড়াতে হবে তারও সমস্ত ভুল হয়ে যায়, পাড়ায় টি টি পড়ে গেছে। তাসের দেশের নাম ডোবালে।

চিঁড়েতনীর প্রবেশ

চিঁড়েতনী। কী গো টেক্কাঠাকরুন, শুনছি আমাদের নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। বলছ, আমরা আচার খুইয়ে, ওঠবার বেলায় বসি, বসবার বেলায় উঠি।

টেক্কানী। তা সত্যি কথা বলেছি, দোষ হয়েছে কী। ঐ যে তোমার গাল দুটি টুকটুক করছে, রঞ্জিনী, সে কোন্ রঙে। আর, ঐ যে তোমার ভুরুর ভঙ্গিমা, ধার করেছে কোন্ বিদেশী অমাবস্যার কাজললতা থেকে। এটা তো সাতজন্মে তাসের দেশের শাস্তরে লেখে না। তুমি কি ভাব, এ কারো চোখে পড়ে না।

চিঁড়েতনী। মরে যাই! আর, তুমি যে তোমার ঐ সখীটিকে নিয়ে বকুলতলায় বসে দিনরাত কানে কানে ফিস্-ফিস্ করছ, এটাই কি তাসের দেশের শাস্ত্রে লেখে না কি। ওদিকে যে গোলাম বেচারী তার জুড়ি পায় না, মরে হায়-হায় ক'রে।

ইস্কাবনী। আহা গুরুঠাকরুন, উপদেশ দিতে হবে না। চুলে যে রাঙা ফিতেটা জড়িয়েছ ঐ ফিতে দিয়ে তাসের দেশের আচার বিচার গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। এতবড়ো বেহায়াগিরি তাস-রমণী হয়ে!

চিঁড়েতনী। তা হয়েছে কী। আমি ভয় করি নে কাউকে, তোমাদের মতো লুকোচুরি আমার স্বভাব নয়। ঐ যে তোমাদের দহলানী সেদিন আমাকে মানবী বলে টিট্কারি দিতে এসেছিল, আমি তাকে পষ্ট জবাব দিয়েছি, তোমাদের তাসিনী হয়ে মরে থাকার চেয়ে মানবী হতে পারলে বেঁচে যেতুম।

ইস্কাবনী। অত গুমোর কোরো না গো কোরো না। জান, তোমাকে জাতে ঠেলবে বলে কথা উঠেছে?

চিঁড়েতনী। তাসের জাত তো, আমি তা নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমাকে ভয় দেখাবে কিসে।

ইস্কাবনী। সর্বনাশ! এমন ধাণ্টামির কথা তো সাত জন্মে শুনিনি। উনি ঢাক পিটিয়ে মানবী হতে চলেছেন। চল্ ভাই টেক্কারানী, কে কোথা থেকে দেখবে ওর সঙ্গে কথা ক'ছি, আমাদের সন্দেহ মজাবে।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীমতী হরতনী টেক্কার প্রবেশ

হরতনী।

গান

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,
জানি নে কী ছিল মনে।
এ তো ফুল তোলা নয়, এ তো ফুল তোলা নয়,
বুঝি নে কী মনে হয়,
জল ভরে যায় দূ নয়নে।

রুইতনের সাহেবের প্রবেশ

রুইতন। এ কী, হরতনী তুমি এখানে? খুঁজতে খুঁজতে বেলা হয়ে গেল যে।
হরতনী। কেন, কী হয়েছে, কী চাই।
রুইতন। তোমাকে ডাক পড়েছে রাজসভার গরাবদুন্ডলে।
হরতনী। বলো গে, আমি হারিয়ে গেছি।
রুইতন। হারিয়ে গেছ?
হরতনী। হাঁ, হারিয়ে গেছি, যাকে খুঁজছ তাকে আর খুঁজে পাবে না, কোনোদিনই।
রুইতন। এ কী কান্ড। এ কী দুঃসাহস। এই বনে এসেছ তুমি? জান না—নিয়ম নেই?
হরতনী। নিয়ম তো নেই, কিন্তু কার নিয়মে বর্ষাবিহীন তাসের দেশে আজ এমন ঘনঘটা।
হঠাৎ সকালে উঠেই দেখি, নীল মেঘ আকাশ জুড়ে। এতদিন তোমাদের দেশের ময়ূর গুনে গুনে
পা ফেলত, নাচত সাবধানে, আজ কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল, সমস্ত পেখম ছাড়িয়ে দিয়ে।
রুইতন। কিন্তু, ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ, সেও আজ ফুল তুলতে বেরিয়েছে—এতবড়ো
অদ্ভুত কাজ তোমার মাথায় এল কী করে।
হরতনী। হঠাৎ মনে হল আমি মালিনী, আর-জন্মে ফুল তুলতেম। আজ পূবে হাওয়ায় সেই
জন্মের ফুলবাগানের গন্ধ এল। সেই জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্‌ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।

রুইতন। আচ্ছা, গরাবদুন্ডলের জন্যে বিবিসুন্দরীদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, তারাও কি তবে—
হরতনী। হাঁ, তারাও এইখানেই, নদীর ধারে ধারে, গাছের তলায় তলায়।
রুইতন। কী করছে।
হরতনী। সাজ বদল করছে, আমারই মতো। কেমন দেখাচ্ছে। পছন্দ হয়?

রুইতন। মনে হচ্ছে পর্দা খুলে গেছে, চাঁদের থেকে মেঘ গেছে সরে, একেবারে নতুন মানুষ।
 হরতনী। তোমাদের ছক্কা-পঞ্জা আমাদের শাসাবার জন্যে এসেছিলেন, তাঁদের কী দশা হয়েছে দেখো গে যাও।

রুইতন। কেন। কী হল।

হরতনী। খ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, এমন-কি, গদ্ন-গদ্ন করে গানও করছে।

রুইতন। গান! ছক্কা-পঞ্জার গান!

হরতনী। সুরে না হোক বেসুরে। আমি তখন চুল বাঁধাছিলুম। থাকতে পারলুম না, চলে আসতে হল।

রুইতন। আশ্চর্য করলে। চুল বাঁধা! এ বিদ্যে কে শেখালে।

হরতনী। কেউ না। ঐ দেখো-না, এবার হঠাৎ শূন্যে বরনায় নামল বরষা। জলের ধারায় ধারায় শূন্য হল বেণীবন্ধন। এ বিদ্যা কে শেখালো তাকে। চলো আমার সঙ্গে, ছক্কা-পঞ্জার গান শুনিয়ে দিই তোমাকে।

[প্রস্থান]

বিবিদের প্রবেশ

বিবির।

নাচ ও গান

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,
 ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।
 বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে
 হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে
 কেন্দ্রে ফিরে পথহারা রাগিণী।
 কোন্ বসন্তের মিলন রাতে তারার পানে
 ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।

[প্রস্থান]

রুইতন-হরতনীর পুনঃপ্রবেশ

রুইতন। দোষ দেব কাকে। আমারই গাইতে ইচ্ছা করছে।

হরতনী। দেখো, সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, স্তম্ভে চড়াবে। সে দেখলুম ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বনের খবর নিতে।

রুইতন। দেখো হরতনী, ভয় কিন্তু আমার গেছে ঘুচে, কেন কী জানি। একটা-কিছু হুকুম করো, তোমার জন্যে দুঃসাধ্য কিছু-একটা করতে চাই।

হরতনী। আর যাই কর গান গেলো না, বনে জবা ফুটেছে, তুলে এনে দাও। ফুলের রস দিয়ে রাঙাব পায়ের তলা।

রুইতন। দেখো সুন্দরী, আজ সকালে উঠেই বুঝেছি, আমাদের এই তাসজন্মটা স্বপ্ন। সেটা হঠাৎ ভাঙল। আমাদের আর-এক জন্ম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই বাণী আসছে মুখে। তারই গান শুনছি কানে। ঐ শোনো, ঐ শোনো, আমার সেই যুগের রচিত গান আকাশ থেকে ঐ কে বয়ে আনছে।

গান

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গণ্ঠে দিই প্রাণের অনুরাগে।

হরতনী। এ গান কোনোদিন তুমিই বেঁধেছিলে, আর আমারই জন্যে? কেমন করে বাঁধলে।
রুইতন। যেমন করে তুমি বাঁধলে বেণী।
হরতনী। আচ্ছা, মনে কি আসছে, তোমার গানে আমি নেচেছিলুম কোনো-একটা যুগে।
রুইতন। মনে আসছে, আসছে। এতদিন ভুলে ছিলুম কী করে তাই ভাবি।

গান

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে, দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে।
যদি কাটে রশি,
যদি হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ উঠে উচ্ছ্বসি,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়, নেবই তারে, নেবই তারে জিতে।

রুইতন। দেখো হরতনী, মন ছটফটিয়ে উঠেছে যমরাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ছবি, তুমি পরিয়ে দিলে আমার কপালে জয়ন্তিলক, আমি বেরলুম বন্দিদানীকে উদ্ধার করতে, বন্ধ দুর্গের দ্বারে বাজালুম আমার ভেরী। কানে আসছে বিদায়কালে যে গান তুমি গেয়েছিলে।

গান

বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘ রাত্রি রইব আমি জাগি।
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে
বৃকের মধ্যে উঠবে আমার পরান দু'লে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী।

হরতনী। চলো চলো বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দু'জনে মিলে। দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে কী যেন কালো পাথরের ভ্রুকুটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক। পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বৃক ফাটিয়ে দিয়ে। কী করতে এসেছি এখানে। ছি ছি, কেন আছি এখানে। এ কী অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মৃদুতে মৃদুতে।

রুইতন। সাহস আছে তোমার সুন্দরী?

হরতনী। আছে, আছে।

রুইতন। অজানাকে ভয় করবে না?

হরতনী। না, করব না।

রুইতন। পা ধাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, পথ ফুরোতে চাইবে না।

হরতনী। কোন্ যুগে আমরা চলেছিলাম সেই দুর্গমে। রাতে ধরেছি মশাল তোমার সামনে, দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা তোমার আগে আগে। আজ আর-একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নিজীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা।

রুইতন। ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো। মৃদু হও, শৃঙ্খল হও, পূর্ণ হও।

[প্রস্থান

ছক্কা-পঞ্জার প্রবেশ

ছক্কা। ওহে পঞ্জা, কী হল বলো দেখি।

পঞ্জা। ভারি লজ্জা হচ্ছে নিজের দিকে তাকিয়ে। মূঢ়, মূঢ়! কী করছিলি এতদিন।

ছক্কা। এতদিন পরে কেন মনে প্রশ্ন জাগছে, এ-সমস্তর অর্থ কী।

পঞ্জা। ঐ যে দহলা পণ্ডিত আসছেন, ঠুকে জিজ্ঞাসা করি।

দহলার প্রবেশ

ছক্কা। এতকাল যে-সব ওঠাপড়া-শোয়াবসার কটকেনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম তার অর্থ কী।

দহলা। চুপ।

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) করব না চুপ।

দহলা। ভয় নেই?

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) নেই ভয়, বলতে হবে অর্থ কী।

দহলা। অর্থ নেই—নিয়ম।

ছক্কা। নিয়ম যদি নাই মানি?

দহলা। অধঃপাতে যাবে।

ছক্কা। যাব সেই অধঃপাতেই।

দহলা। কী করতে।

পঞ্জা। সেখানে যদি অগোরব থাকে তার সঙ্গে লড়াই করতে।

দহলা। এ কেমন গোঁয়ারের কথা শান্তিপ্রিয় দেশে!

পঞ্জা। শান্তিভঙ্গ করব পণ করেছি।

হরতনীর প্রবেশ

দহলা। শুনছ শ্রীমতী হরতনী? এরা শান্তি ভাঙতে চায় আমাদের এই অতলস্পর্শ প্রশান্ত-মহাসাগরের ধারে।

হরতনী। আমাদের শান্তিটা বড়ো গাছের মতো। পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নিজীব, তাকে কেটে ফেলা চাই।

দহলা। ছি ছি ছি ছি, এমন কথা তোমার মুখে বেরোল! তুমি নারী, রক্ষা করবে শান্তি; আমরা পুরুষ, রক্ষা করব কৃষ্টি।

হরতনী। অনেকদিন তোমরা আমাদের ভুলিয়েছ পণ্ডিত। আর নয়, তোমাদের শান্তিরসে হিম হয়ে জমে গেছে আমাদের রক্ত, আর ভুলিয়ে না।

দহলা। সর্বনাশ! কার কাছ থেকে পেলো এ-সব কথা।

হরতনী। মনে মনে তাকেই তো ডাকাছি। আকাশে শুনতে পাচ্ছি তারই গান।

দহলা। সর্বনাশ! আকাশে গান! এবার মজল তাসের দেশ। আর এখানে নয়।

[প্রস্থান

ছক্কা। সুন্দরী, তুমিই আমাদের পথ দেখাও।

পঞ্জা। অশান্তিমন্ত্র পেয়েছ তুমি, সেই মন্ত্র দাও আমাদের।

হরতনী। বিধাতার ধিক্কারের মধ্যে আছি আমরা, মৃত্যুর অপমানে। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

ছক্কা। একটু নড়লেই যে ওরা দোষ ধরে, বলে 'অশুচি'।

হরতনী। দোষ হয় হোক, কিন্তু মরে থাকার মতো অশুচিতা নেই।

[প্রস্থান]

ইস্কাবনী ও টেকানী ফুল তুলছে

টেকানী। ঐ রে দহলানী এসেছে। আর রক্ষে নেই।

দহলানীর প্রবেশ

দহলানী। লুকোচ্ছ কোথায়। কে গো, চেনা যায় না যে! এ যে আমাদের টেকানী। আর উনি কে, উনি যে আমাদের ইস্কাবনী। মরে বাই। কী ছিরি করেছে! মানুষ সেজেছ বুঝি? লজ্জা নেই?

টেকানী। সাজি নি, দৈবাৎ সাজ খসে পড়েছে।

দহলানী। তাসের দেশের বন্ধন আঁট বন্ধন—হাজার বছরের হাজার গিরে দেওয়া, খসে পড়ল? কাণ্ডটা ঘটল কী করে।

ইস্কাবনী। একটা হাওয়া দিয়েছিল।

দহলানী। ওমা, কী বলে গো। তাসের দেশের হাওয়ায় বাঁধন ছেঁড়ে! আমাদের পবনদেবের নামে এত বড়ো বদনাম। বলি, এ কি মেলেচ্ছ দেশ পেয়েছ, যেখানে একটু হাওয়া দিলেই গাছের শূকনো পাতা খসে উড়ে যায়।

ইস্কাবনী। স্বচক্ষেই দেখো-না দিদি, কী বদল ঘটিয়েছেন আমাদের পবনদেব।

দহলানী। দেখো, ছোটো মুখে বড়ো কথা ভালো নয়। আমাদের সনাতন পবনদেব! তবে কিনা পুঁথিতে লিখেছে তাঁর এক মহাবীর পুত্র আছেন, তিনি নাকি লম্বা লম্বা লম্ফ দিয়ে বেড়ান। হয়তো বা তিনিই ভর করেছেন তোমাদের 'পরে'।

টেকানী। কেবল আমাদের খোঁটা দিচ্ছ কেন। এখনো চোখে বুঝি পড়ে নি? তিনি যে লম্ফ লাগিয়েছেন তাসের দেশময়। তাসিনীদের বুক আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ইস্কাবনী। সাগরপারের মানুষরা বলছে, তিনিই নাকি ওদের পূর্বপুরুষ।

দহলানী। হতে পারে—ওরা লাফ-মারা-বংশেরই সন্তান।

টেকানী। আচ্ছা, সত্যি কথা বলো দিদি—ভিতরে ভিতরে তোমারও মন চঞ্চল হয়েছে? না, চুপ করে থাকলে চলবে না।

দহলানী। কাউকে বলে দিবি নে তো?

টেকানী। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলব না।

দহলানী। কাল ভোর রাত্তিরের ঘুমে স্বপ্ন দেখলুম, হঠাৎ মানুষ হয়ে গেছি, নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি ঠিক ওদেরই মতো। জেগে উঠে লজ্জায় মরি আর-কি। কিন্তু—

টেকানী। কিন্তু কী।

দহলানী। সে কথা থাক্ গে।

ইস্কাবনী। বুঝেছি, বুঝেছি, দিনের বেলাকার বাঁধা পাখি খোলা পেয়েছিল স্বপ্নে।

দহলানী। চুপ চুপ চুপ, নহলাপাণ্ডিত শুনলে স্বপ্নেরও প্রায়শ্চিত্ত লাগিয়ে দেবে। ওটা পাপ যে। কিন্তু, স্বপ্নে কী ফুটিবে।

টেকানী। যা বলিস ভাই, তাসের দেশে সাগরপারের হাওয়া দিয়েছে খুব জোরে। কিছু যেন ধরে রাখতে পারছি নে, সব দিচ্ছে উড়িয়ে।

দহলানী। তা হোক, এখনো কিন্তু কিছু উড়ল, কিছু রইল বাকি। মাথার ঘোমটা যদি বা খসল, পায়ের বাকি-মল তো সোজা করতে পারল না।

ইস্কাবনী। সত্যি বলছিঁস, মনটা সমুদ্রের এপারে ওপারে দোলাদুলি করছে। ঐ দেখ্-না চিঁড়েতনীর মানুষ হবার অসহ্য শখ, পারে না, তাই মানুষের মুখোশ পরেছে—সেটা তাসমহলেরই কারখানাঘরে ঠেঁতরি। কী অদ্ভুত দেখতে হয়েছে।

দহলানী। আমাদের কাকে কী রকম দেখতে হয়েছে নিজেরা বুঝতেই পারি নে। গাছের আড়াল থেকে কাল শুনলুম, সদাগরের পুতুর বলছিল, এরা যে মানুষের সঙ সাজছে।

টেকানী। ওমা, কী লজ্জা। রাজপুতুর কী বললেন।

দহলানী। তিনি রেগে উঠে বললেন, সে তো ভালোই—সাজের ভিতর দিয়ে রুচি দেখা দিল। তিনি বললেন, এ দেখে হেসো না, হাসতে চাও তো যাও তাদের কাছে মানুষের মধ্যে যারা তাসের সঙ সেজে বেড়ায়।

ইস্কাবনী। ওমা, তাও কি ঘটে নাকি। মানুষ হয়ে তাসের নকল! আচ্ছা, কী করে তারা।

দহলানী। রাজপুতুর বলছিলেন, তারা রঙের কাঠি বুলোয় ঠোঁটে, কালো বাতি দিয়ে আঁকে ভুরু, আরো কত কী, আমাদের রঙ-করা তাসেদেরই মতো। সব চেয়ে মজার কথা, ওরা খুঁরওয়ালা চামড়া লাগায় পায়ের তলায়।

টেকানী। কেন।

দহলানী। পদোন্নতি ঘটে, মাটিতে পা পড়ে না। এ সমস্তই তাসের ঢঙ। একে দেওয়া, সাজিয়ে দেওয়া কায়দা।

ইস্কাবনী। এ তো দেখি পবনদেবের উলটোপালটা খেলা—তাসীরা হতে চায় রঙ খসিয়ে মানুষ, মানুষ চায় রঙ মেখে তাসী হতে। আমি কিন্তু ভাই, ঠিক করেছি, মানুষের মন্তর নেব রাজপুতুরের কাছে।

টেকানী। আমিও।

দহলানী। আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু ভয়ও করে। শুনছি মানুষের দুঃখ ঢের, তাসের কোনো বুলাই নেই।

ইস্কাবনী। দুঃখের কথা বলছিঁস ভাই? দুঃখ যে এখনি শুরু করেছে তার নৃত্য বৃকের মধ্যে।

টেকানী। কিন্তু সেই দুঃখের নেশা ছাড়তে চাই নে। থেকে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়, কেন যে ভেবেই পাই নে।

গান

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়,
মন কেন এমন করে—
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে চলে গিয়েছে অনাদরে—
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।

ইস্কাবনী। পালাও পালাও, সম্পাদক আসছে। কাগজে যদি রটে যায় তা হলে মুখ দেখাতে পারব না।

দহলানী। ঐ যে দলবল সবাই আসছে। বড়োনিমতলায় আজ সভা বসবে। এখানে আর নয়।

[প্রস্থান]

রাজাসাহেব প্রভূতির প্রবেশ

রাজা। এ জায়গাটা কেমন ঠেকছে। ওটা কিসের গন্ধ।

পঞ্জা। কদম্বের।

রাজা। কদম্ব! অদ্ভুত নাম। ওটা কী পাখি ডাকছে।

পঞ্জা। শুনোছি, ওকে বলে ঘুঘু।

রাজা। ঘুঘু! তাসের ভাষায় ওকে একটা ভদ্র নাম দাও, বলো বিনুতি। আজ তো কাজ করা দায় হয়েছে। আজ আকাশে কথা শোনা যাচ্ছে, বাতাসে সুর উঠেছে। অনেক কষ্টে মনকে শান্ত রেখেছি। রানীবিবিকে তো ঘরে রাখা শক্ত হল, নেচে বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো। সভ্যগণ, তোমাদের আজ চেনা যায় না—সভার সাজ নেই, অত্যন্ত অসভ্যের মতো।

সকলে। দোষ নেই। ঢিলে হয়ে গেল আমাদের সাজ, আপনি পড়ল খসে—সেগদুলো রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে আছে।

রাজা। সম্পাদক, তোমারও যেন গাম্ভীৰ্যহানি হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

গোলাম। সকাল থেকে আছি বনে, পলাতকাদের নাম সংগ্রহ করার জন্যে। এখানকার হাওয়া লেগেছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভরাতে গিয়ে দেখি, লেখনী দিয়ে ছন্দ ঝরছে। শুনোছি, আধুনিক ডাক্তার এইরকম নিঃসারণকেই বলে ইন্ফুলুয়েঞ্জা।

রাজা। কী রকম, একটা নমুনা দেখি।

গোলাম।

যে দেশে বায়ু না মানে

বাধ্যতামূলক বিধি,

সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি

কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি—

সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি।

রাজা। থাক, আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাস-বংশীয় শিশুরা কণ্ঠস্থ করুক।

ছক্কা। রাজাসাহেব, তোমার চতুর্থবর্গের শিশুবিভাগের ছাত্র নই আমরা। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমাদের বয়স হয়েছে। ও ছন্দ মনে লাগছে না।

পঞ্জা। ওগো বিদেশী, সমুদ্রের ওপারের ছন্দ আমাদের কানে দিতে পার?

রাজপুত্র। পারি, তবে শোনো।

গান

গগনে গগনে যায় হাঁক

বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,

স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়

বনস্পতির শাখাতে।

শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,

অচিন পথের ছন্দ উড়ায়

মুক্ত বেগের পাখাতে।

অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে
সাদার কালোর দ্বন্দে,
নানা ভালো নানা মন্দে,
নানা সোজা নানা বাঁকাতে।
ছন্দ নাচিল হোমবহির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্ধাবীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
রুদ্ধরথের চাকাতে।

রাজা। কিছ্ বদলে তোমরা?
তাসের দল। কিছ্ই না।
রাজা। তবে?
তাসের দল। মন মেতে উঠল।
রাজা। সেটা তো ভালো নয়। আমাদের সনাতন শাস্ত্রের ছন্দ একটা শোনো—

শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে
নেড়েচেড়ে যায় ফেলে,
বলে, 'মোর নাহি প্রয়োজন'।

শোনো বিদেশী।

রাজপুত্র। আদেশ করো।

রাজা। তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ—জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়,
কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ—এ-সব কেন।

রাজপুত্র। রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ
মাটিতে, সেই বা কেন।

রাজা। সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র। এ আমাদের ইচ্ছে।

রাজা। ইচ্ছে! কী সর্বনাশ! এই তাসের দেশে ইচ্ছে! বন্ধুগণ, তোমরা সবাই কী বল।

ছক্কা-পঞ্জা। আমরা ওর কাছে ইচ্ছেমন্ত্র নিয়েছি।

রাজা। কী মন্ত্র।

ছক্কা-পঞ্জা।

গান

ইচ্ছে।

সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,

সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।

সেই তো আঘাত করছে তালায়,

সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়,

বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে।

রাজা। যাও যাও, এখান থেকে চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও। হরতনী, কানে পেঁপীছল না কথাটা?
চিঁড়েতনী, দেখছ ওর ব্যবহারটা? হঠাৎ এমন হল কেন।

হরতনী। ইচ্ছে।

অন্য টেক্কারা। ইচ্ছে।

রাজা। ও কী রানীবিবি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে।

রানী। আর বসে থাকতে পারছি নে।

রাজা। রানীবিবি, সন্দেহ হচ্ছে, তোমার মন বিচলিত হয়েছে।

রানী। সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে।

রাজা। জান? চাঞ্চল্য তাসের দেশে সব চেয়ে বড়ো অপরাধ।

রানী। জানি, আর এও জানি, এই অপরাধটাই সব চেয়ে বড়ো সম্ভাগের জিনিস।

রাজা। শাস্তির জিনিসকে তুমি বললে ভোগের জিনিস, তাদের দেশের ভাষাও ভুলে গেছ?

রানী। আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে।

রুইতন। হাঁ বিবিরানী, এদের ভাষায় জেলখানাকে বলে শ্বশুরবাড়ি।

রাজা। চুপ।

হরতনী। এরা হেঁয়ালিকে বলে শাস্তর।

রাজা। চুপ।

হরতনী। বোবাকে বলে সাধু।

রাজা। চুপ।

হরতনী। বোকাকে বলে পণ্ডিত।

রাজা। চুপ।

পঞ্জা। এরা মরাকে বলে বাঁচা।

রাজা। চুপ।

রানী। আর, স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়।

সকলে। জয় ইচ্ছের জয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমার বনবাস!

রানী। বাঁচি তা হলে।

রাজা। নির্বাসন!—ও কী, চললে যে! কোথায় চললে।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

রানী। ফেলে রেখে যাব কেন।

রাজা। তবে?

রানী। সঙ্গে নিয়ে যাব তোমাকে।

রাজা। কোথায়?

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আর এরা, আমার প্রজারা?

সকলে। যাব নির্বাসনে।

রাজা। দহলাপণ্ডিত কী মনে করছ।

দহলা। নির্বাসনটা ভালোই মনে করছি।

রাজা। আর, তোমার পুণ্ডিগলো?

দহলা। ভাসিয়ে দেব জলে।

রাজা। বাধ্যতামূলক আইন?

দহলা। আর চলবে না।

সকলে। চলবে না, চলবে না।

রানী। কোথায় গেল সেই মানুষরা।

রাজপুত্র। এই যে আছি আমরা।
 রানী। মানুষ হতে পারব আমরা?
 রাজপুত্র। পারবে, নিশ্চয় পারবে।
 রাজা। ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব।
 রাজপুত্র। সন্দেহ করি। কিন্তু, রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রানীর।

সকলের গান
 বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
 বাঁধ ভেঙে দাও।
 বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
 শূন্যে গাঙে আসুক
 জীবনের বন্যার উদ্দাম কোঁতুক,
 ভাঙনের জয়গান গাও।
 জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
 যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
 আমরা শূন্যে ওই
 মাঠেঃ মাঠেঃ মাঠেঃ
 কোন্ নদনেরই ডাক।
 ভয় করি না অজানারে,
 রুদ্ধ তাহারি দ্বারে
 দুর্দাড় বেগে ধাও।

বাঁশরি

প্রকাশ : ১৯৩৩

পান্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 'বাঁশরী' এই বানান দৃষ্ট হলেও,
কবির অভিপ্রেত বানানই বর্তমান সংস্করণে অনুসৃত।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীমতী বাঁশরি সরকার বিলিতি রুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতশক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইম্পাতের চাকচিক্য। ক্ষিতীশ সাহিত্যিক। চেহারায় খুঁত আছে, কিন্তু গল্প লেখায় খ্যাতিনামা। পার্টি জমেছে সুসমা সেনদের বাগানে।

বাঁশরি। ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি নতুন ফ্যাশনের ধুমকেতু বললেই হয়। জ্বলন্ত লেজের ঝাপটায় পুরোনো কায়দাকে ঝেঁপটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে। যেখানে তোমাকে এনোঁছি এটা বিলিতি-বাঙালি মহল, ফ্যাশনেবল পাড়া। পথঘাট তোমার জানা নেই। দেউড়িতে কার্ড তলব করলেই ঘেমে উঠতে। তাই সকাল-সকাল আনলুম। আপাতত একটু আড়ালে বোসো। সকলে এলে প্রকাশ কোরো আপন মহিমা। এখন চললুম, হয়তো না আসতেও পারি।

ক্ষিতীশ। রোসো, একটু সমঝিয়ে দাও। অজায়গায় আমাকে আনা কেন।

বাঁশরি। কথাটা খোলসা করে বলি তবে। বাজারে নাম করেছে বই লিখে। আরো উন্নতি আশা করেছিলুম। ভেবেছিলুম, নামটাকে বাজার থেকে উদ্ধার করে এত উদ্বেগ তুলবে যে, ইতরসাধারণ গাল পাড়তে থাকবে।

ক্ষিতীশ। আমার নামটা বাজারে-চলতি ঘষা পয়সা নয়, সে কথা কি স্বীকার কর না।

বাঁশরি। সাহিত্যের সদর বাজারের কথা হচ্ছে না, তোমরা যে নতুন বাজারের চলতি দরে ব্যবসা চালাচ্ছ সেও একটা বাজার। তার বাইরে যেতে তোমার সাহস নেই পাছে মালের গুমোর কমে। এবারে তারই প্রমাণ পেলুম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ 'বেমানান'। সস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার পুরো পরিমাণেই আছে। মাঝারি লেখকেরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধুনিকতার বটতলায় ছাপা, খেলো আধুনিকতা।

ক্ষিতীশ। কিণ্ঠ্য রাগ হয়েছে দেখছি; ছুরিটা বিধেছে তোমাদের ফ্যাশনেবল শার্ট-ফ্রন্ট ফুঁড়ে।

বাঁশরি। রামো! ছুরি বল ওকে! যাত্রার দলের কাঠের ছুরি, রাংতা-মাখানো। ওতে যারা ভোলে তারা অজবুগ।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, মেনে নিলেম। কিন্তু আমাকে এখানে কেন।

বাঁশরি। তুমি টেবিল বাজিয়ে বাজনা অভ্যেস কর, যেখানে সত্যিকার বাজনা মেলে সেইখানে শিক্ষা দিতে নিয়ে এলুম। এদের কাছ থেকে দূরে থাক, ঈর্ষা কর, বানিয়ে দাও গাল। তোমার বইয়ে নলিনাক্ষের নামে যে দলকে সৃষ্টি করে লোক হাসিয়েছ সে দলের মানুষকে কি সত্যি করে জান।

ক্ষিতীশ। আদালতের সাক্ষীর মতো জানি নে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

বাঁশরি। বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেয়ে অনেক বেশি জানা দরকার হয়, গুণায়। যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখোঁছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য; এখন সাবালক হয়েছে তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।

ক্ষিতীশ। ছেলেমানুষি রুচিকে রস জোগাবার ব্যবসা আমার নয়। আমি এসেছি জীর্ণকে চূর্ণ করে সাফ করতে।

বাঁশরি। বাস্ রে। আচ্ছা বেশ, কলমটাকে যদি ঝাঁটাই বানাতে চাও তা হলে আঁস্তাকুড়টা সত্যি হওয়া চাই, ঝাঁটাগাছটাও, আর সেইসঙ্গে ঝাড়ু-ব্যবসায়ীর হাতটাও। এই আমরাই তোমাদের

নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ আছে ঢের, তোমাদেরও আছে বিস্তর। কসরূর মাপ করতে বলি নে, ভালো করে জানতে বলি, সত্যি করে জানাতে বলি, এতে ভালোই লাগুক মন্দই লাগুক কিছুই যায় আসে না।

ক্ষিতীশ। অন্তত তোমাকে তো জেনেছি, বাঁশি। কেমন লাগছে তারও আভাস আড়চোখে কিছু, কিছু পাও বোধ করি।

বাঁশরি। দেখো সাহিত্যিক, আমাদের দলেও মানান-বেমানানের একটা নিষ্কি আছে। চিটেগড় মাথিয়ে কথাগুলোকে চট্‌চটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেন্না করে। শোনো ক্ষিতীশ, আর-একবার তোমাকে স্পষ্ট করে বলি।

ক্ষিতীশ। এত অধিক স্পষ্ট তোমার কথা যে, যত বৃষ্টি তার চেয়ে বাজে বেশি।

বাঁশরি। তা হোক, শোনো। অশ্বখামার ছেলেবেলাকার গল্প পড়েছ? ধনীর ছেলেকে দুধ খেতে দেখে যখন সে কাশা ধরল, তাকে পিটুনি গুলে খেতে দেওয়া হল, দু হাত তুলে নাচতে লাগল দুধ খেয়েছি বলে।

ক্ষিতীশ। বুদ্ধোহি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ, আমার লেখায় পিটুনি-গোলা জল খাইয়ে পাঠকশিশুদের নাচাচ্ছি।

বাঁশরি। বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিশ্বাস লাগে।

ক্ষিতীশ। সত্যের পরিচয় আছে তোমার?

বাঁশরি। হাঁ আছে, দুঃখ এই, লেখবার শক্তি নেই। তার চেয়ে দুঃখের কথা—লেখবার শক্তি আছে তোমার, কিন্তু নেই সত্যের পরিচয়। আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখো যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাক্ষা করে লিখতে শেখো। যাতে মনে হবে, আমারই মন প্রাণ যেন তোমার কলমের মুখে ফুটে পড়ছে।

ক্ষিতীশ। জানার কথা তো বললে, জানবার পদ্ধতিটা কী।

বাঁশরি। পদ্ধতিটা শূন্য হোক আজকের এই পার্টিতে। এখানকার এই জগৎটার কাছ থেকে সেই পরিমাণে তুমি দূরে আছ, যাতে এর সমস্তটাকে নির্লিপ্ত হয়ে দেখা সম্ভব।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, তা হলে এই পার্টিটার একটা সরল ব্যাখ্যা দাও, একটা সিনপ্সিস।

বাঁশরি। তবে শোনো। এক পক্ষে এই বাড়ির মেয়ে, নাম সুসমা সেন। পুরুষমাত্রেই মত এই যে, ওর যোগ্যপাত্র জগতে নেই নিজে ছাড়া। উদ্ভট যুবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনতরো আস্তিন-গোটানো ভাঙি দেখি যাতে বোঝা যায়, আইন-আদালত না থাকলে ওকে নিয়ে লোক-ক্ষয়কর কাণ্ড ঘটত। অপর পক্ষে শম্ভুগড়ের রাজা সোমশংকর। মেয়েরা তার সম্বন্ধে কী কানাকানি করে বলব না, কারণ আমিও স্ত্রী জাতিরই অন্তর্গত। আজকের পার্টি এঁদের দৌঁহাকার এন্‌গেজ্‌মেন্ট নিয়ে।

ক্ষিতীশ। দুজন মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল। দুই সংখ্যাটা গড়ায় এসে সুশীতল গার্হস্থ্য। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাটা। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায়।

বাঁশরি। আছে তৃতীয় ব্যক্তি, সেই হয়তো প্রধান ব্যক্তি। লোকে তাকে ডাকে পুরুন্দরসন্ন্যাসী। পিতৃদত্ত নামটার সম্বন্ধ মেলে না। কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক-শিকারে। কেউ বলে, ও যুরোপে অনেককাল ছিল। সুসমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়। অবশেষে ঘটিয়েছে এই সম্বন্ধ। সুসমার মা বললেন—অনুষ্ঠানটা হোক স্বাস্থ্য-সমাজের কাউকে দিয়ে, সুসমা জেদ ধরলে একমাত্র পুরুন্দর ছাড়া আর-কাউকে দিয়ে চলবে না। চতুর্দিকের আবহাওয়াটার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, বলব, কোনো-একটা জায়গায় ডিপ্রেসন ঘটেছে। গতকটা ঝোড়ো ঝকমের; বাদলা কোনো-না-কোনো পাড়ায় নেমেছে, বৃষ্টিপাত হয়তো স্নানার্থিকের চেয়ে বেশি। বাস্, আর নয়।

ক্ষিতীশ। ঐ যাঃ, এই দেখো আমার এন্ডির চাদরটাতে মস্ত একটা কালির দাগ।

বাঁশরি। বাস্ত হও কেন। ঐ কালির দাগেই তোমার অসাধারণতা। তুমি রিয়ালিস্ট, নির্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ। ঐ আসছে অনসূয়া প্রিয়ংবদা।

ক্ষিতীশ। তার মানে?

বাঁশরি। দুই সখী। ছাড়াছাড়ি হবার জো নেই। বন্ধুত্বের উপাধি-পরীক্ষায় ঐ নাম পেয়েছে, আসল নামটা ভুলেছে সবাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

দুই সখীর প্রবেশ

১। আজ সুসমার এন্গেজ্‌মেন্ট, মনে করতে কেমন লাগে।

২। সব মেয়েরই এন্গেজ্‌মেন্টে মন খারাপ হয়ে যায়।

১। কেন?

২। মনে হয়, দাঁড়ির উপরে চলছে, থরথর করে কাঁপছে সুখদঃখের মাঝখানে। মূখের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় করে।

১। তা সত্যি। আজ মনে হচ্ছে যেন নাটকের প্রথম অঙ্কের ড্রপ্‌সীন্‌ উঠল। নায়কনারায়িকাও তেমনি, নাট্যকার নিজের হাতে সাজিয়ে চালান করেছেন রংগভূমিতে। রাজা সোমশংকরকে দেখলে মনে হয়, টেডের রাজস্থান থেকে বেরিয়ে এসে দুশো-তিনশো বছর পেরিয়ে।

২। দেখিস নি, প্রথম যখন এলেন রাজাবাহাদুর? খাঁটি মধ্যযুগের; ঝাঁকড়া চুল, কানে বীরবোলি, হাতে মোটা কঙ্কণ, কপালে চন্দনের তিলক, বাংলা কথা খুব বাঁকা। পড়লেন বাঁশরির হাতে, হল ঔর মডার্ন সংস্করণ। দেখতে দেখতে যে-রকম রূপান্তর ঘটল কারো সন্দেহ ছিল না ঔর গোত্রান্তর ঘটবে বাঁশরির গর্দভটিতেই। বাপ প্রভুশংকর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধুনিকের কবল থেকে নিয়ে গেলেন সরিয়ে।

১। বাঁশরির চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ঐ পুরন্দরসন্ন্যাসী, সব কটা বেড়া ডিঙিয়ে রাজার ছেলেকে টেনে নিয়ে এলেন এই ব্রাহ্মসমাজের আংটি-বদলের সভায়। সব চেয়ে কঠিন বেড়া স্বয়ং বাঁশরির।

সুসমার বিধবা মা বিভাসিনীর প্রবেশ

স্বপ্নপঙ্কজা বৈশাখী নদীর স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে চর পড়ে যেরকম দৃশ্য হয় তেমনি চেহারা।

শিথিল বিস্তারিত দেহ, কিছ্র মাংসবহুল, তবু চাপা পড়ে নি যৌবনের ধারাবশেষ।

বিভাসিনী। বসে বসে কী ফিস্‌ফিস্‌ করছিঁস তোরা।

১। মাসি, লোকজন আসবার সময় হল, সুসমার দেখা নেই কেন।

বিভাসিনী। কী জানি, হয়তো সাজগোজ চলছে। তোরা চল বাছা, চায়ের টেবিলের কাছে, অতিথিদের খাওয়াতে হবে।

১। যাচ্ছি মাসি, ওখানে এখনো রোদ্দুর।

বিভাসিনী। যাই, দেখি গে সুসমা কী করছে। তাকে এখানে তোরা কেউ দেখিস নি?

২। না, মাসি।

বিভাসিনী। কে যে বললে ঐ পুকুরটার ধারে এসেছিল?

১। না, এতক্ষণ আমরাই ওখানে বেড়াচ্ছিলাম।

[বিভাসিনীর প্রস্থান]

২। চেয়ে দেখ্‌ ভাই, তোদের সুধাংশু কী খাটুনিই খাটছে। নিজের খরচে ফুল কিনে এনে টেবিল সাজিয়েছে নিজের হাতে। কাল এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। নেপদ বিশ্বাস মূখ বাঁকিয়ে বলেছিল, সুসমা টাকার লোভে এক বুনো রাজাকে বিয়ে করছে।

১। নেপদ বিশ্বাস! ওর মূখ বাঁকবে না? বুনোর মধ্যে যে ধনুটংকার! আজকাল সুসমাকে

নিয়ে ছেলেদের দলে বুক-জ্বলুনির লঙ্কাকান্ড। ঐ সুধাংশুর বুকখানা যেন মানোয়ারি জাহাজের বয়লার-ঘরের মতো হয়ে উঠেছে।

২। সুধাংশুর তেজ আছে, যেমন শোনা নেপদুর কথা অমনি তাকে পেড়ে ফেললে মাটিতে, বুকের উপর চেপে বসে বললে, মাপ চেয়ে চিঠি লিখতে হবে।

১। দারুণ গোঁয়ার, ওর ভয়ে পেট ভ'রে কেউ নিন্দে করতেও পারে না। বাঙালির ছেলেদের বিষম কণ্ট।

২। জানিস নে, আমাদের পাড়ায় বসেছে হতাশের সমিতি? লোকে যাদের বলে সুষমাভক্ত সম্প্রদায়, সৌম্যমিক যাদের উপাধি, তারা নাম নিয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার দল। নিশেন বানিয়েছে, তাতে ভাঙাকুলোর চিহ্ন। সন্ধ্যাবেলায় কী চেঁচামেচি। পাড়ার গেরস্তরা বলছে কাউন্সিলে প্রস্তাব তুলবে, আইন করে ধরে ধরে অবিলম্বে সব ক'টার জীবন্ত সমাধি, অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া চাই। নইলে রাত্তিরে ভদ্রলোকদের ঘুম বন্ধ। পার্বলিক-ন্যুসেন্স্ যাকে বলে।

১। এই লোকহিতকর কার্যে তুই সাহায্য করতে পারবি, প্রিয়।

২। দয়াময়ী, লোকহিতৈষিতা তোমারও কোনো মেয়ের চেয়ে কম নয়, ভাই। লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী স্থাপন করবার শখ আছে তোমার। আন্দাজে তা বৃদ্ধিতে পারি। অনন্, ঐ লোকটাকে চিনিস?

১। কখনো তো দেখি নি।

২। ক্ষিতীশবাবু। গল্প লেখে, খুব নাম। বাঁশরি দামী জিনিসের বাজারদর বোঝে। ঠাট্টা করলে বলে—ঘোলের সাধ দুধে মেটাচ্ছি, মদুস্তার বদলে শুক্তি।

১। চল্ ভাই, সবাই এসে পড়ল। আমাদের একত্র দেখলে ঠাট্টা করবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগানের কোণে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে। তলায় কাঠের আসন। সেই নিভৃতে ক্ষিতীশ। অন্যত্র নিম্নস্তরের দল কেউ-বা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউ-বা খেলছে টেনিস, কেউ-বা টেবিলে সাজানো আহাৰ্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শচীন। আই সে, তারক, লোকটা আমাদের এলাকায় পিলপেগাড়ি করেছে, এর পরে পার্মনেন্ট টেন্যুরের দাবি করবে। উচ্ছেদ করতে ফোঁজদারি।

তারক। কার কথা বলছ।

শচীন। ঐ-যে নববার্তা কাগজের গল্প-লিখিয়ে ক্ষিতীশ।

তারক। ওর লেখা একটাও পড়ি নি, সেইজন্যে অসীম শ্রদ্ধা করি।

শচীন। পড়ি নি ওর নূতন বই 'বেমানান'? বিলিতিমার্কী নব্যবাঙালিকে মদুচড়ে মদুচড়ে নিংড়েছে।

অরুণ। দূরে বসে কলম চালিয়েছে, ভয় ছিল না মনে। কাছে এসেছে এইবারে বৃদ্ধবে, নিংড়ে ধব্ধবে সাদা করতে পারি আমরাও। তার পরে চড়াতে পারি গাধার পিঠে।

অর্চনা। ওর ছোঁয়া বাঁচাতে চাও তোমরা, ওরই ভয় তোমাদের ছোঁয়াকে। দেখছ না—দূরে বসে আইডিয়ার ডিমগদুলোতে তা দিচ্ছে?

সতীশ। ও হল সাহিত্যরথী, আমরা পায়ে-হাঁটা পেয়াদা, মিলন ঘটবে কী উপায়ে।

শচীন। ঘটকী আছেন স্বয়ং তোমার বোন বাঁশরি। হাইরো দার্জিলিং আর ফিলিস্টাইন শিলিগুড়ি, এর মধ্যে উনি রেল-লাইন পাতছেন। এখানে ক্ষিতীশের নেমন্তন্ন তাঁরই চক্রান্তে।

সতীশ। তাই নাকি! তা হলে ভগবানের কাছে হতভাগার আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করি। আমার বোনকে এখনো চেনেন না।

শৈলবালা। তোমরা যাই বল, আমার কিন্তু ওর উপরে মায়া হয়।

সতীশ। কোন্‌ গুণে।

শৈল। চেহারাতে। শুনোছি, ছেলেবেলায় মায়ের বর্ণটির উপর পড়ে গিয়ে কপালে চোট লেগেছিল, তাই ঐ মস্ত কাটা দাগ। শরীরের খুঁত নিয়ে ওকে যখন ঠাট্টা কর, আমার ভালো লাগে না।

শচীন। মিস্‌ শৈল, বিধাতা তোমাকে নিখুঁত করেছেন তাই এত করুণা। কলির কোপ আছে যার চেহারায়, সে বিধাতার অকুপার শোধ তুলতে চায় বিশ্বের উপর। তার হাতে কলম যদি সরু করে কাটা থাকে তাহলে শতহস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। ইংরেজ কবি পোপের কথা মনে রেখো।

শৈল। আহা, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ।

সতীশ। শৈল, তোমার দরদ দেখে নিজেরই কপালে বর্ণিট মারতে ইচ্ছে করছে। শাস্ত্র আছে মেয়েদের দয়া আর ভালোবাসা থাকে এক মহলে, ঠাইবদল করতে দেরি হয় না।

শচীন। তোমার ভয় নেই সতীশ, মেয়েরা অযোগ্যকেই দয়া করে।

শৈল। আমাকে তাড়াতে চাও এখান থেকে?

শচীন। সতীশ সেই অপেক্ষাই করছে। ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শৈল। রাগিয়ে না বলছি, তা হলে তোমার কথাও ফাঁস করে দেব।

শচীন। জেনে নাও বন্ধুগণ, আমারও ফাঁস করবার যোগ্য খবর আছে।

সতীশ। মিস্‌ বাণী, দেখছ লোকটার স্পর্ধা? গুজবটাকে ঠেলে আনছে তোমার দিকে। পাশ কাটাতে না পারলে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য।

লীলা। মিস্‌ বাণীকে সাবধান করতে হবে না। ও জানে তাড়া লাগালেই বিপদকে খেঁদিয়ে আনা হয়। তাই চুপচাপ আছে, কপালে যা থাকে। ঐ-যে কী গানটা, 'বলোছিল ধরা দেব না'।

গান

বলোছিল ধরা দেব না, শুনোছিল সেই বড়াই।

বীরপুরুষের সয় নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।

তার পরে শেষে কী-যে হল কার,

কোন্‌ দশা হল জয়পতাকার—

কেউ বলে জিত, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই।

অর্চনা। আঃ, কেন তোরা বাণীকে নিয়ে পড়েছিস। ও এখনই কোঁদে ফেলবে। সুখীমা, যা তো ক্ষিতীশবাবুকে ডেকে আন চা খেতে।

লীলা। হায় রে কপাল! মিথ্যে ডাকবে, চোখ নেই, দেখতে পাও না!

সতীশ। কেন, দেখবার কী আছে।

লীলা। ঐ-যে এন্ডি চাদরের কোণে মস্ত একটা কলির দাগ। ভেবেছেন চাপা দিয়েছেন কিন্তু ঝুলে পড়েছে।

সতীশ। আচ্ছা চোখ যা হোক তোমার!

লীলা। বোমা তদন্তে পুঁলিস না এলে ঠুঁকে নড়ায় কার সাধ্য।

সতীশ। আমার কিন্তু ভয় হয়, কোন্‌দিন বাঁশরি ঐ জখমি মানুষকে বিয়ে করে পরিবারের মধ্যে আতুরাগ্রস্ত খুলে বসে।

লীলা। কী বল তার ঠিক নেই। বাঁশরির জন্যে ভয়! ওর একটা গম্প বলি, ভয় ভাঙবে শূনে। আমি উপস্থিত ছিলাম।

শচীন। কী মিছে তাস খেলছ তোমরা! এসো এখানে, গল্প-লিখির উপর গল্প! শুরু করো।

লীলা। সোমশংকর হাতছাড়া হবার পরে বাঁশার শখ গেল নখী-দন্তী-গোছের একটা লেখক পোষবার। হঠাৎ দেখি জোটালো কোথা থেকে আস্ত একজন কাঁচা সাহিত্যিক। সেদিন উৎসাহ পেয়ে লোকটা শোনাতে এসেছে একটা নতুন লেখা। জয়দেব-পদ্মাবতীকে নিয়ে তাজা গল্প। জয়দেব দূর থেকে ভালোবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধূর যেমন রূপ তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি বিদ্যেসাধি। অর্থাৎ এ কালে জন্মালে সে হত ঠিক তোমারই মতো শৈল। এ দিকে জয়দেবের স্ত্রী খোলোআনা গ্রাম্য, ভাষায় পানাপুকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে-সব তার বীভৎস প্রবৃত্তি—ড্যাশ দিয়ে ফুটকি দিয়েও তার উল্লেখ চলে না। লেখক শেষকালটায় খুব কালো কালিতে দেগে প্রমাণ করেছে যে, জয়দেব স্নব, পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মন্দাকিনী। বাঁশার চোঁকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলে উঠল, ‘মাস্টারপীস!’ ধন্য মেয়ে! একেবারে সারাইম ন্যাকামি।

শচীন। মানুসটা চুপসে চ্যাপটা হয়ে গেল বোধ হয়?

লীলা। উলটো। বুক উঠল ফুলে। বললে, ‘শ্রীমতী বাঁশারি, মাটি খোঁড়বার কোদালকে আমি খনির নাম দিয়ে শুদ্ধ করে নিই নে, তাকে কোদালই বলি।’ বাঁশারি বলে উঠল, ‘তোমার খেতাব হওয়া উচিত—নব্যসাহিত্যের পূর্ণচন্দ্র, কলঙ্কগর্বিত।’ ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় যেন আতস-বাজির মতো।

শচীন। এটাও লোকটার গলা দিয়ে গলল? বাধল না?

লীলা। একটুও না। চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে ভাবল, আশ্চর্য করেছি, এবার শুদ্ধ করে দেব। বললে, ‘শ্রীমতী বাঁশারি, আমার একটা থিয়োরি আছে। দেখে নেবেন একদিন ল্যাবরেটোরিতে তার প্রমাণ হবে। মেয়েদের জৈবকণায় যে এনার্জি থাকে সেটা ব্যাপ্ত সমস্ত পৃথিবীর মাটিতে। নইলে পৃথিবী হত বন্ধ্যা।’ আমাদের সদাঁর-নেকি শুনাই এতখানি চোখ করে বললে, ‘মাটিতে! বলেন কী ক্ষিতীশবাদ! মেয়েদের মাটি করবেন না। মাটি তো পুরুষ। পশুভূতের কোঠায় মেয়ে যদি কোথাও থাকে সে জলে। নারীর সঙ্গে মেলে বারি। স্থূল মাটিতে সূক্ষ্ম হয়ে সে প্রবেশ করে, কখনো আকাশ থেকে নামে বৃষ্টিতে, কখনো মাটির তলা থেকে ওঠে ফোয়ারায়, কখনো কঠিন হয় বরফে, কখনো ঝরে পড়ে ঝরনার।’ যা বলিস ভাই শৈল, বাঁশি কোথা থেকে কথা আনে জুড়িয়ে, ভগীরথের গঙ্গার মতো, হাঁপ দাঁড়িয়ে দিতে পারে ঐরাবত হাতিটাকে পর্যন্ত।

শচীন। ক্ষিতীশ সেদিন তিজ্ঞে কাদা হয়ে গিয়েছিল বোলে!

লীলা। সম্পূর্ণ। বাঁশি আমার দিকে ফিরে বললে, ‘তুই তো এম. এসসি.-ও বায়োকেমিস্ট্রি নিয়েছিস, শুনলি তো? বিশ্ব রমণীয় রমণীয়তা যে অংশে সেইটিকে কেটে ছিঁড়ে পুড়িয়ে গুড়িয়ে হাইড্রলিক প্রেস দিয়ে দলিয়ে সল্ফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে তোকে রিসার্চে লাগতে হবে।’ দেখো একবার দৃষ্টান্ত, আমি কোনোকালে বায়োকেমিস্ট্রি নিই নি। ওর পোষা জীবকে নাচাবার জন্যে চাতুরী। ভাই বলছি, ভয় নেই, মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে কিন্তু যাকে বিদ্বপ করে তাকে নৈব নৈব চ। সব-শেষে বোকাটা বললে, ‘আজ স্পষ্ট বুঝলুম, পুরুষ তেমনি করেই নারীকে চায় যেমন করে মরুভূমি চায় জলকে মাটির তলার বোবা ভাষাকে উদ্ভিদ করে তোলবার জন্যে।’ এত হেসেছি!

তারক। তুমি তো ঐ বললে। আমি একদিন ক্ষিতীশের তালি-দেওয়া মুখ নিয়ে একটু ঠাট্টার আভাস দিয়েছিলাম। বাঁশারি বলে উঠলেন, ‘দেখো লাহিড়ী, ওর মুখ দেখতে আমার পর্জিটিভলি ভালো লাগে।’ আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, ‘তা হলে মুখখানা বিশুদ্ধ মডার্ন আর্ট। বুঝতে ধাঁধা লাগে।’ ওর সঙ্গে কথায় কে পারবে—ও বললে, ‘বিধাতার তুলিতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান তাকে সুন্দর দেখতে করা দরকার বোধ করেন না। তাঁর মিস্টার ছড়ান ইতর লোকদেরই পাতে।’ বাই জোভ, সূক্ষ্ম বটে!

শৈল। আর কি কোনো কথা নেই তোমাদের। ক্ষিতীশবাবু শুনতে পাবেন যে।

সতীশ। ভয় নেই, ওখানে ফোয়ারা ছুটছে, বাতাস উলটো দিকে, শোনা যাবে না।

অর্চনা। আচ্ছা, তোমরা সব তাস খেলো, টেনিস খেলতে যাও, ঐ মানুষটার সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে আসি গে।

অর্চনা প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়ে গেল ক্ষিতীশের কাছে। দোহারা গড়নের দেহ, সাজে-সজ্জায় কিছু অযত্ন আছে, হাসিখুশি ঢলঢলে মুখ, আর পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে।

অর্চনা। ক্ষিতীশবাবু, পালিয়ে বসে আছেন আমাদের কাছ থেকে তার মানে বদ্বতে পারি, কিন্তু খাবার টেবিলটাকে অস্পৃশ্য করলেন কোন্ দোষে। নিরাকার আইডিয়ায় আপনারা অভ্যস্ত, নিরাহার ভোজেও কি তাই। আমরা বঙ্গনারী বঙ্গসাহিত্যের সেবার ভার পেয়েছি যে দিকটাতে সে দিকে আপনাদের পাকযন্ত্র।

ক্ষিতীশ। দেবী, আমরা জোগাই রসাত্মক বাক্য, তা নিয়ে তর্ক ওঠে; আপনারা দেন রসাত্মক বস্তু, ওটা অন্তরে গ্রহণ করতে মতান্তর ঘটে না।

অর্চনা। কী চমৎকার। আমি যখন থালায় কেক সন্দেশ গোছাচ্ছিলাম আপনি ততক্ষণ কথাটা বানিয়ে নিচ্ছিলেন। সাত জন্ম উপোস করে থাকলেও আমার মুখ দিয়ে এমন বক্বকে কথাটা বেরত না। তা যাক গে; পরিচয় নেই, তবু এলুম কাছে, কিছু মনে করবেন না। পরিচয় দেবার মতো নেই বিশেষ কিছু। বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জে যাবার ভ্রমণবৃত্তান্তও কোনো মাসিকপত্রে আজ পর্যন্ত ছাপাই নি। আমার নাম অর্চনা সেন। ঐ-যে অপরিচিত ছোটো মেয়েটি বেণী দুর্লিয়ে বেড়াচ্ছে, আমি তারই অখ্যাত কারিক।

ক্ষিতীশ। এবার তা হলে আমার পরিচয়টা—

অর্চনা। বলেন কী। পাড়াগেয়ে ঠাওরালেন আমাকে? শেরালদ-স্টেশনে কি গাইড রাখতে হয় চের্চিয়ে জানাতে যে কলকাতা শহরটা রাজধানী। এই পরশুদিন পড়েছি আপনার 'বেমানান' গল্পটা। পড়ে হেসে মরি আর-কি। ও কী! প্রশংসা শুনতে আজও আপনার লজ্জা বোধ হয়? খাওয়া বন্ধ করলেন যে? আচ্ছা, সীতা বলুন, নিশ্চয় ঘরের লোক কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। রক্তের যোগ না থাকলে এমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ-যে, যে জায়গাটাতে মিস্টার কিষণ গাঙ্গা বি. এ. ক্যান্টাব, মিস্ লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙুটি ফেলে দিয়ে থানাতল্লাশির দাবি করে হো-হা বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, 'ম্যাচুলেস—বঙ্গসাহিত্যে এ জায়গাটার দেশলাই মেলে না, একটু পোড়াকারিও না।' আপনার লেখা ভয়ানক রিয়ালিস্টিক ক্ষিতীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।

ক্ষিতীশ। আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি ভয়ংকর, বিচার করবেন বিধাতাপুরুষ।

অর্চনা। না, ঠাট্টা করবেন না। সিঙাড়াটা শেষ করে ফেলুন. আপনি ওস্তাদ, ঠাট্টায় আপনার সঙ্গে পারব না। মোস্ট ইন্টারেস্টিং আপনার বইখানা। এমন-সব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ-যে মেয়েটা কী তার নাম—কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, 'মাই আইজ', 'ও গড'—লাজুক ছেলে স্যান্ডেলের সংকোচ ভাঙবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মতলব ছিল স্যান্ডেলকে দুই হাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। হবি তো হ স্যান্ডেলের হাতে হল কম্পউন্ড ফ্ল্যাকচার। কী ড্রামাটিক, রিয়ালিজমের চূড়ান্ত! ভালোবাসার এতবড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিল না। ভেবে দেখুন, সুভদ্রার কত বড়ো চান্স্ মারা গেল, আর অর্জুনেরও কর্জ্জ গেল বেঁচে!

ক্ষিতীশ। কম মডার্ন নন আপনি। আমার মতো নির্লজ্জকেও লজ্জা দিতে পারেন।

অর্চনা। দোহাই ক্ষিতীশবাবু, বিনয় করবেন না। আপনি নির্লজ্জ! লজ্জায় গলা দিয়ে সন্দেশ গলছে না। কলমটার কথা স্বতন্ত্র।

লীলা। (কিছু দূর থেকে) অর্চনামাসি, সময় হয়ে এল, ডাক পড়েছে।

অর্চনা। (জনান্তিকে) লীলা, আধমরা করেছি, বাকিটুকু তোর হাতে।

[অর্চনার প্রস্থান]

লীলা সাহিত্যে ফাস্ট্ ক্লাস এম. এ. ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স ধরেছে। রোগা শরীর, ঠাট্টা-তামাশায় তীক্ষ্ণ, সাজগোজে নিপুণ, কটাক্ষে দেখবার অভ্যাস।

লীলা। ক্ষিতীশবাবু, নমস্কার! আপনি 'সর্বত্র পূজ্যত্ব'র দলে। লুকোবেন কোথায়, পূজারী আপনাকে খুঁজে বের করে নিজের গরজে। এনেছি অটোগ্রাফের খাতা। সুযোগ কি কম।

কী লিখলেন দেখি। 'অন্য-সকলের মতো নয় যে-মানুষ তার মার অন্য-সকলের হাতে।' চমৎকার, কিন্তু প্যাথোটিক। মারে ঈর্ষা করে। মনে রাখবেন, ছোটো যারা তাদের ভক্তিরই একটা ইন্ডিয়ম ঈর্ষা, মারটা তাদের পূজা।

ক্ষিতীশ। বাগ্‌বাদিনীর জাতই বটে, কথায় আশ্চর্য করে দিলেন।

লীলা। বাচস্পতির জাত যে আপনারা। যেটা বললেম ওটা কোটেশন। পুরুষের লেখা থেকেই। আপনাদের প্রতিভা বাক্যরচনায়, আমাদের নৈপুণ্য বাক্যপ্রয়োগে। ওরিজিন্যালিটি আপনার বইয়ের পাতায় পাতায়। সেদিন আপনারই লেখা গল্পের বই পড়লেম। ব্রীলিয়েন্ট। ঐ-যে যাতে একজন মেয়ের কথা আছে, সে যখন দেখলে স্বামীর মন আর-এক জনের উপরে, বানিয়ে চিঠি লিখলে। স্বামীর কাছে প্রমাণ করে দিলে যে সে ভালোবাসে তাদের প্রতিবেশী বামনদাসকে। আশ্চর্য সাইকলজির ধাঁধা। বোঝা শক্ত, স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার এই ফন্দী, না তাকে নিষ্কৃতি দেবার ঔদার্য।

ক্ষিতীশ। না না, আপনি ওটা—

লীলা। বিনয় করবেন না। এমন ওরিজিন্যাল আইডিয়া, এমন ঝক্‌ঝকে ভাষা, এমন চরিত্র-চিত্র আপনার আর-কোনো লেখায় দেখি নি। আপনার নিজের রচনাকেও বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছেন। ওতে আপনার মদ্রাদোষগুলো নেই, অথচ—

ক্ষিতীশ। ভুল করছেন আপনি। 'রক্তজবা'—ও বইটা যতীন ঘটকের।

লীলা। বলেন কী! হি, হি, এমন ভুলও হয়! যতীন ঘটককে যে আপনি রোজ দু-বেলা গাল দিয়ে থাকেন। আমার এ কী বুদ্ধি! মাপ করবেন আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ। আপনার জন্যে আর-এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—রাগ করে ফিরিয়ে দেবেন না।

[লীলার প্রস্থান]

রাজাবাহাদুর সোমশংকরের প্রবেশ

রাঘবংশিক চেহারা 'শালপ্রাংশুর্মহাভূজঃ' রোদ্রে পড়ে ঈষৎ স্নান গৌরবর্ণ, ভারী মুখ, দাড়িগোঁফ-কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচকান, সাদা মসলিনের পাঞ্জাবী কায়দার পাগড়ি, শাড়তোলা সাদা নাগরাজুতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।

সোমশংকর। ক্ষিতীশবাবু, বসতে পারি কি।

ক্ষিতীশ। নিশ্চয়।

সোমশংকর। আমার নাম সোমশংকর সিং। আপনার নাম শুনোছি মিস্ বাঁশরির কাছ থেকে। তিনি আপনার ভক্ত।

ক্ষিতীশ। বোঝা কঠিন। অন্তত ভক্তিটা অবিমিশ্র নয়। তার থেকে ফুলের অংশ ঝরে পড়ে, কাঁটাগুলো দিনরাত থাকে বিণ্ধে।

সোমশংকর। আমার দুর্ভাগ্য আপনার বই পড়বার অবকাশ পাই নি। তবু আমাদের এই বিশেষ দিনে আপনি এখানে এসেছেন, বড়ো কৃতজ্ঞ হলাম। কোনো এক সময়ে আমাদের শম্ভুগড়ে আসবেন, এই আশা রইল। জায়গাটা আপনার মতো সাহিত্যিকের দেখবার যোগ্য।

বাঁশরি। (পিছন থেকে এসে) ভুল বলছ শংকর, যা চোখে দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ঠুর চোখ উলটো দিকে। সে কথা যাক। শংকর, ব্যস্ত হোয়ো না। এখানে আজ

আমার নেমন্তন্ন ছিল না। ধরে নিচ্ছি, সেটা আমার গ্রহের ভুল নয়, গৃহকর্তাদেরই ভুল। সংশোধন করতে এলুম। আজ সন্ধ্যার সঙ্গে তোমার এন্গেজমেন্টের দিন, অথচ এ সভায় আমি থাকব না এ হতেই পারে না। খুঁশি হও নি অনাহৃত এসেছি বলে?

সোমশংকর। খুব খুঁশি হয়েছি, সে কি বলতে হবে।

বাঁশরি। সেই কথাটা ভালো করে বলবার জন্যে একটু বোসো এখানে। ক্ষিতীশ, ঐ চাঁপা-গাছটার তলায় কিছুক্ষণ অস্থিতীয় হয়ে থাকো গে। আড়ালে তোমার নিদ্বে করব না।

[ক্ষিতীশের প্রস্থান]

শংকর, সময় বেশি নেই, কাজের কথাটা সেরে এখনই ছুটি দেব। তোমার নতুন এন্গেজমেন্টের রাস্তায় পুরোনো জঞ্জাল কিছু জমে আছে। সাফ করে ফেললে সুগম হবে পথ। এই নাও।

বাঁশরি রেশমের থলি থেকে একটা পামার কণ্ঠী, হীরের ব্রেসলেট, মস্কোবসানো ব্রোচ বের করে দেখিয়ে আবার থলিতে পুরে সোমশংকরের কোলে ফেলে দিলে।

সোমশংকর। বাঁশি, তুমি জান, আমার মুখে কথা জোগায় না। যা বলতে পারলেম না তার মানে নিজে বুদ্ধে নিয়ো।

বাঁশরি। সব কথাই আমার জানা, মানে আমি বুদ্ধি। এখন যাও, তোমাদের সময় হল।

সোমশংকর। যেয়ো না, বাঁশি। ভুল বুদ্ধো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শুনো যাও। আমি জঙ্গলের মানুষ। শহরে এসে কলেজে পড়ার আরম্ভের মূখে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছিলে, তার দাম কিছুতেই শোধ হবে না। তুচ্ছ এই গয়নাগুলো।

বাঁশরি। আমার শেষ কথাটা শোনো, শংকর। আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন-জাগা অরুণরঙের দিগন্তে। ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম। আত্মপরিচয় ঘটল। বাস্, দুই পক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন দুজনেই অক্ষণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম। আর কী চাই।

সোমশংকর। বাঁশি, যদি কিছু বলতে যাই নির্বোধের মতো বলব। বুদ্ধলুম, আমার আসল কথাটা বলা হবে না কোনোদিনই। আচ্ছা, তবে থাক্। অমন চুপ করে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন। মনে হচ্ছে, দুই চোখ দিয়ে আমাকে লুপ্ত করে দেবে।

বাঁশরি। আমি তাকিয়ে দেখছি একশো বছর পরেকার যুগান্তে। সে দিকে আমি নেই, তুমি নেই, আজকের দিনের অন্য কেউ নেই। ভুল বোঝার কথা বলছ! সেই ভুল বোঝার উপর দিয়ে চলে যাবে কালের রথ। ধুলো! হয়ে যাবে, সেই ধুলোর উপরে বসে খেলা করবে তোমার নাতি-নাতনিরা। সেই নির্বিকার ধুলোর হোক জয়।

সোমশংকর। এ গয়নাগুলোর কোথাও স্থান রইল না; যাক তবে।

[ফেলে দিলে ফোয়ারার জ্বলাশয়ে]

সন্ধ্যার বোন সন্ধ্যার প্রবেশ

ফুক পরা, চশমা চোখে, বেণী দোলানো, দ্রুতপদে চলা এগারো বছরের মেয়ে।

সন্ধ্যা। সন্ন্যাসীবাবা আসছেন, শংকরদা। তোমাকে ডেকে পাঠালেন সবাই। তুমি আসবে না, বাঁশিদিদি?

বাঁশরি। আসব বৈকি, আসার সময় হোক আগে।

[সোমশংকর ও সন্ধ্যার প্রস্থান]

ক্ষিতীশ, শুনো যাও। চোখ আছে। দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু?

ক্ষিতীশ। রংগভূমির বাইরে আমি। আওয়াজ পাচ্ছি, রাস্তা পাচ্ছি নে।

বাঁশরি। বাংলা উপন্যাসে নিয়মাকর্ষের রাস্তা খুলেছ নিজের জোরে আলকাতরা ঢেলে। এখানে পদতুলনাচের রাস্তাটা বের করতে তোমারও অক্ষীশিয়াল গাইড চাই! লোকে হাসবে যে!

ক্ষিতীশ। হাসুক-না। রাস্তা না পাই, অমন গাইডকে তো পাওয়া গেল।

বাঁশরি। রসিকতা! সস্তা মিষ্টানের ব্যাবসা! এজন্যে ডাকি নি তোমাকে। সত্যি করে দেখতে শেখো, সত্যি করে লিখতে শিখবে। চারি দিকে অনেক মানুষ আছে, অনেক অমানুষও আছে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে। দেখো দেখো, ভালো করে দেখো।

ক্ষিতীশ। নাই বা দেখলেম, তোমার তাতে কী।

বাঁশরি। নিজে লিখতে পারি নে যে, ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে বুদ্ধি, স্বর বন্ধ, ব্যর্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে, একদিন বাঙালি কারিগরদের বড়ো আঙুল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা বড়ো আঙুল কেটে দিয়েছেন। আমদানি-করা মালে কাজ চালাই, পরখ করে দেখতে হয় সেটা সাঁচা কি না। তোমরা লেখক, আমাদের মতো কলমহারাদের জন্যেই কলমের কাজ তোমাদের।

সুধমার প্রবেশ

দেখবামাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রঙ যাকে বলে
কনকগোর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।

সুধমা। (ক্ষিতীশকে নমস্কার ক'রে) বাঁশি, কোণে লুকিয়ে কেন।

বাঁশরি। কোনো সাহিত্যিককে বাইরে আনবার জন্য। খনির সোনাকে শানে চাঁড়িয়ে তার চেকনাই বের করতে পারি, আগে থাকতেই হাতযশ আছে। জহরতকে দামি করে তোলে জহরী পরের ভোগেরই জন্য, কী বল। সুধী, ইনিই ক্ষিতীশবাবু, জান বোধ হয়।

সুধমা। জানি বই-কি। এই সেদিন পড়িছিলুম গুঁর 'বোকার বুদ্ধি' গল্পটা। কাগজে কেন এত গাল দিয়েছে বুদ্ধিতে পারলুম না।

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ বইখানা গাল দেবার যোগ্য, এতই কী ভালো!

সুধমা। ওরকম ধারালো কথা বলবার ভার বাঁশরি আর ঐ আমার পিসতুতো বোন লীলার উপরে। আপনাদের মতো লেখকের বই সমালোচনা করতে ভয় করি, কেননা তাতে সমালোচনা করা হয় নিজেরই বিদ্যে-বুদ্ধির। অনেক কথা বুদ্ধিতেই পারি নে। বাঁশরির কল্যাণে আপনাকে কাছে পেয়েছি, দরকার হলে বুদ্ধিয়ে নেব।

বাঁশরি। ক্ষিতীশবাবু ন্যাচারল্ হিস্ট্রি লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে। দেখে দয়া হল। বললুম, জীবজন্তুর সাইকলজির খোঁজে গুহাগহবরে যেতে যদি খরচে না কুলোয়, অন্তত জুয়োলজিকালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে উর্কি মারতে দোষ কী।

সুধমা। তাই বুদ্ধি এনেছ এখানে?

বাঁশরি। পাপমুখে বলব কী করে। তাই তো বটে। ক্ষিতীশবাবুর হাত পাকা, মালমসলাও পাকা হওয়া চাই। যথাসাধ্য জোগাড় দেবার মজদুরিগিরি করছি।

সুধমা। ক্ষিতীশবাবু, একটু অবকাশ করে নিয়ে আমাদের ও দিকে যাবেন। মেয়েরা সদ্য আপনার বই কিনে আনিয়েছে সই নেবে বলে। সাহস করছে না কাছে আসতে। বাঁশি, ঠুকে একলা ঘিরে রেখে কেন অভিশাপ কুড়োচ্ছ।

বাঁশরি। (উচ্চহাস্যে) সেই অভিশাপই তো মেয়েদের বর। সে তুমি জান। জয়যাত্রায় মেয়েদের লুটের মাল প্রতিবেশিনীর ঈর্ষা।

সুধমা। ক্ষিতীশবাবু, শেষ দরবার জানিয়ে গেলুম। গান্ধি পেরোবার স্বাধীনতা যদি থাকে একবার যাবেন ও দিকে।

[সুধমার প্রস্থান]

ক্ষিতীশ। কী আশ্চর্য ঠুকে দেখতে। বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্লুন্‌হিল্ড!

বাঁশরি। (তীরহাস্যে) হায় রে হায়, যত বড়ো দিগ্গজ পুরুষই হোক-না কেন সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রিয়লিস্ট বলে দেমাক কর, ভান কর মন্তর মান না। লাগল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে। আজও কচি মনটা রূপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিঁচড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি করে মনের উপরের চামড়াটাকে করে তুলেছ কড়া। দুর্বল বলেই বলের এত বড়াই।

ক্ষিতীশ। সে কথা মাথা হেঁট করেই মানব। পুরুষজাত দুর্বল জাত।

বাঁশরি। তোমরা আবার রিয়লিস্ট! রিয়লিস্ট মেয়েরা। যত বড়ো স্থূল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের। পাঁকে-ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স বানাই নে। রঙ মাখাই নে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব! ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো। পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা! মিনভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্ট, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা, মিনভা।

ক্ষিতীশ। বাঁশি, বৈদিককালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো—যাদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা, আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

বাঁশরি। সত্যি, সত্যি, খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।

ক্ষিতীশ। এর উপায়?

বাঁশরি। লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শস্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনভার মন্থোশটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে। সামনে পড়ল পথ-চলতি এক রাজা, শুরু করলে জাদু। কিসের জন্যে। টাকার জন্যে। শূনে রাখো, টাকা জিনিসটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের, ওটা তোমাদের রিয়লিজ্‌মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ। টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বুদ্ধির লক্ষণ, সেইসঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরি। আছে গো, হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজলে দেখতে পাবে, পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু মন্থা এক দিকে, হৃদয়টা আর-এক দিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনই জমবে গল্পটা। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে; বলবে, মেয়েদের খেলো করা হল, অর্থাৎ তাদের মন্ত্রশক্তিতে বোকাদের মনে খটকা লাগানো হচ্ছে। উঁচুদের পুরুষ পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রঙ চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কিন্তু ভয় কোরো না ক্ষিতীশ, রঙ যখন যাবে জ্বলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টিকে, শেলের মতো, শূলের মতো।

ক্ষিতীশ। শ্রীমতী সুষমার হৃদয়ের বর্তমান ঠিকানাটা জানতে পারি কি।

বাঁশরি। ঠিকানা বলতে হবে না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে যদি চোখ থাকে। এখন চলো ঐ দিকে। ওরা টেনিস-খেলা সেরে এসেছে। এখন আইসক্রিম পরিবেশনের পালা। বর্ণিত হবে কেন।

তৃতীয় দৃশ্য

বাগানের এক দিক। খাবার-টোবল ঘিরে বসে আছে তারক, শচীন, স্বেচ্ছাশ্রম, সতীশ ইত্যাদি।

তারক। বাড়াবাড়ি হচ্ছে সন্ন্যাসীকে নিয়ে। নাম পূরন্দর নয়, সবাই জানে। আসল নাম ধরা পড়লেই বোকার ভিড় পাতলা হয়ে যেত। দেশী কি বিদেশী তা নিয়েও মতভেদ। ধর্ম কী জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলে, ধর্মটা এখনো মরে নি তাই তাকে নামের কোঠায় ঠেসে দেওয়া চলে না। সেদিন দেখি, আমাদের হিম্মকে গল্ফ শেখাচ্ছে। হিম্মের জীবাত্মাটা কোনোমতে গল্ফের গুলির পিছনেই ছুটতে পারে, তার বেশি ওর দৌড় নেই, তাই সে ভক্তিতে গদগদ। মিস্টারিয়স সাজের নানা মাল-মসলা জুড়িয়েছে। আজ ওকে আমি একস্পোজ করব সবার সামনে, দেখে নিয়ো।

স্বেচ্ছাশ্রম। প্রমাণ করবে, তোমার চেয়ে যে বড়ো সে তোমার চেয়ে ছোটো!

সতীশ। আঃ স্বেচ্ছাশ্রম, মজাটা মার্ট করিস কেন। পকেট বাজিয়ে ও বলছে ডকুমেন্ট আছে। বের করুক-না, দেখি কী রকম চীজ সেটা। ঐ যে সন্ন্যাসী, সঙ্গে আসছেন এঁরা সবাই।

পূরন্দরের প্রবেশ

ললাট উন্নত, জ্বলছে দুই চোখ, ঠোঁটে রয়েছে অনুরূপিত অনুরূপিত, মুখের স্বচ্ছ রঙ পাশুর শ্যাম—অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ধৌত। দাড়ি-গোঁফ কামানো, স্বেচ্ছাশ্রম মাথায় ছোটো করে ছাঁটা চুল, পায়ে নেই জুতো, তসরের ধূতি পরা, গায়ে খয়েরি রঙের টিলে জামা। সঙ্গে স্বেচ্ছাশ্রম, সোমশংকর, বিভাসিনী।

শচীন। সন্ন্যাসীঠাকুর, বলতে ভয় করি, কিন্তু চা খেতে দোষ কী।

পূরন্দর। কিছুমাত্র না। যদি ভালো চা হয়। আজ থাক, এইমাত্র নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।

শচীন। নেমন্তন্ন আপনাকেও? লাগে নাকি। গ্রেট্‌ইস্টার্নে বোম্বের মোড়ব!

পূরন্দর। গ্রেট্‌ইস্টার্নেই যেতে হয়েছিল। ডাক্তার উইল্‌কিন্সের ওখানে।

শচীন। ডাক্তার উইল্‌কিন্স! কী উপলক্ষে।

পূরন্দর। যোগবাশিষ্ঠ পড়ছেন।

শচীন। বাস্ রে। ওহে তারক, এগিয়ে এসো-না!—কী-যে বলছিলেন।

তারক। এই ফোটোগ্রাফটা তো আপনার?

পূরন্দর। সন্দেহমাত্র নেই।

তারক। মোগলাই সাজ, সামনে গুড়গুড়ি, পাশে দাড়িওয়ালাটা কে। স্বেচ্ছাশ্রম যাবনিক।

পূরন্দর। রোশেনাবাদের নবাব। ইরানী বংশীয়। তোমার চেয়ে এঁর আয়রকু বিশুদ্ধ।

তারক। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে যে!

পূরন্দর। দেখাচ্ছে তুর্কির বাদশার মতো। নবাবসাহেব ভালোবাসেন আমাকে, আদর করে ডাকেন মুক্তিয়ার মিঞা, খাওয়ান এক থালায়। মেয়ের বিয়ে ছিল, আমাকে সাজিয়েছিলেন আপন বেশে।

তারক। মেয়ের বিয়েতে ভাগবতপাঠ ছিল বড়ি?

পূরন্দর। ছিল পোলোখেলার টুর্নামেন্ট। আমি ছিলুম নবাবসাহেবের আপন দলে।

তারক। কেমন সন্ন্যাসী আপনি।

পূরন্দর। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে। তোমার বাবা ছিলেন কাশীতে হরিহর তত্ত্বরত্ন, তিনি আমাকে যে নামে জানতেন সে নাম গেছে ঘুচে। তোমার দাদা রামসেবক বেদান্তভূষণ কিছুদিন পড়েছেন আমার কাছে বৈশেষিক। তুমি তারক লাহিড়ী, তোমার নাম ছিল বদকু, আজ স্বশ্রমের সুপারিশে কক্সহিল সাহেবের অ্যাটর্নি-অফিসে শিক্ষানবিশ। সাজ বদলেছে তোমার, তারক

নামের আদ্যক্ষরটা তবর্গ থেকে টবর্গে চড়েছে। শুনোছি যাবে বিলেতে। বিশ্বনাথের বাহনের প্রতি দয়া রেখো।

তারক। ডাক্তার উইল্‌কিন্সের কাছ থেকে কি ইন্ট্রোডাকশন চিঠি পাওয়া যেতে পারবে।

পূরন্দর। পাওয়া অসম্ভব নয়।

তারক। মাপ করবেন।

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রশ্ন

বাঁশরি। সুসমার মাস্টারিতে আজ ইস্তফা দিতে এসেছেন?

পূরন্দর। কেন দেব। আরো-একটি ছাত্র বাড়ল।

বাঁশরি। শুরু করাবেন মৃদুবোধের পাঠ? মৃদুতার তলায় ডুবছে যে মানুষটা হঠাৎ তার বোধোদয় হলে নাড়ী ছাড়বে।

পূরন্দর। (কিছুক্ষণ বাঁশরির মূখের দিকে তাকিয়ে) বৎসে, একেই বলে ধৃষ্টতা।

বাঁশরি মূখ ফিরিয়ে সরে গেল

বিভাসিনী। সময় হয়েছে। ঘরের মধ্যে সভা প্রস্তুত, চলুন সকলে।

সকলের ঘরে প্রবেশ

দরজা পর্যন্ত গিয়ে বাঁশরি থমকে দাঁড়াল

ক্ষিতীশ। তুমি যাবে না ঘরে?

বাঁশরি। সস্তাদরের সদুপদেশ শোনবার শখ আমার নেই।

ক্ষিতীশ। সদুপদেশ!

বাঁশরি। এই তো সুযোগ। পালাবার রাস্তা বন্ধ। জালিয়ানওয়ালাবাগের মার।

ক্ষিতীশ। আমি একবার দেখে আসি গে।

বাঁশরি। না। শোনো, প্রশ্ন আছে। সাহিত্যসম্মেলন, গল্পটার মর্ম যেখানে, সেখানে পৌঁছেছে তোমার দৃষ্টি?

ক্ষিতীশ। আমার হয়েছে অন্ধ-গোলাঙুল ন্যায়। লেজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেরেছে আমাকে কিন্তু চেহারা রয়েছে অস্পষ্ট। মোট কথাটা এই বুঝেছি যে, সুসমা বিয়ে করবে রাজা-বাহাদুরকে, পাবে রাজৈশ্বর্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

বাঁশরি। তবে শোনো বলি। সোমশংকর নয় প্রধান নায়ক, এ কথা মনে রেখো।

ক্ষিতীশ। তাই নাকি। তা হলে অন্তত গল্পটার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তার পরে সাঁতরিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক, পারে পৌঁছব।

বাঁশরি। হয়তো জান পূরন্দর তরুণসমাজে বিনা মাইনের মাস্টারি করেন। পরীক্ষার উৎসর্গে দিতে অম্বিতীয়। কড়া বাছাই করে নেন ছাত্র। ছাত্রী পেতে পারতেন অসংখ্য, কিন্তু বাছাইরীতি এত অসম্ভব কঠিন যে, এতদিনে একটিমাত্র পেয়েছেন, তার নাম শ্রীমতী সুসমা সেন।

ক্ষিতীশ। ছাত্রী যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের কী দশা।

বাঁশরি। আত্মহত্যার সংখ্যা কত, খবর পাই নি। এটা জানি, তাদের অনেকেই চণ্ড মেলে চেয়ে আছে উর্ধ্ব।

ক্ষিতীশ। সেই চকোরীর দলে নাম লেখাও নি?

বাঁশরি। তোমার কী মনে হয়।

ক্ষিতীশ। আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চণ্ড মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

বাঁশরি। ধন্য! নরনারীর ধাত বুঝতে পয়লা নম্বর, গোল্ড্ মেডালিস্ট্। লোকে বলে নারী-

স্বভাবের রহস্যভেদ করতে হার মানেন স্বয়ং নারীর সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত, কিন্তু তুমি নারীচরিত্রচারণ-চক্রবর্তী, নমস্কার তোমাকে।

ক্ষিতীশ। (করজোড়ে) বন্দনা সারা হল, এবার বর্ণনার পালা শুরুর হোক।

বাঁশরি। এটা আন্দাজ করতে পার নি যে, সূর্যমা ঐ সন্ন্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষ-পর্যন্ত তলিয়ে গেছে?

ক্ষিতীশ। ভালোবাসা না ভক্তি?

বাঁশরি। চরিত্রবিশারদ, লিখে রাখো, মেয়েদের যে ভালোবাসা পেঁছায় ভক্তিতে সেটা তাদের মহাপ্রয়াণ—সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। অভিভূত যে পুরুষ ওদের সমান প্ল্যাটফর্মে নামে সেই গরিবের জন্য থার্ড ক্লাস, বড়োজোর ইন্টারমীডিয়েট। সেলুনগাড়ি তো নয়ই। যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল না, ওদের ভুজপাশের দিগ্বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্যগগনে, দুই হাত উর্ধ্বে তুলে মেয়েরা তারই উদ্দেশে দিল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। দেখ নি তুমি, সন্ন্যাসী যেখানে মেয়েদের সেখানে কী ঠেলাঠেলি ভিড়।

ক্ষিতীশ। তা হবে। কিন্তু তার উলটোটাও দেখেছি। মেয়েদের বিষম টান একেবারে তাজা বর্বারের প্রতি। পুরুষিত হয়ে ওঠে তাদের অপমানের কঠোরতায়, পিছন পিছন রসাতল পর্যন্ত যেতে রাজি।

বাঁশরি। তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই 'পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিংবা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, বোঝা গেল সন্ন্যাসীকে ভালোবাসে ঐ সূর্যমা। তার পরে?

বাঁশরি। সে কী ভালোবাসা! মরণের বাড়া! সংকোচ ছিল না, কেননা একে সে ভক্তি বলেই জানত। পুরুষের দূরে যেত আপন কাজে, সূর্যমা তখন যেত শূন্যে, মুখ হয়ে যেত ফ্যাকাশে। চোখে প্রকাশ পেত জ্বালা, মন শূন্যে শূন্যে খুঁজে বেড়াত কার দর্শন। বিষম ভাবনা হল মায়ের মনে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাঁশি, কী করি।' আমার বুদ্ধির উপর তখন তাঁর ভরসা ছিল। আমি বললেম, 'দাও-না পুরুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে।' তিনি তো আঁতকে উঠলেন, বললেন, 'এমন কথা ভাবতেও পার?' তখন নিজেই গেলুম পুরুষের কাছে। সোজা বললুম, 'নিশ্চয়ই জানেন, সূর্যমা আপনাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে করে উদ্ধার করুন বিপদ থেকে।' এমন করে মানুষটা তাকাল আমার মুখের দিকে, রক্ত জল হয়ে গেল। গম্ভীর সুরে বললে, 'সূর্যমা আমার ছাত্রী, তার ভার আমার 'পরে আর আমার ভার তোমার 'পরে নয়।' পুরুষের কাছ থেকে এতবড়ো ধাক্কা জীবনে এই প্রথম। ধারণা ছিল, সব পুরুষের 'পরেই সব মেয়ের আবদার চলে, যদি নিঃসংকোচ সাহস থাকে। দেখলুম দুর্ভেদ্য দুর্গও আছে। মেয়েদের সাংঘাতিক বিপদ সেই বন্ধ কপাটের সামনে, ডাকও আসে সেইখান থেকে, কপালও ভাঙে সেইখানটায়।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা বাঁশি, সত্যি করে বলো, সন্ন্যাসী তোমারও মনকে টেনেছিল কি না।

বাঁশরি। দেখো, সাইকলজির অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের মহলে কুলদূপ দেওয়া ঘর। নিষিদ্ধ দরজা না খোলাই ভালো; সদরমহলেই যথেষ্ট গোলমাল, সামলাতে পারলে বাঁচি। আজ যে-পর্যন্ত শুনলে তার পরের অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে একখানা চিঠি থেকে। পরে দেখাব।

ক্ষিতীশ। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখো, বাঁশি। পুরুষের আঙুটি বদল করাচ্ছে। জানলার থেকে সূর্যমার মুখের উপর পড়েছে রোদের রেখা। স্তম্ভ হয়ে বসে আছে, শান্ত মুখ, জল ঝরে পড়ছে দুই চোখ দিয়ে। বরফের পাহাড়ে যেন সূর্যাস্ত, গলে পড়ছে ঝরনা।

বাঁশরি। সোমশংকরের মুখের দিকে দেখো—সুখ না দুঃখ, বাঁধন পরছে না ছিঁড়ছে? আর পুরুষের, সে যেন ঐ সূর্যেরই আলো। তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে লক্ষ যোজন দূরে, মেয়েটার মনে যে অগ্নিকান্ড চলছে তার সঙ্গে কোনো যোগই নেই। অথচ তাকে ঘিরে একটা জ্বলন্ত ছবি বানিয়ে দিলে।

ক্ষিতীশ। সুষমার 'পরে সন্ন্যাসীর মন এতই যদি নির্লিপ্ত তবে ওকেই বেছে নিলে কেন।

বাঁশরি। ও যে আইডিয়ালিস্ট! বাস্ রে! এতবড়ো ভয়ংকর জীব জগতে নেই। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানুষকে নিজে খাবে বলে। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। খায় না খিদে পেলেও। বল দেয় সারে সারে, জেঁজিগসখাঁর চেয়ে সর্বনেশে।

ক্ষিতীশ। সন্ন্যাসীর 'পরে তোমার মনে মনে ভক্তি আছে বলেই তোমার ভাষা এত তীব্র।

বাঁশরি। যাকে-তাকে ভক্তি করতে না পেলে বাঁচে না যে-সব হ্যাংলা মেয়ে আমি তাদের দলে নই গো। রাজরানী যদি হতুম মেয়েদের চুলে দাঁড়ি পাকিয়ে ওকে দিতুম ফাঁসি। কামিনীকাণ্ডন ছোঁয় না-যে তা নয়, কিন্তু তাকে দেয় ফেলে ওর কোন্-এক জগন্নাথের রথের তলায়, বৃকের পাঁজর যায় গুঁড়িয়ে।

ক্ষিতীশ। ওর আইডিয়াটা কী জানা চাই তো।

বাঁশরি। সে আছে বাওয়ান্স বাঁও জলের নীচে। তোমার এলাকার বাইরে, সেখানে তোমার মন্দাকিনী-পদ্মাবতীর ডুবসাঁতার চলে না। আভাস পেয়েছি কোন্ ডাকঘর-বিবর্জিত দেশে ও এক সংঘ বানিয়েছে, তরুণতাপসসংঘ, সেখানে নানা পরীক্ষায় মানুষ তৈরি হচ্ছে।

ক্ষিতীশ। কিন্তু, তরুণী?

বাঁশরি। ওর মতে গৃহেই নারী, কিন্তু পথে নয়।

ক্ষিতীশ। তা হলে সুষমাকে কিসের প্রয়োজন।

বাঁশরি। অন্ন চাই-যে। মেয়েরা প্রহরণধারিণী না হোক বেড়িহাতা-ধারিণী তো বটে। রাজ-ভান্ডারের চাবিটা থাকবে ওরই হাতে। ঐ-যে ওরা বেরিয়ে আসছে, অনুষ্ঠান শেষ হল বৃষ্টি।

[পুরুন্দর ও অন্য সকলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে

পুরুন্দর। (সোমশংকর ও সুষমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে) তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয়, বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা বৎসে, যে সম্বন্ধ মূর্ত্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে ধিক্ তাকে। পুরুন্দর কর্ম করে, স্ত্রী শক্তি দেয়। মূর্ত্তির রথ কর্ম, মূর্ত্তির বাহন শক্তি। সুষমা, ধনে তোমার লোভ নেই, তাই ধনে তোমার অধিকার। তুমি সন্ন্যাসীর শিষ্যা, তাই রাজার গৃহিণীপদে তোমার পূর্ণতা।

(ডান হাতে সোমশংকরের ডান হাত ধরে)

তস্মাৎ তুমুর্দন্তিষ্ঠ যশোলভস্ব

জিহ্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ওঠো, তুমি যশোলাভ করো। শত্রুদের জয় করো—যে রাজ্য অসীম সমৃদ্ধিবান তাকে ভোগ করো। বৎস, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করো প্রণামের মন্ত্র।

নমঃ পুরুস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতন্তে

নমোস্তুতে সর্বত এব সর্ব।

অনন্তবীৰ্য্যমিতবিক্রমস্ ত্বং

সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ।

তোমাকে নমস্কার সমুখ থেকে, তোমাকে নমস্কার পশ্চাৎ থেকে, হে সর্ব, তোমাকে নমস্কার সর্ব দিক থেকে। অনন্তবীৰ্য্য তুমি, অমিতবিক্রম তুমি, তোমাতেই সর্ব, তুমিই সর্ব!

ক্ষণকালের জন্য যবনিকা পড়ে তখনই উঠে গেল। তখন রাতি,
আকাশে তারা দেখা যায়। সুষমা ও তার বন্ধু নন্দা।

সুষমা। এইবার সেই গানটা গা দেখি ভাই।

নন্দা।

গান

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,
 তেয়াগিলে আসে হাতে,
 দিবসে সে-ধন হারিয়েছি আমি
 পেয়েছি অধার রাতে।
 না দেখিবে তারে পরশিবে না গো,
 তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো,
 তারায় তারায় রবে তারি বাণী,
 কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।
 তারি লাগি যত ফেলোছি অশ্রুজল
 বীণাবাদিনীর শতদলদলে
 করিছে সে টলমল।
 মোর গানে গানে পলকে পলকে
 ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
 শান্ত হাসির করুণ আলোক
 ভাতিছে নয়নপাতে।

পদ্রুন্দরের প্রবেশ

সুধমা। (ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে) প্রভু, দুর্বল আমি। মনের গোপনে যদি পাপ থাকে ধুয়ে দাও, মূছে দাও। আসক্তি দূর হোক, জয়যুক্ত হোক তোমার বাণী।

পদ্রুন্দর। বৎসে, নিজেকে নিন্দা কোরো না, অবিশ্বাস কোরো না, নাস্ত্রানমবসাদয়েৎ। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আজ তোমার মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে মাধুর্যে, কাল সেই সত্য অনাবৃত করবে আপন জগজ্জয়িনী বীরশক্তি।

সুধমা। আজ সন্ধ্যায় এইখানে তোমার প্রসন্নদৃষ্টির সামনে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হল। তোমারই পথ হোক আমার পথ।

পদ্রুন্দর। তোমাদের কাছ থেকে দূরে যাবার সময় আসন্ন হয়েছে।

সুধমা। দয়া করো প্রভু, ত্যাগ কোরো না আমাকে। নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না। তুমি চলে গেলে আমার সমস্ত শক্তি যাবে তোমারই সংগে।

পদ্রুন্দর। আমি দূরে গেলেই তোমার শক্তি তোমার মধ্যে ধ্রুবপ্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার হৃদয়দ্বার খুলে দিয়েছি নিজে স্থান নেব বলে নয়। যিনি আমার ব্রতপতি তিনি সেখানে স্থান গ্রহণ করুন। আমার দেবতা হোন তোমারই দেবতা, দুঃখকে ভয় নেই, আনন্দিত হও আত্মজয়ী আপনারই মধ্যে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরের মহত্ত্ব তুমি আপন অন্তরের থেকে চিনতে পেরেছ?

সুধমা। পেরেছি।

পদ্রুন্দর। সেই দুর্লভ মহত্ত্বকে তোমার দুর্লভ সেবার দ্বারা মূল্যদান করে গৌরবান্বিত করবে, তার বীর্যকে সর্বোচ্চ সার্থকতার দিকে আনন্দে উল্লসিত রাখবে, এই নারীর কাজ; মনে রেখো, তোমার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে। এই কথাটি ভুলো না।

সুধমা। কখনো ভুলব না।

পদ্রুন্দর। প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয়, এইজন্যই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করতে পারে, তোমার কাছে এই আমার শেষ কথা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চৌরঙ্গি-অঙ্গলে বাঁশরিদের বাড়ি। ক্ষিতীশ ও বাঁশরি

ক্ষিতীশ। তোমার হিন্দুস্থানী শোফারটা ভোরবেলা মন্থম্‌ম্‌হু বাজাতে লাগল গাড়ির ভেঁপু। চেনা আওয়াজ, ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম।

বাঁশরি। ভোরবেলায়? অর্থাৎ?

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ আটটার কম হবে না।

বাঁশরি। অকালবোধন!

ক্ষিতীশ। দঃখ নেই, তবু জানতে চাই কারণটা। কোনো কারণ না থাকলেও নালিশ করব না।

বাঁশরি। বুঝিয়ে বলছি। লেখবার বেলায় নালিনাক্ষের দল বলে যাদের দাগা দিয়েছ তাদের সামনে এলেই দেখি তোমার মন যায় এতটুকু হয়ে। মনে মনে চের্চিয়ে নিজেকে বোঝাতে থাক— ওরা তো ডেকোরেটেড ফুল্‌স্‌। কিন্তু, সেই স্বগতোক্তি সৎকোচ চাপা পড়ে না। সাহিত্যিক আভিজাত্যবোধকে অন্তরের মধ্যে ফাঁপিয়ে তোল তবু নিজেকে ওদের সমান বহরে দাঁড় করাতে পার না। সেই চিন্তাবিক্ষেপ থেকে বাঁচবার জন্য নালিনাক্ষ-দলের দিন আরম্ভ হবার পূর্বেই তোমাকে ডাকিয়েছি। সকালবেলায় অন্তত নটা পর্যন্ত আমাদের এখানে রাতের উত্তরাকান্ড। আপাতত এ বাড়িটা সাহারা মরুভূমির মতো নির্জন।

ক্ষিতীশ। ওয়েসিস দেখতে পাচ্ছি এই ঘরটার সীমানায়।

বাঁশরি। ওগো পৃথক, ওয়েসিস নয়, ভালো করে যখন চিনবে তখন বুঝবে মরীচিকা।

ক্ষিতীশ। আমার মাথায় আরো উপমা আসছে বাঁশি, আজ তোমার সকালবেলাকার অসঞ্জিত রূপ দেখাচ্ছে যেন সকালবেলাকার অলস চাঁদের মতো।

বাঁশরি। দোহাই তোমার, গদগদ ভাবটা রেখে দিয়ো একলা-ঘরের বিজনবিরহের জন্য। মৃগ্ধ দৃষ্টি তোমাকে মানায় না। কাজের জন্য ভেঁকেছি, বাজে কথা স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড।

ক্ষিতীশ। এর থেকে ভাষার রেলোটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা গম্যান্তিক জরুরি তোমার পক্ষে তা কের্ণিয়ে-ফেলা বাজে।

বাঁশরি। আজ সকালে এই আমার শেষ অনুরোধ, গাঁজিয়ে-ওঠা রসের ফেনা দিয়ে তাড়িখানা বানিয়ে না নিজের ব্যবহারটাকে। আর্টিস্টের দায়িত্ব তোমার।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, তবে মেনে নিলুম দায়িত্ব।

বাঁশরি। সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্রাজেডির সংকেত—আগুননের সাপ ফণা ধরেছে—এখনো চেঁতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হল না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুননের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টের চোখে, বলতে পারছি নে আর্টিস্টের কণ্ঠে। স্বস্তি যদি বোবা হতেন তা হলে অসংখ্য বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।

ক্ষিতীশ। কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিস্ট! তুমি যেন হীরে-মুকোর হরির লুঠ দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায়, দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরি। আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা—সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায়, হাতে হাতে, দিনে দিনে। ঘরে ঘরে মন্থম্‌হুতে মন্থম্‌হুতে সেগলো ওঠে আর মেলায়।

ক্ষিতীশ। পুরুষ আর্টিস্টকে এবার মেয়েছ ঠেলা, আচ্ছা বেশ, কাজ আরম্ভ হোক। সেদিন বলেছিলে একটা চিঠির কথা।

বাঁশরি। এই সেই চিঠি। সম্যাসী বলছেন—প্রেমে মানুষের মূর্তি সর্বত্র। কবির যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নির্বিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে; প্রকৃতি রঙিন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাশে, তাতে যে মাতলামি তীর হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকেও পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশার বশ করা যায়। সংসারের যত দুঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্টা সত্য কোন্টা মিথ্যে চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মূর্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

ক্ষিতীশ। শুনলেম চিঠি, তার পরে?

বাঁশরি। তার পরে তোমার মাথা! অর্থাৎ তোমার কল্পনা। মনে মনে শুনতে পাচ্ছ না? শিষ্যকে বলছেন, ভালোবাসা আমাকে নয়, অন্য কাউকেও নয়। নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন, এই হল দীক্ষামন্ত্র।

ক্ষিতীশ। তা হলে এর মধ্যে সোমশংকর আসে কোথা থেকে।

বাঁশরি। প্রেমের সরকারি রাস্তায়, যে প্রেমে সকলেরই সমান অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখকপ্রবর, তোমার সামনে সমস্যাটা এই যে, খোলা হাওয়ায় সোমশংকরের পেট ভরবে কি।

ক্ষিতীশ। কী জানি। সূচনায় তো দেখতে পাচ্ছি শূন্যপুরাণের পালা।

বাঁশরি। কিন্তু, শূন্যে এসে কি ঠেকতে পারে কিছুর। শেষ মোকামে তো পেঁপেছল গাড়ি, এ-পর্যন্ত রথ চালিয়ে এলেন সম্যাসীসারথি! আড্ডা-বদলের সময় যখন একদিন আসবে তখন লাগাম পড়বে কার হাতে। সেই কথাটা বলো-না রিয়ালিস্ট?

ক্ষিতীশ। যাকে গুরা নাক সিটকে প্রকৃতি বলেন, সেই মায়াবিনীর হাতে। পাখা নেই অথচ আকাশে উড়তে চায় যে স্থূল জীবটা তাকে যিনি ধপ করে মাটিতে ফেলে চট্কা দেন ভাঙিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সর্বাপেক্ষে লাগিয়ে দেন ধুলো।

বাঁশরি। প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিষ্যতের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে; শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম্, নোংরামিকে নয়। লেখো লেখো, দেরি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেখুক, এতদিন পরে বাংলার দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

ক্ষিতীশ। ইস্, তোমার মনটা নেমেছে ভল্ক্যানোর জঠরাগ্নির মধ্যে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওদের অবস্থায় পড়লে কী করতে তুমি।

বাঁশরি। সম্যাসীর উপদেশ সোনার জলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতুম। তার পরে প্রবৃত্তির জোর কলমে তার প্রত্যেক অক্ষরের উপর দিতুম কালির আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মনে, সম্যাসীও জাদু করতেই চায় উলটো মন্ত্রে। ওর মধ্যে একটা মন্ত্র নিতুম মাথায়, আর-একটা মন্ত্র প্রতিদিন প্রতিবাদ করতুম হৃদয়ে।

ক্ষিতীশ। এখন কাজের কথা পাড়া যাক। ইতিহাসের গোড়ার দিকটায় ফাঁক রয়েছে। ওদের বিবাহসম্বন্ধ সম্যাসী ঘটালো কী উপায়ে।

বাঁশরি। প্রথমত সেনবংশ যে ক্ষত্রিয়, সেনানী শব্দ থেকে তার পদবীর উদ্ভব, ওরা যে কোনো-এক খ্রিস্ট-শতাব্দীতে এসেছিল কোনো-এক দক্ষিণপ্রদেশ থেকে দিগ্বিজয়ীবাহিনীর পতাকা নিয়ে বাংলার কোনো-এক বিশেষ বিভাগে, সেইটে প্রমাণ করে লিখল এক সংস্কৃত পুঁথি। কাশীর দ্রাবিড়ী পণ্ডিত করলে তার সমর্থন। সম্যাসী স্বয়ং গেল সোমশংকরদের রাজ্যে। প্রজারা হাঁ করে রইল ওর চেহারা দেখে; কানাকানি করতে লাগল, কোনো-একটা দেব-অংশের ঝালাই দিয়ে এর দেহখানা তৈরি। সভাপণ্ডিত মুগ্ধ হল শৈবদর্শনব্যাখ্যায়। রাজাবাহাদুরের মনটা সাদা, দেহটা

জোরালো, তাতে লাগল কিছ্‌র সন্ধ্যাসীর মন্ত, কিছ্‌র লাগল প্রকৃতির মোহ। তার পরে এই যা দেখছ।

ক্ষিতীশ। হায় রে, সন্ধ্যাসী কি আমাদের মতো অভাজনদের হয়ে স্থূল প্রকৃতির তরফে ঘটকালি করেন না।

বাঁশরি। রাখো তোমার ছিবলেমি। ভুল করেছি তোমাকে নিয়ে। যে মানুষ খাঁটি লিখিয়ে তার সামনে যখন দেখা দিয়েছে সৃষ্টিকল্পনার এমন একটা জীবন্ত আদর্শ, দব্‌ দব্‌ করছে যার নাড়ী, তার মূখ দিয়ে কি বোরোয় খেলো কথা। কেমন করে জাগাব তোমাকে। আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি একটা মহারচনার পূর্বরাগ, শুনছি তার অন্তহীন নীরস কান্না। দেখতে পাচ্ছ না অদৃষ্টের একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ? থাক্‌ গে, শেষ হল আমার কথা। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতে চললুম।

[প্রস্থানোদ্যম]

ক্ষিতীশ। (ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে) চাই নে খাবার। যেয়ো না তুমি।

বাঁশরি। (হাত ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চহাস্যে) তোমার 'বেমানান' গল্পের নায়িকা পেয়েছ আমাকে! আমি ভয়ংকর সত্যি।

ড্রোইসিং-গাউন-পরা সতীশের প্রবেশ

সতীশ। উচ্চহাসির আওয়াজ শুনলুম যে।

বাঁশরি। উনি এতক্ষণ স্টেজের মুনুবাবদুর নকল করছিলেন।

সতীশ। ক্ষিতীশবাবদুর নকল আসে নাকি।

বাঁশরি। আসে বই-কি, গুঁর লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায়। তুমি এ'র কাছে একটু বোসো, আমি গুঁর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিই গে।

ক্ষিতীশ। দরকার নেই, কাজ আছে, দেরি করতে পারব না।

[প্রস্থান]

বাঁশরি। মনে থাকে যেন আজ বিকেলে সিনেমা—তোমারই 'পদ্মাবতী'।

ক্ষিতীশ। (নেপথ্য হতে) সময় হবে না।

বাঁশরি। হবেই সময়, অন্য দিনের চেয়ে দূ-ঘণ্টা আগে।

সতীশ। আচ্ছা বাঁশি, ঐ ক্ষিতীশের মধ্যে কী দেখতে পাও বলো তো।

বাঁশরি। বিধাতা ওকে যে পরীক্ষার কাগজটা দিয়েছিলেন, দেখতে পাই তার উত্তরটা। আর দেখি তারই মাঝখানে পরীক্ষকের একটা মস্ত কাটা দাগ।

সতীশ। এমন ফেল-করা জিনিস নিয়ে করবে কী।

বাঁশরি। ডান হাত ধরে ওকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেব।

সতীশ। তার পরে বাঁ হাত দিয়ে প্রাইজ দেবার প্ল্যান আছে নাকি।

বাঁশরি। দিলে পরের ছেলের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে।

সতীশ। ঘরের ছেলের প্রতিও। এ দিকে ও মহলের হাল খবরটা শুনছে?

বাঁশরি। ও মহলের খবর এ মহলে এসে পৌঁছয় না। হাওয়া বইছে উলটো দিকে।

সতীশ। কথা ছিল সুষমার বিয়ে হবে মাসখানেক বাদে, সম্প্রতি স্থির হয়েছে আসছে হুণ্ডায়।

বাঁশরি। হঠাৎ দম এত দ্রুতবেগে চড়িয়ে দিলে যে?

সতীশ। ওদের হৃৎপিণ্ড কে'পে উঠেছে দ্রুতবেগে, হঠাৎ দেখেছে তোমাকে রণরঞ্জিনী বেশে। তোমার তীর ছোট্টর আগেই ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়—এইরকম আন্দাজ।

বাঁশরি। আমার তীর! আধমরা প্রাণীকে আমি ছুঁই নে। বনমালী, মোটর ডাকো।

[বাঁশরির প্রস্থান]

শৈলের প্রবেশ

বয়স বাইশ কিন্তু দেখে মনে হয়, ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে।

তনু দেহ শ্যামবর্ণ, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, মুখের ভাব মমতায় ভরা।

সতীশ। কী আশ্চর্য। ভোরের স্বপ্নে আজ তোমাকেই দেখেছি, শৈল। তুমিও আমাকে দেখেছ নিশ্চয়।

শৈল। না, দেখি নি তো।

সতীশ। আঃ, বানিয়ে বলো-না কেন। বড়ো নিষ্ঠুর তুমি। আমার দিনটা মধুর হয়ে উঠত তা হলে।

শৈল। তোমাদের ফরমাশে নিজেকে স্বপ্ন করে বানাতে হবে! আমরা যা, শুধু তাই নিয়ে তোমাদের মন খুঁশি হয় না কেন।

সতীশ। খুব হয়, এই-যে সাক্ষাৎ এসেছে এর চেয়ে আর কিসের দরকার।

শৈল। আমি এসেছি বাঁশির কাছে।

সতীশ। ঐ দেখো, আবার একটা সত্য কথা। সদ্য বিছানা থেকে উঠেই দু-দুটো খাঁটি সত্য কথা সহ্য করি এত মনের জোর নেই। ধর্মরাজ মাপ করতেন তোমাকে যদি বলতে আমারই জন্য এসেছে।

শৈল। ব্যারিস্টার মানুষ, তুমি বড় লিটরল। বাঁশির কাছে আসতে চেয়েছি বলে তোমার কাছে আসবার কথা মনে ছিল না এটা ধরে নিলে কেন।

সতীশ। খোঁটা দেবার জন্যে। বাঁশির সঙ্গে কথা আছে কিছু? আমাদের লগ্ন স্থির করবার পরামর্শ?

শৈল। না, কোনো কথা নেই। ওর জন্য বড়ো মন খারাপ হয়ে থাকে। মনের মধ্যে মরণবাণ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অথচ কবুল করবার মেয়ে নয়। ওর ব্যথায় হাত বুলোতে গেলে ফোঁস করে ওঠে, সেটা যেন সাপের মাথার মণি। তাই সময় পেলে কাছে এসে বসি, যা-তা বকে বাই। পরশুদিন সকালে এসেছিলুম ওর ঘরে। পায়ের শব্দ পায় নি। ওর সামনে এক বান্ডিল চিঠি। ডেস্কের ঝুঁকে পড়িছিল বসে, বেশ বুদ্ধিতে পারলুম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যদি জানত আমি দেখতে পেয়েছি তা হলে একটা কাণ্ড বাধত, বোধ হয় আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। আস্তে আস্তে চলে গেলুম। কিন্তু, সেই ছবি আমি ভুলতে পারি নে। বাঁশি গেল কোথায়।

খানসামা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল

সতীশ। বাঁশি এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, ভাগ্যিস গেছে।

শৈল। ভারি স্বার্থপর তুমি।

সতীশ। অত্যন্ত। ও কী, উঠছ কেন। চা তৈরি শুরুর করো।

শৈল। খেয়ে এসেছি।

সতীশ। তা হোক-না, আমি তো খাই নি। বসে খাওয়াও আমাকে। কবিরাজী মতে একলা চা খাওয়া নিষেধ, ওতে বায়ু প্রকুপিত হয়ে ওঠে।

শৈল। মিথ্যে আবদার কর কেন।

সতীশ। সুযোগ পেলেই করি, তোমার মতো খাঁটি সত্য আমার ধাতে নেই। ঢালো চা, ও কী কবলে, চায়ে আমি চিনি দিই নে তুমি জান।

শৈল। ভুলে গিয়েছিলুম।

সতীশ। আমি হলে কখনো ভুলতুম না।

শৈল। আমাকে স্বপ্ন দেখে অবধি তোমার মেজাজের তো কোনো উন্নতি হয় নি। ঝগড়া করছ কেন।

সতীশ। কারণ মিষ্টি কথা পাড়লে তুমিই ঝগড়া বাধাতে। সীরিয়স হয়ে উঠতে।

শৈল। আচ্ছা থামো, তোমার চা খাওয়া হল?

সতীশ। হলেই যদি ওঠ তা হলে হয় নি।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। হরিশবাবু দলিলপত্র নিয়ে এসেছেন।

সতীশ। বলো ফর্সত নেই।

[ভূত্যের প্রস্থান]

শৈল। ও কী ও, কাজ কামাই করবে!

সতীশ। করব, আমার খুঁশি।

শৈল। আমি যে দায়ী হব।

সতীশ। তাতে সন্দেহ নেই, বিনা কারণে কেউ কাজ কামাই করে না।

নেপথ্য থেকে। সতীশদা!

সতীশ। ঐ রে! এল ওরা! বাড়িতে নেই বলবার সময় দিলে না।

সুধাংশুর সঙ্গে একদল লোকের প্রবেশ

অলক্ষুণের দল, সকালবেলায় মন্থ দেখলুম, উননের উপর হাঁড়ির তলা যাবে ফেটে।

সুধাংশু। মিস্ শৈল, ভীরু তোমার আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু আজ ছাড়ছি নে।

সতীশ। ভর দেখাও কেন। চাও কী।

শচীন। চাই লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবের চাঁদা। প্রথম দিন থেকেই বার্কি।

সতীশ। কী। আমি তোমাদের দলে! ভিগরস্ প্রোটেষ্ট জানাচ্ছি, বলবান অস্বীকৃতি।

নরেন। দলিল দেখাও।

সতীশ। আমার দলিল এই সামনে সশরীরে।

সুধাংশু। শৈলদেবী, এই বুদ্ধি! বে-আইনি প্রশ্রয় দেন পলাতককে।

শৈল। কিছু প্রশ্রয় দিই নে, নিন-না আপনাদের দাবি আদায় করে।

সতীশ। শৈল, যত তোমার সত্য আমার বেলায়। আর, এদের সামনে সত্যের অপলাপ—প্রশ্রয় দেও না বলতে চাও!

শৈল। কী প্রশ্রয় দিয়েছি।

সতীশ। এইমাত্র মাথার দাঁবি দিয়ে আমাকে চা খাওয়াতে বস নি? শ্রীহস্তে অজীর্ণ রোগের পত্তন আরম্ভ, তবু আমাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া!

শচীন। লোকটা লোভ দেখিয়ে কথা বলছে। শৈলদেবী, যদি শক্ত হয়ে থাকতে পার তা হলে ওকে আমাদের লাইফ-মেম্বর করে নিই।

সতীশ। আচ্ছা, তবে বলি শোনো। চাঁদা পাবা মাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার তা হলে এখনি বার্কি-বকেয়া সব শোধ করে দিই।

শচীন। শুধু চাঁদা নয়। আমাদের ঘরে নেই চা ডেলে দেবার লোক, যাদের ঘরে আছে সেখানে পালা করে চা খেতে বেরোই—তার পরে কিছু ভিক্ষে নিয়ে যাই—আজ এসেছি বাঁশরিদেবীর করকমল লক্ষ্য করে।

সতীশ। সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবী তার করকমলসুন্দর অনুপস্থিত। অতএব ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিটের নোটিশ দিচ্ছি, বেরোও তোমরা—ভাগো।

শৈল। আহা, ও কী কথা। না খেয়ে যাবেন কেন। আমি বুদ্ধি পারি নে খাওয়াতে? একটু বসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

[শৈলের প্রস্থান]

সতীশ। কিন্তু, ঐ যে ভিক্ষার কথাটা বললে, ভালো ঠেকল না। উদ্দেশ্যও বুঝতে পারছি নে।

সুধাংশু। কিংখাবের দোকানে আমাদের সমবেত দেনা আছে, আজ সমবেত চেষ্টায় শোধ করতে হবে।

সতীশ। কিংখাব! ভাবী লক্ষ্মীর আসন-রচনা?

শচীন। ঠিক তাই।

সতীশ। আশ্চর্য দূরদর্শিতা—

শচীন। না হে, অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।

শৈলের প্রবেশ

শৈল। সব প্রস্তুত, আসুন আপনারা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারান্দায় সোমশংকর। গহনার বাজ্ঞ খুলে জহুরি গহনা দেখাচ্ছে।
কাপড়ের গাঁঠির নিয়ে অপেক্ষা করছে কাশ্মীরী দোকানদার।

বাঁশরি। কিছ্‌ বলবার আছে।

সোমশংকর জহুরি ও কাশ্মীরীকে ইঙ্গিতে বিদায় করলে

সোমশংকর। ভেবেছিলুম আজই যাব তোমার কাছে।

বাঁশরি। ও-সব কথা থাক্‌। ভয় নেই, কান্নাকাটি করতে আসি নি। তবু আর-কিছ্‌ না হোক তোমার ভাবনা ভাববার অধিকার একদিন দিয়েছ আমাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— জান সুখমা তোমাকে ভালোবাসে না?

সোমশংকর। জানি।

বাঁশরি। তাতে তোমার কিছ্‌ই যায় আসে না?

সোমশংকর। কিছ্‌ই না।

বাঁশরি। তা হলে সংসারযাত্রাটা কিরকম হবে।

সোমশংকর। সংসারযাত্রার কথা ভাবছিই নে।

বাঁশরি। তবে কিসের কথা ভাবছ।

সোমশংকর। একমাত্র সুখমার কথা।

বাঁশরি। অর্থাৎ ভাবছ, তোমাকে ভালো না বেসেও কী করে সুখী হবে ঐ মেয়ে।

সোমশংকর। না, তা নয়। সুখী হবার কথা সুখমা ভাবে না— ভালোবাসারও দরকার নেই তার।

বাঁশরি। কিসের দরকার আছে তার, টাকার?

সোমশংকর। তোমার যোগ্য কথা হল না, বাঁশি।

বাঁশরি। আচ্ছা, ভুল করেছি। কিন্তু, প্রশ্নটার উত্তর বাকি। কিসের দরকার আছে সুখমার।

সোমশংকর। ওর একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমত সার্থক করা আমারও ব্রত।

বাঁশরি। ওর ব্রত আগে, তারই পশ্চাতে তোমার—পুরুষের মতো শোনাচ্ছে না, এ কথা ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই। এতবড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে ঐ সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা। শুনলুম সব, ভালো হল। গেল আমার শ্রদ্ধা ভেঙে, গেল আমার বন্ধন ছিঁড়ে। বয়স্ক শিশুকে মানুষ করবার কাজ আমার নয়, সে-কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ মেয়ের হাতে।

পদ্রুন্দরের প্রবেশ

সোমশংকর প্রণাম করলে, অশ্লিষ্টাচার মতো বাণির উঠে দাঁড়াল তার সামনে
বাণির। আজ রাগ করবেন না; ধৈর্য ধরবেন, কিছু প্রশ্ন করব।

[পদ্রুন্দরের ইঙ্গিতে সোমশংকরের প্রস্থান]

পদ্রুন্দর। আচ্ছা, বলো তুমি।

বাণির। জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরকে শ্রদ্ধা করেন আপনি? ওকে খেলার পুতুল বলে মনে করেন না?

পদ্রুন্দর। বিশেষ শ্রদ্ধা করি।

বাণির। তবে কেন এমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন ওর হাতে যে ওকে ভালোবাসে না।

পদ্রুন্দর। জান না এ অতি মহৎ ভার, একই কালে ক্ষত্রিয়ের পদ্রুন্দর এবং পরীক্ষা। সোমশংকরই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাণির। যোগ্য বলেই ওর চিরজীবনের সুখ নষ্ট করতে চান আপনি?

পদ্রুন্দর। সুখকে উপেক্ষা করতে পারে ঐ বীর মনের আনন্দে।

বাণির। আপনি মানবপ্রকৃতিকে মানেন না?

পদ্রুন্দর। মানবপ্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নয়।

বাণির। এতই যদি হল, ওরা বিয়ে নাই করত?

পদ্রুন্দর। ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পদ্রুন্দর, এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে-পদ্রুন্দর অনেকদিন খুঁজেছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

বাণির। পদ্রুন্দর বলেই বৃদ্ধিতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পদ্রুন্দর। মেয়ে বলেই বৃদ্ধিতে ইচ্ছা করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাণির। মোহ চাই, চাই, সম্ব্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের। তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে—সেই ব্রতের টানে তুমি মানুষের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়াতাড়া দিতে বসেছ—বৃদ্ধিতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ, তোমার স্ল্যানের মধ্যে খাপ-খাওয়াবার জন্য তৈরি হয় নি। আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ংকর তোমাদের মোহ।

পদ্রুন্দর। মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয়, এ কথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু, তুমিও এ কথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নিঃশব্দ হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, সুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। ব্রতই কঠিন হোক।

বাণির। সেইজন্যই সজীব নয় তোমার আইডিয়া, সম্ব্যাসী। তুমি জ্ঞান মন্ত, জ্ঞান না মানুষকে। মানুষের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যান্ডেজ বেঁধে অসহ্য বাথার পরে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি? টিকবে না ব্যান্ডেজ, ব্যথা যাবে থেকে। তোমরা সব অমানুষ, মানুষের বসতিতে এলে কী করতে। বাও-না তোমাদের গৃহাগৃহের বদরিকাশ্রমে। সেখানে মনের সাথে নিজেদের শূন্য করে পাথর করে ফেলো। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের তৃষ্ণার জল মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে ছিঁড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে চাও কোন্ করুণায়। ব্যর্থজীবনের অভিশাপ লাগবে না তোমাকে? যা নিজে ভোগ করতে জান না তা ভোগ করতে দেবে না ক্ষুধিতকে?

সুখমার প্রবেশ

এই যে সুখমা, শোন বলি। মরিয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেক, ভেবেছে

তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস জ্বলে জ্বলে? চাস নে তুই ভালোবাসা, কিন্তু যে-মেয়ে চায়, পাষণ সে করে নি আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চিরজীবনের আনন্দ। এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস, তবু তুই পুরুষ নোস। আইডিয়ার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।

সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর। বাঁশি, শান্ত হও, চলো এখান থেকে।

বাঁশরি। যাব না তো কী। মনে কোরো না মরব বুক ফেটে। জীবন হবে চিরচিত্তানলের শ্মশান। কখনো এমন বিচলিত দশা হয় নি আমার। আজ কেন এল বন্যার মতো এই পাগলামি। লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! তোমাদের তিনজনের সামনে এই অপমান! থামো সোমশংকর, আমাকে দয়া করতে এসো না। মদুছে ফেলব এই অপমান, কোনো চিহ্ন থাকবে না এর কাল। এই আমি বলে গেলুম।

[বাঁশরি ও সুষমার প্রস্থান]

পুরুন্দর। সোমশংকর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সোমশংকর। বলুন।

পুরুন্দর। যে-রত তুমি স্বীকার করেছ তা সম্পূর্ণই তোমার আপন হয়েছে কি। তার ক্রিয়া চলেছে তোমার প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে?

সোমশংকর। কেন সন্দেহ বোধ করছেন।

পুরুন্দর। আমার প্রতি ভক্তিতেই যদি এই সংকল্প গ্রহণ করে থাক তবে এখনি ফেলে দাও এই বোঝা।

সোমশংকর। এমন কথা কেন বলছেন আজ। আমার মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ কিছুর দেখছেন কি।

পুরুন্দর। মোহিনী শক্তি আছে আমার, এমন কথা কেউ কেউ বলে-- শূনে লজ্জা পাই: জাদুকর নই আমি।

সোমশংকর। আত্মার ক্রিয়াকে যারা বিশ্বাস করে না তারা তাকে বলে জাদুর ক্রিয়া।

পুরুন্দর। রতের মাহাত্ম্য তার স্বাধীনতায়। যদি ভুলিয়ে থাকি তোমাকে, সে-ভুল ভাঙতে হবে। গুরুবাক্য বিষ—সে-বাক্য যদি তোমার নিজের বাক্য না হয়।

সোমশংকর। সন্ন্যাসী, যে-রত নিয়েছি সে আজ আমার রক্তে বইছে তেজরূপে, জ্বলছে বুকের মধ্যে হোমায়িত মতো। মৃত্যুর মৃথোমুখি দাঁড়িয়েছি, আজ আমার দ্বিধা কোথায়।

পুরুন্দর। এই কথাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মৃথ থেকে। আর-একটি কথা বাকি আছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কেন সুষমার বিবাহ দিলুম তোমার সঙ্গে। তোমারই কাছ থেকে আমি তার উত্তর চাই।

সোমশংকর। এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো উধেঁর জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারই 'পরে ভার দিলে এই অনির্বাক্ত অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।

পুরুন্দর। বৎস, ষতদিন রক্ষা করবে তার দ্বারা তুমি আপনাকেই রক্ষা করতে পারবে। ঐ তোমার মূর্তিমান ধর্ম, রইল তোমার সঙ্গে—ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতম্। আমার বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত, সেইসঙ্গে শিষ্যের বন্ধন থেকে আমিও মুক্তি পেলুম। তোমাদের বিবাহের পর আমাকে যেতে হবে দূরে—হয়তো কোনোদিন আমার আর দেখা পাবে না। আমার এই আশীর্বাদ রইল, জানথ আত্মানম্—আপনাকে পূর্ণ করে জানো।

[পুরুন্দরের প্রস্থান]

সোমশংকর অনেকক্ষণ স্তম্ভ হয়ে রইল

সোমশংকর। ওরে ভোলা, সেই নতুন গানটা—

গান

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।

একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।

দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শূন্য,

বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু,

পালায় ছুটে সূপ্তরাতের স্বপ্ন-দেখা মন্দ ভালো।

নিরুদ্দেশের পথিক, আমায় ডাক দিলে কি—

দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি।

ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,

ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,

বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো।

নেপথ্য থেকে। যেতে পারি কি।

সোমশংকর। এসো এসো।

তারকের প্রবেশ

তারক। রাজাবাহাদুর, আজকাল তোমার কাছে আসতে কিরকম ভয়-ভয় করে।

সোমশংকর। কোনো কারণ তো দেখি নে।

তারক। কারণ নেই বলেই তো ভয় বেশি। আজ বাদে কাল বিয়ে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দ্বীপান্তরে চলেছ। ভয়ানক গাম্ভীর্য।

সোমশংকর। বিয়েটা তো এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রাই বটে।

তারক। সব বিয়ে তা নয় রাজন্! নিজের কথা বলতে পারি। আমার বরষাত্রা হয়েছিল পটল-ডাঙা থেকে চোরবাগানে। মনের ভিতরটাও তার বেশি এগোয় নি। আমার স্ত্রীর নাম পুষ্প। রসিকবন্ধু তার কবিতায় আমাকে খেতাব দিলে পুষ্পচোর। কবিতাটার হেডিং ছিল চোর-পণ্ডাশিকা। কবিকে প্রশ্ন করলেম, চোর-পণ্ডাশিকার একটা কবিতাই তো দেখছি, বাকি উনপঞ্চাশটা গেল কোথায়। উত্তর পেলেম, তারা উনপঞ্চাশ পবনরূপে বরের হৃদয়গহবরে বেড়াচ্ছে ঘুরপাক দিয়ে।

সোমশংকর। এর থেকে প্রমাণ হয় আমার রসিকবন্ধু নেই, তাই গাম্ভীর্য রয়েছে ঘনিয়ে।

তারক। আমাদের পাড়ার লক্ষ্মীছাড়ার দল অশোক গুপ্তদের বাগানে দর্মা-ঘেরা একটা পোড়ো ফর্নিতে ক্লাব করেছে। আপিস থেকে ফিরে এসে সেইখানে সন্ধ্যাবেলায় বিষম হুলা করতে থাকে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমরা লক্ষ্মীমন্তরা ওদের নিমন্ত্রণ করছি। তোমাকে প্রিজাইড করতে হবে।

সোমশংকর। শুনছি বৈকুণ্ঠলুণ্ঠন পাঁচালি লিখে ওরা আমাকে লক্ষ্মীহারী দৈত্য বানিয়েছে।

তারক। সে কথা সত্যি। ওদের টেম্পারেচার কমানো দরকার হয়েছে।

সোমশংকর। বৈধ উপায়ে ওদের ঠান্ডা করতে রাজি আছি।

তারক। আমাদের কমলবিলাস সেনগুপ্তকে দিয়ে একটা নিমন্ত্রণপত্র রচিয়ে নিয়ে এলুম।

সোমশংকর। পড়ে শোনাও।

তারক। প্রজাপতি যাদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখা,

আর যারা সব প্রজাপতির ভবিষ্যতের লক্ষ্য,

উদরসেবার উদার ক্ষেত্রে মিলন উভয় পক্ষ,
 রসনাতে রসিয়ে উঠুক নানা রসের ভক্ষ্য।
 সত্যযুগে দেবদেবীদের ডেকেছিলেন দক্ষ,
 অনাহৃত পড়ল এসে মেলাই যক্ষ রক্ষ,
 আমরা সে-ভুল করব না তো, মোদের অম্বকক্ষ
 দুই পক্ষেই অপক্ষপাত দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
 আজও যারা বান্দন-ছাড়া ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
 বিদায়কালে দেন তাঁদের আশিস লক্ষ লক্ষ,
 তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে জুটুন কারাধাক্ষ,
 এর পরে আর মিল মেলে না—য র ল ব হ ক্ষ।

ঐ আসছে ওদের দল।

সুধাংশু শচীন প্রভৃতির প্রবেশ

সোমশংকর। কী উদ্দেশ্যে আগমন।

সুধাংশু। গান শোনাব।

সোমশংকর। তার পরে?

সুধাংশু। তার পরে নোব্ল্ রিভেঞ্জ্, সুমহতী প্রতিহিংসা।

সোমশংকর। ঐ মানুষটার কাঁধে ওটা কী! বোমা নয়?

সুধাংশু। ক্রমশ প্রকাশ্য। এখন গান।

সোমশংকর। কার রচনা।

শচীন। কপিরাইটের তর্ক আছে। বিষয় অনুসারে কপিরাইট-স্বত্ত্ব আমাদেরই, বাকগুলি যার
 তাকে আমরা গণ্য করি নে।

গান

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল

ভরের পাম্পপণ্ডে জল

সদাই করছি টলোমনল,

মোদের আসাথাওয়া শূন্য হাওয়া,

নাইকো ফলাফল।

নাই জানি করণকারণ, নাই জানি ধরনধারণ

নাই মানি শাসন বারণ গো—

আমরা আপন রোথে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল।

লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,

লুটুন তোমার চরণধূলি গো—

আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।

তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে

অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,

আমরা নোঙরছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল।

আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,

স্বীপ আছে কি ভবসাগরে—

যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।

আমরা জুটে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান করব খেলা গো,
কণ্ঠে যদি সুর না আসে করব কোলাহল।

সোমশংকর। এবার কিঞ্চিৎ ফলাহারের আয়োজন করি।

সুধাংশু। আগে দেবী আসুন ঘরে, তার পরে ফল কামনা করব।

সোমশংকর। তৎপূর্বে—

সুধাংশু। তৎপূর্বে সুমহতী প্রতিহিংসা। (গাঠরি থেকে কিংখাবের আসন বেরল) লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর ভক্তদের যোগ থাকবে এই আসনটিতে। তোমাদের ঘরের মাটি রইল তোমাদের, তার উপরে আসনটা রইল আমাদেরই। আর তাঁর কমলাসন, সে আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে।

সোমশংকর। কী তোমাদের বলব। বলবার কথা আমি জানি নে।

তৃতীয় অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

বাঁশরিদের বাড়ি। সতীশ ডেস্ক বসে লিখছে

সুধামার ছোটো বোন সুধীমার প্রবেশ

সতীশ। আমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে এসেছিস? বরের মুখ-দেখা বুঝি আজ?

সুধীমা। যাও!

সতীশ। যাও কী। বেশিদিনের কথা নয়, তোর বয়স যখন পাঁচ, মাকে জিজ্ঞাসা করিস, আমাকে বিয়ে করতে তোর কী জেদ ছিল। আমি তোকে সোনার বালা গাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেটা ভেঙে ব্লোচ তৈরি হয়েছে।

সুধীমা। সতীশদা, কী বকছ তুমি।

সতীশ। আচ্ছা থাক্ তবে, কী জন্যে এসেছিস।

সুধীমা। দিদির বিয়েতে প্রেজেন্ট দেব।

সতীশ। সে তো ভালো কথা। কী দিতে চাস।

সুধীমা। এই চামড়ার থলিটা।

সতীশ। ভালো জিনিস, আমারই লোভ হচ্ছে।

সুধীমা। আমি এসেছি বাঁশিদিদির কাছে।

সতীশ। ওখান থেকে কেউ তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

সুধীমা। না, লুকিয়ে এসেছি, কেউ জানে না। আমার এই থলির উপরে বাঁশিদিদিকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব।

সতীশ। বাঁশিদিদি আঁকিতে পারে কে বললে তোকে।

সুধীমা। শংকরদাদা। তাঁর কাছে একটা সিগারেট-কেস আছে সেটা বাঁশিদিদির দেওয়া। তার উপরে একজোড়া পায়রা এঁকেছেন নিজের হাতে। চমৎকার!

সতীশ। আচ্ছা, তোর বাঁশিদিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

বাঁশরির প্রবেশ

বাঁশরি। কী সুধী।

সুধীমা। তোমাকে সতীশদাদা সব বলেছেন?

বাঁশরি। হাঁ, বলেছেন। ছবি একে দেব তোর খিলির উপর? কী ছবি আঁকব।
 সুষীমা। একজোড়া পায়রা, ঠিক যেমন একেছ শংকরদাদার সিগারেট-কেসের উপরে।
 বাঁশরি। ঠিক তেমনি করেই দেব। কিন্তু কাউকে বলিস নে যে আমি একে দিয়েছি।
 সুষীমা। কাউকে না।
 বাঁশরি। তোকেও একটা কাজ করতে হবে, নইলে আমি আঁকব না।
 সুষীমা। বলো কী করতে হবে।
 বাঁশরি। সেই সিগারেট-কেসটা আমাকে এনে দিতে হবে।
 সুষীমা। তাঁর বন্ধুর পকেটে থাকে। কক্ষনো আমাকে দেবেন না।
 বাঁশরি। আমার নাম করে বলিস দিতেই হবে।
 সুষীমা। তুমি তাঁকে দিয়েছ আবার ফিরিয়ে নেবে কী করে।
 বাঁশরি। তোমার শংকরদাদাও দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেন।
 সুষীমা। কক্ষনো না।
 বাঁশরি। আচ্ছা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস আমার নাম ক'রে।
 সুষীমা। আচ্ছা করব। আমি যাই, কিন্তু ভুলো না আমার কথা।
 বাঁশরি। তুইও ভুলিস না আমার কথা, আর নিয়ে যা এক বাক্স চকোলেট, কাউকে বলিস নে আমি দিয়েছি।
 সুষীমা। কেন।
 বাঁশরি। মা জানতে পারলে রাগ করবেন।
 সুষীমা। কেন।
 বাঁশরি। যদি তোর অসুখ করে।
 সুষীমা। বলব না, কিন্তু খেতে দেব শংকরদাদাকেও।

[সুষীমার প্রস্থান]

একখানা খাতা হাতে নিয়ে বাঁশরি সোফায় হেলান দিয়ে বসল

লীলার প্রবেশ

বাঁশরি। দেখ্ লীলা, মুখ গম্ভীর করে আসিস নে ভাই, তা হলে ঝগড়া হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে সান্ধ্বনা দেবার কুমতলব আছে, বাদল নামল বলে। দুঃখ আমার নয়, সান্ধ্বনা আমার নয় না, সে তোদের জানা। বসেছিলাম গ্রামোফোনে কর্মিক গান বাজাতে কিন্তু তার চেয়ে কর্মিক জিনিস নিয়ে পড়েছি।

লীলা। কী বলো তো বাঁশি।

বাঁশরি। ক্ষিতীশের এই গল্পখানা।

লীলা। (খাতাটা তুলে নিয়ে) 'ভালোবাসার নিলাম'—নামটা চলবে বাজারে।

বাঁশরি। বস্তুটাও। এ জিনিসের কার্টিজ আছে। পড়তে চাস?

লীলা। না ভাই, সময় নেই, বিয়েবাড়ি সাজাবার জন্যে ডাক পড়েছে।

বাঁশরি। আমি কি সাজাতে পারতুম না!

লীলা। আমার চেয়ে অনেক ভালো পারতিস।

বাঁশরি। ডাকতে সাহস হল না! ভীৰু ওয়া।

লীলা। তা নয়, লজ্জা হল, কী বলে তোকে ডাকবে।

বাঁশরি। না ডেকেই লজ্জা দিলে আমাকে। ভাবছে আমি অন্তর্জল ছেড়ে ঘরে দরজা দিয়ে কেঁদে মরিছি। ওদের সঙ্গে যখন তোর দেখা হবে কথাপ্রসঙ্গে বলিস, 'বাঁশি বিছানায় শুয়ে কর্মিক গল্প পড়ছিলাম, পেট ফেটে যাচ্ছিল হেসে হেসে।' নিশ্চয় বলিস।

লীলা। নিশ্চয় বলব, গল্পের বিষয়টা কী বল্ দেখি।

বাঁশরি। হিরোর নাম স্যার চন্দ্রশেখর। নায়িকা পঙ্কজা, ধনকুবেরের মন ভোলাতে লেগেছেন উঠেপড়ে। ওঠার চেয়ে পড়ার অংশটাই বেশি। সেন্ট-অ্যান্টনির টেম্‌টেশন ছবি দেখেছিঁস তো? দিনের পর দিন নতুন বেহারাগিরি—তোর খুব-যে শর্চিবাই তা নয়, তবু ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ঘাটে দৌড় মারতে চাইঁতিস। দ্বিতীয় নম্বরের নায়িকা গলা ভেঙে মরছে পঙ্ককুন্ডের ধারে দাঁড়িয়ে। অবশেষে একদিন পৌষ মাসের অর্ধরাতে খিড়কির ঘাটে—তুই ভাবছিঁস হতভাগিনী আত্মহত্যা করে বাঁচল—ক্ষিতীশের কম্পনাকে অবিচার করিস নে—নায়িকা জলের মধ্যে এক পৈঁঠে পর্যন্ত নেবেছিল। ঠান্ডা জলে ছাঁক করে উঠল গা-টা। ছুটল গরম বিছানা লক্ষ্য করে। এইখানটাতে সাইকলজির তর্ক এই, শীত করল বলেই মরা মূলতুঁবি কিংবা শীত করাতে আগুনের কথাটা মাথায় এল, অমনি ভাবল ওদের জ্বালিয়ে মারবে বেঁচে থেকে।

লীলা। কিছুতে বুঝতে পারি নে, এত লোক থাকতে ক্ষিতীশের উপর এত ভরসা রেখেছিঁস কী করে।

বাঁশরি। অবিচার করিস নে। ওর লেখবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো, কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে পোকা হতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে। ঐ বুঝি আসছে।

লীলা। আমি তবে চললুম।

বাঁশরি। একেবারে যাস নে। সন্ধ্যাবেলাটা কোনোমতে কাটাতে হবে। কমিক গল্পটা তো শেষ হল।

লীলা। কমিক গল্পের এক্টিং করতে হবে বুঝি আমাকেই? আচ্ছা, রইলুম পাশের ঘরে।

[লীলার প্রস্থান]

ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ। কেমন লাগল। মেলোড্রামার খাদ মেশাই নি সিকি তোলাও। সেন্টমেন্টালিটির তরল রস চায় যে-সব খুকিরা, তাদের পক্ষে নির্জলা একাদশী। একেবারে নিষ্ঠুর সত্য।

বাঁশরি। কেমন লাগল বুঝিয়ে দিচ্ছি (পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলল)।

ক্ষিতীশ। করলে কী। সর্বনাশ! এটা আমার সব লেখার সেরা, নষ্ট করে ফেললে?

বাঁশরি। দলিলটা নষ্ট করে ফেললেই সেরা জিনিসের বালাই থাকে না। কৃতজ্ঞ হোয়ো আমার 'পরে।

ক্ষিতীশ। সাহিত্যে নিজে কিছু দেবার শক্তি নেই, অথচ সংকোচ নেই তাকে বর্ণিত করতে। এর দাম দিতে হবে, কিছুতে ছাড়ব না।

বাঁশরি। কী দাম চাই।

ক্ষিতীশ। তোমাকে।

বাঁশরি। ক্ষতিপূরণ এত সস্তায়, সাহস আছে নিতে?

ক্ষিতীশ। আছে।

বাঁশরি। সেন্টমেন্ট এক ফোঁটাও মিলবে না।

ক্ষিতীশ। আশাও করি নে।

বাঁশরি। নির্জলা একাদশী, নিষ্ঠুর সত্য।

ক্ষিতীশ। রাজি আছি।

বাঁশরি। আছ রাজি? বুঝেসবুঝে বলছ? এ কমিক নভেল নয়, ডুল করলে প্রুফ-দেখা চলবে না, এডিশনও ফুরবে না মরার দিন পর্যন্ত।

ক্ষিতীশ। শিশু নই, এ কথা বুঝি।

বাঁশরি। না মশায়, কিছু বোঝ না, বুঝতে হবে দিনে দিনে পল্ল পল্ল, বুঝতে হবে হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়।

ক্ষিতীশ। সেই হবে আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা।

বাঁশরি। তবে বলি শোনো। অবোধের 'পরে মেয়েদের স্বাভাবিক স্নেহ। তোমার উপর কৃপা আছে আমার। তাই অবোধের মতো নিজের সর্বনাশের যে-প্রস্তাবটা করলে তাতে সম্মতি দিতে দয়া হচ্ছে।

ক্ষিতীশ। সম্মতি না দিলে সাংঘাতিক নিদয়তা হবে। সামলে উঠতে পারব না।

বাঁশরি। মেলোড্রামা?

ক্ষিতীশ। না, মেলোড্রামা নয়।

বাঁশরি। ক্রমে মেলোড্রামা হয়ে উঠবে না?

ক্ষিতীশ। যদি হয় তবে সেই দিনগুলোকে ঐ খাতার পাতার মতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো।

বাঁশরি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা সম্মতি দিলেম। (ক্ষিতীশ ছুটে এসে বাঁশরির দিকে) ঐ রে, শূরু হল! ভালো করে ভেবে দেখো, এখনো গিছোবার সময় আছে।

ক্ষিতীশ। (করজোড়ে) মাপ করো, ভয় হচ্ছে পাছে মত বদলায়।

বাঁশরি। যখন বদলাবে তখন ভয় কোরো। অমন মূখের দিকে তাকিয়ে থেকে না। দেখতে খারাপ লাগে। যাও রেজিস্ট্রি আফিসে। তিন-চার দিনের মধ্যে বিয়ে হওয়া চাই।

ক্ষিতীশ। নোর্টশের মেয়াদ কমাতে আইনে যদি বাধে?

বাঁশরি। তা হলে বিয়েতেও বাধবে। দেরি করতে সাহস নেই।

ক্ষিতীশ। অনুষ্ঠান?

বাঁশরি। হবে না অনুষ্ঠান, তোমার দেখছি কর্মকের দিকে ঝোঁক আছে। এখনো বুকুলে না জিনিসটা সীরিয়াস।

ক্ষিতীশ। কাউকে নিমন্ত্রণ?

বাঁশরি। কাউকে না।

ক্ষিতীশ। কাউকেই না?

বাঁশরি। আচ্ছা, সোমশংকরকে।

ক্ষিতীশ। কিরকম চিঠিটা লিখতে হবে তার একটা খসড়া—

বাঁশরি। খসড়া কেন, লিখে দিচ্ছি।

ক্ষিতীশ। স্বহস্তে?

বাঁশরি। হাঁ, স্বহস্তে।

ক্ষিতীশ। আজই?

বাঁশরি। হাঁ, এখনি। (চিঠি লিখে) এই নাও, পড়ো।

ক্ষিতীশের পাঠ। এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, শ্রীমতী বাঁশরি সরকারের সহিত শ্রীযুগ্ম ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিকের অবিলম্বে বিবাহ স্থির হইয়াছে। তারিখ জানানো অনাবশ্যক—আপনার অভিনন্দন প্রার্থনীয়। পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন হইল, দুটি মার্জনা করিবেন। ইতি—

বাঁশরি। এ চিঠি এখনি রাজার দারোয়ানের হাতে দিয়ে আসবে। দেরি কোরো না।

(ক্ষিতীশের প্রস্থান)

লীলা, শূনে যা খবরটা।

লীলার প্রবেশ

লীলা। কী খবর।

বাঁশরি। বাঁশরি সরকারের সঙ্গে ক্ষিতীশ ভৌমিকের বিবাহ পাকা হয়ে গেল।

লীলা। আঃ, কী বলিস তার ঠিকানা নেই।

বাঁশরি। এতদিন পরে একটা ঠিকানা হল।

লীলা। এটা যে আত্মহত্যা!

বাঁশরি। তার পরে পুনর্জন্মের প্রথম অধ্যায়।

লীলা। সব চেয়ে দুঃখ এই যে, যেটা ট্রাজেডি সেটাকে দেখাবে প্রহসন।

বাঁশরি। ট্রাজেডির লজ্জা ঘুচবে ঠাট্টার হাসিতে। অশ্রুপাতের চেয়ে অগৌরব নেই।

লীলা। আমাদের রাশিচক্র থেকে খসে পড়ল সব চেয়ে উজ্জ্বল তারটি। যদি তার জ্বালা নিবত শোক করতুম না। জ্বালা সে সঙ্গে করে নিয়েই চলল অন্ধকারের তলায়।

বাঁশরি। তা হোক, ডার্ক্ হীট, কালো আগুন, কারো চোখে পড়বে না। আমার জন্য শোক করিস নে, যে আমার সাথী হতে চলল শোচনীয় সে-ই। এ কী। শংকর আসছে। তুই যা ভাই একটু আড়ালে।

[লীলার প্রস্থান]

সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর। বাঁশি!

বাঁশরি। তুমি যে!

সোমশংকর। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। জানি অন্যপক্ষ থেকে ডাকে নি তোমাকে। আমার পক্ষ থেকে কোনো সংকোচ নেই।

বাঁশরি। কেন সংকোচ নেই। ঔদাসীনা?

সোমশংকর। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জান।

বাঁশরি। তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন।

সোমশংকর। সে কথা বদ্বতে যদি নাও পার, তবু দয়া কোরো আমাকে।

বাঁশরি। তবু বলো। বদ্বতে চেষ্টা করি।

সোমশংকর। কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক, দুঃসাধ্য আমার সংকল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোনো-এক সংকটের দিনে বদ্ববে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না?

সোমশংকর। নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাও না বাঁশি। তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে। যে-দুর্গম পথে দুঃসমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আমাকে যাত্রায় প্রবৃত্ত করেছেন সেখানে ভালোবাসার গতিবিধি বন্ধ।

বাঁশরি। সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বদ্ববেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শত্রুতা। তবে এই শত্রুর দুর্গে কোন্ সাহসে তুমি এলে। একদিন যে-শক্তি আমার মধ্যে দেখেছিলেন আজ কিছুর কি তার অবশিষ্ট নেই। ভয় করবে না?

সোমশংকর। শক্তি একটুও কমে নি, তবু ভয় করব না।

বাঁশরি। যদি তেমন করে পিছন ডাকি এড়িয়ে যেতে পারবে?

সোমশংকর। কী জানি, না পারতেও পারি।

বাঁশরি। তবে?

সোমশংকর। তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার সত্য কখনোই ভাঙা পড়বে না তোমার হাতে। সংকটের মুখে যাবার পথে আমাকে হেয় করতে পারবে না তুমি। নিশ্চিত জান, সত্যভঙ্গ হলে আমি প্রাণ রাখব না। মরব তুষানলে পড়ি।

বাঁশরি। শংকর, তুমি ক্ষত্রিয়ের মতোই ভালোবাসতে পার। শুধু ভাব দিয়ে নয়, বীর্ষ দিয়ে। সত্যি করে বলো, আজও কি আমাকে সেদিনের মতোই ততখানিই ভালোবাস।

সোমশংকর। ততখানিই।

বাঁশরি। আর কিছুই চাই নে আমি। সুখমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমার রত, তাকে ঈর্ষা করব না।

সোমশংকর। একটা কথা বাকি আছে।

বাঁশরি। কী, বলো।

সোমশংকর। আমার ভালোবাসার কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে, ফিরিয়ে দিতে পারবে না। (অলংকারের সেই থলি বের করলে)

বাঁশরি। ও কী, ও-সব যে তুলিয়ে ছিল জলে।

সোমশংকর। ডুব দিয়ে আবার তুলে এনেছি।

বাঁশরি। মনে করেছিলুম আমার সব হারিয়েছে। ফিরে পেয়ে অনেকখানি বেশি করে পেলুম। নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমাকে। (সোমশংকর গয়না পরিয়ে দিলে) শক্ত আমার প্রাণ। তোমার কাছেও কোনোদিন কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না, আজ যদি কাঁদি কিছু মনে কোরো না। (হাতে মাথা রেখে কান্না)

ভূতের প্রবেশ

ভূত। রাজাবাহাদুরের চিঠি।

বাঁশরি। (দাঁড়িয়ে উঠে) শংকর, ও চিঠি আমাকে দাও।

সোমশংকর। না পড়েই?

বাঁশরি। হাঁ, না পড়েই।

সোমশংকর। তবে নাও। (বাঁশরি চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল) এখনো একটা কাজ বাকি আছে। এই সিগারেট-কেস চেয়ে পাঠিয়েছিলে। কেন, বুঝতে পারি নি।

বাঁশরি। আর-একবার তোমার ঐ পকেটে রাখব বলে, এ আমার দ্বিতীয়বারকার দান।

সোমশংকর। সন্ন্যাসীবাবা আমাদের বাড়িতে আসবেন এখনি—বিদায় দাও, যাই তাঁর কাছে।

বাঁশরি। যাও, জয় হোক সন্ন্যাসীর।

[সোমশংকরের প্রস্থান]

লীলার প্রবেশ

লীলা। কী ভাই—

বাঁশরি। একটু বোসো। আর-একখানা চিঠি লেখা বাকি আছে, সেটা তাকে দিতে হবে তোরই হাত দিয়ে। (চিঠি লিখে লীলাকে দিলে) পড়ে দেখ্।

চিঠি

শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক কল্যাণবরেষু—

তোমার ভাগ্য ভালো, ফাঁড়া কেটে গেল, আমারও বিবাহের আসন্ন আশঙ্কাটা সম্পূর্ণ লোপ করে দিলুম। ‘ভালোবাসার নিলামে’ সর্বোচ্চ দরই পেয়েছি, তোমার ডাক সে-পর্যন্ত পেঁছত না। অন্যত্র অন্য-কোনো সাল্ফনার সুযোগ উপস্থিতমত যদি না জোটে তবে বই লেখো। আশা করি এবার সত্যের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তোমার এই লেখায় বাঁশরির প্রতি দয়া করবার দরকার হবে না। আত্মহত্যা এক পৈণ্টে পা বাড়িয়েই সে ফিরে এসেছে।

লীলা। (বাঁশরিকে জড়িয়ে ধরে) আঃ, বাঁচারি ভাই আমাদের সবাইকে। সুখমার উপর এখন আর তোর রাগ নেই?

বাঁশরি। কেন থাকবে। সে কি আমার চেয়ে জিতেছে। লীলা, দে ভাই সব দরজা খুলে, সব আলোগুলো জ্বালিয়ে—বাগান থেকে যতগুলো ফুল পাস নিয়ে আয় সংগ্রহ করে।

[লীলার প্রস্থান]

পদ্রুন্দরের প্রবেশ

বাঁশরি। এ কী সন্ন্যাসী, তুমি যে আমার ঘরে?

পদ্রুন্দর। চলে যাচ্ছি দূরে, হয়তো আর দেখা হবে না।

বাঁশরি। যাবার বেলায় আমার কথা মনে পড়ল?

পদ্রুন্দর। তোমার কথা কখনোই ভুলি নি। ভোলবার মতো মেয়ে নও তুমি। নিতাই এ কথা মনে রেখেছি, তোমাকে চাই আমাদের কাজে—দুর্লভ দঃসাধ্য তুমি, তাই দঃখ দিয়েছি।

বাঁশরি। পার নি দঃখ দিতে। মরা কঠিন নয়, পেয়েছি তার প্রথম শিক্ষা। কিন্তু তোমাকে একটা শেষকথা বলব সন্ন্যাসী, শোনো। সুধমাকে তুমি ভালোবাস, সুধমা জানে সেই কথা। তোমার ভালোবাসার সূত্রে গেঁথে রতের হার পরেছে সে গলায়, তার আর ভাবনা কিসের। সত্য কি না বলো।

পদ্রুন্দর। সত্য কি মিথ্যা সে-কথা বলে কোনো ফল নেই, দুইই সমান।

বাঁশরি। সুধমার ভাগ্য ভালো কিন্তু সোমশংকরকে কী তুমি দিলে।

পদ্রুন্দর। সে পদ্রুষ, সে ক্ষত্রিয়, সে তপস্বী।

বাঁশরি। হোক পদ্রুষ, হোক ক্ষত্রিয়, তার তপস্যা অপূর্ণ থাকবে আমি না থাকলে, আবশ্যক আছে আমাকে।

পদ্রুন্দর। বশিষ্ঠ হবার দঃখই তাকে দেবে শক্তি।

বাঁশরি। কখনোই না, তাতেই পঙ্গু করবে তার রত। যে পারে ঐ ক্ষত্রিয়কে শক্তি দিতে এমন কেবল একটি মেয়ে আছে এ-সংসারে।

পদ্রুন্দর। জানি।

বাঁশরি। সে সুধমা নয়।

পদ্রুন্দর। তাও জানি। কিন্তু ঐ বীরের শক্তি হরণ করতে পারে, এমনও একটি মাত্র মেয়ে আছে এ-সংসারে।

বাঁশরি। আজ অভয় দিচ্ছে সে। আপন অন্তরের মধ্যে সে আপনি পেয়েছে দীক্ষা। তার বন্ধন ছুঁচ্ছে, সে আর বাঁধবে না।

পদ্রুন্দর। তবে আজ যাবার দিনে নিঃসংকোচে তারই হাতে রেখে গেলেম সোমশংকরের দুর্গম পথের পাথর।

বাঁশরি। এতদিন আমার যত প্রণাম বাকি ছিল সব একত্র করে আজ এই দিলেম তোমার পারে।

পদ্রুন্দর। আর আমি দিয়ে গেলেম তোমাকে একটি গান, তোমার কণ্ঠে সেটিকে গ্রহণ করো।

গান

পিনাকেতে লাগে টংকার—

বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার।

আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি

সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,

বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডংকার।

স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি,

সুরপরিষদ বন্দী,

তিমিরগহন দঃসহ রাতে উঠে শঙ্খলব্ধংকার।

দানবদম্ভ তর্জি

রুদ্ধ উঠিল গর্জি,

লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অদ্রভেদী অহংকার।

ଶ୍ରୀବତ୍ସଗାଥା

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୭୫

নটরাজ। মহারাজ, আদেশ করেন যদি, বর্ষার অভ্যর্থনা দিয়ে আজ উৎসবের ভূমিকা করা যাক।
রাজা। ভূমিকার কী প্রয়োজন।

নটরাজ। ধুর্যোর যে প্রয়োজন গানে। ঐ ধুর্যোটাই অশ্বকুরের মতো ছোটো হয়ে দেখা দেয়,
তার পরে শাখায় পল্লবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজা। আচ্ছা, তা হলে বিলম্বে কাজ নেই।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগোরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

গদগদ গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে;
নিখিল চিন্তহরষা
ঘনগোরবে আসিছে মস্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধু তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা,
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হৃদয়রব করো বধুরা,
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।

কুঞ্জকুটীরে অয়ি ভাবাকুললোচনা
ভূজপাতায় নবগীত করো রচনা,
মেঘমল্লার রাগিণী;
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে গন্ধমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,

শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

নটরাজ। ওগো কর্মলিকা, এখন তবে শুরু করো তোমাদের পালা।

রাজা। কী দিয়ে শুরু করবে।

নটরাজ। বনভূমির আত্মনিবেদন দিয়ে।

রাজা। কার কাছে আত্মনিবেদন।

নটরাজ। আকাশপথে যিনি এসেছেন অতিথি—আবির্ভাব যার অরণ্যের রাসমণ্ডে, পূর্ব-
দিগন্তে উড়েছে যার কেশকলাপ।

সভাকবি। ওহে নটরাজ, আমরা আধুনিক কালের কবি—ফুলকাটা বুলি দিয়ে আমরা কথা
কই নে—তুমি যেটা অত করে ঘুরিয়ে বললে, আমরা সেটাকে সাদা ভাষায় বলে থাকি বাদলা।

নটরাজ। বাদলা নামে রাজপথের ধুলোয়, সেটাকে দেয় কাদা ক'রে। বাদলা নামে রাজপ্রহরী-
দের পাগড়ির পরে, তার পাকে পাকে জমিয়ে তোলে কফের প্রকোপ। আমি যার কথা বলছি তিনি
নামেন ধরণীর প্রাণমন্দিরে, বিরহীর মর্মবেদনায়।

রাজা। তোমাদের দেশের লোক কথা জমাতে পারে বটে।

সভাকবি। ঠুঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজম্বারে আসব কোন্‌ দুঃখে। এইবার শুরু করো।

বারি আমি রাখব না কিছুই।

তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।

ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়

গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,

উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই।

পূরব-সাগর পার হয়ে যে এলে পৃথিবী তুমি,

আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।

আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান,

সব তোমারেই করেছি দান,

দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যখন ছুঁই।

রাজা। দেখলুম, শুনলুম, লাগল ভালো, কিন্তু বৃষ্টি-পড়ে নিতে গেলে পৃথিবীর দরকার।
আছে পৃথি?

নটরাজ। এই নাও, মহারাজ।

রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কি চীনা অক্ষরে লেখা নাকি।

নটরাজ। বলতে পারেন অচিন্তা অক্ষরে।

রাজা। কিন্তু, রচনা যার সে গেল কোথায়।

নটরাজ। সে পারলিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। পালাবার তাৎপর্য কী।

নটরাজ। পাছে এখানকার বুদ্ধিমানরা বলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরো দুঃখের বিষয়—
যদি কিছু না বলে হাঁ করে থাকেন।

সভাকবি। এ তো বড়ো কোঁতুক! পাঁজিতে লিখছে, পূর্ণিমা, এ দিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ বলে বসে তাঁর আলোটা ঝাপসা।

নটরাজ। বিশল্যকরণীটারই দরকার, গন্ধমাদনটা বাদ দিলেও চলে। না-ই রইলেন কবি, গানগুলো রইল।

সভাকবি। একটা ভাবনার বিষয় রয়ে গেল। গানে স্বয়ং কবিই সুর বসিয়েছেন নাকি।

নটরাজ। তা নয় তো কী। ফুলে যিনি দিয়েছেন রঙ তিনিই লাগিয়েছেন গন্ধ।

সভাকবি। সর্বনাশ! নিজের অধিকারে পেয়ে এবার দেবেন রাগিণীর মাথা হেঁট ক'রে। বাণীকে উপরে চড়িয়ে দিয়ে বীণার ঘটাবেন অপমান।

নটরাজ। অপমান ঘটানো একে বলে না, এ পরিণয় ঘটানো। রাগিণী যতদিন অনুতা ততদিন তিনি স্বতন্ত্র। কাব্যের সঙ্গে বিবাহ হলেই তিনি কবিত্বের ছায়েবানুগতা। সপ্তপদীগমনের সময় কাব্যই যদি রাগিণীর পিছন পিছন চলে, সেটাকে বলব স্ট্রেনের লক্ষণ। সেটা তোমাদের গোড়ীয় পারিবারিক রীতি হতে পারে, কিন্তু রসরাজ্যের রীতি নয়।

রাজা। ওহে কবি, কথাটা বোধ হচ্ছে যেন তোমাকেই লক্ষ্য করে! ঘরের খবর জানলে কী করে।

সভাকবি। জনশ্রুতির 'পরে' ভার, বানানো কথায় লোকরঞ্জন করা।

রাজা। জনশ্রুতিকে তা হলে কবি আখ্যা দিলে হয়। অলমতিবিস্তরেণ। যথারীতি কাজ আরম্ভ করো।

সভাকবি। আমরা সহ্য করব ঠুঁদের স্বরবর্ষণ, মহাবীর ভীষ্মের মতো।

নটরাজ। ধরণীর তপস্যা সার্থক হয়েছে, প্রণতি। রুদ্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জলদগ্নি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে শ্যামল জটাভার—প্রসন্ন তাঁর মুখ। প্রথমে সেই বন্ধু-দর্শনের আনন্দকে আজ মুখরিত করো।

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।

হৃদয় আমার, শ্যামল বন্ধুর করুণ স্পর্শ নে।

অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে

তিমিরমেদুর বনাঞ্জে

ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে।

ভরুক গগন, ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা,

দেখুক ভুবন মিলনস্বপন মধুর বেদনা-ভরা।

পরান-ভরানো ঘনছায়াজাল

বাহির আকাশ করুক আড়াল,

নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে।

নমো নমো নমো করুণাঘন নমো হে।

নয়নস্নিগ্ধ অমৃতাজনপরশে,

জীবন পূর্ণ সুধারসবরষে,

তব দর্শনধনসার্থক মন হে,

অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।

নমো হে নমো হে।

সভাকবি। নটরাজ, মহারানী-মাতার কল্যাণে সেদিন রাজবাড়ি থেকে কিছু ভোজ্যপানীয় সংগ্রহ করে নিয়ে আসছিলেন গৃহিণীর ভান্ডার-অভিমুখে। মধ্যপথে বাহনটা পড়ল উঁচট খেয়ে,

ছাড়িয়ে পড়ল মোদক মিষ্টান্ন পথের পাঁকে, গাড়িয়ে পড়ল পায়সান্ন ভাঙা হাঁড়ি থেকে নালার মধ্যে। তখন মৃদলধারে বর্ষণ হচ্ছে—নৈবেদ্যটা শ্রাবণ স্বয়ং নিয়ে গেলেন ভাসিয়ে। তোমাদের এই প্রণামটাও দেখি সেইরকম। খুবই ছাড়িয়েছ বটে, কিন্তু পেঁপেছল কোথায় ভেবে পাচ্ছি নে।

নটরাজ। কবিবর, আমাদের প্রণামের রস তোমার হাঁড়িভাঙা পায়সের রস নয়—ওকে নষ্ট করতে পারবে না কোনো পাঁকের অপদেবতা; সুরের পাত্রে রইল ও চিরকালের মতো, চিরকালের শ্যামল বঁধুর ভোগে বর্ষে বর্ষে ওর অক্ষয় উৎসর্গ।

রাজা। কিছন্ন মনে কোরো না নটরাজ, আমাদের সভাকবি দৃঃসহ আধুনিক। হাঁড়িভাঙা পায়সের রস পাঁকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌরপঞ্চশতক রচনা করতে পারেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না সেই রসে যার সঙ্গে না আছে জঠরের যোগ, না আছে ভাঙারের। তোমার কাজ অসংকোচে করে যাও, এখানে অন্য শ্রোতাও আছে।

নটরাজ। বনমালিনী, এবার তবে বর্ষাধারাস্নানের আমন্ত্রণ ঘোষণা করে দাও নৃপনুরের ঝংকারে, নৃত্যের হিল্লোলে। চেয়ে দেখো, শ্রাবণঘনশ্যামলার সিন্ধু বেণীবন্ধন দিগন্তে স্থলিত, তার ছায়াবসনাঙ্গুল প্রসারিত ঐ তমালতালীবনশ্রেণীর শিখরে শিখরে।

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,

এসো করো স্নান নবধারাজলে।

দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,

পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—

কাজল নয়নে, যুথীমালা গলে,

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

আজি খনে খনে হাসিখানি সখী,

অধরে নয়নে উঠুক চমকি।

মল্লারগানে তব মধুস্বরে

দিক বাণী আনি বনমর্মরে—

ঘন বরিষনে জলকলকলে

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

রাজা। উত্তম। কিন্তু চাঞ্চল্য যেন কিছন্ন বেশি, বর্ষাঋতু তো বসন্ত নয়।

নটরাজ। তা হলে ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে পলক জেগেছে, সে পলক গভীর, সে প্রশান্ত।

সভাকবি। ঐ তো মূর্শকিল। ভিতরের দিকে? ও দিকটাতে বাঁধা রাস্তা নেই তো।

নটরাজ। পথ পাওয়া যাবে সুরের স্রোতে। অন্তরাকাশে সজল হাওয়া মৃদু হয়ে উঠল। বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস উঠেছে সেখানে—কার বিরহ জানা নেই। ওগো গীতরসিকা, বিশ্ববেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর,

বিরহকাতর শব্দরী।

ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন

কানন কানন মর্মরি।

আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ

গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।

হৃদয় এ কী রে ব্যাপিল তিমিরে

সমীরে সমীরে সগুরি।

রাজা। কী বল হে, কী মনে হচ্ছে তোমার।

সভাকবি। সত্য কথা বলি, মহারাজ। অনেক কবিষ্ট করেছি, অমরদশতক পেরিয়ে শান্তি-শতকে পঁচঁছবার বয়স হয়ে এল—কিন্তু এই যে এঁরা অশরীরী বিরহের কথা বলেন যা নিরবলম্ব, এটা কেমন যেন প্রেতলোকের ব্যাপার বলে মনে হয়।

রাজা। শুনলে তো, নটরাজ! একটু মিলনের আভাস লাগাও, অন্তত দূর থেকে আশা পাওয়া যায় এমন আয়োজন করতে দোষ কী।

সভাকবি। ঠিক বলেছেন, মহারাজ। পাত পেড়ে বসলে ঠুঁদের মতে যদি কবিষ্টবিরুদ্ধ হয়, অন্তত রাসাঘর থেকে গন্ধটা বাতাসে মেলে দিতে দোষ কী।

নটরাজ। বরমাপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা। পেটভরা মিলনে সুর চাপা পড়ে, একটু ক্ষুধা বাকি রাখা চাই, কবিরাজরা এমন কথা বলে থাকেন। আচ্ছা, তবে মিলনতরীর সারিগান বিরহবন্যার ও পার থেকে আসুক সজল হাওয়ায়।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভগে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরণে।
কাঁপছে বনের হিয়া বরষনে মধুরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘনমন্দ্রে।

রাজা। এ গানটাতে একটু উৎসাহ আছে। দেখছি, তোমার মৃদঙ্গওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়ে উঠেছে—ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। এবার তা হলে একটা অশ্রুত গীতছন্দের মূর্তি দেখা যাক।

সভাকবি। শুনলেন ভাষাটা! অশ্রুত গীত। নিরল ভোজের আয়োজন!

রাজা। দোষ দিয়ো না, যাদের যেমন রীতি। তোমাদের নিমন্ত্রণে আর্মিষের প্রাচুর্য।

সভাকবি। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, আমরা আধুনিক, আর্মিষলোলুপ।

নটরাজ। শ্যামলিয়া, দেহভাঙ্গির নিঃশব্দ গানের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নাচ

রাজা। অতি উত্তম। শুন্যকে পূর্ণ করেছে তুমি। এই নাও পুরস্কার। নটরাজ, তোমাদের পালাগানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি, এতে বিরহের অংশটাই যেন বেশি। তাতে ওজন ঠিক থাকে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ এক দিকে, একটিমাত্র ফুল এক দিকে—তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার এক দিকে, একটি তারা এক দিকে—তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক-না অকূল, তারই মধ্যে একটিমাত্র মিলনের পদ্মই যথেষ্ট।

সভাকবি। এঁদের দেশের লোক বাচালের সেরা, কথায় পেরে উঠবেন না। আমি বলি সন্ধি করা যাক—ক্ষণকালের জন্য মিলনও ক্ষান্ত দিক, বিরহও চূপ মেয়ে থাক্। শ্রাবণ তো মেয়ে নয় মহারাজ, সে পুরুষ, ঠুর গানে সেই পুরুষের মূর্তি দেখিয়ে দিন-না।

নটরাজ। ভালো বলেছ, কবি। তবে এসো উগ্রসেন, উন্মত্তকে বাঁধো কঠিন ছন্দে, বজ্রকে মঞ্জীর করে নাচুক ভৈরবের অনুচর।

হৃদয়ে মন্দির ডমরু গুরুগুরু,
 ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুণ্ডিত।
 হল রোমাঞ্চিত বনবনান্তর,
 দুর্লিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
 মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে!
 সঘনবর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
 বজ্রসর্চকিত ব্রহ্ম শব্দরী,
 মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
 করুণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত
 বিল্লিঝংকৃত।

রাজা। এই তো নৃত্য! কঠিনের বক্ষপ্লাবী আনন্দের নিব্বর। এ তো মন ভোলাবার নয়,
 এ মন দোলাবার।

সভাকবি। কিন্তু এই দুর্দম আবেগ বেশিক্ষণ সহবে না। ঐ দেখুন, আপনার পারিষদের দল
 নেপথ্যের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কড়াভোগ ওদের গলা দিয়ে নামে না, একটু মিঠুয়া চাই।

রাজা। নটরাজ, শুনলে তো। অতএব কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ।

নটরাজ। প্রস্তুত আছি। তা হলে শ্রাবণপূর্ণিমার লুকোচুরির কথাটা ফাঁস করে দেওয়া যাক।

ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার
 আজ রইলে আড়ালে।
 স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে।
 আপনার মনে জানি নে একেলা
 হৃদয়-আঁঙিনায় করিছ কী খেলা,
 তুমি আপনায় খুঁজে কি ফের
 কি তুমি আপনায় হারালে।
 এ কি মনে রাখা, এ কি ভুলে যাওয়া,
 এ কি স্নোতে ভাসা, এ কি কূলে বাওয়া।
 কভু বা নয়ানে কভু বা পরানে
 কর' লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
 কভু বা ছায়ায় কভু বা আলোয়
 কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে।

রাজা। বৃষ্টিতে পারলুম না এর মনোরঞ্জন হল কি না। সে অসাধ্য চেষ্টায় প্রয়োজন নেই।
 আমার অনুরোধ এই, রসের ধারাবর্ষণ যথেষ্ট হয়েছে, এখন রসের ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দাও।

নটরাজ। মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমারও মনের ভাব মিলছে। এবার শ্রাবণের ভেরীধ্বনি
 শোনা যাক। সুপ্তকে জাগিয়ে তুলুক, চেঁতিয়ে তুলুক অন্যমনাকে।

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে—
 এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।

যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
 চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
 যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্ধনাচের তালে।

আসন আমার পাততে হবে রিস্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিস্ত বৃকের 'পরে।

নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যুথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বৃষ্টি মরণ-অন্তরালে।

রাজা। আমার সভাকবিকে বিমর্ষ করে দিয়েছ। তোমাদের এই গানে গানকে ছাড়িয়ে গানের কবিকে দেখা যাচ্ছে বেশি, ঐখানে ইনি দেখছেন ঔর প্রতিশ্রুতদ্বীকে। মনে মনে তর্ক করছেন, কী ক'রে আধুনিক ভাষায় এর খুব একটা ককর্শ জবাব দেওয়া যায়। আমি বলি—কাজ নেই, একটা সাদা ভাবের গান সাদা সুরে ধরো, যদি সম্ভব হয় ঔর মনটা সুস্থ হোক।

নটরাজ। মহারাজের আদেশ পালন করব। আমাদের ভাষায় যতটা সম্ভব সহজ করেই প্রকাশ করব, কিন্তু যত্নেতে যদি ন সিধ্যতি কোহরদোষঃ। সক্রুণা, এই বারিপতনশব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে সুরের যোগে মধুর করে তোলো।

ভেবেছিলাম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুন-শেষে দিলেম বিদায়।
যখন গেলে তখন ভাসি নয়ননীরে,
এখন শ্রাবণদিনে মরি শ্রবধায়।
বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝরো ঝরো বারিধারে
ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়।
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমা-হারা বিজন রাতে
কেবল 'হারাই হারাই' বাজে হিয়ায়।

সভাকবি। নটরাজ, আমার ধারণা ছিল বসন্ত ঋতুরই ধাতটা বায়ুপ্রধান—সেই বায়ুর প্রকোপেই বিরহমিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে। কফপ্রধান ধাত বর্ষার—কিন্তু তোমার পালায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। রক্ত হয়েছে তার চঞ্চল। তা হলে বর্ষায় বসন্তে প্রভেদটা কী।

নটরাজ। সোজা কথায় বৃষ্টিয়ে দেব—বসন্তের পাখি গান করে, বর্ষার পাখি উড়ে চলে।

সভাকবি। তোমাদের দেশে এইটেকেই সোজা কথা বলে! আমাদের প্রতি কিছু দয়া থাকে যদি কথাটা আরো সোজা করতে হবে।

নটরাজ। বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়ায় সক্রুণ করে তোলে—আর বর্ষায় বলাকান্ন বন, হংসশ্রেণীই বন, উধাও হয়ে মৃগ পথে চলে শূন্যে—কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকূল সমুদ্রতটের দিকে। ভাবনার এই দুই জাত আছে। মৃগের তর্ক ছেড়ে সুরের ব্যাখ্যা ধরা যাক। পূর্বিকা, ধরো গান।

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি;
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বৃষ্টি ওই গাঁথি গাঁথি।

সুদূরের বাঁশির স্বরে
 কে ওদের হৃদয় হরে,
 দূরাশার দঃসাহসে উদাস করে;
 উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি।
 ওদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে;
 অলক্ষিতে লক্ষ্য ওদের, পিছন পানে তাকায় না রে।
 যে বাসা ছিল জানা,
 সে ওদের দিল হানা,
 না জানার পথে ওদের নাই রে মানা;
 ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি।

নটরাজ। আপনার ঐ সভাকবির মূখখানা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখুন। ঠুঁর গোমুখীবিনিঃসূত
 বাক্যনির্ঝর এ দেশের কঠোর শিলাখণ্ডের উপর পাক খেয়ে বেড়াক। আমরা এনেছি সুদুরলোকের
 ধারা—আলোকের সভাপ্রাঙ্গণ ধুয়ে দিতে হবে। কাজ শেষ হলেই বিদায় নেব।

রাজা। আচ্ছা নটরাজ, তোমার পথের উপদ্রবকে নিরস্ত রাখব। পাল তুলে চলে যাও।

নটরাজ। মঞ্জুলা, তা হলে হাওয়াটা শোধন করে নিয়ে আর-একবার আবাহন গান ধরো।

তৃষ্ণার শান্তি,
 সুন্দরকান্তি,
 তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।
 আঁকো ধরাবক্ষে
 দিক্‌বধুচক্ষে
 সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।
 এলে বীর, ছন্দে—
 তব কটিবন্ধে
 বিদ্যুৎ-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্জন।
 তব উত্তরীয়ে
 ছায়া দিলে ভরিয়ে
 তমালবর্নশিখরে নবনীল-অঞ্জন।
 ঝিল্লির মন্দ্রে
 মালতীর গন্ধে
 মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগদ্‌গুন।
 নৃত্যের ভঙ্গে
 এলে নবরঙ্গে,
 সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন।

রাজা। ওহে নটরাজ, সভাকবির মুখে আর শব্দমাত্র নেই। এর চেয়ে বড়ো সাধুবাদ আর আশা
 কোরো না।

সভাকবি। আছে মহারাজ, আছে, বলবার বিষয় আছে—হঠাৎ মুখ বন্ধ করে দেবেন না।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

সভাকবি। আমি আধুনিক বটে, কিন্তু নাচ সম্বন্ধে আমি প্রাচীনপন্থী।

রাজা। কী বলতে চাও।

সভাকবি। নৃত্যকলায় দোষ আছে, ওটাকে হেয় করে রাখাই শ্রেয়।

রাজা। কাব্যে কোথাও কোনো দোষ সম্ভব নয় বন্ধি! কত কালিদাস এবং অকালিদাস দেখা গেল, ঠুঁদের শ্লোকগুলোর মধ্যে পাঁক বাঁচিয়ে চলা দায় যে।

সভাকবি। কাব্য বলুন, গীতকলা বলুন, ওরা অভিজাতশ্রেণীর, ওদের দোষকেও শিরোধার্য করতে হয়। কিন্তু ঐ নৃত্যকলার অভিজাত্য নেই, গোড়দেশের ব্রাহ্মণরা ওকে অনাচরণীয়া বলে থাকেন।

নটরাজ। কবিবর, তোমার গোড়দেশের সূচনা হবার বহু পূর্বে যখন আদিদেবের আহবানে সৃষ্টি-উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহিমালার নৃত্যে। সূর্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড়্ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সূরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর, সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিবাটিনী। মানুষের অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গের আনন্দকে তরঙ্গিত করবার ভার নিয়েছি আমরাই; তোমাদের মোহাচ্ছন্ন চোখে নির্মল দৃষ্টি জাগাব নইলে বৃথা আমাদের সাধনা।

মম চিন্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
হাসিকান্না হীরা পান্না দোলে ভালে;
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে;
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মৃষ্টি, নাচে বন্ধ;
সে তরঙ্গে ছুঁটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।

রাজা। এর উপরে আর কথা চলে না। এখন আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি ভালোবাসি কড়া পাকের রস। বর্ষার সবটাই তো কান্না নয়, ওতে আছে ঐরাবতের গর্জন, আছে উচ্চৈঃশ্রবাস দৌড়।

নটরাজ। আছে বৈকি। এসো তবে বিদ্যুন্ময়ী, শ্রাবণ যে স্বয়ং বজ্রপাণি মহেন্দ্রের সভাসদ, নৃত্যে সুরে তোমরা তার প্রমাণ করে দাও।

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বন্ধে এ কী ব্যাকুলতা।
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দূরে;
সহসা কী হাসি হাসো, নাহি কহ কথা।
আঁধার ঘনায় শূন্যে; নাহি জানে নাম,
কী রুদ্ধ সন্ধানে সিঁধু দুলিছে দুর্দাম।
অরণ্য হতাশ প্রাণে আকাশে ললাট হানে;
দিকে দিকে কেঁদে ফিরে কী দুঃসহ ব্যথা।

নটরাজ। ওহে ওস্তাদ, তোমার গানের পিছনে পিছনে ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল।

গরজত বরখত চমকত বিজরী। দুই পক্ষের পাল্লা চলুক। সুরে তালে কথায়, আর মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পাখি মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক্-হারানো দঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে;
কিসের বাধা ঘরের কোণে শাসনসীমালঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে,
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন;
শেষ ক'রে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

সভাকবি। ঐ রে! ঘুরে ফিরে আবার এসে পড়ল—সেই অজানা, সেই নিরুদ্দেশের পিছনে-ছোটো পাগলামি।

নটরাজ। উজ্জয়িনীর সভাকবিরও ছিল ঐ পাগলামি। মেঘ দেখলেই তাঁকেও পেয়ে বসত অকারণ উৎকণ্ঠা; তিনি বলেছেন, মেঘালোকে ভবতি সখিনোহপান্যথাবৃন্তি চেতঃ—এখানকার সভাকবি কি তার প্রতিবাদ করবেন।

সভাকবি। এত বড়ো সাহস নেই আমার। কালিদাসকে নমস্কার ক'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব মেঘ-দেখা হাহুতাশটাকে মনে আনতে।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে থাক্ কিছুক্ষণ হাহুতাশ, এখন অন্য কথা পাড়া যাক। মহারাজ, সব চেয়ে যারা ছোটো, উৎসবে সব চেয়ে সত্য তাদেরই বাণী। বড়ো বড়ো শাল তাল তমালের কথাই কবির বড়ো করে বলেন—যে কচিপাতাগুলি বন জুড়ে কোলাহল করে তাদের জন্যে স্থান রাখেন অম্পই।

রাজা। সত্য বলেছ, নটরাজ। ক্রিয়াকর্মের দিনে পাড়ার বড়ো বড়ো কর্তারা ভাঙা গলায় হাঁকডাক করে, কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশুদের কলরবে।

নটরাজ। ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলুম। কিশলয়িনী, এসো তুমি শ্রাবণের আসরে।

ওরা অকারণে চঞ্চল;
ডালে ডালে দোলে বায়ু হিল্লোলে
নব পল্লবদল।
বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী
শূন্যে পেয়েছে কখন কী জানি,
মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোর-কোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,
বনে বনে জানাজানি।
ওরা প্রাণ-ঝরনার উচ্ছল ধার
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল।

রাজা। সাধু সাধু! কিন্তু নটরাজ, এ হল ললিত চাঞ্চল্য—এবার একটা দুর্ললিত চাঞ্চল্য দেখিয়ে দাও।

নটরাজ। এমন চাঞ্চল্য আছে যাতে বাঁধন শক্ত করে, আবার এমন আছে যাতে শিকল ছেঁড়ে। সেই মুক্তির উদ্বেগ আছে শ্রাবণের অন্তরে। এসো তো বিজুলি, এসো বিপাশা।

হা রে, রে রে, রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—
 যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।
 ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধন-হারা,
 বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।
 হা রে, রে রে, রে রে, আমায় রাখবে ধ'রে কে রে—
 দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
 বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
 অটুহাস্যে সকল বিষয়- বাধার বন্ধ চেরে।

সভাকবি। মহারাজ, আমাদের দুর্বল রুচি, ক্ষীণ আমাদের পরিপাকশক্তি। আমাদের প্রতি দয়ামায়া রাখবেন। জানেন তো, ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ। রুদ্ররস রাজন্যদেরই মানায়।
 নটরাজ। আচ্ছা, তবে শোনো। কিন্তু বলে রাখছি, রস জোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী
 রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনি রিনি।
 দরদর করে হিয়া,
 মেঘ উঠে গরজিয়া,
 ঝিল্লি ঝনকে ঝিনি ঝিনি।
 মম মন-উপবনে করে বারিধারা,
 গগনে নাই শশী তারা।
 বিজুলির চমকনে
 মিলে আলো খনে খনে,
 খনে খনে পথ ভোলে উদাসিনী।

নটরাজ। অরণ্য আজ গীতহীন, বর্ষাধারায় নেচে চলেছে জলস্রোত বনের প্রাঙ্গণে—যমুনা, তোমরা তারই প্রচ্ছন্ন সুরের নৃত্য দেখিয়ে দাও মহারাজকে।

নাচ

রাজা। তোমার পালা বোধ হচ্ছে শেষের দিকে পের্পঁছল—এইবার গভীরে নামো যেখানে শান্তি, যেখানে স্তব্ধতা, যেখানে জীবনমরণের সন্মিলন।
 নটরাজ। আমারও মন তাই বলছে।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশ সে কি সহজ গান।
 সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।
 ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
 মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।
 সে ঝড় যেন সেই আনন্দে চিত্তবীণার তারে,
 সপ্তসিন্ধু দিক্-দিগন্ত জাগাও যে ঝংকারে।
 আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
 অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সন্মহান।

নটরাজ। মহারাজ, রাহি অবসানপ্রায়। গানে আপনার অভিনিবেশ কি ক্লান্ত হয়ে এল।

রাজা। কী বলো, নটরাজ! মন অভিষিক্ত হতে সময় লাগে। অন্তরে এখন রস প্রবেশ করেছে। আমার সভাকবির বিরস মুখ দেখে আমার মনের ভাব অনুমান কোরো না। প্রহর গণনা করে আনন্দের সীমানির্ণয়! এ কেমন কথা!

সভাকবি। মহারাজ, দেশকালপাত্রের মধ্যে দেশও অসীম, কালও অসীম, কিন্তু আপনার পাত্রদের ধৈর্যের সীমা আছে। তোরগম্বার থেকে চতুর্থ প্রহরের ঘণ্টা বাজল, এখন সভাভঙ্গ করলে সেটা নিন্দনীয় হবে না।

রাজা। কিন্তু তৎপূর্বে উষাসমাগমের একটা অভিনন্দন-গান হোক। নইলে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ হবে। যে-অন্তগমন নব অভ্যুদয়ের আশ্বাস না রেখেই যায় সে তো প্রলয়সন্ধ্যা।

নটরাজ। এ কথা সত্য। তবে এসো অরুণিকা, জাগাও প্রভাতের আগমনী। বিশ্ববেদীতে শ্রাবণের রসদানযজ্ঞ সমাধা হল। শ্রাবণ তার কমন্ডলু নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।

দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়

প্রভাতের কিনারায়।

ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে—

আয় আয় আয়।

ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,

কার ললাটে পরায় টিপ,

ও যে কার আগমনী গায়—

আয় আয় আয়।

জাগো জাগো সখী,

কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।

মালতীর বনে বনে

ওই শোনো ক্ষণে ক্ষণে

কহিছে শিশিরবায়—

আয় আয় আয়।

নটরাজ। মহারাজ, শরৎ দ্বারের কাছে এসে পৌঁছেছে। এইবার বিদায়গান। রসলোক থেকে আপনার সভাকবি মূর্ত্তি পেলেন বস্তুলোকে।

সভাকবি। অর্থৎ, অপদার্থ থেকে পদার্থে।

বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।

গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর।

ছাড়ল খেয়া ও পার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,

দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর।

কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধূলি,

মৌমাছির কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।

অরণ্যে আজ স্তম্ভ হাওয়া, আকাশ আজ শিশির ছাওয়া,

আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর।

ନୂତନାଟା ଚିତ୍ରାଞ୍ଜନା

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୭୬

১৮৯২ সালে প্রকাশিত 'চিত্রাঙ্গদা'র পরিবর্তিত রূপ 'নৃতানাট্য চিত্রাঙ্গদা' ১৯৩৬ সালে কলিকাতায় অভিনয় উপলক্ষে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং ১৩৪৪ খ্রিঃাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৩৪৩ বৈশাখে স্ৱলিপিহযে পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় বর্তমান পাঠ তদনুযায়ী।

বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কৰ্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঞ্জা হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।

দৃশ্য

মণিপুর-অরণ্য

মণিপুর-প্রাসাদ

পাত্র

অর্জুন

চিত্রাঙ্গদা

সখীগণ

মদন

অর্জুনের বন্যপরিচর

গ্রামবাসীগণ

ভূমিকা

প্রভাতের আদ্যিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে।

অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শূদ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।

তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণবৈচিত্র্যে,

তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।

একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবৃদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।

এই নাট্যকাহিনীতে আছে—

প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মর্দু স্নেহ সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা; শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যরত গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

মোহিনী মায়া এল,

এল যৌবনকুঞ্জবনে।

এল হৃদয়শিকারে,

এল গোপন পদসগারে,

এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।

পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,

হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়

বাজায় বাঁশি।

করে বীরের বীর্য-পরীক্ষা,

হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,

সর্বনাশের বেড়াজাল বেঁটিল চারি ধারে।

এসো সুন্দর নিরলংকার,

এসো সত্য নিরহংকার—

স্বপ্নের দুর্গ হানো,

আনো মুক্তি আনো,

ছলনার বন্ধন ছেঁদ

এসো পৌরুষ-উদ্ধারে।

১

প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার শিকার আয়োজন
 গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,
 অরণ্যে তমস্ছায়া।

মুখর নিঝরকলকল্লোলে
 ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
 হরিণদম্পতি।
 চিত্রব্যাঘ্র পদনখাচিহ্নরেখাশ্রেণী
 রেখে গেছে ওই পথপঙ্ক-পরে,
 দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সম্ভান।

বনপথে অর্জুন নির্দ্রিত
 শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গদার সখী তাঁকে তাড়না করলে

অর্জুন। অহো কী দুঃসহ স্পর্ধা,
 অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
 কোথা তার আশ্রয়!

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!

বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়
 অর্জুন। হাহা হাহা হাহা হাহা, বালকের দল,
 মা'র কোলে যাও চলে, নাই ভয়।
 অহো কী অদ্ভুত কৌতুক!

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!
 ফিরে এসো, ফিরে এসো,
 ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,
 যুদ্ধে করো আহ্বান!
 বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব
 করি যেন অনুভব—
 অর্জুন! তুমি অর্জুন!
 হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যর্থনা মহতের
 এল দেবতা তোর জগতের,
 গেল চলি,
 গেল তোরে গেল ছলি—
 অর্জুন! তুমি অর্জুন!

সখীগণ। বেলা যায় বহিয়া,
 দাও কহিয়া
 কোন্ বনে যাব শিকারে।
 কাজল মেঘে সজল বায়ে
 হরিণ ছুটে বেগুনছায়ে।

চিত্রাঙ্গদা। থাক্ থাক্ মিছে কেন এই খেলা আর।

জীবনে হল বিতৃষ্ণা,
আপনার 'পরে' ধিক্কার।

আত্ম-উদ্দীপনার গান

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার
শুকনো পাতার ডালে,
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজ হয়ে যাক সারা;
যাবার যাহা যাক সে চলে
রুদ্ধ নাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুদ্ধের 'পরে'।
নদীর জলে বান ডেকেছে
কূল গেল তার ভেসে,
বুথীর্বনের গন্ধবাণী
ছুটল নিরুদ্ধেদে—
পরান আমার জাগল বুদ্ধি
মরণ-অন্তরালে।

সখী। সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি!
এক পলকের আঘাতেই
খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।
রবিকরপাতে

কোরকের আবরণ টুটি
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে।

চিত্রাঙ্গদা। বন্ধু, কোন্ আলো লাগল চোখে!
বুদ্ধি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি.

ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে,
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সংগীতশূন্য বিষন্ন মনে

সঙ্গীরিক্ত চিরদুঃখরাত
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি!
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তব আনো বহে.

অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে।

[প্রস্থান

বন্য অনুচরদের সঙ্গে অর্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য

২

সখীদের গান
যাও যদি যাও তবে
তোমায় ফিরিতে হবে।
ব্যর্থ চোখের জলে
আমি লুটাব না ধূলিতলে,
বাতি নিবায়ে যাব না যাব না
মোর জীবনের উৎসবে।
মোর সাধনা ভীরু নহে,
শক্তি আমার হবে মুক্ত
দ্বার যদি রুদ্ধ রহে।
বিমুখ মহতেরে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি তব
খুলিব প্রেমের গোরবে।

চিত্রাঙ্গদা।
সখীসহ স্নানে আগমন
শূনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
চঞ্চল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে
ভরা জোয়ারে,
সকল ভাবনা-ডুবানো ধারায়
করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ
হবে নির্বাণ।
ঢেউ দিয়েছে জলে।
ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।
এ কী ব্যাকুলতা আজি আকাশে,
এই বাতাসে
যেন উতলা অঙ্গুরীর উত্তরীয়
করে রোমাঞ্চ দান,
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে
গুঞ্জরতান।

সখীদের প্রতি
 দে তোরা আমায় নতুন ক'রে দে
 নতুন আভরণে।
 হেমন্তের অভিসম্পাতে
 রিস্ত অকিঞ্চন কাননভূমি;
 বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন
 নব লাবণ্যধনে।
 শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক
 পল্লব-আবরণে।
 সখীগণ। বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
 পলকিত প্রাণের বীণায়ন্ত্রে
 চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
 আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক
 হিল্লোলে হিল্লোলে,
 যৌবন পাক সম্মান
 ব্যঞ্জিতসম্মিলনে।

[সকলের প্রস্থান]

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন
 তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য
 আমি তোমারে করিব নিবেদন
 আমার হৃদয় প্রাণ মন!
 অর্জুন। ক্ষমা করো আমায়,
 বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে,
 ব্রহ্মচারী ব্রতধারী।

[প্রস্থান]

চিত্রাঙ্গদা। হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ
 দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
 ধিক্ ধনুঃশর!
 ধিক্ বাহুবল!
 তের অশ্রুবন্যাবেগে
 ভাসিয়ে দিল যে মোর পৌরুষসাধনা।
 অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
 বসন্তেরে করিল ব্যাকুল।

রোদন-ভরা এ বসন্ত
 কখনো আসে নি বৃষ্টি আগে।
 মোর বিরহবেদনা রাঙালো
 কিংশুকরক্টিমরাগে।

- সখীগণ । তোমার বৈশাথে ছিল
প্রথর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন বাদল
আনে আষাঢ়ের পালা,
হায় হায় হায় ।
- চিত্রাঙ্গদা । কুঞ্জস্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পট্টালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিত্ত
কার পথ চেয়ে জাগে ।
- সখীগণ । কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা
নামিল অশ্রুঢালা ।
হায় হায় হায় ।
- চিত্রাঙ্গদা । দক্ষিণসমীপে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বৃষ্টি গো ।
কুঞ্জবনে মোর মৃকুল যত
আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে
- সখীগণ । মৃগয়া করিতে
বাহির হল যে বনে
মৃগী হয়ে শেবে
এল কি অবলা বালা ।
হায় হায় হায় ।
- চিত্রাঙ্গদা । আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,
দেওয়া হল না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে ।
- সখীগণ । যে ছিল আপন
শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে
হার মানিবার ডালা ।
হায় হায় হায় ।
- একজন সখী । ব্রহ্মচর্য !
পুরুষের স্পর্ধা এ যে !
নারীর এ পরাভবে
লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী ।
পশুশর, তোমারি এ পরাজয় ।
জাগো হে অতনু,
সখীরে বিজয়দূতী করো তব,
নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে,
দাও তারে অবলার বল ।

চিত্রাঙ্গদা ।

আমার এই রিস্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে ।
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে বিছায়ে ।
যে পদুপে গাঁথ পদুপধনু
তারি ফুলে ফুলে হে অতনু,
আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্য
দিয়ে ঘুচায়ে ।
তোমার রণজয়ের অভিযানে
আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে
এঁকে দিয়ে !
আমার শূন্যতা দাও যদি
সুধায় ভরি
দিব তোমার জয়ধ্বনি
ঘোষণ করি ;
ফাঙ্গনের আহবান জাগাও
আমার কায়ে
দক্ষিণবায়ে ।

মদনের প্রবেশ

মদন ।

মণিপদুরনুপদুহিতা
তোমাতে চিনি,
তাপসিনী ।
মোর পূজায় তব ছিল না মন,
তবে কেন অকারণ
মোর দ্বারে এলে তরুণী,
কহো কহো শুন ।

চিত্রাঙ্গদা ।

পদুরদ্বের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা
লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা—
কুসুমধনু,
অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু ।
অর্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে হেরিল না নারী,
ফিরাইল, গেল ফিরে ।
দয়া করো অভাগীরে—
শুধু এক বরষের জন্যে
পদুপলাবণ্যে
মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের মূল্য
মর্ত্যে অতুল্য ।

মদন ।

তাই আমি দিনু বর,
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর,

মম পঞ্চম শর—
 দিবে মন মোহি,
 নারীবিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে
 পাবে অচিরে,
 বন্দী করিবে ভুজপাশে
 বিদ্রুপহাসে।
 মণিপূররাজকন্যা
 কান্তহৃদয়-বিজয়ে হবে ধন্যা।

৩

নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা
 চিত্রাঙ্গদা। এ কী দেখি!
 এ কে এল মোর দেহে
 পূর্ব-ইতিহাসহারা!
 আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন;
 বিশ্বের অপরিচিত আমি।
 আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা,
 আমি শুধু এক রাত্রি ফোটা
 অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল,
 এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,
 তার পরে ধূলিশয্যা,
 তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা।

সরোবরতীরে
 আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
 আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।
 পুষ্পবিকাশের সুরে
 দেহ মন উঠে পূরে,
 কী মাধুরী সঙ্গন্ধ
 বাতাসে যায় ভাসি।
 সহসা মনে জাগে আশা,
 মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
 আজ মম রূপে বেশে
 লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
 এল মমের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি।

মীনকেতু,
 কোন্ মহা রাক্ষসীয়ে দিয়েছ বাঁধিয়া
 অঙ্গসহচরী করি।

এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত!
 ক্ষণিক যৌবনবন্যা
 রক্তপ্রোতে তরঙ্গিয়া
 উন্মাদ করেছে মোরে।

নৃতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য
 স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
 জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল বাথা।
 বহে মম শিরে শিরে
 এ কী দাহ, কী প্রবাহ—
 চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।
 ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়,
 দূরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
 তরঙ্গ উঠে প্রাণে
 দিগন্তে কাহার পানে,
 ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে—
 নাহি নাহি কথা।

[প্রস্থান

এরে ক্ষমা কোরো সখা,
 এ যে এল তব আঁখি ভুলাতে,
 শুধু ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় দুলাতে,
 আঁখি ভুলাতে।
 মায়াপূরী হতে এল নাবি,
 নিয়ে এল স্বপ্নের চাবি,
 তব কঠিন হৃদয়-দুয়ার খুলাতে,
 আঁখি ভুলাতে।

অর্জুনের প্রবেশ
 অর্জুন। কাহারে হেরিলাম!
 সে কি সত্য, সে কি মায়া,
 সে কি কায়া,
 সে কি সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত ছায়া!

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ
 এসো এসো যে হও সে হও,
 বলো বলো তুমি স্বপ্ন নও।
 অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
 বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা।
 চিত্রাঙ্গদা। তুমি অতিথি, অতিথি আমার।
 বলো কোন্ নামে করি সংকার।

অর্জুন।

পাণ্ডব আমি অর্জুন গান্ধীবধন্বা,
নৃপতিকন্যা।

লহো মোর খ্যাতি,

লহো মোর কীর্তি,

লহো পৌরুষ-গর্ব।

লহো আমার সর্ব।

চিহ্নাঙ্গদা।

কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,

এর কাছে মানিবে কি হার।

ধিক্ ধিক্ ধিক্।

বীর তুমি বিশ্বজয়ী,

নারী এ যে মায়াময়ী,

পিঞ্জর রচিবে কি

এ মরীচিকার।

ধিক্ ধিক্ ধিক্।

লজ্জা, লজ্জা, হায় এ কী লজ্জা,

মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।

এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,

এ যে শূন্য ক্ষণিকের অর্ঘ্য,

এই কি তোমার উপহার।

ধিক্ ধিক্ ধিক্!

অর্জুন।

হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার

সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি।

পৌরুষের সে অধৈর্য

তাহারে গৌরব মানি আমি।

আমি তো আচারভীরু নারী নহি,

শাস্ত্রবাক্যে বাঁধা।

এসো সখী, দঃসাহসী প্রেম

বহন করুক আমাদের

অজানার পথে।

চিহ্নাঙ্গদা।

তবে তাই হোক।

কিন্তু মনে রেখো,

কিংশুকদলের প্রান্তে এই যে দুলিছে

একটু শিশির—তুমি যারে করিছ কামনা

সে এমনি শিশিরের কণা

নিমিষের সোহাগিনী।

কোন্ দেবতা সে, কী পরিহাসে

ভাসালো মায়ার ভেলায়।

স্বপ্নের সাথী এসো মোরা মাতি

স্বর্গের কোতুক-খেলায়।

সুন্দের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
 বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে,
 নৃত্যবিভঙ্গে,
 মাধবীবনের মধুগন্ধে
 মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।
 যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি
 রোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
 মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া
 মোহের মন্দির জলে।
 নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে
 বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
 দিন গত হলে নতুন প্রভাতে
 মিলাবে ধুলার তলে
 কার অবহেলায়।

অর্জুন।

আজ মোরে
 সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়।
 শুধু একা পূর্ণ তুমি,
 সর্ব তুমি,
 বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,
 অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি,
 এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
 মহা অবসান,
 সব সাধনার তুমি
 শেষ পরিণাম।

চিত্রাঙ্গদা।

সে আমি যে আমি নই, আমি নই—
 হায়, পার্থ হায়,
 সে যে কোন্ দেবের ছলনা।
 যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও, বীর।
 শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
 দিয়ে না মিথ্যার পায়ে—
 যাও যাও ফিরে যাও।

[প্রস্থান]

অর্জুন।

এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ!
 এ যে অগ্নিলতা, পাকে পাকে
 ঘোরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
 উত্তপ্ত হৃদয়
 ছুটিয়া আসিতে চাহে
 সর্বাঙ্গ টুটিয়া।

অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজ্বালা ।
 বিঞ্চল হৃদয় নিদয় বাণে
 বেদন-ঢালা ।
 বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
 চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,
 মরণ-স্নাতোয় গাঁথল কে মোর
 বরণমালা ।
 চেনা ভুবন হারিয়ে গেল
 স্বপন-ছায়াতে,
 ফাগুন-দিনের পলাশরঙের
 রঙিন মায়াতে ।
 যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা,
 পথ-হারানোর লাগল নেশা,
 অচিন দেশে এবার আমার
 যাবার পালা ।

৪

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা । ভস্ম ঢাকে ক্লান্ত হৃদয়শন;
 এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন্,
 আর কতখন ।
 শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
 সহজে হতে দাও শেষ ।
 সুন্দর যাক রেখে স্বপ্নের রেশ ।
 জীর্ণ কোরো না, কোরো না,
 যা ছিল নতুন ।
 মদন । না না না, সখী, ভয় নেই, ভয় নেই—
 ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা
 ফল ধরে সেই ।
 হর্ষ-অচেতন বর্ষ
 রেখে যাক মন্ত্রস্পর্শ
 নবতর ছন্দস্পন্দন ।

[প্রস্থান

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
 আকাশকুসুম-চয়নে ।
 সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
 তোমার দুখানি নয়নে ।

দেখিতে দেখিতে নতুন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পলকে
নতুন ভুবন নতুন দ্যুলোকে
মোদের মিলিত নয়নে।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে,
এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো
শুদ্ধ দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনের বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহার নয়নে।

[প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কেন রে ক্লান্ত আসে আবেশভার বহিয়া।
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে।
ছিন্ন করো এখনি বীর্ষবিলোপী এ কুহেলিকা;
এই কর্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন্ পরমাদে।

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাসীগণ। হো, এল এল এল রে দস্যুর দল,
গর্জিয়া নামে যেন বন্যার জল।
চল্ তোরা পণ্ডগ্রামী,
চল্ তোরা কলিঙ্গধামী,
মল্লপল্লী হতে চল্,
'জয় চিত্রাঙ্গদা' বল্,
বল্ বল্ ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।

অর্জুন। জনপদবাসী, শোনো শোনো,
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো?

গ্রামবাসী। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি
গোপনব্রতধারিণী,
চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী।

অর্জুন। নারী! তিনি নারী!

গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা,
বাহুবলে তিনি রাজা।
তার নামে ভেরী বাজা,
'জয় জয় জয়' বলো ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।

সন্তাসের বিহবলতা নিজেই অপমান।
 সংকটের কম্পনাতে হোয়ো না শ্রিয়মাণ।
 মদুস্ত করো ভয়,
 আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেই করো জয়।
 দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
 নিজেই দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
 মদুস্ত করো ভয়,
 নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
 ধর্ম যবে শত্ৰুরবে করিবে আহবান
 নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
 মদুস্ত করো ভয়,
 দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ!
 অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
 কেমন না জানি
 আমি তাই ভাবি মনে মনে।
 শর্দূল স্নেহে সে নারী
 বীর্যে সে পুরুষ,
 শর্দূল সিংহাসনা যেন সে
 সিংহবাহিনী।
 জান যদি বলো প্রিয়ে,
 বলো তার কথা।
 চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে।
 হেন বৃষ্কম ভুরুষদুগ নাহি তার,
 হেন উজ্জ্বল কজ্জল-আঁখিতারা।
 সন্ধিতে পারে লক্ষ্য
 কীর্ণাঙ্কিত তার বাহু,
 বর্শিতে পারে না বীরবক্ষ
 কুটিল কটাক্ষরে।
 নাহি লজ্জা, নাই শঙ্কা,
 নাহি নিষ্ঠুর সুন্দর রং,
 নাহি নীরব ভাঙ্গির সংগীতলীলা
 ইঙ্গিতছন্দমধুর।
 অর্জুন। আগ্রহ মোর অধীর অতি—
 কোথা সে রমণী বীর্যবতী।
 কোষাবমুস্ত কুপাগলতা—
 দারুণ সে, সুন্দর সে
 উদ্যত বস্ত্রের রুদ্ররসে,
 নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,
 ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা।

সখীগণ।

নারীর ললিত লোভন লীলায়
এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি সখা, খেলা হল অবসান।
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল
সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি,
সে কি স্বপ্নের দান,
সে কি সত্যের অপমান।
দূর দূরশায় হৃদয় ভরিছ,
কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ
পৌরুষসন্ধান।
এও কি মায়ার দান।
সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে
যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন-সমান ছিন্ন
করি ফেলে খুলিতলে,
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য—
ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য
জানি জানি সখা, ক্ষুব্ধ করিবে
লব্ধ পদরুশপ্রাণ,
হানিবে নিষ্ঠুর বাণ।

অর্জুন।

যদি মিলে দেখা
তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি
আত্মপ্রাণে।
ভোগের আবেশ হতে
ঝাঁপ দিব যুদ্ধশ্রোতে।
আজি মোর চণ্ডল রক্তের মাঝে
ঝনঝন ঝনঝন ঝঞ্জন বাজে।
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
একাধারে মিলিত পদরুশ নারী।

চিত্রাঙ্গদা।

ভাগ্যবতী সে যে,
এত দিনে তার আহ্বান
এল তব বীরের প্রাণে।
আজ অমাবস্যার রাত
হোক অবসান।
কাল শুভ শুভ প্রাতে
দর্শন মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী
ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন।

অঙ্গুরের প্রতি
 সখী । রমণীর মন ভোলাবার ছলাকলা
 দূর ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী,
 সরল উন্নত বীৰ্যবন্ত অন্তরের বলে
 পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরু-সম,
 যেন সে সম্মান পায় পুরুষের ।
 রজনীর নর্মসহচরী
 যেন হয় পুরুষের কর্মসহচরী,
 যেন বামহস্তসম
 দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী ।
 তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয়, বীরোত্তম ।

চিত্রাঙ্গদা ও মদন
 চিত্রাঙ্গদা । লহো লহো ফিরে লহো
 তোমার এই বর,
 হে অনঙ্গদেব ।
 মদন্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও
 এই মিথ্যার জাল,
 হে অনঙ্গদেব ।
 চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
 তোমার পায়ে
 আমার অঙ্গশোভা ;
 অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে
 অশোকবনে, হে অনঙ্গদেব ।
 যাক যাক যাক এ ছলনা,
 যাক এ স্বপন, হে অনঙ্গদেব ।
 মদন । তাই হোক তবে তাই হোক,
 কেটে যাক রঙিন কুয়াশা,
 দেখা দিক শূদ্র আলোক ।
 মায়া ছেড়ে দিক পথ,
 প্রেমের আসুক জয়রথ,
 রূপের অতীত রূপ
 দেখে যেন প্রেমিকের চোখ—
 দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক
 মোহনির্মোক ।

[প্রস্থান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে,
 আভরণে আজি আবরণ কেন রবে ।

ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে
আলোতে অঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে,
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে—
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে।
ভাবের রসেতে বাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তব্দ কেন রয়ে গেলে দূরে।
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে।
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে।

৬

চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ

অর্জুনের প্রতি

এসো এসো পদ্রুশোভন,
এসো এসো বীর মম।
তোমার পথ চেয়ে
আছে প্রদীপ জ্বালা।
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে
দগ্ধ ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা।
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার
শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান
আত্মনিবেদনের ডালা,
চরণে করিবে দান।
আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার
দগ্ধ ললাটে সখা,
বীরের বরণমালা।

সখী।

হে কোন্‌তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি
সৌন্দর্যের ডালি,
নন্দনকানন হতে পদ্প তুলে এনে
বহু সাধনায়।
যদি সাঙ্গ হল পূজা,
তবে আজ্ঞা করো প্রভু,
নির্মাল্যের সাজি
থাক্ পড়ে মন্দির-বাহিরে।

এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও
সেবিকার পানে।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ
চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে উধেব
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বের রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শৃঙ্খল করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।
অর্জুন। ধন্য ধন্য ধন্য আমি।

সমবেত নৃত্য
তৃষ্ণার শান্তি সুন্দরকান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপ-ভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে,
একে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।
এনে দাও চিন্তে
রক্তের নৃত্যে
বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন।
উদ্বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেগুনে মলয়ের চুম্বন।
আনো নব পল্লবে
নর্তন উল্লোল,
অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরীবন্ধন।

এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে—
আনো মৃদু মৃদু নব তান,
আনো নব প্রাণ,
নব গান,
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,

আনো বিশ্বের অন্তরে অন্তরে
নিবিড় চেতনা।
আনো নব উল্লাসহিল্লোল,
আনো আনো আনন্দছন্দের হিন্দোলা
ধরাতলে।
ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃঙ্খল,
আনো, আনো উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা
ধরাতলে।

এসো থরথর-কম্পিত
মর্মরমুখরিত
মধু সৌরভপুলকিত
ফুল-আকুল মালতীবল্লীবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে।
এসো বিকশিত উন্মুখ,
এসো চিরউৎসুক,
নন্দনপথ-চিরযাত্রী।
আনো বাঁশরিমন্দিত মিলনের রাত্রি,
পরিপূর্ণ সুধাপাত্র
নিয়ে এসো।

এসো অরুণচরণ কমলবরন
তরুণ উষার কোলে।
এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
এসো নীরব কুঞ্জকুটীরে,
সুখসুপ্ত সরসীনীরে।
এসো তিড়িংশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে,
সিন্ধুতরঙ্গদোলে।

এসো জাগরমুখর প্রভাতে,
এসো নগরে প্রান্তরে বনে,
এসো কর্মে বচনে মনে।
এসো মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে,
এসো গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এসো মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এসো কোমল কিশলয়বসনে।
এসো সুন্দর, যৌবনবেগে।
এসো দৃপ্ত বীর, নব তেজে।
ওহে দুর্মদ, করো জয়যাত্রা
জরাপরাভব-সমরে—
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে।

অর্জুন।

মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিৎ।
যথা স্দপর্গঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নিহন্মি তে মনঃ।

চিত্রাঙ্গদা।

যথেমে দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পৰ্যেতি স্দর্ঘ্যঃ
এবা পৰ্যেমি তে মনঃ।

উভয়ে।

অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জসম্।
অন্তঃ কৃণদ্ব মাং হৃদি মন ইশৌ সহাসতি।

শান্তিনিকেতন
৮ ফাল্গুন ১৩৪২

মন্তের অনুবাদ

ফুল্ল শাখা যেমন মধুমতী
মধুরা হও তেমনি মোর প্রতি।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে
পাখায় ভূমিরে হানে
তেমনি আমার অন্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে।

—

আকাশধরা রবিরে ঘিরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

—

আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত,
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত।
হৃদয়ের ব্যবধান হোক মদুস্ত,
আমাদের মন হোক যোগযুক্ত।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

প্রকাশ : ১৯৩৮

১৯৩৮ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 'চন্ডালিকা নৃত্যনাট্য'
রবীন্দ্রনাথ পর বৎসর অভিনয় উপলক্ষে পরিমার্জিত করেন। ১৯৩৯
সালে 'নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা' নামে স্বরলিপিসহ যে নতুন সংস্করণ
প্রকাশিত হয়, বর্তমান পাঠ তদনুযায়ী।

প্রথম দৃশ্য

ফুলওয়ালির দল। একদল ফুলওয়ালি চলেছে ফুল বিক্রি করতে
নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদের দ্বারে,

আয় আয় আয়,

পরিবি গলার হারে।

লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে—
বেণীর বাঁধনে রাখিবি বেঁধে,
অলকদোলায় দুলাবি তারে,

আয় আয় আয়।

বনমাধুরী করিবি চুরি

আপন নবীন মাধুরীতে—

সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে,

আয় আয় আয়।

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা
বসন্তের মন্ত্রলিপি।

এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর

রাঙা রঙে রঞ্জিত,

মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে

গন্ধে তার গদুঞ্জরে।

আন্ গো ডালা, গাঁথ্ গো মালা,

আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী,

আয় তোরা আয়।

আন্ করবী রঙ্গন কাণ্ডন রজনীগন্ধা

প্রফুল্ল মল্লিকা,

আয় তোরা আয়।

মালা পর্ গো মালা পর্ সুন্দরী,

ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্।

আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা,

বকুলকুঞ্জ

দক্ষিণবাতাসে দুলিছে কাঁপিছে

থরথর মৃদু মর্মরি।

নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চারে,

চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গদুঞ্জরে।

দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে

উদাসিনী, হায় রে।

শূভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা,
সুধাপসরা

ধূলায় দেবে শূন্য করি,

শূকাবে বজ্রলমজরী।

চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারা পিক-বিরহকাকলি-কুজিত দক্ষিণবায়ে
মালাগু মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,
কিংশুকশাখা চঞ্চল হল দুলে দুলে গো।

প্রকৃতি ফুল চাইতেই তাকে ঘৃণা করে চলে গেল

দইওয়ালার প্রবেশ

দইওয়ালো। দই চাই গো, দই চাই, দই চাই গো।

শ্যামলী আমার গাই,

তুলনা তাহার নাই।

কঙ্কনানদীর ধারে

ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে—

দুর্বাদলঘন মাঠে তারে

সারা বেলা চরাই, চরাই গো।

দেহখানি তার চিকণ কালো,

যত দেখি তত লাগে ভালো।

কাছে বসে যাই বঁকে,

উত্তর দেয় সে চোখে,

পিঠে মোর রাখে মাথা—

গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো।

চন্ডালকন্যা প্রকৃতি দই কিনতে চাইল

একজন মেয়ে সাবধান করে দিল

মেয়ে। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,

ও যে চন্ডালিনীর ঝি—

নষ্ট হবে যে দই

সে কথা জান' না কি।

[দইওয়ালার প্রস্থান]

চুড়িওয়ালার প্রবেশ

চুড়িওয়ালো। ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে,

এসো এসো, দেখো চেয়ে,

এনেছি কাকিনজোড়া

সোনালি তারে মোড়া।

আমার কথা শোনো

হাতে লহো প'রে

যারে রাখিতে চাহ ধ'রে

কাকিন দুটি বেঁড়ি হয়ে

বাঁধিবে মন তাহার—
আমি দিলাম করে।

মেয়েরা। প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াতেই
ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।

[চুড়িওয়াল প্রভৃতির প্রস্থান

প্রকৃতি। যে আমারে পাঠাল এই
অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল,
কেন দিব ফুল আমি তারে—
যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিক্কারে।
জানি না হয় রে কী দুরাশায় রে
পূজাদীপ জ্বালি মন্দিরদ্বারে।
আলো তার নিল হরিয়া
দেবতা ছলনা করিয়া,
অধারে রাখিল আমারে।

ভিক্ষুগণ। পথ বেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ
যো সন্মিসিনো
বরবোধিমূলে,
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বেোধি মাগণি অনন্তএওঁএওঁনে
লোকুন্তমা তং পণমামি বুদ্ধ।

[প্রস্থান

মা। প্রকৃতির মা মান্নার প্রবেশ
কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে
নিষ্কারণে—
বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে।
রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,
বেলা বহে যায়।
রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো
আঁওনা হয় নি যে নিকোনো,
তোলা হল না জল,
পাড়া হল না ফল,
কখন্ বা চুলো তুই ধরাবি।
কখন্ ছাগল তুই চরাবি।
ধরা কর্, ধরা কর্, ধরা কর্—
জল তুলে নিয়ে তুই চল্ ঘর।

রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা
 ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং
 ওই যে বেলা বহে যায়।
 প্রকৃতি। কাজ নেই, কাজ নেই মা,
 কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়ে।
 যাক ভেসে যাক
 যাক ভেসে সব বন্যায়।
 জন্ম কেন দিলি মোরে,
 লাঞ্ছনা জীবন ভরে—
 মা হয়ে আনিলা এই অভিশাপ!
 কার কাছে বল্ করেছি কোন্ পাপ,
 বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়।
 মা। থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে,
 মিথ্যা কান্না কাঁদ্ তুই
 মিথ্যা দুঃখ গড়ে।

প্রকৃতির জল তোলা

বুদ্ধশিষ্য আনন্দের প্রবেশ
 আনন্দ। জল দাও আমায় জল দাও,
 রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ,
 আমায় জল দাও।
 আমি তাপিত পিপাসিত,
 আমায় জল দাও।
 আমি শ্রান্ত,
 আমায় জল দাও।

প্রকৃতি। ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—
 আমি চন্ডালের কন্যা,
 মোর কপের বারি অশুচি।
 তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি
 নহি অধিকারিণী,
 আমি চন্ডালের কন্যা।

আনন্দ। যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
 সেই বারি তীর্থবারি
 বাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে,
 বাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে
 সেই তো পবিত্র বারি।
 জল দাও আমায় জল দাও।

জল দান

কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।



চণ্ডালিকা : প্রকৃতি ও আনন্দ

নন্দলাল বসু-অঙ্কিত

প্রকৃতি ।

শুদ্ধ একটি গন্ডুষ জল,
আহা নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায় ।
আমার কদুপ যে হল অকদল সমুদ্র—
এই যে নাচে এই যে নাচে তরঙ্গ তাহার,
আমার জীবন জুড়ে নাচে—
টলোমলো করে আমার প্রাণ,
আমার জীবন জুড়ে নাচে ।
ওগো কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরম মুক্তি!
একটি গন্ডুষ জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুদ্ধ একটি গন্ডুষ জল ।

মেয়ে পুরুষের প্রবেশ

ফসল কাটার আহ্বান-গান
মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে,
আয় আয় আয় ।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে—
মরি হায় হায় হায় ।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে,
দিগ্বধরা ফসলখেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে—
মরি হায় হায় হায় ।
মাঠের বাঁশ শূনে শূনে আকাশ খুঁশি হল ।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো দয়ার খোলো ।
আলোর হাসি উঠল জেগে,
পাতায় পাতায় চমক লেগে
বনের খুঁশি ধরে না গো, ওই যে উথলে—
মরি হায় হায় হায় ।

প্রকৃতি ।

ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না ।
আমার কাজভোলা মন, আছে দূরে কোন্—
করে স্বপনের সাধনা ।
ধরা দেবে না অধরা ছায়া,
রিচি গেছে মনে মোহিনী মায়া—
জানি না এ কী দেবতারি দয়া,
জানি না এ কী ছলনা ।
আঁধার অঙ্গনে প্রদীপ জ্বালি নি,
দগ্ধ কাননের আমি যে মালিনী,
শূন্য হাতে আমি কাঙালিনী
করি নিশিদিন যাপনা ।
যদি সে আসে তার চরণছায়ে
বেদনা আমার দিব বিছায়ে,

জানাব তাহারে অশ্রুসিক্ত
রিক্ত জীবনের কামনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্ঘ্য নিয়ে বোধনারীদের মন্দিরে গমন
স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমদনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত,
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত।

[প্রস্থান

প্রকৃতি। ফুল বলে, ধন্য আমি
ধন্য আমি মাটির 'পরে।
দেবতা ওগো, তোমার সেবা
আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে,
দয়া করে দাও ভূলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগদূলি কাঁপে থরোথরো।
চরণপরশ দিয়ে দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে।

মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমায় মেয়ে।
পূরাণে শুনি নাকি তপ করেছেন উমা
রোদের জ্বলনে,
তোমার কি হল তাই।

প্রকৃতি। হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে।

মা। তোমার সাধনা কাহার জন্যে।

প্রকৃতি। যে আমারে দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক্।
যে আমারি জেনেছে নাম,
ওগো তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্।
আমি তারি বিচ্ছেদদহনে
তপ করি চিস্তের গহনে।
দুঃখের পাবকে হয়ে যায় শূন্য
অন্তরে মলিন যাহা আছে রুদ্ধ,
অপমান-নাগিনীর খুলে যায় পাক।

মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক।
কোন পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা
তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে,
আমি মন্ত্র পড়ে কাটাব তার মায়া।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—
জল দাও, জল দাও।

মা। পোড়া কপাল আমার!
কে বলেছে তোকে 'জল দাও'!

সে কি তোর আপন জাতের কেউ।
প্রকৃতি। হাঁ গো মা, সেই কথাই তো বলে গেলেন তিনি,
তিনি আমার আপন জাতের লোক।
আমি চণ্ডালী, সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,
সে যে দারুণ মিথ্যা।

শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল',
তা বলে কি জাত ঘুচবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল।
তিনি বলে গেলেন আমায়—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।
ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের,
সে-যে পাপ।
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,
আমি নই চণ্ডালী।

মা। কী কথা বলিস তুই,
আমি যে তোর ভাষা বদ্বি নে।
তোর মুখে কে দিল এমন বাণী।
স্বপ্নে কি কেউ ভর করেছে তোকে
তোর গতজন্মের সাথী।
আমি যে তোর ভাষা বদ্বি নে।

প্রকৃতি। এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম,
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দপদুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলাম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও।

শিউরে উঠল দেহ আমার,
 চমকে উঠল প্রাণ।
 বল্ দেখি মা,
 সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
 কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
 আমাকে দিলেন সহসা
 মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।

বলে, দাও জল, দাও জল।
 দেব আমি কে দিয়েছে হেন সম্বল।
 কালো মেঘ-পানে চেয়ে
 এল ধেয়ে
 চাতক বিহ্বল---
 বলে, দাও জল।
 ভূমিতলে হারা
 উৎসের ধারা
 অন্ধকারে
 কারাগারে।
 কার সুগভীর বাণী
 দিল হানি
 কালো শিলাতল—
 বলে, দাও জল।

মা। বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে,
 তোরে পথ-চাওয়া মন টান দিয়েছে কে।
 প্রকৃতি। সে যে পথিক আমার,
 হৃদয়পথের পথিক আমার।
 হায় রে আর সে তো এল না এল না,
 এ পথে এল না,
 আর সে যে চাইল না জল।
 আমার হৃদয় তাই হল মরুভূমি,
 শুকিয়ে গেল তার রস—
 সে যে চাইল না জল।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা,
 তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
 আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
 সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।

ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।
যে ফুল কানন করত আলো,
কালো হয়ে সে শূন্যকাল।
ঝরনারে কে দিল বাধা-
নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে।

মা।

বাছা, সহজ করে বল আমাকে
মন কাকে তোর চায়।
বেছে নিস মনের মতন বর—
রয়েছে তো অনেক আপন জন।
আকাশের চাঁদের পানে
হাত বাড়াস নে।

প্রকৃতি।

আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
ঝড়ে-পড়া ধূতরো ফুল
ধূলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রভু, ওগো প্রভু
সেই ফুলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না দিয়ো না।

অনুচর। রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ
সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো
শেষকালে এই ঠাই
ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই।

মা।

কেন গো কী চাই।

অনুচর।

রানীমার পোষা পাখি কোথায় উড়ে গেছে—
সেই নিদারুণ শোকে
ঘুম নেই তাঁর চোখে,
ও চরণের বউ।
ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে,
ও চরণের বউ।

মা।

উড়োপাখি আসবে ফিরে
এমন কী গুণ জানি।

অনুচর।

মিথ্যে ওজর শুনব না, শুনব না,
শুনবে না তোর রানী।
জাদু করে মন্ত্র পড়ে ফিরে আনতেই হবে,
খালাস পাবি তবে,
ও চরণের বউ।

প্রকৃতি ।

ওগো মা, ওই কথাই তো ভালো ।

মন্ত্র জানিস তুই,

মন্ত্র পড়ে

দে তাঁকে তুই এনে ।

মা ।

ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস—

আগুন নিয়ে খেলা!

শূনে বুক কেঁপে ওঠে,

ভয়ে মরি ।

প্রকৃতি ।

আমি ভয় করি নে মা,

ভয় করি নে ।

ভয় করি মা, পাছে

সাহস যায় নেমে,

পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি ।

এত বড়ো স্পর্ধা আমার,

এ কী আশ্চর্য!

এই আশ্চর্য সে'ই ঘটিয়েছে—

তারো বেশি ঘটবে না কি,

আসবে না আমার পাশে,

বসবে না আধো-আঁচলে?

মা ।

তাঁকে আনতে যদি পারি

মূল্য দিতে পারবি কি তুই তার ।

জীবনে কিছ্‌নুই যে তোর

থাকবে না বাকি ।

প্রকৃতি ।

না, কিছ্‌নুই থাকবে না, কিছ্‌নুই থাকবে না,

কিছ্‌নুই না, কিছ্‌নুই না ।

যদি আমার সব মিটে যায়

সব মিটে যায়,

তবেই আমি বেঁচে যাব যে

চিরদিনের তরে

যখন কিছ্‌নুই থাকবে না ।

দেবার আমার আছে কিছ্‌নু

এই কথাটাই যে

ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে—

আজ জেনেছি, আমি নই-যে অভাগিনী;

দেবই আমি, দেবই আমি, দেব,

উজাড় করে দেব আমারে ।

কোনো ভয় আর নেই আমার ।

পড়্‌ তোর মন্ত্র, পড়্‌ তোর মন্ত্র,

ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,

সেই তারে দিবে সম্মান—

এত মান আর কেউ দিতে কি পারে ।

মা। বাছা, তুই যে আমার বৃকচেরা ধন।
 তোর কথাতেই চলিছি
 পাপের পথে, পাপীয়সী।
 হে পবিত্র মহাপুরুষ,
 আমার অপরাধের শক্তি যত
 ক্ষমার শক্তি তোমার
 আরো অনেক গুণে বড়ো।
 তোমাতে করিব অসম্মান—
 তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম।
 প্রকৃতি। আমায় দোষী করো।
 ধূলায়-পড়া মলান কুসুম
 পায়ের তলায় ধরো।
 অপরাধে ভরা ডালি
 নিজ হাতে করো খালি,
 তার পরে সেই শূন্য ডালায়
 তোমার করুণা ভরো—
 আমায় দোষী করো।
 তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ
 ধরব তোমায় ফাঁদে
 আমার অপরাধে।
 আমার দোষকে তোমার পুণ্য
 করবে তো কলঙ্কশূন্য—
 ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি
 গলায় তোমার পরো।

মা। কী অসীম সাহস তোর, মেয়ে।
 প্রকৃতি। আমার সাহস!
 তাঁর সাহসের নাই তুলনা।
 কেউ যে কথা বলতে পারে নি
 তিনি বলে দিলেন কত সহজে—
 জল দাও।
 ওই একটু বাণী—
 তার দীপ্তি কত;
 আলো ক'রে দিল আমার সারা জন্ম।
 বৃকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,
 সেটাকে ঠেলে দিল—
 উথলি উঠল রসের ধারা।

মা। ওরা কে যায়
 পীতবসন-পরা সন্ন্যাসী।

ভিক্ষুগণ। বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল
 নমো নমো বুদ্ধদেবাকরায়,
 নমো নমো গৌতমচন্দ্রিমায়।

নমো নমো নন্তগুণধরায়,
 নমো নমো সাকিয়নন্দনায় ।
 প্রকৃতি । মা, ওই যে তিনি চলেছেন
 সবার আগে আগে!
 ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না—
 তাঁর নিজের হাতের এই নূতন সৃষ্টিরে
 আর দেখিলেন না চেয়ে!
 এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর
 আপন রে!
 হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে
 শুধু এক নিমেষের জন্যে!
 থাকতে হবে তোকে মাটিতেই
 সবার পায়ের তলায় ।
 মা । ওরে বাছা, দেখতে পারি নে তোর দুঃখ—
 আনবই আনবই, আনবই তারে
 মন্ত্র প'ড়ে ।
 প্রকৃতি । পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র,
 পাকে পাকে দাগ দিয়ে
 জড়িয়ে ধরুক ওর মনকে ।
 যেখানেই যাক,
 কখনো এড়াতে আমাকে
 পারবে না, পারবে না ।

আকর্ষণীমন্ত্রে যোগ দেবার জন্যে মা
 তার শিষ্যদলকে ডাক দিল
 মা । আয় তোরা আয়,
 আয় তোরা আয় ।

তাদের প্রবেশ ও নৃত্য
 যায় যদি যাক সাগরতীরে—
 আবার আসুক, আসুক ফিরে ।
 রেখে দেব আসন পেতে
 হৃদয়েতে ।
 পথের ধূলো ভিজিয়ে দেব
 অশ্রুদীপ্তে ।
 যায় যদি যাক শৈলশিরে—
 আসুক ফিরে, আসুক ফিরে ।
 লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,
 ডাকব উহায়—
 আমার স্বপন ওর জাগরণ
 রইবে ঘিরে ।

মায়ের মায়ানৃত্য
 মা । ভাবনা করিস নে তুই—
 এই দেখ্ মায়াদর্পণ আমার,
 হাতে নিয়ে নাচবি যখন
 দেখতে পারি তাঁর কী হল দশা ।
 এইবার এসো এসো রুদ্রভৈরবের সন্তান,
 জাগাও তান্ডবনৃত্য ।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মায়ের মায়ানৃত্য
 প্রকৃতি । ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনাল,
 মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে—
 উড়ে যাবে শূঙ্ক সাধনা সন্ন্যাসীর
 শূকনো পাতার মতন ।
 নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার,
 ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি
 ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে ।
 দুরদুর করে মোর বক্ষ,
 মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজুলি ।
 দূরে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সমুদ্র—
 তল নেই, কল নেই তার ।
 মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে ।
 মা । এইবার আয়নার সামনে নাচ্ দেখি তুই,
 দেখ্ দেখি কী ছায়া পড়ল ।

প্রকৃতির নৃত্য
 প্রকৃতি । লজ্জা, ছি ছি লজ্জা!
 আকাশে তুলে দুই বাহু
 অভিশাপ দিচ্ছেন কাকে ।
 নিজেরে মারছেন বহির বেদ,
 শেল বিধছেন যেন আপনার মর্মে ।
 মা । ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি,
 শেষে তোর কী হবে দশা ।
 প্রকৃতি । আমি দেখব না, আমি দেখব না,
 আমি দেখব না তোর দর্পণ ।
 বুক ফেটে যায়, যায় গো,
 বুক ফেটে যায় ।

কী ভয়ংকর দঃখের ঘূর্ণিবিক্ষা—
মহান বনস্পতি ধূলায় কি লুটাবে,
ভাঙবে কি অপ্রভেদী তার গৌরব।
দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ।
না না না।

মা। থাক্ তবে থাক্ এই মায়া।
প্রাণপণে ফিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র—
নাড়ী যদি ছিঁড়ে যায় যাক,
ফুঁরায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস।
প্রকৃতি। সেই ভালো মা, সেই ভালো।
থাক্ তোর মন্ত্র, থাক্ তোর—
আর কাজ নাই. কাজ নাই, কাজ নাই।

না না না, পড়্ মন্ত্র তুই. পড়্ তোর মন্ত্র—
পথ তো আর নেই বাকি!
আসবে সে, আসবে সে, আসবে,
আমার জীবনমৃত্যু-সীমানায় আসবে।
নিবিড় রাতে এসে পেঁছবে পান্থ,
বুকের জ্বালা দিয়ে আমি
জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—
সে আসবে।

দঃখ দিয়ে মেটাব দঃখ তোমার।
স্নান করাব অতল জলে
বিপুল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি—
মরণব্যথা দিব তোমার
চরণে উপহার।

মা। বাছা, মোর মন্ত্র আর তো বাকি নেই,
প্রাণ মোর এল কণ্ঠে।
প্রকৃতি। মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাঁহার।
ওই আসছে, আসছে, আসছে।
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ওই আসছে, আসছে, আসছে—
কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে।
মা। বল্ দেখি বাছা, কী তুই দেখিছিস আয়নার।

প্রকৃতি। ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে,
চারি দিকে বিদ্যুৎ চমকে।
অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর
অগ্নির আবেষ্টন,
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি।
তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালীনাগিনীমূর্তি
গর্জিছে বিবানিশ্বাসে,
কলুষিত করে তাঁর পুণ্যশিখা।

আনন্দের ছায়া-অভিনয়

মা। ওরে পাষাণী,
কী নিষ্ঠুর মন তোরা,
কী কঠিন প্রাণ,
এখনো তো আছিস বেঁচে।

প্রকৃতি। ক্ষুধার্ত প্রেম, তার নাই দয়া,
তার নাই ভয়, নাই লজ্জা।
নিষ্ঠুর পণ আমার,
আমি মানব না হার, মানব না হার—
বাঁধব তাঁরে মায়াবাঁধনে,
জড়াব আমারি হাসি-কাদনে।
ওই দেখ্, ওই নদী হয়েছেন পার—
একা চলেছেন ঘন বনের পথে।
যেন কিছুর নাই তাঁর চোখের সম্মুখে—
নাই সত্য, নাই মিথ্যা;
নাই ভালো, নাই মন্দ।

মাকে নাড়া দিয়ে

দুর্বল হোস নে হোস নে,
এইবার পড়্ তোরা শেষনাগমন্ত্র—
নাগপাশ-বন্ধনমন্ত্র।

মা। জাগে নি এখনো জাগে নি
রসাতলবাসিনী নাগিনী।

বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাঁশি, বাজ্ রে
মহাভীমপাতালী রাগিণী,
জেগে ওঠ্ মায়াকালী নাগিনী—
ওরে মোর মন্ত্রে কান দে—
টান দে, টান দে, টান দে, টান দে।
বিষগর্জনে ওকে ডাক দে—
পাক দে, পাক দে, পাক দে, পাক দে।
গহ্বর হতে তুই বার হ,
সপ্তসমুদ্র পার হ।

বেঁধে তারে আন্ রে—
 টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে।
 নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল—
 পাক দিতে ওই লাগল, লাগল, লাগল—
 মায়াটান ওই টানল, টানল, টানল।
 বেঁধে আনল, বেঁধে আনল, বেঁধে আনল।

এইবার নৃত্যে করো আহবান—
 ধরু তোরা গান।
 আয় তোরা যোগ দিবি আয়
 যোগিনীর দল।
 আয় তোরা আয়,
 আয় তোরা আয়,
 আয় তোরা আয়।

সকলে। ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন,
 তেমনি উঠে এসো এসো।
 শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি,
 তেমনি তুমি এসো এসো।
 ঈশানকোণে কালো মেঘের নিবেধ বিদারি
 যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ,
 তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে,
 এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো।
 আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়,
 যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
 তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।
 সুদূর হিমগিরির শিখরে
 মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ,
 প্রথর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে
 বন্যাধারা যেমন নেমে আসে—
 তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।

মা। আর দেরি করিস নে, দেখ্ দর্পণ—
 আমার শক্তি হল যে ক্ষয়।

প্রকৃতি। না, দেখব না আমি দেখব না,
 আমি শুনব—
 মনের মধ্যে আমি শুনব,
 ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব,
 তাঁর চরণধ্বনি।
 ওই দেখ্ এল ঝড়, এল ঝড়,
 তাঁর আগমনীর ওই ঝড়—
 পৃথিবী কাঁপছে থরো থরো থরো থরো,
 গুরু গুরু করে মোর বক্ষ।

মা। তোর অভিশাপ নিয়ে আসে
হতভাগিনী।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয় নয়,
অভিশাপ নয় নয়—
আনছে আমার জন্মান্তর,
মরণের সিংহদ্বার ওই খুলছে।
ভাঙল দ্বার,
ভাঙল প্রাচীর,
ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা।
ওগো আমার সর্বনাশ,
ওগো আমার সর্বস্ব,
তুমি এসেছ
আমার অপমানের চূড়ায়।
মোর অন্ধকারের উর্ধ্ব রাখো
তব চরণ জ্যোতির্ময়।

মা। ও নিষ্ঠুর মেয়ে,
আর যে সহে না, সহে না, সহে না।

প্রকৃতি। ওমা, ওমা, ওমা,
ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র
এখনি এখনি এখনি।
ও রাক্ষুসী, কী করলি তুই,
কী করলি তুই—
মরলি নে কেন পাপীয়সী।
কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জ্বল
শুভ্র সুনীর্মল
সুন্দর স্বর্গের আলো।
আহা কী শ্লান, কী ক্লান্ত—
আত্মপরাভব কী গভীর।
যাক যাক যাক,
সব যাক, সব যাক—
অপমান করিস নে বীরের,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক।

আনন্দের প্রবেশ
প্রভু, এসেছ উন্মাদিতে আমায়,
দিলে তার এত মূল্য,
নিলে তার এত দুঃখ।
ক্ষমা করো, ক্ষমো করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,

ধূলি হতে তুলি নাও আমার
তব পদ্যলোকে।
ক্ষমা করো।

জয় হোক তোমার জয় হোক।
আনন্দ। কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী।

সকলে বুদ্ধকে প্রণাম
সকলে। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহান্নবো,
যোচ্ছন্ত সুদ্বন্দ্বর ঐশ্বর্যলোচনো
লোকসুপাপপাকিলেসম্বাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং।

নৃতানাটা মায়াৰ খেলা

ৰচনা : ১৯৩৮

১৮৮৮ সালে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা'র পরিবর্তিত রূপ 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা' বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৫৭) 'পরিশিষ্ট' রূপে প্রথম মৃদ্বিত হয়। নৃত্যনাট্যটির কল্পনা ও রচনা শুরুর হয় ১৩৪৫ অগ্রহায়ণে। তবে সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য কবির জীবদ্দশায় অভিনীত বা মৃদ্বিত হয় নি।

পান্ডুলিপিতে প্রদত্ত নির্দেশে সংশয়ের অবকাশস্থলে [] চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

- সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। মোরা মর্দির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।
প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধো তানে ভাঙা গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান—
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

- শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে—
ওগো যাও, কোথা যাও।
সুখে ঢলোঢলো বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী,
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপূরী-পানে ধাও—
কোন্ মায়াপূরী-পানে ধাও।
অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত—
নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে—
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
 তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
 মনের মতো করে খুঁজে মর—
 সে কি আছে ভুবনে।
 সে যে রয়েছে মনে।
 ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
 তুমি শৃঙ্খলে যাহার পানে চাও।
 তোমার আপনার যেজন, দেখিলে না তারে?
 তুমি যাবে কার দ্বারে।
 যারে চাবে তারে পাবে না, যে মন
 তোমার আছে যাবে তা'ও।

[প্রস্থান]

শান্তার প্রতি

অমর। যেমন দেখিলে বায়ু ছুটেছে,
 কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে,
 তেমনি আমিও, সখী, যাব—
 না জানি কোথায় দেখা পাব।
 কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে,
 প্রভাত জাগিছে কার নয়নে,
 কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত—
 তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

[প্রস্থান]

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা। আমার পয়ান যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।
 তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।
 তুমি সুখ যদি নাহি পাও
 যাও সুখের সন্ধানে যাও—
 আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
 আর কিছু নাহি চাই গো।
 আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
 তোমাতে করিব বাস
 দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষা মাস।
 যদি আর-কারে ভালোবাস,
 যদি আর ফিরে নাহি আস,
 তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
 আমি যত দুখ পাই গো।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

- প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়। তারে ডেকে নিয়ে আয়।
 সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুলতায়।
 প্রথমা। আজ এ মধুর সন্ধ্যা কাননে ফুলের মাঝে
 হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তার।
 দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে।
 পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
 প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে।
 সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায়।

প্রমদার প্রবেশ

- প্রমদা। দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে সাধের বকুলফুলহার—
 আধোফুট জুঁইগুঁলি যতনে আনিয়া তুলি
 গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে, কবরী ভরিবে ফুলভার।
 তুলে দে লো, চঞ্চল কুন্তল কপোলে পিঁড়িছে বারে-বার।
 প্রথমা। আজ এত শোভা কেন। আনন্দে বিবশা যেন—
 দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য বারিয়া পড়ে ধরাতলে।
 প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—
 তরুণ তনু এত রূপরাশি বহিতে পারে না বৃদ্ধ আর।
 দ্বিতীয়া। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
 কোরো না হেলা হে গরবিনী।
 বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা—
 সূধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি।
 মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে—
 হেসে চলে যায় জেয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা।
 দুর্লভধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি।
 ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
 কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা হে গরবিনী।
 বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
 চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
 বাজবে বৃকে বিদায়পথের চরণ ফেলা হে গরবিনী।
 তৃতীয়া। সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা
 এ কি আর ভালো লাগে।
 আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস প্রাণে কেন নাহি জাগে।
 কবে আর হবে থাকিতে জীবন
 আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
 মধুর হৃদাশে মধুর দহন নিতিনব অনুরাগে।

তরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি,
 সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রথর চপল হাসি।
 উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
 আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে—
 মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণ রাগে।
 প্রমদা। ওলো, রেখে দে সখী, রেখে দে—মিছে কথা ভালোবাসা।
 সুখের বেদনা, সোহাগঘাতনা—বুঝিতে পারি না ভাষা।
 ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
 পরান সর্পিপতে প্রাণের সাধন,
 'লহো লহো' বলে পরে আরাধন—পরের চরণে আশা।
 তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া
 বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
 পরের মূখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা—
 জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা।

অমরের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

অমর। যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে।
 দাঁড়াও, চরণদুটি বাড়াও হৃদয়-আসনে।
 তুমি রঙিন মেঘমালা যেন ফাগুনসমীরে।
 প্রমদা। কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই—
 আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
 অমর। তোমায় ধরিতে চাই, ধরিতে পারি নে—
 তুমি গঠিত স্বপনে।
 মোরে রেখো না, রেখো না
 তব চঞ্চল লীলা হতে রেখো না বাহিরে।
 প্রমদা। কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
 কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে—
 আমি শুদ্ধ বহে চলে যাই।
 পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
 উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
 বনে বনে উঠে হৃদয়-তাশ—
 চাঁকিতে শূন্যে শূন্যে পাই—চলে যাই।
 আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

[অমরের প্রস্থান]

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি—
 যারে ভালোবেসেছি।
 ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
 পাছে কঠিন ধরণী পায় বাজে—
 রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে।

নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি।
প্রমদা। ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল।
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল।
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল।
সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
ফিরে যাই এই বেলা চলো সখী, চলো।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

[অমর শান্তা ও সখী]

শান্তা। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো—
বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়—
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান।
সখী। সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না—শুধু সুখ চলে যায়।
শান্তা। এত ব্যথা-ভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান—
বুঝি সে তুলে নিত না, শূন্যে অনাদরে—
তবু তার সংশয় হত অবসান।

[প্রস্থান]

অমর। আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে।
সখী। অবোধ মন লয়ে ফেরো ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহারবে।
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো—
কেন গো নিতে চাও মন তবে।
অমর। স্বপনসম সব জেনেছি মনে—
'তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে,

যেজন ফিরিতেছে আপন আশে
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।'
সখী। নয়ন মেলি শূদ্ধ দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শূদ্ধ শান্তি পাও।
তোমারে মদ্য তুলে চাহে না যে থাক্ সে আপনার গরবে।
অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
সখী। 'মন দিয়ে মন পেতে চাহি'—ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা।
অমর। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়ী-মরীচিকা,
শূদ্ধ ঘরে মরি মরুভূমে।
সখী। ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে—
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, কোকিলকর্জিত কুঞ্জ।
অমর। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়—
একি ঘোর প্রেম অন্ধরাহুপ্রায় জীবন যৌবন গ্রাসে।
সখী। তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কুয়াশা।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা। সুখে আছি, সুখে আছি, সখা, আপন-মনে।
প্রমদা ও সখীগণ। কিছ্ চেয়ো না, দূরে যেয়ো না—
শূদ্ধ চেয়ে দেখো, শূদ্ধ ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। সখা, নয়নে শূদ্ধ জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শূদ্ধ চেয়ে থাকো—
শূদ্ধ ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মধুরীধারা বহিছে আপনি,
কেহ কিছ্ নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা।
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ
আপনারে সঁপিয়াছি।
অমর। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলি নে ছলনাতে।
অমর। মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
অমর। সুখের শিশির নিমেষে শূকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো!
আনো সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
 অমর। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
 সুখ পায় তায় সে।
 চির-কলিকাজনম কে করে বহন চির শিশিররাতে।
 প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

[প্রস্থান]

[পুনঃপ্রবেশ]

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে।
 যা তোরা যা সখী, যা শূধা গে
 ওই আকুল অধর আঁখি, কী ধন যাচে।
 সখীগণ। ছি ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী।
 প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল। এত দিনে শরম টুটিল!
 তৃতীয়া। কেমনে যাব। কী শূধাব।
 প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।
 প্রমদা। যা তোরা যা সখী, যা শূধা গে—
 ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

অমরের প্রতি

সখীগণ। ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও—
 তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।
 অমর। আমি কী যেন করেছি পান, কোন্ মদিরারস-ভোর।
 আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।
 সখীগণ। ছি ছি ছি।
 অমর। সখী, ক্ষতি কী।
 এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি কেহ ভোলা-মন,
 কেহ সচেতন কেহ অচেতন,
 কাহারো নয়নে হাসির কিরণ কাহারো নয়নে লোর—
 আমার চোখে শূধু ঘুমঘোর।
 সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায় হেথা দাঁড়ায়ে তরুছায়।
 অমর। অবশ হৃদয়ভারে চরণ চলিতে নাই চায়,
 তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।
 সখীগণ। ছি ছি ছি।
 অমর। সখী, ক্ষতি কী।
 এ ভবে কেহ পড়ে থাকে কেহ চলে যায়,
 কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
 কেহ বা আপনি স্বাধীন কাহারো চরণে পড়েছে ডোর—
 কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর।
 সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না—চলে আয়, চলে আয়।
 ও কী কথা-যে বলে সখী, কী চোখে যে চায়।
 চলে আয়, চলে আয়।

লাজ টুটে শেষে মরি লাজে মিছে কাজে।
ধরা দিবে না যে, বলো, কে পারে তায়।
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয়, চলে আয়।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার। সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।
সখীগণ। দেয় যদি কাঁটা?
কুমার। তাও সহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
কুমার। যদি একবার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই অঁখিসুধাপানে চিরজীবন মাতি রহিব।
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে?
কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—
এ-যে হৃদয়দহন জ্বালা সখী।
এ-যে প্রাণ-ভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা—
এ-যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন-মরণ ঢালা।
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে—
‘যাই যাই’ করে প্রাণ, যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাই—
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা।
প্রথম সখী। সেজন কে, সখী, বোঝা গেছে
আমাদের সখী যারে মন প্রাণ সঁপেছে।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে।
প্রথম। ওই-যে তরুতলে, বিনোদমালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।

- দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু। কথা কবে?
তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে। ও কি বাঁধন মানে।
ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে।
দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি-পানে চায়,
যেন কী পথ তুলে এল কোথায় ওগো।
তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভ'রে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে।
প্রমদা। সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মথার একটি কুসুম দে।
যদি শূন্যায় কে দিল কোন্ ফুলকাননে—
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে।
সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে!
প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!
দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে।
তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে।

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

- অমর। সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে
সে কি ফিরাতে পারে সখী!
সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে।
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না-পায়—জানি নে।
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হৃদয়-দ্বারে।
তোমার সকলই ভালোবাসি—ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই—
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমঝারে।
সখীগণ। তুমি কে গো, সখীকে কেন জানাও বাসনা।
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না।
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন—
হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না।
সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা।
দ্বিতীয়া। আপন দুখ আপন ছায়া লয়ে যাও।
প্রথমা। জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাঁড়াও।
তৃতীয়া। দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা।
অমর। তবে সুখে থাকো, সুখে থাকো। আমি যাই—যাই।
প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না সখী!
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।

অমর। ছিলাম একেলা আপন ভুবনে—এসেছি এ কোথায়।
হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই।
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

[প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে। মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না সখী!
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অমর ও শান্তা

অমর। আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণার রাগিণী যায় থামি যে।
গৃহহারা হৃদয় যায় আলোহারা পথে হায়—
গহন তিমিরগৃহাতলে যাই নামি যে।
তোমারই নয়নে সন্ধ্যাতারার আলো,
আমার পথের অন্ধকারে জ্বালো জ্বালো।
মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে।
দিন-অবসানে তোমারই হৃদয়ে
শ্রান্ত পান্থ অমৃততীর্থগামী যে।

শান্তা। ভুল কোরো না গো, ভুল কোরো না, ভুল
কোরো না ভালোবাসায়।
ভুলায়ো না, ভুলায়ো না, ভুলায়ো না নিষ্ফল আশায়।
বিচ্ছেদদুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি—
পরিচিত আমি তার ভাষায়।
দয়ার ছলে তুমি হোয়ো না নিদয়।
হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয়।
রেখো না লব্ধ করে—মরণের বাঁশিতে মৃগ্য করে
টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায়।

অমর। ভুল করেছিন্দু, ভুল ভেঙেছে।
জেগেছি, জেনেছি—আর ভুল নয়, ভুল নয়।
মায়ার পিছে পিছে
ফিরেছি, জেনেছি ন্যপন সবই মিছে—
বিন্ধেছে কাঁটা প্রাণে—এ তো ফুল নয়, ফুল নয়।
ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন—হেলা করিব না।
তব হৃদয়ে, সখী, আশ্রয় মাগি।
অতল সাগর সংসারে—এ তো কল নয়, কল নয়।

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ। অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফর্টিতে চাহে, ফোটে না—মরে লাজে, মরে গ্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও হৃদয়রতন-আশে।

সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো—বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে।

অমর। ডেকো না আমারে ডেকো না—ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না।
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মূল্য নাই চাই যে ভালো বেসেছি।
কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না।
আমার দুঃখ-জোয়ারের জলস্রোতে।
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে—
অবহেলা তব ছলনা দিয়ে ডেকো না।

অমরের প্রতি

শান্তা। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্যপথপানে—
কাহার জীবনে নাই সুখ, কাহার পরান জ্বলে।
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা, দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে।

অমর। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি—
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে, লজ্জা আমার ঢাকিলে গো—
তোমাতে সহজে পেরেছি বুঝিতে।
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে—
এ নিরন্তর সংশয়ে আর পারি নে বুঝিতে।
তোমাতেই শুধু পেরেছি বুঝিতে।

[প্রস্থান]

[শান্তা] হায় হতভাগিনী,
স্রোতে বৃথা গেল ভেসে, কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি।
কাটালি বেলা বীণাতে সুর বেধে—
কঠিন টানে উঠল কেঁদে,
ছিল তারে থেমে গেল-যে রাগিণী।
এই পথের ধারে এসে ডেকে গেছে তোরে সে।
ফিরায়ে দিলি তারে রুদ্ধদ্বারে।
বুক জ্বলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি।

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ। এসো এসো, বসন্ত ধরাতলে।
আনো কুহুতান, প্রেমগান।
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আনো নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ—
প্রফুল্লনবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এসো থরথর কম্পিত মর্মরমুখরিত
নব পল্লবপলকিত
ফুল-আকুল মালতীবিল্লিবিতানে—
সুখছায়ে মধুবায়ে এসো এসো।
এসো অরুণচরণ কমলবরন তরুণ উষার কোলে।
এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কলকল্লোলতটিনীতীরে
সুখসুপ্তসরসীনীরে এসো এসো।

স্ত্রীগণ। এসো যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এসো মিলনসুখালস নয়নে,
এসো মধুর শরমমাঝারে—দাও বাহুতে বাহু বাঁধি।
নবীনকুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া।

পুরুষগণ। ও কি এল, ও কি এল না—
বোঝা গেল না, গেল না।
ও কি মায়া কি স্বপ্ননছায়া—ও কি ছলনা।

অমর। ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে।
গানেরই তানে কি বাঁধবে ওরে।
ও-যে চিরবিরহেরই সাধনা।

শান্তা। ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া—
বুঝি শুধু ও পরম কামনা।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া।

সখীগণ। কোন্ সে ঝড়ের ভুল ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মনুকুল।
নব প্রভাতের তারা
সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা।

অমরাবতীৰ সূৰ্যবতীৰ এ ছিল কানৈৰ দুল।
এ যে মৰ্কুটশোভাৰ ধন—
হায় গো দৰদী কেহ থাক যদি, শিৰে দাও পৰশন।
এ কি স্নোতে যাবে ভেসে দূৰ দয়াহীন দেশে—
জানি নে, কে জানে দিন-অবসানে কোন্‌থানে পাবে কুল।

শান্তা। ছি ছি, মৰি লাজে।

কে সাজালো মোৰে মিছে সাজে।
বিধাতাৰ নিষ্ঠুৰ বিদ্ৰূপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোৰে তোমাদেৰ দুজনেৰ মাঝে।
আমি নাই, আমি নাই—
আদরিণী, লহো তব ঠাই যেথা তব আসন বিৰাজে।

শান্তা ও স্ত্ৰীগণ। শূভমিলনলগনে বাজুক বাঁশি,
মেঘমুগ্ধ গগনে জাগুক হাসি।

পদুমবৰণ। কত দুখে কত দূৰে দূৰে আঁধাৰসাগৰ ঘূৰে ঘূৰে
সোনাৰ তৰী তীৰে এল ভাসি।
ওগো পদুমবালা, আনো সাজিয়ে বৰণডালা।
যুগলমিলনমহোৎসবে শূভ শঙ্খবৰে
বসন্তেৰ আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি।

প্ৰমদা। আৰ নহে, আৰ নহে।
বসন্তবাতাস কেন আৰ শূষ্ক ফুলে বহে।
লগ্ন গেল বয়ে, সকল আশা লয়ে—
এ কোন্‌ প্ৰদীপ জ্বাল! এ-যে বক্ষ আমার দহে।
আমাৰ কানন মৰু হল—
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকাৰে সেথায় কী ফুল তোল।
কাহাৰ ভাগ্য হতে বৰণমালা হরণ কর—
ভাঙা ডালি ভৰ।

মিলনমালার কণ্টকভাৰ কণ্ঠে কি আৰ সহে।

অমর। ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী।
বাজবে তোৰ পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাৰি আনন্দ—
দিশাহাৰা মেঘ যে গেল ডাকি।
নিৰ্মল দুঃখে যে সেই তো মুক্তি নিৰ্মল শূন্যেৰ প্ৰেমে।
আত্মবিড়ম্বন দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক সে থেমে।
দূৰাশাৰ মৰাবাঁচায় এতদিন ছিলি তোৰ খাঁচায়—
ধূলিতলে যাবি রাখি।

শান্তা। যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যাৰ জাল।
দুঃখেৰ প্ৰসাদে এল আজি মুক্তিৰ কাল।
এই ভালো ওগো, এই ভালো—বিচ্ছেদবহ্নিশিখাৰ আলো।
নিষ্ঠুৰ সত্য কৰুক বৰদান—ঘূচে যাক ছলনাৰ অন্তৰাজ।
যাও প্ৰিয়, যাও তুমি যাও জয়ৰথে। বাধা দিব না পথে।
বিদায় নেবাৰ আগে মন তব স্বপ্ন হতে যেন জাগে—
নিৰ্মল হোক হোক সব জঞ্জাল।

মায়াকুমারী । দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
 দীপ্ত সে হেম—
 নিত্য সে নিঃসংশয়, গৌরব তার অক্ষয় ।
 দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
 যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমোগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ,
 তৃষাদাহনমুগ্ধ অনর্দিন অমলিন রয় ।
 গৌরব তার অক্ষয়—
 অশ্রু-উৎস-জল-স্নানে তাপস মৃত্যুঞ্জয় ।

: প্রস্থান

সকলে । আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয় ।
 সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয় ।
 মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
 ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে—
 উধাও মনের পাখা মেলবি আয় ।
 অস্তগিরির ওই শিখর-চূড়ে
 ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে ।
 কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন—
 সাথে নাচুক তোর মরণ-বাঁচন,
 হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয় ।

ଶ୍ରୀମା

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୭୯

কথা (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের 'পরিশোধ' কবিতা অবলম্বনে রচিত 'পরিশোধ (নাট্যগীতি)' ১৯৩৬ সালে অভিনীত হয়, সেটিই 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের আদি সূচনা। প্রবাসীতে (১৩৪৩ কার্তিক) প্রকাশিত সেই আদিরূপটি বর্তমান খণ্ডে 'শ্যামা'র পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত।

প্রথম দৃশ্য

বজ্রসেন ও তাহার বন্ধু

বন্ধু।

তুমি ইন্দ্রমণির হার
এনেছ সুবর্ণ দ্বীপ থেকে—
রাজমহিষীর কানে যে তার খবর
দিয়েছে কে।

দাও আমায়, রাজবাড়িতে দেব বেচে
ইন্দ্রমণির হার—
চিরদিনের মতো তুমি যাবে বেঁচে।

বজ্রসেন।

না না না বন্ধু,
আমি অনেক করেছি বেচাকেনা,
অনেক হয়েছে লেনাদেনা—
না না না,
এ তো হাটে বিকোবার নয় হার—
না না না।
কণ্ঠে দিব আমি তারি
যারে বিনা মূল্যে দিতে পারি—
ওগো আছে সে কোথায়,
আজো তারে হয় নাই চেনা।
না না না বন্ধু!

বন্ধু।

জান না কি
পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর।

বজ্রসেন।

জানি জানি, তাই তো আমি
চলেছি দেশান্তর।

এ মানিক পেলেম আমি অনেক দেবতা পূজে,
বাধার সঙ্গে যুদ্ধে—
এ মানিক দেব যারে অর্পণি তারে পাব খুঁজে,
চলেছি দেশ-দেশান্তর।

বন্ধু দূরে প্রহরীকে দেখতে পেয়ে বজ্রসেনকে মালা-সমেত পালাতে বলল

কোটালের প্রবেশ

কোটাল।

থামো থামো,
কোথায় চলেছ পালায়ে
সে কোন্ গোপন দায়ে।
আমি নগর-কোটালের চর।

বজ্রসেন।

আমি বণিক, আমি চলেছি
আপন ব্যবসায়,
চলেছি দেশান্তর।

কোটাল।

কী আছে তোমার পেটিকায়।

বাজবে বাঁশি দরের হাওয়ায়,
 চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায়
 কাটবে প্রহর—
 বাজবে বদকে বিদায়পথে চরণ-ফেলা দিনযামিনী,
 হে গরবিনী।

শ্যামা। ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
 যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই—
 কোথা সে যে আছে সংগোপনে,
 প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে।
 এসো মম সার্থক স্বপ্ন,
 করো মোর যৌবন সুন্দর,
 দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে।
 ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,
 নবপ্রাণমন্তের আনো বাণী।
 পিপাসিত জীবনের ক্ষুধা আশা
 আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা—
 শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে,
 ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে।

সখীদের নৃত্যচর্চা, শেষে শ্যামার সজ্জা-সাধন, এমন সময়
 বজ্রসেন ছুটে এল। পিছনে কোটাল

কোটাল। ধর্ ধর্ ওই চোর, ওই চোর।
 বজ্রসেন। নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর—
 অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে।
 কোটাল। ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর, ওই চোর।

[প্রস্থান

বজ্রসেন যে দিকে গেল শ্যামা সে দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল
 শ্যামা।

আহা মরি মরি,
 মহেন্দ্রানন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
 কারে বন্দী করে আনে
 চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
 শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো, যা লো—
 বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
 শ্যামা ডাকিতেছে তারে।
 বন্দী সাথে লয়ে একবার
 আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি।

[শ্যামা ও সখীদের প্রস্থান

সখী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
 ঘুচাবে কে।
 নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
 মদ্যাবে কে।

আতের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

[সহচরীর প্রস্থান

বজ্রসেন ও কোটাল -সহ শ্যামার পুনঃপ্রবেশ

শ্যামা। তোমাদের এ কী ভ্রান্তি—
কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি।
এমন করে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছে কোন্ দোষে।
কোটাল। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে,
চোর চাই যে করেই হোক।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক, চোর চাই।
নাহিলে মোদের যাবে মান!

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিন্দু সময়।

কোটাল। রাখিব তোমার অনন্দনয়;
দুই দিন কারাগারে রবে,
তার পর যা হয় তা হবে।

বজ্রসেন। এ কী খেলা হে সুন্দরী,
কিসের এ কোঁতুক।
দাও অপমান-দুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কোঁতুক।

শ্যামা। নহে নহে, এ নহে কোঁতুক।
মোর অঙের স্বর্ণ-অলংকার
সর্পি দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে।
তব অপমানে মোর
অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

[বজ্রসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান

শ্যামা। সঙেগ শ্যামা কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসে
রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে
নিরীহের প্রাণ বধিবে বলে কারাগারে বাঁধে।
ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো,
আছ কি বীর কোনো,
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে।

উত্তরীর প্রবেশ

উত্তরী।

ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে,
শুদ্ধ তোমারে জানি

ওগো সুন্দরী।

চাও কি প্রেমের চরম মূল্য—দেব আনি,

দেব আনি ওগো সুন্দরী।

প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,

নেবে মোর প্রাণঞ্চল—

তাহারি সঙ্গ তোমারি বক্ষে

বাঁধা রব চিরদিন

মরণডোরে।

কেমনে ছাড়িবে মোরে,

ওগো সুন্দরী।

শ্যামা।

এতদিন তুমি সখা, চাহ নি কিছু;

নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু।

রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান,

তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান।

তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে

আমার প্রণাম যাক তব পিছু পিছু।

উত্তরী।

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।

রজনীগন্ধা অগোচরে

যেমন রজনী স্বপনে ভরে

সৌরভে,

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।

বিদায় নেবার সময় এবার হল—

প্রসন্ন মুখ তোলো,

মুখ তোলো, মুখ তোলো—

মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সর্পিয়া যাব প্রাণ

চরণে।

যারে জান নাই, যারে জান নাই,

যারে জান নাই,

তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।

শ্যামা হাত ধরে উত্তরীর মূখের দিকে চেয়ে রইল

অস্পর্শ পরে হাত ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল

সখী।

তোমার প্রেমের বীর্ষে

তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান

তব মরণের ডোরে

বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে

অসীম পাপে

অনন্ত শাপে।

তোমার চরম অর্ঘ্য

কিনিল সখীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ।

উত্তরী।

প্রহরী, ওগো প্রহরী,

লহো লহো লহো মোরে বঁধি।

বিদেশী নহে সে তব শাসনপাঠ,

আমি একা অপরাধী।

কোটাল।

তুমিই করেছ তবে চুরি?

উত্তরী।

এই দেখো রাজ-অঙ্গুরী --

রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি,

সেই পরিতাপে আমি কাঁদি।

[উত্তরীকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

সখী।

বুক যে ফেটে যায়, হায় হায় রে।

তোর তরুণ জীবন দিলি নিষ্কারণে

মৃত্যুপিপাসিনীর পায় রে।

ওরে সখা,

মধুর দুর্লভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি

কেন অকালে

পুষ্পবিহীন গীতিহার্য মরণমরুর পারে,

ওরে সখা।

[প্রস্থান

প্রহরী।

করাগারে উত্তরী। প্রহরীর প্রবেশ

নাম লহো দেবতার; দেরি তব নাই আর,

দেরি তব নাই আর।

ওরে পাষন্ড, লহো চরম দণ্ড; তোর

অন্ত যে নাই আশ্পর্ধার।

শ্যামার দ্রুত প্রবেশ

শ্যামা।

থাম্ রে, থাম্ রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—

দোষী ও-যে নয় নয়, মিথ্যা মিথ্যা সবই,

আমারি ছলনা ও যে—

বেঞ্জে নিয়ে যা মোরে

রাজার চরণে।

প্রহরী।

চুপ করো, দূরে যাও, দূরে যাও নারী—

বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না।

[দুই হাতে মুখ ঢেকে শ্যামার প্রস্থান

প্রহরীর উত্তরীকে হত্যা

সখী।

কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো

দেখা দিল রে প্রলয়রাশি ভেদি

দুর্দিন দুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি।
অকরণ নির্মম ভুবনে
দেখিনু এ কী সহসা—
কোন্ আপনা-সম্পর্গ, মুখে নির্ভয় হাসি।

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামা। বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ডঙ্কা,
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে
ভীষণ নীরবে।
কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে,
সহসা জাগিতে হবে রে।

বজ্রসেনের প্রবেশ

শ্যামা। হে বিদেশী এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
অভাগীরে করুণা করিয়ো, এসো এসো।
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী,
জীবনে মরণে প্রভু।

বজ্রসেন। এ কী আনন্দ, আহা—
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ।

এলে কারাগারে

রজনীর পারে উষাসম,

মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী।

শ্যামা। বোলো না, বোলো না, বোলো না
আমি দয়াময়ী।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। বোলো না।

এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।

আমি দয়াময়ী!

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে,
জেনো, প্রিয়ে।

সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।

কলঙ্ক যাহা আছে,

দূর হয় তার কাছে,

কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে।
জেনো, প্রিয়ে।

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দৌঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না,
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল,
পাগল হে নাবিক,
ভূলাও দিগ্‌বিদিক,
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
সখী। হায় হায় রে হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি।
শূন্যে কি পাস দূর আকাশে
কোন বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে
মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে
গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অটুহাসি।

চতুর্থ দৃশ্য

কোটার প্রবেশ
কোটার। পদরী হতে পালিয়েছে যে পদরসুন্দরী
কোথা তারে ধরি, কোথা তারে ধরি।
রক্ষা রবে না, রক্ষা রবে না—
এমন ক্ষতি রাজার সবে না,
রক্ষা রবে না।
বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী
ফাঙ্গানের অঙ্গন শূন্য করি।
ওরে কে তুই ভুলালি,
তারে কে তুই ভুলালি—

ফিরিয়ে দে তারে মোদের বনের দুলালী,
তারে কে তুই ভুলালি।

[প্রস্থান

সখীগণ।

মেয়েদের প্রবেশ। শেষে প্রহরীর প্রবেশ
রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে
এল আমাদের সখী।
দেঁরি কোরো না, দেঁরি কোরো না—
কেমনে যাবে অজানা পথে
অন্ধকারে দিক নিরখি।

অচেনা প্রেমের চমক লেগে
প্রণয়রাতে সে উঠেছে জেগে—
ধুবতারাকে পিছনে রেখে
ধূমকেতুকে চলেছে লখি।

কাল সকালে পদরোনো পথে
আর কখনো ফিরিবে ও কি।

দেঁরি কোরো না, দেঁরি কোরো না, দেঁরি কোরো না।

প্রহরী।

দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে বলো বলো।

সখীগণ।

আমরা আহিরিণী, সারা হল বিকিকিনি—

দূর গাঁয়ে চলি ধৈয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে।

প্রহরী।

ঘাটে বসে হোথা ও কে।

সখীগণ।

সাথী মোদের ও যে নেয়ে—

যেতে হবে দূর পারে,

এনেছি তাই ডেকে তারে।

নিয়ে যাবে তরী বেয়ে

সাথী মোদের ও যে নেয়ে—

ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না,

মিনতি করি,

ওগো প্রহরী।

[প্রস্থান

সখী।

কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দূই অজানারে

এ কী সংশয়ের অন্ধকারে।

দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়

মিলনতরণীখানি ধায় রে

কোন্ বিচ্ছেদের পারে।

বজ্রসেন ও শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন।

হৃদয়ে বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল

সেই প্রেম সেই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল।

এই ফুলহারে প্রেয়সী তোমারে

বরণ করি

অক্ষয় মধুর সুধাময়

হোক মিলনবিভাবরী।

প্রেমসী তোমায় প্রাণবেদিকায়
প্রেমের পূজায় বরণ করি।

কহো কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মনুষ্য কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।
নহে নহে নহে, সে কথা এখন নহে।
নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস।
তোমার প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বঁধিয়ে রাখিস।
দয়িতেরে দিয়েছিলি সন্ধ্যা,
আজিও তাহে মেটে নি ক্ষুধা—
এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।
যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে
কেন তারে বাহিরে ডাকিস।
কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত
কহো বিবরিয়া।

শ্যামা।
সহচরী।

বজ্রসেন।

জানি যদি প্রিয়ে, শোধ দিব
এ জীবন দিয়ে এই মোর পণ।
তোমা লাগি যা করেছি
কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর;
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ
নিজ-পরে লয়ে

বজ্রসেন।

সম্পেছে আপন প্রাণ।
কাঁদিতে হবে রে, রে পারিপ্ৰা,
জীবনে পারি না শান্তি।
ভাঙবে ভাঙবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে।

শ্যামা।

ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রসেন।

এ জন্মের লাগি
তোমার পাপমূল্য কেনা
মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত।
কলঙ্কিনী ধিক্ নিশ্বাস মোর
তোমার কাছে ঋণী।

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,
 দোষ করি নাই।
 দোষী আমি বিধাতার পায়ে,
 তিনি করিবেন রোষ—
 সহিব নীরবে।
 তুমি যদি না করো দয়া
 সবে না, সবে না, সবে না।

বজ্রসেন। তবু ছাড়িবি না মোরে?
 শ্যামা। ছাড়িবি না, ছাড়িবি না, ছাড়িবি না।
 তোমা লাগি পাপ নাথ,
 তুমি করো মর্মাঘাত।
 ছাড়িবি না।

শ্যামাকে বজ্রসেনের আঘাত ও শ্যামার পতন

[বজ্রসেনের প্রস্থান]

নেপথ্যে। হায় এ কী সমাপন!
 অমৃতপাত্র ভাঙিল,
 করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ;
 এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো
 কলঙ্কে, অসম্মানে।

বজ্রসেনের প্রবেশ

পল্লীরমণীরা। তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা,
 হায় বিদেশী পান্থ।
 এই দারুণ রোদ্রে, এই তপ্ত বালুকার
 তুমি কি পথদ্রান্ত।
 দুই চক্ষুতে এ কী দাহ
 জানি নে, জানি নে, জানি নে, কী যে চাহ।
 চলো চলো আমাদের ঘরে,
 চলো চলো ক্ষণেকের তরে,
 পাবে ছায়া, পাবে জল।
 সব তাপ হবে তব শান্ত।

কথা কেন নেয় না কানে,
 কোথা চলে যায় কে জানে।
 মরণের কোন্ দূত ওরে
 করে দিল বৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত।

[সকলের প্রস্থান]

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো এসো এসো প্রিয়ে,
 মরণলোক হতে নতুন প্রাণ নিয়ে।
 নিষ্ফল মম জীবন,
 নীরস মম ভুবন,

শূন্য হৃদয় পূরণ করো
মাধুরীসুধা দিয়ে।

সহসা নৃপদর দেখিয়া কুড়াইয়া লইল
হায় রে, হায় রে নৃপদর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি
কলগুঞ্জনসুর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া
স্মরণ সুমধুর।
তার কোমল-চরণ-স্মরণ সুমধুর।
তোর ঝংকারহীন ধিক্কারে কাঁদে
প্রাণ মম নিষ্ঠুর।

[প্রস্থান

নেপথ্যে। সব কিছুর কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
আপনাতে কেন মিটালো না
যত-কিছুর মন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে।

বজ্রসেনের প্রবেশ
বজ্রসেন। এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নতুন প্রাণ নিয়ে।

শ্যামার প্রবেশ
শ্যামা। এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না গেল না কেন কঠিন পরান মম—
তব নিষ্ঠুর করুণ করে! ক্ষমো মোরে।
বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে।
যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।

শ্যামা চলে যাচ্ছে। বজ্রসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে
শ্যামা একবার ফিরে দাঁড়াল। বজ্রসেন একটু এগিয়ে
বজ্রসেন। যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।

[বজ্রসেনকে প্রণাম করে শ্যামার প্রস্থান

বজ্রসেন।

ক্ষমিতে পারিলাম না যে,
 ক্ষমো হে মম দীনতা,
 পাপীজনশরণ প্রভু।
 মরিছে তাপে মরিছে লাজে
 প্রেমের বলহীনতা—
 ক্ষমো হে মম দীনতা,
 পাপীজনশরণ প্রভু।
 প্রিয়ারে নিতে পারি নি বৃকে,
 প্রেমেরে আমি হেনেছি,
 পাপীরে দিতে শাস্তি শুদ্ধ
 পাপেরে ডেকে এনেছি।
 জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
 যে অভাগিনী পাপের ভারে
 চরণে তব বিনতা।
 ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
 আমার ক্ষমাহীনতা,
 পাপীজনশরণ প্রভু।

পরিশোধ

নাট্যগীতি

প্রকাশ : ১৯৩৬

কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত “পরিশোধ” নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীনবৈধব্য অপরিহার্য।

গৃহদ্বারে পথপাশ্বে

শ্যামা ।

এখনো কেন সময় নাহি হল
নাম-না-জানা অতিথি,
আঘাত হানিলে না দ্বারে
কহিলে না, দ্বার খোলো ।
হাজার লোকের মাঝে
রয়েছি একেলা যে,
এসো আমার হঠাৎ আলো
পরান চমকি' তোলো ।

আঁধার বাঁধা আমার ঘরে
জানি না কার্দি কাহার তরে ।

চরণসেবার সাধনা আনো,
সকল দেবার বেদনা আনো,
নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র
কানে কানে বোলো ।

রাজপথে

প্রহরীগণ ।

রাজার আদেশ ভাই
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই,
কোথা তারে পাই?
যারে পাও তারে ধরো
কোনো ভয় নাই ।

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী ।
বজ্রসেন ।

ধরু ধরু, ওই চোর, ওই চোর ।
নই আমি, নই নই নই চোর ।
অন্যায় অপবাদে
আমারে ফেলো না ফাঁদে ।

প্রহরী ।
বজ্রসেন ।

নই আমি নই চোর ।
ওই বটে ওই চোর ওই চোর ।
এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর ।
আমি পরদেশী
হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর ;
নই চোর, নই আমি, নই চোর ।

শ্যামা ।

আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্দি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন

কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে। বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন আমার আলয়ে
দয়া করি।

সহচরী।

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে;
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে।
আতের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা,
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলারে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

শ্যামা।

প্রহরীদের প্রতি
তোমাদের এ কী ভ্রান্তি,
কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি।
এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে?

প্রহরী।

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
চোর চাই যে ক'রেই হোক।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক;
নহিলে মোদের যাবে মান।

শ্যামা।

নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিন্দু সময়।

প্রহরী।

রাখিব তোমার অনুনয়;
দুই দিন কারাগারে রবে
তার পর যা হয় তা হবে।

বজ্রসেন।

এ কী খেলা, হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
কেন দাও অপমান-দুখ,
মোরে নিয়ে কেন,
কেন এ কৌতুক।

শ্যামা।

নহে নহে, নহে এ কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার
সপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাখা আজি অপমান মানে।

বজ্রসেন।

কোন্ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমির রাশি ভেদি

দুর্দিন দূষণে,
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্মম ভুবনে
দেখিনু এ কী সহসা
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ধনা হাসি।

২

কারাগার

শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন।

এ কী আনন্দ
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃত সুগন্ধ।

এলে কারাগারে

রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অসি, লক্ষ্মী দয়াময়ী।
বোলো না, বোলো না, আমি দয়াময়ী।

শ্যামা।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।

আমি দয়াময়ী!

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

বজ্রসেন।

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে,
জেনো, প্রিয়ে,
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।

কলঙ্ক যাহা আছে

দূর হয় তার কাছে,

কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে।

শ্যামা।

হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো,

তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী,

জীবনে মরণে প্রভু।

বজ্রসেন।

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দৌঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।

ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না

পাল তুলে দাও, দাও দাও।

প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
 হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল,
 পাগল হৈ নাবিক
 ভুলাও দিগ্‌বিদিক
 পাল তুলে দাও, দাও দাও।
 শ্যামা। চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
 নিয়ো না নিয়ো না সরাসে।
 জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
 বক্ষে ধরিব জড়াসে।
 স্থলিত শিথিল কামনার ভার
 বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
 নিজ হাতে তুমি গেথে নিয়ো হার,
 ফেলো না আমারে ছড়াসে।
 বিকাসে বিকাসে দীন আপনারে
 পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
 তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে
 বরণের মালা পরাসে।

৩

বজ্রসেন ও শ্যামা

শ্যামা। তরঙ্গীতে
 এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
 তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
 ফুল ফোটানো সারা ক'রে
 বসন্ত যে গেল স'রে
 নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
 বলো কী করি।
 জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে,
 মর্ম্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুন্দলে,
 শূন্যমানে কোথায় তাকাস
 সকল বাতাস সকল আকাশ
 ওই পারের ওই বাঁশির সুরে
 উঠে শিহরি।
 বজ্রসেন। কহো কহো মোরে প্রিয়ে
 আমারে করেছে মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
 অয়ি বিদেশিনী,
 তোমারি কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।
 শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

ওই রে তরী দিল খুলে।

তোর বোঝা কে নেবে তুলে।

সামনে যখন যাবি ওরে,

থাক্-না পিছন পিছে পড়ে,

পিঠে তারে বইতে গেলে

একলা পড়ে রইবি কূলে।

ঘরের বোঝা টেনে টেনে

পারের ঘাটে রাখিল এনে

তাই যে তোরে বারে বারে

ফিরতে হল গেলি ভুলে।

ডাক্ রে আবার মাঝরে ডাক্,

বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,

জীবনখানি উজাড় করে

সপে দে তার চরণমূলে।

বজ্রসেন।

কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত

কহো বিবরিয়া।

জানি যদি প্রিয়ে,

শোধ দিব এ জীবন দিয়ে

এই মোর পণ।

শ্যামা।

নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

তোমা লাগি যা করেছি

কঠিন সে কাজ,

আরো সুকঠিন আজ

তোমারে সে কথা বলা।

বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,

ব্যর্থ প্রেমে মোর মন্ত অধীর।

মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ

নিজ-পরে লয়ে সপেছে আপন প্রাণ।

এ জীবনে মম ওগো সর্বোত্তম

সর্বাধিক মোর এই পাপ

তোমার লাগিয়া।

বজ্রসেন।

কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,

জীবনে পাবি না শান্তি।

ভাঙবে ভাঙবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে।

কোথা তুই লুকাবি মুখ মৃত্যু-আঁধারে।

শ্যামা।

ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।

এ পাপের যে অভিসম্পাত

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।

তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রসেন।

এ জন্মের লাগি

তোর পাপমূল্য কেনা মহাপাপভাগী

এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী
ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই,
দোষী আমি বিধাতার পায়ে;
তিনি করিবেন রোষ—
সহিব নীরবে।

তুমি যদি না কর দয়া
সবে না, সবে না, সবে না।

বজ্রসেন। তবু ছাড়িবি নে মোরে?
শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না।
তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না।

শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা
নেপথ্যে। হয়, এ কি সমাপন!
অমৃতপাত্র ভাঙিলি,
করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো, হারালো,
কলঙ্কে, অসম্মানে।

৪

পাথক রমণী

সব কিছুর কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা।
আপনাতে কেন মিটল না যত কিছুর মন্দেবরে—
ভালো আর মন্দেবরে।
নদী নিয়ে আসে পাঞ্চিক জলধারা
সাগর-হৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দে রে।

[প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা—
পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা,
ক্ষমো হে মম দীনতা।

প্রিয়ারে নিতে পারি নি বৃকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
 পাপীরে দিতে শাস্তি শূদ্ধ পাপেরে ডেকে এনেছি,
 জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
 যে অভাগিনী পাপের ভারে
 চরণে তব বিনতা,
 ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
 আমার ক্ষমাহীনতা।

এসো এসো এসো প্রিয়ে
 মরণলোক হতে নতুন প্রাণ নিয়ে।
 নিষ্ফল মম জীবন,
 নীরস মম ভুবন
 শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে।

নৃপদর কুড়াইয়া লইয়া
 হায় রে নৃপদর,
 তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগদ্বজনসদর।
 নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
 রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর।
 তোর ঝংকারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা।

এসেছি প্রিয়তম।

ক্ষমো মোরে ক্ষমো।

গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম
 তব নিষ্ঠুর করুণ করে।

বজ্রসেন।

কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে—
 যাও যাও চলে যাও।

[শ্যামার প্রণাম ও প্রস্থান]

বজ্রসেন।

ধিক্ ধিক্ ওরে মদুগ্ধ,
 কেন চাস্ ফিরে ফিরে।
 এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন
 এ যে মোহবাষ্পঘন কুজ্বাটিকা,
 দীর্ঘ করিবি না কি রে।
 অশ্রুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে
 নিদারুণ বিষ,
 লোভ না রাখিস
 প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিরে।
 নির্মম বিচ্ছেদসাধনায়
 পাপ ক্ষালন হোক,

না করো মিথ্যা শোক,
 দঃখের তপস্বী রে,
 স্মৃতিশৃংখল করো ছিন্ন,
 আয় বাহিরে
 আয় বাহিরে।

নেপথ্যে।

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে,
 যাও চিরবিরহের সাধনায়,
 ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।
 গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
 জয়ী হও অন্তর বিদ্রোহে।
 যাক পিয়াসা, ঘুচুক দঃরাশা,
 যাক মিলায়ে কামনা-কুয়াশা।
 স্বপ্ন-আবেশবিহীন পথে
 যাও বাঁধন-হারা,
 তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে বহে।

শান্তিনিকেতন

আশ্বিন ১৩৪৩

মুক্তির উপায়

প্রকাশ : ১৯৪৮

‘মুষ্টির উপায়’ (সাধনা, চৈত্র ১২৯৮) গল্প অবলম্বনে রচিত নাটকটি
‘অলকা’ মাসিকপত্রের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৪৫)
মুদ্রিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ১৯৪৮ সালে।

ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফদাড়িতে মুখের বারো-আনা অনাবিস্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত।

পুষ্পমালা এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূর-সম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়ারগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কোতূহলের সীমা নেই। কোতূকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের। অগুরু-জঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পের ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসির আগুন লাগিয়ে খান্ডবদাহন করে। কাজ শুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনোছি, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পণ্ডশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই সুমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন দুই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস পুষ্পের অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।

প্রথম দৃশ্য

ফকির। পদ্মপমালা। হৈমবতী

ফকির। সোহং সোহং সোহং।

পদ্ম। ব'সে ব'সে আওড়াচ্ছ কী।

ফকির। গুরুমন্ত্র।

পদ্ম। কতদূর এগোল।

ফকির। এই, ইড়া নাড়ীটার কাছ পর্যন্ত এসে গেল থেমে।

পদ্ম। হঠাৎ থামে কেন।

ফকির। ঐ আমার ছিঁচকাঁদুনি খুঁকিটার কীর্তি। মন্তরটা গুরুগুরু গুরুগুরু করতে করতে দিবা উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে। বোধ হয় আর সিকি ইঞ্চি হলেই পিঙ্গলার মধ্যে ঢুকে পড়ত, এমন সময় মেয়েটা নাকিসূরে চীৎকার করে উঠল—বাবা, নচণ্ডুস। দিলুম ঠাস করে গালে এক চড়, ভগ্না করে উঠল কেঁদে, অমনি এক চমকে মন্তরটা নেমে পড়ল পিঙ্গলার মুখ থেকে একেবারে নাভিগহ্বর পর্যন্ত। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পদ্ম। তোমার গুরুদর মন্তরটা কি অজীর্ণরোগের মতো। নাড়ীর মধ্যে গিয়ে—

ফকির। হাঁ দিদি, নাড়ীর মধ্যে ঘুটঘাট ঘুটঘাট করছেই—ওটা বায়ু কিনা।

পদ্ম। বায়ু নাকি।

ফকির। তা না তো কী। শব্দ ব্রহ্ম—ওতে বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋষিরা যখন কেবলই বায়ু খেতেন তখন কেবলই বানাতেন মন্তর।

পদ্ম। বল কী।

ফকির। নইলে অতটা বায়ু জমতে দিলে পেট যেত ফেটে। নাড়ী যেত পটপট করে ছিঁড়ে বিশথানা হয়ে।

পদ্ম। উঃ, তাই তো বটে—একেবারে চার-বেদ-ভরা মন্ত্র—কম হাওয়া তো লাগে নি।

ফকির। শুনলেই তো বুঝতে পার, ঐ-যে ও—ম্, ওটা তো নিছক বায়ু-উগার। পুণ্যবায়ু, জগৎ পবিত্র করে।

পদ্ম। এত সব জ্ঞানের কথা পেল কোথা থেকে। আমরা হলে তো পাগল হয়ে যেতুম।

ফকির। সবই গুরুদর মুখ থেকে। তিনি বলেন, কলিতে গুরুদর মুখই গোমুখী—মন্ত্রগঙ্গা বেরচ্ছে কল্কল্ করে।

পদ্ম। বি.এ.-তে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে। অজীর্ণ রোগেও ভুগেছি, সেটা কিন্তু পাকযন্ত্রের, ইড়াপিঙ্গলার নয়।

ফকির। এতেই বুঝে নাও—গুরুদর কৃপা। তাই তো আমার নাড়ীর মধ্যে মন্তরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গুরুদ গুরুদ গুরুদ শব্দে।

পদ্ম। আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে।

ফকির। তা বাড়ে বটে।

পদ্ম। গুরুদ কী বলেন।

ফকির। তিনি বলেন, পেটের মধ্যে স্থূলে সূক্ষ্মে লড়াই, যেন দেবে দৈত্যে। খাদ্যের সঙ্গে মন্ত্রের বেধে যায় যেন গোলাগুলি-বর্ষণ, নাড়ীগুলো উচ্চস্বরে গুরুদকে স্মরণ করতে থাকে।

হৈম। দুঃখের কথা আর কী বলব দিদি, পেটের মধ্যে গুরুদর স্মরণ চলছে, বাইরেও বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ঠুর গুরুদাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই, ঠুকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা—

পদ্মপ। চুপ চুপ চুপ, পতিব্রতা তুমি। স্বামী'র কন্ঠ যখন চলে, সাধবীরা প্রাণপণে থাকেন নীরবে। ফকিরদা, গলায় গান শানাচ্ছ কেন, গান্ধিজির অহিংসানীতির কথা শোন নি।

হৈম। তোমরা দুজনে তত্ত্বকথা নিয়ে থাকো। আমাকে যেতে হবে মাছ কুটতে। আমি চললাম।

[প্রস্থান]

ফকির। আমার কথাটা বুঝিয়ে বলি। গুরুদ্বর মন্ত্র, যাকে বলে গুরুদ্বপাক। খুব বেশি যখন জমে ওঠে অন্তরে, তখন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে। নাচের ঘূর্ণি উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে; আর, ঘানি ঘুরলে যেরকম আওয়াজ দিতে চায়, ভক্তির ঘোরে সেইরকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই দেখো-না এখনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে মূলাধার থেকে—উঃ!

পদ্মপ। কী সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকব নাকি।

ফকির। কিছু করতে হবে না। একবার পেট ভরে নেচে নিতে হবে। গুরুদ্ব বলেছেন, গুরুদ্বর মন্ত্রটা হল ধারক, আর নৃত্যটা হল সারক, দুটোরই খুব দরকার। (উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য)

গুরুচরণ করো শরণ-অ

ভবতরণ হবে তরণ-অ

সুধাক্ষরণ প্রাণভরণ-অ

মরণভয় হবে হরণ-অ।

পদ্মপ। শুধু মরণভয়-হরণ নয়, দাদা। গুরুদ্বক্ষিণার চোটে স্ত্রীর গয়না, বাপের তহবিল হরণও চলছে পুরো দমে।

ফকির। ঐ দেখো, বাবা আসছেন বউকে নিয়ে। বড়ো ব্যাঘাত, বড়ো ব্যাঘাত। গুরো।

পদ্মপ। ব্যাঘাতটা কিসের।

ফকির। স্থূলরূপে ঠুঁরা আমাকে ফকির বলেই জানেন।

পদ্মপ। আরো একটা রূপ আছে নাকি।

ফকির। ক্ষয় হয়ে গেছে আমার ফকির-দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলই মিলে যাচ্ছে গুরুদ্ব-দেহের সূক্ষ্মরূপে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ঠুঁরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

পদ্মপ। খোলসটা যে অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।

ফকির। দৃষ্টিশুদ্ধি হতে দেরি হয়। কিন্তু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবৎ-কৃপায় এঁদের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হলে গুরুদ্বদেহে আর ফকিরের দেহে একেবারে অভেদ রূপ দেখতে পাবেন—তখন বাবা—

পদ্মপ। তখন বাবা গয়ায় পিণ্ডি দিতে বেরবেন।

[ফকিরের প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বর ও হৈমবতীর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। (হৈমর প্রতি) বেয়াই ব্যাঙ্কে তোমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ফকির সেটা জানে। তাই তো ওর কিছু হল না।

পদ্মপ। আর কী হলে আর কী হত, সে ভাবতে গেলে মাথা ধরে যায়।

বিশ্বেশ্বর। ম্যাকিননের হেডবাবু আমার বন্ধুর শ্যালীপতি, সে বলেছিল, ফকির যা-হয় একটা-কিছু পাস করলেই তাকে অ্যাসিস্টেন্ট স্টোরকীপার করে দেবে। বাঁদরটা কেবল জেদ করেই বারে বারে ফেল করতে লাগল।

পদ্মপ। ফেল করবার বিদ্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিস্তিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সঙ্গে একসঙ্গেই পড়া আরম্ভ করেছিল। ম্যাট্রিকের এ পারের খোঁটা এমনি বিষম জেদ করে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিসেমশায় ওর কানে ধরে ঝপ্কে মারতে মারতে কান প্রায় ছিঁড়ে দিলেন কিন্তু

পার করতে পারলেন না। চল্ ভাই হৈমি, পড়া করবি আয়—স্বামীর হয়ে পাস করার কাজটা তুই সেরে রাখবি চল্।

বিশ্বেশ্বর। যাও পড়তে, কিন্তু শোনো মা—ফকির টাকা চাইলেই তুমি ওকে দাও কেন।

হৈম। কী করব বাবা, টাকা টাকা করে উনি বড়ো অশান্তি বাধান।

বিশ্বেশ্বর। ঐ দেখো-না, একটা রোঁয়া-ওঠা বাঘের চামড়ার উপর বসে বিড়বিড় করে বকছে। এই ফকির, শূনে যা, বাঁদর। শূনে যা বলছি।

পুষ্প। মেসোমশায়, তোমার বুদ্ধি সাহস হয় না ওকে ওর গন্ডিটা থেকে টেনে আনতে!

বিশ্বেশ্বর। সত্যি কথা বলি, মা, ভয়-ভয় করে। ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মানবার মতো বুদ্ধির পাটাও নেই। দেখো-না, ওখানটায় কিরকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঁঠা খেয়েছিল, তার মূড়োর খুলিটা রেখেছে পশমের আসনে।

পুষ্প। ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুতে পুতে গন্ডি বানিয়েছে। ও বলে, কাঠিগুলোর আলো কিছতেই নেবে না, যার দিব্যদৃষ্টি আছে সে চোখ বুললেই দেখতে পায়। গুরুর একটা চা-সেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুরুর বর্মা চুরটের প্যাকব্যাঞ্জে। গুরু ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ভাজা, কিনে এনে নৈবেদ্য দেয় ঐ পিরিচ ভরে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়লা ছিল এক কালে, তার অদৃশ্যরূপ গুরুর অদৃশ্য প্রসাদ ঢালতে থাকে। মোক্ষধাম ভরে যায় দার্জিলিং চায়ের গন্ধে।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা মা, ঐ বড়ো বড়ো বোতলগুলো কী করতে সাজিয়ে রেখেছে! ওর মধ্যে গুরুর ফীভার-মিক্সচারের অদৃশ্যরূপ ভরে রেখেছে নাকি!

পুষ্প। বল্-না হৈমি, ওগুলো কিসের জন্যে।

হৈম। দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধ্যা স্নান করে তিন চুমুক করে খান। ঠুঁর বিশ্বাস, ঠুঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমার সংসার-খরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বন্যায় গেছে ভেসে। যাই, আমার কাজ আছে।

[প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। ওরে ও ফক্রে!

পুষ্প। আচ্ছা, আমি ওকে নিয়ে আসছি। (কাছের দিকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে) ও ফকিরদা, করেছে কী!

ফকির। কেন, কী হয়েছে।

পুষ্প। গুরু হাঁসের ডিমের বড়া খেয়েছিলেন, তার খোলাটা পড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

ফকির। (লাফ দিয়ে উঠে) এঃ, ছি ছি, করেছি কী!

পুষ্প। হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি! সে তোমার পিছনে পিছনে প্যাক প্যাক করতে করতে যেত বৈকুণ্ঠধামে—সেখানে পাড়ত ম্বর্গীয় ডিম।

ফকির। (বোরিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বার বার মাথায় ঠেকালে) ক্ষমা কোরো গুরু, ক্ষমা কোরো—এ অন্ড জগদ্ব্রহ্মান্ডের বিগ্রহ; এর মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য, আছে লোকপাল দিকপালরা সবাই। গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনি গে।

পুষ্প। (চাদর চেপে ধরে) এনো. এখন তোমার বাবার কথাটা শূনে নাও।

[চাদরের খুঁটে ডিম বেঁধে ফকির বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করলে

বিশ্বেশ্বর। বাপু, ভক্তিটা খাটো করে আমার উক্তিটা মানো।

ফকির। কী আদেশ করেন।

বিশ্বেশ্বর। আর-একবার পাস করবার চেষ্টা করে দেখো।

ফকির। পারব না, বাবা।

বিশ্বেশ্বর। কী পারবি নে। পাস করতে না পাস করবার চেষ্টা করতে?

ফকির। চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন হবে না।

ফকির। গুরুদ্বিজ বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রথমে পাস, তার পরেই চাকরি।

বিশ্বেশ্বর। লক্ষ্মীছাড়া! কী করে চলবে তোমার! আমার পেন্সনের উপর? আমি কি তোমাকে খাওয়াবার জন্যে অমর হয়ে থাকব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বউমার কাছে টাকা চাইতে তোর লজ্জা করে না? পুরুষমানুষ হয়ে স্ত্রীর কাছে কাঙালপনা!

ফকির। আমি নিজের জন্যে এক পয়সা নিই নে।

বিশ্বেশ্বর। তবে নিস্ কার জন্যে।

ফকির। ঠুরই সদৃগতির জন্যে।

বিশ্বেশ্বর। বটে? তার মানে?

ফকির। আমি তো সবই নিবেদন করি গুরুদ্বিজের ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন।

বিশ্বেশ্বর। অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঁঠিসুদ্ধ। ছেলেপুলেরা মরবে শূন্যে।

ফকির। আমি কিছুই জানি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যা করেন গুরুদ্ব।

বিশ্বেশ্বর। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষ্মীছাড়া বাদর। তোর মদুখ দেখতে চাই নে।

[প্রস্থান]

হৈমবতীর প্রবেশ

ফকির। কা তব কান্তা—

হৈমবতী। কী বকছ।

ফকির। কা তব কান্তা। কোন্ কান্তা হয়।

হৈমবতী। হিন্দুস্থানী ধরেছ? বাংলায় বলো।

ফকির। বলি, কাঁদছে কে।

হৈমবতী। তোমারই মেয়ে মিন্তু।

ফকির। হায় রে, একেই বলে সংসার। কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিলে।

হৈমবতী। কাকে বলে সংসার।

ফকির। তোমাকে।

হৈমবতী। আর, তুমি কী! মৃত্যুর জাহাজ আমার! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি!

ফকির। গুরুদ্ব বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈমবতী। আমি তোমাকে যদি বেঁধে থাকি সাত পাকে, তোমার গুরুদ্ব বেঁধেছেন সাতান্ন পাকে।

ফকির। মেয়েমানুষ—কী বুঝবে তুমি তত্ত্বকথা! কামিনী কাণ্ডন—

হৈম। দেখো, ভণ্ডামি কোরো না। কাণ্ডনের দাম তোমার গুরুদ্বিজ কতখানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর, কামিনীর কথা বলছ! ঐ মদুখ কামিনীগুলোই পায়ের ধুলো নিয়ে পায়ে কাণ্ডন যদি না ঢালত তা হলে তোমার গুরুদ্বিজের পেট অত মোটা হত না। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমার কাটবে। কাণ্ডনের বাঁধন খসল তোমার। শব্দরমণায় আমাকে দিবি গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

পদুমের প্রবেশ

পদুম। ফকিরদা! মানে কী। তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মান্ডুক্যোপনিষৎ! অনিদ্রার পাঁচন নাকি!

ফকির। (ঈষৎ হেসে) তোমরা কী বুঝবে—মেয়েমানুষ!

পদ্মপ। কৃপা করে বুঝিয়ে দিতে দোষ কী!

[ফকির হাস্যমুখে নীরব]

হৈম। কী জানি ভাই, ওখানা উনি বালিশের নীচে রেখে রাস্তিরে ঘুমান।

পদ্মপ। বেদমন্ত্রগুলোকে তালিয়ে দেন ঘুমের তলায়। এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্ম পূর্বে।

ফকির। গুরুকৃপায় আমাকে পড়তে হয় না।

পদ্মপ। ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির। এই পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন, জ্বলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফুঁড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, ঢুকতে থাকে সুষুপ্ত নাড়ীর পাকে পাকে।

পদ্মপ। সেজন্যে ঘুমের দরকার?

ফকির। খুবই। আমি স্বয়ং দেখেছি গুরুদ্বিজকে, দুপুরবেলা আহারের পর ভগবঙ্গীতা পেটের উপর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়—গভীর নিদ্রা। বারণ করে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইড়াপিঙ্গলার মধ্য দিয়ে শ্লেষ্মাগুলো অন্তরাঙ্গায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। অবিশ্বাসীরা বলে, নাক ডাকে। তিনি হাসেন; বলেন, মূত্ৰদের নাক ডাকে, ইড়াপিঙ্গলা ডাকে জ্ঞানীদের—নাসারন্ধ্র আর ব্রহ্মরন্ধ্র ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিৎপদুর আর চৌরঙ্গী।

পদ্মপ। ভাই হৈমি, ফকিরদার ইড়াপিঙ্গলা আজকাল কিরকম আওয়াজ দিচ্ছে।

হৈম। খুব জোরে। মনে হয় পেটের মধ্যে তিনটে চারটে ব্যাঙ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ফকির। ঐ দেখো, শুনলে পদ্মপিদিদি? আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যি কথা না জেনেই মূখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গুরুদ্বিজ বলে দিয়েছেন, মাণ্ডুক্য উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অন্তরাঙ্গা চরম অবস্থায় নাভিগহবরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন কদমণ্ডুক, চার দিকের কিছুতেই আর নজর পড়ে না। তখনই পেটের মধ্যে কেবলই শিবোহং শিবোহং শিবোহং করে নাড়ীগুলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘুমেতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি—যোগনিদ্রা একেই বলে।

হৈম। একদিন মিন্তু কেন্দে উঠে গুর সেই ব্যাঙডাকা ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই তাকে মেরে খুন করেন আর-কি!

পদ্মপ। ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিলুম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মাণ্ডুক্যের কিছু কিছু। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হেঁচে হেঁচে ঘুম ভাঙিয়ে রাখতে হত। হাঁচির চোটে নিরেট ব্রহ্মজ্ঞানের বারো-আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিঙ্গলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আমি, গুরুর ফুঁয়ের জোরে অজ্ঞানসমুদ্র পার হতে পারলেম না।

ফকির। (ঈষৎ হেসে) অধিকারভেদ আছে।

পদ্মপ। আছে বৈকি। দেখো-না, ঐ শাস্ত্রেই ঋষি কোন্-এক শিষ্যকে দেখিয়ে বলছেন, সোয়ামাত্মা চতুষ্পাৎ—এর আত্মাটা চার-পা-ওয়ালা। অধিকারভেদকেই তো বলে দু-পা চার-পায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শুনলে জেগে থাকিস, আর-কোনো জাতের ডাক শুনিস কি দিনের বেলায়।

হৈম। কী জানি ভাই, মিন্তু দৈবাৎ গুর মন্ত্রপড়া জলের ঘটি উলটিয়ে দিতেই উনি যে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন সেটা—

পদ্মপ। হাঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শাস্ত্রের সঙ্গে।

ফকির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পদ্মপ। ফকিরদা, তপস্যা যখন ভেঙেছিল শিব এসেছিলেন তাঁর বরদাগ্রীর কাছে—তোমার তপস্যা এবার গুটিয়ে নাও; এই দেখো, বরদাগ্রী অপেক্ষা করে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি পরে।

হৈমবতী। পদ্মপাদিদি, বরদাতীর জন্যে ভাবনা নেই; পাড় দেখা দিচ্ছে রঙ-বেরঙের।

পদ্ম। বদ্বৈছি, গেরদুয়া রঙের ছটা বদ্বৈ ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে?

হৈমবতী। এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন দুটি-একটি করে বরদাতী। গেরদুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদশা আর-কি! সেদিন এসেছিল একজন বেহায়া মেয়ে ঠুঁর কাছে মৃষ্টিমন্ত্র নেবে বলে। হবি তো হ, আমারই ঘরে এসে পড়েছিল—দুটো-একটা খাঁটি কথা শুনিয়েছিলুম, মৃষ্টিমন্ত্রেরই কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে।

ফকির। দেখো, আমার মাণ্ডুকাটা দাও।

পদ্ম। কী করবে।

ফকির। নারীর হাত লেগেছে, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনি গে।

পদ্ম। সেই ভালো, বদ্বৈ দিবে ধোয়াটা তো হল না এ জন্মে।

ফকির। শুনো যাও, হৈম। আজকে গুরুদুগ্ধে নবরত্নদান রত। আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই।

হৈমবতী। দিতে পারব না, শ্বশুরমশায় পা ছুঁইয়ে বারণ করেছেন।

পদ্ম। তোমার গুরুদুজির বদ্বৈ কাণ্ডনে অরুচি নেই!

ফকির। তাঁর মহিমা কী বদ্বৈ তোমরা! কাণ্ডন পড়তে থাকে তাঁর বদ্বৈর মধ্যে আর তিনি চোখ বদ্বৈ বলেন—হুং ফট্। বাস্, একেবারে ছাই হয়ে যায়। যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ স্বচক্ষে দেখা।

পদ্ম। বদ্বৈতে যদি ছাই ভরবারই দরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকামি কর কেন।

ফকির। হায় রে, এইটেই বদ্বৈ না! গুরুদুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দগ্ধ হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসক্তি ছাই করতেই গুরুদুজির আবির্ভাব ধরাধামে। স্থূল সোনার কামনা ভস্ম করে কানে দেবেন সূক্ষ্ম শোনা, গুরুদুমন্ত্র।

পদ্ম। আর সহ্য হচ্ছে না, চল্ ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকি আছে।

ফকির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পদ্ম। (খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে) রোসো ভাই, একটা কথা আছে, বলে যাই। ফকিরদা, শুনোছি তোমার গুরু আমায় সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ফকির। হাঁ, তিনি শুনছেন, তুমি বেদান্ত পাস করেছ। তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এসে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেসে! সময় প্রায় হয়ে এল।

পদ্ম। বদ্বৈতে পারছি। কদিন ধরে কেবলই বাঁ চোখ নাচছে।

ফকির। নাচছে? বটে! ঐ দেখো, অব্যর্থ তাঁর বাক্য। টান ধরেছে।

পদ্ম। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, ছাই করে দেবার মতো মালমসলা আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাস করতে করতে যুনিভাসিটির আস্তিকুড়ে ভর্তি করে দিয়েছি।

হৈমবতী। কী বলছ ভাই, পদ্মপাদিদি! কোন্ ভূতে আবার তোমাকে পেল।

পদ্ম। কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটায়। বদ্বৈতে কাঁপন দিয়ে হঠাৎ আসে যেন ম্যালেরিয়ার গুরুদুগুনি। মনে হচ্ছে, রবি ঠাকুরের একটা গান শুনিয়েছিলুম—

গেরদুয়া ফাঁদ পাতা ভুবনে,

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

ফকির। পদ্মপাদি, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। পূর্বজন্মের কর্মফল আর-কি!

পদ্ম। নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অবদ্বৈকে দম্ব দিতে দিতে এমন অদ্ভুত বদ্বৈ হঠাৎ পাক খেয়ে ওঠে—তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির। উঃ, আশ্চর্য! ধন্য তুমি! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই—কী বলব!

পদুপ। একেবারে শেষের দিক থেকেই শুরু করে। রবি ঠাকুর বলেছেন—

যথনি জাগিলে বিশ্ব পূর্ণপ্রস্ফুটিত

ফকির। বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর—আমি তো কখনো পড়ি নি!

পদুপ। ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, তোর সেই মটরদানার দুনলী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপুরুষদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

হৈমি। কী বল দিদি! ও যে আমার শাশুড়ির দেওয়া!

পদুপ। এ মানুষটিও তো তোর শাশুড়ির দেওয়া, এও যেখানে তলিয়েছে ওটাও সেখানে যাবে নাহয়।

ফকির। অবোধ নারী, আসক্তি ত্যাগ করো, গুরুচরণে নিবেদন করো যা কিছু আছে তোমার।

পদুপ। হৈমি, বিশ্বাস করে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির। আহা, বিশ্বাস—বিশ্বাসই সব! আমার ছোটো ছেলেটার নাম দেব—অমূল্যধন বিশ্বাস।

পদুপ। হৈমি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুরুধাম

শিষ্যশিষ্যাপরিবৃত্ত গুরু। জটাজাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গেরুয়া চাদরখানা স্থূল উদরের উপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরনার মতো। ধূপধূনা। গদির এক পাশে খড়ম, যারা আসছে, খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছে—গুরো। গুরুর চক্ষু মৃদু, বকের কাছে দুই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুচছে। দুজন দু পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

গুরু। (হঠাৎ চোখ খুলে) এই-যে, তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি। সিদ্ধিরস্তু সিদ্ধিরস্তু। এখন মন দিয়ে শোনো আমার কথা।

সেবক। মন তো পড়েই আছে গুরুর চরণে।

শিষ্যদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কামা

গুরু। আজ তোমাদের বড়ো কঠিন পরীক্ষা। মুক্তির সাতটা দরজার মধ্যে এইটে হল তিনের দরজা। শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এইটে কোনোমতে পেরলে হয়। যাদের ধনের থলি ফেঁপে উঠেছে উদুরি-রুগির পেটের মতো, তারা এই সরু দরজায় যায় আটকে, জাঁতাকলের মতো।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এইখানে এসে মুক্তির ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ বসে পড়ে, কেউ ফিরে যায়। তার পরে এক দুই তিন, ঘণ্টা পড়ল, বাস্—হয়ে গেল, ডুবল নৌকো, আর টিকি দেখবার জো থাকে না। ক্রিং হ্রিং ব্রুম্।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছু হালকা হয়েছে যদি দেখি, তা হলে আর মার নেই। এইবার তবে শুরু হোক। ওহে চরণদাস, গানটা ধরো।

গুরুপদে মন করো অর্পণ,

ঢালো ধন তাঁর ঝুলিতে—

লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর

ভবের দোলায় দুর্লিতে।

হিসাবের খাতা নাড় বসে বসে,

মহাজনে নেয় সুদ কষে কষে—

খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে
 কেন থাক হায় ভুলিতে,
 দিন চলে যায় টাঁকে টাকা হায়
 কেবলি খুলিতে তুলিতে।

গদরু। কী নিতাই, চুপ করে বসে বসে মাথা চুলকোচ্ছ যে? মন খারাপ হয়ে গেছে বুদ্ধি! আচ্ছা, এই নে, পায়ের ধুলো নে।

নিতাই। তা, গদরুর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। খুবই ভাবনা আছে মনে। কাল সারারাত ধস্তাধস্তি করে স্ত্রীর বাক্স ভেঙে বাজুবন্দজোড়া এনেছি।

গদরু। এনেছ, তবে আর ভাবনা কী।

নিতাই। প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই। বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে ঝাঁটাপেটা করে দর করে দেবে।

গদরু। সেজন্যে এত ভয় কেন।

নিতাই। এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন।

গদরু। নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব—ঝগড়া দুদিনে যাবে মিটে।

নিতাই। ঐ নারীটিকে চেনেন না। সীতা-সাবিত্রীর সঙ্গে মেলে না। নাম দিয়েছি হিড়িম্বা। তা, বরুণ যদি অনুমতি পাই তা হলে দ্বিতীয় সংসার করে শান্তিপুরে বাসা বাঁধব।

গদরু। দোষ কী! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকন্তু ন দোষায়। সেইরকম দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী গৌরবে বহুবচন।

মাধব। তার মানে একাই এক সহস্র।

গদরু। উল্টো। আধ্যাত্মিক অর্থে পুরুষের পক্ষে এক সহস্রই একা। বড়ো বড়ো সজ্জন কুলীন বহু কষ্টে তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেইজন্যেই এ দেশকে বলে পুণ্যভূমি—পুণ্যবিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্লান্তি নেই।

মাধব। আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর কখনো শুনিনি।

গদরু। কী গো বিপিন, প্রস্তুত তো? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে—সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে, সব ছাই, সব ছাই?

বিপিন। জপেছি। মোহরটা আরো যেন তারার মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল মনের মধ্যে। (গদরুর পা জড়িয়ে ধরে) প্রভু, আমি পার্শ্বিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ করো, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গদরু। এই রে! মোলো, মোলো দেখছি। সর্বনাশ হল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গদরুর ধন চুরি করা! (ঝুলি এগিয়ে দিয়ে) ফেল্, ফেল্ বলছি, এখুনি ফেল্।

বিপিন বহু কষ্টে কম্পিত হস্তে রুমাল থেকে মোহর খুলে নিয়ে ঝুলিতে ফেলল

এইবার সবাই মিলে বলো দেখি—

সোনা ছাই, সোনা ছাই, সোনা ছাই।

নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই।

নয়ন মৃদিলে পরে কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই।

[সকলের চীৎকারস্বরে আবৃত্তি]

এই-যে, মা তারিণী! এসো এসো, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দূরে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সরল ভক্তি, দেখে পুরুষদের শিক্ষা হোক।

তারিণী পায়ের কাছে এক জোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল

(গদরু হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) গদরুভার বটে—বন্ধনটা বেশ একটু চাপ দিয়েছিল মনটাকে। যাক গে, এত দিনে হাতের বেড়ি তোমার খসল। লোহার বেড়ির চেয়ে অনেক কঠিন—ঠিক কিনা, মা?

তারিণী। খুব ঠিক, বাবা। মনে হচ্ছে, খানিকটা মাংস কেটে নিলে।

গুরুদ। মাংস নয়, মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রন্থি এই সবে আল্গা হতে শুরু করল, তার পরে ক্রমে ক্রমে—

তারিণী। না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের জন্যে শাশুড়ির আমলের গয়নাগর্দল যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

গুরুদ। (খিলির মধ্যে বালাজোড়া ফেলে দিয়ে) আচ্ছা আচ্ছা এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক্। তোমরা বলো সবাই—সোনা ছাই...।

[সকলের আবৃত্তি]

আরে বলদেও, ক্যা খবর?

বলদেও। (পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেখে) খবর আঁখসে দেখ্ লিজিয়ে হজরৎ।

গুরুদ। ভালো ভালো, দিল তো খুশ হয়?

বলদেও। পহেলা তো বহুৎ ঘাবড়া গিয়া থা। রাত ভর মেরে জীবাত্মানেসে হাজারো দফে বাতায়ী লিয়া কি, কুছ নেই, কুছ নেই, ইয়ে তো শ্রেফ কাগজ হয়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগ্‌সে জ্বল্ জাতা, পানীমেসে গল্ জাতা, ইস্‌কো কিম্মৎ কোড়িসে ভি কমতি হয়। লিকেন আত্মারাম সারা বখৎ গড়বড় কর্তে থে। মেরে ঐসী বুদ্ধি লগি ইয়ে কাগজ তো গুরুদজিকে পাঁও পর ডারনেকে লায়েক একদম নেই হয়—ইস্‌সে দো এক রুপৈয়া ভি অচ্ছি হয়। পিছে ফজিরমে দো লোটা ভর ভাঙ যব পী লিয়া, তব সব দুরস্ত হো গয়া। মেরে দিল হালকা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাফিক।

গুরুদ। জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তুঝকো ভালো করে। বলো সবাই—

নোটগুলো সব ঝুটো, সব ঝুটো, সব ঝুটো—

ওরা সব খড়কুটো, খড়কুটো, খড়কুটো—

ছাই হয়ে উড়ে যাবে মূঠো মূঠো, মূঠো মূঠো, মূঠো মূঠো।

[সকলের আবৃত্তি]

গুরুদ। আজ ফকিরকে দেখাছি নে যে বড়ো।

বলদেও। এক ঔরৎ ফকিরচাঁদজিকো আপনি সাথ লেকে আয়ি হয়। নয়া আদমি, হামারা মালুম দিয়া কি ভিতর আকে চিল্লায়েগি—ইস্‌বাস্তে দোনোকো বাহার খাড়া রখ্‌খা হয়। হুকুম মিল্‌নেসে লে আয়গা।

গুরুদ। কী সর্বনাশ! ঔরৎ! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখখনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়!

ফকিরের সঙ্গে পুষ্পের প্রবেশ

গুরুদ। এসো এসো মা, এসো। মুখ দেখেই বুঝছি, দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।

পুষ্প। ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, এত বড়ো বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুল্লুকে আর পাবেন না। কোনোদিন ঔর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল—গুরুদর আশীর্বাদে চিহ্নমাত্রই নেই।

গুরুদ। এ-সব কথা অর্থ কী।

পুষ্প। অর্থ এই যে, এঁর বাপ এঁকে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এঁর স্ত্রীকে। এক পয়সার সম্বল এঁর নেই। শুনছি, আপনার এখানে সকল রকম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার শ্রীপাদপদ্মে।

ফকির। অ্যাঁ, এ-সব কথা কী বলছ, পুষ্পদি। ঐ তো, সোনার হারগাছা নিয়ে আসা গেল—গুরুদরগে রাখবে না?

পুষ্প। রাখব বৈকি। (গুরুদর হাতে দিয়ে) তৃপ্ত হলেন তো?

গদরু। (হারখানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ ক'রে) আমার অতি যৎসামান্যেই তৃপ্তি। পণ্ড পদ্পং ফলং তোয়ং।

ফকির। ভুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

পদ্প। ভুল ভাঙানো জরুরি দরকার, নইলে আসন্ন বিপদ। ঠুর বাবা বিশ্বেশ্বরবাবু পদলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতল্লাসি করতে এখনই আসছে মখলদুগঞ্জের বড়ো দারোগা দাবিরদ্দিন সাহেব।

গদরু। (দাঁড়িয়ে উঠে) কী সর্বনাশ!

পদ্প। কোনো ভয় নেই, এখুঁখনি সোনাগুলোকে ভস্ম করে ফেলুন, পদলিসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গদরু। (কাতরস্বরে) বলদেও!

বলদেও। (লারি বাগিয়ে) কুছ পরোয়া নেই, ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হো, আপকো হুকুমসে হম লটাই করেঙ্গে।

মথরু। গদরুজি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপাগাড়ি দেখলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি, এই নোটখানা পরমাত্মার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বাস্তব ভেঙে নিয়ে এসেছে!

গদরু। অ্যাঁ, বল কী মথরু। পালাব কোথায়। ওরা যে আমার বাসার ঠিকানা জানে। এখন এই ঝুলিটা তোমরা কে রাখবে।

সকলে। কেউ না, কেউ না।

তারিণী। আমার বালা জোড়া ফিরিয়ে দাও।

গদরু। এখুঁখনি, এখুঁখনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা তুমি নাও, বাবা।

বলদেও। অব্ভিত তো নেই সকেঙ্গে। পদলিস চলা জানেসে পিছে লেউঙা।

পদ্প। আচ্ছা, আমারই হাতে ঝুলিটা দিন। পদলিসের কর্তার সঙ্গে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস সবাইকে ফিরিয়ে দেব।

মথরু। ওরে বাস্ রে, স্পাই রে স্পাই। কারো রক্ষা নেই আজ।

গদরু। স্পাই! সর্বনাশ! (উধর্শ্বাসে) চললুম আমি। মোটরটা আছে?

একজন। আছে।

ফকির। (পায়ে ধ'রে) প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে তোমার সঙ্গ।

গদরু। দূর দূর দূর। ছাড়্, ছাড়্ বলছি। লক্ষ্মীছাড়া! হতভাগা!

ফকির। তা, আমার কী দশা হবে! আমার কোথায় গতি!

গদরু। তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

[দ্রুত প্রস্থান]

বিপিন। মা গো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই। আর, আমার আছে বাজুবন্দ।

পদ্প। এই নাও তোমরা।

সকলে। তুমিই রক্ষা করলে মা, ধড়ে প্রাণ এল।

বলদেও। মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দাঁজিয়ে। আফিস্কে বখৎমে থোড়ী দেব হ্যায়।

পদ্প। এই নাও, ঠিক জায়গায় পেঁপঁছিয়ে দেবে তো?

বলদেও। জরুর। পরমাত্মাজি তো ফেরার হো গয়া, দুস্‌রা লেনেওয়ালো কোই হ্যায় নেই সওয়ায় মনিব ঠুর ডাকু। মালদুম থা কি নোট ভস্ম হো জায়গা, উস্‌কা পত্তা নহি মিলেগা, মেরা পদ্য ঠুর পদলিসকী ডাণ্ডা ফরক্‌ রহেগা। অভি দেখ্তা হ্‌ কি হিসাবকি থোড়ী গলতি থী। হর হর, বোম্‌ বোম্‌।

[প্রস্থান]

পদ্মপ। ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী। গদরদর পদধূলি তো আঠারো-আনা মিলেছে। এখন ঘরে চলো।

ফকির। যাব না।

পদ্মপ। কোথায় যাবে।

ফকির। রাস্তায়।

পদ্মপ। আচ্ছা বেশ, ছান্দোগ্যটা তো নিয়ে আসতে হবে।

ফকির। সে আমার সঙ্গে আছে।

পদ্মপ। কিন্তু, তোমার গদরদর?

ফকির। রইলেন আমার অন্তরে।

পদ্মপ। আর, ডিমের খোলাটা?

ফকির। সে ঝুলছে গামছায় বাঁধা বুদ্ধের কাছে।

[প্রস্থান

পদ্মপ। (পিছন থেকে) সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

হৈমর প্রবেশ

পদ্মপ। বিশ্বাস করতে পারিস নে বুদ্ধি? এই নে তোর হার।

হৈম। আর অন্যটি?

পদ্মপ। এখনকার মতো চার পা তুলে সে বেড়া ডিঙিয়েছে।

হৈম। তার পর?

পদ্মপ। লম্বা দাঁড় আছে।

হৈম। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

পদ্মপ। তুই হাঁউমাউ করিস নে তো। চতুষ্পদ একটু চরে বেড়াক-না!

হৈম। উনি ছান্দোগ্য নিয়ে যখন বেরলেন তখনই বুদ্ধলম্ব, ফিরবেন না। মন্ডুক মানে ব্যাঙ বুদ্ধি ভাই?

পদ্মপ। হাঁ।

হৈম। উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মানুষের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ। সেই পরম ব্যাঙ যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর করে ডাকে তখনই বোঝা যায়, সে পরমানন্দে আছে।

পদ্মপ। তাই হোক-না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে ডেকে বেড়াক, তোর আত্মাব্যাঙ এখন কিছ-দিনের মতো ঘুমিয়ে নিক।

হৈম। মনটা যে হু হু করবে, তার চেয়ে ব্যাঙের ডাক যে ভালো।

পদ্মপ। ভয় নেই, আনব তোর মাণ্ডুক্যকে ফিরিয়ে।

তৃতীয় দৃশ্য

ষষ্ঠীচরণ। পদ্মপ

ষষ্ঠী। মা, শরণ নিলুম তোমার।

পদ্মপ। খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে—সংসারের দুনলা বন্দুক লেগেছে তার বুদ্ধে, দুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে পদ্রুপের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে; আর, দুটো বিয়ে করলেই দুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাঁড়া যায় বেকে।

ষষ্ঠী। কী না জান তুমি, মা। নবগ্রাম থেকে আরম্ভ করে মথলুগঞ্জ পর্যন্ত সব কটা গাঁ যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর, তাই তোমায় মোলাম করতে হয় তাঁর শাসন।

পদুপ। না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বোলো না। আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি—ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন করে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্পিস্ করতে থাকে মানুষের হাত-দুটো। এ না হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।

ষষ্ঠী। না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখো-না! বড়ো বউয়ের ছেলেপুলের দেখা নেই। ভাবলেম, পিতৃপুরুষ পিণ্ডি না পেয়ে শূন্যকিয়ে মরবেন বৈতরণীতীরে। ধরে বেঁধে দিলেম মাখনের দ্বিতীয় বিয়ে, আর সবুদর সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে দুই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

পদুপ। এবারে পিতৃপুরুষের অজীর্ণ রোগের আশঙ্কা দেখছি।

ষষ্ঠী। মা, তোমার সব ভালো, কেবল একটা বড়ো খট্কা লাগে—মনে হয়, তুমি দেবতা-ব্রাহ্মণ মানই না।

পদুপ। কথাটা সত্যি।

ষষ্ঠী। কেন মা, ঐ খুঁতটুকু কেন থেকে যায়।

পদুপ। সংসারে দেবতা-ব্রাহ্মণের অবিচারের বিরুদ্ধেই যে লড়াই করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতুম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাখনের খোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী। জান তো মা, ও কিরকম হো হো করে বেড়াত—কেবল খেলাধুলো, কেবল ঠাট্টা-তামাসা। ভয় হত, কোথায় কী করে বাসে! তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর-একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

পদুপ। নোঙর বেড়েই চলল, ভারে নৌকো তলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ায় এসেছি হৈমির খবর নেবার জন্যে। শুনলুম, সে তোমার এখানেই আছে।

ষষ্ঠী। হাঁ মা, এতদিন আমি ছিলুম নামেই মামা। তার বিয়ের পর থেকে এই তাকে দেখলুম। বুক জুড়িয়ে গেল তার মধুর স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হল কি বলো তো! কন্‌গ্রেসওয়ালারা এর কিছু করে উঠতে পারলে না?

পদুপ। মহাত্মাজিকে বললে এখনই তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওয়াজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির মোড়ে খুদু ময়রার দোকানে তেলেভাজা ফুলদুরি খেয়ে বাবুদের আঁপসে ছুটতে হবে—দুদিন বাদেই সিক্‌ লীভের দরখাস্ত।

ষষ্ঠী। ও সর্বনাশ!

পদুপ। ভয় নেই, মেয়েদের হয়ে আমি মহাত্মাজিকে দরবার জানাব না। বরঞ্চ রবি ঠাকুরকে ধরব, যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

ষষ্ঠী। কিন্তু, রবি ঠাকুর কি আজকাল লিখতে পারে। আমার শ্যালার কাছে—

পদুপ। আর বলতে হবে না। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু ভাবনা নেই, লেখন্দাজ ঢের জুটে গেছে। দ্বাদশ আদিত্য বললেই হয়।

ষষ্ঠী। বরঞ্চ লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি, আজকাল মেয়েরা যেরকম—

পদুপ। অসহ্য, অসহ্য। জামা শেমিজ পরার পর থেকে ওদের লজ্জা শরম সব গেছে।

ষষ্ঠী। সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলুম; দেখি, মেয়েরা ট্রামে বাসে এমনি ভিড় করেছে—

পদুপ। যে পুরুষ বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চায় না। ও কথা যাক্ গে—মাখনের জন্যে ভেবো না।

ষষ্ঠী। সেই ভালো, তোমার উপরেই ভার রইল।

হৈমর প্রবেশ

হৈম। শুনলুম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এলুম।

পদুপ। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ সাজলেন। তোমারও সেই দশা। স্বামী এল বেরিয়ে রাস্তায়, স্ত্রী এল বেরিয়ে মামার বাড়িতে।

হৈম। মন টেকে না ভাই, কী করি! তুমি বলেছিলে, হারাধন ফিরিয়ে আনবে।

পদুপ। একটু সবুজ করো—ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে; একটা ধরতে যাই, দুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।

হৈম। আমার তো দুটোতে দরকার নেই।

পদুপ। খেরকম দিনকাল পড়েছে, দুটো-একটা বাড়তি হাতে রাখা ভালো। কে জানে কোন্টা কখন ফস্কে যায়।

হৈম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

পদুপ। হাঁ, সেটা আমারই কীর্তি।

হৈম। তাতে লিখেছ, প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্যে লোক চাই, হনুমানের পার্ট অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়।

পদুপ। এই তো চার দিকেই চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই।

হৈম। তা যেন বদললুম, এর মধ্যে হনুমানের অভাব ঘটল কবে থেকে।

পদুপ। দল পুরনু আছে ঘরে ঘরে। একটা পাগলা পার্লিয়েছে লেজ তুলে, ডাক দিচ্ছি তাকে।

হৈম। সাড়া মিলেছে?

পদুপ। মিলেছে।

হৈম। তার পরে?

পদুপ। রহস্য এখন ভেদ করব না।

হৈম। যা খুশি কোরো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখো না। ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা—ওকে তাড়িয়ে দিতে বলে দিই।

পদুপ। না না, তুমি বরঞ্চ যাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

[হৈমর প্রস্থান]

সেই লোকের প্রবেশ

পদুপ। তুমি কে?

সেই লোক। সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীর্তি, হাতের কাজের যে নমুনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর সুনাম হয় নি।

পদুপ। মন্দ তো লাগছে না!

সেই লোক। অর্থাৎ মজা লাগছে। ঐ গুণেই বেঁচে গেছি। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

পদুপ। কিন্তু, সব জায়গায় মজা লাগে নি।

সেই লোক। খবর পেয়েছ দেখছি। তা হলে আর লুকিয়ে কী হবে। নাম আমার শ্রীমাখনচন্দ্র। বদ্বতেই পারছ, যাত্রার দলের সরকারি গোঁফদাড়ি পরে এসেছি কেন। এ পাড়ায় মুখ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানোই অভ্যাস হয়ে গেছে।

পদুপ। এলে যে বড়ো?

মাখন। চলোছিলুম নাজিরপুরে ইলিশ মাছ ধরার দলে। ইন্সটেশনে দেখি বিজ্ঞাপন, হনুমানের দরকার। রইল পড়ে জেলেরগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বললুম,

ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই—আর দ্বিতীয় মানুষ নেই যার এত বড়ো যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয়!

পদ্মপ। খাওয়াপরা কিছুর টানাটানি পড়েছে বুদ্ধি?

মাখন। নিতান্ত অসহ্য হয় নি। কেবল যখন ধনেশাক দিয়ে ডিমওয়ালা কই মাছের ঝোলের গন্ধস্মৃতি অন্তরাআর মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে, তখন আমার শ্রীমতী বাঁয়া আর শ্রীমতী তবলার তেরেকেটে মেরেকেটে ভির্কুটি মির্কুটির তালে তালে দূর থেকে মন কেমন ধড় ফড় করতে থাকে।

পদ্মপ। তাই বুদ্ধি ধরা দিতে এসেছ?

মাখন। না না, মনটা এখনো তত দূর পর্যন্ত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে তখন প্রথমটা ভাবলুম বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা করব, দেব এক লক্ষ্য। কিন্তু, রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দিদি আমার, কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কোনো সূত্রে বুদ্ধি আমাকে চিনতে, নইলে অমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আসত না।

পদ্মপ। তোমার আঁচলওয়ালা নাকের খ্যাতি পাড়ার লোকের মূখে মূখে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক দূবার তৈরি হতে পারে না—ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

মাখন। এই নাকের জোরে একবার বেঁচে গিয়েছি, দিদি। মটরুগঞ্জ চুরি হল, সন্দেহ করে আমাকে ধরলে চোঁকিদার। দারোগা বুদ্ধিমান; সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্ সাহসে—নাক লুকোবে কোথায়। বুদ্ধি দিদি? আমার এ নাকটাতে ভাঁড়ামির ব্যাবসা চলে, চোরের ব্যাবসা একেবারে চলে না।

পদ্মপ। কিন্তু, তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার জুড়ি-অন্নপূর্ণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন। অনেক দিনের পেটের জ্বালায় ওদের ভাঁড়ারে চুরি পূর্বে থেকেই অভ্যাস আছে।

পদ্মপ। এত বড়ো কাঁদি নিয়ে করবে কী। হনুমানের পালার তালিম দেবে?

মাখন। সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলুম এক রক্তাচারী বসে আছেন পাকুড়তলায়। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেষ্টা করলুম—ঠোঁটের এক কোণও নড়াতে পারলুম না, মন্তর আউড়েই চলল। ভয় হল, বুদ্ধি রক্তদাত্য হবে। কিন্তু, মুখ দেখে বুদ্ধলুম উপোস করতে হতভাগা তিথিবিচার করছে না। ওর পাঁজিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাবাজি, খাবে কিছুর? কপালে চোখ তুলে বললে, গুরুদ্বর কৃপা যদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পুঁথি রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, ডাকের শব্দ ও-গাছের পাখি একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আসব কলার ছড়াটা।

পদ্মপ। লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

মাখন। নিশ্চয় নিশ্চয়। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে, আমার চেয়ে মজা।

পদ্মপ। ভালো হল। হনুমানের সঙ্গে অঙ্গদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি করে নিতে হবে। শেওড়াফুলের হাট উজাড় করে কলার কাঁদি আনিয়ে নেব।

মাখন। শুধু কলার কাঁদির কর্ম নয়।

পদ্মপ। তা নয় বটে। যে কারখানায় তুমি নিজে তৈরি সেখানকার দুই-চাকাওয়ালা যন্ত্রের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাখন। দয়াময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালো নয়।

পদ্মপ। ভয় নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেব না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এসো।

মাখন। আমাদের দেশে মেয়েরা থাকতে সম্ম্যাসী না খেয়ে মরে না। কিন্তু, ও লোকটা ভুল

করেছে—বৈরাগীর ব্যাবসা ওর নয়, ওর চেহারায় জলদুষ নেই। নিতান্ত নিজের স্ত্রী ছাড়া ওর খবরদারি করবার মানদুষ মিলবে না।

পদুম্প। তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কী করে।

মাখন। ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসি লুচি তেলে-ভাজা, যার খন্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিস্তি সেজেছি, জল খেতে দিয়েছেন অধিকারী মড়কি আর পচা কলা। সুবিধে পেলেই মা মাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাঁচালি শুনিয়ে দিয়েছি যখন পুরুষরা কাজে চলে গেছে—

ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন—

ওরে রে লক্ষ্মণ এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।

মা-জননীদের দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা ঝরেছে—দু-চার দিনের সপ্তয় নিয়ে এসেছি। আমাকে ভালোবাসে সবাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি দুটো বিয়ে না দিত তা হলে চাই কি আমার নিজের স্ত্রীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে বদ্বতে পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অলপেতেই মন গলে যায়। এই দেখো-না, এখন তোমাকে মা-অঞ্জনা বলতে ইচ্ছে করছে।

পদুম্প। সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বড় বেশি ভারী হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি, তোমার মনটা কী বলছে।

মাখন। তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেক দিন পরে এ পাড়ার কাছাকাছি আসতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গন্ধে। সেদিন আমাদের রান্নাঘরে পাঁঠা চড়েছিল—সত্যি বলি, বড়ো বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নায় ওর হাত ভালো। সেদিন বাতাস শূঁকে শূঁকে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর থেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হল। বার বার মনে পড়ছে, কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচর্চা। একদিন দিবি গেলোছিলুম, এ বাড়িতে কোনোদিন আর ঢুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি কাল।

পদুম্প। কিসে ভাঙলো।

মাখন। তালের বড়ার গন্ধে। দিনটা ছট্‌ফট্‌ করে কাটালুম। রাস্তিরে যখন সব নিশ্চুতি, বাইরে থেকে ছিট্‌কিনি খুলে ঢুকলুম ঘরে। খুঁট করে শব্দ হতেই আমার ছোটোটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মুখে মেখে এসেছিলুম কালি, আমি হাঁ করে দাঁত খিঁচিয়ে হাঁউমাউখাঁউ করে উঠতেই পতন ও মূর্ছা। বড়ো বউ একবার উঁকি মেরেই দিল দৌড়। আমি রয়ে বসে পেট ভরে আহার করে ধামাসুদ্ধ বড়া নিয়ে এলুম বোরিয়ে।

পদুম্প। কিছন্ন প্রসাদ রেখে এলে না পতিরতাদের জন্যে?

মাখন। অনেকখানি পায়ের ধুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগুলো নিয়ে এসেছি দলবলকে খাইয়ে দিতে।

পদুম্প। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে?

মাখন। দেখো মা, বিপদে না পড়লে আমি কখনো মিথ্যে কথা কই নে।

পদুম্প। লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরো একটা বিয়ে করেছ।

মাখন। তা করেছি।

পদুম্প। পিঠ স্ফুস্ফু করছিল?

মাখন। না মা, দুটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। ভারি ইচ্ছা হল, একটা বিয়ে কী রকম মরবার আগে জেনে নেব।

পদুম্প। জেনে নিয়েছ সেটা?

মাখন। বেশি দিন নয়। ভাগ্যবতী কিনা, পুণ্যফলে মারা গেল সকাল-সকাল স্বামী বর্তমানেই। ঘোমটা সবে খুলেছে মাত্র। কিন্তু ভালো করে মুখ ফোটবার তখনো সময় হয় নি। বেঁচে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।

পদুম্প। কার কপালে।

মাখন। শক্ত কথা।

চতুর্থ দৃশ্য

নিদ্রামগ্ন ফকির। মূখের কাছে একছড়া কলা।

জ্বেকে উঠে কলার ছড়া তুলে নেড়েচেড়ে দেখল

ফকির। আহা, গদ্রদেবের কৃপা। (ছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজে) শিবোহং শিবোহং শিবোহং। (একটা একটা করে গোটা দশেক খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে) আঃ!

মাখনের প্রবেশ

মাখন। কী দাদা, ভালো তো! আমার নাম শ্রীমাখনানন্দ।

ফকির। গদ্রদর চরণ ভরসা।

মাখন। গদ্রদই খুঁজে মরিছি। সদগদ্রদ মেলে না তো। দয়া হবে কি। নেবে কি অভাজনকে।

ফকির। ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন। (কাল্লার সদ্রের) সময় আমার হবে না প্রভু, হবে না। দিন যে গেল! বড়ো পাপী আমি। আমার কী গতি হবে।

ফকির। গদ্রদপদে মন স্থির করো—শিবোহং।

মাখন। এই পদেই ঠেকল আমার তরী; যম তা হলে ভয়ে কাছে ঘেঁষবে না।

ফকির। তোমার নিষ্ঠা দেখে বড়ো সন্তুষ্ট হলুম।

মাখন। শূদ্ধ নিষ্ঠা নয় গদ্রদ, এনেছি কিছু তালের বড়া। তালগাছটা শূদ্ধ উদ্ধার পাক।

ফকির। (ব্যগ্রভাবে আহা) আহা, শূদ্ভাদ বটে। ভক্তির দান কিনা।

মাখন। সার্থক হল আমার নিবেদন। বাড়ির এঁয়ারা খবর পেলে কী খুশিই হবেন! যাই, ঠুন্দের সংবাদ পাঠিয়ে দিই গে, ঠুন্ডা আরো কিছু হাতে নিয়ে আসবেন।—প্রভু, গৃহাশ্রমে আর কি ফিরবেন না।

ফকির। আর কেন। গদ্রদ বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন। গৃহী আমি, ডাইনে বাঁয়ে মায়া-মাকড়সানি জড়িয়েছে আপাদমস্তক। ধনদৌলতের সোনার কেজাটা কত বড়ো ফাঁকি সেটা খুব করেই বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি সেটা নিছক স্বপ্ন। ভগবান আমাকে অকিঞ্চন করে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো আমার দিনরাত্রির সাধনা, কিন্তু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাতালিয়ে দাও।

ফকির। আছে উপায়।

মাখন। (পা জড়িয়ে) বলে দাও, বলে দাও, বাণ্ডিত কোরো না।

ফকির। দিন-ভোর উপোস ক'রে থেকে—

মাখন। উপোস! সর্বনাশ! সেটা অভ্যেস নেই একেবারেই। আমার দুষ্ট গ্রহ দিনে চার বার করে আহা জুড়টিয়ে দিয়ে অন্তরটা একেবারে নিরেট করে দিয়েছেন। আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির। আচ্ছা, দুখানা রুটি—

মাখন। আরো একটু দয়া করেন যদি, দুবাটি ক্ষীর!

ফকির। ভালো, তাই হবে।

মাখন। আহা, কী করুণা প্রভুর! তেমন করে পা যদি চেপে থাকতে পারি তা হলে পাঁঠাটাও—

ফকির। না না, ওটা থাক্।

মাখন। আচ্ছা, তবে থাক্, একটা দিন বৈ তো নয়। তা, কী করতে হবে বলুন। দেখুন, আমি মদুখন্দ মানুষ, অনদ্ভার-বিসর্গওয়ালা মন্তর মদুখ দিয়ে বেরবে না, কী বলতে কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে।

ফকির। ভয় নেই, তোমার জন্যে সহজ করেই দিচ্ছি। গদ্রদর মূর্তি স্মরণ করে সারারাত জপ

করবে, সোনা তোমাকেই দিলুম, তোমাকেই দিলুম, যতক্ষণ না ধ্যানের মধ্যে দেখবে, সোনা আর নেই—কোথাও নেই।

মাখন। হবে হবে প্রভু, এই অধমেরও হবে। বলব, সোনা নেই, সোনা নেই; এ হাতে নেই, ও হাতে নেই; টাঁকে নেই, থলিতে নেই; ব্যাঙ্কে নেই, বাঙ্কায় নেই। ঠিক সুরে বাজবে মন্ত্র। আচ্ছা, গুরুদ্বিজ, ওর সঙ্গে একটা অনুস্বার জুড়ে দিলে হয় না? নইলে নিতান্ত বাংলার মতো শোনাচ্ছে। অনুস্বার দিলে জোর পাওয়া যায়—সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছুং নেই, কিছুং নেই। ফকির। মন্দ শোনাচ্ছে না।

মাখন। আচ্ছা, তবে অনুমতি হোক, পোলাওটা ঠান্ডা হয়ে এল!

[প্রস্থান]

ফকিরের গান

শোন্ রে শোন্ অবোধ মন—

শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি

সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

ভবের শ্রুতি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ

ওরে ও ভোলা মন!

ষষ্ঠীচরণ ছুটে এসে

ষষ্ঠী। দেখি দেখি, এই তো দাদু আমার—আমার মাখন। (মুখে হাত বুলিয়ে) অমন চাঁদ-মুখখানা দাড়িগোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে। একে ভগবান আমার চোখে পরিয়েছে বড়ো বয়সের ঠুলি, ভালো দেখতেই পাই নে, তার উপর এ কী কাণ্ড করেছিস মাখন!

ফকির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

ষষ্ঠী। করেছিস কী দাদু, মন্তর পড়ে পড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পড়িয়ে দিয়েছিস! সুর মোটা হয়ে গেছে!

ফকির। শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

বামনদাসবাবুর প্রবেশ

বামনদাস। আরে আরে, আমাদের মাখন নাকি? খাঁটি তো? ও ষষ্ঠীদা, মানতেই হবে যোগবল—নাকের উপর থেকে আঁচলটা একেবারে সাফ দিয়েছে উড়িয়ে। ভট্‌চাষ, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মন্তর দেগেছিল গো! একটু চিহ্ন রেখে যায় নি। ষষ্ঠীদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফুঁক করেছিলে, একটু টলাতে পার নি। তর্পিস্যের মাহাত্ম্য বটে—

ষষ্ঠী। না ভাই, মাহাত্ম্য ভালো লাগছে না। তোরা যাকে বলতিস গুডারী নাক, সে ছিল ভালো।

নিশিঠাকুর। ওর মুখমণ্ডল যে নিজেকে বেকবুল করছে, তার উপরে আবার মুখে কথা নেই। অমন সব বোলচাল, মূনি হয়ে সব ভুলেছে বুদ্ধি!

ভজহরি। দেখি দেখি মাখনা, মুখটা দেখি। (চিমটি কেটে, চামড়া টেনে) না হে, এ মুখোশ নয়, ধাঁদা লাগিয়ে দিলে।

নিতাই। কিন্ন, দেখ্ তো টেনে ওর দাড়িগোঁফ সত্যি কি না।

ফকির। উঃ উঃ!

চণ্ডী। (পিঠে কিল মেরে) কেমন লাগল।

ফকির। উঃ!

চণ্ডী। ঐ তো, সন্ন্যাসীর সুখদুঃখবোধ আছে তো! মাথায় হুকোর জল ঢালি তবে, মাথা ঠান্ডা হোক।

ষষ্ঠী। আহা, কেন ওকে বিরক্ত করছ ভাই। সাত বছর পরে ফিরে এল, সবাই মিলে আবার ওকে তাড়াবে দেখাছি। মাখন, ও ভাই মাখন, আর দুখখু দিস্ নে—একটা কথা ক, নাহয় দুটো গাল দিলিই বা!

ফকির। আপনারা আমাকে মাখন বলে ডাকছেন কেন। পূর্ব-আশ্রমে আমার যে নাম থাক্, আমার গুরুদত্ত নাম চিদানন্দ স্বামী।

সকলের উচ্চহাস্য

চিন্দু। ওরে বাবা, গ্রাণকর্তা এলেন আমাদের। দেখ্ মাখনা, ন্যাকামি করিস নে। ভাবছি, এমনি করে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি! সেটি হচ্ছে না; তোর দুই বউয়ের হাতে দুই কান জিন্মে করে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ফকির। গুরো, হায় গুরো!

দুই স্ত্রীর প্রবেশ

১। ঐ যে গো, মুখ চোখ বদলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।

ফকির। মা, আমি তোমাদের অধম সন্তান, দয়া করো আমাকে।

সকলে। এই এই, করলে কী! প্রাণের ভয়ে মা বলে ফেললে?

১। ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বলিস কাকে!

২। চোখের মাথা খেয়ে বসেছি, তোর মরণ হয় না!

ফকির। একটু ভালো করে আমাকে দেখে নিন।

১। তোমাকে দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কী খোকা নও, নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরাও ভুলব।

২। (নাক মূচ্ছড়িয়ে দিয়ে) সাক্ষীকে বিদায় করেছে নাকের ডগা থেকে। তাই বলে আমাদের ভোলাতে পারবে না—তোমার বিট্লেমি ঢের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ্ লো ছুট্‌কি—সেই তালের বড়ার ধামাটা।

১। তাই রাস্তারে গিয়েছিলেন ভূত সেজে বড়া খেতে!

২। চক্কোত্তমশায়, এই দেখে নাও—মিন্সে রান্নাঘরে ঢুকে এনেছে বড়াসুন্দর আমাদের ধামা চুরি করে।

সকলের হাস্য

কান্দু মণ্ডল। সে কি হয়। যোগবল, ভাঁড়ার থেকে উড়িয়ে এনেছে।

ষষ্ঠী। ওগো বউদিদিরা, কেন ওকে খোঁটা দিচ্ছ। ঘরের বড়া ঘরের মানুষই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে।

১। ভালোমানুষের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না—মা গো, সে কী দাঁতিখিঁচুনি। আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল।

ষষ্ঠী। ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি—গোপনে আমাকে জানালে না কেন। তালের বড়ার অভাব কী।

ফকির। গুরো!

২। (কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধরে) এই দেখো তোমরা। ভাঁড়ারে রেখেছিলুম ব্রাহ্মণ-ভোজন করাব বলে। সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে। দরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি। আমাদের এই মহাপুরুষের কীর্তি। কলা চুরি করে ধর্মকর্ম করেন!

ষষ্ঠীচরণ। (মহাক্রোধে) দেখো, এ আমি কিছড়তেই সহিব না। এই ডাইনি দুটোকে ঘর থেকে

বিদায় করতে হবে, নইলে আমার মাখনকে টেকেতে পারব না। দেখছ তো মাখন? কেবল ভালো-মানুষ করে দুই বউকে কী রকম করে বিগড়িয়ে দিয়েছে!

ফকির। সর্বনাশ! আপনারা সাংঘাতিক ভুল করছেন। আপনাদের সকলের পায়ে ধরি—আমাকে বাঁচান! হে গুরো, কী করলে তুমি।

ষষ্ঠী। না ভাই, বেকবুল যেয়ো না। ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিকেশ করেছ। সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি—তবে লজ্জা পাচ্ছ কেন।

ফকির। দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের—আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি।

ষষ্ঠী। পষ্টই দেখা যাচ্ছে খেয়েছ তুমি। কেন এত জিদ করছ।

ফকির। খেয়েছি, কিন্তু—

বামনদাস। আবার কিন্তু কিসের!

ফকির। আমি আনি নি।

সকলের হাস্য

পাঁচু। তুমি খাও তালের বড়া, দেয় এনে আর-এক মহাত্মা, এও তো মজা কম নয়। তাকে চেন না?

ফকির। আজ্ঞে না।

সিধু। সে চেনে না তোমাকে?

ফকির। আজ্ঞে না।

নকুল। এ যে আরব্য উপন্যাস।

সকলের হাস্য

ষষ্ঠী। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চলো।

ফকির। কার ঘরে যাব?

১। মরি মরি, ঘর চেন না পোড়ারমুখো! বালি, আমাদের দুটিকে চেন তো?

ফকির। সত্যি কথা বালি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে। ঐ লোকটার ভণ্ডামি তো সইবে না। জোর করে নিয়ে যাও ওকে ধরে, তালা বন্ধ করে রাখো।

ফকির। গুরো!

সকলে মিলে ঠেলাঠেলি। ওঠো, ওঠো বলছি।

সুধীর। বউ দুটোকে এড়াতে চাও তার মানে বুদ্ধি; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েগুলিকে? তোমার চারটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, তাও ভুলেছ নাকি।

ফকির। ও সর্বনাশ! আমাকে মেরে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না। (গাছের গুঁড়ি আঁকড়িয়ে ধরে) কিছুতেই না।

হরিশ উকিল। জান আমি কে? পূর্ব-আশ্রমে জানতে। অনেক সাধুকে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকিল। জান? তোমার দুই স্ত্রী!

ফকির। এখানে এসে প্রথম জানলুম।

হরিশ। আর, তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে।

ফকির। আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ। এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা হলে মকদ্দমা চলবে বলে রাখলুম।

ফকির। বাপ রে! মকদ্দমা! পায়ে ধরি, একটু রাস্তা ছাড়ুন।

দুই স্ত্রী। যাবে কোথায়, কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুর্যোরে?

ফকির। গুরো! (হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়ল)

হৈমবতীর প্রবেশ ও ফকিরকে প্রণাম

ফকির। (লাফিয়ে উঠে) এ কী, এ যে হৈমবতী! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

১। ওলো, ওর সেই কাশীর বউ, এখনো মরে নি বুদ্ধি!

মাখনকে নিয়ে পদুম্পর প্রবেশ

মাখন। ধরা দিলেম—বেওজর। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে সিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কল্‌সি। মা অঞ্জনা, কিষ্কিন্ধ্যায় তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ে। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাফ মারব।

পদুম্প। ফকিরদা, তোমার মর্দুস্তি কোথায় সে তো এখন বুদ্ধি?

ফকির। খুব বুদ্ধি—এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

পদুম্প। বাছা মাখন, তোমার মস্ত সর্দিবধে আছে—তোমার ফর্টি কেউ মারতে পারবে না। এ দুটিও নয়।

দুই স্ত্রী। ছি ছি, আর একটু হলে তো সর্বনাশ হয়েছিল! (গড় হয়ে প্রণাম করে) বাঁচালে এসে।

পরিশিষ্ট ১

গুরু

প্রকাশ : ১৯১৮

সহজে অভিনয়যোগ্য কৰিবার অভিপ্ৰায়ে অচলায়তন নাটকটি
'গদ্য' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তৰিত এবং লঘুতর আকারে
প্রকাশ করা হইল।

শান্তিনিকেতন
১লা ফাল্গুন
১৩২৪

শ্রীৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অচলায়তন

একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই শুনোছিস?

দ্বিতীয়। শুনোছি—কিন্তু চুপ কর।

তৃতীয়। কেন বল দেখি?

দ্বিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয়?

প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজেকে যে আমাকে বলেছেন।

তৃতীয়। কী বলেছেন বল-না।

প্রথম। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু আসছেন!

তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই?

দ্বিতীয়। ভয় করছে।

প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।

তৃতীয়। কিন্তু ভাই গুরু কী?

দ্বিতীয়। তা জানি নে।

তৃতীয়। কে জানে?

দ্বিতীয়। এখানে কেউ জানে না।

প্রথম। শুনোছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।

তৃতীয়। তা হলে এখানে কোথায় ধরবে?

প্রথম। পণ্ডকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।

তৃতীয়। কোথাও না?

প্রথম। কোথাও না।

তৃতীয়। তা হলে কী হবে?

প্রথম। ভাবি মজা হবে।

[প্রস্থান

পণ্ডকের প্রবেশ

পণ্ডক।

গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।

আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না।

ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।

সঞ্জীবের প্রবেশ

সঞ্জীব। তাই তো শুনোছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো।

পণ্ডক। কে দিলে তা তো কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছে না পণ্ডক?

পণ্ডক। বাঃ, সেইজন্যই তো পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।

সঞ্জীব। সেই বদ্বি তোমার তৈরি হওয়া?

পঞ্চক। আরে, গদরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গদরু যখন আসবেন তখন ঐ-সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত। সঞ্জীব। তাই তো দেখছি।

[প্রস্থান

পঞ্চক।

গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেছ? বোঝা ফেলো। গদরু আসছেন যে।
জয়োত্তম। আরে ছুঁয়ো না; এ-সব মাঙ্গল্য। গদরুর জন্যে সিংহদ্বার সাজাতে চলেছি।

পঞ্চক। গদরু কোন্ দ্বার দিয়ে ঢুকবেন তা জানবে কী করে?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।

পঞ্চক। তোমরাও জান না, আমিও জানি নে—তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মর,
আমি হালকা হয়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই।

[প্রস্থান

পঞ্চক।

গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চক। এবার দাদা, স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চক। আমি মহাপঞ্চক, গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোঝা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক। কেন বলো তো?

পঞ্চক। গদরু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে।

মহাপঞ্চক। গদরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্চক। তার জন্যে ভাবনা কী। নির্লজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব।

মহাপঞ্চক। মন্তরে ভুল হলে গদরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চক। অমিতায়ুর্ধারণী মন্ত্রটা—

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গদরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ঐ শব্দ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি, সময় নষ্ট করো না। গদরু আসছেন।

পঞ্চক।

গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না।

ও কী ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সন্ভদ্র। আমাদের এই অচলায়তনে ঐ বালকের চোখের জল আর শুকোলে না। ওর কান্না আমি সহিতে পারি নে।

প্রস্থান ও বালক স্ভদ্রকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল—কী হয়েছে বল।

স্ভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস! কী পাপ?

স্ভদ্র। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে?

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

স্ভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

স্ভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি?

স্ভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শূনে লোভ হচ্ছে যে।

স্ভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি।
কোন প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে; আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত—আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

বালকদের প্রবেশ

প্রথম। আঁ, স্ভদ্র! তুমি বড়ি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, স্ভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ! ভয় নেই স্ভদ্র, কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি।
প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, স্ভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, স্ভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তা হলে যে সে—

পঞ্চক। তা হলে কী?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক শুনাই-না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

স্ভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন বলি স্ভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে—কিন্তু যাই হোক-না,
আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

স্ভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই-না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বড়ি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন
আমি কাঁসার থালায় ইন্দুরের গর্তের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর
তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পণ্ডকদাদা, তোমার কী হল?

পণ্ডক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছে তুমি।

দ্বিতীয়। মহাময়দেবী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পণ্ডক। তার রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি!

সুভদ্র। কিন্তু পণ্ডকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত!

পণ্ডক। তা হলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না—ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়। না না, বলিস নে।

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না—কী ভয়ানক!

প্রথম। আচ্ছা, একটু—খুব একটুখানি বল ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর বোলো না সুভদ্র।

ঐ-যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল চল—আর না।

পণ্ডক। কেন? এখন তোমাদের কী?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পণ্ডক। তাতে কী?

দ্বিতীয়। আজ কার্কিনী সরোবরের নৈর্ধার্ত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পণ্ডক। কেন রে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পণ্ডকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পণ্ডক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

[সুভদ্র ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান]

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়!

পণ্ডক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনতে হবে, এখন বিরক্ত করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পণ্ডক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন? সুভদ্র, শুনো যাও।

পণ্ডক। আর রক্ষা নেই, সাপের এতটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটো।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বরষোছি, কনুই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সৈদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাণ্ড আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পণ্ডক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে, ভূমিকুস্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পণ্ডক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি।—কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞাপ্তি তো মানতেই হবে—
তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পণ্ডক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী! আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে?

পণ্ডক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুঁচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই। গদ্যর আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চক্ষু মদুহুতেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই আচার্যদেবকে জানাই গে।

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গদ্যর আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি—কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিরত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়!

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। সুতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো একমুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য। ঠিক, ঠিক—ঠিক বলেছ সূতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাৰ? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি!

উপাচার্য। আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে, কেবল একলা আমিই না, চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তম্ভতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চার পর্যাপ্ত। ঐ-যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল! ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভৎসনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভুতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান]

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক!

পঞ্চক। করলেন কী! আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে?

পঞ্চক। আমি যে আচার্য রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বৎস?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুঁশি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয়?

আচার্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস?

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচার্যের চেয়ে, নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যদুক জাতির সঙ্গে মেশ?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান?

আচার্য। না না থাক, বোলো না। কিন্তু যদুকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে—তুমি ভুল করো গে—আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য আসছেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

[প্রস্থান]

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্ভগ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ঠুরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্দিরপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি—সবাই ভুলেই গেছে। ঐ-যে মহাপণ্ডক আসছে—যদি কারো জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপণ্ডকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপণ্ডক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপণ্ডক। সেইজন্যই তো এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারো স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পার।

মহাপণ্ডক। ক্রিয়াকম্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্ত-কৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখেছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাত্মস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাত্মস?

মহাপণ্ডক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেন না, আলোকের দ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার স্ফালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপণ্ডক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুদর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে।

[সকলের গমনোদ্যম]

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপণ্ডক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই—সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপণ্ডক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এরকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি! এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাতে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পণ্ডকের প্রবেশ

পণ্ডক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মূখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এসো পণ্ডক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পণ্ডকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়?

[উপাচার্যের প্রস্থান

মহাপণ্ডক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সকলই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান?

মহাপণ্ডক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার গুঁর ঘটল! এ অবস্থায় গুঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এই সব অনাচার ঘটতে লাগল?

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

অধ্যাতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যাতা, ব্যাপার কী?

অধ্যাতা। সুভদ্রকে মহাত্মসে বসায় কার সাধ্য?

মহাপণ্ডক। কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে?

অধ্যাতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপণ্ডক। পণ্ডক?

অধ্যাতা। হাঁ। আমি ডাকতেই সুভদ্র ছুটে এল, কিন্তু পণ্ডক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপণ্ডক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যাতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যাতা। আমি কি তোমার পণ্ডককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনিনি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপণ্ডক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয়—আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপণ্ডক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপণ্ডক। কেমন করে আবার কী। মন্তু হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োন্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপণ্ডক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এ দিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য। গদ্য চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পদুথি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ পদুথির ভান্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গদ্য নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পণ্ডক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োন্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মৃষ্টির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য করো রে নৃত্য করো।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োন্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপণ্ডক। পণ্ডক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম বলাছি থাম!

পণ্ডক।

গান

ওরে আমার মন মেতেছে,
আমারে থামায় কে রে।

মহাপণ্ডক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন—ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পণ্ডক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ রে, ও ভাই, নাচ রে,—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে,—
লাজভয় ঘুচিয়ে দে রে;
তোরে আজ থামায় কে রে!

মহাপণ্ডক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরুর হয়েছে, বন্ধতে পারছ না। ওরে সব ছদ্মমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পণ্ডক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরুর হয় দাদা।

মহাপণ্ডক। চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন, সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, স্বেচ্ছাক্রমে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, স্বেচ্ছাক্রমে কতবড়ো ভাগ্য। মহাতমস ক-জন লোকে পারে। ও-যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যই সে দেবতাদের প্রিয়।

জ্যোত্স্নম। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণয়, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল, তাতেই বৃদ্ধিতে পারছি গুরুদর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। স্বেচ্ছাক্রমে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপণ্ডক। তা হলে আর শি্ষা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ঠুকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জ্যোত্স্নম। খবরদার—আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপণ্ডক, ঠুকে অপমান করলে আমরা সহ্যে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ঠুকে রাজি করাব। একা স্বেচ্ছাক্রমে প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

বিশ্বম্ভর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কী হয়েছে?

স্বেচ্ছাক্রমে প্রবেশ

স্বেচ্ছাক্রমে। আমাকে মহাতমস রত করাও।

পণ্ডক। সর্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলাম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস স্বেচ্ছাক্রমে, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার—আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর। না না, আয় রে আয় স্বেচ্ছাক্রমে, তুমি মানুষ না, তুমি দেবতা।

সঞ্জীব। তুমি ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতমস করা আর কারো ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা স্বেচ্ছাক্রমে, তুমি আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপণ্ডক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপদ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ঠুকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু

দেখাছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মর্নিষ্ট অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে! কখন সময় পেল সে? সে কি গভীর মধ্যেও কাজ করে?

পণ্ডক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে—লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপণ্ডক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য কোরো না—এসো পণ্ডক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পণ্ডকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান]

মহাপণ্ডক। ধিক্! তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকেও মারবে।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপণ্ডক। ব্যাপারখানা কী! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপণ্ডক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে, দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপণ্ডক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ঐ-যে য়ুনকরা।

মহাপণ্ডক। য়ুনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তা হলে যে সমস্ত লন্ডভন্ড করে দেবে!

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। চণ্ডক বলে একজন য়ুনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপণ্ডক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এ দিকে আমাদের অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

রাজা। সে কী কথা!

সঞ্জীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ?

মহাপণ্ডক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেইদিককার জানালা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপণ্ডক। আচার্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বম্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও!

মহাপণ্ডক। আগামী অবাস্য্য—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি—শাস্ত্র তার বিধান আছে।

মহাপণ্ডক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পাল-গণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারীগণ সাক্ষী।

মহাপণ্ডক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যুনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দৰ্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দৰ্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজজাতি—অশুচি পতিত!

মহাপণ্ডক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পণ্ডককে ক্ষমা করব। তারও সেই দৰ্ভকপাড়ায় গতি।

দূতের প্রবেশ

দূত। শুনলুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে?

দূত। চারি দিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তা হলে তো তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপণ্ডক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করাতে থাকো।

মহাপণ্ডক। জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান]

পণ্ডক কোথায়?

জয়োত্তম। শুনলুম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যুনকদের কাছে গেছে।

মহাপণ্ডক। পাষন্ড! আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারীগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসো।

২

পাহাড় মাঠ

পণ্ডকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—

তা কে জানে তা কে জানে।

কোন্‌ পাহাড়ের পারে, কোন্‌ সাগরের ধারে,

কোন্‌ দুরাশার দিকপানে—

তা কে জানে তা কে জানে।

এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে

তা কে জানে তা কে জানে।

কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,

যায় সে কাহার সন্ধানে

তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া য়নকদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস?

প্রথম য়নক। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দড়টোকে স্থির রাখতে পারি নে।

দ্বিতীয় য়নক। আয় ভাই, ওকে সুস্থ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।

তৃতীয় য়নক। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। য়নককে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম য়নক। সত্যি নাকি? তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছুর আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় য়নক। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো—একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ! তিনি তো য়নকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে—তাকে নিয়েই—

তৃতীয় য়নক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়? আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম য়নক। সেইজন্যেই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় য়নক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চন্ডক—তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে—তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় য়নক। কিন্তু য়নক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম য়নক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে—কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম য়নক। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।

মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যা।

রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,

বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।

সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,

মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।

ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,

অঘ্রানের সোনার রোদে পূর্ণিমার চন্দ্রে।

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস, সেও কোনোমতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস?

প্রথম য়নক। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেসারিডালেরও চাষ করিস বড়ি?

তৃতীয় য়নক। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পণ্ডক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম য়ুনক। কেন?

পণ্ডক। কেন কী রে? ওটা যে নিষেধ।

প্রথম য়ুনক। কেন নিষেধ?

পণ্ডক। শোনো একবার! নিষেধ, তার আবার কেন। সাথে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুদ্ধিস নে যে, কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় য়ুনক। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না।

পণ্ডক। খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় য়ুনক। কেন?

পণ্ডক। ফের কেন? তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্ণুম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বুদ্ধি?

দ্বিতীয় য়ুনক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পণ্ডক। আবার কেন? তোরা যে ঐ এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় য়ুনক। আর খেঁসারির ডাল?

পণ্ডক। একবার কোন্ য়ুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্-এক মস্ত বড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কী করতিস বল দেখি!

প্রথম য়ুনক। আমাদের কথা বল কেন? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পণ্ডক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস—তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম য়ুনক। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পণ্ডক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম য়ুনক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে?

পণ্ডক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম য়ুনক। তা তো হবে।

পণ্ডক। তবে আর কী—এই বুঝে নে-না।

দ্বিতীয় য়ুনক। তবে একটা তো কারণ আছে।

পণ্ডক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পৃথিবীর মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি?

দ্বিতীয় য়ুনক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র?

পণ্ডক। এই মনে কর, যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র—তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় য়ুনক। ওর মানে কী?

পণ্ডক। আবার! মানে! তোর আশ্পর্শ তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম য়ুনক। না।

পণ্ডক। মরীচী?

প্রথম য়ুনক। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম য়ুনক। না।

পঞ্চক। উষীষবিজয়?

প্রথম য়ুনক। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী?

তৃতীয় য়ুনক। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় য়ুনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তা হলে তোদের বুককে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

য়ুনকগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই।

বাধাবাধন নেই গো নেই।

দেখি, খুঁজি, বুঝি,

কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,

মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।

পারি, নাই বা পারি,

না হয় জিতি কিংবা হারি,

যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।

আপন হাতের জোরে

আমরা তুলি সৃজন করে,

আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে—আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুস্থ এরা টানবে দেখছি। কোন্‌দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব—কিন্তু খেসারির ডাল—না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখাছিস না, পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

আর-একদল য়ুনকের প্রবেশ

প্রথম য়ুনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় য়ুনক। এখন রাখো তোমার পুঁথি, রাখো—দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম য়ুনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী রে?

দ্বিতীয় য়ুনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী চাই রে?

তৃতীয় য়নক। কিছ্‌র চাই নে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম য়নক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের? উনি আমাদের সব দলের শতদল পশ্ম।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ঠুকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম য়নক। নিয়ে যাও-না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুস্থ নাচতে আরম্ভ করবে, পৃথিবীগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কবে পৃথিবী চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

একদল য়নকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত বাস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম য়নক। চন্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় য়নক। স্থাবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় য়নক। স্থাবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চন্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করেছিল। ওদের রাজা মন্তরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় য়নক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাঁচ পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থাবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ য়নক। আমাদের দেশ থেকে দশজন য়নক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম য়নক। কোথায়?

দাদাঠাকুর। স্থাবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় য়নক। এখনই?

দাদাঠাকুর। হাঁ, এখনই।

সকলে। ওরে, চল রে চল!

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যদুনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?

প্রথম যদুনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গদ্য আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

[প্রস্থান]

৩

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তাদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্য ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারো ছোঁয়া মানে না, সবই পবিষ্ট করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল্ তো। ষড়ঙ্করিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ! বলিস কী? এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তা হলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল? তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল্ তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনবে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই, এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি—তোরা আমাকেও হাসাবি—শুনবেও মন খুঁশি হয়। কিছু ভাবিস নে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই, আয় তবে—গান ধর।

গান

ও অকালের কাল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধা সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ দ্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধূলো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনিবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব—সে কি হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান]

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ঐ, পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর-কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বৃকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে—আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে, সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের? আজ তো গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে, খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনোছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল, চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলাম, স্বপ্ন বন্ধি।

আচার্য। তবে কি গদ্য আসেন নি?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গদ্যরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন। আটক নেই। রাগে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো ষমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনোছি, কে বলছিল গদ্যও এসেছেন।

আচার্য। গদ্যও এসেছেন! সে কী রকম হল?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বলো তো।

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শুনি, ঠিক বলছিস তো রে?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিয়ে দিই, এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয়-না ভাই, আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ, লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে?

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গদ্য আসছেন।

আচার্য। বলিস কী? গদ্য? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গদ্য এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও—আমরা তফাতে সরে যাই।

আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গদ্য নয়—সে এ পাড়ায় আসবে কেন? এ-যে আমাদের গোঁসাই।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই! এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই, সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গদ্যজির জয়!

পঞ্চক। এ কি! এ যে দাদাঠাকুর! গদ্য কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শূদ্ধ মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর-কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারো যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক। ঐ তো আমাদের গোঁসাই—পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল্ ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান]

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বৃদ্ধি—আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মন্ত্রি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চার দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সূক্ষ্ম বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলাছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়াছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারিছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তার বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ!—কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না।

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু।

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তা হলে আমার দূতই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ, এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মূখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছাঁড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে।

[প্রস্থান]

৪

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োস্তুম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই-যে খবর এল, শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছে?

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োস্তুম। আজই তো আমাদের গদ্যর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ ভাইবোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জন্মটিয়ে আনতে পারলে না—দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গদ্যর এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁক বাজায় সেই বৃন্দ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ঐ যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গদ্যর আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কত দূর?

উপাধ্যায়। কত দূর কী? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী? দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শূন্য দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শূন্যে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর-কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। ঐ দেখছ না আলো।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ-যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো। এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

বিশ্বম্ভর। আমি তো তখনই বলেছিলুম, এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকাল-পঞ্চদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কী?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছে। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শুনছ—ঐ শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

বালকদের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুননি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনিনি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটেতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্ক্টিধোঁতির দরকার নেই?

মহাপণ্ডক। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছই বদ্বাতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি।

[বালকদের প্রস্থান]

জয়োত্তম। দেখো মহাপণ্ডকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপণ্ডক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গদ্য আসছেন।

সকলে। গদ্য!

মহাপণ্ডক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। মহাপণ্ডক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপণ্ডকের।

ষোড়শবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গদ্যজির জয়!

সকলে স্তম্ভিত

মহাপণ্ডক। উপাধ্যায়, এই কি গদ্য?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপণ্ডক। তুমি কি আমাদের গদ্য?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গদ্য।

মহাপণ্ডক। তুমি গদ্য? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গদ্য।

মহাপণ্ডক। তুমি গদ্য? তবে এই শব্দবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গদ্যর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গদ্যর অভ্যর্থনা।

মহাপণ্ডক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গদ্যর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপণ্ডক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব?

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপণ্ডক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না—আমি যে তোমার গুরু।

মহাপণ্ডক। উপাধ্যায়, তোমরা একে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বৈকি— তা নইলে যে—

মহাপণ্ডক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপণ্ডক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপণ্ডক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী—এরা য়ুনক।

সকলে। য়ুনক!

মহাপণ্ডক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপণ্ডক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপণ্ডক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম য়ুনক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্য সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছে ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপণ্ডক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম য়ুনক। এ পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপণ্ডক। কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম য়ুনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় য়ুনক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছোয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গদ্য হয়ে সুখ কিসের?

সকলে। কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত! এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ঐ আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়ন্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপণ্ডকদাদা, তুমিও এসো-না।

মহাপণ্ডক। না, আমি না।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গদ্য!

দাদাঠাকুর। কী বাবা।

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা দু'লিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো—তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব?

পণ্ডক। এখন তুমি আছ ভাই, আর আমি আছি। দু'জনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

যুনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।

তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খঞ্জ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সূকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।

তোমারি হউক জয়।

এসো দ্বঃসহ, এসো নিদয়,
তোমারি হউক জয়।

এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।

প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্ধসাজে,
দ্বঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবাহি জ্বালাও চিত্তমাবো

মৃত্যুর হোক লয়।

তোমারি হউক জয়।

ଅରୂପରତନ

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୨୦

‘অরুপরতন’ ‘রাজা’ নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

‘শাপমোচন’ কথিকাটি একই আখ্যানের আভাসে রচিত; অরুপরতন-এর ‘পরিশিষ্ট’রূপে মন্দিত।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ‘শাপমোচন’ মণ্ডস্থ হবার অনতিপূর্বে নাটিকাটির জন্য বিশেষভাবে যে কয়টি গান রচিত হয় সেগুলিও ‘সংযোজন’রূপে মন্দিত হল।

ভূমিকা

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, ভাঙারে সণ্ডয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমালা পাঠাইয়াছিল। বৃন্দ্রিধর অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বৃন্দ্রিধর জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুবর্ণমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নতুন করিয়া পুনর্লিখিত।

মাঘ ১৩২৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনর্লিখিত : কার্তিক ১৩৪২

প্রস্তাবনা

গান

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো।
দেখবে বলে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো।
আমায় তোরা ডাকিস না রে,
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব
অকূল সুধা-সাগর তলে গো।

প্রাসাদকুঞ্জ

সুদৃগমা। প্রভু, একটা কথা আছে।

নেপথ্যে। কী বলো।

সুদৃগমা। রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবে না?

নেপথ্যে। সে কি আমাকে চেনে?

সুদৃগমা। না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিবে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথ্যে। অনেক বাধা আছে।

সুদৃগমা। তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

নেপথ্যে। বহু দূঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সুদৃগমা। সেই দূঃখই তাকে দিয়ে, তাকে দিয়ে।

নেপথ্যে। আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।

সুদৃগমা। এই সুযোগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নীচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এসো তাকে।

নেপথ্যে। সুদর্শনাকে বলো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

সুদৃগমা। বাঁশি বাজবে না? আলো জ্বলবে না? সমারোহ হবে না?

নেপথ্যে। না।

সুদৃগমা। বরণডালায় সে কি ফুলের মালা তোমাকে দেবে না?

নেপথ্যে। সে ফুল এখনো ফোটে নি।

সুদৃগমা। সেই ভালো মহারাজ। অন্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হলে আপনিই আসে আলোয়।

বাহির হতে আহবান।—‘সুদৃগমা’!

সুদৃগমা। ঐ আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশির-ধোয়া সকালবেলার স্পর্শ। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

সুদৃগমা। সুদ ছিটিয়েছি।

সুদর্শনা। আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সুদৃগমা, আমি শুনিনি।

সুদৃগমা। মৃত্যুর কথায় বলে উঠতে পারি নে।

সুদর্শনা। বলো, তিনি কি খুব সুন্দর?

সুদৃগমা। সুন্দর? এক দিন সুন্দরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল যেদিন, বৃক ফেটে গেল, সেইদিন বৃকলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ংকর বলে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ংকর বলে আনন্দ করি—তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দূঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি—তুমি আনন্দ।

গান

আমি যখন ছিলাম অন্ধ,
 স্নেহের খেলায় বেলা গেছে, পাই নি তো আনন্দ।
 খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে
 খেলায় নিয়ে ছিলাম মেতে,
 ভিত ভেঙে যেই আসলে ঘরে
 ঘুচল আমার বন্ধ,
 স্নেহের খেলা আর রোচে না
 পেয়েছি আনন্দ।
 ভীষণ আমার, রুদ্ধ আমার,
 নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার,
 উগ্র ব্যথায় নতুন করে
 বাঁধলে আমার হৃদ।
 যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
 সব-কিছু মোর নিলে এসে,
 সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব,
 দুঃখ স্নেহের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ।

সুদর্শনা। প্রথমটা তুমি তাঁকে চিনতে পার নি?

সুরঙ্গমা। না।

সুদর্শনা। কিন্তু দেখো, তাঁকে চিনতে আমার একটুও দেরি হবে না। আমার কাছে তিনি সুন্দর হয়ে দেখা দেবেন।

সুরঙ্গমা। তার আগে একটা কথা তোমাকে মনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। নেব, আমার কিছুতে দ্বিধা নেই।

সুরঙ্গমা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

সুদর্শনা। চিরদিন?

সুরঙ্গমা। সে কথা বলতে পারি নে।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি সবই মনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

সুরঙ্গমা। জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

সুদর্শনা। আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে কথা কাউকে জানাতে পারব না?

সুরঙ্গমা। জানাতে পার কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।

সুদর্শনা। এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে না, সে কি হয়?

সুরঙ্গমা। লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবে না যে।

সুদর্শনা। পারবই, নিশ্চয় পারব।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, চেষ্টা দেখো।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন—এ তিনি এড়াতে পারবেন না।

সুরঙ্গমা। সে কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাঁকে সম্পূর্ণ করে নিয়ো, তা হলেই সব সহজ হবে।

সুদর্শনা। ও কথা কেন বলছ? আমি তো সেইজন্যই প্রস্তুত হয়ে রইছি। আর কিন্তু বিলম্ব কোরো না।

সুদৰ্শনা। তাঁর দিকে সমস্তই প্রস্তুত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হই।

সুদৰ্শনা। কোথায় যাচ্ছ?

সুদৰ্শনা। বসন্ত-উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

সুদৰ্শনা। কী রকমের আয়োজনটা হওয়া চাই।

সুদৰ্শনা। মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমার বনেও মৃকুল আপনি ধরে। আমাদের মানবের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হতে চায় না। কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চলবে না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

সুদৰ্শনা। আমি সেদিন কী দেব সুদৰ্শনা।

সুদৰ্শনা। সে কথা তুমিই বলতে পার।

সুদৰ্শনা। আমি নিজ হাতে মালা গাংথে সুন্দরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

সুদৰ্শনা। সে-ই ভালো।

সুদৰ্শনা। তাঁকে দেখব কী করে?

সুদৰ্শনা। সে তিনিই জানেন।

সুদৰ্শনা। আমাকে কোথায় যেতে হবে?

সুদৰ্শনা। কোথাও না, এইখানেই।

সুদৰ্শনা। কী বল সুদৰ্শনা, অন্ধকারের সভা এখানেই? যেখানে চিরদিন আছি এইখানেই? সাজতে হবে না?

সুদৰ্শনা। নাইবা সাজলে। একদিন তিনিই সাজাবেন যে সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে
আঁচল রঙিন হবে।
তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটায় পূজার কুসুমগূলি,
সেই ধূলি হায় কখন আমায়
আপন করি লবে?
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধুলার কাঙাল যাত্রীদলে
চলে যারা, আপন ব'লে
চিনবে আমায় সবে।

সুদৰ্শনা। আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না।

সুদৰ্শনা। কোরো না দেরি—তাঁকে ডাকো, এইখানেই দয়া করবেন।

সুদৰ্শনা। সুদৰ্শনা, আমি তো মনে করি যে ডাকছি, সাড়া পাই নে। বোধ হয় ডাকতে জানি নে। তুমি আমার হয়ে ডাকো-না—তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

সুদৰ্শনার গান

খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে।

কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে।
ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি
সেজেছি তো শূচি দুকূলে,
বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল,
গেঁথেছি তো মালা মুকূলে।
ধেনু এল গোষ্ঠে ফিরে
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
অধারে গিয়েছে হারায়ে।

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

সুদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি কি এর মধ্যে আছ?
নেপথ্যে। এই তো আমি আছি।

সুদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই?

নেপথ্যে। চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে—অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

সুদর্শনা। ভয়ে যে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে।

নেপথ্যে। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না।

সুদর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। হাঁ, পাচ্ছি।

সুদর্শনা। কী রকম দেখছ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোক-লোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহুপূরাতনের নূতন রূপ।

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি করে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্মজন্মান্তর থেকে শুন্যে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন করে? না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব—সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপথ্যে। আচ্ছা দেখো। তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।

—সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা। কী প্রভু।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসব তো এল।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে?

নেপথ্যে। আজ তোমার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। পুষ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ে প্রাণের আনন্দ।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

নেপথ্যে। সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

নেপথ্যে। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পদ্যপকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি, সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুদর্শমা। চোখে ধাঁধা লাগবে না?

নেপথ্যে। সুদর্শনার কোঁতহুল হয়েছে।

সুদর্শমা। কোঁতহুলের জিনিস তো পথে ঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কোঁতহুলের অতীত।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, যায় রে যায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেন্দ্রে, পরবে ফাঁসি,
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা-হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে, সুখের হাসে, আকুল গানে
চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে;
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বৃষ্টি পাগল প্রায়,
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

[উভয়ের প্রস্থান

২

উৎসবক্ষেত্র

বিদেশী পথিকদল ও প্রহরীর প্রবেশ

বিরাজদত্ত। ওগো মশায়।

প্রহরী। কেন গো?

ভদ্রসেন। রাস্তা কোথায়? এখানে রাজাও দেখি নে, রাস্তাও দেখি নে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

মাধব। ঐ যে শূন্যে আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সামনে চলে যাও।

বিরাজদত্ত। শোনো একবার, কথা শোনো। বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এত-
গুলোর দরকার ছিল কী?

মাধব। তা ভাই রাগ করিস কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই
বলেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না থাকাই
ভালো—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না,
আসতেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য
উজাড় হয়ে যেত।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, তোমার ঐ-একটা বড়ো দোষ।

মাধব। কী দোষ দেখলে?

বিরাজদত্ত। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বৃষ্টি ভালো হল? বলো তো ভাই ভদ্রসেন, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

ভদ্রসেন। ভাই বিরাজদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ মাধবের ঐ একরকম ত্যাগী বৃষ্টি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তা হলে ম'লে ওকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

বিরাজদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই—রাম রাম!

ভদ্রসেন। সেও তো ঐ মাধবের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুরুশ্রুতিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান—কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গাণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—এক দিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ঐ উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়—সে এক বিষম মূর্শকিল—শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ঐ চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবে তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছে!

বিরাজদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে এ কি কম কথা।

ভদ্রসেন। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু মাধব বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো।

[সকলের প্রস্থান]

সদলে ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। ওরে দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

মেয়ের দলের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উৎসবটা হচ্ছে কোথায়?

ঠাকুরদাদা। যেদিকে চাইবে সেইদিকেই।

প্রথমা। একেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব!

ঠাকুরদাদা। আমরা তো তাই বলি।

দ্বিতীয়া। আমাদের দেশের সব চেয়ে খুদে সামন্তরাজও এর চেয়ে ঘটা করে পথে বেরোয়।

ঠাকুরদাদা। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বণ্ডিত।

তৃতীয়া। আর তোমরা যে কোন্ না-দেখা রাজার কথা বলছ?

ঠাকুরদাদা। তাঁকে না চিনতে পারলে আমরাই বণ্ডিত।

প্রথমা। চেনবার উপায়টা কী করেছে?

ঠাকুরদাদা। তাঁর সঙ্গে সদর মেলাচ্ছি। এই যে দখিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান সদরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।

দ্বিতীয়া। তোমাদের কর্তারা ঢাকঢোলের বায়না দেন নি বৃষ্টি? তোমাদের উপরেই সব বরষাত?

ঠাকুরদাদা। তা নয় তো কী? ভাড়া করে সমারোহ? তোমরা আমরা আছি কী করতে? ওরে তোরা ধর-না ভাই গান।

গান

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজারে ব্যাকুল বেগু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জ—
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমাল্যকাকুঞ্জ—
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

[মেয়েদের প্রস্থান]

পূর্ব দুয়ারটা হল। এবার চলো পশ্চিম দুয়ারটার দিকে।

দেশী পথিকদের প্রবেশ

কোঁণ্ডল্য। ঠাকুরদা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ যে?
ঠাকুরদাদা। নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছি।
জনাব। সেটা কি তোমাকে শোভা পায়?
ঠাকুরদাদা। ওরে পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

কোঁণ্ডল্য। ডাক দিয়েছ সে তো দেখতে পাচ্ছি, পাড়া অস্থির করে তুলেছ। কিন্তু এর
দরকার ছিল কি।

ঠাকুরদাদা। আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি—বুড়োটা ঢাকা পড়ে
গেল।

তাই তো আমার এই জীবনের বনছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,

নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে।

কৌণ্ডল্য। তা তুমি নতুন হয়েই রইলে সে কথা সত্যি, বড়ো হবার সময় পেলো না।
ঠাকুরদাদা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাই নে।

ওগো আমার নিত্য নতুন, দাঁড়াও হেসে
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাল,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে।

কৌণ্ডল্য। রাখো দাদা, তোমার গান রাখো। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদাদা। কী বলো দেখি।

কৌণ্ডল্য। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন—কাউকে জবাব দিতে পারি নে। এখানে ঐটে বড়ো একটা ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদাদা। ফাঁকা! আমাদের এই দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বপ্নে।
আমরা যা খুঁশি তাই করি
তবু তাঁর খুঁশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
দাসের দাসত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বপ্নে।
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ
কোনো অসত্যে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বপ্নে।
আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার
বিষম আবর্তে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বপ্নে।

কুম্ভ। কিন্তু দাদা, যা বল, তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুঁশি বলে, সেইটে অসহ্য হয়।

জনাদর্শন। এই দেখো-না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মূখ বন্ধ করবার নেই।

ঠাকুরদাদা। ওর মানে আছে; প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু মিথিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাকে ছাড়িয়ে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুটুকু দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।

[সকলের প্রস্থান]

বিদেশীদলের পুনঃপ্রবেশ

বিরাজদত্ত। দেখো ভাই ভদ্রসেন, আসল কথাটা হচ্ছে, এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

ভদ্রসেন। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুন্দর লোকের আত্মপূরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খুঁজেও মেলে না! কিছু না হোক, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার যদি চোখ পার্কিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তা হলেও বুদ্ধি রাজার মতো রাজা আছে বটে!

মাধব। কিন্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

বিরাজদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার! নিয়মই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার আর দরকার কী?

মাধব। এই দেখো-না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে—রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না—কিন্তু, রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায়, সেইটে বলো।

মাধব। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

ভদ্রসেন। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা! তুমি বিরাজদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও-না হে—হাঁ কি না? রাজাকে দেখেছ কি দেখ নি?

বিরাজদত্ত। রেখে দাও ভাই ভদ্রসেন, ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এদেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অঙ্গে কিছুদিন ওকে আহ্বার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

[সকলের প্রস্থান]

বাউলের প্রবেশ

গান

আমার	প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
	তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে	নয়নতারায় আলোকধারায়,
	তাই না হারায়,
ওগো	তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
	তাকাই আমি যেদিক পানে।

আমি তার মূখের কথা
 শুনব বলে গেলাম কোথা,
 শোনা হল না, হল না.
 আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
 এই যে শূনি,
 শূনি তাহার বাণী আপন গানে।
 কে তোরা খুঁজিস তারে
 কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
 দেখা মেলে না, মেলে না—
 ও তোরা আয় রে ধৈয়ে, দেখ রে চেয়ে
 আমার বৃকে—
 ওরে দেখ রে আমার দুই নয়ানে।

। প্রস্থান

একদল পদাতিক ও দেশী পথিকের প্রবেশ

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।
 কোন্ডিল্য। ইস, তাই তো। মস্ত লোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব
 কেন? আমরা সব পথের কুকুর নাকি?
 দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।
 জনার্দন। রাজা? কোথাকার রাজা?
 প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।
 কুম্ভ। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের এই অবাক দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে
 হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?
 দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।
 জনার্দন। সত্যি না কি ভাই?
 দ্বিতীয় পদাতিক। ঐ দেখো-না নিশেন উড়ছে।
 কোন্ডিল্য। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।
 দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে, দেখছ না?
 কুম্ভ। ওরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি—একেবারে টকটক করছে।
 প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!
 জনার্দন। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি
 একটি কথাও বলি নি।
 প্রথম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।
 দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?
 কোন্ডিল্য। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়শ্বর—অন্য পাড়ায়
 বাড়ি—
 দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বরে
 খাচার।

কুম্ভ। অনেক দূরে বুদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল,
 নামের গোড়ায় তিনশ পয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘুরে বেড়াল—আমি
 তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো
 হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মূলুক চায়

সে তখন পাঁজিপাখি খুলে শূভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশেষা গ্র্যাম্পর্শ কিছুই তো বাধত না।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি নাকে খত দিচ্ছি—যতদূর সরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াব।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

[পদাতিকদের প্রস্থান]

জনাদর্শন। কুম্ভ, তোমার ঐ মূখের দোষেই তুমি মরবে।

কুম্ভ। না ভাই জনাদর্শন, ও মূখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি—অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছে—আর এবার হয়তো-বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মূখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

জনাদর্শন। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক, মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব। অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় করে যাই—সত্যি হলে লাভ, মিথ্যে হলেই-বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না; দামি জিনিস—বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

কোঁণ্ডল্য। ঐ যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতন রাজা বটে। কী চেহারা! যেন ননীরা পুতুল! কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে?

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো—কী জানি ভাই, হতে পারে।

কোঁণ্ডল্য। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয়, পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

জনাদর্শন। দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি।

[সকলের প্রস্থান]

বিদেশী পথিকদলের প্রবেশ

মাধব। ওরে, রাজা রে রাজা! দেখাবি আয়!

বিরাজদত্ত। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারো কথায় কান দিই নি—আমি সন্দের আগে তোমাকে মেনেছি।

ভদ্রসেন। শোনো একবার, আমি যে ভের থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনো কাক ডাকে নি—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন, ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

[রাজবেশীর প্রস্থান]

দেশী পথিকদের প্রবেশ

কোঁণ্ডল্য। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়বে না।

বিরাজদত্ত। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

কোন্ডল্য। তাই তো হে, লোকটার আশ্পর্শ তো কম নয়।

মাধব। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগিয়া।

কোন্ডল্য। ওহে, রাজা কি আর এটুকু বঝবে না? এ যে অতিভক্তি।

বিরাজদত্ত। না হে না—রাজাদের যদি মগজই থাকবে তা হলে মনুকুট থাকবার দরকার কী? ঐ তালপাথার হাওয়া খেয়েই ভুলবে।

[সকলের প্রস্থান]

ঠাকুরদাদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদাদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদাদা। সেইজন্যে তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়।

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কী।

ঠাকুরদাদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জি বরাবরই ঠিক আছে—ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা—একেবারে ননীর পদতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদাদা। তোর এমন বৃন্দ্বি কবে হল? আমার রাজা ননীর পদতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি।

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর—আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদাদা। আমার রাজা তোদের চোখেই পড়ত না।

কুম্ভ। ধরজা দেখতে পেলুম যে গো। লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বোরিয়েছে।

ঠাকুরদাদা। বোরিয়েছে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদি নেই।

কুম্ভ। কেউ বৃদ্ধি ধরতেই পারে না?

ঠাকুরদাদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদাদা। সে কিছুর চায় না। ভিক্ষুর কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে।

[সকলের প্রস্থান]

রাজা বিজয়বর্মা, বিক্রমবাহু ও বসুসেনের প্রবেশ

বসুসেন। এই উৎসবের রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই?

বিজয়। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

বিজয়। এই-সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

বিক্রম। কিন্তু কান্তিকরাজকন্যা সুদর্শনা তো দৃষ্টিগোচর।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার উৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

বিক্রম। একটা ফন্দি দেখাই যাক-না।

বসুদেব। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আসছে? সঙ না কি? রাজা সেজেছে?

বিজয়। এ তামাশা এখানকার রাজা সহিতে পারে কিন্তু আমরা সহিব না তো।

বসুদেব। কোথাকার গ্রাম্যরাজা হতেও পারে।

পদাতিগণের প্রবেশ

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[পদাতিগণের প্রস্থান

বিজয়। এ কী কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছেন!

বসুদেব। তাই তো। তা হলে একেই দেখে ফিরতে হবে! অন্য দর্শনীয়টা?

বিক্রম। শোনো কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ-না যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

বসুদেব। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশী সূর্যবর্গের প্রবেশ

সূর্যবর্গ। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

বিক্রম। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সূর্যবর্গ। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এইজন্যই একবার দেখা দিতে এলুম।

বিক্রম। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

সূর্যবর্গ। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

বিক্রম। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

সূর্যবর্গ। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

বিক্রম। আছে বৈকি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

সূর্যবর্গ। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও—(রাজগণের প্রতি) এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

বিক্রম। অসংকোচেই জানাব—তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

সূর্যবর্গ। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

বিক্রম। এসো তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

সূর্যবর্গ। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজাশিবিরে কিছু মত্তহস্তেই বিতরণ করেছে।

বিক্রম। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেইজন্যই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

সূর্যবর্গ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত। সেনাপতি!

সূর্যবর্গ। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণাম্য। মাথা আপনি নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে

চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে অনুমতি দেন তা হলে বিলম্ব করব না।

বিক্রম। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছুর আছে?

সুবর্ণ। আছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না, তখন সবাই সন্দেহ করছিল—লোক যত বেড়ে গেল, সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মূগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমারও একটা কাজ করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

বিক্রম। আর-কিছুর চাই নে, রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখতে চাই—সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। যথাসাধ্য চেষ্টার চেষ্টা হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমত চলতে হবে। আমার পরামর্শ শোনো, ভুল কোরো না।

সুবর্ণ। ভুল হবে না।

বিক্রম। করভোদ্যানের মধ্যেই রাজকুমারী সুদর্শনার প্রাসাদ।

সুবর্ণ। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। সেই উদ্যানে আগুন লাগাবে। তার পর অগ্নিদাহের গোলমালে কাজ সিদ্ধ করব।

সুবর্ণ। অন্যথা হবে না।

বিক্রম। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিথ্যা সাবধান হচ্ছি, এদেশে রাজা নেই।

সুবর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দূর করতে বেরিয়েছি, সাধারণের জন্যে সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটা রাজা খাড়া করা চাই; নইলে অনিষ্ট ঘটে। একটা কথা বুদ্ধিতে পারছি নে মহারাজ।

বিক্রম। আমার অনেক কথাই তুমি বুদ্ধিতে পারবে না। তবু বলো শূনি।

সুবর্ণ। রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন-না।

বিক্রম। সে তো সকলেই করে থাকে। আমি তো সকলের দলে নই। আগুন করবে আমার ঘটকালি, আমি বিপদ ঘটিয়ে বিপদের পারে যাব।

সুবর্ণ। আপনি তো পারে যাবেন মহারাজ, আমি সামান্য লোক, পার পর্যন্ত না পৌঁছোতেও পারি।

বিক্রম। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। সামান্য লোক, কাজে লাগবে এই যথেষ্ট, তার পরে থাকবে কি না-থাকবে সেটা ভাববার কথাই নয়।—চলো আর বিলম্ব কোরো না।

বিজয়। দেখো দেখো, সেই লোকটা আবার একদল লোক নিয়ে আসছে।

বসুদেব। ও যেন উৎসবের খেয়া পার করেছে; নতুন নতুন দলকে দ্বারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে।

সদলে ঠাকুরদাদার প্রবেশ

বিজয়। কী হে, তুমি যে কখন কোথা দিয়ে ঘুরে আসছ, তার ঠিকানা পাবার জো নেই।

ঠাকুরদাদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার জো কী? শিঙা যে বেজে উঠছে।

নৃত্য ও গীত

মম চিস্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙে কী মৃদঙে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মৃন্সি নাচে বন্ধ,
সে তরঙে ছুটি রঙে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

[প্রস্থান

বসুসেন। লোকটার মধ্যে কিছুর কোঁতুক আছে।

বিক্রম। কিন্তু এ-সব লোকের কোঁতুকে যোগ দেওয়া কিছুর নয়—প্রশ্ন দেওয়া হয়—চলো
সরে যাই।

[রাজাদের প্রস্থান

৩

কুঞ্জ-বাতায়ন

সুরঙ্গমার গান

বাহিরে ভুল হানবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি?
বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি?
রৌদ্রদাহ হলে সারা
নামবে কি ওর বর্ষাধারা
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি?
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি ব্যথার টানে?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মানবে কি?

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। সুদুঃখমা, ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার কখনোই ভুল হতে পারে না—
আমি হব রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।

সুদুঃখমা। কাকে তুমি রাজা বলছ?

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে।

সুদুঃখমা। ঐ যার পতাকায় কিংশুক আঁকা?

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আসছে।

সুদুঃখমা। ও তোমার রাজা নয়। আমি যে ওকে চিনি।

সুদর্শনা। ও কে?

সুদুঃখমা। ও সুবর্ণ। ও জুয়ো খেলে বেড়ায়।

সুদর্শনা। মিথ্যে কথা বলিস নে। সবাই ওকে রাজা বলছে। তুই বদ্বি সকলের চেয়ে বেশি
জানিস।

সুদুঃখমা। ও যে সবাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছে, সেইজন্যে সবাই ওর বশ হয়েছে। যখন ভুল
ভাঙবে তখন হায় হায় করে মরবে।

সুদর্শনা। তোর বড়ো অহংকার হয়েছে। তুই আমার চেয়ে চিনিস?

সুদুঃখমা। যদি আমার অহংকার থাকত, তা হলে আমি চিনতে পারতুম না।

সুদর্শনা। আমি ওকেই মালা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুদুঃখমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

সুদর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত? তোর তো আশ্রয় কম নয়! যা এখান থেকে চলে, আমি
তোর মুখ দেখব না।

[সুদুঃখমার প্রস্থান

আমার মন আজ এমনই চঞ্চল হয়েছে! এমন তো কোনোদিন হয় না। সুদুঃখমা!

সুদুঃখমার প্রবেশ

সুদর্শনা। আমার মালা কি ভুল পথেই গেছে?

সুদুঃখমা। হাঁ।

সুদর্শনা। আবার সেই একই কথা? আচ্ছা বেশ, ভুল করেছি, বেশ করেছি। তিনি কেন নিজে
দেখা দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দেন না? কিন্তু তোর কথা মানব না। যা আমার কাছ থেকে—মিছিমিছি
আমার মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিস নে।

[সুদুঃখমার প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলই কটাক্ষপাত করছ। স্মিত কৌতুকে
সমস্ত আকাশ ভরে গেল যে! প্রতিহারী!

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। কী রাজকুমারী?

সুদর্শনা। ঐ-যে আশ্রয়বনবীথিকায় উৎসববালকেরা গান গেয়ে যাচ্ছে, ডাক্ ডাক্, ওদের ডেকে
নিয়ে আয়। একটু গান শুন।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

বালকগণের প্রবেশ

এসো এসো সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহমন গান
গাইছে, কণ্ঠে আসছে না। আমার হয়ে তোমরা গাও।

বালকগণের গান

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুনদিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে,
লুকিয়ে তুমি ওই গানেরই আড়ালে,
আজ ফাগুনদিনের সকালে।

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে—
আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই— তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদাদা ও দেশী পণ্ডিতদের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী ভাই, হল তোমাদের?
কৌণ্ডল্য। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো-না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ
বাকি নেই।
ঠাকুরদাদা। বলিস কী? রাজাগুলোকে সুন্দর রাঙিয়েছে না কি?
জনাদর্শন। ওরে বাস্ রে! কাছে ঘেঁষে কে! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।
ঠাকুরদাদা। হায় হায়, বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রঙ ধরাতে পারলি নে? জোর করে
টুকে পড়তে হয়।
কুম্ভ। ও দাদা, তাদের রাঙা সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর
পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যেরকম ভাঁজ দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই
একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।
ঠাকুরদাদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড—ওদের তফাতে
রেখেই চলতে হবে।

বাউলের প্রবেশ ও গান

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হল কেমন দেখ্ রে, যেমন
রাঙা কমল টলোমলো!

ঠাকুরদাদা। বেশ ভাই, বেশ—খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদাদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তা হলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রঙ ছিড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারও রঙ বন্ধে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ওই উত্তরীয়।

[সকলের প্রস্থান]

সুবর্ণ ও রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

সুবর্ণ। এ কী কান্ড করেছে রাজা বিক্রমবাহু?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারি দিকে ধরে উঠবে সে আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

সুবর্ণ। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখিছি নে।

বিক্রম। তুমি তো এদেশেরই লোক—পথ নিশ্চয় জান।

সুবর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

বিক্রম। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দূ-টুকরো করে কেটে ফেলব।

সুবর্ণ। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা?

সুবর্ণ। আমি রাজা না, রাজা না। (মার্টিতে পিড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পার্শ্বা, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

বিক্রম। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী? ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

সুবর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

বিক্রম। সে হবে না। পড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো, রক্ষা করো। চারি দিকে আগুন।

বিক্রম। মদু, ওঠো, আর দৌরি না।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। রাজা, রক্ষা করো। আগুন ঘিরেছে।

সুবর্ণ। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

সুবর্ণ। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড! (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক।

[রাজা বিক্রমের সহিত প্রস্থান]

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হুতাশন, দণ্ড করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব।

নেপথ্যে। ও দিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারি দিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ করো না।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। এসো।

সুদর্শনা। কোথায় যাব?

সুদর্শনা। ঐ আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।

সুদর্শনা। সে কী কথা?

সুদর্শনা। আগুনকে বিশ্বাস করো, যাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভালো।

সুদর্শনা। রাজা কোথায়?

সুদর্শনা। রাজাই আছেন ঐ আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।

সুদর্শনা। সত্যি বলছিস?

সুদর্শনা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।

[উভয়ের প্রস্থান]

গানের দলের প্রবেশ

গান

আগুনে হল আগুনময়।

জয় আগুনের জয়।

মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে

এইবেলা সব যাক-না পুড়ে,

মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক রে পরিচয়।

আগুন এবার চলল রে সন্ধানে

কলঙ্ক তোর লুকিয়ে কোথায় প্রাণে।

আড়াল তোমার যাক-না ঘুচে,

লজ্জা তোমার যাক রে মূছে,

চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক ভয়।

[গানের দলের প্রস্থান]

সুদর্শনা ও সুদর্শনার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

সুদর্শনা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

সুদুর্গমা। হতাশ হোয়ো না। তোমার সাধ তো মিটেছে, আগুনের মধ্যেই তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বৃকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

সুদুর্গমা। কেমন দেখলে?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো—ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কলশদ্যু সমুদ্রের মতো কালো।

[প্রস্থান]

সুদুর্গমা। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই এক দিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাব।
জানবে না কেউ কোন্‌ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব।

সুদর্শনার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। কিন্তু কেন সে আমাকে জোর করে পথ আটকায় না? কেশের গুচ্ছ ধরে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না? আমাকে কিছুর সে বলছে না, সেইজন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে।

সুদুর্গমা। রাজা কিছুর বলছে না, কে তোমাকে বললে?

সুদর্শনা। অমন করে নয়, চীৎকার করে বজ্রগর্জনে—আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। রাজা আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

সুদুর্গমা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন?

সুদর্শনা। যেতে দেবেন না? আমি যাবই।

সুদুর্গমা। আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা। আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে তিন ধরে রাখতে পারতেন কিন্তু রাখলেন না। আমাকে বাঁধলেন না—আমি চললুম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক।

সুদুর্গমা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মধ্যে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে—এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না।

[দ্রুত প্রস্থান]

৪

রাজপথ

নাগরিকদলের প্রবেশ

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকন্যা সন্দর্শনা।

দ্বিতীয়। সকল সর্বনাশের মূলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই তো আছে—কী আছে বলো-না হে বটুকেশ্বর—তুমি বামনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে, আছে বৈকি। বেদে যা খুঁজবে তাই পাওয়া যাবে—অষ্টাবক্র বলেছেন, নারীগাণ্ড নখিনাণ্ড শৃঙ্গিণাং শম্বপাণিনাং—অর্থাৎ কিনা—

দ্বিতীয়। আরে, বুদ্ধোছি বুদ্ধোছি—আমি থাকি তর্করত্নপাড়ায়—অনুস্বার-বিসর্গের একটা ফোঁটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই।

প্রথম। আমাদের এ হল যেন কলির রামায়ণ। কোথা থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল দশমুণ্ড রাবণ, আচমকা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল।

তৃতীয়। যুদ্ধের হাওয়া তো চলছে, এ দিকে রাজকন্যা যে কোথায় অদর্শন হয়েছেন কেউ খোঁজ পায় না। মহারাজ তো বন্দী, এ দিকে কে যে লড়াই চালাচ্ছে তারও কোনো ঠিকানা নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন আমাদের উপায় কী? আমাদের ছিল এক রাজা এখন সাতটা হতে চলল, বেদে পুরাণে কোথাও তো এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বৈকি—পণ্ডপাণ্ডবের কথা ভেবে দেখো।

তৃতীয়। আরে সে হল পণ্ডপতি—

প্রথম। একই কথা। তারা হল পতি, এরা হল নৃপতি। কোনোটারই বাড়াবাড়ি সুবিধে নয়।

তৃতীয়। আমাদের পাঁচকাড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠল হে—রামায়ণ মহাভারত ছাড়া কথাই কয় না।

দ্বিতীয়। তোরা তো রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এ দিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কী ঘটছে খবর কেউ রাখিস নে।

প্রথম। ওরে বাবা—সেখানে যাবে কে? খবর যখন আসবে তখন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে—জানতে বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে?

প্রথম। তা তো সত্যি। তুমি যাও-না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চলো-না ধনঞ্জয়ের ওখানে। সে সব খবর জানে।

দ্বিতীয়। না জানলেও বানিয়ে দিতে জানে।

[সকলের প্রস্থান]

সন্দর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ

সন্দর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সৌভাগ্যবতী বলত, আমি যেখানে যেতুম সেখানেই ঐশ্বর্যের আলো জ্বলে উঠত। আজ আমি এ কী অকল্যাণ সংগে করে এনোছি। তাই আমি ঘর ছেড়ে পথে এলুম।

সুরঙ্গমা। মা, ষতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে পেঁপাছোবে ততক্ষণ তো পথই বন্ধ।

সন্দর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, তার কথা আর বলিস নে।

সুরঙ্গমা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

সন্দর্শনা। কখনোই না।

সুরঙ্গমা। কার উপরে রাগ করছ মা!

সন্দর্শনা। আমি তার নাম করতেও চাই নে।

সুদৰ্শমা। আচ্ছা, নাম কোরো না, তাঁর সবুদর সহাবে।

সুদৰ্শনা। আমি পথে বেরোলুম, সঙ্গে সে এল না!

সুদৰ্শমা। সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি।

সুদৰ্শনা। একবার বারণও করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল-না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার!

সুদৰ্শমা। সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর। তাঁকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদৰ্শনা। তবে তুই এমন দিনরাত ডাকিস কেন?

সুদৰ্শমা। সে যেন এমনি পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার দুঃখ আমার থাক, সেই কঠিনেরই জয় হোক।

[সুদৰ্শনার প্রস্থান]

সুদৰ্শমার গান

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিষ্ঠুর।

তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবার্নিশি তাই তো বাজে
পরান-মাঝে এমন কঠিন সুদর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর।

[সুদৰ্শমার প্রস্থান]

রাজা বিক্রম ও সুবর্ণের প্রবেশ

বিক্রম। কে যে বললে সুদৰ্শনা এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। যুদ্ধে তার বাপকে বন্দী করা মিথ্যে হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

সুবর্ণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তা হলে তো বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্লান্ত হোন।

বিক্রম। কেন বলো তো?

সুবর্ণ। দঃসাহসিকতা হচ্ছে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

সুবর্ণ। কান্তিকরাজকে ভয় না করলেও চলে কিন্তু—

বিক্রম। ঐ কিন্তুটাকে ভয় করতে শরদ্র করলে জগতে টেকা দায় হয়।

সুবর্ণ। মহারাজ, ঐ কিন্তুটাকে নাহয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ও-যে বাইরে থেকেই হঠাৎ উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখুন-না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। খুব করেই আটঘাট বোধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অগ্নিমূর্তি ধরে ঢুকে পড়ল একটা কিন্তু।

বসুদসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুদসেন। অন্তঃপুর ঘরে এলুম, কোথাও তো তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাত্রা শূভ, সেটা বদ্বি মিথ্যা হল।

বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়াতেই হয়তো শূভ, কে বলতে পারে?

বিক্রম। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ!

বসুসেন। এ কী! ভূমিকম্প নাকি!

বিক্রম। ভূমিই কাঁপছে বটে, কিন্তু তাই বলে পা কাঁপতে দেওয়া হবে না।

বসুসেন। এটা দলক্ষণ।

বিক্রম। কোনো লক্ষণই দলক্ষণ নয়, যদি সঙ্গে ভয় না থাকে।

বসুসেন। দৃষ্ট কিছকে ভয় করি নে কিন্তু অদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে লড়াই চলে না।

বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে খুবই লড়াই চলে।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, সৈন্যরা প্রায় সকলে পালিয়েছে।

বিক্রম। কেন?

দূত। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকে গেল—কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের ফিরিয়ে আনিছ। যুদ্ধের পর হারা চলে কিন্তু যুদ্ধের আগে হারা মানতে পারব না।

[বিক্রমবাহন ও দূতের প্রস্থান]

বিজয়। যার জন্য যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারাও পালায়, এখন আমাদেরই কি পালানো দোষের।

বসুসেন। মনে ধাঁধা লেগেছে, কিছু স্থির করতে পারছি নে।

[উভয়ের প্রস্থান]

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ,
ফুল ফোটাবার খাপামি, তার
উদ্দাম তরঙ।
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ।
সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝরে
তারা ধূলা হল, ধূলা দিল ভরে।
প্রথর তাপে জরো-জরো
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক ভঙ।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। এ কী হল? ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে পড়ছি। ঐ-যে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার চার দিকেই যুদ্ধ চলছে। ঐ-যে আকাশ ধুলোয় অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তকাল ঘুরে বেড়াব? এর থেকে বেরোই কেমন করে?

সুদর্শনা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্ছ, ফিরতে চাচ্ছ না, সেইজন্য কোথাও পৌঁছোতে পাচ্ছ না।

সুদর্শনা। কোথায় ফেরবার কথা তুমি বলছিস?

সুদর্শনা। আমাদের রাজার কাছে। আমি বলে রাখছি যে পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে পথের অন্ত পাবে না কোথাও।

সৈনিকের প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি?

সৈনিক। আমি নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। শীঘ্র বলো সেখানকার খবর কী।

সৈনিক। মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। কে বন্দী হয়েছেন?

সৈনিক। আপনার পিতা।

সুদর্শনা। আমার পিতা! কার বন্দী হয়েছেন?

সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহুর।

[সৈনিকের প্রস্থান]

সুদর্শনা। রাজা, রাজা, দুঃখ তো আমি সহিতে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দুঃখ চার দিকে ছড়িয়ে দিলে কেন? যে আগুন আমার বাগানে লেগেছিল সেই আগুন কি আমি সংগে করে নিয়ে চলছি। আমার পিতা তোমার কাছে কী দোষ করেছেন?

সুদর্শনা। আমরা যে কেউ একলা নই। ভালোমন্দ সবাইকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেই-জন্যেই তো ভয়, একলার জন্যে ভয় কিসের?

সুদর্শনা। সুদর্শনা!

সুদর্শনা। কী রাজকুমারী!

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন?

সুদর্শনা। আমাকে কেন বলছ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারো কিছু বৃদ্ধিতে বাকি থাকবে না।

সুদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি তুমি আসতে, তা হলে তোমার যশ বাড়ত বৈ কমত না।

[প্রস্থানোদ্যম]

সুদর্শনা। কোথায় যাচ্ছ?

সুদর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদূর নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে।

[উভয়ের প্রস্থান]

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। যুদ্ধের আরম্ভেই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈন্য কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে?

বিজয়। বিক্রমবাহুকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না।

বসুসেন। সে আত্মবিনাশের নেশায় উন্মত্ত।

বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বললে, রণক্ষেত্রে সে যেমনি গিয়ে পেঁচাচ্ছে অমনি তার বুক লেগেছে ঘা। এতক্ষণে তার কী হল কিছুই বলা যায় না।

বসুসেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত ঠেকছে যে, আমরা আয়োজন করলুম কতদিন থেকে, সমারোহ হল ঢের, কিন্তু শেষ হবার বেলায় এক পলকেই কী যে হয়ে গেল ভালো বুঝতে পারা গেল না।

বিজয়। রাত্রির সমস্ত তারা যেমন প্রভাতসূর্যের এক কটাক্ষেই নিবে যায়।

বসুসেন। এখন চলো।

বিজয়। কোথায়?

বসুসেন। ধরা দিতে।

বিজয়। ধরা দিতে, না পালাতে?

বসুসেন। পালানোর চেয়ে ধরা দেওয়া সহজ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

এখনো গেল না আঁধার,
এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ-ব্রত
জীবনে হল না সাধা।
কবে যে দুঃখজ্বালা
হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে
নিশীথরাতের কাঁদা।
এখনো নিজেরই ছায়া
রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে
চাহিছে কেবলই পিছে,
চকিতে বিজলি আলো
চোখেতে লাগালো ধাঁধা।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এ লজ্জা কাটবে।

সুদর্শনা। কাটবে বৈকি সুরঙ্গমা—সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমার নিচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু কই রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

সুদর্শনা। হায় কপাল, লোককে ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে! না না, দুঃখ করব না। যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে, ভালোই হয়েছে, কিছু অন্যায় হয় নি।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনোছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদাদা। করো কী, করো কী। আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদাদা। ঐ তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদাদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন! তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদাদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন! ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি—বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না! ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে?

ঠাকুরদাদা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদাদা। দেবে বৈকি। নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। পথের ধারে আমি চুপ করে পড়ে থাকব—এক পা-ও নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদাদা। দিদি, তোমার বয়স অল্প—জেদ করে অনেকদিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মূহূর্ত গেলেও লোকসান হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে দেখাতেন কারো আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদুঃখ লোকের সামনে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

[উভয়ের প্রস্থান

নাগরিক দলের প্রবেশ

প্রথম। ওহে, এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম, খুব তামাশা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল, বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়—কেউ এদিকে

যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহু, সে কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা তার বৃকে এসে লাগল।

তৃতীয়। সে যে পদে পদেই হারছিল, তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল, তার ঠিক নেই।

[সকলের প্রস্থান]

অন্য দলের প্রবেশ

প্রথম। শুনোছি বিক্রমবাহু মরে নি।

তৃতীয়। না, কিন্তু বিক্রমবাহুর বিচারটা কিরকম হল?

দ্বিতীয়। শুনোছি বিচারকর্তা স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেথাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা কিছু করেছে, সে তো ঐ বিক্রমবাহুই।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম, তা হলে কি আর আস্ত রাখতুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না!

তৃতীয়। কী জানি, বিচারকর্তাকে দেখি নে, তার বৃদ্ধিটাও দেখা যায় না।

প্রথম। ওদের বৃদ্ধি বলে কিছু আছে কি! এর মধ্যে সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত, তা হলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে!

[সকলের প্রস্থান]

ঠাকুরদাদা ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। একি বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে।

বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদাদা। ঐ তো তার স্বভাব।

বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদাদা। সেও তার এক কৌতুক।

বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মৃহুতে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদাদা। তা হোক, সে যতবড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাগে বেরিয়েছ যে।

বিক্রম। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারি নি। রাজা বিক্রম থালার মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদাদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, তুমিও পথে যে?

ঠাকুরদাদা। আমিও সর্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী বলো।
ঠাকুরদাদা। তার কাছে ধরা দিলে এক সঙ্গেই ধরাও দেওয়া হয় ছাড়াও পাওয়া যায়।

যে জন দেয় না দেখা—যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়।

[উভয়ের প্রস্থান]

সুদূরগম্য প্রবেশ

গান

পথের সাথী, নরি বারংবার।
পথিক জনের লহো নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো কীর্তি
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার।
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার।
জীবনরথের হে সার্থক,
আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহো নমস্কার।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুদূরগম্য! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারিছিলুম না। সমস্ত রাতটা পথে পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিণে হাওয়া বৃকের বেদনার মতো হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণ-চতুর্দর্শীর অন্ধকারে বউ-কথা-কণ্ড চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না!

সুদূরগম্য। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে, তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তার বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে? বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনিয়েছিলি সুদূরগম্য। না, সে আমার স্বপ্ন?

সুদূরগম্য। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুদূর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।

[উভয়ের প্রস্থান]

গানের দলের প্রবেশ
গান

আমার অভিমানের বদলে আজ
নেব তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই
চোখের জলের পালা।
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর
পরশ পাষণ-গালা।
ছিল আমার আঁধারখানি,
তারে তুমিই নিলে টানি,
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে
করল তারে আলা।
সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দারি
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণডালা।

[প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে! মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টিকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে। এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে। এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা; এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে, এই শূন্যে ধুলোয়, আপনি বেরিয়ে এসেছেন। আমার হাত ধরেছেন। সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন, হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, এও সেইরকম। কে বললে তিনি নেই! সুরঙ্গমা, তুমি কি বুদ্ধিতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

সুরঙ্গমার গান

আমার আর হবে না দোরি,
আমি শুনছি ওই বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ
আমার যাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে
মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি।

আমার স্বপন হল সারা
এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর
নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্বাদের মালা
নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি।

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাতে এই আঁধার পথে আরো একজন পাঁথক বেরিয়েছে যে!

সুরঙ্গমা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখছি!

সুদর্শনা। বিক্রম রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব। ভয়ের দিন আমার আর নেই।

রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

বিক্রম। তুমিও চলেছ বন্ধি। আমিও এই এক পথেরই পাঁথক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে বিক্রমরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত!

বিক্রম। কিন্তু তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তা হলে এখনি রথ আনিয়া দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা বোলো না—যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধূলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধূলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারো দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন প্রাসাদে ছিলুম তখন কেবল সোনারদুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধূলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খিঁড়িয়ে নেব। আজ আমার সেই ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধূলোমাটিতে মিলন হচ্ছে, এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। ঐ দেখো, পূর্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই—তাঁর প্রাসাদের সোনার চুড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। ভোর হল দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি।

ঠাকুরদাদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদাদা। তা হোক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে—আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্যে রানীর বেশ নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না। সে বেশ তিনি আমাকে চির দিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে

আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদাদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক! আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদাদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক্, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তাঁর গায়েও ধুলো মাখা। তাঁকে বর্ষা কেউ ছাড়ে মনে করছ? যে পায় তাঁর গায়ে মূঠো মূঠো ধুলো দেয় যে।

বিক্রম। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদাদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে। আর এই আমাদের রানীকে দেখো, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল। মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে! কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর-কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপন গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

সুদর্শনা। ঐ-যে সূর্য উঠল।

[সকলের প্রস্থান]

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।

শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান।

ধন্য হ'লি ওরে পান্থ

রজনীজাগরকান্ত,

ধন্য হল মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ।

বনের কোলের কাছে

সমীরণ জাগিয়াছে;

মধুভিক্ষু সারে সারে

আগত কুঞ্জের দ্বারে

হল তব যাত্রা সারা,

মোছো মোছো অশ্রুধারা,

লজ্জা ভয় গেল ঝরি,

ঘুচিল রে অভিমান।

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ে না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সহিতে পারবে?

ভূমিকা

যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে
শাপমোচন কাথকাটি রচনা করা হল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা
গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকার গান। ভাবটা এই, মনের নানা গভীর আকাঙ্ক্ষা কাহিনীতে রূপকে গানে রূপ নেয় ছন্দে বন্ধে, সঙ্গ রচনা করে কম্পনায়, বস্তুজগৎ থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কম্পজগতে করে লীলা।

এ শূদ্ধ অলস মায়া—এ শূদ্ধ মেঘের খেলা,
এ শূদ্ধ মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন,
এ শূদ্ধ আপনমনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসি কান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারা বেলা
আপনারি ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগর্দলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ করে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব বলে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় বনের ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হয়, খেলার সাথী কে আছে।
ভুলে ভুলে গান গাই—কে শোনে, কে নাই শোনে—
যদি কিছুর মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে।

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরসভায় গীতনায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুরমেরু-শিখরে সূর্যপ্রদক্ষিণে। সৌরসেনের বিরহীচিত্ত ছিল উৎকণ্ঠিত। অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, নৃত্যে উর্বশীর শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।

পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়,
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়।
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন,
পুণ্য লগন
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়,
পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয়।
যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে,
পাছে তার তালে মোর তাল না মেলে
সেই ঝড়ে।
যখন মরণ এসে ডাকবে শেষে বরণগানে
পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়,
পাছে বিনা গানেই বিদায়বেলা লয় হয়।

স্থলিতচ্ছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী হল বিকৃত, অরুণেশ্বর নামে তার জন্ম হল গান্ধাররাজগৃহে।

মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বললে, ‘ঘটিয়ো না বিচ্ছেদ দেবী, গতি হোক আমাদের একই লোকে, একই দৃঃখভোগে, একই অবমাননায়।’

শচী সঙ্করুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন, ‘তথাস্তু, যাও মর্ত্যে, সেখানে দ্বংথ পাবে, দ্বংথ দেবে। সেই দ্বংথে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।’

বিদায়গান

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি,
মিলনের উৎসবে তায়
ফিরায়ে দিয়ো আনি।
বিষাদের অশ্রুজলে
নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফলে
হৃদয়ের নতুন বাণী।
যে পথে যেতে হবে
সে পথে তুমি একা,
নয়নে আঁধার হবে
ধেয়ানে আলোকরেখা।
সারাদিন সঙ্গোপনে
সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে
বিরহের বীণাপাণি।

মধুস্রী জন্ম নিল মদুরাজকূলে, নাম নিল কমলিকা। স্বর্গলোক থেকে যে আত্মবিস্মৃত বিরহ-বেদনা সঙ্গে এনেছে অরুণেশ্বর, যৌবনে তার তাপ উঠল প্রবল হয়ে।

জাগরণে যায় বিভাবরী,
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি।
যার লাগি ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি
তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি।

বাণী নাহি তব্দ কানে কানে
কী যে শুনি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়া-ভরা বেদনাতে
বারি-ছলছল আঁখিপাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি।

তাপাত্ত মন খুঁজে বেড়ায় অনাবৃষ্টিতে তুষার জল, বীণা কোলে নিয়ে গান করে—

এসো এসো হে তুষার জল,
ভেদ করো কঠিনের বন্ধস্থল, কলকল ছলছল।
এসো এসো উৎসম্প্রোতে গদ্য অন্ধকার হতে,
এসো হে নির্মল, কলকল ছলছল।

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়,
তুমি যে খেলার সাথী, সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগাক গান,
এসো হে উজ্জ্বল, কলকল ছলছল।

হাঁকিছে অশান্ত বায়—
আয় আয় আয়, সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল, কলকল ছলছল।

অনাবৃষ্টি কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে,
ভেঙে নীরসের কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল ছলছল।

কেমন করে কর্মলিকার ছবি এসে পড়ল গান্ধারে রাজ-অন্তঃপুরে। মনে হল, যা হারিয়েছিল
এই-জন্মের আড়ালে, তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপরূপ স্বপ্নরূপে।

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঁঙিনায় বাজল সে সুর আমার প্রাণের তালে তালে।

সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে,
স্বপ্নে-ছাওয়া দখিন হাওয়া আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুদ্ধ, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণের রঙের হিলোল;
মর্ম্মরিত মর্ম্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে।

ছবিখানি দিনের চিন্তা রাতের স্বপ্নের 'পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।

তুমি কি কেবলই ছবি, শুদ্ধ পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,

তুমি কি তাদের মতো সত্য নও—
 হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি!
 নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
 নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই।
 আজি তাই
 শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
 আমার নিখিল
 তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
 নাই জানি, কেহ নাই জানে
 তব সুর বাজে মোর গানে,
 কবির অন্তরে তুমি কবি—
 নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

রাজা লিখলেন চিঠি চিত্ররূপিণীর উদ্দেশে। লিখলেন—

কখন দিলে পরায়ে স্বপনে ব্যথার মালা, বরণমালা।
 প্রভাতে দেখি জেগে অরুণ মেঘে
 বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রুগালা।
 গোপনে এসে গেলে, দেখি নাই আঁখি মেলে।
 আঁধারে দঃখডোরে বাঁধিলে মোরে,
 ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা।

চিঠি পেঁপঁছল রাজকন্যার হাতে। অজানার আহ্বানে তার মন হল উতলা। সখীদের নিষে
 বার বার করে পড়লে সেই চিঠি।

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে,
 তার দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে।
 শস্যখেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি,
 ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া লাগুক আমার মৃদুকেশে।
 নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজুক আমার বিজন মনে,
 ধূসর পথের উদাস বরন মেলুক আমার বাতায়নে।
 সূর্য-ডোবার রাঙা বেলায় ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
 আপন-মনে চোখের কোণে অশ্রু-আভাস উঠবে ভেসে।

গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে। বিবাহ-প্রস্তাব শুনে রাজা বললে, 'আমার কন্যার দুর্লভ
 ভাগ্য।'

সখীরা রাজকন্যাকে গিয়ে বললে—

বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে।
 হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
 বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
 অধরে লাজহাসি সাজিবে।

নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
 সুখবেদনা মনে বাজিবে।
 মরমে মূরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
 সেই চরণযুগরাজীবে।

চৈত্রপূর্ণিমার পূর্ণ্যতিথিতে শুবলগ্ন। সেই বিবাহরাতে দূরে একলা বসে রাজার বৃকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়ে উঠল। কেবলই তার মনে হতে লাগল, লোকান্তরে কার সঙ্গে এইরকম জ্যোৎস্না-রাতে সে যেন এক-দোলায় দুলেছিল। ভুলে-যাওয়ার কুহেলিকার ভিতর থেকে পড়েছে মনে। একটা পদ তার মনে গুঞ্জরিয়া উঠছে ‘ভুলো না—ভুলো না—ভুলো না’—

সেদিন দূজনে দুলেছিল বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
 সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না।
 সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান
 আমার মনের প্রলাপ জড়ানো,
 আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে,
 দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহালগনে।
 এখন আমার বেলা নাই আর,
 বাঁধব একাকী বিরহের ভার—
 বাঁধব যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না।

যথালগ্নে রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে এল অরুণেশ্বরের বক্ষোবিহারিণী বীণা, রাজার অশ্রুত আহ্বান সঙ্গে করে। সখীরা দূরোদ্দিশ্ট বন্ধুর আবাহন-গান গাইলে—

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল গো
 ওগো পুরবাসী।
 বৃকের আঁচলখানি ধুলায় ফেলে
 আঁঙিনাতে মেলো গো।
 পথে সেচন করো গন্ধবারি,
 মলিন না হয় চরণ তারি,
 তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে এল গো—
 আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছাড়িয়ে ফেলো গো।

সকল ধন যে ধন্য হল হল গো,
 বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দ্বার খোলো গো।
 হেরো রাঙা হল সকল গগন,
 চিত্ত হল পদলকমগন,
 তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে এল গো—
 তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধরে ওই আলোতে জেদলো গো।

অন্তঃপুরিকারা বীণাখানিকে বরণ করে নিয়ে এল বিবাহের আসরে, বধূকে আহ্বান করে গাইলে—

বাজো রে বাঁশরি বাজো ।
 সুন্দরী, চন্দনমাল্যে মঞ্জলসন্ধ্যায় সাজো ।
 বদ্বি মধুফালগুদনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে,
 মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক
 অঙ্গনে ফোটে নি কি আজো ।
 রক্তিম অংশুক মাথে, কিংশুককঙ্কণ হাতে,
 মঞ্জীরঝংকৃত পায়ে, সৌরভমন্থন বায়ে,
 বন্দনসংগীতগুঞ্জনমুখরিত
 নন্দনকুঞ্জে বিরাজো ।

বীণার সঙ্গে রাজকুমারীর মালা বদল হল । সখীরা এই বীণা সুন্দরকে উৎসর্গ করে গাইলে—

লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি,
 নন্দনকুঞ্জ হতে সুদর দেহো তায় আনি
 ওহে সুন্দর হে সুন্দর ।
 অঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
 তোমারি আশ্বাসে,
 তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী
 ওহে সুন্দর হে সুন্দর ।

পাষণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে—
 পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রুজলে
 ওহে সুন্দর হে সুন্দর ।
 শব্দক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
 আমার চিত্তমাঝে,
 শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি ।

বধু পতিগৃহে যাবার সময় সখীরা সুন্দরকে প্রণাম করে বললে—

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে ।
 আপন রাগে, গোপন রাগে,
 তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
 অশ্রুজলের করুণ রাগে ।
 রঙ যেন মোর মর্মে লাগে—আমার সকল কর্মে লাগে—
 সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে—
 গভীর রাতের জাগায় লাগে ।
 যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
 রক্তে তোমার চরণদোলা লাগিয়ে দিয়ে ।
 অঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
 পাষণগুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
 মেঘের বদকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
 বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে—

তেমনি আমার দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে
কাদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে।

রাজবধূ এল পতিগৃহে।

দীপ জ্বলে না, ঘর থাকে অন্ধকার, সেই ঘরে প্রতি রাতে স্বামীর কাছে বধূ সমাগম।

কমলিকা বলে, 'প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার দিন, আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'

এসো আমার ঘরে,
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।
দুঃখসুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো,
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
এবার ফুলের প্রফুল্লরূপ এসো বৃকের 'পরে।

রাজা বলে, 'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।'

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে যায় রে যায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাঁখি বনে পালায়।
ওগো, হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে, পরবে ফাঁসি—
তখন ঘুচবে স্বরা, ঘুরিয়ে মরা হেথা হোথায়।

চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়—
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির-বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বৃষ্টি পাগলপ্রায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাঁখি বনে পালায়।

অন্ধকারে বীণা বাজে। অন্ধকারে গান্ধবী'কলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে। সেই নৃত্য-কলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে তার মর্ত্যদেহে। নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে আঘাত করে; নিশীথরাতে সমুদ্রে জোয়ার এলে তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে, অশ্রুতে দেয় প্লাবিত করে।

একদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহর, শূকতারা পূর্বগগনে; কমলিকা তার সুগন্ধি এলোচুলে দিলে রাজার দুই পা ঢেকে; বললে, 'আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে তোমাকে প্রথম দেখব। নইলে আমি বিদায় নিয়ে যাই, রেখে যাই আমার কান্না এই অন্ধকারের বৃকে—যতক্ষণ না আমাকে ফিরে ডেকে আন তোমার আলোর সভায়।'

আমি এলেম তোমার দ্বারে,
ডাক দিলেম অন্ধকারে।

আগল ধরে দিলেম নাড়া, প্রহর গেল পাই নি সাড়া,
 দেখতে পেলেম না তোমারে।
 তবে যাবার আগে এখান থেকে
 এই লিখনখানি যাব রেখে।
 দেখা তোমার পাই বা না পাই
 দেখতে এলেম জেনো গো তাই.
 ফিরে যাই সুদূরের পারে।

রাজা বললে, ‘প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না, এই মিনতি। এখনো তুমি অন্যমনে আছ, শব্দদৃষ্টির সময় তাই এল না।’

আনমনা গো আনমনা,
 তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।
 বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুদ্ধবে কবে.
 তোমারো মন জানব না।
 লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে
 নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে.
 দেব’ তোমায় শান্ত সুদূরের সান্ধনা।

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে মন্দমৃদুল তানে.
 ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
 অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুদ গাঁথে—
 একলা আমি বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
 প্রান্তে বসে একমনে
 একে যাব আমার গানের আল্পনা।

মহিষী বললে, ‘প্রিয়প্রসাদ থেকে আমার দুই চক্ষু চিরদিনই কি থাকবে বঞ্চিত। অন্ধতার চেয়ে এ যে বড়ো অভিশাপ।’

অভিমনে মহিষী মূখ ফেরালে।

রাজা বললে, ‘কাল চৈত্রসংক্রান্তি। নাগকেশরের বনে নিভূতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন। প্রাসাদশিখর থেকে দেখো চেয়ে।’

মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। বললে, ‘চিনব কী করে।’

রাজা বললে, ‘যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো। সেই কল্পনাই হবে সত্য।’

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা।

নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা।
 অলখ পথেই যাওয়া-আসা, শূন্য চরণধ্বনির ভাষা,
 গন্ধে শূন্য হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।

কেমন করে জানাই তারে, বসে আছি পথের ধারে।
 প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোছায়ার রঙিন খেলা,
 ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা।

আজি দখিন দুরার খোলা,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজারে ব্যাকুল বেণু
মেখে পিয়ালফুলের রেণু,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।

এসো ঘনপল্লবপদ্মে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে—
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।

চৈত্রসংক্রান্তির রাতে আবার মিলন। মহিষী বললে, ‘দেখলেম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরু-শ্রেণীতে বসন্তবাতাসের অধৈর্য। যেন চন্দ্রলোকের শূরুপক্ষে লেগেছে তুফান। কেবল একজন কুস্ত্রী কেন রসভঙ্গ করলে। ও যেন রাহুর অনুচর। কী গুণে ও পেল প্রবেশের অধিকার।’

রাজা স্তম্ভ হয়ে রইল। তার পরে উঠল গেয়ে, ‘অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ধনা দেবার তরে। মর্ত্যের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।’

‘না মহারাজ, না’ বলে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

রাজার কণ্ঠের সুরে লাগল অশ্রুর ছোঁয়া। বললে, ‘যাকে দয়া করলে যেত তোমার হৃদয় ভরে, তাকে ঘৃণা করে কেন পাথর করলে মনকে।’

‘রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে’ বলে মহিষী উঠে পড়ল আসন থেকে।

রাজা হাত ধরে বললে, ‘একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাম্ভিক্যে। কুস্ত্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।’

ভ্রু কুটিল করে মহিষী বললে, ‘অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বৃষ্টি নে। ঐ শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক। অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি। আজ সূর্যোদয়-মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হোক আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলেম।’

রাজা গাইলেন—

বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি।
বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে
রসের প্রসাদ মাঙবে কি।
রৌদ্রদাহ হলে সারা নামবে কি ওর বর্ষাধারা,
লাজের রাঙা মিটলে হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি।

যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে টানবে না কি ব্যথার টানে।
অভিমানের কালো মেঘে বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন কোনোই বাধা মানবে কি।

মহিষী স্তম্ভ হয়ে রইল। রাজা বললে, ‘আচ্ছা, কথা তোমার রাখব, কিন্তু তাতে ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে না।’

জ্বলে উঠল আলো, আবরণ গেল ঘুচে, দেখা হল। টলে উঠল যুগলের সংসার। ‘কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বণ্ডনা’ বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পার্লিয়ে গেল। তাকে ডাক দিলে রাজার জগৎ থেকে—

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনাপিয়াসি মোরা, কথা রাখো।
আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয় নি সারা, সাজি ভরে নি,
পাখিক ওগো, থাকো থাকো।

গেল বহুদূরে, বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে। কুয়াশায় শূন্যতার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।

রাগি যখন দুইপ্রহর, আধোঘুমে সে শূন্যতে পায় এক বীণাধ্বনির আত্মরাগিণী। স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে। মনে হয়, এই সূর চিরদিনের চেনা। চিরবিরহের সঞ্চিত অশ্রু বৃক্ষের মধ্যে উছলে ওঠে।

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসের পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না।
ঝরঝর নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজল সমীরে গো,
যেন কার বাণী কভু প্রাণে আনে কভু আনে না।

রাতের পর রাত যায়। অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে তাকে চোখে দেখি নে, তার হৃদয় দেখি—জনশূন্য দেওদার-বনের দোলায়িত শাখায় যেন দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার। রানী মনে ভাবে, যখন সে কাছে এল তখন ছিল কৃষ্ণসন্ধ্যা। যখন চাঁদ উঠল তখন তার মালাখানি রইল, সে রইল না।

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিঁধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে
জেনেছিলেম অনুভবে,
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে।
তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি পথের কাছে
মালা তোমার পড়ে আছে,
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে করে।

কী হল রাজমহিষীর। কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহ জাগিয়ে তোলে। কোন্ রাত-জাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়, তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া। আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র। বীণাধরনি যেন আজ আর বাইরে নেই; এসেছে তার অন্তরের তন্তুতে তন্তুতে।

ওই বৃষ্টি বাঁশ বাজে বনমাঝে কি মনোমাঝে।
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনি, এ সুখরজনী কোন্‌খানে উদিয়াছে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে।

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি ভয়ে লাজে।
কী জানি কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে।

রাজমহিষী বিছানায় উঠে বসে, স্রস্তু তার বেণী, হস্ত তার বক্ষ। বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় অন্তহীন অভিসারের পথ। রাগিণীবিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল, দেখার পরে যাকে ভুলেছিল তারই দিকে।
একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে নিয়ে এল অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ। মহিষী দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে। নীচে সেই ছায়ামূর্তির নাচ, বিরহের সেই উর্মিদোলা।

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না।
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা।
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে,
গানেরই তানে কি বাঁধবে ওরে,
ও যে চিরবিরহেরই সাধনা।

ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বৃষ্টি শুধু ও পরমকামনা।

মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত। ঝিল্লিঝংকৃত রাত। কৃষ্ণপঙ্কের চাঁদ দিগন্তে। অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য কথা কয় যেন স্বপ্নে। বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল মহিষীর অঙ্গে অঙ্গে। কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না। এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

বীণায় বাজে পরজের বিহবল মীড়। কমলিকা আপন-মনে বলে, ‘ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না। আর দেরি নেই, দেরি নেই।’

কৃষ্ণপঙ্কের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়। আঁধারের ডাক গভীর। রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ‘যাব আজ। আর ভয় করি নে আমার দৃষ্টিকে।’

পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে গেল সে অশথতলায়—সেখানে বীণা

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি
কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়স্পন্দে।
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত,
উড়ে পীতবসনপ্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে।

অম্বরপ্রাঙ্গণমাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদপরশন-আশা
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা,
সমীরণ বন্ধনহারা
উন্মন কোন্ বনগন্ধে।

বীণা থামল। মহিষী থমকে দাঁড়াল।
রাজা বললে, 'ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।'
গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর দূরদূরত্ব ধ্বনির মতো।
'কিছু ভয় নেই আমার, জয় হল তোমারই।'
এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুলে ধরলে রাজার
মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার!'

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চিরপূরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
এই আলো এই হাসি ডুবে আঁধারে।

সংযোজন

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমরতনে
 কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
 কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা,
 কণ্ঠে দোলাইব মৃদ্ধামালিকা,
 সীমন্তে সিন্দূর অরুণবিন্দূর
 চরণ রঞ্জিব অলঙ্ক-অঙ্কনে।

সখীরে সাজাব সখার প্রেমে
 অলঙ্ক্য প্রাণের অমূল্য হেমে।
 সাজাব স্কন্ধে বিরহবেদনায়,
 সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়,
 মধুর লজ্জা রচিব শয্যা
 যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে।

[১৯৩৩]

হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব,
 নীরবে জাগো একাকী শূন্য মন্দিরে-
 কোন্‌ সে নিরুদ্দেশ লাগি
 আছ চাহিয়া।

স্বপনরূপিণী আলোকসুন্দরী
 অলঙ্ক্য অলকাপূরী-নিবাসিনী
 তাহার মূর্তি রচিলে বেদনায়
 হৃদয়মাঝারে।

[শান্তিনিকেতন
 ১৪ নভেম্বর ১৯৩৩]

নমো নমো শচীচিতরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন
 নবজলধরকান্তি ঘননীল অঞ্জন,
 নমো হে, নমো নমো।
 নন্দনবীথির ছায়ে
 তব পদপাতে নব পারিজাতে

উড়ে পরিমল মধুরাতে,
 নমো হে, নমো নমো।
 তোমার কটাক্ষের ছন্দে মেনকার মঞ্জীরবন্ধে
 জেগে ওঠে গুঞ্জন মধুকরগুঞ্জন
 নমো হে, নমো নমো।

[পানাদুরা। সিংহল
 ২৬ মে ১৯৩৪]

৪

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
 তব নিশ্বাসপরশনে,
 এসেছ অদেখা বন্ধু
 দক্ষিণসমীরণে।
 কেন বগুনা কর মোরে,
 কেন বাঁধ অদৃশ্য ভোরে,
 দেখা দাও দেহমন ভ'রে
 মম নিকুঞ্জবনে।
 দেখা দাও চম্পকে রংগনে,
 দেখা দাও কিংশুক কান্ডনে।
 কেন শব্দ বাঁশিরির সুরে
 ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে,
 ঘোবন-উৎসবে ধরা দাও
 দৃষ্টির বন্ধনে।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

৫

বন্ধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে।
 বন্ধু স্বপ্নরূপে ছিলে চন্দ্রলোকে।
 ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
 যুগে যুগে দিনরাত্রি ধরি,
 ছিল মর্মবেদনঘন অন্ধকারে—
 জন্ম জনম গেল বিরহশোকে।
 অক্ষুট মঞ্জরী কুঞ্জবনে
 সংগীতশূন্য বিষন্ন মনে
 সঙ্গীরিক্ত বধু দৃঃখরাত্তি
 পোহাইল নির্জনে শয়ন পাতি।

সুন্দর হে, সুন্দর হে,
 বরমাল্যখানি তারি আনো বহে
 তুমি আনো বহে।
 অবগদুষ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
 হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে।

২০।৯।৩৪

৬

দূরের বন্ধু সূরের দূতীরে
 পাঠালো তোমার ঘরে।
 মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে
 বাজে তব অগোচরে।

মনের কথাটি গোপনে গোপনে
 বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
 বনে উপবনে,
 বকুলশাখার চঞ্চলতায়
 মর্মরে মর্মরে।

পুষ্পমালার পরশপুলক
 পেয়েছ বক্ষতলে।
 রাখো তুমি তারে সিন্ধু করিয়া
 সুখের অশ্রুজলে।

ধরো সাহানাতে মিলনের পালা,
 সাজাও যতনে বরণের ডালা,
 মালতীর মালা,
 অণ্ডলে ঢেকে কনকপ্রদীপ
 আনো তার পথ-পরে।

২১।৯।৩৪

৭

ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে—
 বহু-পূর্বস্মৃতিসম হেরি ওকে।
 কার তুলিকা নিল মন্ত্রে জিনি
 এই মঞ্জুল রূপের নিৰ্ঝরিণী,
 স্থির নিৰ্ঝরিণী,
 যেন ফাল্গুন-উপবনে শুরুরাতে,
 দোলপূর্ণিমাতে,
 এল ছন্দমূর্তি কার নব অশোকে।

নৃত্যকলা যেন চিত্রে লিখা
কোন স্বর্গের মোহিনী মরীচিকা,
শরৎ-নীলাম্বরে তড়িৎলতা
কোথা হারাইল চঞ্চলতা।
হে স্তম্ভবাণী, কারে দিবে আনি
নন্দনমন্দারমালাখান,
বরমালাখানি,
প্রিয়- বন্দনগান-জাগানো রাতে
শুভ দর্শন দিবে তুমি কাহার চোখে।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৪

৮

মায়াবন-বিহারিণী হরিণী,
গহনস্বপনসঞ্চারিণী,
কেন তারে ধরিবারে করি পণ, অকারণ।
থাক্ থাক্ নিজমনে দূরেতে,
আমি শুদ্ধ বাঁশির সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন, অকারণ।

চর্মকিবে ফাগুনের পবনে,
পাশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অনুখন, অকারণ।
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব,
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন, অকারণ।

২৯ সেপ্টেম্বর [১৯০৪]

৯

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আধারে,
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে।
সমুখে রয়েছে সুখাপারাবার,
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার,
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।
আড়ালে আড়ালে শূনি শুদ্ধ তার বাণী যে,
জানি তারে আমি তবু তারে নাহি জানি যে।
শুদ্ধ বেদনায় অন্তরে পাই,
অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই,
আমার ভুবন হবে কি কেবলি আধা রে।

৩০ সেপ্টেম্বর [১৯০৪]

১০

কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে—
 কোন্ দূর জনমের কোন্ স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে।
 আজ আলো-আঁধারে
 কখন বৃষ্টি দেখি কখন দেখি না তারে।
 কোন্ মিলনসুখের স্বপনসাগর এল পারায়ে।
 ধরা অধরার মাঝে
 ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।
 বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফুলের গন্ধে মিশে
 জানি নে মন পাগল করে কিসে—
 কোন্ নটিনীর ঘূর্ণি আঁচল লাগে আমার গায়ে।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ସ୍ଵାଗତଶୋଧ

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୨୯

গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ মেঘে।

কেমনে আজকে ভোরে
গেল গো গেল সরে

তোমার ওই আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁয়া লেগে।

কী যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।

সে যে ওই শিউলিদলে
ছড়ালো কাননতলে,

সে যে ওই ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে।

ପାତ୍ରଗଣ

ସମ୍ରାଟ ବିଜୟାଦିତ୍ୟ

ଶେଖର କବି

ଠାକୁରଦାଦା

ଲକ୍ଷ୍ମେଶ୍ବର

ଉପନନ୍ଦ

ରାଜା ସୋମପାଳ

ରାଜଦତ୍ତ

ଅମାତ୍ୟ

ବାଳକଗଣ

ভূমিকা

রাজসভা

সম্রাট বিজয়াদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি।

বিজয়াদিত্য। কী তোমার রাজনীতি?

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শূন্য হতে থাকে।

বিজয়াদিত্য। রাজ্য যতই বাড়বে তাকে রক্ষা করবার দায়ও তো ততই বাড়বে— তা হলে থামবে কোথায়?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

বিজয়াদিত্য। তা হলে তোমার পরামর্শ কী?

মন্ত্রী। আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মানিকপুর আছে সেইটে জয় করে নেবার এই অবসর উপস্থিত হয়েছে।

বিজয়াদিত্য। সেই অবসর আমি দিলুম উড়িয়ে। আমার রাজনীতির কথা আমি তোমাকে বলব?

মন্ত্রী। বলুন।

বিজয়াদিত্য। রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়। রাজ্য হয়েছি বলেই দেখতে পেয়েছি রাজ্যটা কিছুই নয়।

মন্ত্রী। বলেন কী মহারাজ? ওর মধ্যে কোনো সত্যই কি—

বিজয়াদিত্য। ওর মধ্যে একমাত্র সত্য হচ্ছে রাজ্য হওয়া। আমি রাজ্য হতে চাই।

মন্ত্রী। সেইজন্যই তো—

বিজয়াদিত্য। সেইজন্যই তো আমি রাজ্যে লোভ করতে চাই নে। কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্যন্ত টেকে নি—যে সাম্রাজ্য যতই বড়োই হোক। কিন্তু একবারের মতো যে সত্যকার রাজ্য হতে পেরেছে চিরকালের মতো সে বেঁচে রইল।

মন্ত্রী। কিন্তু সৈন্যদল প্রস্তুত আছে।

বিজয়াদিত্য। ভালোই হয়েছে।

মন্ত্রী। তবে কি—

বিজয়াদিত্য। তাদের লাগিয়ে দাও শারদোৎসবের কাজে।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ, শরৎকালে জয়যাত্রায় বেরোবার নিয়ম—মহারাজের পূর্ব-পুরুষেরা—

বিজয়াদিত্য। আমিও বেরোব ঠিক করেছি।

সেনাপতি। তা হলে আদেশ করুন কী ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

বিজয়াদিত্য। তোমাদের কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না।

সেনাপতি। বলেন কী মহারাজ?

বিজয়াদিত্য। আমি একলা যাব।

সেনাপতি। সে কী কথা?

বিজয়াদিত্য। সে তোমরা বুঝবে না। কবি কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি!

শেখর। কী মহারাজ।

বিজয়াদিত্য। আমার পিতার সিংহাসনে এক বছর মাত্র আমি বসেছি—কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে আমার ঘাড়ের চেপে বসেছে। রাজাকে নবীন করবার কী উপায় আমাকে বলে দাও তো।

শেখর। সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা ফেলেন দিকি! ঐ মাটির মধ্যে জীবন-যৌবনের জাদুমন্ত্র রয়েছে।

বিজয়াদিত্য। আমার সিংহাসনের খাঁচার দরজা আমি চিরদিনের মতো খুলে রাখতে চাই—যাতে মাটির সঙ্গে আমার সহজ আনাগোনা চলে।

শেখর। যাতে শিউলির মালার সঙ্গে আপনার মদুস্তোর মালার অদল-বদল হয়। তা হলে এই শরৎকালে আপনার ঐ রাজবেশটা একবার খোলেন—আপন বলে চিনতে কারো ভুল হবে না।

বিজয়াদিত্য। আছে আমার সন্ন্যাসীর বেশ—ধুলোর সঙ্গে তার সুর মেলে। কবি তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শেখর। না মহারাজ, আমাকে যদি সঙ্গে নেন তা হলে আপনার 'পরে মন্ত্রী আর সেনাপতির বিষম অশ্রদ্ধা হবে, আর আমার 'পরে হবে রাগ।

বিজয়াদিত্য। ঠিক বটে। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃ-ঋণ, সে শোধ করবার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই-যে বিশ্ব আমাদের চিন্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে বলা। আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মতো ঝলমল করে উঠল তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিন্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপছে পড়ছে—

গান

আজ শরত তপনে প্রভাত স্বপনে

কী জানি পরান কী যে চায়—

ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে

বিহগ বিহগী কী যে গায়।

বিজয়াদিত্য। তুমি আমাকে ঘরে টিংকতে দিলে না দেখছি। চললেম আমি অমৃতের ঋণ শোধ করতে।

শেখর।

গান

আজ মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

বিজয়াদিত্য। কবি, ভালোবাসা তো দেব, কিন্তু কোথায় দেব?

শেখর। মহারাজ, যেদিন সময় আসে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন বাজে-খরচের দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে। আজ সেই দিন এসেছে—আমার মন দিশেহারা হয়েছে।

গান

আমি যদি রচি গান অথির পরান
সে গান শোনার কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়?
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

বিজয়াদিত্য। বুঝেছি কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অমৃতের ঋণ শোধ করতে বেরোব। তুমি একবার মন্ত্রীকে ডেকে দাও।

[শেখরের প্রস্থান]

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। মন্ত্রী, আমি আজই বাহির হব।

মন্ত্রী। তার আয়োজন—

বিজয়াদিত্য। বিনা আয়োজনে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কী এমন বিশেষ কর্তব্য আছে যে—

বিজয়াদিত্য। আছে কর্তব্য। আমি সেই বীনকারকে ডাকতে যাব।

মন্ত্রী। বীনকার? সেই সুরসেন? আমি এখনই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিজয়াদিত্য। না না, রাজার ডাকে বীণার ঠিক সুরটি বাজে না। আমি তার দরজার বাইরে মাটিতে বসে শুনব, তার পরে যদি ডাক পড়ে তবে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে শুনব।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কী কথা বলছেন?

বিজয়াদিত্য। সিংহাসনে সুর পেঁছায় না। শ্রোতার আসন থেকে আমাকে চিরদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি মাটিতে বসব মেঠো ফুলের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে। কবিকে ডেকে দাও তো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি।

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি, আমার বেরোবার সময় হল। যাবার আগে সেই মেঠো ফুলের গানটা শুনিয়ে দাও।

শেখর।

গান

যখন সারা নিশি ছিলাম শূন্যে
 বিজন ভুয়ে
 মেঠো ফুলের পাশাপাশি;
 তখন শুনোঁছিলাম তারার বাঁশি।
 যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
 স্বপ্নে শোনা সে সুর এ কি
 আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
 এ সুর আমি খুঁজেছিলাম রাজার ঘরে
 শেষে ধরা দিলে ধরার ধূলির 'পরে।
 এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
 আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
 এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, বেতসিনীতীরে পিঞ্জরীতে বীনকার সুরসেনের বাস। যখন আপনি সেখানে যাওয়াই স্থির করেছেন তখন সেইসঙ্গে একটা রাজকার্যও সম্পন্ন করতে পারেন।

বিজয়াদিত্য। সেখানে রাজকার্য আছে না কি?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। পিঞ্জরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্য সভায় সর্বদাই মহারাজের নামে স্পর্ধাবাক্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয়াদিত্য। বড়ো কৌতূহল হচ্ছে, মন্ত্রী। স্তুতিবাক্য অনেক শুনোঁছি, কিন্তু কোনোদিন নিজের কানে স্পর্ধাবাক্য শুনিনি।

মন্ত্রী। ভগবানের কৃপায় কোনোদিন যেন না শুনতে হয়।

বিজয়াদিত্য। রাজা হবার ঐ তো বিড়ম্বনা। পরিহাস করে তোমরা আমাদের বল পৃথিবীপতি কিন্তু পৃথিবীকে সিংহাসনের মাপে ছোটো করে তোমরা আমাদের খেলনা বানিয়ে দিয়েছ—সব দেখা দেখতে পাই নে, সব শোনা শোনবার জো নেই।

মন্ত্রী। যাদের সব দেখাই দেখতে হয়, সব শোনাই শুনতে হয় তারাই তো হতভাগ্য।

বিজয়াদিত্য। সেই হতভাগ্যদের দশাই আমি পরীক্ষা করে দেখব। সোমপালের স্পর্ধাবাক্য আমি নিজের কানে শুনব।

মন্ত্রী। তা হলে শেখরই মহারাজের সঙ্গে যাবেন, আর কেউ না?

শেখর। না মন্ত্রী, এ-যাত্রায় আমার প্রয়োজন নেই। জানলার দরকার হয় যেখানে প্রাচীর আছে—যেখানে খোলা আকাশ সেখানে জানলায় কী হবে—রাজসভায় কবিকে না হলে চলে না।

মন্ত্রী। তোমার কথা বদ্ব্যলেম না।

[প্রস্থান

শেখর। মহারাজ, চার দিকের দ্রুভঙ্গি দেখে বদ্ব্যতে পারছি আপনি চলে গেলে কবির পক্ষে এখানে অরাজক হবে। আমিও আপনারই পথ ধরলেম।

বিজয়াদিত্য। ভালো হল কবি, আজ শরতের নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছি—তুমি সঙ্গে না থাকলে তার প্রতিসম্ভাষণের বাণী পেতেম কোথায়?

বেতসিনী নদীর তীর

বালকগণ

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
কেয়াপাতার নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেগু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষ্মেশ্বর। (ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগুলো তো জ্বালালে। ওরে চোবে। ওরে
গির্ধারিলাল। ধরু তো ছোঁড়াগুলোকে ধরু তো।

ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা
বেরিয়েছে।

লক্ষ্মেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আনু তো; একটাকেও ছাড়িস নে।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা? মার-মর্তি কেন?

লক্ষ্মেশ্বর। আরে দেখো-না! সন্ধ্যা বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না? গান গাইলেও তোমার
কানে খোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শান্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষ্মেশ্বর। গান গাবার বুদ্ধি সময় নেই? আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ
আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে!

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক! হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের
হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে! চল্ তোদের
পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দস্তর নিয়ে বোসো গে! আর হিসেবে
ভুল হবে না।

[লক্ষ্মেশ্বরের প্রস্থান]

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদা চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুরদা আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষ্মেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষ্মেশ্বর। কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে।

[ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার প্রস্থান]

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষ্মেশ্বর। কী রে তোর প্রভু কিছুর টাকা পাঠিয়ে দিলে? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাতে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষ্মেশ্বর। মৃত্যু! মৃত্যু হলে চলবে কেন? আমার টাকাগুলোর কী হবে?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুর নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র!

লক্ষ্মেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র! কী শ্রুত সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ। আমি শ্রুত সংবাদ দিতে আসি নি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলাম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অশ্রুর ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষ্মেশ্বর। বটে! তাই বৃদ্ধি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অশ্রু ভাগ বসাবার মতলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল্ দেখি!

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অশ্রু আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব—তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষ্মেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ঐরকম মরারই স্বভাব।—আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছুর করবে। আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ে না বলছি।

লক্ষ্মেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছলে, সোনার চাঁদ ছলে। টাকাটা ঠিকমত দিয়ে বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

[উপনন্দের প্রস্থান]

ঐ-যে আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয় সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সন্ডুগ হতে আর-এক সন্ডুগে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মতলবটা কী বল্ দেখি।

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই এই বেতসিনীর ধারে আমোদ করবে বলে আসছে—আমাকে ছুটি দিলে আমিও তাদের সঙ্গে খেলি।

লক্ষ্মেশ্বর। বেতসিনীর ধারে! ঐ রে খবর পেয়েছে বৃদ্ধি। বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই

গজমোতির কোটো পুতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্ শীঘ্র চল্, নামতা মদুস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা।

লক্ষেশ্বর। দিন আবার সুন্দর কী রে। এইরকম বৃদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি। যা বলছি, ঘরে যা। (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিস্ত্রী দিন। আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুস্থ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়।

শেখর কবির প্রবেশ

এ লোকটা আবার এখানে কে আসে? কে হে তুমি? এখানে তুমি কী করতে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

শেখর। আমি সন্ধান করতে বেরিয়েছি।

লক্ষেশ্বর। ভাব দেখে তাই বুঝেছি। কিন্তু কিসের সন্ধানে বলা দেখি?

শেখর। সেইটে এখনো ঠিক করতে পারি নি।

লক্ষেশ্বর। বয়স তো কম নয়, তবু এখনো ঠিক হয় নি? তবে কী উপায়ে ঠিক হবে?

শেখর। ঠিক জিনিসে যেমনি চোখ পড়বে।

লক্ষেশ্বর। ঠিক জিনিস কি এইরকম মাঠে-ঘাটে ছড়ানো থাকে।

শেখর। তাই তো শুনছি। ঘরের মধ্যে সন্ধান করে তো পেলেম না।

লক্ষেশ্বর। লোকটা বলে কী? তুমি ঘরে বাইরে সন্ধান করবার ব্যাবসা ধরেছ—রাজা খবর পেলে যে তোমাকে আর ঘরের বার হতে দেবে না। পাহারা বসিয়ে দেবে।

শেখর। আমি রাজাকে সুস্থ এই ব্যাবসা ধরাব—যা মাঠে-ঘাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিদ্যে তাঁকে শেখাতে চাই।

লক্ষেশ্বর। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলো তো।

শেখর। তা হলে একেবারেই বুঝতে পারবে না।

লক্ষেশ্বর। ওহে বাপু, তোমার ঐ সন্ধানের কাজটা ঠিক আমার এই ঘরের কাছটাতে না হয়ে কিছু তফাতে হলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

শেখর। আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্ছে কেন বলো তো।

লক্ষেশ্বর। সত্যি কথা বলব? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাজার চর। কোথা থেকে কী আদায় করা যেতে পারে রাজাকে সেই সন্ধান দেওয়াই তোমার মতলব।

শেখর। আদায় করবার জায়গা তো আমি খুঁজি বটে! তোমার বৃদ্ধি আছে হে।

লক্ষেশ্বর। আছে বৈকি। সেইজন্যেই হাত জোড় করে বলছি আমার ঘরটার দিকে উর্কি দিয়ো না—আমি তোমাকে খুঁশি করে দেব।

শেখর। তোমার চেহারা দেখেই বুঝেছি সন্ধান করবার মতো ঘর তোমার নয়।

লক্ষেশ্বর। আশ্চর্য তোমার বৃদ্ধি বটে। এ নইলে রাজকর্মচারী হবে কোন্ গুণে? রাজা বেছে বেছে লোক রাখে বটে। অকিঞ্চনের মদু দেখলেই চিনতে পার?

শেখর। তা পারি। অতএব তোমার ঘরে আমার আনাগোনা চলবে না।

লক্ষেশ্বর। তোমার উপরে ভক্তি হচ্ছে। তা হলে আর বিলম্ব কোরো না—এইখান থেকে একটুখানি—

শেখর। আমি তফাতেই যাচ্ছি—তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি।

[প্রস্থান]

লক্ষেশ্বর। ‘তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি’। লোকটা যখন কথা কয় সব ব্যাপসা ঠেকে। রাজারা স্পষ্ট কথা সহ্য করতে পারে না, তাই বোধ হয় দায়ে পড়ে এইরকম অভ্যাস করেছে।

[প্রস্থান]

পুঁথি প্রভৃতি লইয়া উপনন্দের প্রবেশ ও একটি কোণে লিখিতে বসে

ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ

গান

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

একজন বালক। ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই: সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর।

গান

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা।

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুরদা, এই বৃষ্টি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন। তোমার সঙ্গে আড়ি। জন্মের মতো আড়ি।

ঠাকুরদাদা। এত বড়ো দণ্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি। না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর।

গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো কে আসছে, ওকে তো কখনো দেখি নি।

ঠাকুরদাদা। পাগড়ি দেখে মনে হচ্ছে লোকটা পরদেশী।

প্রথম বালক। পরদেশী। ভারি মজা!

দ্বিতীয় বালক। আমি পরদেশী হব ঠাকুরদা।

তৃতীয় বালক। আমিও হব পরদেশী—কী মজা!

সকলে। আমরা সবাই পরদেশী হব।

প্রথম বালক। আমাদের ঐরকম পাগড়ি বানিয়ে দাও ঠাকুরদা, তোমার পায়ে পড়ি।

শেখরের প্রবেশ

প্রথম বালক। তুমি পরদেশী?

শেখর। ঠিক বলেছ।

দ্বিতীয় বালক। তুমি কী কর?

শেখর। আমি সব জায়গায়ই দেশ খুঁজে বেড়াই।

তৃতীয় বালক। তার মানে কী, পরদেশী?

শেখর। দেখো-না, শরৎকালে রাজারা দেশ জয় করতে বেরোয়—তার আসল কারণ পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও এখনো তারা দেশ খুঁজে পায় নি, কোনো কালে পাবেও না।

প্রথম বালক। কেন পাবে না?

শেখর। তারা নির্বোধ, মনে করে লড়াই করে দেশ পাওয়া যায়। বিনা লড়াইয়ে যারা জয় করতে জানে তারাই আপন দেশ খুঁজে পায়।

দ্বিতীয় বালক। তুমি খুঁজে পেয়েছ?

শেখর। বড়ো শক্ত। কেননা, মানুষে লুকিয়ে রাখে। ঐ বাড়িটার কাছে সম্মানে গিয়েছিলেম, একটা মানুষ ছুটে এসে বললে, এ তোমার জায়গা নয়, এ আমার।

সকলে। ও বুদ্ধোচ্ছ। লক্ষ্মীপেঁচা।

প্রথম বালক। তার কোর্টরের কাছে গেলেই সে ঠোকর দিতে আসে।

দ্বিতীয় বালক। কিন্তু পরদেশী, আমাদের কাছে তোমার কোনো ভয় নেই।

শেখর। বাবা, তা হলে তোমাদের মধ্যেই আমার দেশ খুঁজে পাব।

গান

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—

ওরা যে ডাকতে জানে।

আশ্বিনে ওই শিউলি শাখে

মৌমাছিরে যেমন ডাকে

প্রভাতে সৌরভের গানে।

ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,

আপন মনে রইল মজে।

হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে

খবর যে তার পৌঁছল রে,

ঘর-ছাড়া ওই মেঘের কানে।

ঠাকুরদাদা। ও ভাই, আমার জায়গা তোমাকে ছেড়ে দিলেম।

শেখর। ছাড়তে হবে কেন? দুজনেরই জায়গা আছে।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে চিনে নিয়েছি। তুমি মন ভোলাতে জান।

শেখর। আমার নিজের মন ভুলেছে বলেই আমি মন ভুলিয়ে বেড়াই।

প্রথম বালক। তার মানে কী পরদেশী? কেমন করে মন ভোলে?

শেখর।

গান

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।

তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।

কেউ বোঝে না তারে,

সে যে বোঝে না আপনারে,

সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না।

তার খেয়া গেল পারে

সে যে রইল নদীর ধারে।

কাজ করে সব সারা

(ওই) এগিয়ে গেল কারা

আনমনা মন সৈদিকপানে দৃষ্টি হানে না।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে ছাড়ছি নে ভাই, নিজের মনের কথা তোমার মুখ থেকে শুনেনে নব।
ছেলেরা। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

শেখর। তোমরা ছাড়লে আমিই বন্ধি তোমাদের ছাড়ব মনে করছ? একবার চার দিকটা ঘুরে আসছি—কোথায় এলুম একবার বন্ধে নিই।

[প্রস্থান]

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো, ঐ দেখো সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ঠুর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ।

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর।

ঠাকুরদাদা। আরে থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই। আপনি কে?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী। হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, বন্ধোছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিবি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেনি—আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ?

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কতদিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী। খুব অল্পদিনের। আমার গুরুদশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুদশায়!

প্রথম বালক। সন্ন্যাসী ঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেরা কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে!

বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এসো ভাই। আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিছুর কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বড়ি কাজ! ভারি তো কাজ! ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না। ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া) আজ ছুটির দিন— কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাছ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই!

উপনন্দ। ঠাকুরদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ। ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে—এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে। ঐ ছেলটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বন্ধুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো। লেখো, লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পন্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে, চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না।

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। সেইজন্যই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল, বাবা-সকল। আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক। দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও-না।

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?

প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না।

উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো?

দ্বিতীয় বালক। কখনো না।

উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক। তা বড়ি পারি নে? আচ্ছা তুমি দেখো।

উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক। কিছুর ভুল থাকবে না!

প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ছেলেরা। এই-যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী।

শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। একি! তুমি পরদেশী না কি?

শেখর। পরদেশী আমার সাজমাত্র, আসলে আমি সবদেশী।

সন্ন্যাসী। সাজের দরকার কী ছিল?

শেখর। 'রাজাকে সাজতে হয় সন্ন্যাসী, রাজা যে কী জিনিস সেই বোঝবার জন্যে। যে-মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চায় তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বড়ো হয়ে বসে আছেন ওটাও ঠুর সাজমাত্র—উনি যে বালক সেটা উনি বার্ষিক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো করে চিনে নিচ্ছেন।

ঠাকুরদাদা। ভাই, এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে!

শেখর। সাজের ভিতর থেকে মানুষকে খুঁজে বের করা, সেই তো আমার কাজ। ঠাকুরদা, আমি আগে থাকতে তোমাকে বলে রাখছি এই যে মানুষটিকে দেখছ, উনি বড়ো যে-সে লোক নন—একদিন হয়তো চিনতে পারবে।

ঠাকুরদাদা। সে আমি কিছু কিছু চিনেছি—নিজের বৃদ্ধির গুণে নয় ঠুরই দীপ্তির গুণে।

সন্ন্যাসী। আর এই পরদেশীকে কিরকম ঠেকছে ঠাকুরদা।

ঠাকুরদাদা। সে আর কী বলব, যেন একেবারে চিরদিনের চেনা।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, আমার পক্ষেও তাই। কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যেন ঠুরে চেনবার জো নেই। উনি যে কিসের খোঁজে কখন কোথায় ফেরেন তা বোঝা শক্ত।

শেখর।

গান

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।

ও সে আছে বলে

আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।

সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়

এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়,

ও সে সঙ্গে থাকে বলে

আমার অঙ্গে অঙ্গে পলক লাগায় দখিন সমীরণে।

তারি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে

আনন্দের কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।

দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়

কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে

আমারে কাজ ভোলায়।

সে মোর চিরদিনের বলে

তারি পলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম বালক। কিন্তু আর লিখতে ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয় বালক। না, আর নয়।

সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক্।

উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।

প্রথম বালক। আচ্ছা পরদেশী, তুমি এত গান গাও কেন?

শেখর। আর কোনো গুণ যদি থাকত তা হলে গাইতেন না। ঐ দেখো-না কেন, তোমাদের সেই লক্ষ্মীপেঁচা তো গান গায় না।

সকলে। না, সে চেঁচায়।

শেখর। তার মানে, সার বস্তুর দ্বারা ভরতি হয়ে ও একেবারে নিরেট।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তোমার দেশের গল্প তুমি আমাদের শোনাবে?

শেখর। আমার দেশের গল্প ভারি অদ্ভুত!

সকলে। আমরা অদ্ভুত গল্প শুনব।

শেখর। আচ্ছা, তা হলে চলো, কোপাই নদীর ধার দিয়ে একবার পারদুলডাঙায় তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি গে। চলতে চলতে গল্প হবে।

সন্ন্যাসী। এই দেখো, ওর সঙ্গে আমরা পারব না—আমাদের সব চেলা ভাঙিয়ে নিলে।

শেখর। ভাঙিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু টিপকিয়ে রাখা শক্ত। এখনই ফিরে আসবে!

[বালকদের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান]

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল।

উপনন্দ। সুরসেন।

সন্ন্যাসী। সুরসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে?

সন্ন্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলাম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল!

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এত বড়ো গুণী! তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এদেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি।

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে জানেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে!

সন্ন্যাসী। তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয়? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন তখন শুনিয়েছিলাম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কিরকমে সম্বন্ধ হল?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আগ্রয়ের জন্যে এসেছিলাম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলাম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেইদিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব; তিনি বললেন বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না। বাবা, লেখো, লেখো। আমরা ততক্ষণ আমাদের দলবলের খবর নিয়ে আসি গে।

[প্রস্থান

শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ

শেখর। বিজয়াদিত্যকে তুমি হার মানাতে চাও, তা হলে আগে ঐ অপূর্বানন্দ সন্ন্যাসীকে বশ করো। রাজা সোমপাল, তিনিও নিশ্চয় তোমার মনের কথা জানেন।

সোমপাল। কোথায় তাঁকে পাব?

শেখর। তিনি এখানেই এসেছেন আমি জানি। কাছাকাছি কোথায় আছেন।

সোমপাল। দেখো আমি লোক চিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোমার দ্বারা আমার কাজ উদ্ধার হবে।

শেখর। তা হতেও পারে, অসম্ভব নয়। বিজয়াদিত্যকে বশ করবার ফন্দি আমি হয়তো তোমাকে কিছু কিছু বলে দিতে পারব।

সোমপাল। দেখো, তোমাকে আমি রাজমন্ত্রী করে দেব।

শেখর। আমার যদি মন্ত্রণা চাও তা হলে আমাকে মন্ত্রী করো না। মন্ত্রণা দেওয়াই যার কাজ তার মন্ত্রণা কোনো রাজার ভালো লাগে না। বিজয়াদিত্যের সভায় যে একজন কবি আছে, আমি দেখেছি—

সোমপাল। আরে ছি ছি, সে-ও আবার কবি হল! ঐ তো রায়শেখরের কথা বলছ?

শেখর। হাঁ, সেই বটে।

সোমপাল। সে আমার বিদুষকেরও যোগ্য নয়।

শেখর। একেবারেই নয়।

সোমপাল। বিজয়াদিত্য যেমন রাজা তার কবিটিও তেমনি।

শেখর। তাই তো অনেকে বলে। তোমার সভায় তাকে—

সোমপাল। আমার সভায় যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কিছুতেই—

শেখর। নিশ্চয়ই। ততক্ষণ সে—

সোমপাল। সে-কথা পরে হবে। এখন সন্ন্যাসীকে তুমি খুঁজে বের করো; দেখা হলেই তাকে আমার রাজসভায় পাঠিয়ে দিও, বিলম্ব করো না। আমি বরং আমার দূতকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[উজ্জয়ের প্রস্থান

সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। উপনন্দ, ঐ যে পরদেশী এসেছে—ওকে দেখে তোমার মনে হয় না কি, তোমার আচার্য সুরসেনেরই ও জর্দা?

উপনন্দ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন তাঁরই বীণা শুনছি।

সন্ন্যাসী। তুমি যেমন তাঁকে পেয়েছিলে তেমনি করেই এই মানুষটিকে পাবে।

উপনন্দ। উনি কি আমাকে নেবেন?

সন্ন্যাসী। ওর মুখ দেখেই কি বুঝতে পার নি?

উপনন্দ। পেরেছি। আমার প্রভুই বুঝি ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কোঁটো পুতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শোধতে এসেছে। তা তো নয় দেখছি! পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা

সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুড়িয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চলে জায়গাটা বের করে দেবে।
উপনন্দ।

উপনন্দ। কী।

লক্ষেশ্বর। ওঠ্ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে। এখানে কী করতে এসেছি।

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা নাকি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু! ভারি সেয়ানা দেখছি! তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই বুদ্ধি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে—কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু। আমি কি শিশু।

সন্ন্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছুর জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার।

ঠাকুরদাদা। আরে কী বলিস লখা। আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রঙবাটা নোড়া দিয়ে তোমার মূখ গুঁড়িয়ে দেব-না? টাকা হয়েছে বলে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না! [সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন]

সন্ন্যাসী। আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধূলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুদ্ধি! ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও, আমি ঠুকে কিছুর ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মূঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিঁধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকুরদা! এক মূঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ। আচ্ছা তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এতদিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলাম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস্, চুকে গেল।

[প্রস্থান]

লক্ষেশ্বর। ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো। এখন কী করি। (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বোসো—এই যে এইখানে—আর একটু বাঁ দিকে সরে এসো—এই হয়েছে। খুব চেপে বোসো। রাজাই আসুক আর সন্ন্যাসীই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খুঁশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে লখা করে কী। হঠাৎ খেপে গেল নাকি।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি—শত্ৰুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাগে ঘুমোতে পারি নে।

[প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ?

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদূত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদূত। আপনি তা হলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদূত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই—এখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সন্ন্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

রাজদূত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হোক আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, তুমিই অপূর্বানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর, শ্রদ্ধা মাপ করতে তো সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা কিছুর ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেরেছি তখন শ্রদ্ধা হাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী। কী বর চাই।

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে—সে অতি যৎসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটেছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে—এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী। আমিও সেই সন্ধানই আছি, আর যেন ঘুরতে না হয়।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

লক্ষ্মেশ্বর। ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেরানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে?

লক্ষ্মেশ্বর। (কাছে ঘেষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে) সন্ধান কিছুর পেয়েছ?

সন্ন্যাসী। কিছুর পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষ্মেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষ্মেশ্বর। ও বাবা! সে তো কম কথা নয়। তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের চণ্ডলা ঠাকুরদুর্নীটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দখানিই বাঁধা থাকবে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠবে? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষ্মেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যবসা চলবে।

লক্ষ্মেশ্বর। শেষকালে দু কল যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তল্লি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারো কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব। ঐ রে রাজা আসছে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দীগণের গান

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দুঃখদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সংকট শরণ্য তুমি দৈন্যদুঃখহারী,
মুগ্ধ অবরোধ তব অভ্যুদয় হে!

রাজা সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জয় হোক। কী বাসনা তোমার।

সোমপাল। সে-কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরুর করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

সোমপাল। পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সোমপাল। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

সোমপাল। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

সোমপাল। মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নেই।

সোমপাল। তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী সন্ন্যাসীকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

সোমপাল। কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে—সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে।

সোমপাল। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব—তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুশি হবে।

সোমপাল। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যস্ত করে বলেছে এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না!

সোমপাল। তবে বিদায় হই। প্রণাম!

[প্রস্থান]

(পদুমচ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

সোমপাল। বল কী ঠাকুর! হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলাম। অ্যাঁ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ!

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে, আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বদ্বিষয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

সোমপাল। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুলো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

সোমপাল। প্রণাম!

[প্রস্থান]

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা!

উপনন্দ। মনে করেছিলাম লক্ষ্মেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগদূলি বেজে উঠল—অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষ্মেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে—মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যি বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক বলে ছোটো জাত বলে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী। তাই নাকি?

উপনন্দ। তুমি জান না বুঝ?

সন্ন্যাসী। তা হবে। না-হয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনামূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজ-ভান্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যি বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর, এও কি সম্ভব?

সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষ্মেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগদূলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারো প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ে না।

উপনন্দ। তা হলে চললুম ঠাকুর। তোমার কথা শুনলে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

[প্রস্থান]

লক্ষ্মেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষ্মেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম—পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায়-হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষ্মেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

লক্ষ্মেশ্বর। (মাটি ও শূঙ্কপত্র সরাইয়া কোঁটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘুরে

বোঁড়িয়েছি। এই-যে গজমোতি, এ আমি তোমাকে আজ প্রথম দেখালাম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বোঁড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হালকা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি আমার বন্ধুর ভিতরে যেন গদুর্গদুর্ করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছে থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মর্শাকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাগে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী। সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষ্মেশ্বর। সেই তো মর্শাকিলের কথা। আমি দেখছি, এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে, হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষ্মেশ্বর। তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয়, আমি মরে গেলে কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পশ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। ওহে পরদেশী, তুমি তো মানুষের ভিতরকার মতলব সব দেখতে পাও। তুমি জান আমি বোরিয়েছিলুম বিশ্বের ঋণশোধ করতে।

ঠাকুরদাদা। কী ঋণ প্রভু, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন না?

সন্ন্যাসী। আনন্দের ঋণ ঠাকুরদা। শরতে যে সোনার আলোয় সুধা ঢেলে দিয়েছে— তার শোধ করতে চাই যদি তো হৃদয় ঢেলে দিতে হবে। ওহে উদাসী, তুমি বল কী?

শেখর।

গান

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া

তোমায় আমায়

জনম জনম এই চলেছে

মরণ কভু তারে থামায়?

যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি,

আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়।

ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তার ধারি ধার,

আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তার।

আমার শরৎ-রাতের শেফালি বন
সৌরভেতে মাতে যখন,

তখন পালটা সে তান লাগে তব
শ্রাবণ-রাতের প্রেম বরিষায়।

সন্ন্যাসী। এই ঋণশোধের ছবি আমি দেখে নিলেম ঐ উপনন্দের মধ্যে। ঐ তো প্রেমের ঋণ প্রেম দিয়ে শোধছে। উপনন্দকে তুমি দেখেছ?

শেখর। হাঁ তাঁকে দেখে নিয়েছি, বন্ধুও নিয়েছি। ছেলেদের মধ্যে উপনন্দ আর ঠাকুরদা এই দুই নাম বাজছে। তাদের কাছে থেকে ওর সব খবর পেলুম।

সন্ন্যাসী। ওকে সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে।

শেখর। ঐ দুঃখের রতনমালা বিশ্বের কণ্ঠে বলমল করছে।

গান

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুঃখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মৃগুহার।
চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বন্ধু শোভা পাবে আমার
দুঃখের অলংকার।
ধনধান্য তোমারি ধন
কী করবে তা কও,
দিতে চাও তো দিয়ো আমার,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোমার প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস,
এ মোর অহংকার।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি এখানে এসে জুটেছে। (চোখ টিপিয়া) ঠাকুরদা, একে চিনতে পেরেছ কি, ইনি একজন সন্ধানী লোক।

শেখর। সেইজন্যেই তো তোমাকে ছেড়ে এখন একে ধরেছি।

লক্ষেশ্বর। একে দেখে ঠাউরেছ ঠুর সগুয় কিছু আছে, আমার মতো অকিঞ্চন না।

শেখর। ঠিক বটে। সেইজন্যে লেগে আছি, আদায় না করে ছাড়ছি নে।

লক্ষেশ্বর। কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে মিলে চুপিচুপি কী পরামর্শ করছিলে বলো দেখি?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। অ্যাঁ! এরই মধ্যে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মের আমদানি করবে? তবেই হয়েছে। তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না

অমনি তাড়াতাড়ি অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু এ-সব কি ঠাকুরদার কর্ম। ঠুর পুঁজিই বা কী।

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি না কি ঠাকুরদা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ! তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো, স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তা হলে এতদিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্ধ্বস্বরে চোবে, তেওয়ারি, গিরধারিলালকে হাঁক পাড়িছিলে!

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু বলে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ঐ। সেইজন্যেই কারো কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ে না!

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই। ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। ঐ দেখছ-না দূরে—আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে! সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক তুমি যে-রকম আলাগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারো কাছে ফাঁস কোরো না—অংশীদার আর বাড়িয়ে না।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, ‘পুত্র দাও’ ‘ধন দাও’ করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ঐ যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল বলে।

[দ্রুত প্রস্থান

শেখরকে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। কী বাবা।

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সন্ন্যাসী। এই পরদেশীকে তোমাদের সহায় করো, এ মানুষটি সকল খেলাই খেলতে জানে।

প্রথম বালক। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তুমি বলে দাও আমাদের কী করতে হবে।

শেখর। আচ্ছা, তা হলে চলো তোমাদের সাজিয়ে নিয়ে আসি গে।

[বালকগণকে লইয়া কবির প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

ঠাকুরদাদা। এই যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও যেন খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন।

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কী সহজে মেলে। আমি একদল ছেলেকে নিয়ে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী খেলাছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো ফেলো, তোমার জটা ফেলো!

চতুর্থ ব্যক্তি। ওরে দেখ্ না গেরুয়া পরেছে! কিন্তু এটা দামি জিনিস রে।

প্রথম ব্যক্তি। বাবা, তোমার এই শখের সন্ন্যাসীর সাজ কেন।

সন্ন্যাসী। আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কবির কাছে? এ যে শূনি নতুন কথা। আমাদের গাঁয়ে আছে ভূষণ কবি, কৈবস্তুর পো, লেখে ভালো, কিন্তু দীক্ষা দিতে এলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতুম-না!

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে।

সন্ন্যাসী। যদি-বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভন্ড নাকি?

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছ্ শিখেছ?

সন্ন্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা—সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণ-পুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্য বেঁচে আছে। না, হাসছ কী, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে, চল্ রে, বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে-কথা আমি তো তখনই বলেছিলাম। আজকালকার দিনে কি আর সে-রকম যোগবল আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল!

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল্-না ভাই, কোন্ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

লক্ষ্মেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষ্মেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্ত্র যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মূর্খকিলেই ফেলেছ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক গে ও-সব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে

ঠাকুরদাই জিতলে-বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুরদা! ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার! কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না—আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না।

[প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুদ্ধি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! এবারে সকলে মিলে শারদোৎসবের আবাহন গানটি ধরো। কবি, তুমি ধরিয়ে দাও। ঠাকুরদা, তুমিও যোগ দিয়ে।

গান

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি-পর্বতে।
এসো মৃকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা।
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পার্তিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জর তান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে স্করদুগ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
অঁধার হইবে আলা।

শেখর। পেঁচেছে, গান আকাশের পারে গিয়ে পেঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছি কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছি না? আচ্ছা তা হলে আগে ধ্যানের গানটি গেয়ে নিই।

গান

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।
 দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
 কোন্ সাগরের পার হতে আনে
 কোন্ সুদূরের ধন!
 ভেসে যেতে চায় মন,
 ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
 সব চাওয়া সব পাওয়া।
 পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
 গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
 মৃখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
 ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
 ওগো কান্ডারী, কে গো তুমি, কার
 হাসিকান্নার ধন।
 ভেবে মরে মোর মন
 কোন্ সুরে আজ বাঁধবে যন্ত্র
 কী মন্ত্র হবে গাওয়া।

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক। কই দেখিয়ে দাও-না।

শেখর। ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।

শেখর। ঐ-যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক। কিসে?

শেখর। কিসে! এই তো স্পর্শই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।

শেখর। তবে আর-কি! চক্কু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ-না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।

গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
 আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

শেখর। সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে আসি গে।

[ছেলেদের লইয়া গাহিতে গাহিতে শেখরের প্রস্থান]

লক্ষ্মণবরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল! লখা গেরুয়া ধরেছে যে!

লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কোঁটো—এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভু! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্তই তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা করো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ। একটু বিশ্রাম করো।

সোমপাল। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মূখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে—তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী। বল কী। বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিংকতে দেয় নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

সোমপাল। কী সর্বনাশ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন!

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দৃষ্টিত্ব হলে চলবে কেন? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার উদ্যোগে ছিলে।

সোমপাল। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে—তা সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দৃষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি; তুমি তাঁকে বোলো সে-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমি কি এমন উন্মত্ত? আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে?

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা!

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু?

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি গেরুয়া পরে এবং গুঁড়কতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলাম আর ঐ চক্রবর্তী সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দল্লভ উৎসব কেবল নটাই করতে পারে। লোকটা কী রকম দল্লভাঙ্গা দেখেছ!

সোমপাল। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে।

সন্ন্যাসী। ঐ বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

সোমপাল। আরে, চুপ চুপ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি। তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তুমি মনেই রেখে দাও!

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

সোমপাল। কী মর্শকিলেই পড়লেম! সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্-না! ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ! এখান থেকে যাও-না!

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কি আছে! একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য!

[ভূমিস্ত হইয়া প্রণাম]

সোমপাল। আরে করেন কী, করেন কী! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, পূর্বেই তো বলেছিলাম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি কিন্তু গুরুদশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু এ কী কান্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতছি। এই কয় দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচর্যা পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি! কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর।

লক্ষ্মেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

সোমপাল। মহারাজ দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলাম।

সোমপাল। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ আমার হার মেনে আনন্দ।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর! এ কী, রাজা যে! এরা সব কারা!

[পলায়নোদ্যম]

সন্ন্যাসী। এসো এসো বাবা, এসো। কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরন্তর) এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা। ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম এই কদিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কাষাপণ আমি লক্ষ্মেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বলো বাবা!

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি নেবে!

সন্ন্যাসী। নেব বৈকি। তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষ্মেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি!

সন্ন্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী। আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কাষাপণ গুণে দাও।

শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন।

সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ঠুর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য করেছিলাম যে আমার এমন ভাগ্য হল!

সন্ন্যাসী। ওগো সদ্ভূতি!

মন্ত্রী। আজ্ঞা!

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল!

মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ! তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী। ইনি যে-গৃহে জন্মেছেন সে-গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন—পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ।

সন্ন্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি, এই তোমাকে ফিরে দিলাম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে!

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মূঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মূঠি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মূঠি দেখেই কথাটা পেড়েছিলাম।

সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড় তাকাচ্ছে।

[প্রস্থান]

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সোমপাল। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—

সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

সোমপাল। যাকে ইচ্ছা নাম করুন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। না-হয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী। বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

সোমপাল। কেবল মাত্র একে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সন্নিবিধা হবে না, আমি একেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায়, তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজস্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি!

ঠাকুরদাদা। কারো পালাবার পথ কি রেখেছ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে। ঐ আসছে।

শেখরের সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এসো বাবা, সব এসো।
সকলে। একী! এ যে রাজা! আরে পালা, পালা!

[পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা। আরে পালাস নে! পালাস নে!

সন্ন্যাসী। তোমরা পালাবে কী, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে,
আমি যাবি।

সোমপাল। যে আদেশ।

[প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি এইবার এখানে গান শেষ করি।
শেখর। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!
আলো ছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মূখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে!
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শূনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নৃপদর বাজে—
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষণ-গলা সুধা ঢেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!

শেষরক্ষা

প্রকাশ : ১৯২৮

নাটকের পাত্রগণ

চন্দ্রকান্ত	ক্ষান্তমণি
বিনোদ	ইন্দুমতী
গদাই	কমলমুখী
নিবারণ	বুড়ি
শিবচরণ	ঠাকুরদাসী
ভৃত্য	
নলিনাক্ষ	
শ্রীপতি	
ভূপতি	
ললিত	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিবারণবাবুর বাসা

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। কী আর বলব আমি তোকে, আমার তো হাড় জ্বালাতন। আমার ঘরে যতগুলো লোক জোটে সব চেয়ে লক্ষ্মীছাড়া হচ্ছে ঐ বিনোদ।

ইন্দু। সেইজন্যেই লক্ষ্মীদের মহলে সব চেয়ে তার পসার ভারি—লক্ষ্মী যে ছাড়ে লক্ষ্মী তারই পিছনে পিছনে ছোটে।

ক্ষান্তমণি। কেন ভাই, তোর ওকে পছন্দ নাকি?

ইন্দু। আরেকটু হলেই হতে পারত। কিন্তু সে ফাঁড়া কেটে গেছে।

ক্ষান্তমণি। কী করে কাটল?

ইন্দু। দিদি আগেই তাকে পছন্দ করে বসে আছে। আমাকে আর সময় দিলে না।

ক্ষান্তমণি। বলিস কী! কমল নাকি? সে ওকে দেখলে কখন?

ইন্দু। দেখে নি। সেইটেই তো বিপদ। শব্দভেদী বাণের কথা রামায়ণে শোন নি?

ক্ষান্তমণি। শুনছি।

ইন্দু। সব চেয়ে শক্ত বাণ হল সেইটে। শব্দের রাস্তা বেয়ে কখন এসে বন্ধকে বেঁধে, কেউ দেখতেই পায় না।

ক্ষান্তমণি। একটু ভাই, বুঝিয়ে বল। তোদের মতো আমার অত পড়াশুনো নেই।

ইন্দু। সেইটেতেই তোমার রক্ষে। নইলে কেবল পড়াশোনার জোরেই মরণ হতে পারত, দেখা-শোনার দরকার হত না। তোমার বিনোদবাবু যে কবি তা জান না!

ক্ষান্তমণি। তা হোক-না কবি, হয়েছে কী?

ইন্দু। কমলদিদি ওর বই লুকিয়ে পড়ে। সেইটেই খারাপ লক্ষণ। বিনোদবাবুর ‘আঙুরলতা’ বইখানা ওর বালিশের নীচে থাকে। আর তার ‘কাননকুসুমিকা’ রেখেছে ধোবার বাড়ির হিসেবের খাতার তলায়।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু ওর মুখে তো বিনোদবাবুর নামও শুনিনি।

ইন্দু। নামটা বন্ধের মধ্যে বাসা করেছে, তাই মুখে বের হতে চায় না।

ক্ষান্তমণি। কী যে বলিস, বুঝতে পারি নে—ওর লেখায় এমন কী মন্ত্র আছে বল তো। আমাকে একটু নমুনা দে দেখি।

ইন্দু। তবে শোনো—

রসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে,
অন্তরে জোগায় সে যে বাণী।
সময় পায় না অর্থি মজিবারে রূপে,
গোপনে স্বপনে তারে জানি।

ক্ষান্তমণি। হায় রে, কী শব্দভেদী বাণেরই নমুনা!

ইন্দু। কমলদিদি খাতায় লিখে রেখেছে, এই ওর জপের মন্ত্র। শব্দভেদী বাণের যে জোর কত তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাও?

ক্ষান্তমণি। চাই বৈকি, জেনে রাখা ভালো।
ইন্দ্র। (নেপথ্যে চাহিয়া) দিদি! দিদি!

সেলাই হাতে কমলের প্রবেশ

কমল। 'কেন? হয়েছে কী?

ইন্দ্র। এখনো বিশেষ কিছু হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? বিধাতা আমাদের চেয়েও পর্দানিশীন, আড়ালে বসে বসে তোমার সাধের স্বপনকে মূর্তি দিচ্ছেন।

কমল। সে খবর দেবার জন্যে তোমায় ডাকাডাকি করতে হবে না।

ইন্দ্র। তা জানি ভাই, খবর পাকা হলে বিধাতা আপনাই দূত পাঠিয়ে দেবেন। আমি সেজন্যে ভাবিও নি। সখীপরিষদে আমাকে গান গাইতে ধরেছে। স্বরলিপি থেকে তুমি যে নতুন গানটি শিখেছ, আমাকে শিখিয়ে দাও। ক্ষান্তদিদিও সেইজন্যে বসে আছেন—আমি জানি, তোমার গান উনি চন্দ্রবাবুর চটি জুতোর আওয়াজের প্রায় সমতুল্য বলেই জানেন।

ক্ষান্তমণি। ইন্দ্রের কথা শোনো একবার! এ আবার আমি কবে বললুম!

ইন্দ্র। তা হলে সমতুল্য বলাটা ভুল হয়েছে, তার চেয়ে নাই কিছু নীরসই হল। সে তর্ক পরে হবে, তুমি গান গাও।

কমল।

গান

ডাকিল মোরে জাগার সাথী।

প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে,

প্রভাত হল আঁধার রাত।

বাজায় বাঁশি তন্দ্রাভাঙা,

ছড়ায় তারি বসন রাঙা,

ফুলের বাসে এই বাতাসে

কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।

গোপনতম অন্তরে কী

লেখনরেখা দিয়েছে লেখি!

মন তো তারি নাম জানে না,

রূপ আজিও নয় যে চেনা,

বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে

রেখেছি তারি আসন পাতি।

ইন্দ্র। ক্ষান্তদিদি, ঐ চেয়ে দেখো, বাণ পৌঁছেছে!

ক্ষান্তমণি। কোথায়?

ইন্দ্র। আমাদের এই গলির আকাশ পার হয়ে, ঠেকেছে গিয়ে তোমাদের বাড়ির ঐ দরজাতে।

ক্ষান্তমণি। ইন্দ্র, তুই স্বপ্ন দেখাছিস নাকি?

ইন্দ্র। ঐ দেখো-না, তোমাদের বন্ধ দরজার খড়্‌খড়ে খুলে গেছে।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখছি।

ইন্দ্র। কমলদিদি, বুঝতে পেরেছ?

কমল। আঃ, কী যে বকিস তার ঠিক নেই।

ইন্দ্র। ঐ খোলা খড়্‌খড়ির ফাঁক দিয়ে কবিকুঞ্জবনের দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত। ঐ খড়্‌খড়ির পিছনে একটা ধড়্‌ফড়ানি দেখতে পাচ্ছ?

কমল। কিসের ধড়্‌ফড়ানি?

ইন্দ্র। সেই খবরটাই তো চোখের আড়ালে রয়ে গেল।

গান

হায় রে,

ওরে যায় না কি জানা!

নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়,

পায় না ঠিকানা।

অলখ পথেই যাওয়া-আসা,

শূনি চরণধ্বনির ভাষা,

গন্ধে শূদ্ধ হাওয়ায় হাওয়ায়

রইল নিশানা।

কেমন ক'রে জানাই তারে,

বসে আছি পথের ধারে।

প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা

আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা,

ঝরে-পড়া বকুলদলে

বিছায় বিছানা।

ক্ষান্তমণি। ওলো ইন্দু, দেখ্ দেখ্ খড়্ খড়ে আরো ফাঁক হয়ে উঠল যে!

ইন্দু। এবার তুমি যদি গান ধর তা হলে দেয়ালসুন্দর ফাঁক হয়ে যাবে!

ক্ষান্তমণি। আর ঠাট্টা করতে হবে না, যাঃ। তোর কথা শুনলে ভেবেছিলুম, একা কমলই বৃষ্টি শব্দভেদী বাণের তীরন্দাজ; বিধাতা কি তোদের সকলেরই গলায় বাণ বোঝাই করেছেন। হাতের কাছে এত বিপদ জমা আছে, এ তো জানতুম না।

ইন্দু। সৃষ্টিকর্তা সংকল্প করেছেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে—তারই সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েছে। সবাই ছুটে আসছে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে; কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুণ্ঠিত কেশকলাপ; কারো বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনাযোগে বুক-জ্বালানি রান্না।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু তোদের সব বাণই কি ঐ একটা খড়্ খড়ে দিয়ে গলবে নাকি?

ইন্দু। কবির হৃদয়টা দরাজ, বড়ো বোনের পাকা হাত আর ছোটো বোনের কাঁচা হাত কারো লক্ষ্যই ফসকায় না।

ক্ষান্তমণি। তা যেন হল, তার পরে অংশ নিয়ে তোদের মামলা বাধবে না?

ইন্দু। তাই তো বলে রেখেছি, আমি দাবি করব না।

কমল। এত নিঃস্বার্থ হবার দরকার কী?

ইন্দু। কমলদিদি, জীবনের অজ্ঞানশাস্ত্রে পুরুষরা আছে গুণের কোঠায়, মেয়েরা ভাগের কোঠায়। ওদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দ্বিগুণ, আমাদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দ্বভাগ। তাই তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি—নইলে দুই বোনে মিলে ঐ খড়্ খড়েটার কব্জা এতদিনে ঝরঝরে করে দিতুম।

কমল। কেন, রাস্তা কি আমি ছাড়তে জানি নে?

ইন্দু। আমি ঠুর কবিতা-বিছানো রাস্তায় এক পা চলতে পারব না। মানেই বৃষ্টিতে পারি নে—হুঁচট খেয়ে মরব।

ক্ষান্তমণি। তোরা দুজনে মিলে রফানিস্পত্তি করে নে, আমার কাজ আছে, যাই।

ইন্দু। বেলা গিয়েছে, এখন আবার তোমার কাজ?

ক্ষান্তমণি। যত বেকারের দল, কখন কী খেয়াল যায় ঠিক নেই। হয়তো হঠাৎ হুকুম হবে, তপসি মাছ ভাজা চাই; নয়তো কড়াইশুঁটির কচুরি, নয়তো হাঁসের ডিমের বড়া।

ইন্দু। একটু দাঁড়াও, আমরাও যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কর্মবিভাগ করে নেব। আমরা লাগব

চেখে দেখবার কঠিন কাজে। কমলদিদি, ঐ দেখো, খড়্‌খড়টা লুপ্ত চকোরের চণ্ডুর মতো এখনো হাঁ করে রয়েছে। দেখে দুঃখ হচ্ছে।

কমল। এত দয়া যদি তো সূধা তুমিই ঢালো-না। আমি চললুম।

ইন্দ্র। না, দিদি।

গান

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোনখানে যে মন লুকানো দাও বলে।
চপল লীলা ছলনাভরে
বেদনখানি আড়াল করে,
যে বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে।

হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা
হায় রে অভিমানিনী নারী,
বিরহ হল দ্বিগুণ ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও বলে।

আচ্ছা ভাই, ক্ষান্তদিদি, ঐ খড়্‌খড়ের পিছনে কোন্‌ মানুষটি বসে আছে আন্দাজ করো দেখি। চন্দ্রবাবু?

ক্ষান্তমণি। না ভাই, তার আর যাই দোষ থাক, তাদের শব্দভেদী বাণ তাকে পেঁছয় না, সে আমি খুব দেখে নিয়েছি।

ইন্দ্র। অর্থাৎ, আমাদের চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো দাগ পড়ে না। তোমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলে আর কে আছে নাম করো দেখি।

ক্ষান্তমণি। আর-একজন আছে, তার নাম গদাই।

ইন্দ্র। আরে, ছি ছি, ছি ছি! অমন নাম যার তার খড়্‌খড়ে চিরদিন যেন বোজা থাকে।

ক্ষান্তমণি। নাম শুনেই যে তোর—

ইন্দ্র। নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈবদুর্যোগে গদাই যদি ‘কাননকুসুমিকা’র কবি হত তা হলে কবির নাম জপ করবার সময় দিদি কী মূর্শকিলেই পড়ত। ভক্তি হত না, সূতরাং মূর্খিও পেত না।

কমল। দিদির মূর্তির জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এখন নিজের কথা চিন্তা করবার সময় হয়েছে।

ইন্দ্র। সেইজন্যেই তো নাম বাছাই করতে লেগে গেছি। সময় নষ্ট করতে চাই নে। আমার স্বয়ংবরসভায় নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

কমল। তা হলে এইবেলা তোমার পছন্দসই নামের একটা ফর্দ করা যাক। কুমুদ কিরকম?

ইন্দ্র। চলে যায়।

কমল। নিকুঞ্জ?

ইন্দ্র। চলতেও পারে, কিন্তু উপবাসের মুখে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে।

কমল। পরিমল?

ইন্দ্র। মালাবদলের সময় নাম-বদল করতে হবে, সে হবে ইন্দ্র আমি হবে পরিমল। যা হোক এগুলো চলতেও পারে—কিন্তু গদাই? নৈব নৈব চ।

ক্ষান্ত। কী যে পাগলামি করছিস ইন্দ্র! চল, আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাসা

চন্দ্র। ভাই বিন্দা, তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, আজ তোমার ভালোমন্দ একটা-কিছু হল বলে, কিংবা হয়েই বসেছে।

বিনোদ। তাই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। আজ তোমার দৃষ্টিটা ছুটেছে যেন কোন্‌ মায়ামৃগীর পিছু পিছু। গেছে তার পথ হারিয়ে! ওহে, আজকের হাওয়ায় তোমায় গায়ে কারো ছোঁয়াচ লাগছে নাকি?

বিনোদ। কিসে ঠাওরালে?

চন্দ্রকান্ত। মুখের ভাবে।

বিনোদ। ভাবটা কিরকম দেখছ?

চন্দ্রকান্ত। যেন ইন্দ্রধনু উঠেছে আকাশে, আর তারই ছায়াটা শিউরে উঠছে নদীর ঢেউয়ে।

বিনোদ। বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় জুইগাছের গাঁঠে গাঁঠে কুঁড়ি ধরল বলে, আর দেরি নেই।

বিনোদ। আরো কিছুর আছে?

চন্দ্রকান্ত। যেন—

নব জলধরে বিজুরী-রেহা

স্বন্দর পসারি গেলি।

বিনোদ। থামলে কেন, বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন বাঁশিটি আজ ঠেকেছে এসে গুণীর অধরে। সত্যি করে বল্‌ ভাই, লুকোস্‌ নে আমার কাছে।

বিনোদ। তা হতে পারে। একটা কোন্‌ ইশারা আজ গোখুলিতে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছতেই ধরতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। ইশারা উড়ে বেড়াচ্ছে! সেটা প্রজাপতির ডনায় নাকি?

বিনোদ। যেন অন্ধ মৌমাছির কাছে রজনীগন্ধার গন্ধের ইশারা।

চন্দ্রকান্ত। হায় হায়, হাওয়াটা কোন্‌ দিক থেকে বইছে, তার ঠিকানা পেলো না?

বিনোদ। পোস্ট-আপিসের ঠিকানাটা পাওয়া শক্ত নয় চন্দ্রদা! কিন্তু স্বর্ণরেণু কোথায় আছে লুকিয়ে সেই ঠিকানাটাই—

চন্দ্রকান্ত। সর্বনাশ করলে! এরই মধ্যে স্বর্ণের কথাটা মনে এসেছে? সাদা ভাষায় ওর মানে হচ্ছে পণের টাকা—তোমার রজনীগন্ধার গন্ধটা তা হলে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের দিক থেকেই এল বুঝি?

বিনোদ। ছি ছি চন্দ্র, এমন কথাটাও তোমার মুখ দিয়ে বেরোল! আমি তুচ্ছ টাকার কথাই কি ভাবছি?

চন্দ্রকান্ত। আজকালকার দিনে কোন্‌টা তুচ্ছ, কন্যাটা না পণটা, তার হিসেব করা শক্ত নয়। যুবকরা তো সোনার মৃগ দেখেই ছোটে, সীতা পড়ে থাকেন পশ্চাতে।

বিনোদ। যুবক যে কে, সে কি তার বয়স গুণে বের করতে হবে, আর সোনার রেণু যে কাকে বলে সে কি বুঝবে তার ভরি ওজন করে?

চন্দ্রকান্ত। এটা বেশ বলেছ, তোমার কবিতায় লিখে ফেলো হে, কথাটা আজ বাদে কাল হারিয়ে না যায়। আমার একটা লাইন মনে এল, তুমি কবি, তার পাদপূরণ করে দাও দেখি—

ও ভোলা মন, বল্‌ দেখি ভাই,

কোন্‌ সোনা তোর সোনা।

বিনোদ।

কেনাবেচার দেনালেনায়

যায় না তারে গোনা।

চন্দ্রকান্ত। ভালা মোর দাদা! আচ্ছা, আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, বল্ সে সোনা

কেমন ক'রে গলে।

বিনোদ।

গলে বুকের দুখের তাপে,

গলে চোখের জলে।

চন্দ্রকান্ত। বহুৎ আচ্ছা! আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সেই সোনা তোর

কোন খনিতে পাই?

বিনোদ।

সেই বিধাতার খেলালে, যার

ঠিক-ঠিকানা নাই।

চন্দ্রকান্ত। ক্যা বাৎ! আচ্ছা, আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সোনার সে ধন

রাখবি কেমন করে?

বিনোদ।

রাখব তারে ধ্যানের মাঝে

মনের মধ্যে ভরে।

চন্দ্রকান্ত। বাস্, আর দরকার নেই, ফুল মার্ক পেয়েছ—পাস্‌ড্ উইথ অনার্স। আর ভয় নেই, সম্বন্ধে বেরিয়ে পড়া যাক—

সোনার স্বপন ধরুক-না রূপ

অপরূপের হাটে।

সোনার বাঁশি বাজাও, রসিক,

রসের নবীন নাটে।

বিনোদ। চন্দ্রদা, কে বলে তুমি কবি নও?

চন্দ্রকান্ত। ছায়ায় পড়ে গেছি ভাই, চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে—তোমরা না থাকলে আমিও কবি বলে চলে যেতে পারতুম, কবিসম্মিট নাও যদি হতুম অন্তত কবি-তালুকদার হওয়া অসম্ভব ছিল না। দেখেছি, প্রাণের ভিতরটাতে মাঝে মাঝে রস উছলে ওঠে, কিন্তু তার ধারাটা মাসিকপত্র পর্যন্ত পৌঁছয় না।

বিনোদ। ঘরে আছে রসসমুদ্র, সেইখানেই লুপ্ত হয়ে যায়!

চন্দ্রকান্ত। এক্সেলেণ্ট্। কবি না হলে এই গদ্য খবর আন্দাজ করতে পারত কে বলো। ঐ যে আসছে আমাদের মেডিক্যাল স্টুডেন্ট।

গদাইয়ের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। এই যে গদাই! শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে? তোমার বাবা জানলে যে শিউরে উঠবেন।

গদাই। না ভাই, প্যাথলজি স্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংসর্গটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হৃদয়টা যে সর্বদাই আইটাই করছে সেটা অজীর্ণ রোগের একটি নামান্তর তা জানিস? বেশ ভালো করে আহাৰ্‌টি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে যেতে পারে না। আধ-পেটা করে খাও, অম্বলের ব্যাঘাট বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিলপক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে; জানলার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাও, যা চাও সেটি যে বাই-কার্বোনেট-অফ-সোডা তা কিছুতেই বন্ধুতে পার না।

চন্দ্রকান্ত। হৃদযন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরেই, এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

গদাই। ঐ যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো, তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষুধ বের হবে।

চন্দ্রকান্ত। হবে বৈকি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে—‘হৃদয়-বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ! বিরহনিবারণী বটিকা; রাতে একটি সকালে একটি সেবন করিলে বিরহভার একেবারে নিঃশেষে অবসান।’

আচ্ছা ভাই বিন্দু, এক কথায় বলে দে দেখি, কিরকম মেয়ে তোর পছন্দ।

বিনোদ। আমি কিরকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়, পালাতে গেলে যে ধরে টেনে নিয়ে আসে।

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। যে কোনো কালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই! পাওয়া শক্ত। আমরা ভুস্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকালে পড়া পুঁথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢল্ ঢল্ করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে আসছে, কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ! আচ্ছা, সে যেন হল, আর চেহারা কেমন?

বিনোদ। ছিপ্‌ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যের মতো চোন্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে; এ দিকে মল্লিনাথ, ভারত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপণ্ডানন তার টিকে-ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিন্দু, চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদ। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করি নে, কিন্তু ভাই, সে গদ্য, তাতে ছাঁদ নেই, টিল কলমে লেখা।

গদাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই! আবার তোমার কিরকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। তোরা বুঝবি নে, গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অল্প একটু আমেজ আছে; সুযোগ ঘটলে ললিতলবঙ্গলতার সঙ্গে ছন্দের মিল হতেও পারত। চাঁদের আলোয় মূখের দিকে চেয়ে বেলফুলের মালা হাতে প্রেয়সী যদি বলত—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু

নয়ন না তিরপিত ভেল

নেহাত অসহ্য হত না। প্রেয়সী সর্বদা এসেও থাকেন, কিছুই যে বলেন না এত বড়ো বদনাম দিতে পারব না। কিন্তু বাক্যগুলো, বিশেষত তার সুরটা, এমনটি হয় না—

গোড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

গদাই। দেখো চন্দরদা, বিয়ে করবার প্রসঙ্গে পছন্দ করার কথাটা একেবারেই খাটে না। বিয়েটা হলো মনোথিইজ্‌ম আর পছন্দটা হল পলিথিইজ্‌ম। দুটোর থিওলজি একেবারে উলটো। বিয়ের ডেফিনিশন্‌ই হচ্ছে জন্মের মতো পছন্দ-বায়ুটাকে খতম করে দেওয়া। তেত্রিশ কোটিকে একের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জন করা।

পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদ। ঐ শোনো, গান।

গদাই। কার গান হে?

চন্দ্রকান্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই-না। পরে পরিচয় দেব।

নেপথ্যে গান

কাছে যবে ছিল, পাশে

হল না যাওয়া।

চলে যবে গেল, তারি
লাগিল হাওয়া।
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শূনি শ্রোতে
তরণী বাওয়া।

যেখানে হল না খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শূন্য অঁখিজলে
পিছনে চাওয়া।

চন্দ্রকান্ত। বিন্দা, আজকাল রাধিকার দলই বাঁশি বাজাতে শিখেছে, কলির কৃষ্ণগল্লোকে বাসা থেকে পথে বের করবে। দেখো-না নাড়ীটা বেশ একটু দ্রুত চলছে।

বিনোদ। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্রকান্ত। কী বলো দেখি।

বিনোদ। চলো, যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে।

চন্দ্রকান্ত। বলো কী!

বিনোদ। আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু দেখাশুনা তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমরা বিয়ে করেছিলুম চোখ বুজে বড়ি গেলার মতো, মূখে স্বাদ পেলুম না, পেটের মধ্যে পেঁপেই খুব কষে ক্রিয়া করতে লাগল, কিন্তু তাদের তা তো চলবে না।

বিনোদ। না, তাকে দেখতে চাই নে। আমি ঐ গানরূপটিকে বরণ করব।

চন্দ্রকান্ত। বিন্দু, এ কথাটা তোর মূখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। তার চেয়ে একটা গ্রামোফোন কেন্-না? এ যে ভাই মানুষ, দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদ। মানুষকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি, চোখ বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকির; একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মরচে-পড়া বৃকেও ঝলক মারে, ফের আর একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি, কিন্তু এমনতরো মরিয়া করে তোলে নি।

গদাই। তা বলি, যদি বিয়ে করতে হয় নিজে না দেখে বিয়ে করাই ভালো। ডাক্তারের পক্ষে নিজের চিকিৎসা করাটা কিছূ নয়। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দ্রদা।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্যবাবু আর নিবারণবাবু পরম বন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন।

গদাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখ নি তো?

চন্দ্রকান্ত। আমার কি আর আশে পাশে দৃষ্টি দেবার জো আছে! আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তখতি সীলমোহর করা, অন্ হার্ ম্যাজিস্টিস্ সার্ভিস্। তবে শূনেছি বটে, দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

গদাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না, একেবারে সেই বিবাহের রাতে চমক লাগবে।

চন্দ্রকান্ত। তোমরা একটু বোসো ভাই, আমি অমনি চট করে চাদরটা পরে আসি। এই পাশের ঘরেই।

[প্রস্থান]

পাশের ঘরে

চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, ও বড়োবউ! চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনসর্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কি! যাত্রার দল খুলবে নাকি? আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম, তা আদর করছি।

চন্দ্রকান্ত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে, ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফুলের মালা গায়ে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—

চন্দ্রকান্ত। ও! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয় নি। ওটা বিধাতার অভিশ্রাব নয়। তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, তার কারণই হচ্ছে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। ঢের হয়েছে গোসাইঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্রকান্ত। কে বললে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্তমণি। আমি গদ্য, আমি পদ্য নই, আমি শোলোক পড়ি নে, আমি বেলফুলের মালা পরাই নে—

চন্দ্রকান্ত। আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ে না, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে?

চন্দ্রকান্ত। আমি বললাম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়—পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না।

চন্দ্রকান্ত। (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই? কেবল রাগই করলে! শোনো, বুঝিয়ে দিচ্ছি—

ভালোবাসার থার্মোমিটারে তিন মাত্রার উত্তাপ আছে। মানুষ যখন বলে ‘ভালোবাসি নে’ সেটা হল ৯৫ ডিগ্রি, যাকে বলে সাবনর্মাল। যখন বলে ‘ভালোবাসি’ সেটা হল নাইন্টিএইট পয়েন্ট ফোর, ডাক্তাররা তাকে বলে নর্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে তখন রুগি আদর করে বলতে শুরু করেছে ‘পোড়ারমুখি’, তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েছে। যারা প্রবীণ ডাক্তার তারা বলে এইটেই হল মরণের লক্ষণ। বড়োবউ, নিশ্চয় জেনো, বন্ধুত্বমহলে আমিও যখন প্রলাপ বকি, তোমাকে যা না বলবার তাই বলি, তখন সেটা প্রণয়ের ডিলিরিয়াম, তখন বাঁধা আদরের ভাষায় একেবারে কুলোয় না; গাল দিতে না পারলে ভালোবাসার ইন্সটিমের চাপে বুক ফেটে যায়, বিশ্রী রকমের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। নাড়ী রসস্ব

হলে তাতে ভাষা যে কিরকম এলোমেলো হয়ে ওঠে তা সেই ভাষারই বোঝে রসবোধের যে একেবারে এম্. ডি।

ক্ষান্তমণি। রক্ষে করো, আমার অত ভাষারি জানা নেই।

চন্দ্রকান্ত। সে তো ব্যবহারেই বদ্ব্যপ্তে পারি, নইলে লয়াল্টিকে সিডিশন বলে সন্দেহ করবে কেন। কিন্তু, নিশ্চয় রুগির দশা তোমাকেও মাঝে মাঝে ধরে। আচ্ছা, কলতলায় দাঁড়িয়ে তুমি কখনো পশ্চাৎকুরাঝিকে বল নি—‘আমার এমনি কপাল যে বিয়ে করে ইঙ্গিতক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না’? আমার কানে যদি সে কথা আসত তা হলে আনন্দে শরীর রোমাণ্ডিত হয়ে উঠত।

ক্ষান্তমণি। আমি পশ্চাৎকুরাঝিকে কখনো অমন কথা বলি নি।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, তা হলে সাফ চাদরটা এনে দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি চুলগদুলো কাগের বাসার মতো করে বোরিয়ো না। একটু বোসো, তোমার চুল ঠিক করে দিই।

চিরদিন রুস লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

চন্দ্রকান্ত। হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। না, হয় নি। একদন্ড মাথা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী! নাহয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই—একটা ললিতলবঙ্গ-লতা খোঁজ করে আনো গে, আমি চললুম।

[চিরদিন রুস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙতে হবে।

বিনোদ। (নেপথ্য হইতে) ওহে, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি।

চন্দ্রকান্ত। এইমাত্র যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ি

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার গদাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিবচরণ। সে বেটার আবার পছন্দ কী! বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তার পর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যেরকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা হোক-না কালের গতি, অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখো-না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করে নি সে স্ত্রী চিনবে কী করে? পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না, আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিস? আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি গদাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি, তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও, তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর-পাঁচেকের কথা হবে, যা হোক তিরিশটা বৎসর তাঁকে নিয়ে চালিয়ে এসেছি; আমি

আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুর্ভাঙ্গা পণ থাকে, আমার গদাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্সি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না। এখন এই বড়োটাকে যত্ন করে আর ছেলেটাকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো আমার গদাইয়ের ঘরে এলে এই বড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে। বহুকাল একটি আস্ত বড়ো বাপ তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ ভাই, খাইয়ে-দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। যা হোক, আজ তবে আসি। গদাটিদুয়েক রোগী এখনো মরতে বাকি আছে।

[প্রস্থান]

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। ও বড়োটি কে এসেছিল বাবা।

নিবারণ। কেন মা ‘বড়ো বড়ো’ করছিস—তোর বাবাও তো বড়ো।

ইন্দু। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আদিকালের বদ্য বড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা? কিন্তু ওকে তো কখনো দেখি নি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দু। আমি খুব পরিচয় করতে চাই নে।

নিবারণ। তোর এ বাবা পুরোনো ঝরঝরে হয়ে এসেছে, একবার বাবা বদল করে দেখাবি নে ইন্দু?

ইন্দু। তবে আমি চললুম।

নিবারণ। না না, শোন-না। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার একটি বাপের পদ খালি আছে—তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা।

ইন্দু। তুমি কী বকছ বদ্বতে পারছি নে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তের্মনি হাবা মেয়ে কিনা। সব বদ্বতে পেরেছিস, কেবল দুষ্টুর্মি!

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। তিনিটি বাবু এসেছে দেখা করতে।

ইন্দু। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসছে।

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দু। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শুনে নিই কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না।

ইন্দু। তুমি একবার গল্প পেলো আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জবাবায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুণ্যে মিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয় নি?

[ইন্দুমতীর প্রস্থান]

নিবারণ। (ভূত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত বিনোদবিহারী ও গদাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চন্দ্রবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক। আপনারা সকলে বসুন। ওরে, তামাক দিয়ে যা।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না, তামাক থাক্।

নিবারণ। তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশব্যস্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে। যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। পাত্রটি কে?

চন্দ্রকান্ত। বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনছেন বোধ করি।

নিবারণ। বিলক্ষণ! তা আর শুনিনি নি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। ‘জ্ঞান-রত্নাকর’ তো তাঁরই লেখা?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে ‘প্রবোধলহরী’? আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। ‘প্রবোধলহরী’ তাঁর লেখা নয়। সেটা কার বলতে পারি নে।

নিবারণ। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ‘কাননকুসুমিকা’ দেখেছেন কী?

নিবারণ। ‘কাননকুসুমিকা!’ না, দেখি নি। নামটি অতি সুদুল্লিত। বাংলা বই কবে সেই বাল্যকালে পড়তাম। তখন অবশ্যই ‘কাননকুসুমিকা’ পড়ে থাকব, স্মরণ হচ্ছে না। তা বিনোদবাবুর পুত্রের বয়স কত হবে, কীট পাস করেছেন তিনি?

চন্দ্রকান্ত। মশায় ভুল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম.এ. পাস করে সম্প্রতি বি.এল. উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বলছিলাম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো, এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! আমি মেয়েদের কাছে শুনোছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন।

চন্দ্রকান্ত। তা এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ। আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে।

নিবারণ। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

চন্দ্রকান্ত। তবে অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কী! আর-একটু বসুন-না।

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয় নি—

নিবারণ। সে এখন ঢের সময় আছে। বেলা তো সবে—

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি। এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি।

নিবারণ। তবে আসুন। দেখুন চন্দ্রবাবু, মতি হালদারের ঐ-যে কুসুমকানন না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো।

চন্দ্রকান্ত। কাননকুসুমিকা? বইখানা পাঠিয়ে দেব, কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়।

নিবারণ। তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকান্ত। প্রবোধলহরী তো—

বিনোদ। আঃ, থামো-না! তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকখন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রারশ্চিন্তাবিধি এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ। দেখুন, বিনোদবাবুর একখানি ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি? তা হলে কমলকে একবার—

চন্দ্রকান্ত। ফোটোগ্রাফ সঙ্গেই এনেছি, কিন্তু এতে আমাদের তিন জনেরই ছবি আছে।

নিবারণ। তা হোক, ছবিটি দিবি উঠেছে, এতেই কাজ চলবে।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে আজ্ঞা হয় তো আসি।

[প্রস্থান]

নিবারণ। নাঃ, লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্য আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। বাবা, তোমার হল?

নিবারণ। ও ইন্দু, তুই তো দেখালি নে—তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস, তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু। আমার তো খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যের অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর-একটি যে লোক এসেছিল—বদ-চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে, চোখে চশমা-পরা, সে কে?

নিবারণ। তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিস নে? বদ-চেহারা আবার কার দেখালি? বাবুটি তো দিবি ফুটফুটে কার্তিকের মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ইন্দু। তাকে আবার ভালো দেখতে হল? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা! এখন নাইতে চলো।—

[নিবারণের প্রস্থান]

নাঃ, ঠুর নামটা জানতে হচ্ছে। নিশ্চয় ক্ষান্তদিদি বলতে পারবেন।—বাবা, শোনো শোনো।

নিবারণের পুনঃপ্রবেশ

ওরা তোমাকে বিনোদবাবুর একটা ফোটোগ্রাফ দিয়ে গেল না?

নিবারণ। হাঁ, এতে তিন বন্ধুরই ছবি আছে।

ইন্দু। তাতে ক্ষতি নেই। ওটা আমাকে দাও-না, আমি দিদিকে দেখাব।

নিবারণ। ভেবেছিলুম, আমি নিজে দেখাব।

ইন্দু। না বাবা, আমি দেখাব, বেশ মজা হবে।

নিবারণ। এই নে মা, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি ঠাট্টা করিস নে।

ইন্দু। বাবা, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করছে, আর যাই হোক ঠাট্টায় ওর আর বিপদের আশঙ্কা নেই।

[নিবারণের প্রস্থান]

ইন্দু। কমলদিদি, কমলদিদি।

কমলের প্রবেশ

কমল। কী ইন্দু?

ইন্দু। আর দেরি কোরো না।

কমল। কেন, কী করতে হবে বল্-না।

ইন্দু। এখন কাব্যশাস্ত্রমতে কমলকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে।

কমল। কেন বল্ তো।

ইন্দু। খড়্-খড়ের ফাঁক দিয়ে যাঁর অরুণরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সেই দিনমণি উঠে পড়েছেন তোমার ভাগ্যগগনে।

কমল। তুই খবর পেলি কোথা থেকে?

ইন্দু। স্বয়ং দিনমণির কাছ থেকে।

কমল। একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা ক।

ইন্দু। আমার চেয়ে ঢের বেশি অস্পষ্ট ভাষায় যিনি কাব্য রচনা করেন সেই কবি স্বয়ং এই ঘরে পরিদৃশ্যমান হয়েছিলেন।

কমল। কী কারণে?

ইন্দু। তোমার উপর করস্কেপ করবার দাবি জানিয়ে যেতে। এতদিন যিনি ছিলেন তোমার কানের শোনা, এখন তিনি হবেন তোমার নয়নের মণি, বাবার কাছে স্বয়ং দরবার জানিয়ে গেছেন। তোমার মনের মানুষ এখন থেকে তোমারই কোণের মানুষ হবার উমেদার, কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সুখবর কিনা বলো দিদি!

কমল। এখনো বলবার সময় হয় নি।

ইন্দু। বলিস কী ভাই! কাব্যের চেয়ে কবির দাম বেশি নয়?

কমল। দামের তুলনা করব কী করে? দুটো জিনিস এক জাতের নয়, যেমন মধু আর মধুকর।

ইন্দু। সে কথা মানি, যেমন বাঁশ আর বাঁশি। বাঁশি যেরকম করে বাজে বাঁশ ঠিক তার বিপরীতভাবে অন্তরে বাহিরে বাজতে পারে। তা হলে কী করা কর্তব্য এইবেলা বলো। এখনো সময় আছে। নাহয় বাবাকে বলে আসি যে, কাব্যের মধ্যে শুধু কথার মিল চাই, সেটাতে ভুল হলেও চলে; কিন্তু কবির মধ্যে চাই প্রাণের মিল, সেটাতে ভুল হলে সাংঘাতিক। কাজ নেই দিদি, স্বয়ং দেখেশুনে পছন্দ করে নাও। ছবিটা দেখে তার ভূমিকা করতে পারো।

কমল। এর মধ্যে তো একজন দেখছি চন্দরবাবু।

ইন্দু। বাকি দুজনের মধ্যে কে বিনোদবাবু আন্দাজ কর্ দেখি। এর মধ্যে কেই বা কোকিল কেই বা কাক, কেই বা কবি, কেই বা অকবি বল্ দেখি।

কমল। তোর মতন এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার নেই ভাই!

ইন্দু। আচ্ছা এই নে, তোর ডেস্কের উপর রাখ্, চেয়ে দেখতে দেখতে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে সত্য আপনি প্রকাশিত হবে। দময়ন্তী ছ-জনের মধ্যে নলকে চিনে নিয়েছিলেন, তোর তো কেবল দুজন।

কমল। অত চিন্তায় অত ধ্যানে আমার দরকার নেই।

ইন্দু। বলিস কী দিদি!

কমল। আমি তো স্বয়ংবরা হতে যাচ্ছি নে বোন! তা আমার আবার পছন্দ! দুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে? আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি।

ইন্দু। তুই ভাই, কথায় কথায় বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে পড়িস। বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না।

কমল। সেজন্য নাহয় তুই নিষদ্ধ থাকিস।

ইন্দু। তা হলে যে তোর গাম্ভীৰ্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে। দেখু ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি, এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস, যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস নে। নিজের নামে কবিতা দেখলে কিরকম লাগে, কে জানে।

কমল। মনে হয়, আমার নাম করে আর কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব।

ইন্দু। তুই কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমাদের যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না। আপাতত ছবিটা তোর কাছে রাখু।

কমল। ছবিতে আমার দরকার নেই।

ইন্দু। নেই দরকার? তবে ওটা আমার রইল? সর্বস্বত্ব ত্যাগ করলে?

কমল। কেন বল্ দেখি। এত উৎসাহ কেন তোর।

ইন্দু। সেদিন নাম খুঁজছিলুম, রূপও তো খুঁজতে হবে। এই ছবির মধ্যে যদি নামে রূপে মিল হয়ে যায়?

কমল। অর্থাৎ?

ইন্দু। অর্থাৎ (গদাইয়ের ছবি দেখাইয়া) এর নাম যদি গদাই না হয়, যদি কুমুদ কিংবা পরিমল, কিংবা কিশলয়, কিংবা কোকনদ, কিংবা কপিঞ্জল হয়ে দাঁড়ায়?

কমল। তা হলেই চুকে যাবে?

ইন্দু। একেবারে চুকে না যাক, মিউজিয়মে একটা প্রথম স্পেসিমেন্ পাওয়া যাবে তো?

কমল। আচ্ছা, তোর স্পেসিমেন্ জমা কর্—আপাতত তোর চুল বেঁধে দিই গে চল্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ইন্দু। তোমার স্বামী আদর করেই ঠাট্টা করে, সে কি আর সত্যি!

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারি নে। আর সত্যি হবারই বা আটক কী? নিজে তো জানি নিজের গুণ কত।

ইন্দু। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর-একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই! বন্ধু একটি-আধটি তো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিও নে।

ইন্দু। এই দেখু-না তার ছবি। (কাপড় খুঁজিয়া) এ কী হল! এই যাঃ, কোথায় ফেললুম!

ক্ষান্তমণি। কী ফেললি?

ইন্দু। ফোটোগ্রাফ।

ক্ষান্তমণি। কার?

ইন্দু। বিনোদবাবুর। নিশ্চয় তোমাদের এই গলি পার হয়ে আসবার সময় রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি যাই, খুঁজে আনি গে।

ক্ষান্তমণি। ছি ছি, রাস্তার মাঝে ছবি খুঁজতে গিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিবি যে! সে ছবির এতই কিসের কদর?

ইন্দ্র। হায় হায়, দিদি যদি কেঁদে-কেটে অনর্থপাত করে?

ক্ষান্তমণি। তোর দিদি? কমল?

ইন্দ্র। 'হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষণ নয়, সে যে বড়ো কোমল, কী জানি, আজ থেকে যদি সে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করে?

ক্ষান্তমণি। সে আবার কী?

ইন্দ্র। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।

ক্ষান্তমণি। আর জ্বালাস নে, বাংলা ভাষায় কী বলে তাই বল-না।

ইন্দ্র। তাকে বলে উপোস ক'রে মরা।

ক্ষান্তমণি। আমি যেন কমলকে জানি নে—তুই হলেও বা সম্ভব হত। কেন ভাই, আসল জিনিস যখন ধরা দিয়েছে তখন ছবিটার এত খোঁজ কেন?

ইন্দ্র। আসল জিনিসকে ডেস্কের বসিয়ে রাখা যায় না, দেয়ালে বন্ধ করা চলে না। আসল জিনিসের মেজাজের ঠিক নেই—বেশি খিদে পেলে ভালোবাসার কথা তার মনে থাকে না, বেশি ভালোবাসা পেলে অস্থির ক'রে তোলে—কিন্তু—

ক্ষান্তমণি। আচ্ছা আচ্ছা, তোর সেই 'কিন্তু' এত বেশি দুর্লভ নয়।

ইন্দ্র। ক্ষান্তদিদি, তোমার সেই বন্ধু তিনটির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে বলো-না।

ক্ষান্তমণি। খুব সম্ভব গদাই। সে ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকে বটে।

ইন্দ্র। বাজি রাখতে পারি, সে গদাই নয়। তার নাম যদি গদাই হয় তা হলে আমার নাম মার্ভিগনী।

ক্ষান্তমণি। তা হলে ললিত।

ইন্দ্র। এই এতক্ষণে নামটা পাওয়া গেল। ললিত তার আর সন্দেহ নেই।

ক্ষান্তমণি। চেহারাটা সুন্দর তো?

ইন্দ্র। সুন্দর বৈকি।

ক্ষান্তমণি। পাতলা, চোখে চশমা আছে?

ইন্দ্র। হাঁ হাঁ, চশমা আছে। আর, সব কথাতেই মূচকে মূচকে হাসে।

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জ তাতে আর সন্দেহ নেই।

ইন্দ্র। ললিত চাটুজ্জ না হয়ে যায় না। বাজি রাখতে পারি।

ক্ষান্তমণি। কলকাতার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ নয় ভাই! এম.এ. পাস করে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দ্র। জলপানি পাবার মতোই চেহারা বটে। তা, ওদের ঘরে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ নেই নাকি? লক্ষ্মীছাড়ার মতো টো টো করে বেড়ায় কেন।

ক্ষান্তমণি। স্ত্রী পুত্র থেকেই বা কী হয়? ওর তো তবু নেই। বলে যে, রোজগার না ক'রে বিয়ে করবে না।

ইন্দ্র। জানিস ক্ষান্তদিদি, ওদের তিন জনের ছবিতে যেন তিন কাল মর্তিমান। চন্দ্রবাবু অতীত, বিনোদবাবু বর্তমান, আর ললিতবাবু ভাবী।

ক্ষান্তমণি। ভাবী? কার ভাবী লো?

ইন্দ্র। সে কথাটা রইল ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষান্তমণি। দেখ্ ভাই ইন্দ্র, তোকে সত্যি করে বলি। তোরা তো আমাকে বীক্ষমবাবুর বইগুলো পড়ালি, ভেবেছিলুম একটুও বুঝতে পারব না—কিন্তু বেশ লাগছে।

ইন্দ্র। এই দেখ্, মৃশকিলে ফেললি তো। তোর মনটা এখন আয়েষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওজনমত জগৎসিংহ পারি কোথা?

ক্ষান্তমণি। তা বলিস নে ইন্দু। আমি যেরকম মাপের আয়েষা সেরকম মাপের জগৎসিংহও ঘরে মজুদ আছে। কিন্তু—

ইন্দু। চাল-চলনটা দোরস্ত হয় নি। মনে মনে আয়েষা হয়েছে, ব্যবহারে আয়েষাগিরি করে উঠতে পারছ না।

ক্ষান্তমণি। কতকটা তাই বটে।

ইন্দু। প্র্যাক্টিকাল্ এডুকেশনটা হয় নি আর-কি। কিছুদিন প্র্যাক্টিস্ চাই।

ক্ষান্তমণি। তোর ইংরিজি আমি বদ্বতে পারি নে ভাই।

ইন্দু। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বঙ্কিমের কাছে মন্ত্র পেয়েছ, আমার কাছ থেকে তার সাধনা পেতে হবে।

ক্ষান্তমণি। তোমার কাছ থেকে?

ইন্দু। আমার কাছ থেকে হলেই নিরাপদ হবে। মনুসংহিতার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মিল রক্ষা করেই আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। আজ এখনি হোক হাতে-খড়ি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো, আমি চন্দ্রবাবু, আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদেয় প্রাণ বোরিয়ে যাচ্ছে—তার পর তুমি কী করবে বলো দেখি। রোসো ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না।

আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তর উচ্চহাস্য

ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য। পতিব্রতা রমণী কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইলে সাধবী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অণ্ডল দিয়া নয়ন নত করিয়া ঈষৎ স্মিতহাস্য হাসিতে পারেন। এই গেল মনুসংহিতা, এবার এসো নবীন কবির গীতিকাব্যে। আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি, এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দু। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজছি—

ক্ষান্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দু। আচ্ছা, তবে আর-একবার চেষ্টা করো। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধূতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দু। ও কী করছ! তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো—বলো, ‘নাথ, আজ সন্ধ্যাবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।’

ক্ষান্তমণি। (যথার্থীকৃত) নাথ, আজ সন্ধ্যাবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দু। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে—

ক্ষান্তমণি। (তাড়তাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দু। এই দেখো, সব মার্টি করলে। অস্থানে মনুসংহিতা এসে পড়ে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো, ‘লুচি? কই, লুচি তো আজ ভাজি নি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন। আজ এসো, এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—’

চন্দ্র (নেপথ্য হইতে)। বড়োবউ!

ইন্দু। ঐ চন্দ্রবাবু আসছেন! আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ে না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও।

পাশের ঘর

গদাই আসীন। চাপকান-শামলাপরা ইন্দুর ছুটিয়া প্রবেশ

গদাই। একি!

ইন্দু। ও মা, এ যে সেই ললিতবাবু! আর তো পালাবার পথ নেই। (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া গদাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ে না। আর শিগগির দেখে এসো দেখি, বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কিনা।

গদাই। (হাসিয়া) যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

ইন্দু। হি হি! ললিতবাবু কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস, হঠাৎ বুদ্ধি জোগাল, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই? ঐ আবার আসছে। মানুষটি তো ভালো নয়।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। ঠাকরুন, পালকি তো আসে নি। এখন কী আশ্রয় করেন?

ইন্দু। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পারো। না, না, এ যে তোমার মনিব এ দিকে আসছেন। ঠেকে আমার খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয় এসেছে।

[প্রস্থান]

গদাই। কী চমৎকার! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি! বা বা! আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল—সেও আমার পরম ভাগ্য। বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি, কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে? নির্লজ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে! আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। তুমি এ ঘরে ছিলে নাকি? তবে তো দেখেছ?

গদাই। চক্ষু থাকলেই দেখতে হয়—কিন্তু কে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

গদাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত। ওর আবার স্বামী কোথায়?

গদাই। মরেছে বুদ্ধি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে—কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

গদাই। তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে চলো, একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস, সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে—যেন তার পূর্বে বঙ্গদেশে বাপ-পিতামহর আমল থেকে বিবাহ কেউ করে নি!

গদাই। মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে হবে, তার আবার ভয় কিসের?

চন্দ্রকান্ত। বল কী গদাই? বিধাতার আশীর্বাদে জন্মালুম পুরুষ হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা? গদাই, যেয়ো না হে! তোমাকে দরকার আছে, এখনি আসছি।

[প্রস্থান]

গদাই। (পকেট হইতে নোটব্দক ও পেন্সিল বাহির করিয়া) আর তো পারছি নে। মাথার ভিতরটা যেরকম ঘূর্ণলিয়ে গেছে, আজ বোধ হয় একটা দৃষ্কর্ম করব। কবিতা লিখে ফেলব। বৃন্দ্রি পরিষ্কার থাকলে কবিতার ব্যাক্টিরিয়া জন্মাতেই পারে না। চিত্তের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই। আজ আমার মগজের ভিতরে ঐ কীটাগুণগুলি কেবলই চোন্দ অক্ষর খুঁজে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

লিখিতে প্রবৃত্ত

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভূত্য বলে তখনি চিনিলে।

ভাবটা নতুন রকমের হয়েছে, কিন্তু হতভাগা ছন্দটাকে বাগাতে পারছি নে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়েছে পনেরো। কিন্তু কাকে ফেলে কাকে রাখি। (চিন্তা) ‘আমায়’-কে ‘আমা’ বললে কেমন শোনায়? কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে—কানে তো নেহাত খারাপ ঠেকছে না। তবুও একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদম্বিনীর ‘নী’টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়? পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুনতে হবে। কাদম্বি—না, ঠিক শোনাচ্ছে না। কদম্ব—ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভূত্য বলে তখনি চিনিলে।

উ হু, ও হচ্ছে না। ‘কেমন করে’ কথাটাকে তো কমাবার জো নেই। ‘কেমন করিয়া’—তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। ‘তখনি চিনিলে’র জায়গায় ‘তৎক্ষণাৎ চিনিলে’ বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সূবিধে হয় না। দূর হোক গে! ছন্দে লেখাটা বর্বরতা। যে সময় পুরুষমানুষ কানে কুন্ডল, হাতে অঙ্গদ পরত, পদ্য জিনিসটা সেই যুগের; ডিমক্রাটিক যুগের জন্য গদ্য। হওয়া উচিত ছিল—‘বলি ও কাদম্বিনী, যেমনি আমার উপর নজর পড়ল অমনি আমাকে গোলাম বলে চিনে নিলে কেমন করে খুলে বলো তো।’ এর মধ্যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার সীলমোহরের ছাপ নেই—একেবারে খাস শ্রীযুক্ত গদাইচন্দ্রের গোমুখী-বিনির্গত।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে গদাই?

গদাই। আজ্ঞে, ফিজিয়লজির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি।

শিবচরণ। ফিজিয়লজির কোন্ জায়গাটাতে আছ?

গদাই। হার্টের ফাংশন্ নিয়ে।

শিবচরণ। দেখি তোমার নোটবইটা। আমি তোমাকে হয়তো কিছ—

গদাই। আজ্ঞে, এ একেবারে লেটেস্ট থিওরি নিয়ে—বোধ হয় মাসখানেক হল এর ডিস্কভারি হয়েছে। এখনো সকলে জানে না।

শিবচরণ। সত্যি নাকি? আমি আবার চশমাটা আনি নি। সর্ভেক্টটা ইন্টারেস্টিং, পরে শুনবে নব তোর কাছ থেকে। কিন্তু, এখানে করছিস কী?

গদাই। একজামিনটা খুব কাছে এসেছে—চন্দ্রাবাবুর বাসাটা নিরিবির্ভাল আছে, তাই এখানে—

শিবচরণ। দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।

গদাই। (স্বগত) কী সর্বনাশ!

শিবচরণ। নিবারণবাবুকে জান বোধ করি—

গদাই। আজ্ঞে হাঁ, জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো, বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির।

গদাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপু?

গদাই। একজামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তা হোক-না একজামিন। বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনা যাবে।

গদাই। ডাক্তারিটা পাস না করেই কি—

শিবচরণ। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শস্ত ব্যারামের বিয়ে দিচ্ছি নে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু, আপত্তিটা কিসের জন্যে?

গদাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি? তুমি কি সাহেব হয়েছে যে, বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে?

গদাই নিরন্তর

তোমার হল কী! বিয়ে করবে, তার আবার এত ভাবনা কী! আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম!

গদাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিবচরণ। (সরোষে) অনুরোধ কী বেটা! হুকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

গদাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবি নে! তোর বাপ পিতামহ, তোর চৌন্দপদরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দু পাতা ইংরিজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবি নে!

গদাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা, একেবারে মর্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনোই এ প্রস্তাবে—

শিবচরণ। তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এত বড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন, সেটা তো শোনা আবশ্যিক।

গদাই। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

গদাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল; এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। আজ বিনোদের বিয়ে, মনে আছে তো গদাই?

গদাই। তাই তো, ভুলে গিয়েছিলুম বটে।

চন্দ্রকান্ত। তোমার স্মরণশক্তির ঘেরকম অবস্থা দেখছি, একজামিনের পক্ষে সন্নিবিধে নয়। এইখানে বৈঠক হবে, চলো ওদের ধরে নিয়ে আসিগে।

গদাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্—

চন্দ্রকান্ত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না গদাই! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে, চলো।

গদাই। চলো।

[প্রস্থান]

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। বর তো তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই নাকি?

ক্ষান্তমণি। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনোছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে—তাদের খবরও দেয় নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাবি নে তো। আবার বলে কী, এ তো আর শূন্য-নিশূন্যের যুদ্ধ না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এত শোর-শরাবৎ লোক-লস্করের দরকার কী?

ইন্দু। একবার আমাদের হাতে পড়ুক-না, দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কিরকম ধূন্দুমার ব্যাপার, তা তাঁকে একরকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।—আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটেবে। দেখ-না ভাই, ঘরের অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একটুখানি গুঁছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি।

ইন্দু। তোমার একলার কর্ম নয়, এসো ভাই, দুজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক। এগুলো দরকারি নাকি?

ক্ষান্তমণি। কিছু না। যত রাজ্যের পুরোনো খবরের কাগজ জুটেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে।

ইন্দু। এগুলো?

ক্ষান্তমণি। এগুলো মকদ্দমার কাগজ—হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারি নে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে। যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান, অস্তিকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু। এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেলও আছে—তারও আবার পাতা ছেঁড়া! কতকগুলো চিঠি—এ কি দরকারি!

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে, অ-দরকারিও আছে, কিছু বলবার জো নেই। খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চারি দিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইন্দু। এ-সব কী? কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, কানন-কুসুমিকা, কাগজের পুটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট—এ চাবির গোছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না?

ক্ষান্তমণি। এই দেখো। এই চাবির মধ্যে ঠুর যথাসর্বস্ব। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ঠুকে সহজে দেওয়া হবে না। ঐ ভাই, ওরা আসছে, চলো ও ঘরে পালাই।

[প্রস্থান]

বিনোদ চন্দ্রকান্ত গদাই নলিনাক্ষ গ্রীপতি ভূপতির প্রবেশ

বিনোদ। (টোপর পরিয়া) সঙ তো সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচ জনে মিলে হাততালি দাও—উৎসাহ হোক, মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। এরই মধ্যে? এখনো তো রঙ্গমঞ্চে চড় নি।

বিনোদ। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়ে আমার পার্ট কী হবে বুঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদূষক।

বিনোদ। সার্জটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। ইংরেজ রাজাদের যে ফুলগুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই টোপরের মতো।

চন্দ্রকান্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ঐরকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসরের যত-কিছু শিক্ষাদীক্ষা, যত-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা—ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি,

সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উঁচু উঁচু ভাবের পলতে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল সেগুলো ঐ টোপর চাপা পড়ে একদম নিবে যাবে।

শ্রীপতি। চন্দ্রদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে। হাঁ করে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাকলে কি 'বিয়ে-বিয়ে' মনে হয়?

চন্দ্রকান্ত। সে তো ভাই, স্টোন-এজ্, আইস্-এজের কথা। সে যুগে না ছিল পূর্বরাগের কোমলতা, না ছিল অপূর্ব অনুরাগের উত্তাপ। কেবল বিবাহের যিনি আদ্যাশক্তি সেই মহামায়াই আজও আছেন অন্তরে-বাহিরে, আর সমস্তই ভুলেছি।

ভূপতি। শ্যালীর হাতের কানমলা?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালী থাকলে তবু বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা কাটে, ওরই মধ্যে একটুখানি পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়—শব্দরমশায় একেবারে কড়ায়-গন্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকি পয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদ। বাস্তবিক বর পছন্দ করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে ক'টি পাস আছে, কনে পছন্দ করবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগিনী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বৃদ্ধি বাড়ে। ঠিক বিয়ের দিনটিতে বৃদ্ধি চৈতন্য হল? নিতান্ত বর্ণিত হবে না; তোমার কপালে একটি আছে, নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী।

গদাই। (স্বগত) যাকে আমার স্কন্ধের উপর উদ্যত করা হয়েছে—সর্বনাশ আর-কি!

শ্রীপতি। বিনোদ, একটুখানি বোসো।

বিনোদ। না ভাই, তা হলে আর উঠতে পারব না, মনটা দেহের উপর যেন পাথরের কাগজ-চাপা হয়ে চেপে রাখবে।

ভূপতি। এসো তবে, বর-কনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্‌স্ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয়বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এরকম অনাচার হতে দেব না; শ্রুতকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকো না। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো-না।

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে, আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাকো। কিন্তু মৃহুতের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিনু তুই বল, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাজলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

[সকলে উলু চেষ্টা ও প্রস্থান]

ইন্দুমতী ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই, আমার কতটি মধুর কথাগুলি?

ইন্দু। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন। তোর তো আর বাজে নি। যার বেজেছে সেই জানে—

ইন্দু। তুমি যে একেবারে ঠাট্টা সহিতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সতি ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দু। তুমি এগোও ভাই, তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুদিয়ে দিয়ে যাই।

[ক্ষান্তর প্রস্থান]

ললিতাবাবু তাঁর এই খাতাটা ফেলে গেছেন। এটা না দেখে আমি যাচ্ছি নে। (খাতা খুলিয়া)

ওমা! এ যে কবিতা! কাদম্বিনীর প্রতি! আ মরণ! সে পোড়ারমুখি আবার কে!

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী।

ভারি যে অবস্থা খারাপ! জলও না, বজ্রও না, হতভাগ্য চাতকের জন্যে কবিরাজের তেলের দরকার।

আর কিছ্ দাও বা না-দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসি-ভরা মুখ আর-একবার দেখিলে।

আহাহাহা! অবলে সরলে! পুরুষগুলো ভারি বোকা! মনে করলে, ঠাঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল। হাসতে না কি সিকি পরসা খরচ হয়। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না! অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে। ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোন্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব—পৃথিবীর একটা উপকার করব, কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হারিলে পুরুষের মন,
এবার নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভূত্য বলে তখনি চিনিলে!

ওমা! ওমা! ওমা! এ যে আমারই কথা। এইবার বুঝেছি, পোড়ারমুখি কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ওমা, কত কথাই বলেছেন। আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি। কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুস্তো বসিয়ে গেছে।

নীরবে পাঠ

পশ্চাৎ হইতে খাতা-অন্বেষণে গদাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব। এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া গদাইকে দেখিয়া) ওমা! (মুখ আচ্ছাদন)

গদাই। ঠাকরুন, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলাম।

[ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন]

জন্ম জন্ম কেবলই আমার খাতাই হারাক। কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমার-সম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না!

[মহা উল্লাসে প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

গদাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে, রুটিং যেমন কাগজ থেকে কার্ল শুষে নেয়। কিন্তু, কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল না? না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি। ও কী করছে? একটা ভিজ়ে শাড়ি শুকুতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজ়ে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কী করছেন!

এই বাড়ির চৌকাঠ পার হইতে হুঁচট খাইয়া একজন বড়ির কক্ষ হইতে তরকারির বড়ি পড়িয়া গেল
গদাই। (ছুটিয়া নিকটে গিয়া, ধরিয়া উঠাইয়া) আহাহাহা, কী তোমার নাম গো?

বড়ি। আমার নাম ঠাকুরদাসী, এই বাড়ির ঝি।

গদাই। এই বাড়ির ঝি! আহা, লাগে নি তো?

বড়ি। না, কিছু লাগে নি।

গদাই। আলগুনলো সব যে ছড়িয়ে পড়েছে। রোসো, কুড়িয়ে দিচ্ছি। তুমি বড়ি এই বাড়ির ঝি!

বড়ি। হাঁ বাবু।

গদাই। চৌধুরীদের বাড়ির ঝি?

বড়ি। হাঁ গো, গঙ্গামাধব চৌধুরী।

গদাই। আহাহা, ভাড়টা উলটে গিয়ে তেল যে সব গড়িয়ে গেছে। তোমার দিদিঠাকরুন হয়তো রাগ করবেন।

বড়ি। না, দিদিঠাকরুন কথাটি কবেন না, কিন্তু গিল্মি-মা—

গদাই। কথাটি কবেন না? আহা! (দীর্ঘনিশ্বাস) তা এক কাজ করো। এই টাকটি দিচ্ছি, নাহয় বাজার থেকে তেল কিনে আনো, আমি ততক্ষণ তোমার তরকারি আগলাচ্ছি। তোমার দিদি-ঠাকরুন বড়ি কথাটি কবেন না, অ্যাঁ ঠাকুরদাসী?

বড়ি। তিনি বড়ো লক্ষ্মী।

গদাই। লক্ষ্মী! আহা, তা তোমার দিদিঠাকরুন কী খেতে ভালোবাসেন বলো দেখি।

বড়ি। ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে ভরু ফুলদুরিওয়ালা গরম গরম বেগ্নি ভেজে দেয়, তাই দিয়ে আমার আচার দিয়ে খেতে তাঁর খুব শখ।

গদাই। বটে! তা এই নাও ঠাকুরদাসী, একটাকার বেগ্নি কিনে আনো তো।

বড়ি। একটাকার বেগ্নি! সে যে অনেক হবে।

গদাই। তা হোক, নাহয় কিছু বেশিই হল।

বড়ি। তা আমি কিনে নাহয় আনব পরে, তুমি এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

গদাই। তাতে ক্ষতি নেই, ওটা আমার একটা শখ।

বড়ি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা!

গদাই। না, না, ঐ যে তোমার বেগ্নি—ঐ যে তুমি বললে না—

বড়ি। নাহয় দিদিঠাকরুনকে বেগ্নি খাওয়াব, তাই বলে কি—

গদাই। আমি এইরকম খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসি, ওটা আমার একটা ব্যতিক বসণেই হয়।
বিশেষত গরম গরম বেগ্নি। বেগ্নির ঝুড়ি চক্ষে দেখে তবে নড়ব।
ঝুড়ি। তা হলে দাঁড়াও, দেরি করব না।

[প্রস্থান]

মোড়ক হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

ঐ ব্যক্তি। সরকারমশায় ঝুড়ি?

গদাই। কেন বলো তো।

ঐ ব্যক্তি। এই ঝুড়ির কোন্ মাঠাকরুন সাত জোড়া সিলেকের মোজা রিকদ করতে আমাদের
দোকানে পাঠিয়েছিলেন, সেগদুলি এনেছি।

গদাই। অ্যাঁ, পায়ের মোজা! ঐ জন্যেই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাও দাও।

দরজি। দামটা নগদ চুকিয়ে দিতে হবে।

গদাই। কত?

দরজি। আড়াই টাকা।

গদাই। এই নিয়ে যাও। তোমার রেট তো সস্তা হে!

[দরজির প্রস্থান]

হায় হায়, আজ কী শূভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম! (ঝুড়ির কাছে চাপিয়া) সেই পা দুখানির
অদৃশ্য চলন দিয়ে, দলন দিয়ে এই মোজার ফাঁকগদুলি ভরা। আহা, গা শিউরে উঠছে, কবিতা
লিখতে ইচ্ছে করছে—

ওগো শূন্য মোজা—

মেলানো বড়ো শক্ত। এই সময়ে থাকত বিন্দা!—

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,

অনুপস্থিত কোন্ দৃষ্টি চরণ

সদাই করিতেছ খোঁজা।

কথা আসছে। কিন্তু ঘুলিয়ে যাচ্ছে—

বিনা পায়ের প্রাণের ভিতরে

চলে গিয়েছ সোজা।

আইডিয়াটা ওরিজিনাল্।

তিনটে লাইন হল, সাত জোড়া মোজা আছে, ঠিক সপ্তপদীর নম্বর। আরো চারটে লাইন
চাই। (উপরতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া) অনুদ্দেশকে উদ্দেশ করে এই লাইনগদুলি আবৃত্তি
করতে ইচ্ছে করছে—যুরোপের ষ্ট্রুবেডোরদের মতো।

(আপন-মনে) আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,

অনুপস্থিত কোন্ দৃষ্টি চরণ সদাই করিছ খোঁজা?

কিন্তু আর তো মিল দেখছি নে, এক আছে ‘মুসলমানের রোজা’—মোজাকে বসলে দোষ নেই
যে ঈদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ। না না, ওতে আমার লেখার ক্লাসিক্যাল গ্রেসটা চলে যাবে। তা ছাড়া
দিন খারাপ, হয়তো সামান্য মোজার জন্যে শান্তিভঙ্গ হতেও পারে—ওটা থাক্।

নেপথ্যে। হিঃরা রোখো।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। বেটার তবু হুঁশ নেই। দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো-না। যেন ঝিদি
পেয়েছে, এই ঝুড়ির ইন্টকাঠগুলো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী! খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল
যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। হতভাগা কালেজে যাবার নাম

করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর ঘুর করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কলেজটা কোন্-দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি!

গদাই। কী সর্বনাশ! এ যে বাবা!

শিবচরণ। শুনছ? কলেজ কোন্ দিকে? তোমার অ্যানার্টমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারিশাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দাঁড় দিয়ে ঝুলছে?

গদাই নিরন্তর

মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর এক্জামিন। এইখানে তোর মেডিকেল কলেজ!

গদাই। খেয়েই কলেজে গেলে আমার অসুখ করে, তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে, একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা এক্জামিনের তাড়াতেই শূন্য হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে যে ভুতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

গদাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে এক্সেসাইজ্ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পদতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ্ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবারও জায়গা নেই!

গদাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। শ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার গাড়িতে। যা, এখনই কলেজে যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না।

গদাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

গদাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি, এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিবচরণ। না, সে হবে না—তুই ওঠ্, আমি দেখে যাই—

গদাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবচরণ। সেজন্য তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই ওঠ্ গাড়িতে। এ ঝড়িটা কিসের? তুই কি বাগবাজারে তরকারি ফেরি করে বেড়াস নাকি?

গদাই। তাই তো, ওটা তরকারিই তো বটে। কী আশ্চর্য! কেমন করে এল! এ তো মুলো দেখছি, নটেশাকও আছে। এক কাজ করি বাবা—গেরস্তর জিনিস, ঘরের ভিতরে পেঁছে দিয়ে আসি-না।

শিবচরণ। আর তোমার পরোপকার করতে হবে না। এ ঝড়ির কিনারা আমি করে দিচ্ছি, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! ঝড়িটা এর মধ্যে বেগ্নি নিয়ে উপস্থিত না হলে বাঁচি। আজ সকাল বেলাটা বেশ জমে আসছিল, মাটি করে দিলে। সাত জোড়া মোজা নিয়ে করি কী! কাল দোকানদার সেজে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবচরণ। তোর হাতে ওটা কিসের মোড়ক রে?

গদাই। আজ্ঞে ওটা—

শিবচরণ। দেখি না। (হাত টানিয়া লইয়া) এ কী ব্যাপার?

গদাই। আজ্ঞে, উপহার দেবার জন্যে।

শিবচরণ। কাকে উপহার দিবি?

গদাই। আমার একটি ক্লাস-ফ্রেন্ড্—

শিবচরণ। ক্লাস-ফ্রেন্ডকে মেয়েদের মোজা দিবি!

গদাই। তার বিয়ে হচ্ছে কিনা, তাই—

শিবচরণ। তাই, কার অনেক দিনের পরা পুরোনো ময়লা মোজা তাকে দিবি? তাও আবার সাত জোড়া!

গদাই। সেকেন্ডহ্যান্ড্ নিলেম থেকে শস্তায় কিনেছি, আপনার কাছ থেকে টাকা চাইতে ভয় করে।

শিবচরণ। চাইলেই পেতিস কিনা! ফিরিয়ে দে। ছি ছি! ঐ নোংরা মোজাগুলো নিয়ে বেড়াচ্ছিস। কী জানি কোন্ ব্যামোর ছোঁয়াচ আছে ওর মধ্যে—

গদাই। আমারও সে ভয় আছে বাবা, ছোঁয়াচ যে কোথায় কী থাকে কিছ্ বলবার জো নেই। এখনো ফিরিয়ে দিতে পারব, কালই নাহয়—

শিবচরণ। সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্ছি—পাকপ্রণালী দ্ খন্ড কিনে তাকে দিস। এখন গাড়িতে ওঠ। (সহিসের প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে।

গদাই। (জনান্তিকে সহিসের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্, তাদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্।

[প্রস্থান]

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকাল বেলাটা মাটি করে দিলে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকান্ত। নাঃ, এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন আমিই এ-সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কম্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দ্ দিন না যেতে যেতেই কিছ্ আর মনে ধরছে না।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। কী হচ্ছে চন্দ্রদা?

চন্দ্রকান্ত। না গদাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিস নে।

গদাই। কেন বলো দেখি। তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপল নাকি?

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য নোস। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

গদাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক, এত রাগ কেন।

চন্দ্রকান্ত। শুনছে তো সমস্তই! আমাদের বিন্দুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না।

গদাই। বাস্তবিক, এরকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকান্ত। বিন্দুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম! একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসার ক্ষমতাটুকুও নেই?

গদাই। আমি জানি, কবিতা লেখার চেয়েও সেটা সহজ কাজ।

চন্দ্রকান্ত। আমি ওর মৃদুদর্শন করছি নে।

গদাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত। না, তার সঙ্গে কিছুতেই মিশিছি নে, পায়ে এসে ধরে পড়লেও না। তুমি ঠিক বলেছিলে গদাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো—হঠাৎ চিড়িক মেরে আসে, তার পরে ছেড়ে যেতেও তার সয় না।

গদাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি, কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে।

গদাই। ঐ ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুন।

গদাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চস্বরে) গদাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বলাই আছে!

গদাই। তা আছে ভাই। বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে যে শিগগির আমার একটা সদৃশি না করলে—

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু গদাই, আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস নে।

গদাই। কিছু ভেবো না ভাই। পাপ করেছে বিনোদ, তার রিডেম্পশন্ আমায় দ্বারা।

চন্দ্রকান্ত। ভালা মোর দাদা! আমি একখনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়ো-বউয়ের পরামর্শটাও জানা ভালো।

[প্রস্থান

অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তাদের সংসর্গ লাভ করতে আসি, আর হারাই আমার স্ত্রীর সংসর্গ—আমার ঘটল মদুকুতার বদলে শকুতা!

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই! আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তাদের উপর কি রাগ করতে পারি? তবে দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ। কী করব চন্দরদা! আমি এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই পেরে উঠছি নে—

চন্দ্রকান্ত। কেন বল দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী? মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিস নে?

বিনোদ। চন্দরদা, কী জানি ভাই বিয়ে না করাটাই মদুখস্থ হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিনু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

বিনোদ। চন্দরদা, যাকেই হোক, বিয়ে যে করেছি সেটা বদ্বতে তো বাকি নেই। মদুশকিল হয়েছে সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই বদ্বতে পারছি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতদিন একলা রাজত্ব করেছিলাম অমর্যাদা ছিল না। আর-একটিকে পাশে বসাবামাত্র দেখি, ভাঙা সিংহাসন মড় মড় করে উঠছে। আজ অভাবগুলো চারি দিক থেকে বড়ো বেআরু হয়ে দেখা দিল—সেটা কি ভালো লাগে?

গদাই। তুমি বলতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?

বিনোদ। ভালোবাসা আছে বলেই তো বদ্বতে পারছি, যথেষ্ট টাকা নেই। পাঠ যে ফুটো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুখা ঢালা গেল। ঝাঁঝি দিয়ে মধু খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হালকা ছিলুম, দারিদ্র্যের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি, আর-একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলছি—যেখানটাতে পাকি।

গদাই। বিনোদ, তোমার কবিতা যেমন তোমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দূর্বোধ।

বিনোদ। রেগেছ বলেই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না। ভেবে দেখো-না, আমার ছিল এক মামুলি ছাতা, রোদবৃষ্টির দুঃখ ভোগ করতে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভুলে ডেকে আনলুম ছাতার আর-এক শরিক—আজ আমার কাঁধেও জল পড়ছে, তার কাঁধেও। জিনিসটা ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।

গদাই। কিন্তু ভুলটা তো তোমারই।

বিনোদ। ভুলটা হচ্ছে ভুল, আর অ-ভুলটা হচ্ছে অ-ভুল, তা সে আমারই হোক আর তোমারই হোক। মোজাটা হচ্ছে মোজা, পাগড়িটা হচ্ছে পাগড়ি। ভুল করে মোজাটাকে যদি পাগড়ি করেই পরি, তা হলে আমি ভুল করেছি বলেই মোজাটা কি পাগড়ি হয়ে উঠবে।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন? খবর পেয়েছে নাকি? সেদিন যখন মোজাজোড়া মাথায় জড়িয়ে বসেছিলুম হয়তো কোথা দিয়ে দেখে থাকবে। (প্রকাশ্যে) ওহে, মোজা নিয়ে ভুল করলেও তাতে মোজার বুক ফাটে না, বড়োজোর সেলাই ফেঁসে যেতে পারে। কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভুল ক'রে তার পরে 'ঐ যাঃ' বলে সরে দাঁড়ালে তো চলে না।

চন্দ্রকান্ত। বকাবকি করে লাভ কী গদাই? এখন বলো বিনোদ, কতব্য কী।

বিনোদ। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদ। না, আমি তাঁকে একরকম বদ্বিষয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না। তুমি সব পার বিন্দু। আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাসা

ইন্দুমতী ও কমল

কমল। না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস নে।

ইন্দু। কিরকম করে বলতে হবে? বলতে হবে, স্ত্রীর ভরটুকুও সহিতে পারেন না, বিনোদ-বিহারী এত বড়োই শোখিন কবি! তাঁর বড়োজোর সহ্য হয় ফিকে চাঁদের আলো, কিংবা ঝরা ফুলের গন্ধ। আমি ভাবছি, তোর মতো মেয়েকেও সহিতে পারল না ওর রুচিটি এতই ফিন্‌ফিনে, আর তুই যে ওর মতো পুরুষকেও সহ্য করতে পারছিস তোর রুচিকে বাহাদুরি দিই।

কমল। তুই বদ্বিষস নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব, ওদের আর-এক ভাব। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবদর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে, তার পরে ভালোবাসতে শেখে; ততদিন পৃথিবী সবদর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দু। ইস্! কী সব নবাব! আচ্ছা দিদি, তুই কি বলিস গদাই গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অর্মানি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব—মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, পূর্বজন্মের গয়লা, বিধাতা একে এবং এর অন্য গোরু-গর্দালিকে গোয়ালসুন্দর আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন!

কমল। ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠি নে। গদাই গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন, সে একে গয়লা, তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দ্র। আচ্ছা না-হয় গদাই গয়লা না হল—পৃথিবীতে গদাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমল। তা তোর অদৃষ্টে যদি কোনো গদাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দ্র। কখনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে গদাই-গদাই করে গদগদ হয়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই!

কমল। আসল জানিস ইন্দ্র? ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমানুষের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী। তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দ্র। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছুর না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ, আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ। থাক্ মা, সে-সব আলোচনা থাক্—এখন একটা কাজের কথা বলি। কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না, আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সৃদেও বেড়েছে; তোমার কুড়ি বছর বয়স হলে তবে তোমার পাবার কথা। সময় হয়েছে, এখন নাও তোমার বিষয়। সেই টানে হয়তো স্বামীও এসে পড়বে।

কমল। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। কথাটা যাতে কেউ টের না পায়, আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা?

কমল। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমল। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে গুর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দ্র। সে তো বেশ হবে ভাই! ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সৃখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমল। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন—

ইন্দ্র। ফের আবার একদিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে নাকি?

কমল। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়। ঐ শিবচরণবাবু বোধ হয় আসছেন, চলো পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

গদাই ও শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। দেখ্, নিবারণকে আজ শেষ কথা বলব বলেই এখানে এসেছি। এখন তোর মনের কথাটা স্পষ্ট করেই বল্।

গদাই। আমি তো সব কথা স্পষ্ট করেই বলেছি। বিয়ে করবার কথায় এখন মন দিতেই পারছি নে।

শিবচরণ। এই বড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি, তা কে জানত!

গদাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল!

শিবচরণ। আরে বাপু, সামান্য না তো কী? বিয়ে করা বৈ তো নয়! রাস্তার মদুটে-মজদুর-গুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বৃদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরং কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বৃদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাস ক'রে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল!

গদাই। আপনি তো সব শুনছেন, আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার বুদ্ধিতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে, তবে না-হয় একটাকে না করে আর-একটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি, আমি তার কাছে মদুখ দেখাই কী করে?

গদাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুদ্ধিয়ে বললেই সব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে বুদ্ধিতে পারি নে, নিবারণকে বোঝাব কী? আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না ক'রে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মদুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত? পড়েছিঁস ভালো মানুষের হাতে—

গদাই। শুনছি, আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভালো ছিল। কিছু বলি নে ব'লে, বটে! সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল।

গদাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিঁস এক কথা! আমিই কি এক কথার বেশি বলছি? মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দূটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী! তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে করবি নে? যা বলবি এক কথা বল।

গদাই। কিছুতেই না বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস। এক কথা!

গদাই। সেইরকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছে—এখন আমি নিবারণকে কী বলব?

গদাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না? এক কথা—

গদাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে মলো! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরিছি আর-কী! আমি ভাবছি নিবারণকে বলি কী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদ। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী ক'রে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়।

ঘোমটা পরিয়া কমলের প্রবেশ

বিনোদ। (স্বগত) আহা, মূর্খটি দেখতে পেলে বেশ হত! (প্রকাশ্যে) আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কমল। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদ। কিছু-কিছু শুনছি। (স্বগত) গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমল। সে কথা থাক্। আমার যা-কিছু সমস্তর কর্তৃত্বভার আপনাকে নিতে হবে।

বিনোদ। আপনি যে আমাকে এত বড়ো বিশ্বাসের যোগ্য মনে করলেন, এতেই আমাকে যোগ্যতা দেবে। আপনার বিশ্বাসই আমাকে মানুষ করে তুলবে।

কমল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ। না না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমল। কাল পয়লা তারিখ, কাল থেকে তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি বন্ধে-প'ড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন।

বিনোদ। নিবারণবাবু!

কমল। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদ। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমল। আপনি বরং নীচের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, নিবারণবাবু এলেই খবর পাঠিয়ে দেব। আর-একটা কথা, আমি যে কাল আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আপনার বন্ধু ললিত চাট্‌ম্‌জেকে একবার এখানে আনতে, সেটার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

বিনোদ। সব ঠিক আছে। তিনি এলেন ব'লে, আর দেরি নেই।

কমল। তবে আমি আসি।

[প্রস্থান]

বিনোদ। হায়, হায়, এতটাই যখন বিশ্বাস করলেন তখন কেবল আর তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিশ্বাস ক'রে ঘোমটা খুললে বাঁচা যেত, তা হলেই চোখদুটি দেখতে পেতুম। কিন্তু নিবারণবাবুকে নিয়ে কী করা যায়!

[প্রস্থান]

নিবারণ ও কমলমুখীর প্রবেশ

কমল। আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না। এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাটুজেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমল। সেজন্যে ভাববেন না কাকা! আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশোনা হয় কী করে?

কমল। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা?

কমল। আমি ঠুকে বলে দিয়েছি, ঠুঁর বন্ধু ললিতবাবুকে এখানে নিয়ে আসবেন। তার পর একটা উপায় করা যাবে।

নিবারণ। তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব।

কমল। ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। এই যে, আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

নিবারণ। কেন বাপু, আমি তো তোমার মক্কেল নই।

বিনোদ। আজ্ঞে, আমাকে লজ্জা দেবেন না—আপনি বুদ্ধিতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি কিছুই বুদ্ধিতে পারি নে। আমরা সেকালের লোক।

বিনোদ। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য—তাকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে।

বিনোদ। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পালকি-ভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদ। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে—তা, যাই হোক—তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে তো—তা এখন তো অনায়াসে—

নিবারণ। বাপু, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে, এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিতে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, সে বিষয় বিবেচনা করে পরে বলব।

[প্রস্থান

বিনোদ। বড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক, এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদ। কী হে চন্দর। তুমি এখানে যে!

চন্দ্রকান্ত। নিবারণবাবু এই বাড়িতে কী কাজে এসেছেন শুনলাম। আজ তাঁরই ওখানে আমার খাওয়ার পালা পড়েছে, বড়ো ভুলে গেছেন কি না খবর নিতে এসেছি। খিদে পেয়েছে। তুমিও বড়ি নিবারণবাবুর খোঁজে এখানে এসেছ?

বিনোদ। সে কথা পরে হবে। কিন্তু তুমি পালা করে খাচ্ছ, তার মানে তো বন্ধুতে পারছি নে চন্দ্রদা!

চন্দ্রকান্ত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদ। কেন, কী হয়েছে?

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কখন তাদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শূনে রাঙ্গণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে, কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদ। বলো কী দাদা! তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে, কিছু বন্ধুতে পারছি নে।

বিনোদ। এখন তা হলে তোমার ছুটি চলছে বলো। জীবনে এই বোধ হয় ডোমেস্টিক সার্ভিসে তোমার প্রথম ফালো।

চন্দ্রকান্ত। হাঁ রে, কিন্তু উইদাউট পে। বিনু, আমার দুঃখ তোরা বন্ধুতেই পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি বিয়ে না করাটাই তোর মন্থস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। ঐ স্ত্রীটিকে এমনই বিস্ত্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বন্ধুর হাড়-কথানা খসে গেলে যেমন একদম খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেই তেমনি জগৎটা যেন ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়।

বিনোদ। এখন উপায় কী?

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি, আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস!

বিনোদ। তা বেশ কথা। কিন্তু আমাকে যে আবার শব্দরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। কার শব্দরবাড়ি?

বিনোদ। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু?

বিনোদ। স্ত্রীকে আনতে চলেছি, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু, এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন-সব সংসংকল্পের প্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দুদিন আমার দেখা পাস নি আর তোর ধর্ম-বদ্বিধ এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল?

বিনোদ। কিন্তু, চন্দ্রদা, বিপদ কী হয়েছে জান? নিবারণবাবুর যেরকম মেজাজ দেখলুম, সহজে কমলকে আমার কাছে পাঠাতে রাজি হবেন না। তুমি তো তাঁর ওখানে খেতে যাচ্ছ, আমার হয়ে একটু ওকালতি করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। নিশ্চয় করব। কিন্তু, ওরা যে বললে নিবারণবাবু এখানে এসেছেন।

বিনোদ। এই খানিকক্ষণ হল তিনি চলে গেছেন, তুমি আর দেরি কোরো না।

[প্রস্থান]

ইন্দুমতী ও কমলের প্রবেশ

কমল। তোর জ্বালায় তো আর বাঁচি নে ইন্দু! তুই আবার এ কী জটা পার্কিয়ে বসে আছিস! জালিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে নাকি?

ইন্দু। তা কী করব দিদি! কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী?

কমল। ইতিমধ্যে তুই এত কান্ড কখন করে তুললি, তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস!

ইন্দু। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান-থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব। ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই।

[প্রস্থান]

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। মহারানী, আমার বন্ধু এলে কোথায় তাঁকে বসাব?

কমল। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী?

কমল। কাদম্বিনী—বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কণ্ঠপাত করবে, এমন বোধ হয় না।

কমল। আপনাকে সেজন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না—কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদ। তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমল। মাপ করেন যদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদ। এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি।

কমল। আপনার স্ত্রী নেই কি?

বিনোদ। কেন বলুন দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

কমল। আপনি তো অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদ। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা!

কমল। আজ সন্ধ্যার সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদ। আমি বিশেষ চেষ্টা করব।

[কমলের প্রস্থান]

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। একটি সাহেব বাবু এসেছেন।

বিনোদ। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেব বৈশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেকহ্যান্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদ। একরকম ভালোয়-মন্দয়। তোমার কীরকম চলছে?

ললিত। Pretty well! জানো? I am going in for studentship next year.

বিনোদ। ওহে, আর কতদিন একজামিন দিয়ে মরবে? বিয়েথাওয়া করতে হবে না নাকি? এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject. কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry. I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি, তুমি তোমার নিজের হাত-পাগুলোকে বিয়ে করবে। অবিশ্যি, মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদ। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায়, তা হলে কী বলো?

ললিত। I admire your cheek বিন্দু! তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation. পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে, কিন্তু there is no such thing in marriage.

বিনোদ। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে পছন্দ না হয় বিয়ে করো না।

ললিত। My dear fellow, you are very kind, কিন্তু আমি বলি কী, you need not bother yourself about my happiness, আমার বিশ্বাস, আমি যদি কখনো কোনো girl কে love করি, I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form.

বিনোদ। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition.

বিনোদ। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদম্বিনী।

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good, কিন্তু I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter.

বিনোদ। (স্বগত) এর মানে কী! তবে যে রানী বললেন, কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে! দূর হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল—আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দূর ঘণ্টা কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here—চলো-না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমল ও ইন্দুমতী

ইন্দু। দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। পুরুষমানুষকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস, আমি কাউকে বিয়ে করব না।

কমল। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনিলি কী করে ইন্দু?

ইন্দু। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। ছি ছি! ছি ছি দিদি, আমার এমন লজ্জা করছে! ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে, সে খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমল। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী করবি? এখন কাকা যাকে বলছেন, তাকে বিয়ে কর্।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বলো তো মা। ললিত চাটুজ্জ যা বলেছে সে তো সব শুনছে। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে। অপমান যা হবার তা হয়েছে—

কমল। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি। আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে, তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিবকে কথা দিয়েছি, তাকেই বা কী বলি। তুমি মা, ইন্দুকে বলে ক'য়ে ওদের দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পারো তো ভালো হয়।

কমল। গদাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো?

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে।

কমল। তা, ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব।

[নিবারণের প্রস্থান]

ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমল। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোরা রাখতে হবে।

ইন্দু। কী, বল-না ভাই!

কমল। একবার গদাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর।

ইন্দু। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রার্থিতা হবে?

কমল। তোরা যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবি নে?

ইন্দু। রাখব ভাই, তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমল। তবে চল, তোরা চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস্ নে।

[প্রস্থান]

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে না-হয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনছি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে—তাকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে—বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

মুখে ঘোমটা টানিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। (স্বগত) বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে, কিন্তু কারো অনুরোধে তো পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

গদাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা-বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু। ঐকি! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন, বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন?

গদাই। ঐকি! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলাম, নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি—কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দ্র। ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

গদাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন—যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দ্র। না না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে!

গদাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজেকে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি—ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

ইন্দ্র। আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়?

গদাই। যদি পছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি, কিন্তু বাপ-মায়ে আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন গদাই।

ইন্দ্র। গদাই!—ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন!

গদাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? এখন কী আদেশ করেন?

ইন্দ্র। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে যখন কবিতা লিখবেন কাদম্বিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন আর ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

গদাই। দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দ্র। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নিজেই নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

গদাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করছেন। চোন্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে সেজন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দ্র। না, সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জনা করতে পারি, কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ডুল করলে আমার সহ্য হবে না—

গদাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দ্র। ইন্দুমতী।

গদাই। হায় হায়, এতদিন কী ভুলটাই করেছি! বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু-বেলা বাপান্ত করেছেন, তার উপরে কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা-ভাঙাভাঙি করতে হয়েছে।—

(মৃদুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দ্র প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—
কিংবা
কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে—

আহা, সে কেমন হত!

ইন্দ্র। তবে, এখন ভ্রমসংশোধন করুন, এই নিন আপনার খাতা। আমি চললুম।

[প্রস্থান]

গদাই। (উচ্চস্বরে) শুনুন যান, আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল—সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন—সুবিধে আছে, আপনাকে সেইসঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না। —হায় রে, সেই মোজার কবিতাটা যে অপরাধের বোঝা হয়ে আমার অ্যানার্টমির নোট-বইটা চেপে রইল। মেজর অপারেশন করলেও যে ওটাকে ছাঁটা যাবে না। আর সেই রিফ-করা মোজা ক-জোড়া। আজও যে প্রাণ ধরে সেগলো ফিরিয়ে দিতে পারি নি। তার উপরে সেদিন থেকে ভরদ ফুলদরি-ওয়ালার তেলে-ভাজা বেগুনি খেয়ে খেয়ে অম্লশূল হবার জো হল। ঠাকুরদাসীকে খুঁজে বের করতে হবে। সে বড়িটাকে—ইচ্ছে করছে—থাক, সে আর বলে কাজ নেই।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু—আমার বড়ো ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

গদাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিলাম তাই। বড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে, যুবাদের শাস্ত্রই এক আলাদা। (প্রকাশ্যে) তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বড়োতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

গদাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

[প্রস্থান]

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে পৃথিবী-সুন্দর খুঁজে বেড়াচ্ছি।

গদাই। কেন বাবা?

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

গদাই। কারা?

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

গদাই। কেন!

শিবচরণ। কেন! না দেখে-শুনে অর্মানি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বড়ি আর সবুর সইছে না?

গদাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে?

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস, তা তো জানতুম না। তা সেই বাগবাজারের টাঁকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

গদাই। সে কী বাবা! আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাই নে—বিশেষ আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া গদাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি, আমাকে কে বড়িয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল, আমি ভালো করে বড়ি।

গদাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি?

গদাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কী! হতভাগা পাঁজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি—আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি—তুই তোর বড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর খেঁপিয়ে নিয়ে, নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

গদাই। আমাকে মাপ করো বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভুল কী রে বেটা, তোর সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতি মিনতি করে এলুম যেন আমারই কন্যাদায়

হয়েছে। তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তখন বলে কিনা 'বিয়ে করব না'! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (গদাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক—এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো-না চন্দর, ওর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করলুম, যখন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল তখন বলে কিনা 'তাকে বিয়ে করব না'। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

গদাই। বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে, আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেরি আস্ত থেপা—তা তাদের বুঝাতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকাল কুস্মাণ্ডের মতো এত বড়ো বাঁদর দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর, তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি।

[প্রস্থান]

নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মরজি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কি, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে, এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, আমার অভ্যাস নেই, এখন থাক্, অসময়ে খেয়েছি কি আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

[প্রস্থান]

কমল ও ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমল। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি।

ইন্দু। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমল। এখন পুরুষ জাতটাকে কীরকম লাগছে?

ইন্দু। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমল। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, গদাই গয়লাকে তুই কক্খনো বিয়ে করবি নে!

ইন্দু। না ভাই, গদাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বলো। তোমার কল্লোলকুমার, লাবণ্যকিশোর, কাকলিকণ্ঠ, স্নানস্মিতমোহনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। গদাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমল। কী হিসেবে ভালো শুননি।

ইন্দু। বিনোদবিহারী নামটা বাগভট্টের কাদম্বরীতেই চলে, আঠারো-গর্জি সমাসের মধ্যে। গদাই বেশ সাদাসিধে, ওর মধ্যে বোপদেবের হস্তক্ষেপ করবার জো নেই। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মা দুর্গা কীর্তিকের চেয়ে গণেশকেই বেশি ভালোবাসেন। গদাই নামটি আমার গদাইগণেশ, তোমার বিনোদকীর্তিকের চেয়ে ভালো।

কমল। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্দু। আমি তো ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি!

কমল। তা, যে নমুনা দেখিয়েছিলি! তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শূন্যে বিয়ে করলে স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দু। আমার তো তার দরকার হবে না। আমার কবি কেবল আমারই কবি, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক।

কমল। ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমল। সবাই প্রশংসা করবে, ঐ আশংকাটা তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্ বোন! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দু। ঐ বিনোদবাবু আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[ইন্দুমতীর প্রস্থান]

বিনোদের প্রবেশ

কমল। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদ। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

কমল। আমার বোধ হচ্ছে, তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়।

কমল। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শূন্যে আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না।

বিনোদ। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল। ও কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না, আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমল। খুব ভালোরকম চিনি।

বিনোদ। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমল। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেয়ে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদ। এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালো-বাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে বলে নয়।

কমল। তবে আর-একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি।

বিনোদ। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমল। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন—

বিনোদ। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমল। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্য আপনি ভাববেন না—

বিনোদ। তবে এত মিনতি করছি, তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন?

কমল। আপনি সত্যিই যে তাঁর দেখা চান, এ জানতে পারলে তিনি এক মুহূর্ত গোপনে থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান তো দেখুন।

মুখ-উদ্ঘাটন

বিনোদ। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। মাপ করিস নে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক, তার পরে মাপ।

বিনোদ। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দু। দেখেছিস ভাই, কত বড়ো নির্লজ্জ! এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ঠুঁদের একটু আদর দিয়েছিস কি, আর ঠুঁদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ঠুঁদের উপযুক্ত শাসন হয় না। যদি নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ঠুঁদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদ। তা হলে ভূ-ভার-হরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

ইন্দু।

গান

এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে।

ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে।

ওগো পৃথিবী, পথের টানে

চলেছিলে মরণ-পানে—

আঁঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে।

মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে,

মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।

স্বপ্নস্রোতে ভিড়িবি পারে,

বাঁধিবি দুজন দুই জনারে—

সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে।

ইন্দু। এখন কবিসম্মিতি, এর একটা জবাব দিতে হবে তোমাকে।

বিনোদ। এখনি? হাতে হাতে?

ইন্দু। হাঁ, এখনি।

বিনোদ। আচ্ছা, দুটো মিনিট সময় দাও।

নোটবই লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত

কমল। এ আবার তুই কী খেলা বের করলি ইন্দু!

ইন্দু। কমলদিদি, তুমি যে-খেলা খেলে নিলে এ তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। উনি বাঁধছেন কাব্য, তুমি বেঁধেছ কবিকে।

কমল। ওগো শিকারী, তুমি আর কথা কোয়ো না। তোমার নিজের কবিটির কাহিনী ভুলে গেছ বন্ধু? একবার তাকে হল অস্বীকার, আবার হল স্বীকার—মানুষটাকে কি কম নাকাল করা হয়েছে!

ইন্দু। আমার অ-কবিটিকে আমি কবি বানিয়েছি, এর বেশি কিছু না—কিন্তু তোমার মানুষটি আদিত্য ছিলেন কবি, মধ্যো হলেন অ-কবি, আবার অন্তে উলটো রথে ফিরছেন কবিদ্বৈ, এ কী কম কথা! আমাদের কমল অধিকারীর এই পালাটির নাম দিয়েছি কবি-জগন্নাথের রথযাত্রা। মন্দির থেকে বেরোনো, আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনা। দুর্দিন বাদেই দেখাবি, থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যে।—লেখা হল কবির?

বিনোদ। হয়েছে।

ইন্দু ও কমলে মিলিয়া নোটবই লইয়া মনে মনে পাঠ

ইন্দু। পাকা আম নিঙড়োলে রসের সঙ্গে আঁটি বেরিয়ে আসে, এও যে তাই।

বিনোদ। অর্থাৎ?

ইন্দু। অর্থাৎ, এ তো শুধু কাব্যরস নয়, এ যে রসতত্ত্ব। দিদি, তোমার এ কবিটি যে-সে কবি নয়—কাব্যকুঞ্জবনে এই মানুষটি নারিকেলজাতীয়। তোমার ভাগ্যে শাঁসও জুটবে, রসও জুটবে!

কমল। আর তোর ভাগ্যে ইন্দু?

ইন্দু। শুধু ছোবড়া।

বিনোদ। ছি ছি ভাই, আমার মধ্যে এমন রসের সংকীর্ণতা দেখলে কোথায়?

ইন্দু। কবির, সংকীর্ণতার দর বেশি, ঔদায়েই সস্তা করে। হীরের টুকরো সংকীর্ণ, পাথরের চাঁই মস্ত। আমরা চাই, তুমি একলা আমার দিদির কণ্ঠহারে একটিমাত্র মধ্যমণি হয়ে থাকো—সরকারি হোটেলের রান্নাঘরে মস্ত শিলনোড়ার কাজে বিশ্বজনীন হয়ে না ওঠো।

বিনোদ। তাই সই, কিন্তু ঐ যে গানটা তৈরি করলেম ওটাকে সুরের হারে গেঁথে একলা তোমার কণ্ঠে কি স্থান দেবে না?

ইন্দু। আচ্ছা, আজ তোমার গুড কন্ডাক্টের প্রাইজ স্বরূপে এই অনুগ্রহ করতে রাজি আছি। কোন্ সুর তোমার পছন্দ বলো।

বিনোদ। তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।

ইন্দু। আচ্ছা, সখা, তবে শ্রবণ করো।

গান

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির-করা।

ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।

পাওয়া ধন আনমনে

হারাই যে অযতনে,

হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা।

আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,

কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।

দূরে বারি যায় চলে,

লুকায় মেঘের কোলে,

তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা।

কমল। ঐ ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

[বিনোদের প্রস্থান]

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বৃষ্টি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য! তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দু। সে বৃষ্টি আর বাকি আছে? স্বামী-রত্নটিকে আগে-ভাগে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে?

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে ভর-সন্দের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ?

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকন্না! আমি দুদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই গুঁর আর সহ্য হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে, শুনলুম, তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ-মা একেবারে পর হয়ে গেছে? দুদিন সেখানে থাকতে পার না? যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দু। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বৃষ্টি?

ক্ষান্তমণি। তা ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি?

ইন্দু। ঐ যে গুঁরা আসছেন। এসো এই পাশের ঘরে।

[প্রস্থান]

শিবচরণ গদাই নিবারণ ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

শিবচরণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম।

চন্দ্রকান্ত। সহধর্মিণীকে না। বিয়ে করছে টাকা-কল্পলতিকাকে; সে ওকে সাতপাকে ঘিরে বিলেত যাবার পাথেয়-পুষ্পবৃষ্টি করবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের গদাইবাবুর মত নেওয়া উচিত—ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচজনে পড়ে চেপেচুপে ধরে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো গদাই, অনেক আয়োজন করবার আছে।

(নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই!

নিবারণ। এসো।—

[গদাই ও শিবচরণের প্রস্থান]

চন্দ্রবাবু, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন—একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে।

[প্রস্থান]

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে না কী?

চন্দ্রকান্ত। (দেয়ালের দিকে মূখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে নাকি?

চন্দ্রকান্ত। বিন্দুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিন্দু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা! বিন্দুর সঙ্গে কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকান্ত। (জিব কাটিয়া, মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি, এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা, তোমার তো অযত্ন হয় নি—আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেংধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম? যে বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে বৎসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনদের মড়ক হয়েছিল?

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশোবার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো, আমি আর কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একটু বোসো। নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন—উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেখানে সব ঠিক রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বলো কী, নিবারণবাবু—

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা!

ক্ষান্তমণি। ঐ রে, আবার ওরা আসছে! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি দু জনে পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্র লিখছে, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। অতএব, এ স্থলে অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জন্মলায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব!

[প্রস্থান

বিনোদ গদাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিন্দু?

বিনোদ। সে আর কী বলব, দাদা!

চন্দ্রকান্ত। গদাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি।

গদাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে দিগ্‌বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আর বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যেরকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল, কোথায় মির্জাপুর—কোথায় বাগবাজার!

গদাই। এখন ঠিক পথেই চলেছি, যাচ্ছি বাসরঘরের দিকে; এই যে সামনেই।

[প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। সন্দর্ভান্ত দেখে আমারও ঠিক পথে যাবার ইচ্ছে প্রবল হল। এখানেও আহার তৈরি, ঘরেও আহার প্রস্তুত—কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

বিনোদ। ওহে চন্দরদা, চুপ চুপ!

চন্দ্রকান্ত। কেন হে?

বিনোদ। ঐ যে স্নুর বেজে উঠল বাসরঘর থেকে।

চন্দ্রকান্ত। তাই তো, বিপদ কাছে আসছে। ছিল গলির ও পারে, এখন এল পাশের ঘরে—ক্রমে আরো কাছে আসবে।

বিনোদ। চন্দরদা, বেরসিকের মতো কথা বোলো না, বিপদ আরো বেশি ছিল যখন সেটা গলির ও পারে ছিল। যতই কাছে আসছে ততই হৃদয় ভেঙে যাবার আশঙ্কা কমছে।

নেপথ্যে গান

মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,
ফিরেছ কি ফের নাই বদ্বিব কেমনে?
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে।

গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে
ফের নি আপন দেশে,
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে?

চন্দ্রকান্ত। ওরে বিনু, এখনো মামলা চোকে নি, প্রিভিকোর্নিসলে নালিশ চলছে। তোর
তরফের কের্ণসুলির কোনো জবাব তৈরি আছে? ‘প্লীড্ গিল্টি’ নাকি।

বিনোদ। একরকম তাই। কিন্তু দাদা, আমাদের মোটা কণ্ঠে কথা জোটে তো সদর জোটে না।

চন্দ্র। তা হোক, হার মানতে পারব না। আচ্ছা, দে দেখি কথাটা—কোনোমতে সবাই মিলে
চেঁচামেচি করে চালিয়ে দিতে পারব।

বিনোদ। এই যে, আমার বইয়ে ছাপানো আছে।

চন্দ্রকান্ত। ধন্য কবি, ধন্য—নিদেন কালের উপযুক্ত সকল রকম বটিকা আগে থাকতেই তৈরি
করে রেখেছ! কাফি সদরে ঠিক লাগবে—

গান

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে!
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না লুকায় রে।
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝরিল মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন লুকায় রে?

যদি বা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল?
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোঁজা,
যাহা বদ্বিবের শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে?

তৃতীয় দৃশ্য

বাসরঘরের বাহিরে

লোকারণ্য। শঙ্খ। হৃদধ্বনি। সানাই

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি! কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই! এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।
তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এসো দেখি।

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পেঁচেছে, সেগলো রাখি কোথায়?

নিবারণ। এসেছে। বাঁচা গেছে। তা সেগলো ছাতে—

শিবচরণ। ব্যস্ত হচ্ছে কেন দাদা! কী হয়েছে বলো দেখি। কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে
রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছ্ হাতে নেই নাকি?

ভৃত্য। আসন এসেছে, সেগলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একটু গুঁছিয়েগাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা—তা তোদের
দ্বারা হবে না। চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো জ্বালালে না। এখানে
কোনো কাজেরই একটা বিলি ব্যবস্থা নেই—সমস্ত বেবন্দোবস্ত। নিবারণ, ভাই, তুমি একটু ঠান্ডা
হয়ে বোসো দেখি—ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ, বেটারের কেবল ফাঁকি!
বেহারা বেটারা সব পালিয়েছে দেখছি, আচ্ছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়?

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই—সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা
ঠান্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু, এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারি নে! আমি তাকে পইপই
করে বললাম, ‘তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচি ভাজিয়ে’, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের
টিঁকি দেখবার জো নেই! লুচি যেন কিছ্ কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বলো কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধুর দেখা
পেলে হয়, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত বিনোদ প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহা! প্রস্তুত চন্দ্রবাবু, কিছ্ খাবেন চলুন।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি গে। নিবারণ,
তুমি কিছ্ ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি—কিন্তু, লুচিটা কিছ্ কম পড়বে বোধ
হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন? সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশ-
গুলো এসে পেঁছেলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে, ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বলো কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না। আমি সব দেখে শুনিয়ে নিচ্ছি।

[শিবচরণ ও নিবারণের প্রস্থান]

চন্দ্রকান্ত। ওরে বিনু, খাবার লোভে চলেছিস বুঝি?

বিনোদ। কেন, তোমার লোভ একেবারে নেই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। কাজ আছে যে।

বিনোদ। কাজ তো ফতে হয়ে গেছে, আবার কী?

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ হয়ে গেছে সে তো ব্যক্তিগত। এখন লড়াই বাকি আছে হিউম্যানিটির জন্যে।

বিনোদ। বাস্ রে, এই অর্ধেক রাত্তিরে শেষকালে হিউম্যানিটি নিয়ে পড়তে হবে?

চন্দ্রকান্ত। হিউম্যানিটির জন্যে যত ষড়যন্ত্র সে তো অর্ধেক রাত্তিরেই।

বিনোদ। কোন্ দঃসাধ্য কাজ করতে হবে বলো শূনি।

চন্দ্রকান্ত। বাসরঘরের রুদ্ধ দুর্গ আজ আমরা স্টর্ম্ করব।

বিনোদ। আমরা ভীরু, সামান্য পুরুষজাত মাত্র—আমাদের দ্বারা কি এত বড়ো বিপ্লব ঘটতে পারবে?

চন্দ্রকান্ত। নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান কোরো না বিনোদ! ভেবে দেখো, ত্রেতাযুগে যারা সেতুবন্ধন করেছিল জীব হিসাবে তারাও যে আমাদের চেয়ে খুব বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ নেই—এমন-কি, এক-আধটা বাহ্য বাহুল্য ছাড়া অনেক বিষয়েই মিল ছিল; মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেঁটে সমুদ্র পার হল। আর, আমাদের কেবলমাত্র এই দরজাটুকু পার হতে হবে। এতকাল এই বাসরঘরের সামনে স্ত্রী-পুরুষের যে বিচ্ছেদসমুদ্র বিরাজ করেছে কেবল একটিমাত্র মহাবীর বরবেশে সেটা লঙ্ঘন করবার অধিকারী; কিষ্কিন্ধ্যার বাকি সকলকেই এ পারে পড়ে থাকতে হয়, এই অর্গোরব যদি আমরা মোচন করতে না পারি তা হলে ধিক্ আমাদের পৌরুষ!

বিনোদ। হিয়ার হিয়ার!

চন্দ্রকান্ত। এতদিন সেখানে কেবল ভুজমৃগালের শাসনই বলবান ছিল। আজ বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীর থেকে হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত সকল পুরুষে এককণ্ঠে বলো দেখি, 'নাহি কি বল এ ভুজ-অর্গলে?'

বিনোদ। আছে আছে!

চন্দ্রকান্ত। নবযুগে পুরুষদের কারখানাঘর-আফিসঘরের সামনে ফের্মিনিজ্‌ম্-এর আক্রমণ চলছে, আজ বাসরঘরের সামনে আমরা ম্যাস্‌কুলিনিজ্‌ম্ প্রচার করব। আমরা যুগান্তরের পাইওনিয়ার।

বিনোদ। জয়, পুরুষজাতিকী জয়!

চন্দ্রকান্ত। অত্যাচারকারিণীদের সিংহাসন আজ বিচলিত হোক। আবার বলো, জয় পুরুষ-জাতিকী জয়। গদাই, গদাই, গদাই, গদাধর, ভীরু, ট্রেটর্, এসো তুমি, খোলো রুদ্ধদ্বার, ভাঙো পুরুষজাতির অপমানের বাধা!

বিনোদ। চন্দরদা, ওকে স্পেশ্যাল্ কন্সেশন্ দিয়ে এরা কিনে নিয়েছে—ডিভাইড অ্যান্ড্ রুল্ পলিসি। ওকে সহজে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রকান্ত। সে কিছতেই হচ্ছে না। আজ অসম্মানিত পুরুষজাতির আহ্বান তার মৃগ হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছেবেই। গদাই! গদাধর! বিশ্বাসঘাতক! স্বজাতিবিদ্রোহী কাপুরুষ!

গদাই ইন্দুমতী ও কমলের প্রবেশ

কমল। এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা করছেন কী?

চন্দ্রকান্ত। সিঁড়িশন।

ইন্দু। আপনাদের সাহস তো কম নয়!

চন্দ্রকান্ত। শর্টহ্যান্ড-লিখিয়ে রিপোর্টার কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই ভাষাটা হয়তো কিছু অসংযত হয়েছিল। আর কিছুই নয়, আমরা বলছিলাম, 'ভাগ্যদেবীগণ, রুদ্ধদ্বার খোলো—পাপীদের ক্ষমা করবার প্রত্যক্ষ আনন্দটা ভোগ করে নাও, তাতে স্বর্গেরও গৌরব, মর্ত্যেরও পরিচয়।'

ইন্দু। যারা ক্ষমা করবার যোগ্য তাদের তো ক্ষমা হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত। এত বড়ো নিষ্ঠুর কথাটা বলতে পারলেন দয়াময়ী? দেবী, আমিই কি পারিপৃষ্ঠতম? এদের দুজনের চেয়েও অধম?

ইন্দু। তিনি আপনাকে উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

চন্দ্রকান্ত। দেবী, সেটা কি তাঁর পক্ষে আমার চেয়ে কম শোচনীয়? যিনি তারিণী তাঁর জন্যে যদি একটা বাঁধা-পাপীর বরাদ্দ না থাকে তবে তো একেবারে বেকার তিনি। যাকে বলে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রব্লেম্! বড়োবউ, তোমার অনুপস্থিতিতে যদি দৈবাৎ আমার সংশোধন হয়ে যায়, যদি তোমার জন্যে সবদূর করতে না পারি, যদি পরিত্রাণের দোসরা পথ জুটে যায়, তা হলে সেটাতে কি তোমারই যশ না আমারই!

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। আঃ কী মিছেমিছি চেঁচাচ্ছে!

চন্দ্রকান্ত। মিছেমিছি নয় দেবী! পৃথিবীসুন্দর লোক চেঁচাচ্ছে পরিত্রাণের দরবারে—কেউ-বা ধর্মে, কেউ-বা কর্মে, কেউ-বা পলিটিক্‌সে, আর আমিই যদি চুপ করে থাকব তা হলে নিতান্তই ঠকব যে। এই দুটি ভাগ্যবানদের দিকে তাকিয়ে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু চেঁচিয়েছি, ফলও পেয়েছি—এখন যবনিকাপতনের পূর্বে দয়াময়ীদের বন্দনাটা সেরে নিই।

গান

প্রথমে চন্দ্রকান্ত পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে

সেই আমাদের ভালো।

আমাদের এই আধার ঘরে

সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।

কেউ-বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ-বা ম্লান ছলছল—

কেউ-বা কিছু দহন করে, কেউ-বা স্নিগ্ধ আলো।

নতুন প্রেমে নতুন বধু আগাগোড়া কেবল মধু,

পুরাতনে অম্ল মধুর—একটুকু ঝাঁঝালো।

বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,

রাগের সঙ্গো অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।

আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,

তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,

তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।

যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—

কেউ-বা দিবি গৌরবরন, কেউ-বা দিবি কালো।

ପରିତ୍ରାଣ

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୧୯

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধনঞ্জয় ও প্রজাগণ

প্রজা। থাকতে পারলুম না যে ঠাকুর। তাই তোমাকে ধরে নিয়ে চলছি।

ধনঞ্জয়। আমাকে নিয়ে তোদের কী হবে বল তো।

প্রজা। মাঝে মাঝে তোমাকে না দেখতে পেলে যে—

ধনঞ্জয়। তোরা ভাবছিছ তোরাই আমাকে ধরে এনেছিস। তা নয় রে—আমিই তোদের খবর দিতে বেরিয়েছি—

প্রজা। কিসের খবর ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। দুঃখের দিন আসছে।

প্রজা। বল কী প্রভু?

ধনঞ্জয়। হাঁ রে, আমি ধরণীর কান্না শুনতে পাই যে।

প্রজা। কোথায় পালাব?

ধনঞ্জয়। পালাব না রে, তাকে বুঝে নেব—ভিতরে এসে দুঃখটাকে দেখব বাইরে।

গান

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া—

তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্-বিদিকে

শেষে অন্তরে পাই সাড়া।

আমি তোদের ডাকছি—সবাই আমার বৃকের ভিতরে আয়, সেইখান থেকে নির্ভয়ে দেখবি তুফানের দাপট, মরণের চোখ-রাঙানি।

প্রজা। তুমি যেখানে ডাক দাও ঠাকুর সেখানে যাবার পথ পাই নে যে।

ধনঞ্জয়। যখন হারাই বন্ধ-ঘরের তালা,

যখন অন্ধ নয়ন, শ্রবণ কালা,

তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে

শিকলে দাও নাড়া।

ঘুম যখন ভাঙবে তখনই দরজা খোলবার সময় আসবে রে।

প্রজা। ঘুম যে ভাঙে না।

ধনঞ্জয়। সেইজন্যেই তাড়া লাগছে, নইলে দুঃখ আসবে কেন।

যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,

সে-যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে,

ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ

করো গো দেশছাড়া।

অজ্ঞান হয়ে থাকিস বলেই তো স্বপ্নের চোটে তোরা গুঙরে মরিস।

প্রজা। রাজার পেয়াদা এসে যখন মার লাগায়? সেটাকে তুমি স্বপ্ন বল নাকি?

ধনঞ্জয়। তা না তো কী? স্বপ্নের হাজার লক্ষ মদুখোশ আছে; রাজার মদুখোশ প'রেও আসে—
তোদের অচেতন্য নিয়েই তোদের সে মারে, তার হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই।

আমি আপন মনের মারেই মরি
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাই নে বলে
কেঁদে ভাসাই পাড়া।

দেখ, আমি এই কথা তোদের বলতে এসেছি—সংসারে তোরাই দুঃখ এনেছি।

প্রজা। সে কী কথা ঠাকুর, আমরা দুঃখ পাই, আমরা তো দুঃখ দিই নে। আমাদের সে শক্তিই নেই।

ধনঞ্জয়। ওরে বোকা, মার খাবার জন্যে যে তৈরি হয়ে আছে মারের ফসল ফলাবার মাটি সে যে চষে রেখেছে। তোদেরই অপরাধ সব চেয়ে বেশি—তোরা তোদের অন্তর্যামী ঠাকুরকে লজ্জা দিয়েছিস, তাই এত দুঃখ।

প্রজা। আমরা কী করব বলে দাও।

ধনঞ্জয়। আর কত বলব? বার বার বলছি ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।

গান

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিন্তে
থৈ-থৈ-নর্তন-নৃত্যে,
ওরে মন বন্ধনছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে।

প্রজা। ঠাকুর, ঐ যেন কে আসছে?

ধনঞ্জয়। আসতে দে।

প্রজা। কী জানি, খুনে হবে কি ডাকাত হবে, এই অন্ধকার রাত্তিরে বেরিয়েছে।

ধনঞ্জয়। খুনেকে তোরাই খুনে করিস, ডাকাতকে করে তুলিস ডাকাত। খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্।

প্রজা। প্রভু, বিপদ ঘটতে পারে। আমরা বরঞ্চ একটু সরে দাঁড়াই—একেবারে সামনে এসে পড়বে—তখন—

ধনঞ্জয়। ওরে বোকারা, পিছন দিকে বিপদ যখন মারে তখন আর বাঁচোয়া নেই—বুক পেতে দিতে পারিস, বিপদ তা হলে নিজেই পিছন ফিরবে।

বসন্তরায় ও একজন পাঠানের প্রবেশ

পাঠান। কোন্ হ্যায় রে!

প্রজা। দোহাই বাবা, আমরা চাষি লোক—

পাঠান। রাত্তিরে কী করতে বেরিয়েছিস?

ধনঞ্জয়। রাত্তিরে যারা বেরোয় তাদের সঙ্গে মিলন হবে বলেই বেরিয়েছি। দিনে মিলি কাজের লোকের সঙ্গে, রাত্তিরে মিলি অকাজের লোকের সঙ্গে।

পাঠান। ভয় ডর নেই?

ধনঞ্জয়। দাদা, তোমারও তো ভয় ডর নেই দেখছি। দুই নির্ভয়ে সামনাসামনি দেখাসাক্ষা হল—এ তো পরম আনন্দ। (প্রজাদের প্রতি) যাস কোথায় তোরা! চেনাশোনা করে নে-না।

বসন্ত। ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমিই ধনঞ্জয় ঠাকুর, কেমন, ঠিক ঠাউরেছি কি না?

ধনঞ্জয়। ধরা পড়েছি। রাত-কানা নও তুমি।

বসন্ত। তেমন মানুষ অন্ধকারেও চোখে পড়ে।

ধনঞ্জয়। তুমিও তো অন্ধকারে ঢাকা পড়বার লোক নও, খুড়ো মহারাজ!

পাঠান। যাঃ চলে! সব ফেসে গেল!

ধনঞ্জয়। কী ফাসিল দাদা!

পাঠান। মহারাজের সঙ্গে ঠিক যে সময়টিতে একলা আলাপ জমিয়েছিলুম, তুমি এসে বাগড়া দিলে।

ধনঞ্জয়। খাঁ-সাহেব, তুমি জান না, বাগড়া দিয়েই আলাপ জমান যিনি বড়ো আলাপী।

গান

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো।

তাই তো তোমার বাণী বাজে

ঝর্না-ঝরানো।

আমার বাঁশি তোমার হাতে

ফুটোর পরে ফুটো তাতে,

তাই শুনি সদর অমন মধুর

পরান-ভরানো।

তোমার হাওয়া যখন জাগে

আমার পালে বাধা লাগে,

এমন করে গায়ে পড়ে

সাগর-তরানো।

ছাড়া পেলে একেবারে

রথ কি তোমার চলতে পারে?

তোমার হাতে আমার ঘোড়া

লাগাম-পরানো।

বসন্ত। খাঁ-সাহেব, এই তো জমে গেল। আজ পথে বাধা পেয়েছিলুম বলেই তো। যিনি বাগড়া দেন জয় হোক তাঁর।

ধনঞ্জয়। আজ বোরিয়েছ কোন্ ডাকে মহারাজ?

বসন্ত। বশোরে চলেছিলুম। ঠাকুর, গ্রামে ডাকাত পড়েছে খবর পেয়ে লোকজনদের সব পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই খাঁ-সাহেবকে নিয়ে এই রাস্তার মধ্যেই মজলিশ জমে গেল।

ধনঞ্জয়। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ-মজলিশেই মজা মহারাজ। আমিও তোমার এ সভায় হঠাৎ-দরবারী।

গান

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—

তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।

বসন্ত। বেশ, বেশ ঠাকুর। যা নিত্যি জোটে তা থাক্ পড়ে—এই হঠাতের টানেই তো বাঁধন কাটে।

ধনঞ্জয়।

গোপন পথে আপন মনে

বাহির হও যে কোন্ লগনে,

হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ!

বসন্ত। হায় হায় ঠাকুর—বড়ো শূভক্ষণেই বোরিয়েছিলুম—দেহমন শিউরে উঠছে।

ধনঞ্জয়।

নিত্য যেথায় আনাগোনা

হয় না সেথায় চেনাশোনা,

উড়িয়ে ধুলো আসছে কতই জন।

বসন্ত। আহা, ভিড়ের মধ্যে হল না দেখা! দিন বৃথা গেল।

ধনঞ্জয়। কখন পথের বাহির থেকে
হঠাৎ বাঁশি যায় যে ডেকে

পথহারাকে করে সচেতন।

বসন্ত। এসো ঠাকুর, একবার কোলাকুলি করে নিই।

প্রজা। কোথায় চলেছ মহারাজ?

বসন্ত। প্রতাপ আমাকে ডেকেছে, তাই যশোরে চলেছি।

প্রজা। রায়গড়ে ফিরে যাও আজ রাত্তিরেই।

বসন্ত। কেন বলো দেখি?

প্রজা। নানারকম গুজব কানে আসে। ভালো লাগে না।

ধনঞ্জয়। কোথাকার অযাত্রা এরা সব? নিজেরাও চলবি নে ভয়ে, অন্যকেও চলতে
দিবি নে?

প্রজা। দেখছ না ঠাকুর, পাঠানটা হঠাৎ কখন সরে গেল?

ধনঞ্জয়। তোদের সঙ্গ ওর ভালো লাগল না, তাতে আর আশ্চর্য কী রে। সবাই কি তোদের
সহ্য করতে পারে?

প্রজা। তোমার সাদা মন, তুমি বুঝবে না—ওর যে কী মতলব ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে।

ধনঞ্জয়। সাদা মনে বোঝা যায় না, ময়লা মনে বোঝা সহজ হয়, এ কথা নতুন শোনা গেল।
বিশ্বাস নেই, উপর থেকে দেখিস দিঘির পানা, বিশ্বাস করে নীচে ডুব মারিস, দেখবি ডুব-জল।
তোরা ডাঙা থেকেই মুখ ফিরিয়ে যাস, আমি না তলিয়ে দেখে ছাড়ি নে।

প্রজা। প্রভু, রাগ যে হয়।

ধনঞ্জয়। সেইজন্যেই সংসারে কেবল রাগীকেই দেখিস—না রাগতিস, তা হলে যে রাগে না
তাকেও দেখতে পেতিস।

পাঠানের পুনঃপ্রবেশ

বসন্ত। এই-যে খাঁ-সাহেব ফিরেছ। তুমি যে ফারিস বয়েদগুর্লি শুনিয়েছিলে, ওগুর্লি
আমাকে লিখে দিতে হবে।

পাঠান। দেব হুজুর, কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি। (প্রজাদিগকে দেখাইয়া) এই এদের
সরে যেতে বলো।

প্রজা। না, সে হবে না। আমরা ঠুকে ফেলে যাব না।

ধনঞ্জয়। কেন যাবি নে রে? ভারি অহংকার তোদের দেখি। তোরা হ'লি রক্ষাকর্তা, না?

প্রজা। তুমি যদি হুকুম কর তো যাই।

ধনঞ্জয়। রক্ষা করবার যদি দরকার হয়, খাঁ-সাহেব একলা রক্ষা করতে পারবেন।

[প্রজাদের প্রস্থান]

পাঠান। মহারাজ, আমাকেই রক্ষা করো।

বসন্ত। সে কী কথা? কিছন্ন বিপদ হয়েছে?

পাঠান। হয়েছে। আমি যদি আজ যশোরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ থাকবে না।

বসন্ত। সর্বনাশ! কেন, কী অপরাধ করেছে?

পাঠান। প্রতাপাদিত্য রাজা কাল যখন আমাদের দুই ভাইকে রওনা করে দিলেন, তখন পথের
মধ্যে আপনাকে খুন করবার হুকুম ছিল।

বসন্ত। কী বল খাঁ-সাহেব?

পাঠান। হাঁ, কিন্তু গোপনে। গোপনও রইল না, তা ছাড়া আপনাকে মারা আমার দ্বারা হবে
না, মর্নিবের হুকুমেও না। এখন আপনার মেহেরবারি চাই।

বসন্ত। এখনই চলে যাও রায়গড়ে। তোমার কোনো ভয় নেই।

[সেলাম করিয়া পাঠানের প্রস্থান]

বুকে বড়ো বাজল ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। বাজবে বৈকি ভাই। ভালোবাস যে—না বাজলে কি ভালো হত?

গান

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—

নিবিড় বেদনাতে পদলক লাগে গায়ে।

বসন্ত। আহা, সার্থক হোক কান্না আমার।

ধনঞ্জয়। তোমার অভিসারে

যাব অগম পারে

চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।

বসন্ত। এই ব্যথার পথেই আমাকে চালাও প্রভু! আমি আর কিছুই চাই নে।

ধনঞ্জয়। পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—

দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।

সকলি নিবে কেড়ে

দিবে না তবু ছেড়ে—

মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কী দায়ে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রগৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা কি ভালো হবে?

প্রতাপ। কোন্ কাজটা?

মন্ত্রী। যেটা আদেশ করেছেন—

প্রতাপ। কী আদেশ করেছি?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপ। আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?

মন্ত্রী। মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্তরায় যশোরে আসবার পথে শিমুলতলির চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপ। তখন কী? কথাটা শেষ করেই ফেলো।

মন্ত্রী। তখন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁকে নিহত করবে।

প্রতাপ। নিহত করবে! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না? নিহত করবে! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আনতে বুঝি বাধছে?

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপ। বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, আমি—

প্রতাপ। তুমি শিশু! খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না-করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। পিতৃব্য বসন্তরায় নিজেকে স্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। যে-আজ্ঞে।

প্রতাপ। অমন তাড়াতাড়ি 'যে-আজ্ঞে' বললে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগছে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করব না?

মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন, তবে—

প্রতাপ। আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ে না!

মন্ত্রী। প্রজারা জানতে পারলে কী বলবে?

প্রতাপ। জানতে পারলে তো।

মন্ত্রী। এ কথা কখনোই চাপা থাকবে না।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্বল করে তোলবার জন্যেই কি তোমাকে রেখেছি?

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপ। দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই স্ত্রীণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না! দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনো এল না!

মন্ত্রী। সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ।

প্রতাপ। দোষের কথা হচ্ছে না। দেরি কেন হচ্ছে তুমি কী অনুমান কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মন্ত্রী। শিমুলতালি তো কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি তো হবেই।

একজন পাঠানের প্রবেশ

প্রতাপ। কী হল?

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপ। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। জানি বৈকি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না। আমার ভাই হোসেন খাঁর উপর ভার আছে, সে খুব হুঁশিয়ার। মহারাজের পরামর্শমতে আমি খুড়া রাজাসাহেবের লোকজনদের তফাত করেই চলে আসছি।

প্রতাপ। হোসেন যদি ফাঁকি দেয়।

পাঠান। তোবা। সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ, আমি আমার শির জামিন রাখলাম।

প্রতাপ। আচ্ছা, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বক্শিশ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায় সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপ। কিসে তুমি জানলে?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি তো কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। এমন-কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি—তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই মূল বলে জানবে।

প্রতাপ। তা হলেই তুমি খুব খুশি হও! না?

মন্ত্রী। মহারাজ, এমন কথা কেন বলছেন? আপনার ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্যের বিচার আমি

করি নে, কিন্তু রাজ্যের ভালোমন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন তবে আমি আছি কী করতে? কেবল প্রতিবাদ করে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে?

প্রতাপ। আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শুন।

মন্ত্রী। আমি এই কথাই বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না। দেখুন, মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়, এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেইজন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বলিছিলাম।

প্রতাপ। সে তো বলিছিলে। তার ফল কী হল দেখো-না। আজ দু বৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কী আদায় হল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, আশীর্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উল্টে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিল। সেখানকার প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে—তার পরে যদি এই কথাটা প্রকাশ হয়, তা হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রতাপ। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপুরে থাকে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপ। সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেদ ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলিছিলুম যেমন করে হোক তাকে আচ্ছা করে শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান তো? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক তাকে আশ্রয় দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবারে তার কণ্ঠীসুন্দর কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কত বড়ো বৃকের পাটা! আর দেখো, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখো—খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বসতে হবে। সেইখানেই শ্রান্তশান্তি করব—আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখি নে।

বসন্তরায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান

বসন্ত। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় আমি বন্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তি নেই।

[প্রতাপ নীরব]

প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো—ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছি—তার পরে বহুকাল সেখানে যাও নি।

প্রতাপ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জনে) খবরদার! ঐ পাঠানকে ছাড়িস নে!

[দ্রুত প্রস্থান]

বসন্তরায়ের প্রস্থান। প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপ। এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলাম, হারিয়ে ফেললে! আর-একদিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলিছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী। আশ্চে মহারাজ—

প্রতাপ। চুপ করো! দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যা হোক, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, রাজকাৰ্ঘ্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছ না। আর-একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি মন্ত্রী, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে উদয় আছে। এমনি করে সে নিজের চার দিকে জাল জড়চ্ছে—এর পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়। যাক, চুকল।

সুরমা। কী চুকল।

উদয়। আমার উপর মাধবপদ্র শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। টাকায় আট আনা বৃদ্ধি ধরে খাজনা আদায়ের হঠাৎ হুকুম এল। বৃষ্টি নেই, এবারে সেখানে অজন্মা—তাই আমি—

সুরমা। আমি তো তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম। তার থেকে—

উদয়। তোমার গহনা কেনে এত বড়ো বৃদ্ধির পাটা এ রাজ্যে আছে? আমি মহারাজকে বললুম, মাধবপদ্র থেকে বৃদ্ধি খাজনা আমি কোনোমতেই আদায় করতে পারব না। শূনে তিনি মাধবপদ্র আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন কেবলই সৈন্য বাড়াচ্ছেন, অস্ত্র কিনছেন, টাকা তাঁর নিতান্ত চাই—তা প্রজা বাঁচুক আর মরুক।

সুরমা। পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে!

উদয়। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাদের পেটের ভাতটা জোগাব। শূনেতে পেলো মহারাজ খুশি হবেন না—নিশ্চয় ভাববেন, আমি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। উনি মনে করেন, আমি দয়া দিয়ে নাম কিনি। কিন্তু তোমার ঘরে আজ ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা। রাজপদ্রকে রাজসভায় যখন চিনলে না তখন যে তাকে চিনেছে সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়। সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপদ্র আসা যাওয়া করেন? তিনি কে শূনি? এ খবরটা জানতুম না!

সুরমা। রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না!

উদয়। রাজপদ্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পদ্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ।

সুরমা। সে কী কথা?

উদয়। রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পদ্র জন্মায় না।

সুরমা। এ তুমি মনের স্ফোভে বলছ।

উদয়। কথাটা কি নূতন যে স্ফোভ হবে? যখন এতটুকু ছিলুম তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখছেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না? কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই।

সুরমা। প্রিয়তম, দরকার কী স্নেহের। খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেয়েছে?

উদয়। বল কী? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার করবেন না, সেটা বেশ বুদ্ধিতে পারছি।

সুদরমা। কারো পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না—আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি! তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নও, এ কথা বললেই হল? এত বড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে?

উদয়। রাজ্যভারটা নাই-বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দঃখ কিসের?

সুদরমা। না, না, ও কথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বদ্বি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে! না-হয় দঃখই পেতে হবে—তা বলে—

উদয়। আমি দঃখের পরোয়া রাখি নে। তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সুখী করতে পারি নে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্কার!

সুদরমা। যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্মজন্মান্তরে পাই।

উদয়। সুখ যদি পেয়ে থাক তো নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে; এমন-কি, মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন।

সুদরমা। আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়। তোমার পিতা শ্রীপদরাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না—সেই হয়েছে তোমার অপরাধ—মহারাজ তোমার উপর রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা!

উদয়। কে ও! বিভা বদ্বি? (দ্বার খুলিয়া) কী বিভা? কী হয়েছে?

বিভা। একটা কান্ড হয়ে গেছে। আমি আর বাঁচি নে!

[মুখ ঢাকিয়া কান্না]

সুদরমা। (বিভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কী হয়েছে ভাই, বল্!

বিভা। আর-বার যখন উনি এখানে এসেছিলেন, ঠাট্টার সম্পর্ক ধরে ঠুকে কে ঠাট্টা করেছিল।

সুদরমা। সে তো জানি, ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া মাখনটা ঠুর কাপড়ের সঙ্গে একটা লেজ জুড়ে দিয়েছিল—বলোছিল—উনি রামচন্দ্র নন, রামদাস।

বিভা। সে কথা তাঁরা ভুলতে পারেন নি। এবার এসে ঠাট্টায় জিততে পণ করে ঠুর রমাই ভাঁড়িকে মেয়ে সাজিয়ে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—মাকে কী-একটা যা-তা বলেছে।

উদয়। সর্বনাশ!

বিভা। আমি তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম—মোহন মালকে বলে তখনই তাকে বিদায় করে দিয়েছি। কিন্তু কী জানি যদি কেউ বদ্বিতে পেরে থাকে!

উদয়। তোমার কি মনে হয় মা টের পেয়েছিলেন?

বিভা। হতেও পারে মা হয়তো টের পেয়েছেন, কিন্তু অপমানটা পাছে ছাড়িয়ে পড়ে, তাই চূপ করে গেলেন।

উদয়। মা কখনো এত বড়ো সর্বনেশে কথাটা বাবাকে বলবেন না।

বিভা। তা বলবেন না, কিন্তু কেমন করে বদ্বি আর কেউ জেনেছে কি না।

সুদরমা। বিভা, ভয় পাস নে, নিশ্চয় কেউ টের পায় নি। পেলো এতক্ষণ আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত।

উদয়। ব্যাপার তো কাল হয়ে গেছে?

বিভা। হাঁ।

উদয়। তা হলে আমি বলে দিচ্ছি ফাঁড়া কেটে গেছে। বিচার করতে মহারাজের এক মনোমুহূর্ত বিলম্ব হয় না। খবর পেলো কালকের রাতটা কাটত না। তবু এক কাজ কর, বিভা তুই এখনই যা। রামচন্দ্রকে বল, এ বাড়ি থেকে চলে যেতে, যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করেন।

বিভা। তুমি বলো-না দাদা, আমার কথা যদি না শোনেন।

উদয়। না, আমি তাকে যেতে বললে সে অপমান বোধ করবে।

[বিভার প্রস্থান]

সুন্দরমা। রাজা হলেই কি মানুষ নিজের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না?

উদয়। সামান্য একটা মেয়েলি ঠাট্টার হার-জিতের কথা এই যশোরের রাজবাড়িতে স্বপ্নেও ভাবতে পারে, এত বড়ো নিবোধ! এখানেও খেয়ালের রাজত্ব বটে, কিন্তু কতবড়ো সব খেয়াল—বিধির লিখনকে মূছে ফেলে রক্তের অক্ষরে নতুন লিখন বসিয়ে দেওয়ার খেয়াল।

বসন্তরায়ের প্রবেশ

উদয়। এঁকি, দাদামশায় যে! স্বপ্ন? না মতিভ্রম?

বসন্ত।

গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় কিছু নেই, সুখে থাকো,
অধিক ক্ষণ থাকব নাকো—
এসেছি এক নিমেষের তরে।
দেখব শুধু মুখখানি,
শুনব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশান্তরে।

সুন্দরমা। দাদামশায়, কারো মুখে হাসি দেখবার জন্যে তোমাকে কোনোদিন আড়ালে থাকতে হয় নি।

উদয়। তুমি যাই বল, হাসি দেখে দেশান্তরে যেতে ইচ্ছে হয় এমন হাসি আমরা কেউ হাসি নে।

সুন্দরমা। তুমি যে এলে আমরা কোনো খবর জানতুম না।

বসন্ত। দিদি, এ সংসারে প্রত্যক্ষ এসে না পেরেছলে, কে আসবে কে না আসবে তার ঠিক খবরটি তো পাওয়া যায় না।

সুন্দরমা। ওটা শঙ্করাচার্যের মতো কথা হল। তোমার ঐ হাসিমুখে এমন কথা মানায় না।

বসন্ত। সে কথা মিথ্যে বলিস নি ভাই। সংসার অনিত্য, জীবন অনিশ্চিত, এ-সব কথা ঘোর মিথ্যে। তোদের মুখ যখনই দেখি তখনই সংসার নিত্য, তখনই জীবন চিরদিনের, তা যেদিন মরি আর যেদিন বাঁচি।

সুন্দরমা। যে অমৃত-মুখের কথা বললে সেটিকে তোমার তুষিত চক্ষু খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি কি বুঝতে পারছি নে?

বসন্ত। ওটা ভাই, মিথ্যে অভিমানের কথা বললি, মহাদেব বৃকের মধ্যে রেখেছেন অম্লপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেছেন গঙ্গাকে—কাউকেই তাঁর ছাড়লে একদন্ড চলে না—তাঁর প্রাণের অম্লজল দুইই সমান চাই।

সুন্দরমা। আর আমার ঠাকরুণদিদি! এখানে এসেই বুঝি ভুললে?

বসন্ত। তিনি তো আমার চাঁদ। বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েছেন। তাঁকে ভুলেও ভোলবার জো নেই।

সুন্দরমা। তিনি চাঁদের মতোই চূপ করে থাকেন বটে, আমি বোধ হয় গঙ্গার মতোই মুখরা।

বসন্ত। সে কথা অস্বীকার করতে পারি নে। চক্ষু বৃজে ঐ স্নিগ্ধ কলকণ্ঠ নিয়তই মনে মনে শুনতে পাই।

সুন্দরমা। এত স্তুতিবাক্যও চতুর্মুখ তোমার এক মুখে জোগান কী করে?

বসন্ত। সে আমার এই বাগ্‌বাদিনীর গুণে—বিধিরও নয়, আমারও নয়।

সুন্দরমা। আর নয় দাদামশায়, মিষ্টির পরিমাণটা একলার পক্ষে কিছু বেশি হয়ে উঠেছে।

বিভার দ্রুত প্রবেশ

বসন্ত। বিভা! কী হয়েছে দিদি, তোমার মুখ অমন কেন?

বিভা। মহারাজের কানে গিয়েছে।

উদয়। কী সর্বনাশ! কেমন করে গেল? মা কিছুর বলেছেন না কি?

বিভা। না, মা বলেন নি। ঠাণ্ডা নিজেই থাকতে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের রাজবাড়ির লোকদের কাছে বড়াই করতে গিয়েছেন—তার থেকেই রাগ হয়েছে।

বসন্ত। কী হয়েছে ব্যাপারটা?

উদয়। রামচন্দ্র ছেলেমানুষি করে অন্তঃপুরে তার ভাড়িকে পাঠিয়েছিল মেয়ে সাজিয়ে। সে কথা মহারাজের কানে উঠেছে, এখন কী হয় কিছুরই বলা যায় না।

বসন্ত। আমি একবার প্রতাপের কাছে যাই।

উদয়। এখন কিছুর বোলো না—উলটো হবে। আগে দেখি মহারাজ কী হুকুম দেন।

সুদরমা। হুকুম যাই দিন, এখনই যশোর ছেড়ে ওঁদের পালানো চাই।

রামমোহন মালের প্রবেশ

রামমোহন। (বিভার প্রতি) তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মা, ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই এখানে এলুম।

বিভা। (সভয়ে) কেন, কেন, কী হয়েছে!

রামমোহন। কিছুরই হয় নি। আজ কতকাল পরে মায়ের দেখা পেয়েছি। চারজোড়া শাখা এনেছি তুমি পরো, আমি দেখে যাই।

উদয়। রামমোহন, তোমাদের নৌকো সব তৈরি আছে?

রামমোহন। এখনই কিসের তৈরি যুবরাজ। কতদিন পরে আমাদের আসা, এখন তো শিগগির মাকে ছেড়ে যাচ্ছি নে।

বিভা। মোহন, এখনই নৌকো তৈরি করা গে—একটুও দেরি করিস নে।

রামমোহন। কেন মা?

বিভা। বিপদ ঘটিয়েছে—তুই তো সব জানিস। ঐ-যে ভাড় এসেছিল অন্তঃপুরে। সে কথা মহারাজের কানে গিয়েছে।

রামমোহন। বেশ তো, এখনই তার মুণ্ডু নেন-না—তার নোংরা মুখটা বন্ধ হলে আমরাও বাঁচি। আমি ধরে এনে দেব তাকে—ভাবনা নেই।

উদয়। রামমোহন, সে কীটটাকে কেউ ছোঁবেও না, তার চেয়ে বড়ো বিপদের ভয় আছে। তোমাদের সব চেয়ে বড়ো যে ছিপ নৌকো তার দাঁড়ি কত?

রামমোহন। চৌবাড়ি জন।

উদয়। সেই নৌকোটা আমার এই জানলার সামনের ঘাটে এখনই তৈরি করে আনো। আজ রাত্তিরেই কোনোমতে রওনা করে দিতে হবে।

রামমোহন। দেরি হবে না যুবরাজ, দণ্ড দুয়েকের মধ্যে সব তৈরি করে রেখে দেব। কী করতে হবে বলে দাও।

উদয়। এই জানলা দিয়ে তাঁকে নাবিয়ে দিতে হবে, তার পরে রাতারাতি তোরা দাঁড়ি টেনে চলে যাবি।

[রামমোহনের প্রস্থান। বিভা বসিয়া পড়িয়া মুখে অশ্রু দিয়া রোদন]

বসন্ত। দিদি, ভয় করিস নে, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাকতে তোর ভয় নেই রে।

বিভা। ভয় না, দাদামশায়, লজ্জা! ছি ছি, কী লজ্জা! রাজার ছেলে হয়ে এমন ব্যবহার তো আমি ভাবতে পারি নে। জন্মের মতো আমার যে মাথা হেঁট হয়ে গেল।

বসন্ত। এখন ও-সব কথা ভাবিস নে, আপাতত—

বিভা। অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। কিন্তু এ যে তারও বেশি। এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইল না।

সুদরমা। বিভা, এখন মনটা বিচলিত করিস নে।

বিভা। বউদিদি, যদি মহারাজ শাস্তি দেন, আমার তো কিছুই বলবার থাকবে না। তাঁর সম্মান তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের সুখদুঃখের চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁর মেয়ে হয়ে এ কথা কি আমি বদ্বাক্যে পারি নে?

বসন্ত। এখন রামচন্দ্র আছেন কোথায়?

বিভা। বাইরের বৈঠকখানায় নাচগান জমিয়েছেন—শহর থেকে তিনি সব নাচওয়ালি আনিয়েছেন, আজ দুদিন ধরে এই-সব চলছে।

বসন্ত। কলি যখন সর্বনাশ করে তখন আমোদ করতে করতেই করে। যেমন করে পার বিভা, তুমি এখনই তাকে ডাকিয়ে আনাও।

[বিভার প্রস্থান]

নেপথ্যে। উদয়, উদয়!

উদয়। ঐ-যে মহারাজ আসছেন।

[সুদরমার পলায়ন]

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। শুনছে সব কথা?

উদয়। শুনছি।

প্রতাপ। লহমেন সর্দারকে হুকুম করেছি, কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন তার মুণ্ডু কাটা যাবে। আজ রাতে অন্তঃপুরের পাহারার ভার তোমার উপরে।

উদয়। আমার উপরে মহারাজ? এ যে আমাকে শাস্তি।

প্রতাপ। শাস্তি আমাকেও নয়? তা বলে রাজ্যের কর্তব্য করতে হবে না?

বসন্ত। বাবা প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, এও কি সম্ভব?

প্রতাপ। কেন সম্ভব নয়?

বসন্ত। ছেলেমানুষ, সে তো অবজ্ঞার পাত্র, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য?

প্রতাপ। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এ কথা যে বোকা নাও বোঝে তারও হাত পোড়ে। দুর্বৃদ্ধি যার মাথায় জোগাতে পারে সে বুদ্ধির ফলটা কী হবে সে কি তার মাথায় জোগায় না? দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে মাথাটা তখন দেহে থাকবে না।

বসন্ত। অপরাধ যে করে সে দুর্বল, ক্ষমা যে করে শক্তি তারই, এ কথা ভুলো না।

প্রতাপ। দেখো পিতৃব্য ঠাকুর, রায়বংশের কিসে মান-অপমান সে বোধ যদি তোমার থাকবে তা হলে পাকা মাথায় আজ মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পারতে কি? তোমারও লাঞ্ছিত মাথার স্থান এই ধূলায়, আমারই দুর্ভাগ্য তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই তোমাকে স্পর্শ বললুম। খুড়োমশায়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

বসন্ত। বুঝেছি প্রতাপ, একবার যে ছুরি তোমার খাপ থেকে বেরোয় রক্ত না নিয়ে সে ফিরবে না। তা নিক, যে তার প্রথম লক্ষ্য ছিল এখনো তো সামনেই আছে। প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো।

প্রতাপ। আচ্ছা, তবে ডাকো বিভাকে।

বিভার প্রবেশ

ঐ-যে এসেছে। বিভা!

বিভা। মহারাজ!

প্রতাপ। সকল কথা শুনছে বিভা?

বিভা। হাঁ।

প্রতাপ। তোমার মাকে, আমাদের অন্তঃপুরকে কী রকম অপমান করেছে, তা তো জান?

বিভা। জানি।

প্রতাপ। আমি যদি তার প্রাণদণ্ড দিই তবে সেটা অন্যায় হবে কি?

বিভা। না।

বসন্ত। দিদি, কী বললি দিদি! মহারাজের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নে।

[বিভা নিরন্তর]

প্রতাপ। খুড়ামহারাজ, মনে রেখো বিভা আমারই মেয়ে।

উদয়। মহারাজ, আপনি দণ্ডদাতা, আপনিই শাস্তি দিন। কিন্তু এ শাস্তির দণ্ডভার আমাদের উপরে দেবেন না।

প্রতাপ। কী বলতে চাও তুমি?

উদয়। পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে, তাদের স্নেহ নেই, এইজন্যে তাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েই কর্তব্যপালন করবে। আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।

প্রতাপ। লোক থাকবে আমার, কিন্তু দায় থাকবে তোমার।

উদয়। আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম করতে পারব না।

প্রতাপ। না পার তো তারও জবাবদিহি আছে।

[প্রস্থান]

উদয়। কোথায় ফাঁক আছে, একবার দেখে আসি।

বসন্ত। কিন্তু, দাদা, তুমি এতে হাত যদি দাও তা হলে—

উদয়। তা হলে যা হবে সেটা তো এখনকার কথা নয়—এখনকার কথা হচ্ছে হাত দেওয়াই চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

নৃত্যসভা

রামচন্দ্র। নটনটীর দল

রামমোহনের প্রবেশ

রামমোহন। একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র। এখন না, যাঃ, বিরক্ত করিস নে। গান ছেড়ো না।

রামমোহন। শুনতেই হবে।

রামচন্দ্র। কাল সকালে শুনব। দেখ, বিরক্ত করিস নে।

রামমোহন। যুবরাজ ডাকছেন, জরুরি কাজ আছে।

রামচন্দ্র। বুদ্ধোচ্ছ, শালা বুদ্ধি ঠাট্টার জবাব দিতে চায়! পারবে না আমার সঙ্গে।

রামমোহন। ঠাট্টা শেষ হয়ে গেছে, এখন বিপদের পালা। শীঘ্র এসো।

রামচন্দ্র। আর ভয় দেখাতে হবে না, এখন আমার সময় নেই।

রামমোহন। এ দিকেও সময় একটুও নেই। আচ্ছা, এই দিকে আসুন, বলছি। (রামচন্দ্রকে জনান্তিকে) প্রতাপাদিত্য মহারাজ সব কথা শুনছেন।

রামচন্দ্র। না শুনলে মজাটা কী।

র ৬।২০ক

রামমোহন। কী বলেন মহারাজ, মজা! তিনি আপনার শ্বশুর, আপনার ঠাট্টার সম্পর্ক তো নন।

রামচন্দ্র। আমার ঠাট্টা চলছে শালাদের নিয়ে। তিনি সেটা যদি গায়ে মাখেন সেটা কি আমার দোষ?

রামমোহন। সে বিচার এখন নয়। আপাতত প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে, কাল সকালেই—

রামচন্দ্র। তুমি শুনলে কোথা থেকে?

রামমোহন। যুবরাজের নিজের মুখ থেকে।

রামচন্দ্র। তোর মতো বোকা দুনিয়ায় নেই রে। যুবরাজ ঠাট্টা করেছে বুদ্ধতে পারিস নে! প্রাণদণ্ড!

রামমোহন। দোহাই তোমার, একটুও ঠাট্টা নয়।

রামচন্দ্র। আমাকে ঠাট্টায় ওরা হারাতে পারবে না। তুই এখন যা।

রামমোহন। আচ্ছা, আমি যুবরাজকে ডেকে আনিছি।

[প্রস্থান]

রামচন্দ্র। (নটীদের প্রতি) ধরো গান।—

নটীদের নাচ ও গান
আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে।
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও যে।
নীরব দিঠে শূন্যায় যত
পায় না সাড়া মনের মতো,
অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে
অশ্রুধারায় মজে।
তুমি আমার কথার আভাখানি
পেয়েছ কি মনে।
এই-যে আমি মালা আনি
তার বাণী কেউ শোনে?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে
হাওয়ায় ব্যথা দিই যে পেতে;
বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া
তার ভাষা কেউ বোঝে?

রামচন্দ্র। বেটা রামমোহন আমার মনটা মিছির্মিছি খারাপ করে দিয়ে গেল। এ কেমন গোঁয়ার-গোছের ঠাট্টা এ বাড়ির? শালাদের রসের জ্ঞান একটুও নেই। থেমো না, আর একটা গান ধরো। একটু দ্রুততালে।

নটীদের গান
না ব'লে যেয়ো না চলে মিনতি করি
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারা নিশি জেগে থাকি
ঘুমে ঢলে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি।

চাকিত চমকি বন্ধু তোমারে খুঁজি,
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বন্ধি।
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি।

(রামচন্দ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিতভাবে স্বপ্নের দিকে চাহিতেছেন।)

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। উঠে এসো শীঘ্র।

রামচন্দ্র। একেবারে জোর তলব যে।

উদয়। দেরি কোরো না, এসো শিগগির।

রামচন্দ্র। বোনের পেয়াদা হয়ে এসেছ বন্ধি, তলব দিতে?

উদয়। আমার কর্তব্য আমি করলুম। যদি না শোন তো থাকো। বিধাতা যাকে মারেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

[প্রস্থান

রামচন্দ্র। আওয়াজটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে না। একবার দেখেই আসিগে। (নটীদের প্রতি)
তোমরা গান থামিয়ে না—এখনো রাত আছে বাকি। আমি এখনই আসছি।

[প্রস্থান

নটীদের গান

ফুল তুলিতে ভুল করেছি

প্রেমের সাধনে।

বন্ধু তোমায় বাঁধব কিসে

মধুর বাঁধনে।

ভোলাব না মায়ার ছলে,

রইব তোমার চরণতলে,

মোহের ছায়া ফেলব না মোর

হাসি-কাঁদনে।

রইল শূন্য বেদন-ভরা আশা,

রইল শূন্য প্রাণের নীরব ভাষা।

নিরাভরণ যদি থাকি

চোখের কোণে চাইবে না কি,

যদি আঁখি নাই বা ভোলাই

রঙের ধাঁদনে।

প্রথম নটী। কই, এখনো তো ফিরলেন না।

দ্বিতীয়া নটী। আর তো ভাই পারি নে। ঘুম পেয়ে আসছে।

তৃতীয়া নটী। ফের কি সভা জমবে নাকি!

প্রথম নটী। কেউ যে জেগে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না। এতবড়ো রাজবাড়ি সমস্ত যেন হাঁ হাঁ করছে।

দ্বিতীয়া নটী। চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল।

তৃতীয়া নটী। বাতিগুলো নিবে আসছে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না?

প্রথমা নটী। আমার কেমন ভয় করছে ভাই।

দ্বিতীয়া নটী। (বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘুমোতে লাগল—কী মর্শাকিলেই পড়া গেল। ওদের তুলে দে-না। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে।

তৃতীয়া নটী। মিছে না ভাই। একটা গান ধরো। ওগো, তোমরা ওঠো, ওঠো।

বাদকগণ। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ, এসেছেন নাকি?

প্রথমা নটী। তোমরা একবার বোরিয়ে গিয়ে দেখো না গো। কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না নাকি?

একজন বাদক। (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ও দিকে যে সব বন্ধ।

প্রথমা নটী। অ্যাঁ! বন্ধ! আমাদের কি কয়েদ করলে নাকি?

দ্বিতীয়া নটী। দূর। কয়েদ করতে যাবে কেন?

প্রথমা নটী। ভালো লাগছে না। কী হল বন্ধুতে পারছি নে। চলো ভাই, আর এখানে নয়। একটা কী কান্ড হচ্ছে।

[প্রস্থান

রাজমহিষীর প্রবেশ

রাজমহিষী। কই এদের মহলেও তো মোহনকে দেখতে পাচ্ছি নে। কী হল বন্ধুতে পারছি নে। বামী!

বামীর প্রবেশ

এ দিককার খাওয়াদাওয়া তো সব শেষ হল, মোহনকে খুঁজে পাচ্ছি নে কেন।

বামী। মা, তুমি অত ভাবছ কেন। তুমি শূতে যাও, রাত যে পুইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন।

রাজমহিষী। সে কি হয়। আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী। নিশ্চয় রাজকুমারী তাকে খাইয়েছেন। তুমি চলো, শূতে চলো।

রাজমহিষী। আমি ঐ মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ—এর মানে কী, কিছই বন্ধুতে পারছি নে।

বামী। বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলে দরজা বন্ধ করেছেন। অনেক দিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন। চলো, তুমি শূতে চলো।

রাজমহিষী। কী জানি বামী, আজ ভালো লাগছে না। প্রহরীদের ডাকতে বললুম, তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্ছে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বোরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘুমিয়েছে বন্ধি!

বামী। ঘুমোবেন না! বল কী। রাত কি কম হয়েছে।

রাজমহিষী। গান-বাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে না? ওরা মনে কী ভাববে বলো তো। এ-সমস্তই ঐ বউমার কান্ড। একটু বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘুমোচ্ছে—একটা দিন কি আর—

বামী। যাক্, সে-সব কথা কাল হবে—আজ চলো।

রাজমহিষী। মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে তো?

বামী। হয়েছে বৈকি।

রাজমহিষী। ওষুধের কথা বলিছিস?

বামী। সে-সব ঠিক হয়ে গেছে।

[উদয়ের প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য, প্রহরী পীতাম্বর ও অনুচরের প্রবেশ

প্রতাপ। কত রাত আছে?

পীতাম্বর। এখনো চার দণ্ড রাত আছে।

প্রতাপ। কী যেন একটা গোলমাল শুনলুম।

পীতাম্বর। আজ্ঞে হাঁ, তাই শুনেনি আমি আসছি।

প্রতাপ। কী হয়েছে?

পীতাম্বর। আসবার সময় দেখলুম বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপ। অন্তঃপুরের প্রহরীরা?

পীতাম্বর। হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। তারা কী বললে?

পীতাম্বর। আমার কথার কোনো জবাব দিলে না—হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

প্রতাপ। রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য বসন্তরায় কোথায়?

পীতাম্বর। বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

প্রতাপ। বোধ করি! তোমার বোধ করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে। মন্ত্রীকে ডাকো।

[পীতাম্বরের প্রস্থান]

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা—

প্রতাপ। রামচন্দ্ররায়—

মন্ত্রী। হাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপ। পরিত্যাগ করে গেছেন, প্রহরীরা গেল কোথা?

মন্ত্রী। বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপ। (মুণ্টি বন্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে? পালাবে কোথায়? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আনতে হবে। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল?

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগবত।

প্রতাপ। ভাগবত ছিল? সে তো হুঁশিয়ার; সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে?

মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করি নে। হাত-পা ইচ্ছে করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, সীতারামকে নিয়ে এসো, সেই গদাভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কী করে।

সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে।

সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ—যুবরাজ—যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বেঁধে—

বাস্তবাবে বসন্তরায়ের প্রবেশ

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি—

বসন্ত। হাঁ হাঁ সীতারাম, কী বললি? অধর্ম করিস নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।

সীতারাম। আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ। তবে তোর দোষ!

সীতারাম। আজ্ঞে না।

প্রতাপ। তবে কার দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা যুবরাজ—

প্রতাপ। তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল?

সীতারাম। আজ্ঞে, বউরানীমা—

প্রতাপ। বউরানী? ঐ সেই শ্রীপদুরের—(বসন্তরায়ের দিকে চাহিয়া) উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।

বসন্ত। বাবা প্রতাপ, এতে উদয়ের কোনো দোষ ছিল না।

প্রতাপ। দোষ ছিল না! দেখো, তুমি তার পক্ষ নিয়ে যদি কথা কও তাতে তার ভালো হবে না—এই আমি বলে দিলুম।

[বসন্তরায় কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাধবপদুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়। একেবারে সব মদ্য চুন করে আছি কেন? মেরেছে, বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছি বোটা, এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

প্রথম। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস নি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

দ্বিতীয়। বাকি আর রইল কী ঠাকুর। এ দিকে পেটের জ্বালায় মরিছি, ও দিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে—একবার খুব করে নেচে নে।

গান

আরো প্রভু, আরো আরো!

এমনি করে আমায় মারো।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই—

ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই?

যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

এবার যা করবার তা সারো সারো।

আমি হারি কিংবা তুমিই হার'।

হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,

কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—

দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

দ্বিতীয়। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বলো দেখি?

ধনঞ্জয়। যশোর যাচ্ছি রে।

তৃতীয়। কী সর্বনাশ! সেখানে কী করতে যাচ্ছ।

ধনঞ্জয়। একবার রাজাকে দেখে আসি। চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাৰ? এবার রাজ-দরবারে নাম রেখে আসব।

চতুর্থ। তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ। তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে।

পঞ্চম। জান তো, যুবরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মার সহিতে পারিস নে। সেইজন্যে, তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে পেয়াদা নয়—যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছুটেছি।

প্রথম। না না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। খুব হবে—পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

প্রথম। তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। পেয়াদার হাতে আশ মেটে নি বুদ্ধি?

দ্বিতীয়। না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারছ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। আচ্ছা, যেতে চাস তো চল। একবার শহরটা দেখে আসবি।

তৃতীয়। কিছ্ হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে।

ধনঞ্জয়। কেন রে? হাতিয়ার নিয়ে কী করবি?

তৃতীয়। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়। তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ! তোদের যদি এইরকম বুদ্ধি হয়, তবে এইখানেই থাক।

চতুর্থ। না না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাকব।

তৃতীয়। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

তৃতীয়। আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, অর্ধেক রাজত্ব চাইবি নে?

তৃতীয়। ঠাট্টা করছ ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব। সব রাজত্বটাই কি রাজার। অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী। চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।

চতুর্থ। যখন তাড়া দেবে?

ধনঞ্জয়। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে। আরো একজন শোনবার লোক দরবারে বসে থাকেন—শুনতে শুনতে তিনি একদিন মজদুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছ্ই ক্ষতি হয় না।

গান

আমরা বসব তোমার সনে।

তোমার শরিক হব রাজার রাজা

তোমার আধেক সিংহাসনে।

তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,

তারা জানে না যে মোদের গরব কত,

তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,

তুমি ডেকে লও গো আপন জনে।

প্রথম। বাবাঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বেন কেন বাপ-সকল। আদর করে ধরে রাখবেন।

প্রথম। সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়। ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ—পাহারা দিতে হয়—যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে—আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধ'রে এই হবে যার সাধন,

সে কি অমনি হবে।

আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,

সে কি অমনি হবে।

আমাকে যে দঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,

সে কি অমনি হবে।

তার আগে তার পাষণ-হিয়া গলবে করুণ রসে,

সে কি অমনি হবে।

আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,

সে কি অমনি হবে।

দ্বিতীয়। বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন, তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা যদি তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দঃখই সইলেন—কত মার খেলেন, কত ধুলো মাখলেন—হায় হায়—

গান

কে বলোছে তোমায় বঃখ, এত দঃখ সইতে।

আপনি কেন এলে বঃখ, আমার বোঝা বইতে।

প্রাণের বঃখ, বৃকের বঃখ,

সুখের বঃখ, দুঃখের বঃখ,

তোমায় দেব না দুঃখ, পাব না দুঃখ,

হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,

আমি সুখে দুঃখে পারব বঃখ চিরানন্দে রইতে—

তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

তৃতীয়। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব।

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃতীয়। যদি শুনায়, কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অশ্বে প্রাণ বাঁচে সেই অশ্বে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ। বাবা, এ কথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে ব'লেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না? ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুদ্ধি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুদ্ধি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস!

ষষ্ঠ। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ্ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না! যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।

সপ্তম। তোরা অত ভয় করছিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর্। বেটারা, কেবল তোরা বাঁচতেই চাস—পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে। যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুদ্ধি। তোরা একটু দাঁড়া, চারি দিকের ভাবগতিকটা একটু বুঝে নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। ওরে, মরতে এসেছিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা।

প্রথম। আমাদের মরণ সর্বগ্রহী। পালাব কোথায়?

দ্বিতীয়। তা, মরতে যদি হয় তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়। তোদের কী চাই বল্ দেখি।

অনেকে। আমরা তোমাকে চাই।

উদয়। আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে না রে—দুঃখই পাবি।

তৃতীয়। আমাদের দুঃখই ভালো, কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

চতুর্থ। আমাদের মাধবপুরে ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে। তা নয়। তুমি চলে এসেছ ব'লে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

উদয়। আরে চুপ কর্, চুপ কর্। ও কথা বলিস নে।

পঞ্চম। রাজা তোমাকে ছাড়বে না। আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানি নে—আমরা তোমাকে রাজা করব।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। কাকে মানিস নে রে। তোরা কাকে রাজা করবি।

প্রজাগণ। মহারাজ, পেন্নাম হই।

প্রথম। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

প্রতাপ। কিসের দরবার?

প্রথম। আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপ। বলিস কী রে।

সকলে। হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপ। আর ফাঁকি দিবি! খাজনা দেবার নামটি করবি নে!

সকলে। অন্ন বিনে মরিছি যে।

প্রতাপ। মরতে তো সকলকেই হবে। বেটারা, রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি?

প্রথম। আচ্ছা, আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি তো ঠুই হাতে মরব।

প্রতাপ। সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে?

দ্বিতীয়। (প্রথমকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দার।

প্রতাপ। ও নয়—সেই বৈরাগীটা।

প্রথম। আমাদের ঠাকুর! তিনি তো পদুজোয় বসেছেন। এখনই আসবেন। ঐ-যে এসেছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ

ধনঞ্জয়। দয়া যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভয় ছিল, কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা। প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অর্মানি দেখতে পেলুম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর, এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধু বলে ফেলি।

উদয়। ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়। কী রাজা। কী ভাই।

উদয়। এখানে কেন এলে।

ধনঞ্জয়। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে যে।

উদয়। মহারাজ রাগ করছেন।

ধনঞ্জয়। রাগই সই। আগুন জ্বলছে তবু পতঙ্গ মরতে যায়।

প্রতাপ। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেঁপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খেঁপাই বৈকি। নিজে খেঁপি, ওদেরও খেঁপাই, এই তো আমাদের কাজ।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেঁপিয়ে বেড়ায়

কোন্ খেঁপা সে।

ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে

কী যে বাজে কোন্ বাতাসে।

ওরে খেঁপার দল, গান ধর রে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস, আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক্।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—

ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।

তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি

কেঁদে মরি কোন্ হৃদ্যশে।

(প্রতাপাদিত্যের মূখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে এ কী লীলা হচ্ছে। ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি।

প্রতাপ। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না! এতবড়ো আশ্পর্ধা।

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে।

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার

ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপ। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বন্ধুর উপর বসিয়েছি মহারাজ, সেই দঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক্।

প্রতাপ। দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই, চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ। (প্রজাদের প্রতি) দেখ্ বেটা, আমি বলছি, তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা।—বৈরাগী তুমি এইখানেই রইলে।

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

ধনঞ্জয়। কেন হবে না রে। তোদের বুদ্ধি এখনো হল না। রাজা বললে ‘বৈরাগী তুমি রইলে,’ তোরা বললি ‘না তা হবে না’—আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

গান

রইল বলে রাখলে কারে,
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তাই করতে পারো,
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী,
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও—
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপ। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ—

প্রতাপ। কী। হুকুমটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না বুদ্ধি।

উদয়। মহারাজ, বৈরাগীঠাকুর সাধুপুরুষ।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে।

ধনঞ্জয়। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি দুদিন রাজার কাছে থাকব, বেটারদের সেটা সহ্য হল না।

প্রজারা। আমরা এইজন্যই কি দরবার করতে এসেছিলাম? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়। দেখ, তোদের কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাৰি কি রে বেটা। আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা সব পালা।

প্রজারা। মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না।

প্রতাপ। না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখতুম তা হলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে যে আমার কান্দতে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয়।

বিভা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী। ভগবান তো লজ্জা রাখলেন না।

সুরমা। আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে, জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না। সংসার লজ্জা দিতেও যেমন, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি। সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

বিভা। ঠিক নাও যদি হয়ে যায় তাতেই বা কী। যেটা হয় সেটা তো সহ্যেই হয়।

সুরমা। শুনোছিস তো বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন। তাঁর তো খুব নাম শুনোছি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শুন। গান শুনবি বিভা? ঐ দেখ, কেবল অতটুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন, তা হলে আমরা উপরের ঘর থেকে শুনতে পাব! ও কী, পালাচ্ছিস কোথায়?

বিভা। দাদা আসছেন।

সুরমা। তা, এলই বা দাদা।

বিভা। না, আমি যাই বউরানী।

[প্রস্থান]

সুরমা। আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পারছে না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়। সে তো হবে না।

সুরমা। কেন?

উদয়। তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।

সুরমা। কী সর্বনাশ, অমন সাধুকে কয়েদ করেছেন?

উদয়। ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি, মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি—সেইজন্য আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য কেমন করে করতে হয়।

সুরমা। কিন্তু এগুলো যে অমঙ্গলের কথা—শুনলে ভয় হয়। কী করা যাবে!

উদয়। মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি গারদেই যাব, সেখানে

যত কয়েদি আছে তাদের প্রভুর নামগান শুনিয়ে আসব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না, তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

সুদরমা। মাধবপুরের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি, কোথায় সব পাঠাব?

উদয়। গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগুলো আমাকে রাজা রাজা করে চেঁচাচ্ছিল, মহারাজা সেটা শুনতে পেয়েছেন—নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কী সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

সুদরমা। আচ্ছা, সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল রাতে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম-ভাগবতের কী দশা হবে!

উদয়। মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না, সে ভয় নেই।

সুদরমা। কেন?

উদয়। মহারাজ কখনো ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন।

সুদরমা। কিন্তু শাস্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়। সে তো আমি আছি।

সুদরমা। ও কথা বোলো না।

উদয়। বলতে বারণ কর তো বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না।

সুদরমা। আমি থাকতে তোমার বিপদ ঘটবে কেন? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়। তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে না কি? যাই হোক, সীতারাম-ভাগবতের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সুদরমা। তুমি কিন্তু কিছুর কোরো না। তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি।

উদয়। না, না, এতে তুমি হাত দিয়ে না।

সুদরমা। আমি দেব না তো কে দেবে? ও তো আমারই কাজ। আমি সীতারাম-ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়। সুদরমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

সুদরমা। আমার জন্যে তুমি কিছুর ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জান?

উদয়। কী বলো দেখি।

সুদরমা। ঠাকুরজামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কান্ডটি করলেন, বিভা সেজন্যে লজ্জায় মরে গেছে।

উদয়। লজ্জার কথা বৈকি।

সুদরমা। এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল—আজ যে তার সেই অভিমান করবারও মন্থ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে! একে তো ভারি চাপা মেয়ে, তার পরে এই কান্ড! আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষত বিভার মতো মেয়ে।

উদয়। ভগবান বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

সুদরমা। সে শক্তির অভাব নেই—বিভা তোমারই তো বোন বটে।

উদয়। আমার শক্তি যে তুমি।

সুদরমা। তাই যদি হয় তো সেও তোমারই শক্তিতে।

উদয়। আমার কেবলই ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

সুদরমা। তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো, একদিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ব একলা তোমাতেই।

উদয়। আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

সুদরমা। ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।
উদয়। আচ্ছা, চললুম, কিন্তু দেখো—

[প্রস্থান

ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ

সুদরমা। ভোর রাতে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে তো?

ভাগবতের স্ত্রী। পৌঁচেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চলবে? তোমরা আমাদের সর্বনাশ করলে!

সুদরমা। ভয় নেই কামিনী! আমার যতদিন খাওয়াপরা জুটবে তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস নে!

[উভয়ের প্রস্থান

রাজমহিষী ও বামীর প্রবেশ

রাজমহিষী। এতবড়ো একটা কান্ড হয়ে গেল, আমি জানতেও পারলুম না।

বামী। মহারানীমা, জেনেই বা লাভ হত কী। তুমি তো ঠেকাতে পারতে না!

রাজমহিষী। সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কী—জামাই বৃদ্ধি রাগ করেই গেল! এ দিকে যে এমন সর্বনাশের উদ্‌যোগ হচ্ছিল, তা মনে আনতেও পারি নি। তুই সে রায়েই জানতিস, আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি।

বামী। জানলে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে! তা মা, আর ও কথায় কাজ নেই—যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

রাজমহিষী। হয়ে চুকলে তো বাঁচতুম—এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্ছে!

বামী। ভয় খুব ছিল, কিন্তু সে কেটে গেছে।

রাজমহিষী। কী করে কাটল।

বামী। মহারাজার রাগ বউরানীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক—আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে, কিন্তু ঠুঁর ভয় ডর নেই! যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় করছেন।

রাজমহিষী। তার জন্যে তো বেশি জোগাড় করবার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলিছিলুম সেটা ঠিক আছে তো!

বামী। সে-সমস্তই তৈরি হয়ে রয়েছে, সেজন্যে ভেবো না।

রাজমহিষী। আর দেরি করিস নে, আজকেই যাতে—

বামী। সে আমাকে বলতে হবে না, কিন্তু—

রাজমহিষী। যা হয় হবে—অত ভাবতে পারি নে—ওকে বিদায় করতে পারলেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা, শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী আমি সে ঠিক করেই এসেছি—এতক্ষণে হয়তো—

[প্রস্থান

রাজমহিষী। কী জানি বামী, ভয়ও হয়।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। মহিষী!

মহিষী। কী মহারাজ!

প্রতাপ। এ-সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে?

মহিষী। কী কাজ।

প্রতাপ। ঐ-যে আমি তোমাকে বলেছিলাম শ্রীপদরের মেয়েকে তার পিতালয়ে দূর করে দিতে হবে—এ কাজটা কি আমার সৈন্য-সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী। আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপ। বন্দোবস্ত! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের! আমার রাজ্যে কজন পালকির বেহারা জুটবে না—না কি?

মহিষী। সেজন্যে নয় মহারাজ।

প্রতাপ। তবে কী জন্যে।

মহিষী। দেখো, তবে খুলে বলি! ঐ বউ আমার উদয়কে যেন জাদু করে রেখেছে সে তো তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা হলে—

প্রতাপ। এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে—এ বাড়ি থেকে ঐ মেয়েটাকে নির্বাসিত করে দিলেই জাদু ভাঙবে।

মহিষী। মহারাজ, এ-সব কথা তোমরা বুঝবে না—আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপ। কী ঠিক করেছে জানতে চাই।

মহিষী। আমি বামীকে দিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপ। ওষুধ কিসের জন্যে?

মহিষী। ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে। মঙ্গলার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপ। আমি তোমার ওষুধ-টষুধ বুঝি নে—আমি এক ওষুধ জানি—শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখছি কাল যদি ঐ শ্রীপদরের মেয়ে শ্রীপদরে ফিরে না যায় তা হলে আমি উদয়কে সুন্দর নির্বাসনে পাঠাব—এখন যা করতে হয় করোগে।

মহিষী। আর তো বাঁচি নে। কী যে করব মাথামুণ্ডু ভেবে পাই নে।

[প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। সীতারাম-ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে, সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে?

উদয়। না মহারাজ, আমি বলপূর্বক তাদের কর্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারই দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপ। বউমা তাদের গোপনে অর্থসাহায্য করছেন।

উদয়। আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপ। আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে?

উদয়। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপ। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থসাহায্য না করা হয়।

উদয়। আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপ। আর বউমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না—দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এরকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন স্পর্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়।

[উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। ওষুধের কী করলি?

বামী। সে তো এনেছি—পানের সঙ্গে সেজে দিয়েছি।

মহিষী। খাঁটি ওষুধ তো?

বামী। খুব খাঁটি।

মহিষী। খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, একদিনেই যাতে কাজ হয়। মহারাজ বলেছেন কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয়, তা হলে উদয়কে সন্ধ্যা নির্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কী কপাল করেছিলুম।

বামী। কড়া ওষুধ তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হতে কী ঘটে।

মহিষী। ভয়-ভাবনা করবার সময় নেই বামী, একটা কিছু করতেই হবে। মহারাজকে তো জানিস—কেদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরিছি। ঐ বউটাকে বিদায় করতে পারলে তবু মহারাজের রাগ একটু কম পড়বে। ও যেন গুঁর চক্ষুশূল হয়েছে।

বামী। তা তো জানি। কিন্তু ওষুধের কথা তো বলা যায় না। দেখো, শেষকালে মা, আমি যেন বিপদে না পড়ি। আর, আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী। সে আমাকে বলতে হবে না। তাকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি।

বামী। শূন্য গোট নয় মা, বাজুবন্দ চাই।

[প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।

উদয়। কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করেছে।

মহিষী। কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজের রাজকার্যের যে কী সুযোগ হবে মহারাজই জানেন।

উদয়। মা, রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না? কেবল স্থানটুকু মাত্রই তার ছিল, তার বেশি তো আর কিছু সে পায় নি।

মহিষী। (সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী যে করেন কিছু বুঝতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে অর্বাধি এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল। তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক, কী বল বাছা? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। কই এখানে তো তিনি নেই।

মহিষী। পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করলি? আমার বাছাকে আমার ফিরিয়ে দে। এসে অর্বাধি তুই তার কী সর্বনাশ না করলি। অবশেষে—সে রাজার ছেলে—তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নি।

সুরমা। কোনো ভয় নেই মা। বেড়ি এবার ভাঙল। আমি বুঝতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়েছে—আর বড়ো দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। বৃকের ভিতর যেন আগুন জ্বলে যাচ্ছে। তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলুম। অপরাধ যা-কিছু করেছি মাপ করো। ভগবান করুন, যেন আমি গেলেই শান্তি হয়।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান

মহিষী। ওষুধ খেয়েছে বুঝি! বিপদ কিছু ঘটবে না তো? যে যা বলুক, বউমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে। বামী, বামী!

বামীর প্রবেশ

বামী। কী মা।

মহিষী। ওষুধটা কি বড় কড়া হয়েছে?

বামী। তুমি তো কড়া ওষুধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী। কিন্তু বিপদ ঘটবে না তো?

বামী। আপদ-বিপদের কথা বলা যায় কি।

মহিষী। সত্যি বলছি বামী, আমার মনটা কেমন করছে। ওষুধটা কি খেয়েছে ঠিক জানিস।

বামী। বেশিক্ষণ নয়—এই খানিকক্ষণ হল খেয়েছে।

মহিষী। দেখলুম মূখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কী করলুম কে জানে। হরি, রক্ষা করো।

বামী। তোমরা তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে।

মহিষী। না, না, ছি ছি—অমন কথা বলিস নে। দেখ, আমি তোকে আমার এই গলার হারগাছটা দিচ্ছি, তুই শিগগির দৌড়ে গিয়ে মণ্ডলার কাছ থেকে এর উলটো ওষুধ নিয়ে আয়গে। যা বামী, যা। শিগগির যা।

[বামীর প্রস্থান]

বিভার সরোদনে প্রবেশ

বিভা। মা, মা, কী হল মা।

মহিষী। কী হয়েছে বিভা।

বিভা। বউদিদির এমন হল কেন মা। তোমরা তাকে কী করলে মা। কী খাওয়ালে।

মহিষী। (উচ্চস্বরে) ওরে, বামী, বামী, শিগগির দৌড়ে যা -- ওরে, ওষুধ নিয়ে আয়।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, কী হয়েছে বাপ।

উদয়। সুরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি—আর এখানে নয়।

মহিষী। (কপালে করাঘাত করিয়া) কী সর্বনাশ হল রে, কী সর্বনাশ হল।

উদয়। (প্রণাম করিয়া) চললুম তবে।

মহিষী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ। আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা।

বিভা। (পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা। আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে।

উদয়। তোকে কার হাতে দিয়ে যাব। আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে। ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি—নইলে এ পাপ-বাড়িতে আমি আর এক মৃহুত থাকতুম না।

বিভা। বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।

উদয়। দৃংখ করিস নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাঁম পেল। ওখানে কিসের গোলমাল।

(বাতায়ন হইতে নীচে চাহিয়া) প্রজারা এসেছে দেখছি। ওদের বিদায় করে দিয়ে আসিগে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

নীচের আঙিনায় মাধবপুরের প্রজাদল

প্রথম। (উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।

দ্বিতীয়। আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। এরা সব বৈরাগী ঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যেরকম গোলমাল লাগিয়েছে, এখনই মহারাজের কানে যাবে—মর্শাকিলে পড়ব। কী বাবা, তোমরা মিছে চেঁচামেচি করছ কেন বলো তো।

সকলে। আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী। আমার পরামর্শ শোন বাবা, দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাত ছোটো বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি, কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি নে।

প্রথম। আমরা আর তো কিছুই চাই নে, যে গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই।

প্রহরী। ওরে, চাই বললেই হবে এমন দেশ এ নয়।

দ্বিতীয়। আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী। তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তৃতীয়। তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে। (উচ্চস্বরে) দোহাই যুবরাজ বাহাদুর।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। আমি তোদের হুকুম করছি তোরা দেশে ফিরে যা।

প্রথম। তোমার হুকুম মানব—আমাদের ঠাকুরও হুকুম করেছে, তাঁর হুকুমও মানব—কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়। আমায় নিয়ে কী হবে।

প্রথম। তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়। তোদের তো বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে। এমন কথা মুখে আনিস। তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না।

দ্বিতীয়। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না।

তৃতীয়। আমাদের যে বুক কেমন করে ফাটছে তা বিধাতাপুত্র জানেন।

চতুর্থ। রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ্বলে গেল।

পঞ্চম। আমরা জোর করে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়। আচ্ছা, শোন, আমি বলি—তোরা যদি দেরি না করে এখনই দেশে চলে যাস, তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপুরে যাবার দরবার করব।

প্রথম। সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে?

উদয়। চেষ্টা করব। কিন্তু, আর দেরি না। এই মূহুর্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা। আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক। তোমার জয় হোক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

মন্ত্রী। যুবরাজ কারাদন্ড তো এতদিন ভোগ করলেন, এখন ছেড়ে দিন।

প্রতাপ। কারাদন্ড দেবার কারণ ঘটেছিল, ছেড়ে দেবার তো কারণ ঘটে নি।

মন্ত্রী। কেবল সন্দেহমাত্রে গুঁকে শাস্তি দিয়েছেন। প্রমাণ তো পান নি।

প্রতাপ। মাধবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লিতে চলেছিল, হাতে হাতে ধরা পড়েছিল, সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর।

মন্ত্রী। আজ্ঞে না মহারাজ, অবিশ্বাস করছি নে।

প্রতাপ। ওরা তাতে লিখেছে আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু, ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়—এ কথাগুলো তো ঠিক।

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাস্ত তো আমি দেখেছি।

প্রতাপ। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও।

মন্ত্রী। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন, এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

প্রতাপ। তোমার বিশ্বাস কিংবা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর করে তো আমি রাজকাৰ্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে তবে 'ঐ যা, মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল' বলে তো নিষ্কর্তি পাব না।

মন্ত্রী। কিন্তু ন্যায়বিচার করা রাজত্বের অঙ্গ মহারাজ। যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদন্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা হলেও রাজকাৰ্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপ। রাজ্যরক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দন্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা আমি মনে করি নে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিংবা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দন্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী। আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিংবা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্যন্ত কম্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপ। মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ।

প্রতাপ। তারা গুঁকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ চেয়েছিল।

প্রতাপ। তুমি বলতে চাও এ-সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না?

মন্ত্রী। যদি হাত থাকত তা হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপ। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো—বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি। অন্যায়ের দ্বারা অবিচারের দ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম পালন করতে হয়।

মন্ত্রী। অন্তত বৈরাগী ঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ। প্রজাদের মনে একসঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না।

প্রতাপ। আচ্ছা, সে আমি বিবেচনা করে দেখব।

মন্ত্রী। চলুন-না মহারাজ, একবার স্বয়ং ভিতরে গিয়ে যুবরাজকে দেখে আসুন-না। গুঁর মুখ দেখলে, গুঁর দুটো কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন, গোপনে অপরাধ গুঁর দ্বারা কখনো ঘটতেই পারে না।

প্রতাপ। যারা মূখের ভাব দেখে আর হায়-হায় আহা-উহু করতে করতে রাজ্যশাসন করে তারা রাজা হবার যোগ্য নয়।

বসন্তরায়ের প্রবেশ

বসন্ত। বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও। পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে তাকে এই বড়োর কাছে দাও-না।

[প্রতাপ নিরন্তর]

তুমি যা মনে করে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ, সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্র-রায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলাম।

প্রতাপ। খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোনোদিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত। ভালো, আমার আর-একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই—আমাকে সেই কারাগারে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুরোধ দাও!

প্রতাপ। সে হতে পারবে না।

বসন্ত। তা হলে আমাকে তার সঙ্গে বন্দী করে রাখো। আমাদের দুজনেরই অপরাধ এক—দণ্ডও এক হোক—যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

[নীরবে প্রতাপের প্রস্থান]

রামমোহনের প্রবেশ

বসন্ত। কী মোহন। কী খবর।

রামমোহন। মাকে আমাদের চন্দ্রবীপে আসবার কথা বলতে এসেছিলুম।

বসন্ত। প্রতাপকে জানিয়েছিস নাকি।

রামমোহন। তাঁকে জানাবার আগে একবার স্বয়ং মাকে নিবেদন করতে গিয়েছিলাম।

বসন্ত। তা, বিভা কী বললে।

রামমোহন। তিনি বললেন, তিনি যেতে পারবেন না।

বসন্ত। কেন, কেন। অভিমান করেছে বুঝি? সেটা মিছে অভিমান, রামমোহন, সে বৈশিষ্ট্য থাকবে না, একটু তুমি সবুদর করো।

রামমোহন। তিনি বললেন, ‘দাদাকে ছেড়ে আজ আমি যেতে পারব না।’

বসন্ত। আহা, সে কথা বলতে পারে বটে।

রামমোহন। বড়ো বুক ফুলিয়ে এসেছিলাম। মহারাজ নিষেধ করেছিলেন।—বলেছিলাম, মালক্ষ্মী আমাকে বড়ো দয়া করেন, আমার কথা ঠেলতে পারবেন না! আমাদের রাজা বললেন, প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়েকে নিতে পারব না। আমি বললাম, তিনি কি কেবল প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়ে? আপনার ঘরের রানী নন? শ্বশুরের উপর রাগ করে নিজের সিংহাসনকে অপমান করবেন? এই বলে চলে এসেছি, আজ আমি ফিরব কোন্‌ মূখে?

বসন্ত। বিভাকে দোষ দিয়ো না রামমোহন।

রামমোহন। না খুড়োমহারাজ, আমাদের মহারাজার ভাগ্যকেই দোষ দিই—এমন লক্ষ্মীকে পেয়েও হেলায় হারাতে বসেছেন।

বসন্ত। হারাবে কেন রামমোহন। শুবুর্ভদিন আসবে, আবার মিলন হবে।

রামমোহন। কুপরামর্শ দেবার লোক যে ঢের আছে। ওরা বলছে যাদবপুত্রের ঘরের মেয়ে এনে তাকে ঠুর পাটরানী করবে।

বসন্ত। এও কি কখনো সম্ভব? আমাদের বিভাকে ত্যাগ করবে?

রামমোহন। সেই চক্রান্তই হয়েছে, তাই আমি ছুটে এলাম। অপরাধ করলেন নিজে, আর

যিনি সতীলক্ষ্মী তাঁকে দণ্ড দিলেন। এও কি কখনো সহবে? হোক-না কলি, ধর্ম কি একেবারে নেই। চললুম মহারাজ, আশীর্বাদ করবেন, আমাদের রাজার যেন সন্মতি হয়।

বসন্ত। এখানকার বিপদ কেটে গেলে আমি নিজে যাব তোমাদের ওখানে। এমন অন্যায় হতে দেব কেন।

[রামমোহনের প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

সীতারামের প্রবেশ

কী সীতারাম, খবর কি?

সীতারাম। কারাগারে আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছি, এখনই যুবরাজ বেরিয়ে আসবেন।

বসন্ত। আবার আর-একটা উৎপাত ঘটবে না তো? একটা ফাঁড়া কাটাতে গিয়ে আর-একটা ফাঁড়া ঘাড়ে চাপে যে। আমার ভালো ঠেকছে না।

সীতারাম। কাছেই নৌকো তৈরি আছে খুড়োমহারাজ, তাঁকে নিয়ে এখনই আপনাকে পালাতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

বসন্ত। তার আগে বিভার সঙ্গে একবার দেখা করে আসিগে।

সীতারাম। না, তার সময় নেই।

বসন্ত। দেরি করব না সীতারাম, তার সঙ্গে জীবনে আর তো দেখা হবে না।

সীতারাম। তা হলে সমস্ত আমাদের বৃথা হয়ে যাবে। ঐ দেখুন, আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে।

বসন্ত। আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তো রে?

সীতারাম। কারাগারের মধ্যেই আমাদের চর আছে, এই এলেন বলে, দেখুন-না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। দাদামশায় যে!

বসন্ত। আয় ভাই, আয়।

উদয়। সমস্তই স্বপ্ন নাকি? আমি তো বুঝতে পারছি নে।

সীতারাম। যুবরাজ, এই দিকে নৌকো আছে, শীঘ্র আসুন।

উদয়। কেন, নৌকো কেন।

সীতারাম। নইলে আবার প্রহরীরা ধরে ফেলবে।

উদয়। কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি।

বসন্ত। হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করে নিয়ে চলেছি।

সীতারাম। কয়েদখানায় আমিই আগুন লাগিয়েছি।

উদয়। কী সর্বনাশ! মরবি যে রে!

সীতারাম। যতদিন তুমি কয়েদে ছিলে, প্রতিদিন আমি মরেছি।

উদয়। না, আমি পালাব না।

বসন্ত। কেন দাদা।

উদয়। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যদের বিপদের জালে জড়াতে পারব না।

বসন্ত। অন্যদের যে তাতেই আনন্দ। তোমার তাতে কোনো অপরাধ নেই।

উদয়। সে আমি পারব না। কারাগারের বন্ধন আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক ভালো। যদি পালাই তবে মৃত্তি আমার ফাঁস হবে। আমি কারাগারে ফিরব।

বসন্ত। কারাগার তো গেছে ছাই হয়ে, তুমি ফিরবে কোথায়।

উদয়। ঐ দিকে একখানা ঘর বাকি আছে।

বসন্ত। তা হলে আমিও যাই।

উদয়। না, তুমি যেতে পারবে না। কিছুতেই না।

বসন্ত। আচ্ছা, তা হলে আমি বিভার কাছে যাই। তার প্রাণটা যে কিরকম করছে, সে আমিই জানি।

উদয়। সীতারাম, আমার জন্যে যে নোকো তৈরি আছে সে নোকোয় চড়ে এখন তুই রায়গড়ে চলে যা।

সীতারাম। (উদয়কে প্রণাম করিয়া) তা ছাড়া আমার আর গতি নেই। প্রভু, যদি কোনো পুণ্য করে থাকি আর-জন্মে যেন তোমার দাস হয়ে জন্মাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

নৃত্য ও গীত

ওরে আগুন আমার ভাই,

আমি তোমারি জয় গাই।

তোমার শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।

তুমি দূর হাত তুলে আকাশ-পানে

মেতেছ আজ কিসের গানে,

একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই।

যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই,

আগল যাবে সরে—

সেদিন হাতের দাড়ি পায়ের বোড়ি

দিবি রে ছাই করে।

সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে

ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে,

সকল দাহ মিটবে দাহে

ঘুচবে সব বালাই।

[প্রস্থান]

প্রতাপদিত্য ও মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপ। দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি একবর্ণ বিশ্বাস করি নে। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। খুড়ো কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপ। হুঁ। তিনিই এই অগ্নিকান্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী। তিনি সরল লোক—এ-সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপ। বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ হবে না তার কুটিল বুদ্ধি বৃথা।

মন্ত্রী। কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি—

প্রতাপ। কোনো আশঙ্কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়োমহারাজ পালিয়েছেন। বৈরাগীটার খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী। না মহারাজ।

প্রতাপ। সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ, তাকে আবার কিসের প্রয়োজন।

প্রতাপ। আর কিছু নয়—সেই ভাড়াটাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম, তার কথা শুনতে মজা আছে।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ। আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির; কিন্তু না বলে যাই কী করে। তাই হুকুম নিতে এলুম। প্রতাপ। কদিন কাটল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে, কোনো ভাবনা ছিল না। এ-সব তারই লুকোচুরি খেলা—ভেবেছিল গারদে লুকোবে, ধরতে পারবে না। কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পর খুব হাসি, খুব গান। বড়ো আনন্দে গেছে, আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে।

গান

গুরে শিকল, তোমায় অঙ্গে ধরে
দিয়েছি ঝংকার।

তুমি আনন্দে ভাই, রেখেছিলে
ভেঙে অহংকার।

তোমায় নিয়ে করে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা—
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি,
বিনা দামের অলংকার।

তোমার 'পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারই দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ংকর।

অন্ধকারে সারা রাত
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়টি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কী বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ। অভাব কিসের। তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপ। এখন তুমি যাবে কোথায়।

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপ। বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছন্ন না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক; আমরা কোথায় লাগি। তা হলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপ। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি, যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না।

[প্রস্থান]

মন্ত্রী। মহারাজ! ঐ তো দেখি যুবরাজ আসছেন।

প্রতাপ। তাই তো, পালায় নি তবে।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। কী, তুমি যে মুক্ত দেখি?

উদয়। কেমন করে বলব মহারাজ। কারাগার পড়লেই কি কারাগার যায়।

প্রতাপ। তুমি যে পালিয়ে গেলে না?

উদয়। মেয়াদ না ফুরোলে পালাব কী করে। মহারাজের সঙ্গে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ, সেটা যখন নিজে ছিন্ন করে দেবেন সেইদিনই তো ছাড়া পাব।

প্রতাপ। তোমাকে ত্যাগ ক'রে?

উদয়। তা ছাড়া আর কী বলব। আমাকে গ্রহণ করে আমাদের তো কারো কোনো সুখ নেই।

প্রতাপ। তুমি অথচ সিংহাসনের যোগ্য নও, সেই সিংহাসনে তোমার অধিকার আছে, এর থেকেই যত দুঃখ। যেখানে যার স্থান নয় সেইখানেই তার বন্ধন।

উদয়। না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হতে আমাকে অব্যাহতি দিন এই ভিক্ষা।

প্রতাপ। তুমি যা বলছ তা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী করে জানব।

উদয়। আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ করে শপথ করব, আপনার রাজ্যের সূচ্যগ্র ভূমিও আমি কখনো শাসন করব না; সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপ। তুমি তবে কী চাও।

উদয়। মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে—কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মতো গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চলে যাই।

প্রতাপ। আচ্ছা বেশ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উদয়। আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ। আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশুরবাড়ি পেঁাছে দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপ। তার আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়।

উদয়। তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে তো তার সুখও নেই, কর্মও নেই।

প্রতাপ। তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার।

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

মহিষী ও বিভার প্রবেশ

মহিষী। উদয় কি বেঁচে আছে।

প্রতাপ। ভয় নেই। বেঁচে আছে। তুমি এখানে যে?

মহিষী। পারব কেন থাকতে। শুনলুম কারাগারে আগুন লেগেছে। উদয়, বাবা আমার, এখন ঘরে চলে।

উদয়। আমার ঘর নেই। আমি যাচ্ছি কাশী।

মহিষী। সে কী কথা। তা হলে আমাকে মেরে ফেলে যা।

উদয়। মা, এতদিনে তুমি কি ঠাউরেছ তোমার আশ্রয়েই ছেলে নিরাপদে থাকবে। আমার তো শিক্ষার আর কিছু বাকি নেই। আজ তোমাদেরই কল্যাণে বিশ্বনাথের আশ্রয় পেয়েছি। কারাগারের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্য সব আশ্রয়ই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেঁদে কী হবে মা, আজই চোখের জল মোছবার সময়।

বিভা। দাদা, আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

উদয়। কিছুতে না। (মাতার প্রতি) বিভারও তো আর জায়গা নেই—এখন তুমি অনুমতি করো, আমার সঙ্গে ওকেও অভয়-আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

মহিষী। তুই যদি যাবি উদয়, তো ও যাক তোর সঙ্গে—তোর মায়ের হয়ে ও-ই তোকে দেখতে শুনতে পারবে। ইতিমধ্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিই, যদি তারা—

প্রতাপ। চুপ করো, ওর আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়।

মহিষী। গভে ধরে সংসারে কী দুঃখই এনেছি। রাজার বাড়িতে এরা জন্মেছিল এইজন্যেই? এখন একবার বাড়িতে চল্—তার পরে—

উদয়। না মা, ও বাড়িতে আর নয়—রাস্তা বেয়ে সোজা চলে যাব, আমাদের পিছনে তাকাবার কিছুই নেই।

মহিষী। তোরা রাস্তায় বেরিয়ে যাবি, আর এই রাজবাড়ির অন্ন যে আমার বিষের মতো ঠেকবে।

উদয়। এখন আমাদের আশীর্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী। বৃদ্ধিতে পারছি, তোদের দুঃখের দিন ঘুচল। এবার ঈশ্বর তোদের সুখেই রাখবেন। তবু দুর্বল মন মানে না যে। আজ থেকে মায়ের যোগ্য সেবা তোদের আর তো কিছু করতে পারব না, তোদের জন্যে যশোরেশ্বরীর কাছে রোজ পূজো দেব।

বিভা। দাদামহাশয় কোথায় দাদা।

উদয়। তিনি কাছেই কোথাও আছেন—এখনই দেখা হবে।

প্রতাপ। না, দেখা হবে না। কোনোদিন না!

উদয়। কেন, তাঁর কী হল?

প্রতাপ। তাঁর বিচার বাকি আছে। সে-সব কথা তোমাদের ভাববার কথা নয়।

উদয়। না হতে পারে, কিন্তু এই বলে গেলুম মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হল পুণ্যের—সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। দাদামহাশয় তো মহাপুরুষ, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই ঘা খেয়ে মরে।

প্রতাপ। এখন এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো, মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বরবেশে রামচন্দ্র

রমাই। আপনি তো চলে এলেন, এ দিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়লেন।

মন্ত্রী। কিরকম হে রমাই।

রমাই। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হলে হাতের নোয়া আর বালা দুগাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করতে তম্বি কত।

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনতে পাই প্রতাপাদিত্য আপসোসে সারা হচ্ছেন। এ দিকে একটু ইশারা করলেই নিজের খরচে এখনো মেয়েটিকে পের্পিছিয়ে দিতে রাজি।

রমাই। সেটা বিনি-খরচায় হতে পারে, কিন্তু ফিরে পাঠাবার খরচাটা মহারাজের নিজের গাঁট থেকে দিতে হবে।

মন্ত্রী। সে তো বটেই। বিবাহ করেছেন তাঁদের বাড়িতে, কিন্তু নিজের বাড়িতে আনবার বেলা তো বিচার করতে হয়। কী বল রমাই।

রমাই। সে তো বটেই। পাঁকে যদি মহারাজা পা দিয়ে থাকেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্য, তা বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না?

মন্ত্রী। বেশ বলেছ রমাই।

রমাই। মন্ত্রিবর, শূভকর্মে মহারাজের যশুরে শ্বশুরমশায়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে তো? কী জানি, মনে দুঃখ করতেও পারেন।

[সকলের হাস্য]

বরণ করবার জন্যে এয়োস্ত্রীদের মধ্যে শাশুড়ি-ঠাকরুনকেও ভুললে চলবে না। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, সেটাও চাই—অতএব সেখানে যখন মিষ্টান্ন পাঠানো হবে তখন সেইসঙ্গে দু-চারছড়া কাঁচা রসভাও পাঠানো ভালো। কী বল মন্ত্রী।

মন্ত্রী। তার উপরে কথা।

[উচ্চহাস্য]

রমাই। আর দেখেন মহারাজ, যুবরাজকে একখানা পত্র লিখে জানাবেন যে, তোমাদের রাজত্ব রাজকন্যা তোমাদেরই থাক্, প্রজাপতির কৃপায় জগতে শালা-শ্বশুরের অভাব নেই। কী বলেন আপনারা।

[সকলের উচ্চহাস্য]

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি যাও, লোকজনদের দেখোগে।

[রমাইয়ের প্রস্থান]

সেনাপতি, তুমি এইখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগছে না।

সেনাপতি ফর্নান্ডিজ। মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের ধোঁয়ার মতো, তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

রামচন্দ্র। ঠিক বলেছ সেনাপতি, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে চলে যাই। আজ গান বাজনা ভালো জমছে না ফর্নান্ডিজ।

ফর্নান্ডিজ। না মহারাজ, জমছে না, আমার বন্ধুকে বাজছে—আর-এক দিনের কথা মনে পড়ছে।

রামচন্দ্র। গুজবটা কি সত্য।

ফর্নান্ডিজ। কিসের গুজব।

রামচন্দ্র। ঐ তাঁরা কি যশোর থেকে আসছেন।

ফর্নান্ডিজ। হাঁ মহারাজ, শুনোঁছি বটে। আদেশ করেন তো তাঁদের এগিয়ে আনি গে।

রামচন্দ্র। এগিয়ে আনবে? তা হলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্নান্ডিজ। আদেশ করেন তো ওদের হাসিসুদ্ধ মুখ একেবারে চেঁছে পরিষ্কার করে দিই।

রামচন্দ্র। না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। কালই রায়ে তাকে স্বপ্নে দেখেছি।

ফর্নান্ডিজ। মহারাজ, আমি আর কী বলব—তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবু দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র। দেখো সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না?

ফর্নান্ডিজ। কী বলুন।

রামচন্দ্র। মোহন যদি একবার খবর পায় যে, তাঁরা আসছেন তা হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোনোমতে তাকে সংবাদটা জানাও-না। কিন্তু দেখো, আমার নাম কোরো না।

ফর্নান্ডিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রমাইয়ের প্রবেশ

রমাই। মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না। রাগ করলে-বা।

রামচন্দ্র। হা, হা, হা, হা।

রমাই। আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর তো সেবার তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুরের উপর হাত বুলাবার চেষ্টা করছিলেন—এবারে তাঁকে—

রামমোহন দত্ত আসিয়া

রামমোহন। চুপ। আর একটি কথা যদি কও তা হলে—

রমাই। বন্ধোছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন। মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ। আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজার ঐ হাসি সহ্য করতে পারছি নে।

রামচন্দ্র। ফের বেয়াদবি করছিস।

রামমোহন। আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে করলে বন্ধলে না!

ফর্নান্ডিজ। মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান]

রামচন্দ্র। ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন। ওদের একটু গাইতে বলো-না। আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। গান ধরো।

গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে,
উছলে পড়ে আলো—
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বন্ধুতে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।
নীল গগনের ললাটখানি
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশী, ছড়াও কি এ।
ইন্দ্রপুত্রীর কোন্ রমণী
বাসরপ্রদীপ জ্বালো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়। আজ রাস্তায় মিলন, আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই, আজ আর যুবরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই। আর ভাই, কোলাকুলি করে নিই।

কোলাকুলি

দাদা, যেখানে দীন দরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই।

গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে।
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে।
নাইয় গেল সবই ভেসে—
রইবে তো সেই সর্বনেশে,
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে।
সুখ নিয়ে ভাই, ভয়ে থাকি—
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে সুখ নাড়বে।
যে পড়েছে পড়ার শেষে
ঠাই পেয়েছে তলায় এসে—
ভয় মিটেছে, বেঁচেছে সে,
তারে কে আর পাড়বে।

উদয়। বৈরাগী ঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গে ধরলুম, আর ছাড়ছি নে কিন্তু।

ধনঞ্জয়। তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই। মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খুঁতমুত কিছন্ন
নেই তো?

উদয়। কিছন্ন না, বেশ আছি।

ধনঞ্জয়। তবে দাও একটু পায়ের ধুলো।

উদয়। ও কী কর, ও কী কর। অপরাধ হবে যে।

ধনঞ্জয়। দাদা, এতবড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন, সে যে মহা-
পুরুষ। তোমাকে দেখে আমার সর্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আনো, তাকে একবার দেখি।

উদয়। সে তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, তাকে ডেকে আনিছি।

বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম

ধনঞ্জয়। ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। এই দেখ্-না, আমাকে দেখ্-না—আমি
তার রাস্তার ছেলে—রাস্তার কোলে-কোলেই দিন কেটে গেল—দিনরাতি একেবারে ধুলোয়
ধুলোময় হয়ে বেড়াই, মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের ঐ ধুলোঘরে আজ তোমার
নতুন নিমন্ত্রণ, কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা। বৈরাগী ঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে।

ধনঞ্জয়। কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েছে।
এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

সারিগানের সুর

গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে।

ও যে আমার ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমার নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে।
ও যে কোন্ বঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে।

উদয়। ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সঙ্গিনী। ওকে আমি ওর শব্দরবাড়ি পেঁাছে দিতে যাচ্ছি।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্খানে পেঁাছিয়ে দেন, আমিও সঙ্গে আছি। কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

[প্রস্থান

বিভা। দাদা, ঐ-যে মোহন আসছে। ওর সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা কইতে চাই।

উদয়। আচ্ছা, আমি একটু সরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

রামমোহনের প্রবেশ

বিভা। মোহন!

রামমোহন। মা, আজ তুমি এলে?

বিভা। হাঁ মোহন, তুমি কি আমার নিতে এলি।

রামমোহন। না মা, অত ব্যস্ত হোয়ো না, আজ থাক্।

বিভা। কেন মোহন, আজ কেন নয়।

রামমোহন। আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা। ভালো দিন নয়? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন। বরাবর দেখলুম রাস্তায় আলোর মালা, বাঁশি বাজছে। আজ বুঝি শ্রদ্ধাঙ্গন পড়েছে।

রামমোহন। শ্রদ্ধাঙ্গন, মিথ্যা কথা! সমস্ত ভুল!

বিভা। মোহন, তোর কথা আমি বুঝতে পারছি নে, কী হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল্। মহারাজ কি রাগ করেছেন?

রামমোহন। রাগ করেছেন বৈকি।

বিভা। তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামমোহন। দেরি হয়ে গেছে মা, দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা। কে বললে ফেরে না। আমি তপস্যা করে ফেরাব, আমি জীবন মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনই তুমি আমাকে নিয়ে যা। দেরি যদি হয়ে থাকে, আর এক মৃহুর্ত দেরি করব না।

রামমোহন। যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা। তিনি এখনই আসবেন।

রামমোহন। তিনি ফিরে আসুন-না।

বিভা। না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি। দাদা বললেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন ময়ূরপংখি সাজানো হচ্ছে।

রামমোহন। হাঁ, সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা। এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি।

তপতী

প্রকাশ : ১৯২৯

‘তপতী’ রচনার (১৯২৯) কিছুদিন পূর্বে ‘রাজা ও রানী’র (১৮৮৯) কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ‘যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে’ ‘ভৈরবের বলি’ (১৯২৯) নামে একটি অভিনয়যোগ্য সংস্করণ প্রস্তুত করেন। অভিনয়পট্রীতে ‘রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানীর কবিকৃত নতুন সংস্করণ’ বলে উল্লেখ করা হলেও ‘এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়’ বিধায় ‘ভৈরবের বলি’ গ্রন্থাকারে মৃদু হইয়া গিয়াছে।

ভৈরবের বালি

শ্রী ৩ অর্ধ্যক্ষের পঠিতকালে রত্নধর চিত্রমণ্ড
 ভোলাবানামালা সত্যম্ মতঃ প্রবাসম্। এইরূপ সাক্ষিক্যে
 প্রসঙ্গ সত্যম্ বিবাহ্যং পুনর্যং সত্যম্ স্থানার্থ্যং (৩৩৩)
 যথেষ্ট। ন্যায়ান্তিম্ দৃশ্যান্তিম্ উপাসনান্তিম্ চেষ্টাং সাক্ষিক্যে
 প্রতি ৩৩৩৩ - উহা ছেন ভোলাবো মেলা। প্রাচীন ভারতে
 যা প্রাচীন উহা ছিল না। তখন নাট্যদেব ও দর্শকদেবের প্রকার
 প্রকার ছিল নাটকের সাক্ষিক্যমত নাট্যরম্যুর্ প্রতি।

যথেষ্ট রত্ন ৩ বালীক কিছু কিছু উপাসন সাক্ষিক্য
 বালীক এই নাট্যমত চিত্ত।

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

২৩ ফেব্রুয়ারি
 ১৯২০

ভূমিকা

‘রাজা ও রানী’ আমার অল্পবয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

সুদৃশ্য এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুদৃশ্যের মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুদৃশ্যকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুদৃশ্যের মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুদৃশ্যের সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটাই ‘রাজা ও রানী’র মূল কথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাটকের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

অনেকদিন ধরে ‘রাজা ও রানী’র ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন তখন এটাকে যথা-সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলেন। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলেন এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সঙ্গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি।

পুরানো নাটককে নতুন করে যখন লেখা গেল তখন পুরাতনের মোহ কাটিয়ে তার নতুন পরিচয়কে পাকা করতে গেলে অভিনয় করে দেখানো দরকার। সেই চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই উপলক্ষে নাট্যমণ্ডলের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যিক।

আধুনিক যুরোপীয় নাট্যমণ্ডলের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কার্লিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখা-চিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক-ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তা হলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।

শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্যাপ্ত। আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কম্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মৃদু, মৃদু, স্থান্দু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔন্মত্যে মন

সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।

শান্তিনিকেতন
১৯ ডিস ১৩৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণ

সুদমিত্রা	জালন্ধরের রানী
বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা
নরেশ	বিক্রমের বৈমাত্ৰ ভাই
বিপাশা	সুদমিত্রার সখী
দেবদত্ত	রাজার সখা
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
গৌরী, কালিন্দী, মঞ্জরী	রাজবাড়ির পরিচারিকা
কুমারসেন	কাশ্মীরের যুবরাজ
চন্দ্রসেন	কুমারের পিতৃব্য
শংকর	কুমারের পুরাতন বন্ধু ভৃত্য
প্রবেদী	জালন্ধরের রাজপদরোহিত
ভার্গব	কাশ্মীরের মার্তণ্ডমন্দিরের পদরোহিত

রত্নেশ্বর, শিখরিণী, কুঞ্জলাল, জনতা প্রভৃতি

ভৈরবমন্দিরের প্রাঙ্গণ

দেবদত্ত ও একদল উপাসক

গান

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহো।
দূর করো মহারুদ্ধ,
যাহা মৃগধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে যে,
প্রসূত-শঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।

[দেবদত্ত ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান]

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। এর কী অর্থ? আজ মীনকেতুর পূজার আয়োজন করেছি। ভৈরবের স্তব দিয়ে তোমরা তার ভূমিকা করলে কেন।

দেবদত্ত। রাজার এই পূজা এখনো জনসাধারণে স্বীকার করতেই পারছে না। এমন-কি, তারা ভীত হয়েছে।

বিক্রম। কেন, তাদের ভয় কিসের।

দেবদত্ত। তোমার সাহস দেখে তারা স্তম্ভিত। পশুশর দগ্ধ হয়েছেন যার তপোবনে, তাঁরই পূজার বনে কন্দর্পের পূজা? এর পরিণামে বিপদ ঘটবে না কি?

বিক্রম। কন্দর্প সেবার এসেছিলেন অপরাধীর মতো লুকিয়ে—এবার তাঁকে ডাকব প্রকাশ্যে, আসবেন দেবতার যোগ্য নিঃসংকোচে—মাথা তুলে ধ্বজা উড়িয়ে। বিপদের ভয় বিপদ ডেকে আনে।

দেবদত্ত। মহারাজ, আদিকাল থেকেই ঐ দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম। ক্ষতি তাতে মানুষেরই। এক দেবতা আর-এক দেবতার প্রসাদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেন। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র মিলিয়ে চিরদিন তোমরা দেবপূজার ব্যাবসা করে এসেছ তাই দেবতার তোমরা কিছুই জান না।

দেবদত্ত। সে কথা ঠিক, দেবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পৃথিবীর থেকে। শেল্যাকের ভিড় ঠেলে মরি; দক্ষিণা পাই, কিন্তু গুঁদের কাছে ঘেঁষবার সময় পাই নে।

বিক্রম। আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয়; অনশ্টদুভ-ত্রিশ্টদুভের বন্ধন মানেন না। তিনি প্রলয়েরই দেবতা। রুদ্ধভৈরবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের মিল—পিনাক ছদ্মবেশ ধরেছে তাঁর পদ্পদনুতে।

দেবদত্ত। মহারাজ, ঐ দেবতাটিকে যথাসাধ্য পাশ কাটিয়ে চলবারই চেষ্টা করেছি। আভাসে যেটুকু জানাশোনা ঘটেছে তাতে ভৈরবের সঙ্গে অন্তত বেশেভূষায় গুর যথেষ্ট মিল দেখতে পাই নি।

বিক্রম। তার কারণ, এ পর্যন্ত রতি নিজেরই বেশের অংশ দিয়ে কন্দর্পকে সাজিয়েছে। তাঁকে রাঙিয়েছে নিজেরই কজ্জলের কালিমায়, কুঙ্কুমের রক্তিমায়, নীল কণ্ডলিকার নীলিমায়—উনি

রমণীর লালনে লালিতে আচ্ছন্ন আবিষ্ট, তাই তো বজ্রপাণি ইন্দ্রের সভায় তাঁন লঙ্ঘিতভাবে চরের বৃত্তি করেন। রুদ্রের পৌরুষের আগুনে তাই তো ঠুকে দগ্ধ করেছিল।

দেবদত্ত। সে ইতিহাস তো চুকে গেছে। আবার সেই পোড়া দেবতাকে নিয়ে কেন এই উপসর্গ। পুনর্বার ঠুকে পোড়াতে হবে নাকি।

বিক্রম। না, তাঁকে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই বাঁচাতে হবে—সেজন্যে বীরের শক্তি চাই। তোমাদের ভৈরবের স্তব সম্পূর্ণ হবে না আমাদের মীনকেতুর স্তব যদি তার সঙ্গে না যোগ করি।

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পদ্পধনু,
রুদ্রবাহি হতে লহো জ্বলদীর্ঘ তনু।

যাহা মরণীয় থাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।

যাহা রক্ত, যাহা মৃত তব,
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।

মৃত্যু হতে জাগো পদ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

তোমরা জান না, মহেশ্বর মদনকে অগ্নিবর দিয়েছিলেন, মৃত্যু দিয়েই তিনি তাকে অমর করেছেন। অনঙ্গই অমৃত দেবার অধিকারী হয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় যে-মৃত্যুরে দিয়েছেন হানি
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।

সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।

মিলনেই করুক প্রথর,
বিক্ষেপেই করে দিব দঃসহ সুন্দর।

মৃত্যু হতে শুভো পদ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

মীনকেতুর পথ সহজ পথ নয়, সে নয় পদ্পবিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃপ্তি।

দেবদত্ত। শূনে ভয় হয়। কিন্তু যা নিয়ে বিপদ ঘটে তার কারণ হচ্ছে অনঙ্গদেব যে-ঘরকে তাঁর পায়ের ধূলিলেপনে চিহ্নিত করে নেন, সে-ঘরে অন্য কোনো দেবতাকে প্রবেশ করতে দেন না। তাতেই পূজনীয়দের মনে ঈর্ষা জন্মায়।

বিক্রম। মনে হচ্ছে কথাটা আমাকেই লক্ষ্য করে। সাহস বাড়ছে।

দেবদত্ত। রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব দঃসাহসের চরম। ভাগ্যদোষেই রাজার বন্ধু দুর্মুখ। ইচ্ছাক্রমে নয়।

বিক্রম। তবে মূখ খোলো। স্পষ্ট করেই বলো, প্রজারা আমার নামে কী বলছে।

দেবদত্ত। তারা বলছে, অন্তঃপদের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্যে আজ প্রদোষান্ধকার। রাজলক্ষ্মী রাজতীর ছায়ার শ্লান।

বিক্রম। দুর্মুখ, প্রজারঞ্জে আর-একবার সীতার নির্বাসন চাই নাকি?

দেবদত্ত। নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপদে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শুধু কি তিনি রাজবধু। তিনি যে লোকমাতা।

বিক্রম। দেবদত্ত, অংশ নিয়েই যত বিরোধ। ঐ নিয়েই কুরুক্ষেত্র। ঐ তিনি আসছেন, রাজবধুর অংশ নিয়ে, না লোকমাতার?

দেবদত্ত। আমি তবে বিদায় হই, মহারাজ।

মহিষী সন্মিতির প্রবেশ

বিক্রম। দেবী, কোথায় চলেছ। শূনে যাও!

সন্মিত্রা। কী মহারাজ।

বিক্রম। একটা সন্মিতিবাদ আছে।

সন্মিত্রা। কী, শূনি।

বিক্রম। লোকনিন্দার পরম গৌরবে আমি ধন্য হয়েছি।

সন্মিত্রা। নিন্দা কিসের।

বিক্রম। লোকে বলছে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকেও তুচ্ছ করতে পেরেছি। এতবড়ো কথা।

সন্মিত্রা। যারা বলে তাদের কথা মিথ্যা হোক।

বিক্রম। অক্ষয় হোক এই সত্য, ইতিহাসে বিখ্যাত হোক, কবিকণ্ঠে আখ্যাত হোক, রসতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হোক, ইতরলোকের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হোক।

সন্মিত্রা। মহারাজ, যে-প্রেম রাজকর্তব্যেরও উপরে, সে গ্রহণ করুন দেবতা, সে কি আমি নিতে পারি।

বিক্রম। দেবতার যা প্রাপ্য তিনি তা নেবেন তোমার মধ্যে দিয়েই। তোমার মূখে পরমাশ্চর্যকে দেখেছি। লজ্জা কোরো না, শোনো আমার কথা। যশের লোভে যারা দেশ জয় করে বেড়ায় লক্ষ্মীর তারা বিদ্রোহক। তাদের আয়ু যায় বৃথা, কীর্তিও চিরকাল থাকে না, লক্ষ্মী বসে বসে হাসেন। আমি তাদের দলে নই। কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম তোমারই সাধনায়।

সন্মিত্রা। তোমার যুদ্ধযাত্রা সফল হয়েছে। এখন আর কী চাও।

বিক্রম। পেরেছি বীণাটিকে। সংগীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শূভক্ষণে? সূর মেলাতে পারছি নে, পেরেও হার হচ্ছে পদে পদে। ভাগ্যের কাছে যে-দান পেরেছি, সেই দানই আমাকে লজ্জা দিয়েছে।

সন্মিত্রা। যুদ্ধের মধ্যে চেপে রেখেছ আর কল্পনা করছ, পাই নি। কিন্তু তোমার কাছে আশঙ্ক্য কিছু চাবার নেই কি।

বিক্রম। সবই চাইতে পার, কিছু চাও না বলেই আমার রাজসম্পদ ব্যর্থ।

সন্মিত্রা। আমি চাই আমার রাজাকে।

বিক্রম। পাও নি?

সন্মিত্রা। না, পাই নি। সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে?

বিক্রম। হৃদয়ের সর্বোচ্চ শিখরে তোমার আসন দিয়েছি—তাতেও গৌরব নেই?

সন্মিত্রা। মহারাজ, আমাকে নিয়ে অমন করে কথা সাজিয়ে না—এ তোমাকে শোভা পায় না। এতে আমাকেও ছোটো করে। কী হবে আমার স্তুতিবাক্য। আমার অনুরোধ রাখো। আমি এসেছি প্রজাদের হয়ে প্রার্থনা জানাতে।

বিক্রম। এই উদ্যানে? এখানে আজ ঋতুরাজের অধিকার। অন্তত আজ একদিনের জন্যেও সম্পূর্ণ করে তাকে স্বীকার করো।

সন্মিত্রা। আমি তো তোমার আদেশ পালনে ত্রুটি করি নি—উৎসব যাতে সুন্দর হয় আমি তো সেই আয়োজন করেছি। কিন্তু তোমারও কিছু করবার নেই কি? উৎসব যাতে মহৎ হয়ে ওঠে তুমি তাই করো তোমার রাজমহিমা দিয়ে।

বিক্রম। বলো, আমার কী করবার আছে।

সন্মিত্রা। কাশ্মীর থেকে যে-সব লুণ্ঠের দল তোমার সঙ্গে জালন্ধরে এসেছে, আজই সেই পরোপজীবীদের আদেশ করো কাশ্মীরে ফিরে যাক।

বিক্রম। ~~আমি তো তোমার আদেশ পালনে ত্রুটি করি নি~~ তাদের 'পরে তোমার মনে ক্রোধ আছে।

সন্মিত্রা। তা আছে।

বিক্রম। কাশ্মীরবিজয়ে ওরা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এই তার কারণ।

সুমিত্রা। হাঁ মহারাজ, আমি জানি, বিশ্বাসঘাতকের শত্রুতা ভালো, তাদের মৈত্রী অস্পৃশ্য।

বিক্রম। ওদের ধর্ম ওরা বুঝবে কিন্তু আমি কৃতঘ্ন হব কী করে।

সুমিত্রা। তোমার সপক্ষে ওরা পাপ করেছে, ক্ষমা করতে হয় কোরো, কিন্তু তোমার বিপক্ষে অন্যায় করেছে তাও কি ক্ষমা করতে হবে। তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে প্রজাদের প্রতি পীড়ন হচ্ছে, তাতেও বাধা দেবে না?

বিক্রম। মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করেছে প্রজারা, তাদের ঈর্ষা ওরা বিদেশী বলে।

সুমিত্রা। তারও তো বিচার চাই।

বিক্রম। এ-সব ব্যাপারে তুমি যখন হস্তক্ষেপ কর, মহারানী, তখন সুবিচার কঠিন হয়। তুমি স্বয়ং আন অভিযোগ, কোনো প্রমাণকে আমি কি তার উপরে আসন দিতে পারি। তুমি অনুরোধ করতে যুধাজিৎকে বিনা বিচারেই পদচ্যুত করতে হল। আরো অমাত্য-বলি চাই তোমার?

সুমিত্রা। তবে সেই ভালো। বিচার কোরো না। আমারই প্রার্থনা রাখো। কাশ্মীরের পঙ্গপাল-গুলো যদি কোনো অপরাধ না করেও থাকে তবু ওরা আমার রাষ্ট্রদিনের লজ্জা। আমাকে তার থেকে বাঁচাও।

বিক্রম। ওরা কলঙ্ক স্বীকার করে বিপদ সামনে রেখে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তোমার কথাতেও ওদের ত্যাগ করতে পারব না। দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয় এই কথা মনে রেখো।

সুমিত্রা। মহারাজ, তোমার বিলাসে আমি সঙ্গিনী, তোমার রাজধর্মে আমি কেউ নই এ কথা মনে রেখে আমার সুখ নেই।

[প্রস্থান

বিক্রম। শূনে যাও মহিষী।

সুমিত্রা। (ফিরে এসে) কী, বলো।

বিক্রম। তুমি জাগছ না কেন। কিসের এই সূক্ষ্ম আবরণ। সমস্ত আমার রাজার শক্তি নিয়ে একে সরাতে পারলেম না। আপনাকে প্রকাশ করো—দেখা দাও, ধরা দাও। আমাকে এই অত্যন্ত অদৃশ্য বণ্টনায় বিভ্রমিত কোরো না।

সুমিত্রা। আমিও তোমাকে ঐ কথাই বলছি। তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি নে—তোমার শক্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে। তুমি জাগ নি। তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ কাশ্মীর থেকে—সেই অপমান আমার ঘুঁচিয়ে দাও—আমাকে রানীর পদ দিতে হবে।

বিক্রম। আচ্ছা আচ্ছা, আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি—তুমি প্রজাদের দান করতে চাও, করো দান যত খুশি। তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে।

সুমিত্রা। ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার কোষ তোমারই থাক। আমার দেহের অলংকার থাক আমার প্রজার জন্যে। অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ-সব তো বন্দিদারী বৈশিষ্ট্য—এ বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ কর সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুদ্ধ দাসী! সে আমি নই।

[প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। যুধাজিৎের নামে রানীর কাছে কে অভিযোগ করেছিল? তুমি?

মন্ত্রী। মন্ত্রগৃহের বাইরে আমি মন্ত্রণা করি নে, মহারাজ!

বিক্রম। তবে এ-সব কথা কে তাঁর কানে তুললে?

মন্ত্রী। যারা দুঃখ পেয়েছে তারা স্বয়ং।

বিক্রম। রানীর সাক্ষাৎ তারা পায় কী করে।

মন্ত্রী। করুণার যোগ্য যারা করুণাময়ী স্বয়ং তাদের সম্ভান রাখেন।

বিক্রম। আমাকে অতিক্রম করে যারা রানীর কাছে আবেদন নিয়ে আসে তারা দণ্ডের যোগ্য এ কথা যেন মনে থাকে।

মন্ত্রী। দণ্ড তারা পেয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা তাদের পাকা ফসলের খেত জ্বালিয়ে দিয়েছে, এ কথা সবাই জানে।

বিক্রম। মন্ত্রী, নানা কোশলে তুমি এই অমাত্যদের নামে নিন্দা করবার সুযোগ খোঁজ, এটা আমি লক্ষ্য করেছি।

মন্ত্রী। নিন্দনীয়দের নিন্দা করে থাকি কিন্তু কোশল করে নয়।

বিক্রম। এই বিদেশীরা আমার আশ্রিত, তোমাদের ঈর্ষা থেকে তাদের বিশেষভাবে রক্ষা করা আমার রাজকর্তব্য।

মন্ত্রী। ওদের সম্বন্ধে নীরব থাকব। কিন্তু গুরুতর মন্ত্রণার বিষয় আছে। মহারাজ, ক্ষণকালের জন্যে—

বিক্রম। এখন সময় নয়। যাও, বিপাশাকে সংবাদ দাও আজ বকুলবীথিকায় মধ্যরাতে তার নৃত্য। ত্রিবেদীকে বোলো মীনকেতুর পূজায় মন্ত্রোচ্চারণে তার কোনো স্থলন সহ্য করব না।

মন্ত্রী। কাশ্মীরদেশী অমাত্য সবাই উৎসবে আসবেন সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বিক্রম। মহারানীর সঙ্গে কোনোমতে তাদের সাক্ষাৎ না হয়, সতর্ক থাকো।

[উভয়ের প্রস্থান]

রাজপ্রাতা নরেশ ও সুমিত্রার সহচরী বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। মানব না ও কথা। কাশ্মীর জয় করেছে তোমরা! মানব না।

নরেশ। সুন্দরী, অরসিক ইতিহাস মধুর কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না।

বিপাশা। রাজকুমার, দাম্ভিক কণ্ঠের আশ্ফালনের ভাষাও তার ভাষা নয়।

নরেশ। কিন্তু তলোয়ারের সাক্ষ্য তো মানতে হবে। যমরাজকে সামনে রেখে সে কথা কয়। আমাদের মহারাজ কাশ্মীর জয় করেছেন।

বিপাশা। করেন নি। আমাদের যুবরাজ ছিলেন অনুপস্থিত। মানসসরোবর থেকে অভিষেকের জল আনতে গিয়েছিলেন। তাই যুদ্ধ হয় নি, দস্যুবৃত্তি হয়েছিল।

নরেশ। তাঁর পিতৃব্য চন্দ্রসেন ছিলেন প্রতিনিধি। যুদ্ধ করেছিলেন।

বিপাশা। যুদ্ধের ভান করেছিলেন। লুণ্ঠ-করা সিংহাসন হার-মানার ছদ্মমূল্যে নিজে কিনে নেবার জন্যে। তোমাদের সভাকবি এই নিয়ে সাত সর্গ কবিতা লিখেছেন। তোমাদের যুদ্ধ ফাঁকি, তোমাদের ইতিহাস ফাঁকি। চুপ করে হাসছ যে! লজ্জা নেই!

নরেশ। মহারানী সুমিত্রা তো ফাঁকি নন। তিনি তো পর্বত থেকে নেমে এসেছেন আমাদের জয়লক্ষ্মীর অনুবর্তিনী হয়ে।

বিপাশা। চুপ করো, চুপ করো। দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ে না। রাজকন্যা তখন বালিকা, বয়েস ষোলো। খুড়োমহারাজ এসে বললেন, বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে সন্ধি অসম্ভব। রাজকুমারী আগুন জ্বালিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিলেন। পুরুষদ্বয়েরা এসে বললে, মা, রক্ষা করো, যে পাণি মৃত্যুবরণ করছে তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো— শান্তি হোক।

নরেশ। কিন্তু সেদিনকার কোনো গ্লানি তো মহারানীর মনে নেই। প্রসন্ন মহিমায় সিংহাসনে তাঁর আপন স্থান নিয়েছেন।

বিপাশা। মহাদুঃখ ভোলবার মতোই মহাশক্তি তাঁর, তিনি যে সতীলক্ষ্মী। মৃত্যুর জন্যে যে আগুন জ্বলেছিল তাকে সাক্ষী করে তাঁর বিবাহ। তিনদিন কৈলাসনাথের মন্দিরে ধ্যানে বসে উপবাস করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। অসহ্য অপমানকে নিঃশেষে নিজের মধ্যে দগ্ধ করে

নিয়ে তবে এলেন তোমাদের ঘরে। বীরাজনার ক্ষমা যদি না থাকত তবে আগুন ধরত তোমাদের সিংহাসনে।

নরেশ। জান বিপাশা, ঐ বীরাজনা আপন মহিমাচ্ছটার কাশ্মীরের দিকে আমাদের হৃদয়ের একটি দীপ্যমান ছারাপথ একে দিয়েছেন। জালন্ধরের যুবকদের মন তিনি উদাস করেছেন ঐ কাশ্মীরে মন্থে। তিনি তাদের ধ্যানের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন একটি অপরূপ জ্যোতির্মূর্তি। তুমি জান না, জালন্ধর থেকে কত পাগল গেছে ঐ কাশ্মীরে, খুঁজতে তাদের সাধনার ধনকে।

বিপাশা। হায় রে, এ তো যুদ্ধ করা নয়। ওখানে তোমাদের অস্ত্র চলবার রাস্তা থাকতেও পারে কিন্তু হৃদয়জয়ের পথ ও দিকে বন্ধ করে দিয়েছে তোমাদের বর্বরতা দিয়ে।

নরেশ। সাধনা করতে হবে—তাতেও তো আনন্দ আছে।

বিপাশা। তা করো, কিন্তু সিদ্ধির আশা ছেড়ে দাও।

নরেশ। সিদ্ধি হবেই, আমি একলাই তা প্রমাণ করব—কাশ্মীর পর্যন্ত না গিয়ে!

বিপাশা। তোমার যত বড়ো অহংকার তত বড়োই দুরাশা।

নরেশ। দুরাশাই আমার, সেই আমার অহংকার। আমার আকাঙ্ক্ষা পর্বতের দুর্গম শিখর। সেখানে প্রভাতের দুর্লভ তারাকে দেখি, ভোরের স্বপ্নে।

বিপাশা। তোমাদের কবির কাছে পাঠ মুখস্থ করে এলে বড়ি?

নরেশ। প্রয়োজন হয় না। বাইরে যার কাছ থেকে পাই কঠোর কথা, অন্তরে সেই দেয় বাণীর বর, গোপনে। যদি সাহস দাও তার নামটি তোমাকে বলি।

বিপাশা। কাজ নেই অত সাহসে।

নরেশ। তবে ঠাক। কিন্তু এই পদ্মের কুঁড়ি, একে নিতে দোষ কী। এও তো মুখ ফুটে কিছু বলে না।

বিপাশা। না, নেব না।

নরেশ। কাশ্মীরের সরোবর থেকে এর মূল এনোঁছিলুম। অনেকদিন অনেক শ্বিথার পরে দেখা দিয়েছে তার এই কুঁড়িটি। মনে হচ্ছে আমার সৌভাগ্য তার প্রথম নিদর্শনপত্রটি পাঠিয়েছে—এর মধ্যে একজনের অদৃশ্য স্বাক্ষর আছে। নেবে না? এই রেখে গেলাম তোমার পায়ের কাছে।

[প্রস্থানোদ্যম]

বিপাশা। শোনো, শোনো, আবার বলছি তোমরা কাশ্মীর জয় কর নি।

নরেশ। নিশ্চয় করেছি। সেজন্যে রাগ করতে পার, অবজ্ঞা করতে পারবে না। জয় করেছি।

বিপাশা। ছল করে।

নরেশ। না, যুদ্ধ করে।

বিপাশা। তাকে যুদ্ধ বলে না।

নরেশ। হাঁ, যুদ্ধই বলে।

বিপাশা। সে জয় নয়।

নরেশ। সে জয়ই।

বিপাশা। তবে ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার পদ্মের কুঁড়ি।

নরেশ। ফিরিয়ে নেবার সাধ্য আমার নেই।

বিপাশা। এ আমি কুঁটি কুঁটি করে ছিঁড়ে ফেলব।

নরেশ। পার তো ছিঁড়ে ফেলো—কিন্তু আমি দিয়েছি আর তুমি নিয়েছ, এ কথা রইল বিধাতার মনে—চিরদিনের মতো।

[প্রস্থান]

সন্মিতার প্রবেশ

সন্মিতা। পদ্মের কুঁড়ি-হাতে একলা দাঁড়িয়ে কী ভাবছি, বিপাশা।

বিপাশা। মনে মনে ফুলের সঙ্গে করছি ঝগড়া।

সুমিত্রা। সংসারে তোর ঝগড়া আর কিছতেই মিটতে চায় না। কিসের ঝগড়া। ফুলের সঙ্গে আবার ঝগড়া কিসের।

বিপাশা। ওকে বলছি, তুমি কাশ্মীরের ফুল, এখানেও তোমার মুখ প্রসন্ন কেন। অপমান এত সহজেই ভুলেছ?

সুমিত্রা। দেবতার ফুল মানুষের অপরাধ যদি মনে রাখত তা হলে মরু হত এই পৃথিবী।

বিপাশা। তুমিই সেই দেবতার ফুল, মহারানী, কিন্তু কাঁটাও দেবতারই সৃষ্টি। সত্যি করে বলো, কাশ্মীরের 'পরে যে-অন্যার হয়েছে সে কখনো তোমার মনে পড়ে না? চুপ করে রইলে যে? উত্তর দেবে না? তোমার মাতৃভূমির দোহাই, এর একটা উত্তর দাও।

সুমিত্রা। সেই আমার মাতৃভূমিরই দোহাই, আমাকে কেবল এই একটিমাত্র কথাই মনে রাখতে দে যে, আমি জালন্ধরের রানী।

বিপাশা। আর বা ভুলতে পার ভুলো, কখনো ভুলতে দেব না যে, তুমি কাশ্মীরের কন্যা।

সুমিত্রা। ভুলি নে। তাই কাশ্মীরের গৌরব রক্ষার জন্যেই কর্তব্যের গৌরব রাখতে হবে। নইলে এখানে কি দেহে মনে দাসীর কলঙ্ক মাখব।

বিপাশা। সে কথা প্রতিদিন বদ্বতে পারছি, মহারানী। কাশ্মীরকে জয়ী করেছে এদের হৃদয়ে। আমি তো কেউ না, তবু তোমার মহিমার আলোতেই এরা আমাকে সন্দেহ যে চোখে দেখছে কাশ্মীরের কারো চোখে তো সে মোহ লাগে নি।

সুমিত্রা। বিনয় করছিস বদ্বি?

বিপাশা। বিনয় না মহারানী। আমি আপনাতে আপনি বিস্মিত। হেসো না তুমি, এরা আমাকে উদ্দেশ্য করে যে-সব কথা আজকাল বলে থাকে কাশ্মীরের ভাষাতে সে-সব কথা আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

সুমিত্রা। যে ভোরবেলায় এখানে চলে এলি তখনো তোর কানে কাশ্মীরের ভাষা সম্পূর্ণ জাগবার সময় হয় নি। তবু কার্কিল একটু আধটু আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা আজ বদ্বি স্মরণ নেই? যাই হোক এখনো যে উৎসবের সাজ করিস নি।

বিপাশা। সাজ শুরু করেছিলাম, এমন সময় কে একজন এসে বললে ওরা কাশ্মীর জয় করেছে। কবরী থেকে ফেলে দিয়েছি মালা, আমার রক্তাংশুক লুটোচ্ছে শিরীষবনের পথে। হাসছ কেন রানী।

সুমিত্রা। সে জায়গাটাকে তুই বনের পথ বলিস? এখানে আসবার সময় তোর রক্তাংশুক যে একজনের মাথায় দেখলাম।

বিপাশা। ঐ দেখো, মহারানী, লজ্জা নেই, এখানকার যুবকদের অভ্যাস খারাপ, ওটা চুরি!

সুমিত্রা। আমার সন্দেহ হচ্ছে চুরিবিদ্যা শেখাবার জন্যেই চোরের রাস্তায় তোর রক্তাংশুক পড়ে থাকে। শুনছি তার বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার তার চুরির শেষ পরীক্ষা হবে, তোর উপর দিয়ে।

বিপাশা। রাজার আজ্ঞা নাকি।

সুমিত্রা। যার আজ্ঞা তাঁর বেদী সাজাবি চল্। ঐ পদ্মের কুণ্ডিটিই তোর প্রথম অর্ঘ্য হোক।

বিপাশা। যেয়ো না তুমি, তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলো। মকর-কেতনের পূজায় আজ রাতে যে উৎসব হবে তাতে তোমার উৎসাহ আছে?

সুমিত্রা। মহারাজের আদেশ।

বিপাশা। সে তো জানি কিন্তু তোমার নিজের মন কী বলে।—চুপ করে থাকবে?

সুমিত্রা। হাঁ, চুপ করেই থাকব।

বিপাশা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন এতদিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি—আজ জিজ্ঞাসা করবই—চুপ করে থাকলে চলবে না।

সুমিত্রা। কী প্রশ্ন তোর।

বিপাশা। সত্যি কি তুমি মহারাজকে ভালোবাস। বলতেই হবে আমাকে।

সুমিত্রা। হাঁ ভালোবাসি। উত্তর শব্দে চুপ করে রইলি যে!

বিপাশা। তবে সত্য কথা বলি তোমাকে। আর কিছুদিন আগে এ প্রশ্নও আমার মনে আসত না, উত্তর শব্দেও মেনে নিতুম।

সুমিত্রা। আজ নিজের মনের সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে দেখাচ্ছিস বুঝি।

বিপাশা। তা তোমাকে লুকোব না, সবই তুমি জান—মিলিয়ে দেখছি বৈকি, কিন্তু ঠিক মেলাতে পারছি নে।

সুমিত্রা। কী করে মিলবে। প্রজারক্ষার করুণায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার করে যেদিন আমি মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলুম তখন তিন দিন ধরে কৈলাসনাথের মন্দিরে কিসের জন্যে তপস্যা করেছি?

বিপাশা। আমি হলে জালন্ধরের বিনিপাতের জন্যে তপস্যা করতুম।

সুমিত্রা। এই শক্তি চেয়েছিলুম, রত্নের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনোদিন কিছুর জন্যেই যেন লোভ না করি; তবেই আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।

বিপাশা। কোনোদিন তোমার মন বিচলিত হয় নি, মহারানী?

সুমিত্রা। প্রতিদিন হয়েছে—হাজারবার হয়েছে।

বিপাশা। মাপ করো মহারানী, আমার সন্দেহ হয় তুমি তাঁকে অবজ্ঞা কর।

সুমিত্রা। অবজ্ঞা! এমন কথা বলিস নে, বিপাশা। ঠুঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড ঠুঁর শক্তি—সে শক্তিতে বিলাসের আবির্ভাব নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। আমি যদি সেই কুল-ভাঙা বন্যার ধারে এসে দাঁড়াতুম, তা হলে আমার সমস্ত কোথায় ভেসে যেত, ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা। ঐ শক্তির দুর্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন পাষণ হয়ে উঠল। এত অজস্র দান কোনো নারী পায় না—এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে নিজের সঙ্গে আমার এমন দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব। মহারাজকে যদি অবজ্ঞা করতে পারতুম তা হলে তো সমস্তই সহজ হত। অন্তরে বাহিরে আমার দুঃখ যে কত দুঃসহ তা তিনিই জানেন যাঁর কাছে রত নিয়েছিলুম।

বিপাশা। রত যেন রাখলে, মহারানী, কিন্তু ভালোবাসা!

সুমিত্রা। কী বলিস, বিপাশা। এই রতই তো আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ধিক্কারের মধ্যে তলিয়ে যেত সে। প্রেম যদি লজ্জার বিষয় হয় তবে তার চেয়ে তার বিনাশ কী হতে পারে। আমার প্রেমকে বাঁচিয়েছেন তপস্বী মৃত্যুঞ্জয়। বিবাহের হোমার্গ্ন থেকে আমার এ প্রেম গ্রহণ করেছি—আহুতির আর অন্ত নেই।

বিপাশা। নিষ্ঠুর তোমার দেবতা, আমি কিন্তু তাঁকে মানতে পারতুম না।

সুমিত্রা। কী করে জানলি। তিনি ডাক দিলেই তোকেও মানতে হত। কিন্তু বিপাশা, রতের কথা প্রকাশ করা অপরাধ, আজ অন্যায় করলুম, ক্ষমা করুন আমার রতপতি।

বিপাশা। আমাকে ক্ষমা করো, মহারানী। কিন্তু কোথায় চলেছ।

সুমিত্রা। দেবদত্ত ঠাকুরের কাছে শুনলুম উৎসব উপলক্ষে দূরের থেকে প্রজারা এসেছে। আজ মন্দিরের বাগানে তারা দর্শন পাবে। রাজা সেই সংবাদ পেয়ে শুনছি দ্বার রুদ্ধ করবার আদেশ করেছেন।

বিপাশা। তুমি কি সে দ্বার খোলাতে পারবে?

সুমিত্রা। হয়তো পারব না। তবুও দেখতে যাব যদি কোনোখানে তার কোনো ফাঁক থাকে।

বিপাশা। দ্বার রোধ করবার বিদ্যায় এরা এত নিপুণ যে, তার মধ্যে কোনো ত্রুটিই তুমি পাবে না—এ আমি বলে দিচ্ছি।

দেবদত্তের প্রবেশ। রত্নেশ্বরের দ্রুত প্রবেশ

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, দেবদত্ত ঠাকুর।

দেবদত্ত। আমাকে ডাক পেড়ে আমাকে সুন্দর বিপদে ফেলবে দেখছি। কেন, কী হয়েছে।

রত্নেশ্বর। রাজার কাছে অপরাধী। তাঁর প্রহরীকে প্রহার করে এখানে এসেছি।

দেবদত্ত। প্রহার করেছে? শূনে শরীর পুলাকিত হল। এমন উগ্র পরিহাসের ইচ্ছা হঠাৎ কেন তোমার মনে উদয় হল।

রত্নেশ্বর। উৎসবে রাজার দর্শন মিলবে আশা করেই বহু কষ্টে রাজধানীতে এসেছি। দ্বারী বললে উৎসবের দ্বার বন্ধ। তাই তাকে মারতে হল। অভিযোগ করতে এলে যদি সাক্ষাৎ না মেলে অপরাধ করলে অন্তত সেই উপলক্ষে তো রাজার সামনে পৌঁছব।

দেবদত্ত। কোথাকার মূর্খ তুমি। তুমি কি মনে কর, বৃদ্ধকোটের গোঁয়ারের হাতে রাজার প্রহরী মার খেয়েছে এ কথা সে মরে গেলেও স্বীকার করবে। তার স্থানী শূন্যে যে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, অনেক দূর থেকে এসেছি।

দেবদত্ত। এখনো অনেক দূরেই আছ। রাজার দর্শন কি সহজে মেলে। যোজন গণনা করেই কি দূরত্ব।

রত্নেশ্বর। গ্রামের মানুষ, রাজদর্শনের রীতিনীতি বুঝি নে, সেই জেনেই মহারাজ দয়া করবেন।

দেবদত্ত। নিজের বুদ্ধি থেকে বাহুবলে রাজদর্শনের যে রীতি তুমি উদ্ভাবন করেছ সেটা রাজধানীতে বা রাজসভায় প্রচলিত নেই। পারিষদবর্গের জন্যে দর্শনী কিছূ এনেছ কি।

রত্নেশ্বর। আর কিছূই আনি নি আমার অভিযোগ ছাড়া, কিছূ নেইও।

দেবদত্ত। গ্রামের মানুষ তা বুঝতে পারছি।

রত্নেশ্বর। কিসে বুঝলে, ঠাকুর।

দেবদত্ত। এখনো এ শিক্ষা হয় নি যে, রাজা তোমাদের মূখ থেকে শুনতে চান রাজ্যে সমস্তই ভালো চলছে, সত্যযুগ, রামরাজত্ব।

রত্নেশ্বর। সমস্তই যদি ভালো না চলে?

দেবদত্ত। তা হলে সেটা গোপন না করলে আরো মন্দ চলবে। রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহতা।

রত্নেশ্বর। আমাদের প্রতি যদি উৎপাত হয়?

দেবদত্ত। হয় যদি তো সে তোমাদের প্রতিই হল। রাজাকে জানাতে গেলে উৎপাত হবে রাজার প্রতি।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, সন্দেহ হচ্ছে পরিহাস করছ।

দেবদত্ত। পরিহাস করেন ভাগ্য। বর্তমান অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি। আজ ফাল্গুনের শুক্লা-চতুর্দশী। এখানে চন্দ্রোদয়ের মূহূর্তে কেশরকুঞ্জে ভগবান মকরকেতনের পূজা, রাজার আদেশ। নাচগান বাজনা অনেক হবে, তার সঙ্গে তোমার কণ্ঠস্বর একটুও মিলবে না।

রত্নেশ্বর। না মিলুক, কিন্তু রাজার চরণ মিলবে।

দেবদত্ত। রাজাকে রাজসভায় পাওয়াই হচ্ছে পাওয়া, অস্থানে তাঁর অরাজকত্ব। অপেক্ষা করো, কাল নিজে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, তোমাদের সবুর নয়। আমার যে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, প্রত্যেক মূহূর্ত অসহ্য। আমাদের সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, যমযন্ত্রণাও যখন পাই, অপমানের শূলের উপর যখন চড়ে থাকি তখনো অপেক্ষা করে থাকতে হয় রাজশাসনের জন্যে, নিজের হাত পঙ্গু। ধিক্ বিধাতাকে।

দেবদত্ত। এখন একটু থামো, ঐ মহারানী আসছেন। ঠুঁর কাছে আতর্নাদ করে ধৃষ্টতা কোরো না।

রত্নেশ্বর। আমার সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন মহারানী, সমস্ত রাস্তা ঠুঁই তো দর্শন কামনা করে এসেছি।

দেবদত্ত। যিনি দুঃখ পান তাঁকেই দুঃখ দিতে চাও তোমরা? জান না, বিচারের ভার ঠুঁই 'পরে নেই, রাজ্যশাসন করেন রাজা।

রত্নেশ্বর। মহারানী মা!

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। কী বৎস, তুমি কে।

দেবদত্ত। ও কেউ না, নাম রত্নেশ্বর, এসেছে বৃদ্ধকোট থেকে; এর বেশি ওর পরিচয় নেই। পায়ের ধূলো নিয়েই চলে যাবে। হল তো দর্শন—চল্ এখন ঘরে, আমার ব্রাহ্মণীর প্রসাদ পাবি।

সুমিত্রা। বৃদ্ধকোট, সে তো শিলাদিত্যের শাসনে। বলো দেখি তার ব্যবহার কী রকম।

দেবদত্ত। মহারানী, এ-সব প্রশ্ন এখানকার কোকিলের ডাকের মধ্যে ভালো শোনাচ্ছে না। আমি ওকে কালই নিজে রাজসভায় নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। রাজসভা! মহারানী, সেখানে কোনো আশা নেই বলেই এই উৎসবের প্রাঙ্গণে অভিযোগ এনেছি।

সুমিত্রা। কেন আশা নেই।

রত্নেশ্বর। শিলাদিত্য স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত, আমাদের কান্না চাপা দেবার জন্যে। তিনি বসেন রাজার কানের কাছে, আমরা থাকি দূরে।

সুমিত্রা। কোনো ভয় নেই তোমার, কী বলতে চাও আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। সতীতীর্থ ভৃগুকট্ট পাহাড়ের তলে। আমাদেরই রাজকুলের মহিষী মহেশ্বরী সেখানে স্বামীর অনুমতি হয়েছিলেন, সে আজ পাঁচশো বছরের কথা।

সুমিত্রা। সেই সতীকাহিনী তো ভাটের মুখে শুনোছি আমার বিবাহদিনে।

রত্নেশ্বর। তাঁরই সিঁদুরের কোঁটো সেখানে সমাধিমন্দিরে।

সুমিত্রা। সেই কোঁটোর সিঁদুর বিবাহকালে আমিও পরেছি।

রত্নেশ্বর। আমাদের মেয়েরা তীর্থে যায়, সেই কোঁটোর সিঁদুর মাথায় পরে পুণ্য কামনায়। এতকাল কোনো বাধা হয় নি।

সুমিত্রা। এখন কি বাধা ঘটেছে।

রত্নেশ্বর। হাঁ, মহারানী।

সুমিত্রা। কিসে বাধা।

রত্নেশ্বর। শিলাদিত্য তীর্থদ্বারে কর বসিয়েছে। দরিদ্র মেয়েদের পক্ষে দ্বুঃসাধ্য হল। হাত থেকে তাদের কঙ্কণ কেড়ে নিয়ে কর আদায় হচ্ছে।

সুমিত্রা। কী বললে! মহারাজের সম্মতি আছে এতে?

রত্নেশ্বর। রাজকার্যের রহস্য জানি নে, মা, কথা কইতে সাহস হয় না।

সুমিত্রা। ঠাকুর, বলো, এতে মহারাজের সম্মতি আছে?

দেবদত্ত। সম্মতির প্রয়োজন হয় না, এতে আয়বৃদ্ধি আছে।

সুমিত্রা। সত্য করে বলো, এই অর্থ রাজকোষ গ্রহণ করে?

দেবদত্ত। সেদিন সভাপন্ডিত ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন অগ্নি যা গ্রহণ করেন তাতে মলিনতা থাকে না, রাজার কর সেই অগ্নি।

সুমিত্রা। আমি পন্ডিতের ব্যাখ্যা শুনতে চাই নে—বলো, এই অর্থ রাজকোষে আসে?

দেবদত্ত। নিয়মরক্ষার জন্যে কিছু আসে বৈকি, কিন্তু অনিয়মের কবলটা তার চেয়ে অনেক বড়ো, বেশির ভাগ তলিয়ে যায় সেই গহবরে। মহারানী, অনেক পাপীর উচ্ছ্রষ্ট রাজকোষে জমা হয়।

রত্নেশ্বর। মা, এটুকু কথা নিয়ে দুঃখ কোরো না—আমাদের অন্নসম্বল অল্প, তার কাম্মা কেঁদে কেঁদে আমাদের স্বর ক্লান্ত। সেই সম্বলকে যখন কেউ স্বল্পতর করে তখন তা নিয়ে অভিযোগ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদেরও মর্মস্থান আছে, সেখানে রাজার প্রজায় ভেদ নেই; সেখানে যদি রাজা হাত দেন সে আমাদের সহাবে না।

সুমিত্রা। বলো সব কথা। ভয় কোরো না।

রত্নেশ্বর। আমরা অত্যন্ত ভীরু, মহারানী, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে আমাদেরও ভয় ভেঙে যায়। সেইজন্যেই এমন করে চলে আসতে পেরেছি। জানি বিপদ সাংঘাতিক, কিন্তু বিপদের চেয়ে যেখানে গ্লানি দুঃসহ সেখানে আমাদের মতো দুর্বলও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয় কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই।

সুমিত্রা। সে কথা আমিও বুঝি। যা তোমার বলবার আছে সব তুমি আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। তীর্থস্বারে কর সংগ্রহের জন্যে রাজার অনুচর নিযুক্ত, সুন্দরী মেয়েদের বিপদ ঘটছে প্রতিদিন।

সুমিত্রা। সর্বনাশ! সত্য বলছ?

রত্নেশ্বর। যে কথা নিয়ে মানুষ মরতে প্রস্তুত হয়, আমি সেই কথা শুধু মখে বলতে এসেছি মহারানী, এই আমার লজ্জা। আমার ছোটোবোন গিয়েছিল তীর্থে, হতভাগিনী আজও ফেরে নি।

সুমিত্রা। এও তুমি সহ্য করেছ?

রত্নেশ্বর। সহ্য করব না, সেই পণ করেই বোরিয়েছি। নিজের হাতেই দণ্ড তুলতে হবে, কিন্তু তার আগে রাজদণ্ডের শেষ দোহাই পেড়ে যাব। তার পরে ধর্মই জানেন, আর আমিই জানি।

সুমিত্রা। এই সমস্ত কি শিলাদিত্যের জ্ঞাতসারে?

রত্নেশ্বর। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে।

সুমিত্রা। ঠাকুর সত্য করে বলো—রাজার কানে এ কথা কি আজও ওঠে নি?

দেবদত্ত। তোমার কাছে কোনোদিন মিথ্যা বলি নি, আজও বলব না। রত্নেশ্বর, তোমার আবেদন হল, এখন যাও ঐ আমার কুটীর দেখা যাচ্ছে।

[রত্নেশ্বরের প্রস্থান]

সুমিত্রা। ঠাকুর, রাজার কাছে এই অভিযোগ আসে নি?

দেবদত্ত। হাঁ এসেছে। মন্ত্রী দ্বিধা করেছিলেন, আমি স্বয়ং জানিয়েছি।

সুমিত্রা। ফল কী হল।

দেবদত্ত। শূনে লাভ নেই। রাজারা যখন অন্যায় করেন তখন তার সমর্থনের জন্যে অতি ভীষণ হয়ে ওঠেন।

সুমিত্রা। ঠাকুর, ভীষণতা অন্যায়ের ছদ্মবেশ; ভয় করে তাকে যেন সম্মান না করি; অন্যায়কারীকে ক্ষুদ্র বলেই জানতে হবে, অতি ক্ষুদ্র, তার হাতে যত বড়ো একটা দণ্ড থাকুক। তাকে যদি ভয় করি তবে তার চেয়েও ক্ষুদ্র হতে হবে। শিলাদিত্য উৎসবের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে এসেছে?

দেবদত্ত। হাঁ, এসেছে।

সুমিত্রা। মন্ত্রীকে আদেশ করো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

দেবদত্ত। মহারানী!

সুমিত্রা। তুমি যা বলবে আমি তা সব জানি, সমস্ত জেনেই বলছি আজ তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া চাই।

দেবদত্ত। আগে উৎসব সমাধা হোক।

সুমিত্রা। এ পাপের বিচার না হলে আজ উৎসব হতেই পারবে না।

দেবদত্ত। মহারানী, সাবধান হবার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

সুমিত্রা। আমাকে নিবৃত্ত কোরো না। একদিন আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলুম, সুবিজ্ঞের পরামর্শে নিবৃত্ত হয়েছি। তখনই সংকল্প রক্ষা করলে এত অমঙ্গল ঘটত না এ জগতে। শিলা-দিত্যের বিচার যদি না হয় তা হলে এ রাজত্বে রানী হবার লজ্জা আমি সহিব না। ঐ-যে গর্জন শুনতে পাচ্ছি স্বারের বাইরে।

দেবদত্ত। দয়াময়ী, কতটুকুই বা শুনলে। সবটা কানে উঠলে কান বধির হয়ে যেত। যে নিঃসহায়দের সামনে সকল স্বার রুদ্ধ তাদের কণ্ঠও রুদ্ধ থাকে, তাই তো আছি আমরা আরামে। বাধা আজ অল্প-একটু বৃষ্টি সরেছে—তাই গুমরে-ওঠা দৃঃখসমুদ্রের ধ্বনি সামান্য একটু শোনা গেল।

সুমিত্রা। ঠাকুর, বাধা আছে তো আছে—কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে আত্নাদ করছে কেন, ভীরু সব। বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না তাও কি এরা জানে না? স্বার ভেঙে ফেলুক-না। বিচার ভয়ে ভয়ে চায় বলেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড়ো জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চাবার অধিকার। ধর্মের বিধান মানুষের অনুগ্রহের দান নয়। আমাকে নিয়ে চলো ঠাকুর, ওদের মাঝখানে।

দেবদত্ত। মহারানী, তোমার নিজের জায়গায় থাকলেই ওদের বাঁচাতে পারবে; তোমার আসন যেখানে তোমার শক্তি সেখানেই।

সুমিত্রা। আমার আসন! আমার আসন আমি পাই নি। অহর্নিশ সেই শূন্যতা সহিতে পারছি নে, মন কেবলই বলছে রুদ্ধভৈরবের পায়ের কাছেই আমার স্থান—দেখিয়ে দিন তিনি পথ, ভেঙে দিন তিনি বিঘ্ন, ব্যর্থতার অপমান থেকে সেবিকাকে উদ্ধার করুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

নরেশ। শোনো শোনো বিপাশা, শুনো যাও।

বিপাশা। শোনবার যোগ্য কথা থাকলে তবেই শুনব।

নরেশ। আমি বলতে এসেছি জালন্ধর কাশ্মীর জয় করে নি।

বিপাশা। কবে তোমার ভুল ভাঙল।

নরেশ। প্রতিদিনই ভাঙছে। প্রতিদিনই প্রমাণ পাচ্ছি কাশ্মীরই জালন্ধর জয় করেছে। হার মানলুম। এখন প্রসন্ন হও।

বিপাশা। তার সময় আসে নি।

নরেশ। কবে আসবে।

বিপাশা। যখন আর-একবার তোমার সৈন্য নিয়ে কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে যাবে।

নরেশ। যাব যুদ্ধ করতে, চেষ্টা করে হেরেও আসব।

বিপাশা। চেষ্টা করতে হবে না, বীরপুরুষ। সেই যুদ্ধটা না দেখে আমি যেন না মরি। ছলনাকে গৌরব বলে অহংকার করছ সেইটে চূর্ণ হবে তবেই ধর্ম আছেন এ কথা মানব।

নরেশ। সত্য বলছি, সেই গৌরবটাকে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি।

বিপাশা। কেন বলো তো।

নরেশ। কেননা, সেই গৌরবটার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের জিনিস দেখেছি।

বিপাশা। রানী সুমিত্রাকে দেখেছ।

নরেশ। তাঁর কথা বলা বাহুল্য। আমি বলছিলাম—

বিপাশা। আর কিছুর বলতে হবে না। তাঁর চেয়ে বড়ো কথা তোমাদের রাজ্যে আর নেই। তোমাদের রাজা কি তাঁর নাগাল পায়। চূপ করে রইলে যে? লজ্জা আছে দেখছি। স্বীকার করোই-না।

নরেশ। স্বীকার অনেকদিন করেছি। কুসঙ্গে মহারাজ কাশ্মীর জয় করতে গিয়েছিলেন। জয় করে তাঁর নিজের রাজ্য হারিয়েছেন। কাশ্মীর থেকে পাপগ্রহকে অভ্যর্থনা করে এনেছেন রাজ্যের মধ্যে, পাপের নৈবেদ্যে তাকেই পূজা করে তুলেছেন। বিপাশা, তোমার কাছে গোপন করব না—বিপদের জাল চারিদিকে ঘিরে আসছে, গ্রন্থির পর গ্রন্থি, তারই মাঝখানে নিশ্চিন্ত বসে আছেন আমাদের স্বেচ্ছাম্হ মহারাজ, প্রস্তুত হতে হবে আমাদেরই, আর সময় নেই।

বিপাশা। অতএব?

নরেশ। অতএব এই বেলা তোমার মুখে একটা গান শুনতে চাই।

বিপাশা। আমার গান, বিপদের ভূমিকায়!

নরেশ। বাঁশির স্বরে সাপের জড়তা ঘোচে, তোমার গানে আমার তরবারি জেগে উঠবে।

বিপাশা। যুদ্ধের গান চাই?

নরেশ। না, সে গান আমার অস্থিমজ্জায় আছে, আমি ক্ষত্রিয়।

বিপাশা। তবে?

নরেশ। তুমি জান কোন্ গানটা আমি ভালোবাসি।

বিপাশা। উৎসবের সময় তো গাইতেই হবে, তখন শুনো।

নরেশ। যা সকলেই পাবে তাতে আমার কেবল একটা মাত্র ভাগ। একটি সম্পূর্ণ দান আমাকে দাও, যা কেবল আমার একলারই।

বিপাশা।

গান

মন যে বলে, চিনি চিনি

যে গন্ধ বয় এই সমীরে।

কে ওরে কয় বিদেশিনী

চৈত্ররাতের চামেলিরে?

রক্তে রেখে গেছে ভাষা

স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা

কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে

কোন্ বনে কোন্ সিঁধুতীরে।

এই সুদূরে পরবাসে

ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।

মোর পুরাতন দিনের পাখি

ডাক শুনতে তার উঠল ডাকি,

চিন্ততলে জাগিয়ে তোলে

অশ্রুজলের ভৈরবীরে।

নরেশ। বিপাশা, একটা কথা শুনতে চাই।

বিপাশা। ঐ তো তোমার লব্ধ স্বভাব। বললে, একটি গান শুনতে চাই, যেমনি গান শেষ হল রব উঠেছে একটি কথা শুনতে চাই। একটি কথা থেকে দুটি কথা হবে, তার পর আমার কাজের বেলা যাবে চলে। আমি যাই।

নরেশ। শোনো শোনো, একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। ঐ-যে গাইলে ওটা কি সত্য। প্রবাসে বাঁশি কি বেজেছে।

বিপাশা। অরসিক, কথা দিয়ে যার কাছে গান ব্যাখ্যা করতে হয় তাকে গান না শোনানোই ভালো। তুমি যে অলংকার-শাস্ত্রের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে উঠলে।

নরেশ। তবে থাক ব্যাখ্যা, গানই আমার যথেষ্ট।

রাজপুত্রাঙ্গনা কালিন্দীর প্রবেশ
কালিন্দীর আপন-মনে কাব্য-আবৃত্তি।

মঞ্জরী, গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। একা-একা কার সঙ্গে আলাপ চলছে? বনদেবতার সঙ্গে?

কালিন্দী। না গো, মনোদেবতার সঙ্গে। মন্থথর স্তব কণ্ঠস্থ করছি। রাজার আদেশ।

গৌরী। ওটা হৃদয়স্থ থাকলেই হয়, কণ্ঠে আনবার দরকার কী।

কালিন্দী। হৃদয়ের পদচারণার পথ কণ্ঠে।

গৌরী। ওগো জালন্ধারিনী, এতদিন আছি, তোমাদের ধরনধারন আজও বদ্বতে পারলুম না।

কালিন্দী। আশ্চর্য নেই গো কাশ্মীরিনী, বদ্বতে বদ্বিধর দরকার হবে। কোন্‌খানটা দুর্বোধ ঠেকছে, শূনি-না।

গৌরী। বেদে অগ্নি সূর্য ইন্দ্র বরুণ অনেক দেবতারই স্তব আছে, কিন্তু তোমাদের এই দেবতাটির তো নামও শোনা যায় না।

কালিন্দী। সত্যযুগের ঋষিঋনিরা একে যত সাবধানে এড়িয়ে চলতেন ততই অসাবধানে পড়তেন বিপদে। মৃখে তাঁর নাম করতেন না তাই মার খেয়ে মরতেন অন্তরে। পুরাণগুলো পড় নি বদ্বি?

গৌরী। মৃখ আছে সেই ভালো, বিদুষী। সত্যযুগের কলঙ্ককাহিনী কলিযুগে টেনে আনবার মতো এত বিদ্যেয় দরকার কী ভাই। কলিযুগের পাপের ভার যথেষ্ট ভারী আছে।

কালিন্দী। বড়ো লজ্জা দিলে—মৃখ বলে অহংকার করতে পারলুম না—ওখানে কাশ্মীরেরই জিত রইল।

মঞ্জরী। ভাই, তোর কালিন্দীকলকল্লোল একটুখানি থামা। গ্রিবেদীঠাকুর বলেন, কালিন্দীর রসনা তার প্রতিবেশী দশনপঙ্ক্তির কাছ থেকে দংশন করবার বিদ্যোটা শিখে নিয়েছে। কেবল সেই বিদ্যোটা ফলাবার জন্যেই যে-দেবতাকে মানিস নে তাকে নিয়ে তর্ক তুলেছিস। নতুন দেবতাকে ভক্তি করবার আগে তোর ইষ্টদেবতার সাধনা সারা হোক।

কালিন্দী। তার পরে আছেন অনিষ্টদেবতাটি। একটু চুপ কর্ ভাই, স্তবটা আর-একবার আউড়ে নিই। দেবতা দুটি মার্জনা করেন, কিন্তু আমাদের সভাকবি তাঁর রচনার আবৃত্তিতে একটু ভুল পেলে কাঁদিয়ে ছাড়েন।

মঞ্জরী। ঐ আসছেন গ্রিবেদীঠাকুর, ঠুর কাছে আজ সন্দেহ মিটিয়ে নিই।

আবৃত্তি করতে করতে গ্রিবেদীর প্রবেশ

গ্রিবেদী। কপূর ইব দণ্ডোহপি শক্তিমান্যো জনে জনে—

নমোহস্বব্যবীৰ্য্যায় তস্মৈ মকরকেতবে।

মঞ্জরী। আপন-মনে কী বকছ, ঠাকুর।

গ্রিবেদী। গোলমাল কোরো না, মৃখস্থ করছি।

মঞ্জরী। কী মৃখস্থ করছ।

গ্রিবেদী। মকরকেতুর স্তব। রাজার আদেশ।

কালিন্দী। তোমারও এই দশা?

গ্রিবেদী। দেখছ না, মধুকরের গুঞ্জন আর শোনা যাচ্ছে না। সংস্কৃত শৌরসেনী মাগধী অধ-মাগধী মহারাষ্ট্রী পারসিক যাবনিক নানা ভাষায় আজ অভ্যাস চলছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে মকরকেতুর সকল দেশের সকল ভাষাতেই পাণ্ডিত্য।

কালিন্দী। কিন্তু অনুচ্চারিত ভাষাই তিনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন। দাদাঠাকুর, একটা কথার উত্তর দাও। মকরকেতুর পূজার বিধান পেয়েছ কোন্‌ বেদে।

দ্বিবেদী। চুপ চুপ। কি কণ্ঠস্বরই পেয়েছ তোমরা পদ্রাঙ্গনারা!

কালিন্দী। অরসিক, বয়স হয়েছে বলে কি কণ্ঠস্বরের বিচারবুদ্ধিটাও খোয়াতে হবে। তোমাদের কবি যে কোকিলের সঙ্গে এই কণ্ঠের তুলনা করেন।

দ্বিবেদী। অন্যায় করেন না। কোনো কথা গোপনে বলবার অভ্যাস ঐ পাখিটার নেই।

কালিন্দী। দাদাঠাকুর, তোমার সঙ্গে গোপন কথা বলবার মতো মনের ভাব আমার নয়। শাস্ত্রের বিচার চাই। এরা বলছিল, পদ্রাঙ্গে অতনুর নেই তনু, আবার বেদে নেই তার নামগন্ধ—বাকি রইল কী? তা হলে পূজাটা হবে কাকে নিয়ে।

দ্বিবেদী। আরে চুপ চুপ—স্বরটাকে আর-এক সন্তক নামিয়ে আনো।

মঞ্জরী। কেন ঠাকুর, ভয় কাকে?

দ্বিবেদী। যারা নতুন দেবতার পূজা চালাতে চায় তারা ভক্তির জোরের চেয়ে গায়ের জোরটা বেশি ব্যবহার করে। আমি ভালোমানুষ, দেবতার চেয়ে এই দেবতাভক্তদের ভয় করি অনেক বেশি।

গৌরী। ঠাকুর, আমি বলছিলাম এই-সব হঠাৎ-দেবতার আবার পূজা কিসের।

দ্বিবেদী। মূঢ়ে, যারা বনেদি দেবতা তাদের এত উগ্রতা নেই। সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক। তাদের পূজা করায় ব্যর্থতা, না-পূজা করায় সর্বনাশ। অতএব ছাড়ো তর্ক, পরো মঞ্জীর, আনো বীণা, গাঁথো মালা—পঞ্চশরের শরগুলোকে শান দেও গে।

কালিন্দী। কিন্তু তোমার মন্ত্রটি পেলে কোথা থেকে ঠাকুর।

দ্বিবেদী। যিনি পূজা প্রচার করছেন পূজার মন্ত্ররচনা তাঁরই। আমি সেটাকে শ্রুতির দ্বারা গ্রহণ করে শ্রুতির দ্বারা ব্যক্ত করব। দেখে নিয়ো, রাজসভায় শ্রুতিভূষণ বলবেন, সাধু, শ্রুতি-রত্নাকর বলবেন, অহো কিমাশ্চর্যম্।

মঞ্জরী। ও কী ও, ভাই, বাইরে যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি শোনা গেল।

কালিন্দী। হয়তো ওটা সত্যকার নয়। হয়তো উৎসবের একটা কোনো পালার অভ্যাস চলছে।

গৌরী। দ্বিবেদীঠাকুর, এও বুঝি তোমাদের জালন্ধরের সৃষ্টিছাড়া কীর্তি? মীনকেতুর উৎসবে রক্তপাতের পালা?

দ্বিবেদী। সুন্দরী, জগতে এ পালা বার বার অভিনয় হয়ে গেছে। হেতায়ুগে এই পালায় একবার রাক্ষসে বানরে মিলে অগ্নিকাণ্ড করেছিল। কলিযুগে তাদের বংশ বেড়েছে বৈ কমে নি। যাই হোক শব্দটা ভালো লাগছে না—যাও তোমরা মন্দিরে আগ্রয় লও গে।

[সকলের প্রস্থান]

২

সুদমিত্রা ও প্রতিহারীর প্রবেশ

সুদমিত্রা। সেই প্রজাকে চাই, রত্নেশ্বর তার নাম।

প্রতিহারী। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, মহারানী।

সুদমিত্রা। এই কিছুক্ষণ আগেই ছিল।

প্রতিহারী। কিন্তু কারো কাছে তার সন্ধান পাচ্ছি নে।

সুদমিত্রা। দেবদত্ত ঠাকুরের ঘরে কি নেই।

প্রতিহারী। ঠাকুরদন বললেন সেখানে কেউ আসে নি। ঐ যে ঠাকুর স্বয়ং আসছেন।

[প্রস্থান]

দেবদত্তের প্রবেশ

সুদমিত্রা। রত্নেশ্বর কোথায়।

দেবদত্ত। তাকেই খুঁজতে এসেছি।

সুমিত্রা। তাকে যে নিতান্তই পাওয়া চাই।

দেবদত্ত। সেই কারণেই তাকে পাওয়া নিতান্তই কঠিন হবে। হতভাগ্যকে বলোছিলুম আমার ঘরে আশ্রয় নিতে।

সুমিত্রা। তুমি কি তবে সন্দেহ করছ—

দেবদত্ত। সন্দেহ করছি কিন্তু নাম করছি নে।

সুমিত্রা। এও কি সহ্য করতে হবে।

দেবদত্ত। হবে বৈকি। প্রমাণ নেই যে।

সুমিত্রা। তাই বলে পাপিষ্ঠকে নিষ্কৃতি দেবে?

দেবদত্ত। নিষ্কৃতির সদুপায় পাপিষ্ঠ নিজেই জানে, আমাদের কিছুই করতে হবে না।

সুমিত্রা। ঠাকুর, তবে কিছুই করবে না?

দেবদত্ত। যদি সম্ভব হত নিজের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করে ওর মাথায় ভেঙে পড়তুম।

সুমিত্রা। তুমি বলতে চাও কিছুই করবার নেই? চুপ করে রইলে কেন ঠাকুর, লজ্জায়? পাছে কিছু করতে হয় সেই ভয়ে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি নে। বিপাশা, কী করছিস এখানে।

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। অনঙ্গদেবের পূজায় মহারানীর জন্যে অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছি।

সুমিত্রা। ফেলে দে, ফেলে দে, দূর করে ফেলে দে সব। আমি যাব রত্নভৈরবের মন্দিরে, ঠাকুর, পূজা প্রস্তুত করো।

দেবদত্ত। পুরোহিত দ্বিবেদীকে মহারাজ তাঁর কাজে আজ নিযুক্ত করেছেন।

সুমিত্রা। তুমি হবে আমার পুরোহিত।

দেবদত্ত। আমি পুরোহিত?

সুমিত্রা। হাঁ, তুমি। নীরব যে, মনে কি ভয় আছে।

দেবদত্ত। ভয় দেবতাকে। মুখে মন্ত্র পড়তে পারি, কিন্তু অন্তরের কথা যে অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু মহারানী, ভৈরবের পূজায় তোমার কিসের প্রয়োজন।

সুমিত্রা। দুর্বল মন, শক্তি চাই।

বিপাশা। শক্তির দরকার যার সে তোমার নয়, সে মহারাজের। যে অসামান্য রূপ নিয়ে এসেছ সংসারে তার কাছে রাজলক্ষ্মী হার মেনেছেন—সেজন্যে দোষ দেব কাকে। যদি ক্ষমা কর তো বালি, দোষ তোমারই।

সুমিত্রা। বদ্বিষয়ে বলো।

বিপাশা। ঐ যে কাশ্মীরের নরাদমদের রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের উপর বসিয়েছেন রাজা, তার কারণ শুনবে? রাগ করবে না?

সুমিত্রা। কারণ শুনতেই চাই আমি।

বিপাশা। প্রেমের গৌরব খুব প্রকাণ্ড করে জানাতে চেয়েছিলেন রাজা, খুব দুর্মূল্য দান দঃসাহসের সঙ্গে দিতে পারলে তিনি বাঁচতেন। এই সামান্য কথাটা তুমি বদ্বিতে পার নি?

সুমিত্রা। আমি তো কোনো বাধা দিই নি।

বিপাশা। দাও নি বাধা? ঐ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় সদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি। কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, এ-কী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি। তুমি রাজহংসীর মতো, রাজার তরঙ্গিত কামনাসাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হতে চায় না, রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটুও বাঁধতে, তুমি যত রইলে মদুস্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী। শেষে একদিন আপন রাজ্যটাকে খন্ড খন্ড করে ছাড়িয়ে ফেলে দিলেন ঐ কাশ্মীরী কুটুম্বদের হাতে—মনে করলেন তোমাকেই দেওয়া হল।

সুমিত্রা। আমি তার কিছুই জানতেম না।

বিপাশা। তা জানি, রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায় তোমাকে বিস্মিত করে দেবেন। তখনো তোমাকে চেনেন নি। কিন্তু কতবড়ো দুর্ভাগা—রাজসিংহাসনের উপর বসে ছটফট করে মরছে; দিতে চায় দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যোগ্যতা নেই। ব্যর্থ নিবুদ্বিষ্টতার ধিক্কারে আজ সকলেরই উপর রেগে রেগে উঠছেন। তার মধ্যে তুমিও আছ।

সুমিত্রা। ঠাকুর, আজ পর্যন্ত ভালো করে বুঝতে পারি নি আমার অপরাধটা কোথায়।

দেবদত্ত। মহারানী, কালকে কখন কোথায় নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলি সব সময়ে ভেবে পাই নে।

বিপাশা। ঠাকুর, ভেবে পেয়েছ তুমি, বলতে চাও না। কিন্তু আমি বলব। আমি ভয় করি নে কাউকে। মহারানীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, সেই পাপের ছিদ্র দিয়েই কালির প্রবেশ।

সুমিত্রা। বিপাশা, চুপ কর্ তুই।

বিপাশা। কেন চুপ করব। কাম্মীর জয় করে এরা তোমাকে অধিকার করেছে এই মিথ্যে কথাটাই বলে বেড়াতে হবে? আশ্চর্য হয়ে যাই তোমার ধৈর্য দেখে, মহারানী। পাপকে জয় করেছে পুণ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পুণ্যের দান কি মহারাজ গ্রহণ করতে পারলেন।

সুমিত্রা। চুপ কর্, চুপ কর্, বিপাশা।

বিপাশা। চুপ করিয়ে না। যে কথা অন্তরের মধ্যে জান সে কথা বাইরে থেকেও শোনা ভালো। ঐ রাজা আসছেন। আমি যাই। থাকতে পারব না, শেষে কী বলতে কী বলে ফেলব।

[প্রস্থান]

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। মহারানী, দেবদত্তকে নিয়ে কী গুঢ় পরামর্শ চলছে।

সুমিত্রা। আজ ভৈরবমন্দিরে পূজা করব, ঠুকে পুরোহিত করেছি।

বিক্রম। আজ ভৈরবের পূজা? এ কি হতে পারে।

সুমিত্রা। পাপের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছি, যিনি সকল ভয়ের ভয় তাঁর স্মরণ নেব।

বিক্রম। পাপের মূর্তি কী দেখলে।

সুমিত্রা। সতীতীর্থে সতীধর্মের অবমাননা, অথচ এ রাজ্যে তার কোনো প্রতিকার নেই, এ সংবাদ শুনে উৎসব করতে আমি সাহস করি নি।

বিক্রম। এ সংবাদ কে দিলে। দেবদত্ত?

সুমিত্রা। যারা অত্যাচারে মর্মান্তিক পীড়িত তাদেরই একজন।

বিক্রম। মহারানী, অন্তঃপুরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বিচারশালা স্থাপন করেছে? আমার অধিকার হরণ করতে চাও?

সুমিত্রা। মহারাজ, ধর্ম সাক্ষী করে আমি কি তোমার সহধর্মিণী হই নি। রাজ্যের পাপ যে মূহুর্তে তোমাকে স্পর্শ করে সেই মূহুর্তেই কি আমাকেও স্পর্শ করে না।

বিক্রম। দেবদত্ত, অভিযোগ কে এনেছে। কার নামে অভিযোগ।

দেবদত্ত। বৃধকোট থেকে প্রজা এসেছে, নাম রক্তেশ্বর, শিলাদিত্যের নামে অভিযোগ।

বিক্রম। আমাকে লঙ্ঘন করে রানীর কাছে কেন এই অভিযোগ।

দেবদত্ত। প্রশ্ন যখন করলে তখন সত্য কথা বলব, তোমার কাছে পূর্বেই অভিযোগ হয়েছে।

বিক্রম। আমি কি কান দিই নি।

দেবদত্ত। কান দিয়েছিলে, বলেছিলে বিশ্বাস কর না।

বিক্রম। সেই তো বিচার। অমাত্যের নামে মিথ্যা অপবাদ দিলে তারও বিচার রাজাকে করতে হবে না? জান শিলাদিত্যের 'পরে যে ভার আছে সে অতি কঠিন। প্রত্যন্তদেশের সীমা রক্ষা করতে হয় তাকেই।

দেবদত্ত। রাজার প্রতিনিধিরূপে ধর্মরক্ষা করাও তারই কাজ।

বিক্রম। কে বললে সে তা করে নি।

দেবদত্ত। তোমার নিজের অন্তরই বলছে, তাই আমার 'পরে' এত রাগ করছ। অভিযোগকারীকে আমিই তোমার কাছে নিয়ে গেছি। মন্ত্রী সাহস করে নি। সেদিন দেখি নি কি বিচারকালে ক্ষণে ক্ষণে তোমার দ্রুতি। দণ্ড তোমার কতবার উদ্যত হয়েও দুর্বল দ্বিধায় নিরস্ত হয়েছে সে কথা স্বীকার করবে না?

বিক্রম। সাবধান! আমি দুর্বল! কিসের ভয়ে দুর্বল!

দেবদত্ত। শিলাদিত্যকে যে-শাস্তি নিজে দিয়েছ আজ তার প্রতিরোধ করা তোমার নিজের পক্ষেও দুঃসাধ্য—এই কারণেই দ্বিধা। তুমি ওদের ভয় করতে আরম্ভ করেছ—আমাদের ভয় সেইখানেই।

বিক্রম। অসহ্য তোমার স্পর্ধা! অনুতাপের দিন তোমার আসন্ন।

সুমিত্রা। আশুপুত্র, আমাদের দণ্ড দেওয়া সহজ কথা—সেজন্যে রাজশাস্তির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শিলাদিত্যের বিচার আজই করা চাই।

বিক্রম। অভিযোগ যার সে কই।

সুমিত্রা। সে আমি।

বিক্রম। তুমি?

সুমিত্রা। যে হতভাগা এসেছিল তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিক্রম। নিজের মিথ্যার ভয়ে সে পালিয়েছে।

সুমিত্রা। মহারাজ, তুমি নিশ্চয় জান কে তাকে হরণ করেছে।

বিক্রম। মহারানী, অন্ধ দয়া আর অস্পষ্ট অনুমানের দ্বারা বিচার হয় না।

রত্নেশ্বরকে নিয়ে নরেশের প্রবেশ

নরেশ। শিলাদিত্যের লোক একে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যাচ্ছিল রাজদ্বারের সম্মুখ দিয়ে। আমার নিষেধ শুনলে না। তলোয়ার খুলতে হল 'রাজা আছেন' এই কথা এদের স্মরণ করিয়ে দিতে।

বিক্রম। কেন ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

নরেশ। বললে শিলাদিত্যের আদেশ। সে আদেশের উপরে তোমার আদেশ কী, সেইটে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রত্নেশ্বর। মহারানী, আমার রক্ষা নেই সে আমি জানি, কিন্তু বিচার চাই—সে বিচার আজই যেন হয়, তোমার সামনেই যেন হয়, দোহাই তোমার।

সুমিত্রা। মৃত, ঐ যে মহারাজ আছেন, ঠুকে জানাও তোমার অভিযোগ।

রত্নেশ্বর। মহারাজ, মর্মঘাতী দুঃখ আমাদের—সে দুঃখ বাধা মানবে না, বিলম্ব সহিবে না, মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে সে প্রবল।

বিক্রম। চুপ কর! দেবদত্ত, কে এদের এমন করে প্রশ্ন দিচ্ছে। এরা বলপূর্বক আমার কাছ থেকে বিচার কেড়ে নিতে চায়? দ্বারী কোথায়।

দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। কী মহারাজ।

বিক্রম। একে প্রহরীশালায় নিয়ে রাখো। কাল বিচার হবে।

দ্বারী। যে আদেশ।

রত্নেশ্বর। মহারানী, আমার আজকের দিন গেল, কালকের দিনকে বিশ্বাস নেই। বাঁচি আর মরি আমার যা-হয় হোক, কিন্তু প্রজার অভিযোগ তোমার পায়ে রেখে গেলুম, তোমাকে সে তুলে নিতে হবে। আমি বিদায় নিলুম।

সুমিত্রা। মনে রইল রত্নেশ্বর।

[স্বারী ও রত্নেশ্বরের প্রস্থান]

নরেশ। মহারাজ, মন্ত্রী আমাকে দিয়ে কিছ্‌ সংবাদ পাঠিয়েছেন—আশ্চর্য মন্ত্রণার আবশ্যক।
বিক্রম। তোমরা একটার পর আর-একটা উৎপাত নিজে সাজিয়ে আনছ।

নরেশ। উৎপাত সৃষ্টি করতে পারি এত শক্তি আমাদের আছে?

বিক্রম। সৃষ্টি করবার দরকার নেই। সত্যদুগেও রাজ্যে উৎপাতের অভাব ছিল না। কিন্তু উৎপাত ছাড়িয়ে থাকে দেশে ও কালে। তোমরা তাদের আজই একদিনের মধ্যে পূর্ণীকৃত করে সাজিয়েছ। যে-সমস্ত প্রমাণ তোমাদের মিত্রদের বেলায় থাকে বিক্ষিপ্ত, তোমাদের শত্রুদের বেলায় আজ তোমরা সেইগুলিকে সংহত করে কালো করে আমার সামনে ধরতে চাও—আজ উৎসর্গদিনের আলোর উপরে এই কালীমূর্তিকে দাঁড় করিয়ে কেবল এই কথাটা বলতে চাও যে তোমাদেরই জিত হল। তোমাদের এই সাজিয়ে-তোলা বিভীষিকার কাছে আমি হার মানব না এ কথা নিশ্চয় জেনো। উৎপাতের সংবাদ আছে, থাক-না, নিশ্চয়ই সে আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

নরেশ। অপেক্ষা করতে নিশ্চয় পারে, মহারাজ, কিন্তু আজ যা সংবাদ আছে কাল তা সংকট হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাই, মন্ত্রীকে জানাই গে।

বিক্রম। ওরা আমার প্রিয়পাত্র, ওদের প্রতি আমার পক্ষপাত, ওদের বিচার আমি করতে পারি নে, ওদের শাস্তি দিতে আমি অক্ষম—তোমাদের এ-সব কথা মিথ্যা, মিথ্যা। দণ্ডের যারা যোগ্য তাদের যখন দণ্ড দেব তখন ভয়ে স্তম্ভ হয়ে যাবে। ক্ষীণ দুর্বল তোমরাই, কর্তব্যের তোমরা কী জান! ক্ষমায় দয়ায় অশ্রুজলে তোমাদের কর্তব্যবুদ্ধি পঙ্কিল—তোমরা বিচার করবার স্পর্ধা কর! সময় আসবে, বিচার করব, কিন্তু তোমাদের ঐ কাল্মা শূনে নয়। মহারানী, তুমি কোথায় চলেছ। যেয়ো না, থামো।

সুমিত্রা। এমন আদেশ কোরো না। চলো রাজকুমার, ঐ লতাবিতানে, মন্ত্রী কী সংবাদ পাঠিয়েছেন শুনতে চাই।

বিক্রম। মহারানী, তোমার এই প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা আমার কর্তব্যকে আরো অসাধ্য করে তুলছে। শূনে যাও—আমি আদেশ করছি। ফিরে এসো।

সুমিত্রা। কী, বলো।

বিক্রম। তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—তোমার হৃদয় নেই, নারী! শংকরের তান্ডবকে উপেক্ষা করতে পার কি। সে তো অমরতার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য—আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তা হলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীরু—কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ ব'লে গণ্য করা তোমার গুরুদ্বার শিক্ষা। ভুলে যাও, তোমার ঐ কানে মন্ত্রগুনো। যে আদিশক্তির বন্যার উপরে ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বৃন্দবৃন্দ, সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে—তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, তার কাছে তোমার কর্ম অকর্ম বিধানবন্দ সমস্ত ভাসিয়ে দাও, একেই বলে মুক্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর।

সুমিত্রা। সাহস নেই মহারাজ, সাহস নেই! তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে—আমি তার কাছে অত্যন্ত ছোটো। তোমার চিন্তাসমুদ্রে যে তুফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়—উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মৃত্যুতে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে—সেখানকার ধূলির 'পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হত। তোমার নিজের তরঙ্গগর্জনে তোমার কর্ণ বধির, কেমন করে জানবে কী নিদারুণ দুঃখ তোমার চার দিকে। কত মর্মভেদী কাল্মার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিত্তকুহরে ক্ষুদ্র হয়ে বেড়াচ্ছে তোমাকে তা বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যখন চার দিকেই সবাই বঞ্চিত তখন আমাকে তুমি যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না। চলো রাজকুমার, মন্ত্রী কী আবেদন করছেন আমাকে বলবে চলো।

বিক্রম। শোনো নরেশ, কী সংবাদ এনেছ বলো আমাকে।

নরেশ। মহারাজ যুদ্ধাজিৎকে পদত্যাগের আদেশ করেছিলেন, সে তা একেবারেই শোনে নি। এদের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

বিক্রম। কিসে বোধ হল।

নরেশ। শিলাদিত্যকে যে মদহুতে মহারানী আহ্বান করে পাঠালেন তার পরমদহুতেই সে রাজধানী থেকে চলে গেল। মহারানীর আদেশ গ্রাহ্যই করলে না।

বিক্রম। আবার সংকট বাড়িয়েছ? রাজকার্যে কেন হাত দিতে গেলে, মহারানী।

সুমিত্রা। রাজকার্য নয়, আত্মীয়ের কতব্য। জালন্ধরের কিছতে আমার অধিকার না যদি থাকে কাশ্মীরের দায়িত্ব আছে আমার।

বিক্রম। সম্মানী লোকের অভিমানে আঘাত করে অসম্মান যদি ফিরে পেয়ে থাক কাকে দোষ দেবে।

সুমিত্রা। আত্মীয় যদি আত্মীয়ের অমর্যাদা করে থাকে তা নিয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে যে অপরাধ রাজার বিরুদ্ধে, তোমার প্রজার হয়ে তারই বিচার আমি চাই।

বিক্রম। বিচার যদি চাও তবে প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে।

সুমিত্রা। হাঁ, যুদ্ধই করতে হবে।

বিক্রম। যুদ্ধ! সে তো নারীর মুখের কথা নয়।

সুমিত্রা। নারীর বাহুর সাহায্য যদি চাও তো প্রস্তুত আছি।

বিক্রম। দেখো প্রিয়ে, জয়ের অভিপ্রায়েই যুদ্ধ, আশ্ফালনের জন্য নয়। এতে সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা আছে।

সুমিত্রা। রাজকুমার নরেশ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার কোনো পথই নেই?

বিক্রম। মহারানী, মনে রেখো দয়ার অবিচারেও অন্যায় আছে। প্রজাদের 'পরে অত্যাচার হচ্ছে এও যেমন অত্যাচার, অন্যায়কারীদের শাসন আমার পক্ষে অসাধ্য এও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। এ-সব কথা তোমার সঙ্গেও নয় এবং আজও নয়। দেবদত্ত, পৌরোহিত্য তুমি রাজার কাছ থেকে পাও নি—দ্বিবেদী পদরোহিত। আজ তার অবকাশ নেই, পূজা কাল হবে। রাজার কার্যে বা পূজার কার্যে যদি অনধিকার হস্তক্ষেপ কর তবে তোমার 'পরে রাজার হস্তক্ষেপ প্রীতিকর হবে না। মহারানী, উৎসবের বেশ তুমি এখনো পর নি। যাও, রাজার আদেশ, এখনই বেশ পরিবর্তন করো গে। এ তো রাজরানীর বেশ—

সুমিত্রা। তাই করব মহারাজ, তাই করব, বেশ পরিবর্তন করব। ধিক এই রাজ্য! ধিক আমি এ রাজ্যের রানী!

[দেবদত্ত ও বিক্রম ছাড়া আর সকলের প্রস্থান]

দেবদত্ত। মহারাজ, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু একটা অপ্রিয় কথা বলে যাব। নির্বিচারে যেদিন ঐ কাশ্মীরীদের হাতে ক্ষমতা দিলে সেদিন রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কত লোকের প্রাণদণ্ড হল, কত লোকের নির্বাসন। কত অভিজাত বংশের সম্মানী লোক অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিলে। এত বাধা পেয়েছিলে বলেই আত্মাভিমানের তাড়নায় তোমার নির্বন্ধ এমন দুর্ধর্ষ হয়েছিল।

বিক্রম। দেবদত্ত, এই ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করবার কী প্রয়োজন হয়েছে।

দেবদত্ত। মহারাজ, আমার আর কিছ সাধ্য নেই, আমি কেবল পারি বিপদ সামনে রেখে অপ্রিয় কথা তোমাকে শোনাতে। একদিন কেবলমাত্র অস্ত্রের যুক্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলে যে, এ রাজ্য সকলেই ভুল করেছে কেবল তুমি ছাড়া। বহু কণ্ঠ ছেদন করে রাজ্যের কণ্ঠরোধ করেছিলে। এতবড়ো প্রকাশ্য অহংকারের প্রমাদ সংশোধন পরিশেষে তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে এ আমি জানি। সুতরাং স্বয়ং বিধাতাকে নিতে হল সেই ভার।

বিক্রম। এ কথার সহজ অর্থ, তোমরা বিদ্রোহ করবে?

দেবদত্ত। তুমি জান সে আমার অসাধ্য—দেবতা হয়েছেন বিদ্রোহী, রাজ্যে দুর্যোগ এল, কঠিন দুর্যোগে এর অবসান।

বিক্রম। দেবতার নাম নিচ্ছ আমাকে ভয় দেখাতে?

দেবদত্ত। মহারাজ, তোমাকে ভয় দেখানো কি একটা খেলা। তোমার ভয় আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর। তোলো তোমার দণ্ড, প্রথম আঘাত পড়ুক আমাদের 'পরে যারা তোমার একান্ত আপন্যার। তোমার অন্যায়কে যারা নিজের লজ্জা করে নিয়েছে, তোমার ক্রোধকে দুর্যোগরূপে নিক তারা মাথায় করে। দাও দণ্ড আমাকে।

বিক্রম। যদি নাই দিই?

দেবদত্ত। অগ্রসর হয়ে নেব। আজ আমাদের জন্যে আরাম নেই, সম্মান নেই। যাও মহারাজ, তুমি উৎসব করো। আমাকে রত্নভৈরবের পূজা করতেই হবে। মন্দিরে প্রবেশ করতে নাই দিলে—তাঁর পূজার আহ্বান আজ শুনতে পাচ্ছি সর্বত্র এই রাজ্যের বাতাসে।

বিক্রম। স্পষ্ট কথার ছলে আমাকে অপমান করতে চাও, আমার কথাও একদিন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে—বিলম্ব নেই।

[উভয়ের প্রস্থান]

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। শোনো শোনো, রাজকুমার শোনো।

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। কী বলো।

বিপাশা। এই মালা তোমার, বীরের কণ্ঠের যোগ্য।

নরেশ। পরিচয় পেয়েছ?

বিপাশা। পেয়েছি।

নরেশ। এত সহজে?

বিপাশা। আমি অনাগতকে দেখতে পাচ্ছি।

নরেশ। কী দেখতে পেলো।

বিপাশা। জালন্ধরের রানীর সম্মান তুমি উদ্ধার করবে। চুপ করে রইলে কেন কুমার।

নরেশ। কথা বলবার সময় এখনো আসে নি।

বিপাশা। আমি বলি কথা বলবার সময় এখন চলে গেছে।

গান

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই,
তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই।

এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা
কাহার কাছে লই।

মলিন হল শত্রু বরন,
অরুণ সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল

উষা জ্যোতির্ময়ী।

সদৃশিতাগর-তীর বেয়ে সে

এসেছে মৃথ ঢেকে,
অঙ্গে কার্লি মেখে।

রবির রশ্মি, কই গো তোরা,
কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে
বল্ মাঠেঃ মাঠেঃ।

নরেশ। এ গান কোথায় পেলো বিপাশা?

বিপাশা। কাশ্মীরে মাতৃদেবের মন্দিরে আমরা এ গান গাই হেমন্তে গিরিশিখরে যখন আলোকরাজ্যে অরাজকতা আসে।

নরেশ। এ গান আমাকে শোনাতে যে?

বিপাশা। এখানকার ক্রিষ্ট আকাশে তুমিই আলোকের দূত। যাক মীনকেতুর বেদী ভেঙে, সেখানে তোমার আসন ধরবে না, রুদ্রভৈরবের নির্মাল্য আনব তোমার জন্যে। এখানে তিনি ভৈরব কাশ্মীরে তিনিই মাতৃদেব, সেই দেবতাকে প্রসন্ন করো বীর। আজ সকালে আত্মত্যাগের জন্যে যে কৃপাণ খুলেছিলে একবার দাও আমার হাতে। (তলোয়ার কপালে ঠেকিয়ে) রুদ্রের তৃতীয় চক্ষুতে তুমিই অগ্নি, প্রভাতমাতৃদেবের দীপ্ত দৃষ্টিতে তুমিই রৌদ্রছটা, বীরের হাতে তুমি কৃপাণ, তোমাকে নমস্কার।

গান

জাগো হে রুদ্র জাগো।
সুপ্তজড়িত তিমিরজাল
সহে না সহে না গো।
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে
বিমুগ্ধ করো তারে,
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষু, মাগো।

রাজকুমার, ঐ দেখো!

নরেশ। সেই আমার পক্ষের কুর্গড়! এখনো রেখেছ?

বিপাশা। এ আজ কথা করেছে—কাশ্মীরের হৃদয় জেগেছে এর মধ্যে।

নরেশ। ঐ আসছেন মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা। আমাকে হয়তো প্রয়োজন আছে—তুমি মন্দির-প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করো।

[বিপাশার প্রস্থান]

বিক্রম ও মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। প্রজারা বিদ্রোহী? কোথায়।

মন্ত্রী। বৃদ্ধকোটে সিংহগড়ে।

বিক্রম। ক্ষমার কথা বোলো না। অক্ষমের স্পর্ধা সব চেয়ে ক্ষমার অযোগ্য।

নরেশ। বস্তুত ওদের বিদ্রোহ বিদেশী সামন্তদের বিরুদ্ধে।

বিক্রম। তারা কি আমার প্রতিনিধি নয়।

নরেশ। তখন নয় যখন তারা নিজের স্বার্থ দেখে, প্রজার নয়, রাজার নয়। আমাকে আদেশ করো আমি প্রজাদের শান্ত করে আসি।

বিক্রম। তুমি! আমার শাসন আলগা করেছে তোমরাই। প্রজাদের প্রশ্রয়ে মহারানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছ তুমিই। বিদেশীর প্রতি ঈর্ষা তোমার মতো এমন স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে কেউ সাহস করে নি। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়। আমার আহ্বান এখনই তাকে জানাও গে। তিনি শূন্যদণ্ড তাঁর দয়াদ্রুত প্রজারা আজ বিদ্রোহ করেছে—ভীরুরা বিদ্রোহ করতে সাহস করেছে তাঁর ভরসায়।

কিন্তু তিনি ওদের বাঁচাতে পারবেন? বিচার সর্বাগ্রে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। এখনই, এখানেই। মন্ত্রী, তোমরা অপবাদ দিয়ে এসেছ আমার চিত্ত দুর্বল, রানীর প্রতি অন্ধ আমার প্রেম। আজ দেখাব তোমরা ভুল করেছ। তোমাদের মহারানীরও বিচার হবে। নির্বাসন দিতে পারি নে ভাবছ? আমাদের বংশ রামচন্দ্রের, সূর্যবংশ।

মন্ত্রী। মহারাজ।

বিক্রম। কী, বলো। স্তম্ভ হয়ে রইলে কেন।

মন্ত্রী। সামন্তরাজদের সৈন্যদল নিকটবর্তী। শিলাদিত্য তাদের সেনাপতি।

বিক্রম। সিংহাসনের প্রতি লক্ষ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা করেছ।

মন্ত্রী। সৈন্য প্রস্তুত নেই, তাদের সকলকে বিশ্বাস করাও কঠিন।

নরেশ। আমাকে ভার দিন মহারাজ। দ্বিধা করবার সময় নেই। আমি সৈন্য প্রস্তুত করি গে।

বিক্রম। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়।

প্রতিহারী। তিনি অন্তঃপুরে নেই।

বিক্রম। কোথায় তিনি। ভৈরবমন্দিরে?

প্রতিহারী। সেখানে দর্শন পাই নি।

বিক্রম। কোথায় তবে।

প্রতিহারী। দ্বারপাল বলে, ঘোড়ায় চড়ে তিনি উত্তরের পথে চলে গেছেন।

বিক্রম। অর্থ কী। রাজকুমার, তুমি নিশ্চয় জান কোথায় গেছেন তিনি।

নরেশ। কিছুই জানি নে মহারাজ।

বিক্রম। চলে গেছেন? বিদ্রোহী প্রজাদের উত্তেজিত করতে? ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো, বেঁধে নিয়ে এসো শৃঙ্খল দিয়ে—সৈবরিনী!

নরেশ। এমন কথা মুখে আনবেন না। আমরা সহিতে পারব না।

বিক্রম। মৃগ্ধ আমি! ধিক আমাকে! অন্ধ, দেখতেই পাই নি, সিংহাসনের আড়ালে বসে কাশ্মীরের কন্যা চক্রান্ত করছিলেন। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই। অন্তঃপুরে ওকে কে রাখবে! কারাগার চাই!

নরেশ। এমন পাপ চিন্তা করবেন না, মহারাজ!

বিক্রম। তোমরা সবাই আছ এর মধ্যে। তুমিও আছ, নিশ্চয় আছ। চলে গেছেন! আগে তোমাদের দণ্ড দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ। দেবদত্ত কোথায়। কোথায় সেই বিশ্বাসঘাতক।

মন্ত্রী। বৃথা চণ্ডল হবেন না, মহারাজ। মহারানী মনকে শান্ত করতে গেছেন, নিশ্চয় আপনিই ফিরে আসবেন। অধীর হয়ে তাঁকে অপমান করলে চিরদিনের মতো তাঁকে আমরা হারাব।

বিক্রম। ফিরে আসবেন সে কি আমি জানি নে? আমাকে কেবল স্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন। মনে করেছেন তাঁকে কাকুতি মিনতি করে ফেরাব। ভুল মনে করেছেন। আমাকে এমনি কাপুরুষ বলেই জানেন বটে! আমার পরিচয় পান নি। নিষ্ঠুর হবার প্রচণ্ড শক্তি আমার আছে। আমাকে ভয় করতে হবে—এইবার তা বুঝবেন।

দূতের প্রবেশ

দূত। উত্তরপথ থেকে মহারানীর এই পত্র।

বিক্রম। (পত্র পড়তে পড়তে) রাজকুমার নরেশ, সুমিত্রা এসব কী লিখেছেন। এর কী মানে। —‘বিবাহের পূর্বে একদিন রুদ্রভৈরবকে আত্মনিবেদন করতে গিয়েছিলেন। তাঁরই বলি ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিলেম তোমাকে, তোমার রাজ্যকে। ব্যর্থ হল, তুমিও পেলে না, তোমার রাজ্যও পেতে বাধা পেল।’

নরেশ। মহারাজ, তুমি তো জান, মহারানী আগুনে কাঁপ দিতে গিয়েছিলেন, পুরবাসীরা ফিরিয়ে এনে তোমার হাতে দিলেন।

বিক্রম। সেই আগুন যে সঙ্গে আনলেন, দগ্ধ করলেন আমাকে। এই লও নরেশ, পড়ো, আমার চোখে অক্ষরগুলি নৃত্য করছে, আমি পড়তে পারছি নে!

নরেশ। মহারানী লিখছেন, ‘আমি যাঁর কাছে নিবেদিত তাঁকে তাঁর অর্থ্য ফিরিয়ে দিতে চললেম। কাশ্মীরে ধ্রুবতীর্থে মাতৃদেব আমাকে গ্রহণ করবেন। রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারি নি, শুভকামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দূর করতে পারলুম না। যদি আমার তপস্যা সার্থক হয়, যদি দেবতাকে প্রসন্ন করি তবে দূর হতে তোমাদের মঙ্গল করতে পারব। আমাকে কামনা কোরো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন। আমাকে ত্যাগ করো, তোমাদের শান্তি হোক।’

বিক্রম। দেন নি, তিনি কিছুই দেন নি, সমস্ত ফাঁকি! নারী যে সুধা এনেছে আমার দীনতম প্রজারও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তার কণাও পাই নি—আমার দিনরাত্রি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে, সুধাসমুদ্রের তীরে বসে। নরেশ, আজ আমাকে কী করতে হবে বলো, আমি মন স্থির করতে পারছি নে।

নরেশ। মহারাজ, আমার কথা যদি শোনো, তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কোরো না।

বিক্রম। কী বললে! করব না চেষ্টা! বিশ্বের সামনে আমার পৌরুষ ধিক্কৃত হবে! আনো আগে তাঁকে ফিরিয়ে, তার পর সর্বসমক্ষে তাঁকে ত্যাগ করব। রাষ্ট্রপালকে বলো তাঁকে আনুক বন্দী করে।

নরেশ। হবে না মহারাজ, সে হবে না, আমার প্রাণ থাকতে সে হতে দেব না।

বিক্রম। বিদ্রোহ?

নরেশ। হাঁ বিদ্রোহ! তুমি আত্মবিস্মৃত, তোমার অনুমোদন করে তোমার অবমাননা করতে পারব না। তোমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করতে এখনো তাঁর তিন-চার দিন লাগবে। আমি নিজে যাব তাঁকে ফিরিয়ে আনতে।

বিক্রম। যাও, তবে এখনই যাও, শীঘ্র যাও।

[নরেশের প্রস্থান]

মন্ত্রী, তুমি ভাবছ, তাঁকে ক্ষমা করে ফিরিয়ে আনিছ। একেবারেই নয়। রাজবিদ্রোহিণী তিনি, আমি নিজেই দিতেম তাঁকে নির্বাসন। আমার দণ্ড এড়িয়ে তিনি পালাচ্ছেন, এই আমার ক্ষোভ।

মন্ত্রী। মহারাজ, তাঁকে দণ্ড দেবার কথা বলে আমাদের সকলকে দুঃখ দিচ্ছেন। তিনি কাছে আসলেই দেখতে পাবেন তাঁকে দণ্ড দেবার সাধ্য আপনার নেই।

বিক্রম। তা হতে পারে, আমি মৃদু। এ মোহপাশ যাক, যাক ছিন্ন হয়ে, আমি আনব না তাঁকে আমার কাছে। প্রতিহারী, রাজকুমার নরেশকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনো। যেতে দাও, যেতে দাও, কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরে ফিরে যেতে দাও।

মন্ত্রী। দাসের অনুদয় শুনুন মহারাজ। রাজকুমার নরেশ তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, তার পরে আজকের দিনের এই ক্ষতবেদনা ভুলতে দেরি হবে না।

বিক্রম। মিনতি করে ফিরিয়ে আনা নয়, নয়, কিছুতেই নয়। একদিন যুদ্ধ করে তাঁকে জালন্ধরে এনেছি, পুনর্বীর যুদ্ধ করেই তাঁকে জালন্ধরে ফিরিয়ে আনব।

মন্ত্রী। যুদ্ধ করে?

বিক্রম। হাঁ, যুদ্ধ করেই। কাশ্মীরের অভিমানে কাশ্মীরে চলেছেন—জালন্ধরের অপমান ঘোষণা করবেন! পদানত ধূলিশায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দি করি, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ করে এতদিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তার মূল উৎপাটিত করে তবে আমি শান্তি পাব। মন্ত্রী, বৃথা তর্কের চেষ্টা কোরো না—এই মূহুর্তে সৈন্য প্রস্তুত করতে বলো গে।

মন্ত্রী। মহারাজ, ইতিমধ্যে তবে কি বিনা বাধায় বিদ্রোহী সামন্তরাজদের দেবে রাজ্য অধিকার করতে।

বিক্রম। না।

মন্ত্রী। তা হলে আপাতত এদের সঙ্গে যুদ্ধ সেরে তবে অন্য কথা।

বিক্রম। যুদ্ধ নয়।

মন্ত্রী। তবে?

বিক্রম। সন্ধি।

মন্ত্রী। মহারাজ কী বললেন, সন্ধি?

বিক্রম। হাঁ, সন্ধি করব। ওরাই হবে কাশ্মীর অভিযানে আমার সঙ্গী।

মন্ত্রী। সন্ধি করবে! মহারাজ, ক্ষোভের মুখেই এমন কথা বলছ।

বিক্রম। তোমার মন্ত্রণা দেবার সময় চলে গেছে। এখন বিনা বিচারে আমার আদেশ পালন করো।

মন্ত্রী। তবু বলতে হবে। যা সংকল্প করেছে তাতে রাজ্যের সমস্ত প্রজা উন্মত্ত হয়ে উঠবে।

বিক্রম। উন্মত্ততা গোপন থাকলে স্থায়ী হয়ে থাকে—উন্মত্ততা প্রকাশ হলে তাকে দমন করা সহজ। সেজন্যে আমার কোনো চিন্তা নেই। দূতকে ডেকে পাঠাও।

[উভয়ের প্রস্থান]

কন্দর্পের পুষ্পমূর্তি ও পূজোপকরণ নিয়ে
বিপাশা ও তরুণীগণের প্রবেশ

বিপাশা।

গান

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে।

পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে।

মহারাজা বলেছিলেন এইখান থেকে যাত্রারম্ভ হবে। মাধবীবিতানে তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। কই, তাঁকে তো দেখছি নে।

প্রথমা। আমাদের গান শুনতে পেলেই দেখা দেবেন।

গান। অনুবৃষ্টি

পলাশকলি দিকে দিকে

তোমার আখর দিল লিখে,

চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে।

দ্বিতীয়া। কিন্তু মহারাজ তো এলেন না—গোধূলিলগ্ন বয়ে বাচ্ছে। ঐ তো দিগন্তে চাঁদের রেখা দেখা দিল।

বিপাশা। লগ্ন এলেই কী আর গেলেই কী, আমাদের তাতে কী আসে যায়। গান থামাস নে। মহারাজ বলেছেন উৎসবকে জাগিয়ে রাখতে, একটুও যেন শ্লিয়মাণ না হয়।

গান। অনুবৃষ্টি

আকাশপারে পেতে আছে একলা আসনখানি,

নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।

পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে

নবীন প্রাণের পত্র আসে,

পলাশ-জবায় কনকচাঁপায় অশোকে অশ্বখে।

বিক্রমের প্রবেশ

বিপাশা। মহারাজ, সময় হয়েছে।

বিক্রম। হাঁ সময় হয়েছে—এবার ফেলে দাও এসব, দ'লে ফেলে দাও ধুলোয়।

প্রথমা। মহারাজ কী করলেন, এ-যে দেবতার মূর্তি।

বিক্রম। এমন অক্ষম, এমন ব্যর্থ, এমন মিথ্যা, ওকে বল দেবতা! বিড়ম্বনা! এই আমি ওকে পায়ের তলায় দলছি। দ্বারী।

দ্বারী। কী মহারাজ।

বিক্রম। নিবিয়ে দিতে বলে দাও এই-সব আলোর মালা। দ্বারের কাছে বাজিয়ে দাও রণভেরী।

[রাজা ও তরুণীগণের প্রস্থান]

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, শূনে যাও।

বিপাশা। কী, বলো।

নরেশ। চলে গেলেন।

বিপাশা। কে চলে গেলেন।

নরেশ। আমাদের মহারানী।

বিপাশা। কোথায় চলে গেলেন।

নরেশ। জান না তুমি?

বিপাশা। না।

নরেশ। তিনি গেছেন একলা ঘোড়ায় চড়ে কাশ্মীরের পথে।

বিপাশা। বলো বলো, সব কথাটা বলো।

নরেশ। পত্র পাঠিয়েছেন তিনি আর ফিরবেন না। ধ্রুবতীর্থে মাতৃন্ডমন্দিরে আশ্রয় নেবেন।

বিপাশা। আহা, কী আনন্দ। মূর্ত্তি এতদিন পরে!

নরেশ। বিপাশা, তাঁকে তো বাঁধতে কেউ পারে নি।

বিপাশা। শিকল পরাতে পারে নি, খাঁচায় রেখেছিল। পাখা বাঁধিয়ে দিয়েছিল সোনা দিয়ে। ধরতে গিয়ে তাঁকে হারাল। এই হারানোর কী অপূর্ব মহিমা। সূর্যাস্তরশ্মির পশ্চিমযাত্রা। কিন্তু এই অন্ধরা কি এর পদ্যরূপের ছটা দেখতে পেলেন।

নরেশ। আমরা যাব তাঁকে ফেরাতে। এতক্ষণে তিনি গেছেন নন্দীগড়ের মাঠের কাছে।

বিপাশা। যেয়ো না যেয়ো না, তিনি তোমাদের নন; তাঁকে পাও নি, পাবেও না। আজ ভাঙা-উৎসবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন পাষাণের বুকফাটা নির্ঝরার মতো।

গান

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভূলে

হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।

জাহ্নবী তাই মদুমুখারায়

উন্মাদিনী দিশা হারায়,

সংগীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে।

রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে।

শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘরছাড়ারে।

আপন স্রোতে আপনি মাতে,

সাথী হল আপন সাথে,

সবহারা সে সব পেল তার কদলে কদলে।

এই গান আমরা পাহাড়ে গাই বসন্তে যখন বরফ গলতে থাকে, ঝরনাগুলো বেরিয়ে পড়ে পথে-

পথে। এই তো তার সময়—ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেছে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে।

নরেশ। খুব খুশি হয়েছে, বিপাশা?

বিপাশা। খুব খুশি আমি।

নরেশ। কোনো দুঃখই বাজছে না তোমার মনে?

বিপাশা। এমন সুখ কোথায় পাব, কুমার, যাতে কোনো দুঃখই নেই।

নরেশ। বন্ধন তো কাটল, এখন তুমি কী করবে।

বিপাশা। যাঁর সঙ্গে ঘরে ছিলাম তাঁর সঙ্গেই পথে বেরব।

নরেশ। তোমাকেও আর ফেরাতে পারব না?

বিপাশা। কী হবে ফিরিয়ে বন্ধু। হয়তো বাঁধতে গিয়ে ভুল করবে।

নরেশ। আচ্ছা যাও তুমি। আমার মন বলছে, মিলব একদিন। এখানে আমারও স্থান নেই।

বিপাশা। কেন নেই, কুমার।

নরেশ। মহারাজ স্থির করেছেন, কাশ্মীরে যুদ্ধযাত্রা করবেন—যুদ্ধে জয় করেই মহারানীকে ফিরিয়ে আনবেন।

বিপাশা। সেও ভালো। এমনি রাগ করেও যদি রাজার পৌরুষ জাগে তো সেও ভালো।

নরেশ। ভুল করছ বিপাশা। এ পৌরুষ নয়, এ অসংযম—ক্ষত্রিয়তেজ একে বলে না। যে উন্মত্ততায় এতদিন আপনাকে বিস্মৃত হতে লজ্জা পান নি এও সেই উন্মাদনারই রূপান্তর। কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই, নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি। মীনকেতুরই কেতনে রক্তের রঙ মাখাতে চলেছেন—কল্যাণ নেই। আমাকেও যেতে হল কাশ্মীরে।

বিপাশা। লড়াই করতে?

নরেশ। মহারানীকে এই কথা জানাতে যে, যারা কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে এসেছে তারা জালন্ধরের আবর্জনা, তাদের পাপে আমাদের সকলকে যেন তিনি অপরাধী না করেন।

বিপাশা। যাবে তুমি? সত্যি যাবে?

নরেশ। হ্যাঁ, সত্যি যাব।

বিপাশা। তবে আমিও তোমার পথের পথিক।

নরেশ। তা হলে এ পথের অবসান যেন কখনো না হয়।

বিপাশা। তুমি আর ফিরবে না?

নরেশ। ফেরবার দ্বার বন্ধ। রাজা আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। অন্ধ সংশয়ের হাতে যেখানে রাজদণ্ড, রাজার বন্ধুদের স্থান সেখান হতে বহুদূরে।

[উভয়ের প্রস্থান]

৩

কাশ্মীর

১। সর্বনাশ! বল কী!

২। চলো, আর দেরি নয়।

১। ঠিক জান তো?

২। তরাইয়ে গিয়েছিলুম ভালদুকের চামড়া বেচতে—স্বচক্ষে দেখে এলুম জালন্ধরের সৈন্য। আর দেখলুম ধনদস্তকে, চন্দ্রসেনের দূত। দুই পক্ষে বোঝাপড়া চলছে।

১। ওদের পথ আগলানো হবে না?

রঙ। ২৫ক

২। কে আগলাবে। খুড়োমহারাজ নিজের পথ খোলসা করছেন। এবার আমরা প্রজারা মিলে যেদিন যুবরাজকে রাজা করতে দাঁড়িয়েছি, এমনি অদৃষ্ট, ঠিক সেইদিনই এসে পড়ল বিদেশী দস্যু। খুড়োরাজা এবার কাশ্মীরের রাজছত্রের উপর জালন্ধরের ছত্র চাড়িয়ে সিংহাসনে নিজের অধিকার পাকা করে নিতে চেষ্টা করছেন।

১। কিন্তু দেখো বলভদ্র, এ সংবাদ এখন প্রচার করে অভিষেক ভেঙে দিয়ে না। এখানকার অনুষ্ঠান চলতে থাক্, আজকের মধ্যেই সমাধা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমরা যা করতে পারি করি গে। রণজিৎকে পাঠাও পস্তনে। আর জঠিয়াতে খবর দাও কাঠুরিয়াপাড়ায়—আমি চললেম রংগী-পুরে। ঘোড়া যার যতগুলো পাওয়া যায় ধরে আনা চাই। পাঁচমুড়ির মহাজনদের গমের গোলা আটক করতে হবে—অন্তত দু মাসের যুদ্ধের খোরাক দরকার।

২। এবার আমরা মরি আর বাঁচি ঐ পিশাচের অভিপ্রায় কিছুতেই সিদ্ধ হতে দেব না। কুমারের অভিষেক আজ সম্পন্ন হওয়াই চাই। তার পর থেকেই চন্দ্রসেনকে রাজবিদ্রোহী বলে গণ্য করব। ওরে, তোরা তোরণে দেবদারুশাখায় মালাগুলো শীঘ্র খাটিয়ে দে। ভেরীওয়ালাকে বল-না বাজিয়ে দিতে ভেরী।

১। সবাই এসে জড়ো হোক। এই-যে মহীপাল—তোমাকে অত্যন্ত দরকার।

মহীপাল। কেন, কী হয়েছে।

২। সে কথা এখানে বলা চলবে না। চলো ঐ দিকে। দেরি কোরো না।

১। এইমাত্র একটা খবর পেয়েছি, চন্দ্রসেন এই দিকে আসছেন। বোধ করি অভিষেক ভেঙে দিতে।

২। না, আমার বিশ্বাস, কোশলে যুবরাজকে সতর্ক করে দিতে। চন্দ্রসেন আর সব করতে পারে কিন্তু কুমারকে ওরা বন্দী করে নিয়ে যাবে এ তিনি কখনোই সহিবেন না। কিন্তু চল, আর দেরি না।

[সকলের প্রস্থান]

আর-একদল

১। ব্যাপারখানা কী ভাই।

২। আকাশ থেকে পড়লে নাকি।

১। সেইরকমই তো বটে। দুঃখের কথাটা বলি। জান তো পেটের দায়ে একদিন ঢুকোছিলুম খুড়োরাজার প্রহরীর দলে। খুব মোটা মাইনে নইলে ঠুঁর কাজে লোক আসতে চায় না। স্ত্রীর গায়ে গহনা চড়ল—কিন্তু লজ্জায় সে ইন্দারায় জল আনতে যাওয়া বন্ধ করলে। আমাদের পাড়ায় থাকে কুন্দন; সকলের নামে সে ছড়া কাটে। সে আমার নাম দিলে খুড়ো-গণেশের খুড়তুতো ইন্দুর। শ্রুনে দেশসুন্দর লোক খুব হাসলে, আমি ছাড়া।

৩। বাহবা, ঠিক নামটা বের করেছে তোদের কুন্দন। দেশে খুড়তুতো ইন্দুরের বাড়াবাড়ি হতে চলল। ঘরের ভিত পর্যন্ত ফুটো করে দিলে রে, দাঁত বসাচ্ছে সব-তাতেই, এইবার ওদের গর্তে লাগাব আগুন। তার পরে বৃদ্ধ, পিঠে গণেশঠাকুরের শড়ু-বুলোনি সইল না বৃদ্ধি।

১। অনেকদিন অনেক সহ্য করলুম। শেষকালে যেদিন খুড়োরাজা খুঁশি হয়ে আমাকে প্রহরীশালার সর্দার করে দিলে—সেইদিন পথের মধ্যে দেখা আমার ছোটোশালীর সঙ্গে। জান তাকে—

২। জানি বৈকি। ঐ তোদের রূপমতী, খাসা মেয়ে রে! তোদের ছড়া-কাটিয়ে তাকেই তো বলে মৃত্যুশেল।

১। সে আমাকে দেখে বাঁ পা দিয়ে মাটিতে এক লাথি মারলে, ধুলো উড়িয়ে দিলে, পায়ের মল ঝম ঝম করে উঠল—মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল। আর সইল না।

৩। হা হা হা হা! রাঙা পায়ের এক ঘায়ে খুড়তুতো ইন্দুরের লেজ গেল কাটা!

১। দিলেম ফেলে আমার পাগড়ি প্রহরীশালার দ্বারে, চলে গেলেম উত্তরে মালখণ্ডে। গ্রীষ্ম-ভোর ছাগল চরাই, শীতকালে রাজধানীতে নিয়ে আসি, কম্বল বিক্রি করি। পণ করেছি যখন হাতে কিছু টাকা হবে, পাগড়িতে লাগাব সোনার পাড়—যাব আমার শ্যালীর বাড়িতে, সেই বাঁ পায়ের লাথিটা সে ফিরিয়ে নেবে, তবে অন্য কথা। এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসিছিলাম ছাগলের পাল নিয়ে, যাচ্ছিলাম রাজধানীর দিকে। পথের মধ্যে একদল লোক ছাগলসম্বন্ধ আমাকে হৈঃ হৈঃ শব্দে খেঁদিয়ে নিয়ে এল এইখানে, বললে এই আমাদের রাজধানী এইখানে—এই উদয়পুরে।

২। মদুর্খ, মনে রাখিস, আজ থেকে এর নাম উদয়পুর নয়, কুমারপুর।

১। মনে রাখা শক্ত হবে ভাই, এখানে আমার দাদাশ্বশুরের বাড়ি, চিরদিন জানি—

৩। ভাবনা কী, নতুন রাজত্বে তোর দাদাশ্বশুরের নাম নতুন করে দেব।

১। তা যেন দিলে, কিন্তু আমার ছাগলের মহাজন থাকে সেইখানটাতে যাকে রাজধানী বলে জানতুম। সে লোকটার কাছে দেনাও আছে পাওনাও আছে। নইলে তারও নাম বদল করে দিলে খুঁশি হতুম।

২। আচ্ছা বেশ, খুড়োমহারাজের রাজত্বকালের দেনাটা কুমাররাজের রাজত্বকালে মাপ করে দেওয়া গেল।

১। আর পাওনাটা?

২। সেটা পরে দেখা যাবে—সময়মতো।

১। পেটের তাগিদ সময় মানবে না, দাদা। তা যাই হোক, তোদের মুখের কথায় রাজধানী তৈরি হয় না তো ভাই, সেরকম চেহারা দেখাছি নে।

৩। সবই কি চোখে দেখতে হয়। মনে-মনে দেখ্।

১। কিন্তু ছাগলের দামটা মনে-মনে পেলে আমার চলবে না। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলো, দাদা।

৩। তবে শোন, কুমার এলেন তীর্থ থেকে, তবু খুড়োমহারাজ সিংহাসন আঁকড়েই রইলেন। দেখলুম, টানাটানি করতে গেলে রক্তারক্তি হবে। ঠিক করেছি এখানেই যুবরাজের রাজধানী বসিয়ে তাঁকে রাজা করব। আজই অভিষেক।

১। এই আখরোটের বনে?

২। কোথাকার গোঁয়ার এটা? রাজা যেখানেই বসবেন সিংহাসন সেইখানেই। আর তোকে যদি ইন্দুর আসনেও বসাই তার তলা থেকে ছাগল ডাকতে থাকবে রে।

১। না ডাকলেও সুখ হবে না ভাই, মন কেমন করবে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে। ছিলেন এক রাজা, হলেন দুই রাজা, ভার সইবে? এক ঘোড়ার দুই সওয়ার, লেজের দিকে লাগাম টানবে একজন, মুখের দিকে আর-একজন, জন্তুটা চলবে কোন্ রাস্তায়।

২। ওরে, জন্তুটার চেয়ে মূর্খকিল হবে সওয়ারের—যিনি থাকবেন লেজের দিকে তাঁকে আপনিই খসে পড়তে হবে। বুঝতে পেরেছিস?

১। অনেকখানি বোঝা বাকি আছে। লেজের মানুষটা খসে পড়বার আগে খাজনা দেব কাকে।

৩। খাজনা দিতে হবে মহারাজ কুমারসেনকে।

১। তার পরে?

৩। তার পরে আর কিছুই নেই।

১। খুড়োমহারাজ তো সিংহাসনে বসে উপোস করবার ব্রত নেন নি। যখন খিদে চড়ে যাবে তখন?

২। সে কথা খুড়োমহারাজ চিন্তা করবেন। আমরা সবাই পণ করেছি খাজনা দেব মহারাজ কুমারসেনকে, আর কাউকে নয়।

১। ঠিক বলছ দাদা, সবাই পণ করেছে?

২। হাঁ, সবাই।

১। বরাবর দেখে আসছি তোমরা মোড়লরা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বল, বাহবা, আর সামনে থেকে মাথায় বাড়ি পড়ে আমাদেরই। ঠিক বলছ, সবাই খাজনা দেবে কুমারমহারাজকে, কেউ পিছবে না?

৩। কেউ না, কেউ না। আজ মহারাজের পা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করব।

১। এ কথা ভালো। মার তো কপালে লেখাই আছে। একলা খাই সেইটেই দুঃখ। দেশ জুড়ে মারের ভোজ বসে যায় যদি, পাত পাড়তে ভয় করি নে।

২। এই রইল কথা?

১। হাঁ, রইল।

৩। পিছোবি নে?

১। পিছোবার রাস্তাটা তোমরাই খোলসা রাখ, সে রাস্তা আমরা খুঁজেই পাই নে।

৩। ওরে বোকা, মরতে পারি নে তা নয়, কিন্তু আমরা মলে তোদের দশা কী হবে।

১। আমাদের অন্ত্যেষ্টিসংকারটা বন্ধ থাকবে।

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। রাজার অভিষেকের সময় হল?

২। না, এখনো দেরি আছে। তোমরা প্রস্তুত আছ তো?

প্রথমা। আমাদের জন্যে ভেবো না গো, ভেবো না। তোমাদের পুরুষের মধ্যেই দেখি কেউ বা এগোন কেউ বা পিছোন। কেউ বলছেন সময় বদলে কাজ, কেউ বলছেন কাজ বদলে সময়। মাঝের থেকে সময় যাচ্ছে চলে।

দ্বিতীয়া। দেখে এলেম তোমাদের ন্যায়বাগীশ এখনো বসে তর্ক করছেন, যিনি রাজা তিনি সিংহাসনে বসেন, না, যিনি সিংহাসনে বসেন তিনিই রাজা। এই নিয়ে দুই পক্ষে মাথা-ভাঙাভাঙি চলছে আমাদের পাড়ায়। মেয়েরা কাল সমস্ত রাত ধরে সাজিয়েছে মাঙ্গল্যের ডালা।

তৃতীয়া। ভোর থেকে যে-যার গ্রাম থেকে সব বেরিয়ে পড়ল।

১। আর লজ্জা দিয়ো না আমাদের। এ কথা মেনে নিচ্ছি মেয়েদের মতো পুরুষ মেলে না। তোমাদের গানের দল আছে তো?

দ্বিতীয়া। হাঁ, তারা এল বলে।

২। তোমাদের উমিচাঁদের মেয়ে?

তৃতীয়া। সেই তো সব দল ডেকে আনছে।

২। নন্দপল্লীর উপযুক্ত মেয়ে বটে। সেদিন বিস্তার ঘাটে আমাদের করমচাঁদ গিয়েছিলেন তাকে গোটা দুয়েক মিঠে কথা বলতে। কঙ্কণের এক ঘা খেয়েই মদ্য বন্ধ।

প্রথমা। জান না বুঝি, সে বলেছে বেহবতী নাম নেবে—কুমার মহারাজের সিংহাসনের পশ্চাতে থাকবে তার পরিচারিকা হয়ে।

১। দাদা, তা হলে আমি ছাগল-চরানোর ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে রাজার ছত্রধর হব।

২। ওরে বুদ্ধ, এই খানেক আগেই তোকে দোমনা দেখেছি, একমুহুর্তে রাজভক্তি ভরপুর হয়ে উঠল কিসে।

১। এক আগুন থেকে আর-এক আগুন জ্বলে।

৩। তুই তো ছাগল চরাতে গিয়েছিলি, উত্তরখণ্ডের খবর কিছু এনেছিস?

১। কাউকে যদি না বলো তো বলি।

৩। ভয় কিসের। বলে ফেল-না।

১। বললে না প্রত্যয় যাবে স্বয়ং রানী সন্মিষ্টাকে দেখেছি ভৈরবীবেশে চলেছেন ধুবতীথে।

২। পাগল রে!

প্রথমা। না গো, উনি মিথ্যা বলছেন না। আমিও শুনছি বটে। কাউকে বলতে সাহস করি নি।

৩। কার কাছে শুনলে।

প্রথমা। ঐ যে আমার ভাস্করবি মন্দাকিনী। তীর্থ করে ফিরে আসছিল। পথে দেখা। রাজকুমারী চলেছেন মাতৃদেবের উপাসিকার দীক্ষা নিতে।

২। বিশ্বাস করি কী করে। বুদ্ধ তোর সঙ্গে কথা হল কিছ?

১। প্রণাম করে বললুম, তুমি আমাদের রাজকুমারী সন্মিতা। তিনি বললেন, আমার নাম তপতী। জানিস তো সেই অপরূপ রূপ। সেই লাভ্য যেন আগুনে স্নান করে এল। বললেন, দেবী, চরণের সেবক হয়ে যাই সঙ্গে। তিনি নীরবে তর্জনী তুলে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

৩। দুর্গম তীর্থে রাজকুমারী একলা চলেছেন, তুই এখানে এসে রাজবাড়িতে জানালি নে?

১। দুই-একজনকে জানাতে গিয়েছিলেম—আমাকে মারে আর কি। বলে, আমি নেশা করেছি!

আর-একজনের প্রবেশ

৪। কিছতে রাজি হল না।

২। কার কথা বলছ।

৪। আমাদের সভাকবি দর্দুর। খুড়োমহারাজের আশ্রয় ছাড়তে সাহস করল না। আজ অভিষেকে কোনোরকমের একটা সভাকবি চাই তো।

৩। চাই বৈকি। আজকের মতো রীতরক্ষা করে তার পরে সংক্ষেপে বিদায় করলেই হবে।

৪। জোগাড় করেছি একটি। মন্মদ তাকে নিয়ে আসছে। বিদেশী, যাচ্ছে ধুবতীর্থে, সঙ্গে নারী আছে।

৩। এর থেকেই ঠাওরালে সে কবি?

৪। দেখলেম, গাছতলায় বসে মেয়েটি গান গাচ্ছে আর সে বাজাচ্ছে একতারা। মুখ দেখেই সন্দেহ হল লোকটা আর কিছই না পারুক, গান বানাতে পারে। সিধে গিয়ে বললুম, তুমি কবি, চলো রাজার অভিষেকে। প্রথমটা কিছতেই মানতে রাজি নয়। ভাবলে তাকে পাগল বললুম, না বোকা বললুম। সঙ্গের মেয়েটি বলল, হাঁ, ইনি কবি বৈকি, নিশ্চয় কবি, অভিষেকে যেতে হবেই তো। অমনি মানুষটা জল হয়ে গেল—আর 'না' বলবার জো রইল না।

৩। 'না' বলবার মতো মেয়েটি নয় বোধ করি।

৪। একেবারেই না। দেখলেম দিব্য বশ মেনেছে। মেয়েটি যদি বলত, চলো, লড়াই করবে, তবে তখনই ছুটত লড়াই করতে, কবিতা লেখা তো সামান্য কথা।

২। শূনে বুদ্ধি, লোকটি কবি। মনে তো আছে, আমাদের ধরণীদাস। গৌরীতরাইয়ের নথনি বুনত শাল, ধরণী আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াত তার আঙিনার কোণে। আর সে দিত তার কুন্ডল ঝুলিয়ে ঝংকার, তারই চোটে ধরণী সাত খাতা জুড়ে ছড়া লিখেছে। খেতুলাল, তুই ধরেছিস ঠিক, লোকটা কবি।

৪। হোক, বা না হোক, চেহারায় মানাবে। ঐ-যে আসছে।

মন্মদ সঙ্গে নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। (নরেশের প্রতি) কবি নরোত্তম, এঁদের বণ্ডিত কোরো না। তোমাকে গান গাইতে বলতে সাহস পাই নে। কিন্তু আমি তো তোমারই শিষ্য, যথাসময়ে আমাকে অনুমতি কোরো, আমি গাইব।

নরেশ। তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত। ভালো, অনুমতি করছি, গাও তুমি।

বিপাশা। সে কি প্রভু, এখনই? এখনো তো সময় হয় নি।

নরেশ। এতদিনেও আমার কাছে এ শিক্ষা হল না যে, গানের অসময় নেই?

১। কবি অন্যায় বলেন নি। ঐ দেখো-না, লোক জড়ো হয়েছে। সময় হল।

বিপাশা।

গান

দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন-যে কেমন করে।

ওগো বন্ধু, ফুলের সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি,
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ 'পরে।
পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে।
উত্তরীরে হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।

ফাগুনবেলার বৃকের মাঝে
পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে,
প্রাণের কথা ভাষা হারায় চোখের জলে ঝরে।

১। হায় হায়, খাঁটি কবি বটে রে। ছেড়ে দেওয়া হবে না। দাদাশ্বশুরের আটচালায় এক কোণে জায়গা করে দেব।

২। কবি, রচনা তোমারই বটে তো? ভণিতা নেই কেন। আমাদের বংশীলাল খুব লম্বা করেই ভণিতা লাগায়।

নরেশ। ভণিতার সম্পর্ক রাখি নে। আমি জানি গান যে গায় গান তারই। গানটা আমার কি তোমার, এই অত্যন্ত বাজে প্রশ্ন যদি না ভুলিয়ে দিলে তা হলে সে গান গানই নয়।

৩। কিন্তু দেখো কবি, আমার কেমন মনে হচ্ছে এ গান আমি পূর্বে শুনিনি এই কাশ্মীরেই।
নরেশ। বড়ো খুশি হলুম এ কথা শুনলে। তুমি রসিক লোক। ভালো গান শুনলেই মনে হয় এ গান আগেই শুনিনি।

৩। মনে হচ্ছে আমাদের কবি শশাঙ্ক যেন ঐরকমের একটা—

নরেশ। কিছুই অসম্ভব নয়, কোনো কোনো কবি থাকেন, যাঁর রচনা ঠিক অন্য লোকের রচনার মতোই হয়।

৩। কবি, ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা মালা দিই।

নরেশ। মালা আমি নিই নে। আমার গান যাঁর কণ্ঠে, আমার মালাও তাঁরই কণ্ঠে পড়ে।

৪। সে তো ভালো কথা। উনি মালা পরার যোগ্য বটেন। হাঁ গা, তোমাদের ডালিতে তো মালা অনেক আছে, একখানা দাও-না ঠুকে পরিয়ে দিই।

প্রথমা। হাঁ, দিলাম বলে!

৪। ভালোমানুষের কি, দিলে দোষ কী।

দ্বিতীয়া। তোমরা দোষ দেখতে পাবে কেন। পথে ঘাটে মালা পরিয়ে বেড়ানো তোমাদের স্বভাব যে।

৩। মাসি, রাগ কর কেন।

দ্বিতীয়া। আর 'মাসি' 'মাসি' করতে হবে না।

৩। আচ্ছা, ছাড়লেম মাসি বলা, যা বললে খুশি হও তাই বলব। আপাতত একখানা মালা দাও-না, ঠুকে পরিয়ে দিই।

তৃতীয়া। তোমরা কি লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, রাজার অভিষেকের মালা দিতে হবে! এত সস্তা নয় গো।

১। ও কথা বোলো না দিদিশাশুড়ি, রাজা থাকলে স্বয়ং ঠুকে মালা দিতেন।

দ্বিতীয়া। ভারততলির লোক, তোমাদের ব্যাভারটা কী রকম গো। ওকে দিদিশাশুড়ি বল কোন্ সম্পর্কে। ও আমার বোনঝি।

১। মাসি বলতে সাহস হল না। ভাবলুম দাদাশ্বশুরের গ্রামে থাকে, ঐ সম্পর্কের নামটা বেমানান হবে না।

প্রথমা। ঐ-যে রাজা আসছেন শিবির থেকে। এখনো তো সময় হয় নি। এরা সব গান গেয়ে উৎপাত করে ঠুকে বের করে আনলে।

সকলে। জয়, মহারাজ কুমারসেনের জয়!

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমার। শীঘ্র আমার অশ্ব প্রস্তুত করো।

৩। কবি, ধরো ধরো, একটা গান ধরো শির্গাগির।

বিপাশা।

গান

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো,
ওই যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো।

বাজল তরু আকাশপথে,

সূর্য আসেন অগ্নিরথে,

এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খণ্ড ধরো।

ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।

অমর বীর সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।

দুর্গম পথ সগৌরবে

তোমার চরণচিহ্ন লবে,

চিন্তে অভয়বর্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো।

কুমারসেন। (বিপাশাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে) হঠাৎ এখানে এলে যে।

বিপাশা। ছুটি পেয়েছি যুবরাজ।

কুমারসেন। সুমিত্রা?

বিপাশা। সে বন্দিনীও ছুটি পেয়েছে।

কুমারসেন। মৃত্যু?

বিপাশা। না, নতুন প্রাণ।

কুমারসেন। অর্থ কী, বুঝিয়ে দাও।

বিপাশা। জালন্ধর ছেড়েছেন তিনি। গেছেন ধ্রুবতীরে, উপাসিকার দীক্ষা নেবেন।

কুমারসেন। তোমার কথাটাকে এখনো মনের মধ্যে ঠিক নিতে পারছি নে।

বিপাশা। যুবরাজ, সুমিত্রাকে তো চেন। সূর্যের তপস্যা সেই জ্যোতির্ময়ী ছাড়া কে গ্রহণ করতে পারে আজকের দিনে। আলোকের দূতী যারা, ভোগের ভান্ডারে তাদের বন্ধন রুদ্ধদেব সহ্য করতে পারেন না।

কুমারসেন। আর জালন্ধররাজ বুঝি শঙ্খল হাতে নিয়ে ছুটেছেন।

বিপাশা। মাটির বাঁধ দিয়ে নদীকে বেঁধে তার স্রোতকে রাজভান্ডারে জমা করবার জন্যে; তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করো আমার ঐ পথের সঙ্গীকে।

কুমারসেন। তোমার পথের সঙ্গী?

বিপাশা। হাঁ যুবরাজ, আমার পথের সঙ্গী। চুপ করে রইলে! এর থেকে বুঝিছ তুমি বুঝেছ। এর উপরে কথা চলে না।

কুমারসেন। এতদিনে বন্ধন গ্রহণ করলে, বিপাশা?

বিপাশা। বিপাশা সিন্ধুনদীতে মিলেছে, সে মনুধারার মিলন।

কুমারসেন। ঠুর নামটি বলো।

কুমারসেন। ঠুর নাম নরেশ। রাজা বিক্রমের বৈমাত্র ভাই। ডেকে আনিছি।

কুমারসেন। নমস্কার, রাজকুমার।

নরেশ। নমস্কার।

কুমারসেন। তোমার মতো অতিথিকে পেয়ে আমার আজকের দিন সার্থক।

নরেশ। আমি আমার মহারানীর অনুবর্তী—তীর্থযাত্রী আমি, পথের অতিথি। তোমার দ্বারে আজ যে-অতিথি অনাহৃত এসেছেন, তাঁর সংবাদ পেয়েছ? প্রস্তুত হয়েছে তো?

কুমারসেন। এই মাত্র সংবাদ পেয়েছি। আয়োজন নেই, কিন্তু আহ্বান করতে হবে। বিশেষ করে আমারই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কারণ কী ঘটেছে তা এখনো পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি।

নরেশ। কারণের প্রয়োজন হয় না। অন্ধ বিষয়ে অন্ধ ঈর্ষা বাইরে থেকে পথ খোঁজে না, স্বভাবের ভিতরেই তার আশ্রয়। তোমার মর্যাদা উনি সহ্য করতে পারেন না, তার অহৈতুক উত্তেজনা ঠুর দীনতার মধ্যে। এ যে বিধাতার অভিশাপ। তার উপরে উনি মনে-মনে সন্দেহ করেন মহারানী সন্মিষ্টা তোমার প্রশ্ন পেয়েছেন বা তোমার প্রশ্ন প্রার্থনা করতে এসেছেন।

কুমারসেন। এতদিনেও কি জানেন না সন্মিষ্টার পক্ষে তা অসম্ভব।

নরেশ। জানবার শক্তি যদি থাকত তা হলে হারাবার দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটত না।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

পুরুষোত্তম। মহারাজ, অভিষেকের কাজ এখনই আরম্ভ করা কর্তব্য। মনে হচ্ছে বিলম্ব বিঘ্ন হতে পারে। নানাপ্রকার জনশ্রুতি শোনা যাচ্ছে।

কুমারসেন। অভিষেকের কাজ সংক্ষিপ্ত করো। বিলম্ব সহ্য হবে না।

পুরুষোত্তম। চলো তবে মহারাজ, ঐ অশ্বখবেদিকায়। সকলে জয়ধ্বনি করো।

তুরী ডেরী শঙ্খধ্বনি

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাদিপতির জয়!

কুমারসেন। বাহিরে ঐ কিসের কোলাহল।

অনুচরদের প্রবেশ

অনুচর। খুড়োমহারাজ হঠাৎ উপস্থিত। প্রহরীরা বলছে প্রাণ থাকতে তাঁকে এখানে প্রবেশ করতে দেবে না। তারা লড়াই করে মরতে প্রস্তুত। আদেশ করো মহারাজ।

কুমারসেন। শান্ত করো প্রহরীদের। খুড়োমহারাজকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো।

[অনুচরদের প্রস্থান]

বিপাশা। আমরা তবে প্রচ্ছন্ন হই।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান]

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

একদল। কোথায় চলেছ চন্দ্রসেন। পাশাণ্ড, কপট। কোথায় যাও বিশ্বাসঘাতক। ওকে বন্দী করো।

কুমারসেন। থামো তোমরা। এ কেমন বুদ্ধি তোমাদের। উনি এসেছেন বিশ্বাস করে আমার কাছে।

চন্দ্রসেন। কিছু ভয় নেই, বৎস, শূদ্ধ বিশ্বাসের উপর ভর করে আসি নি। ওদের যদি অপঘাতমত্বের ইচ্ছা থাকে নিরাশ করব না।

কুমারসেন। প্রণাম পিতৃব্যদেব। আমার অভিষেকমুহূর্ত তোমার সমাগমে সার্থক হল। আমাকে আশীর্বাদ করো।

চন্দ্রসেন। সে পরে হবে। সময় একটুও নেই। কেন এসেছি শোনো। সহসা জালন্ধররাজ সসৈন্যে কাশ্মীরে উপস্থিত।

কুমারসেন। শুনোছি সে সংবাদ। অভিষেকের কাজ সত্ত্বর সমাধা করব।

চন্দ্রসেন। থাক্ এখন অভিষেক। অবিলম্বে চলো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

কুমারসেন। আত্মসমর্পণ! যুদ্ধ নয়?

চন্দ্রসেন। সৈন্য কোথায় তোমার।

কুমারসেন। কেন। রাজধানীতে সৈন্যের অভাব নেই।

চন্দ্রসেন। সে তো এখনো তোমার নয়।

কুমারসেন। কিন্তু কাশ্মীরের তো বটে!

চন্দ্রসেন। বিক্রম তো কাশ্মীর চান না, তোমাকেই চান।

কুমারসেন। আমার মান-অপমান কী কাশ্মীরের নয়।

চন্দ্রসেন। কী বল তুমি! এ তো সামান্য আত্মীয়কলহ। দাও তাঁর কাছে ধরা, চাও তাঁর স্নেহ ও ক্ষমা, হাসিমুখে সমস্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কুমারসেন। খুড়োমহারাজ, তর্ক করবার সময় নেই, শেষবার জিজ্ঞাসা করি—রাজধানী থেকে সৈন্য পাব না?

চন্দ্রসেন। রাজধানী! বিদ্রূপ করছ? শুনোছি ঐ আখরোটবনেই কাশ্মীরের রাজধানী। তোমার আদেশ এইখান থেকেই ঘোষণা করো। আমাকে তো কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান

সকলে। ধিক্ ধিক্। নিপাত যাও। কোটি জন্ম তোমার নরকবাস হোক। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীর্ণ করে তার ধূলির মধ্যে তোমার বিলুপ্ত ঘটুক।

কুমারসেন। স্তম্ভ হও। শোনো। জালন্ধর কাশ্মীর আক্রমণে এসেছেন, আমাকে একলা লড়তে হবে।

সকলে। মহারাজ, ন্যায় তোমার পক্ষে, ধর্ম তোমার পক্ষে, সমস্ত কাশ্মীরের হৃদয় তোমার পক্ষে। জয় মহারাজা কুমারসেনের জয়! ধিক্ ধিক্ চন্দ্রসেনকে শত শত শত ধিক্।

কুমারসেন। চূপ করো, বৃথা উত্তেজনায় বলক্ষয় করো না। এখনই যাও সৈন্য সংগ্রহ করো গে।

সকলে। আর অভিষেক?

কুমারসেন। নাইবা হল অভিষেক।

সকলে। সে হবে না মহারাজ, সে হবে না। চন্দ্রসেনের চক্রান্ত শেষে সফল হবে! এ কিছুতেই পারব না সহিতে। আমরা আছি, সৈন্যসংগ্রহের আয়োজনে এখনই চললুম। কিন্তু উৎসব চলুক, অনুষ্ঠান শেষ হোক।

কুমারসেন। ভয় নেই, মন্দিরে দেবসাক্ষী করে তীর্থোদকে একমুহূর্তে আমার অভিষেক হয়ে যাবে। যদি ফিরে আসি উৎসব সম্পূর্ণ করব। কিন্তু তোমরা যাও। আর বিলম্ব নয়।

সকলে। জয় মহারাজ কুমারসেনের। ধিক্ চন্দ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ধিক্।

[সকলের প্রস্থান

আর-এক দলের প্রবেশ

১। মহারাজ, আর সময় নেই। পালাতে হবে।

কুমারসেন। কেন।

১। জালন্ধরের সৈন্য অন্ধমুনির মাঠ পর্যন্ত এসেছে, পালানো ছাড়া এখন আর উপায় নেই। চলো, শত্রুপ্রস্থের বনে আমি পথ জানি।

[উভয়ের প্রস্থান

২। এইমাত্র-যে খুড়োমহারাজ এসেছিলেন।

১। চাতুরী, চাতুরী। শত্রুপক্ষকে তিনি নিজে সন্ধান বাতলিয়েছেন।

২। গ্রামে গ্রামে লোক গেছে সৈন্য জোগাড় করতে, কিন্তু সময় তো পাওয়া গেল না। এরা যুদ্ধ করতেও দিলে না রে।

৩। এ-যে বেড়া আগুন, কিছুই করতে পারব না, মরব শুধু। অসহ্য!

১। জালন্ধরের পাঁপিষ্ঠরা একেই বলে যুদ্ধ করা! এ তো মানুষ খুন করা!

আর-এক দল

১। নাগপত্তন জ্বালিয়ে দিয়েছে রে, জ্বালিয়ে দিয়েছে।

২। বলিস কী।

৩। হাঁ, সেখানকার মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে গলা ভেঙেছে—জয় মহারাজ কুমার-সেনের জয়।

২। এর পিছনে আছে খড়ো রাজা। নাগপত্তন ওকে কিছুতেই মানে নি কিনা, এবার তারই শোধ নিলে বিদেশীকে দিয়ে।

৩। তা হলে অনেক পত্তনেরই লীলা সাঙ্গ হবে।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। শোনো শোনো, তোমাদের মধ্যে কুন্তীপুরের মানুষ কেউ আছে?

১। কেন বলো তো।

দেবদত্ত। চন্দ্রসেনের সঙ্গে বিক্রম মহারাজের পরামর্শ হয়েছে, সেখানে সৈন্য পাঠাবেন উৎপাত করবার জন্যে।

২। আপনি কে হন মহাশয়। বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে।

দেবদত্ত। হাঁ বিদেশী।

৩। জালন্ধরের মানুষ?

দেবদত্ত। ঠিক ঠাউরেছ।

১। তোমার এতটা ধর্মবুদ্ধি হল কেমন করে।

দেবদত্ত। বিধাতার আশ্চর্য মহিমায় কদাচিৎ এমনতরো ঘটে। তোমাদের কাশ্মীরে চন্দ্রসেন যে বংশে জন্মেছেন সে বংশেও ভদ্রমানুষ জন্মায় দেখিছি।

২। বেশ বলেছেন ঠাকুর, বেশ বলেছেন। ব্রাহ্মণ তো?

দেবদত্ত। হাঁ, ব্রাহ্মণ।

সকলে। প্রণাম হই।

২। নিজের রাজার বিরুদ্ধে আপনি—

দেবদত্ত। রাজার বিরুদ্ধে বল একে কোন্ বুদ্ধিতে। আমার রাজার পাপ যতটা নিবারণ করব আমার রাজভক্তি ততটাই সার্থক হবে।

৩। কিন্তু বিপদ আছে তো ঠাকুর, রাজা যদি—

দেবদত্ত। রাজার হয়ে আজ যারা অন্যায় করছে, বিপদের আশঙ্কা আমার চেয়ে তাদের তো কম নয়। অধর্ম যদি সাহস দিতে পারে, ধর্ম কি ভীরু হবে।

২। খুব বড়ো কথা বললে ঠাকুর। দাও, আর একবার পায়ের ধুলো দাও।

দেবদত্ত। যুবরাজ কুমারসেন এখান থেকে পালাতে পেরেছেন?

১। ঠাকুর, মাপ করো, ঐটে পারব না, যুবরাজের কথা তোমার সঙ্গেও চলবে না।

দেবদত্ত। কিছু বলতে হবে না, আমি জানতে চাই, তিনি নিরাপদ তো?

১। আপদ-বিপদের কথা কে বলতে পারে। তবে কিনা আমাদের চেষ্টার হ্রদটি হবে না।

৩। দেখো দেখো, ঐ পশ্চিম পাহাড়ে। বোধ হচ্ছে অচলেশ্বরের কাছে ওরা আগুন লাগিয়েছে। বনটা সন্ধ জ্বলে উঠেছে। অকারণ সর্বনাশ করতে এল কেন এরা! খিদে পেলে বাঘে খায়, ভয়

পেলে সাপে তাড়া করে আসে, এদের এ যে নিষ্কাম পাপ, অহৈতুকী হিংসা। এরা কোন্ জাতের মানুষ, ঠাকুর।

দেবদত্ত। দৈত্য, দৈত্য। দেবতার 'পরে এদের বিশুদ্ধ বিদ্বেষ। ওরে উন্মত্ত দূর্বৃত্ত অন্ধ, তোমার মহাপাতক তোমাকে মহাপতনে নিয়ে চলল, আজ কে তোমাকে বাঁচাতে পারে। ধিক্ তোমার বন্ধুদের।

[প্রস্থান

বিক্রম ও চরের প্রবেশ

বিক্রম। কী বললে। সন্ধান পাওয়া গেল না?

চর। না মহারাজ।

বিক্রম। তবে যে চন্দ্রসেন বললেন, এইখানেই তাঁর অভিষেক হ'চ্ছিল। সে তো বৈশিষ্ট্যের কথা নয়।

চর। এইমাত্র দেখলুম তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে আনছে। তিনি প্রবেশ করেছেন শম্ভুপ্রস্থের বনে। সেখানে গৃহহার পথে অদৃশ্য হতে মূহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হয় না।

বিক্রম। যারা পথ জানে তাদের ধরে আনো।

চর। মহারাজ, মরে গেলেও তারা বলবে না। ওখানে সন্ধান করতে যাবে এমন সাহসও কারো নেই। ও যে ভূতে পাওয়া অরণ্য।

বিক্রম। ডেকে আনো চন্দ্রসেনকে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

কোথায় কুমারসেন।

চন্দ্রসেন। প্রজারা মিলে কোথায় তাঁকে গোপন করেছে, খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। আগুন লাগাও চারি দিকে, আপনি বেরিয়ে আসবেন।

চন্দ্রসেন। কোথায় আছেন না জেনে আগুন লাগানো হিংসার ছেলেমানুষি।

বিক্রম। সন্ধান তুমি জান, গোপন করছ।

চন্দ্রসেন। পাপে তো প্রবৃত্ত হয়েছি, তার উপরে মৃত্যুতা যোগ করব, এতবড়ো অর্বাচীন আমি নই। গোপন করে তোমার কাছে নিজের বিপদ কেন ঘটাব।

বিক্রম। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে।

চন্দ্রসেন। সমস্ত কাশ্মীরের লোক আমাকে অভিসম্পাত করেছে, অবশেষে তোমারও মুখে এমন কথা শুনব এ আমি আশা করি নি।

বিক্রম। তুমি অল্প আগেই এখানে কুমারের কাছে এসেছিলে এ কথা সত্য কি না।

চন্দ্রসেন। তাঁকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিতে এসেছিলুম।

বিক্রম। সেই ছলেই তাকে জানিয়েছ আমি এসেছি। আমার পক্ষ অবলম্বনের ভান করে তাকে সতর্ক করে দিয়েছ।

চন্দ্রসেন। ভুল করে আমাকে অবিশ্বাস করো না, মহারাজ।

বিক্রম। সেও ভালো, কিন্তু বিশ্বাস করে ভুল করবার সময় নেই। সেনাপতিকে আদেশ করে দিচ্ছি, তুমি দৃষ্টিবন্দী হয়ে থাকবে, শেষ পর্যন্ত কুমারকে সন্মিত্রাকে যদি না পাই তবে পশুর মতো পিঞ্জরে পুরে তোমাকে জালন্ধরে নিয়ে যাব, প্রাণদণ্ড দেওয়াও তোমার পক্ষে সম্মান।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

চর। মহিষীর সংবাদ পাওয়া গেছে।

বিক্রম। বলো বলো, কোথায় তিনি।

চর। তিনি গেছেন মাতৃদেবের মন্দিরে, ধুবতীথে।

বিক্রম। চলো, এখনই চলো সেখানে। এই মূহুর্তে।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, কাশ্মীরের দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ কোরো না। দেবালয়ে গিয়ে মাতৃদেবের উপাসিকাকে হরণ করা সহিবে না।

বিক্রম। তোমাদের মাতৃদেবই তো আমার মহিষীকে হরণ করেছেন। দেবতার চৌর্য আমি স্বীকার করব না।

চন্দ্রসেন। এ কী বলছ। ভয় নেই তোমার?

বিক্রম। না, ভয় নেই।

চন্দ্রসেন। তা হলে আমার প্রাণদণ্ড করো। এ পাপের দায়িত্ব আমি বহন করতে পারব না।

বিক্রম। প্রাণদণ্ড সব শেষে। যতক্ষণ তোমার কাছ থেকে কাজ উদ্ধারের আশা আছে, ততক্ষণ নয়। সেনাপতি—

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। কী মহারাজ।

বিক্রম। চলো মাতৃদেবের মন্দিরের পথে।

সেনাপতি। ঐ মন্দিরের দুর্গম পথে সৈন্য নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। মন্দিরের দুর্গমতা লৌকিক হোক অলৌকিক হোক, ভৌতিক হোক দৈবিক হোক, কিছূতে মানব না। সন্মিগ্রার পক্ষে কাশ্মীরের আশ্রয় চূর্ণ চূর্ণ করব এই শপথ আমি নিয়েছি।

চন্দ্রসেন। দেবমন্দির ইহলোকের সীমায় নয় মহারাজ, সে তো পার্থিব কাশ্মীরের বাহিরে।

বিক্রম। সে কথা দেবতা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু সন্মিগ্রা সম্বন্ধে নয়; তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততক্ষণ আমার কাছে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাঁর কাছে আমারও নেই নিষ্কৃতি।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি তোমার পায়ের কাছে মাথা রাখছি, লও আমার মৃণ্ডচ্ছেদন করে, কাশ্মীরের দেবতার অপমান কোরো না।

বিক্রম। তোমার মৃণ্ডের কী মূল্য আছে যে, তার পরিবর্তে আমার অপমান লাঘব হবে। আমাকে ছলনা করে তুমি পরিত্রাণ পাবে না। সেনাপতি, উদয়পুর অবরোধ করো। এইখানেই কুমার নিশ্চয় লুকিয়ে আছেন চন্দ্রসেন সে কথা গোপন করছেন। তার পরে চলব তীর্থের পথে। কন্দর্পদেবের পরিচয় পূর্বেই পেয়েছি, এবার নেব মাতৃদেবের পরিচয়। যে উৎসব জালন্ধরের দেবমন্দিরে আরম্ভ করেছিলুম, কাশ্মীরের দেবমন্দিরে সেই উৎসবের সমাপ্তি হবে।

৪

ধ্রুবতীর্থ। মাতর্গন্ডমন্দির

বিপাশা, পুরোহিত, মন্দিরের সেবকগণ

সূর্যোদয়কালে বেদমন্ত্রে স্তব

উদ্ ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ

দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্।

অপ তো তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যন্তুভিঃ

সূরায় বিশ্বচক্ষসে।

পন্ডের অর্ঘ্য হাতে সন্মিহার প্রবেশ

বিপাশা।

গান

জাগো জাগো

আলসশয়নবিলগ্ন।

জাগো জাগো

তামসগহননিমগ্ন।

ধৌত করুক করুণারুণ বৃষ্টি

সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি;

জাগো জাগো

দুঃখভারনত উদ্যমভগ্ন।

জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত

ধনপ্রলোভননাশন বিস্ত,

জাগো জাগো

পুণ্যবসন পরো লজ্জিত নগ্ন।

পুরোহিত ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব। মা।

সন্মিহা। কী বৎস ভার্গব।

ভার্গব। কিছুদিন থেকে এই দুর্গম তীর্থের পথে নানাবিধ লোকের যাতায়াত লক্ষ্য করছি।
তারা পুণ্যকামী নয়।

সন্মিহা। তাতে দোষ নেই, ভয়ও নেই।

ভার্গব। বোধ হয় যেন তারা বিদেশী।

সন্মিহা। ভগবান সূর্যের উদয়দিগন্ত দেশে দেশে। তাঁর দেশে বিদেশী কে আছে।

ভার্গব। অপরাধ নিয়ে না দেবি, আমরা কিন্তু কিছুদিন থেকে এখানে বিদেশীদের পথরোধ
করেছি।

সন্মিহা। তা হলে আমারও এখানে পথ রুদ্ধ হল।

ভার্গব। ক্ষমা করো, দেবি। তোমাকে বিপদ হতে রক্ষা করব আমরা, এমন চিন্তা করা
আমাদের স্পর্ধা, এ আমাদের মোহ। দুর্বল বুদ্ধির অপরাধ নিয়ে না, যাত্রীদের কোনো বাধা
ঘটবে না।

শিখরিণীর প্রবেশ

শিখরিণী। মা তপতী।

সুমিত্রা। কী শিখরিণী, তুমি যে এখানে?

শিখরিণী। আমার স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেছে।

সুমিত্রা। সে কী কথা। তিনি যে সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁকে মারলে কেন।

শিখরিণী। যুবরাজ কোথায়, সেই সংবাদ তাঁর কাছ থেকে ওরা বের করতে চেষ্টা করেছিল। দেশে সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলে জানত বলেই তাঁর এই বিপদ ঘটল। দেবি, আমি কিছতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি নে, আমাকে বৃষ্টিয়ে বলো, সংসারে যাঁরা ধর্মকে প্রাণপণে মানেন, ধর্ম কেন তাঁদেরই এত দুঃখ দিয়ে মারেন।

সুমিত্রা। যাঁরা মরতে পেরেছেন তাঁরাই এ কথার তত্ত্ব জানেন। মৃত্যু দিয়ে যাঁরা সত্যকে পান তাঁদের জন্য শোক কোরো না।

শিখরিণী। শোক করব না মা, তিনি আমার মৃত্যুর ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে গেছেন, আমাকে এই তাঁর শেষ দান। গ্রামের লোকেরা আমাকে বলেছে অভাগিনী; কী বুদ্ধবে তারা! তিনি আমার স্বামী ছিলেন এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সুমিত্রা। যারা তাঁকে মেরেছে, মৃত্যুর দ্বারা তাদের তিনি জয় করেছেন, সে কথা তারা কোনোদিন বুদ্ধবে না এইটেই সকলের চেয়ে শোকের কথা। কিন্তু বৎসে, তুমি এখানে এসেছ কেন।

শিখরিণী। এখানে তোমার চরণতলে যদি আশ্রয় নিতে পারতুম তা হলে বেঁচে যেতুম। কিন্তু মা, সংসারের আলো নিবলে তবুও সংসার থাকে। আমার মেয়েটি আছে—অমন পিতার কোল হারিয়েছে, তার কল্যাণের জন্যেই সেই অন্ধকারায় আমাকে থাকতে হবে। তারই জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

সুমিত্রা। বলো, আমাকে কী করতে হবে।

শিখরিণী। এই অলংকারগুলি এনেছি দেবমন্দিরে রক্ষা করবার জন্যে। আমার মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, আমার কন্যার জন্যে রাখব। যে পরিবারের 'পরে চন্দ্রসেনের বিদ্রোহ, জালন্ধরের সৈন্য দিয়ে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠ করাচ্ছেন। এই লও মা, তোমার স্পর্শ লাভ করুক—আমার মেয়ের দেহ পবিত্র হবে।

কুঞ্জলালের প্রবেশ

কুঞ্জলাল। আজ বাহিরের কোথাও আমাদের দুঃখের পরিগ্রাণ নেই দেবি, কিন্তু মনে হয় যেন অন্তরে অন্তরে তুমি সেই দুঃখকে নাশ করতে পার, তাই এসেছি।

সুমিত্রা। বলো বৎস, তোমার কী বলবার আছে।

কুঞ্জলাল। যে নগরীতে তোমার মাতামহীর জন্মভূমি সেই উদয়পুর এতদিন চন্দ্রসেনকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি যখনই সৈন্য নিয়ে উৎপাত করতে এসেছেন প্রজারা সমস্ত পুরী উজাড় করে চলে গেছে। এবার সেইখানেই যুবরাজের রাজধানী স্থাপন করে তাঁর অভিষেকের আয়োজন হয়েছিল, বাধা পড়ল। রাজা বিক্রমের সৈন্য উদয়পুর বেষ্টিত করেছে। প্রজাদের বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ।

ভার্গব। কুঞ্জলাল, এ কী বৃষ্টি তোর। কত বড়ো দুঃখ গুঁকে দিলি দেখ তো। কেন এ-সব সংবাদ এই শান্তিতীর্থে।

কুঞ্জলাল। মা, কেন এমন স্তব্ধ হয়ে আকাশে তাকিয়ে রইলে। চিন্তার কথা কিছই নেই, মৃত্যুর পথ খোলা আছে, কোনো অপমান সেখানে পৌঁছয় না। দাও স্বহস্তে আজকে পূজার নির্মালা, নিয়ে যাই তাদের কাছে, আর দাও তোমার হাতের লিখন একখানি, একটি আশীর্বাদ—তাদের সব দুঃখ শূন্য হয়ে যাবে।

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, আমার কী মনে হচ্ছে বলব?

বিপাশা। বলো তো।

নরেশ। এইখানে এসে আমাদের প্রেম পরিপূর্ণ হয়েছে। আশ্চর্যের কথা শুনবে?

বিপাশা। কী, বলো।

নরেশ। আজ মন তোমার গান শোনবারও অপেক্ষা করে না—সকল ধ্বনি এখানে আলোক হয়ে উঠেছে, প্রত্যক্ষ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। তুমি কি তাই অনুভব কর না।

বিপাশা। প্রিয়তম, তোমার আনন্দে আজ আমি আনন্দিত, তার চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি নে।

নরেশ। আজ আলোকের মধ্যে তোমাকে দেখলুম আলোকরূপে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও। আর কোনো ক্ষোভ নেই আমার।

সুদমিত্রার প্রবেশ

সুদমিত্রা। কুমার এসেছেন, শীঘ্র তাঁকে ডেকে আনো, বিপাশা।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান]

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমারসেন। রাজত্বের পথ অতিক্রম করে এই তীর্থেই শেষে আসতে হল, বোন।

সুদমিত্রা। অন্যত্র তোমাকে অনেক প্রয়োজন আছে। শেষ যদি না হয়ে থাকে, এখানে এলে কেন।

কুমারসেন। তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে।

সুদমিত্রা। কার হাত থেকে।

কুমারসেন। বিক্রম মহারাজ জ্বালামুখী দেবীর শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে করে হোক এখান থেকে তোমাকে সরাবেন। তীর্থের পথে সৈন্যবাহিনী আসা অসম্ভব তাই একে একে ক্রমে ক্রমে তাঁর লোক নিয়ে চারি দিক পূর্ণ করে তুলছেন।

সুদমিত্রা। আমাকে তিনি চান?

কুমারসেন। হাঁ।

সুদমিত্রা। আর কী চান।

কুমারসেন। আর তিনি চান আমাকে।

সুদমিত্রা। কেন, তোমার সঙ্গে তাঁর কিসের বিরোধ।

কুমারসেন। আমার সঙ্গে বিরোধের স্পষ্ট কারণ যদি থাকত তা হলে সে কারণ দূর করলেই বিপদ কাটত। কারণ তাঁর অন্ধপ্রকৃতির মধ্যে, সেইজন্যে এত দুর্নিবার, এত ভয়ংকর।

সুদমিত্রা। আমি যদি যাই তিনি কি তোমাকে মুক্তি দেবেন।

কুমারসেন। কিন্তু তুমি কী করে যাবে তাঁর কাছে? তুমি যে দেবতার। রাজ্যের কথা আর আমি ভাবি নে কিন্তু কাশ্মীরের দেবতার অপমান ঘটতে দিতে পারব না।

সুদমিত্রা। কী করবে তুমি।

কুমারসেন। কিছু না পারি তো মরব। পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছু না করাই তো পাপ।

নেপথ্যে। মহারানী!

সুদমিত্রা। এ কী, এ যে দেবদত্ত ঠাকুর!

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। কয়েকদিন থেকে দর্শনের চেষ্টা করেছিলাম, আমার চেহারা দেখে তোমার অনুচরদের মনে সংশয় ঘোচে না। অশোকবনে হনুমানকে দেখে রাক্ষসরা ষেরকম সন্দিগ্ধ হয়েছিল এদের সেই দশা। আজ এইমাত্র হঠাৎ কেন এরা প্রসন্ন হল জানি নে। ছাড়া পেয়েই দেখা করতে এসেছি। একটা নিবেদন আছে—শুনতেই হবে আমার কথা।

সুমিত্রা। বলো।

দেবদত্ত। আর সহ্য হয় না মহারানী। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে অগ্নিকাণ্ড দুর্ভিক্ষ রক্তপাত নারীনির্ধাতন। পাপের নেশা জালন্ধরের সমস্ত সৈন্যকেই পেয়েছে—থামতে পারছে না, মাথা কেবলই বেড়ে চলেছে। আমি মহারাজকে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, অহরহ যমরাজের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যান। রাজা আমাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, প্রহরী দয়া করে ছেড়ে দিলে। আজ মহারাজকে কেউ নিষেধ করতে পারবে না একমাত্র তুমি ছাড়া।

কুমারসেন। ঠাকুর, এমন কথা কী করে বলছ, সুমিত্রা যাবেন তাঁর কাছে? এ মন্দির থেকে ওঁর তো ফেরবার পথ নেই। এতে স্বর্গে মর্ত্যে ধিক্কার উঠবে যে।

দেবদত্ত। আমি জানি বড়োই কঠিন ব্যাপার, এও জানি রাজা এখন প্রকৃতিস্থ নন। তবু বলছি দেবী সুমিত্রা, আজ তুমি সকল মান-অপমান সুখ-দুঃখের অতীত—তুমি পবিত্র, পাপ তোমার কাছে কুণ্ঠিত হবে, তুমি এই বীভৎসের মধ্যে নির্বিকার চিত্তে নামতে পার।

কুমারসেন। সুমিত্রার কী ঘটতে পারে না-পারে সে কথা ভাববার সময় আজ নেই—কিন্তু সুমিত্রা কাশ্মীরের দেবতাকে অপমান করে এখান থেকে চলে যাবে সে আমি ঘটতে দেব না। দেবতার ধন হরণ করে তাকে মানুষ্যের ভোগের ভাণ্ডারে নিয়ে যাবে আমাদের বংশের কন্যা!

সুমিত্রা। ভাই কুমার, তাঁকে এইখানে আহ্বান করে আনব।

কুমারসেন। এইখানে? এই দেবালয়ে?

সুমিত্রা। আসুন এখানেই, নইলে তাঁর মর্দুত্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে—তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাব।

দেবদত্ত। এ কিন্তু বড়ো সংকটের কথা, মহারানী। অনেক পাপ সে করেছে, অবশেষে দুর্বৃত্ত যদি দেবালয়ে এসে দেবতার অসম্মান করে, পুণ্যতীর্থে যদি কলুষ আনে?

সুমিত্রা। ভয় নেই, ঠাকুর, কোনো ভয় নেই। আমার প্রভু, আমার হিরণ্যদ্যুতি, সকল পাপ দণ্ড করবেন, নিঃশেষে ভস্ম করবেন। সেই রুদ্ধ আমাকে গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে আমাকে ছিন্ন করে নিতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। কুমার, তোমার সঙ্গে শংকর আছে?

কুমারসেন। ঐ যে সে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে।

সুমিত্রা। শংকর!

শংকর। কী দিদি। কী দেবি। এই যে আমি এসেছি। যেদিন ওরা তোমাকে কেড়ে নিয়ে গেল সেদিন মরার বেশি দুঃখ পেয়েছি; শেষকালে কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরের দেবতা স্বয়ং উদ্ধার করে আনলেন এই দেখে আমার জন্ম সার্থক হল।

সুমিত্রা। তুমি আমার দূত হয়ে যাও মহারাজ বিক্রমের কাছে।

শংকর। এখনই যাব। বলো কী জানাতে হবে।

নরেশ। দেবি, শংকরকে নয়, আমাকে পাঠিয়ে দাও, রাজা যদি অপমান করে বৃদ্ধ সইতে পারবে না।

সুমিত্রা। না রাজকুমার, এই আমার শেষ আমন্ত্রণ—আমার চিরবন্ধু ছাড়া কার হাত দিয়ে পাঠাব। শংকর, শিশুকালে তোমার কোলে একদিন আমাকে গ্রহণ করেছ। মৃত্যুর সময় পিতা তাঁর শেষ অভিষাদন দিয়েছিলেন তোমাকেই। আজ সেই তোমার সুমিত্রার বাণী নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে, হয়তো অপমানের মুখে। শান্ত হয়ে সহিষ্ণু হয়ে বোলো মহারাজকে, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের চরম পরিণামের জন্যে মন্দিরে দেবতার চরণপ্রান্তে সুমিত্রা অপেক্ষা করবে। আর তোমার পরম স্নেহের ধন কুমার, ঐ কুমারের জন্য ভেবো না; তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। সেই বন্ধু, সেই বিশ্ববিচারক ধর্মরাজ রইলেন তাঁর সহায়।

শংকর। দিদি, বৃদ্ধের একটি কথা শোনো, জানি কুমারের সৈন্যসামন্ত নেই, জানি চন্দ্রসেন

গুঁর বিরুদ্ধে, তবু যে-কয়জন আমরা আছি গুঁর সহচর, তাদের নিয়ে গুঁকে যুদ্ধক্ষেত্রেই যেতে হবে। সেখানে তাঁর জন্মভূমি তাঁকে পুণ্যক্রোড়ে গ্রহণ করবেন।

দেবদত্ত। দেশের দুঃখ তাতে আরো আলোড়িত হয়ে উঠবে, শংকর। উন্মত্তের মত্ততাগ্নিতে আর ইন্ধন দিয়ো না।

কুমারসেন। শংকর, যাও তুমি, মহারাজকে ডেকে নিয়ে এসো গে। অতিথি তিনি, অতিথির মতো তাঁকে সংকৃত করব।

শংকর। হে রুদ্র, হে হিরণ্যপাণি, আজ তোমার জ্যোতিতে আবরণ কেন। তোমার সেবকদের লজ্জা নিবারণ করো। দীপ্যমান তেজে এসো বাহির হয়ে—তোমার অগ্নিকেতু উদ্ঘাটিত করে দাও। নমস্কার তোমাকে, নমস্কার তোমাকে, বারবার তোমাকে নমস্কার।

ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব। মহারাজ বিক্রম অনতিদূরে, এই শূনি জনশ্রুতি। আদেশ করো, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিই।

সুমিত্রা। খুলে দাও, খুলে দাও, সমস্ত দ্বার খুলে দাও, আসবার দ্বার এবং যাবার দ্বার। যাও যাও ভার্গব, তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনো।

ভার্গব। তাঁর প্রতিজ্ঞা, দেবতার কাছ থেকে তিনি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবেন। আমি এ মন্দিরের পুরোহিত, আমার কর্তব্য করতে হবে তো।

সুমিত্রা। তোমার কর্তব্যই করো। দেবতার পথ রোধ কোরো না—যে পথ দিয়ে রাজার সৈন্য আসবে সেই পথ দিয়েই আমার দেবতা আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। যাও তুমি এখনই, মন্দিরের সিংহদ্বার খুলে দাও।

[ভার্গবের প্রস্থান]

দেবদত্ত। তা হলে শংকর তুমি থাকো, মহারানীর দূত হয়ে আমিই তাঁকে আহ্বান করে আনি।

[প্রস্থান]

শংকর। দিদি, রাজগৃহ থেকে সেবার তোমাকে ওরা কেড়ে নিয়ে গেল, এবার কি দেবালয় থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে দেবে। এও কি আমরা চুপ করে সহ্য করব।

সুমিত্রা। ভয় নেই শংকর। আজ আমাকে নেবার সাধ্য কার আছে।

শংকর। তবে বলো, তোমার কী সংকল্প।

সুমিত্রা। রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেকদিনের সংকল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরমতেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব।

শংকর। আমার মোহ দূর হোক সুমিত্রা, মোহ দূর হোক। তোমাকে যেন নিবৃত্ত না করি।

[শংকরের প্রস্থান]

সুমিত্রা। বিপাশা!

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। বলো দেবি।

সুমিত্রা। আমার অগ্নিশয্যা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, তুমি দেখেছ বহুদুঃখের সেই আয়োজন। আজ সময় হয়েছে, আনন্দ করো, জ্বলুক শিখা, বিলম্ব কোরো না।

বিপাশা। যে আদেশ দেবি।

[পায়ের কাছে মাথা রেখে পড়ে রইল]

সুমিত্রা। ওঠ্ বিপাশা, এবার আমার শেষ পূজা করি। অর্ঘ্য প্রস্তুত আছে?

বিপাশা। আছে, দেবি।

পশ্চিমের অর্ঘ্য হাতে সন্মিত্রা

বিপাশা ।

গান

শুভ্র নবশঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণ-গীত ।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত ।

গ্রহণ করো তারে
তিমির পরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত ।

সন্মিত্রা ।

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নিরংহসঃ পিপ্তা নিরবদ্যাৎ ।
পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিদেয়াঃ শান্তিঃ ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

শেষ দৃশ্য

নেপথ্য থেকে চিতাঙ্গির আভাস আসছে
সকলের বেদমন্ত্রসহ বেদী প্রদক্ষিণ
বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ।
ঔ কৃতো স্মর কৃতং স্মর ।
কৃতো স্মর কৃতং স্মর ।
অগ্নে নয় সুপথ্য রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।
যদুযোধ্যস্মজ্জদুহুৱাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ।

নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম । বিক্রম, দেবদত্ত, শংকরের প্রবেশ

পরিশিষ্ট

মন্ত্রের অনুবাদ

১। কপর্দর ইব দগ্ধাহপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমস্তুবার্যবীৰ্যায় তস্মৈ মকরকেতবে।

—সুভাষিতরঙ্গভাঙ্গাগার

কপর্দরের মতো, দগ্ধ হইলেও যাঁর শক্তি প্রত্যেক বাস্তিতে অনুভূত, যাঁহার প্রভাবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই মকরকেতুকে নমস্কার।

২। উদ্য ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দশে বিশ্বায় সূর্যম্।

—ঋগ্বেদ ১. ৫০. ১

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যন্তিভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে।

—ঋগ্বেদ ১. ৫০. ২

বিশ্ব দেখিতে পাইবে এই উদ্দেশ্যে রশ্মিসমূহ সমস্ত ভূতের জ্ঞাতা উজ্জ্বল সূর্যকে উর্ধ্ব বহন করিতেছে।

বিশ্বদ্রষ্টা সূর্যকে আসিতে দেখিয়া সেই নক্ষত্রগুলি রাত্রির সহিত চোরের মতো পলায়ন করিতেছে।

৩। বায়ূরনিলমমৃতমথৈদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ঔ কৃতো স্মর কৃতং স্মর।

কৃতো স্মর কৃতং স্মর।

অগ্নে নয় সূপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যদুধোধ্যস্মজ্জদুহুৱাগমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।

—ঈশোপনিষৎ ১৮

মহাবায়ুতে আমার প্রাণবায়ু এবং এই শরীর ভস্মে মিলিত হোক।

ঔ, আপন কর্তব্য স্মরণ করো, আপন কৃতকার্য স্মরণ করো।

হে অগ্নি, আমাদিগকে সূপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি আমাদের সকল কার্য জান, তুমি আমাদের সমস্ত কুটিল পাপকে বিনাশ করো। তোমাকে আমরা বারংবার নমস্কার করি।

৪। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নিরংহসঃ পিপতা নিরবদ্যাৎ।

—ঋগ্বেদ ১. ১১৫. ৬

অদ্য সূর্যের উদিত উজ্জ্বল কিরণসমূহ পাপ হইতে, নিন্দনীয় কর্ম হইতে, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৫। পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দেয়ো শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—অথর্ববেদ ১৯. ৯. ১৪

পৃথিবীলোক শান্তি আনয়ন করুক। অন্তরীক্ষলোক শান্তি আনয়ন করুক। দ্যুলোক শান্তি আনয়ন করুক।

পরিশিষ্ট ২

ভগ্নহৃদয়

প্রকাশ : ১৮৮১

ভগ্নহৃদয়

ভূমিকা

এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুদলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।

কাব্যের পাত্রগণ

কবি

অনিল

মুরলা

ললিতা

নলিনী

অনিলের ভগ্নী ও কবির বাল্যসহচরী

অনিলের প্রণয়িনী

এক চপলস্বভাবা কুমারী

চপলা

মুরলার সখী

লীলা

সুর্দাচি

মাধবী প্রভৃতি

} নলিনীর সখীগণ

সুরেশ

বিজয়

বিনোদ প্রভৃতি

} নলিনীর বিবাহ বা প্রণয়াকাঙ্ক্ষী

উপহার

শ্রীমতী হে —————,

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শূকায়ে শূকায়ে থাক্,
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়।
বেলা অবসান হবে, মৃদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!

২

জীবনসমুদ্রে তব জীবনতটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর।
সন্ধ্যার বাতাস লাগি উন্মিষত উঠে জাগি
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া—
জানে বা না জানে কেউ জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

৩

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে।
নহিলে হৃদয় মম ছিন্নধূমকেতু-সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে!

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে;
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে।
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী—
ফুরাইবে গীত গান, অবসাদে শ্লিয়মাণ,
সুখ শান্তি অবসান—কাঁদিব আঁধারে বসি!

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিন্দু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়—
একটি নয়নজল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে—
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান?

প্রথম সর্গ

দৃশ্য—বন। চপলা ও মুরলা

চপলা। সখি, তুই হ'লি কি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিহু বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাই— জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল-মস্তক বট চারি দিকে ঝুঁকি!
দুয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তপণে যেন মারিতেছে উর্কি।
অন্ধকার, চারি দিক হ'তে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয়, বৃকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিহু বসিয়া এখানে?

মুরলা। সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাই!
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি,
স্রোতস্বিনী কুল কুল করিছে সদাই!
বিছায়ে শূকানো পাতা বটমূলে রাখি মাথা
দিনরাত্রি পারি, সখি, শূন্যে ও ধ্বনি।
বৃকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উঠলিয়া
বৃঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি!
যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা,
এ বন আঁধার ঘোর ভাল লাগিবে না তোর,
তুই কুঞ্জবনে, সখি, কর্ গিয়ে খেলা!

চপলা। মনে আছে, অনিলের ফুলশয্যা আজ?
তুই হেথা বোসে র'বি, কত আছে কাজ!
কত ভোরে উঠে বনে গেছি ছুটে,
মাধবীরে লোয়ে ডাকি,
ডালে ডালে যত ফুল ছিল ফুটে
একটি রাখি নি বাকি!
শিশিরে ভিজিয়ে গিয়েছে আঁচল,
কুসুমরেণুতে মাথা।
কাঁটা বিধে, সখি, হোয়েছিল সারা
নোয়াতে গোলাপ-শাখা!
তুলেছি করবী গোলাপ-গরবী,
তুলেছি টগরগর্দলি,
যুঁইকুঁড়ি যত বিকেলে ফুটিবে
তখন আনিব তুলি।
আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়,
অনিলে দেখসে আজ—

হরষের হাসি অধরে ধরে না,
 কিছু যদি আছে লাজ!
 মুরলা। আহা সখি, বড় তারা ভালবাসে দুই জনে!
 চপলা। হ্যাঁ সখি, এমন আর দেখি নি ত বর-কোনে!
 জানিস্ ত, সখি, ললিতার মত
 অমন লাজুক মেয়ে
 অনিলের সাথে দেখা করিবারে
 প্রতিদিন যায় বিপাশার ধারে
 সরমের মাথা খেয়ে!
 কবরীতে বাঁধি কুসুমের মালা,
 নয়নে কাজলরেখা,
 চুপি চুপি যায়, ফিরে ফিরে চায়,
 বনপথ দিয়ে একা!
 দূর হোতে দেখি অনিলে অমনি
 সরমে চরণ সরে না যেন!
 ফিরিবে ফিরিবে মনে মনে করি
 চরণ ফিরিতে পারে না যেন!
 অনিল অমনি দূর হোতে আসি
 ধরি তার হাতখানি
 কহে যে কত-কি হৃদয়-গলানো
 সোহাগে মাখানো বাণী।
 আমি ছিন্দু, সখি, লুকিয়ে তখন
 গাছের আড়ালে আসি,
 লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিতেছিলাম
 রাখিতে পারি নে হাসি!
 কত কথা ক'য়ে কত হাত ধরি
 কত শত বার সাধাসাধি করি
 বসাইল যুবা ললিতা বালারে
 বকুল গাছের ছায়।
 মাথার উপরে ঝরে শত ফুল—
 যেন গো করুণ তরুণ বকুল
 ফুল চাপা দিয়ে লাজুক মেয়েরে
 ঢাকিয়া ফেলিতে চায়!
 ললিতার হাত কাঁপে থর থর,
 আঁখি দুটি নত মাটির উপর,
 ভূমি হোতে এক কুসুম তুলিয়া
 ছিঁড়িতেছে শত ভাগে।
 লাজনত মুখ ধরিয়া তাহার
 অনিল রাখিল বুকের মাঝার,
 অনিমিষ আঁখি মেলিয়া যুবক
 চাহি থাকে মুখবাগে!

আদরে ভাসিয়া ললিতার চোখে
 বাহিরে সলিলধার—
 সোহাগে সরমে প্রণয়ে গলিয়া
 আঁখি দুটি তার পড়িল ঢলিয়া,
 হাসি ও নয়নসলিলে মিলিয়া
 কি শোভা ধরিল মুখানি তার!
 আমি, সখি, আর নারিন্দু থাকিতে—
 সন্মুখে পড়িন্দু আসি,
 করতালি দিয়ে উপহাস কত
 করিলাম হাসি হাসি!
 ললিতা অমনি চমকি উঠিল,
 মুখেতে একটি কথা না ফুটিল,
 আকুল ব্যাকুল হইয়া সরমে
 লুকাতে ঠাই না পায়।
 ছুটিয়ে পলায়ে এলেম অমনি,
 হেসে হেসে আর বাঁচি নে সজনি,
 সে দিন হইতে আমারে হেরিলে,
 ললিতা সরমে মরিয়া যায়!

গুরলা। আহা, কেন বাধা দিতে গেলি তাহাদের কাছে?
 চপলা। বাধা না পাইলে, সখি, সন্মুখেতে কি সুখ আছে?
 গুরলা। সূর্য্যমুখী ফুল, সখি, আমি ভালবাসি বড়—
 দু চারিটি তুলে এনে আজিকে করিস্ জড়।
 মনে বড় সাধ তার দেখে রবিমুখ-পানে,
 রবি যেথা মাথা তার লোয়ে যায় সেইখানে!
 তবু মনোআশা হয় মনেই মিশায়ে যায়,
 মুখানি তুলিতে নারে সরমেতে জড়সড়!
 সে ফুলে সাজাবি দেহ লাজময়ী ললিতার,
 লজ্জাবতী পাতা দিয়ে ঢাকিব শয়ন তার;
 কমল আনিয়া তুলি লাজে-রাঙা পাপড়িগর্দলি
 গাঁথি গাঁথি নিরমিয়া দিবি ঘোমটার ধার!
 পাতা-ঢাকা আধ-ফুটো লাজুক গোলাপ দুটো
 আনিস্, দুলায়ে দিবি সূচারু অলকে তার!
 সহসা রজনী-গন্ধা প্রভাতের আলো দেখে
 ভাবিয়া না পায় ঠাই কোথা মুখ রাখে ঢেকে—
 আকুল সে ফুলগর্দলি যতনে আনিস্ তুলি,
 তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরিচিবি কণ্ঠহার।

চপলা। তুই, সখি, আয়—একেলা আমার
 ভাল নাহি লাগে বালা!
 দুটি সখী মিলি হাসিতে হাসিতে
 গুন্ গুন্ গান গাহিতে গাহিতে
 মনের মতন গাঁথিব মালা!
 বল্ দেখি, সখি, হ'ল কি তোরা?

হাসিয়া খেলিয়া কুসুম তুলিয়া
করিবি কোথায় ভাবনা তুলিয়া

কুমারীজীবন ভোর—

তা না, একি জ্বালা? মরমে মিশিয়া
আপনার মনে আপনি বসিয়া
সাধ কোরে এত ভাল লাগে, সখি,
বিজনে ভাবনা-ঘোর!

তা হবে না, সখি, না যদি আসিস্
এই কহিলাম তোরে—

যত ফুল আমি আনিয়াছি তুলি
আঁচল ভরিয়া ল'ব সবগদলি,
বিপাশার স্রোতে দিব লো ভাসায়ে
একটি একটি কোরে!

মুরলা। মাথা খা, চপলা, মোরে জ্বালাস্ নে আর!
চপলা। ভাল, সই, জ্বালাব না চলিন্দু এবার!

[গমনোদ্যম; পুনর্বীর ফিরিয়া আসিয়া]

না না, সখি, এই আঁধার কাননে

একেলা রাখিয়া তোরে
কোথায় যাইব বল্ দিখি তুই.

যাইব কেমন কোরে?

তোরে ছেড়ে আমি পারি কি থাকিতে?

ভালবাসি তোরে কত!

আমি যদি, সখি, হোতেম তোমার

পুরুষ মনের মত

সারাদিন তোরে রাখিতাম ধোরে,

বেঁধে রাখিতাম হিয়ে,

একটুকু হাসি কিনিতাম তোর

শতেক চুম্বন দিয়ে!

অমিয়া-মাখানো মুখানি তোমার

দেখে দেখে সাধ মিটিত না আর!

ও মুখানি লোয়ে কি যে করিতাম

বুকের কোথায় ঢেকে রাখিতাম,

ভাবিয়া পেতাম তা কি?

সখি, কার তুমি ভালবাসা-তরে

ভাবিছ অমন দিনরাত ধোরে,

পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা—

কি হবে রাখিয়া ঢাকি?

মুরলা। ক্ষমা কর মোরে, সখি, শুধায়ো না আর!

মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার!

যে গোপন কথা, সখি, সতত লুকায়ো রাখি

ইষ্টদেবমন্ত্র-সম পূজি অনিবার

তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে—
 লুকানো থাক্ তা, সখি, হৃদয়ে আমার!
 ভালবাসি, শূন্যে না করে ভালবাসি!
 সে নাম কেমনে, সখি, কহিব প্রকাশি!
 আমি তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
 সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!
 ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি পৃথিবীকাননে,
 আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
 দিন দিন পূজা করি শূন্যে পড়ে সে ঋষি,
 আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার—
 তেমনি পূজিয়া তারে এ প্রাণ ঘাইবে হা-রে,
 তবুও লুকানো রবে এ কথা আমার!

চপলা। কে জানে সজনি, বৃষ্টিতে না পারি

এ তোর কেমন কথা!

আজিও ত সখি না পেন্দু ভাবিয়া

একি প্রণয়ের প্রথা!

প্রণয়ীর নাম রসনার, সখি,

সাধের খেলেনা-মত,

উলটি পালটি সে নাম লইয়া

রসনা খেলায় কত!

নাম যদি তার বলিস্, তা হ'লে

তোরে আমি অবিরাম

শূন্য তাহারি নাম—

গানের মাঝারে সে নাম গাঁথিয়া

সদা গাব সেই গান!

রজনী হইলে সেই গান গেয়ে

ঘুম পাড়াইব তোরে,

প্রভাত হইলে সেই গান তুই

শূন্যি ঘুমের ঘোরে!

ফুলের মালায় কুসুম-আখরে

লিখি দিব সেই নাম—

গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি,

তাহারি বলয় কাঁকন করিবি,

হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি

নামের কুসুমদাম!

যখনি গাহিবি তাহার গান,

যখনি কহিবি তাহার নাম,

সাথে সাথে সখি আমিও গাহিব,

সাথে সাথে সখি আমিও কহিব,

দিবারাতি অবিরাম—

সারা জগতের বিশাল আখরে

পিড়িবি তাহারি নাম!

যখনি বলিবি তোর পাশে তারে
 ধরিয়া আনিয়া দিব—
 সন্মুখ হইতে পলাইয়া গিয়া
 আড়ালেতে লুকাইব।
 দেখিব কেমন দুখ না ছুটে
 ওই মুখে তোর হাসি না ফুটে—
 ভুলিবি এ বন, ভুলিবি বেদন,
 সখীরেও বন্দি ভুলিয়া যাবি!
 বল, সখি, প্রেমে পড়েছিঁস্ কার!
 বল, সখি, বল কি নাম তাহার!
 বলিবি নি কি লো? না যদি বলিস্
 চপলার মাথা খাবি!

মুরলা। [নেপথ্যে চাহিয়া] জীবন্ত স্বপ্নের মত, ওই দেখ্, কবি
 একা একা ভ্রমিছেন আঁধার অটবী।
 ওই যেন মূর্ত্তিমান ভাবনার মত
 নত করি দৃ-নয়ন শূনিছেন একমন
 স্তম্ভতার মুখ হোতে কথা কত শত!

[কবির প্রবেশ]
 কবি। বনদেবীটির মত এই যে মুরলা,
 প্রভাতে কাননে বসি ভাবনাবিহবলা!
 প্রকৃতি আপনি আসি লুকায়ে লুকায়ে
 আপনার ভাষা তোরে দেছে কি শিখায়?
 দিনরাত কলস্বরে তটিনী কি গান করে
 তাহা কি বন্দিতে তুই পেরেছিঁস্ বালা?
 তাই হেথা প্রতিদিন আসিস্ একালা!
 মুরলা! আজিকে তোরে বনবালা-মত কোরে
 চপলা সাজায়ে দিক্ দেখি একবার।
 এলোথেলো কেশপাশে লতা দে বাঁধিয়া,
 অলক সাজায়ে দে লো তৃণফুল দিয়া—
 ফুলসাথে পাতাগুলি একটি একটি তুলি
 অযতনে দে লো তাহা আঁচলে গাঁথিয়া!
 হরিণশাবক যত ভুলিবে তরাস,
 পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।
 ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখে তার দিবি তুলি,
 সবিষ্ময়ে স্নকুমার গ্রীবাটি বাঁকায়ে
 অবাক্ নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে!
 আমি হোয়ে ভাবে ভোর দেখিব মূখানি তোর,
 কম্পনার ঘুমঘোর পশিবে পরাণে!
 ভাবিব, সত্যই হবে বনদেবী আসি তবে
 অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে!

চপলা। বল দেখি মোরে, কবি গো, হ'ল কি
 তোমাদের দৃ-জন্য?

সখীরে আমার কি গুণ করেছে
 বল দেখি একবার!
 সখীর আমার খেলাধুলা নেই,
 সারাদিন বসি থাকে বিজনেই—
 জানি না ত, কবি, এত দিন আছি
 কিসের ভাবনা তার!
 ছেলেবেলা হোতে তোমরা দুজনে
 বাড়িয়াছ এক সাথে,
 আপনার মনে ভ্রমিতে দুজনে
 ধরি ধরি হাতে হাতে!
 তখন না জানি কি মন্ত্র, কবি গো,
 দিলে মুরলার কানে!
 কি মায়া না জানি দিয়েছিলে পড়ি
 সখীর তরুণ প্রাণে!
 বেলা হোয়ে এল সজনি এখন,
 করিয়াছে পান প্রভাতকিরণ
 ফুলবধূটির অধর হইতে
 প্রতি শিশিরের কণা।
 তুই থাক্ হেথা, আমি যাই ফিরে,
 অমনি ডাকিয়া ল'ব মালতীরে—
 একেলা ত, বালা, অত ফুলমালা
 গাঁথিবারে পারিব না!

[প্রস্থান

কবি। মুরলা, তোমার কেন ভাবনার ভাব হেন?
 কতবার শুধায়েছি বল নি আমারে!
 লুকায়ে না কোন কথা, যদি কোন থাকে ব্যথা
 রুধিয়া রেখো না তাহা হৃদয়মাঝারে!
 হয়ত হৃদয়ে তব কিসের যাতনা
 আপনি মুরলা তাহা জানিতে পার না!
 হয়ত গো যৌবনের বসন্তসমীরে
 মানসকুসুম তব ফুটেছে সুধীরে,
 প্রণয়বারির তরে তুষায় আকুল
 স্নিয়মাণ হ'য়ে বৃষ্টি পোড়েছে সে ফুল?
 পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন?
 ভালবাসো, ভালবাসা করহ গ্রহণ—
 তা হ'লে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব,
 উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন।

মুরলা। [স্বগত] বৃষ্টিলে না—বৃষ্টিলে না—কবি গো, এখনো
 বৃষ্টিলে না এ প্রাণের কথা!
 দেবতা গো বল দাও, এ হৃদয়ে বল দাও,
 পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।
 জানি, কবি, ভাল তুমি বাস' নাক মোরে—

তা হ'লে এ মন তুমি চিনিবে কি কোরে?
 একটুকু ভাল যদি বাসিতে আমারে
 তা হ'লে কি কোন কথা এ মনের কোন ব্যথা
 তোমার কাছেতে, কবি, লুকায়ে থাকিতে পারে?
 তাহা হ'লে প্রতি ভাবে, প্রতি ব্যবহারে,
 মুখ দেখে, আঁখি দেখে, প্রত্যেক নিশ্বাস থেকে
 বদ্বিধিতে যা গদ্বস্ত আছে বদ্বকের মাঝারে।
 প্রেমের নয়ন থেকে প্রেম কি লুকানো থাকে?
 তবে থাক্, থাক্ সব, বদ্বকে থাক্ গাঁথা—
 বদ্বক যদি ফেটে যায়—ভেঙে যায়—চূরে যায়—
 তবু রবে লুকানো এ কথা।

দেবতা গো বল দাও—এ হৃদয়ে বল দাও
 পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা!
 কবি। বহুদিন হ'তে, সখি, আমার হৃদয়
 হোয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়।
 চরাচর-ব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
 সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
 আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
 কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া!
 তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয়ভিতরে
 হ'তেছে দিবস নিশা, জানি না কি-তরে!

নবজাত উল্কানেন্দ্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
 বাসিতে না পায় ঠাই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,
 উচ্চতম মহীরুহ পদভরে ভূমিতলে লুটে,
 ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূল বিদারিয়া উঠে,
 অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
 চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়,
 তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাই—
 সমস্ত ধরায় তার বাসবার স্থান যেন নাই।
 তাই এই মহারণ্যে অমরারে আসি গো একাকী,
 মহান্ ভাবের ভারে দুরন্ত এ ভাবনারে
 কিছুক্ষণ-তরে তবু দমন করিয়া যেন রাখি।
 চন্দ্রশূন্য আঁধারের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রমাঝারে
 সমস্ত জগৎ যবে মগ্ন হ'য়ে গেছে একেবারে
 অসহায় ধরা এক মহামন্ত্রে হোয়ে অচেতন
 নিশীথের পদতলে করিয়াছে আত্মসমর্পণ,
 তখন অধীর হৃদি অভিভূত হোয়ে যেন পড়ে—
 অতি ধীরে বহে শ্বাস, নয়নেতে পলক না নড়ে।

...

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহমাঝারে,
 মহা উচ্ছ্বাসের সিংহ রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে!

মনের এ রুদ্ধশ্রোত দেহখানা করি বিদারিত
 সমস্ত জগৎ যেন চাহে, সখি, করিতে প্লাবিত !
 অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়াস্থল,
 অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলেনা কেবল,
 চৌদিকে দিগন্ত আসি রুদ্ধিত না অনন্ত আকাশ,
 প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস,
 দূরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য পান করি
 আনন্দসঙ্গীতশ্রোতে ফেলিত গো শূন্যতল ভরি,
 উষার কনকশ্রোতে প্রতিদিন করিত সে স্নান,
 জ্যোছনা-মদিরাধারা পূর্ণিমায় করিত সে পান,
 ঘূর্ণ্যমান ঝটিকার মেঘমাঝে বসিয়া একেলা
 কোঁতুকে দেখিত যত বিদ্যুৎ-বালিকাদের খেলা,
 দূরন্ত ঝটিকা হোথা এলোচুলে বেড়াত নাচিয়া
 তরঙ্গের শিরে শিরে অধীর চরণ বিক্ষেপিয়া ।
 হরষে বসিত গিয়া ধূমকেতুপাথার উপরে,
 তপনের চারি দিকে ভ্রমিত সে বর্ষ বর্ষ ধোরে ।
 চরাচর মুগ্ধ তার অব্যাহত বাসনার কাছে,
 প্রকৃতি দেখাত তারে যেথা তার যত ধন আছে ;
 কুসুমের রেণুমাথা বসন্তের পাখায় চড়িয়া
 পৃথিবীর ফুলবনে ভ্রমিত সে উড়িয়া উড়িয়া ;
 সমীরণ কুসুমের লঘু পরিমলভার বহি
 পথশ্রমে প্রান্ত হোয়ে বিশ্রাম লভিছে রহি রহি,
 সেই পরিমল সাথে অমনি সে যাইত মিলায়ে—
 ভ্রমি কত বনে বনে পরিমলরাশি-সনে
 অতি দূর দিগন্তের হৃদয়েতে যাইত মিশায়ে ।
 তটিনীর কলস্বর পল্লবের মরমর
 শত শত বিহগের হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস
 সমস্ত বনের স্বর মিশে হ'ত একস্তর
 একপ্রাণ হোয়ে তারা পরশিত উন্নত আকাশ ।
 তখন সে সঙ্গীতের তরঙ্গে করিয়া আরোহণ
 মেঘের সোপান দিয়া অতি উচ্চ শূন্যে গিয়া
 উষার আরক্ত ভাল পারিত গো করিতে চুম্বন !
 কল্পনা, থাম গো থাম, কোথায়—কোথায় যাও নিয়ে ?
 ক্ষুদ্র এ পৃথিবী, দেবি, কোন্‌থেনে রেখিছি ফেলিয়ে ?
 মাটির শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা যে গো রোয়েছে চরণ,
 যত উচ্চে আরোহিব তত হবে দারুণ পতন !
 কল্পনার প্রলোভনে নিরাশার বিষ ঢাকা,
 শূন্য অন্ধকার মেঘে সন্ধ্যার কিরণ মাখা,
 সেই বিষ প্রাণ ভোরে সখি লো করিন্দু পান—
 মন হ'য়ে গেল, সখি, অবসন্ন—স্থিরমাগ ।
 মূরলা । কবি গো, ওসব কথা ভেবো নাকো আর,
 প্রান্ত মাথা রাখ এই কোলেতে আমার ।

কবি। সখি, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন
হাহা কোরে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লোরে!
পারি নে, পারি নে আর— পাষণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে।
সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমিসম,
নিরাশা বদকেতে বসি ফেলিতেছে বিষম্বাস।
উঠিতে শক্তি নাই, যদিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে, সখি, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বদকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী-সম!
কে আছে, অজস্র স্রোতে প্রণয়অমৃত ভরি
অবসন্ন এ হৃদয় তুলিবে সজীব করি!
মন, যত দিন যায়, মৃদিয়া আসিছে হায়—
শূকায়ে শূকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি।

মুরলা। [স্বগত] হা কবি, ও হৃদয়ের শূন্য পূরাইতে
অভাগিনী মুরলা গো কি না পারে দিতে!
কি সুখী হোতেম, যদি মোর ভালবাসা
পূরাতে পারিত তব হৃদয়পিপাসা!
শৈশবে ফুটে নি যবে আমার এ মন
তরুণ-প্রভাত সম, কবি গো, তখন
প্রতিদিন ঢালি ঢালি দিয়েছ শিশির—
প্রতিদিন যোগায়েছ শীতল সমীর!
তোমারি চোখের 'পরে করুণ কিরণে
এ হৃদি উঠেছে ফুটি তোমারি যতনে!
তোমারি চরণে, কবি, দোছি উপহার,
যা কিছুর সৌরভ এর তোমারি—তোমার।

[প্রকাশ্য] তোল কবি, মাথা তোল, ভেবো না এমন—
দুজনে সরসীতীরে করিগে ভ্রমণ।
ওই চেয়ে দেখ, কবি, তটিনীর ধারে
মধ্যাহ্নকিরণ লোয়ে বনদেবী স্তম্ভ হোয়ে
দিতেছে বিবাহ দিয়া আলোকে অঁধারে।
সাধের সে গান তব শুনিয়ে এখন?
তবে গাই, মাথা তোল, শোন দিয়ে মন।

গান

কত দিন একসাথে ছিন্দু ঘুমঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভালবাসি তোরে।
মনে আছে ছেলেবেলা কত খেলিয়াছি খেলা,
ফুল তুলিয়াছি কত দুইটি অঁচল ভোরে!
ছিন্দু স্নেহে যত দিন দুজনে বিরহহীন
তখন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে?
অবশেষে এ কপাল ভাঙিল যখন,

ସିଂହାସନ ଉପରେ -

କ୍ରିଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ - ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ॥

ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ଶାସ୍ତ୍ର; ଶାସ୍ତ୍ର-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମାତ୍ର
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ -

ଶାସ୍ତ୍ର! ଶାସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର,

ଶାସ୍ତ୍ର! ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର,

ଶାସ୍ତ୍ର! ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ -

ଶାସ୍ତ୍ର -

ଶାସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର?

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର?

ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ର -

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର?

ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର

ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର

ছেলেবেলাকার যত ফুরাল স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী,
তখন জানিনু, সখি, কত ভালবাসি।

দ্বিতীয় সর্গ

কুড়াকানন। নলিনী ও সখীগণ

নলিনী। সখি! অলকচিকুরে কিশলয়-সাথে
একটি গোলাপ পরায়ে দে।
চারু! দেখি ও আরশীখানি;
বালা! সিন্ধিটি দে ত লো আনি;
লীলা! শিথিল কুন্তল দেখ্ বার বার
কপোলে দুলিয়া পড়িছে আমার,
একটু এপাশে সরায়ে দে।

সুন্দরী। মাধবী! বল্ ত মোরে একবার
আজিকে হ'ল কি তোর!
কতখন ধরে গাঁথিছিস্ মালা
এখনো কি শেষ হ'ল না তা বালা?
এক মালা গেথে করিবি না কি লো
সারাটি রজনী ভোর?
অনিলের হবে ফুলশয্যা আজ,
সাঁঝের আগেই শেষ করি সাজ
সব সখী মিলি যেতে হবে সেথা
তা কি মনে আছে তোর?

অলকা। মরি মরি কিবা সাজাবার ছিরি,
চেয়ে দেখ্ একবার!
সখীর অমন ক্ষীণ দেহমাঝে
কমলফুলের মালা কি লো সাজে?
বিনোদিনী দেখ্ গাঁথিছে বসিয়া
কমলের ফুলহার!

নলিনী। ওই দেখ্, সখি, দাঁড়ের উপরে
মাথারি গুঁজিয়া পাথার ভিতরে
শ্যামারি আমার—সাধের শ্যামারি
কেমন ঘুমায়ে আছে!
আন্ সখি ওরে কাছে!
গান গেয়ে গেয়ে, তালি দিয়ে দিয়ে,
ঘিরে বসি ওরে সকলে মিলিয়ে—
দেখিব কেমন ফিরে ফিরে ফিরে
তালে তালে তালে নাচে।

শ্যামার প্রতি গান
 নাচ, শ্যামা, তালে তালে।
 বাঁকায়ে গ্রীবাটি, তুলি পাখা দুটি
 এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
 নাচ, শ্যামা, তালে তালে।
 রুণ্ড রুণ্ড ঝুন্ড বাজিছে নৃপদর,
 মৃদ মৃদ মধু উঠে গীতসদর,
 বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
 তালে তালে উঠে করতালিধনি—
 নাচ, শ্যামা, নাচ তবে!

নিরালয় তোর বনের মাঝে
 সেথা কি এমন নৃপদর বাজে?
 বনে তোর পাখী আছিল যত
 গাহিত কি তারা মোদের মত
 এমন মধুর গান?
 এমন মধুর তান?
 কমল-করের করতালি হেন
 দেখিতে পেতিস্ কবে?
 নাচ, শ্যামা, নাচ তবে!

বন্দী বোলে তোর কিসের দুখ?
 বনে বল্ তোর কি ছিল সুখ?
 বনের বিহগ কি বৃঝিবি তুই
 আছে লোক কত শত
 যারা, শ্যামা, তোর মত
 এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
 সাধের বন্দী হইতে চায়!
 এই গীতরবে হোয়ে ভরপদর
 শূনি শূনি এই চরণনৃপদর
 জনম জনম নাচিতে চায়!

সাধ কোরে ধরা দেয় গো তারা,
 সাথে সাথে ভ্রমি হয় গো সারা,
 ফিরেও দেখি নে—ফিরেও চাহি নে—
 বড় জ্বালাতন করে গো যখন
 অশরীরী বাজ করি বরিষণ—
 উপেখা-বাণের ধারা!
 তবে দেখ, পাখী, তোর
 কেমন ভাগ্যের জোর!
 বড় পদ্যফলে মিলেছে বিহগ
 এমন সুখের কারা!

আয় পাখী, আয় বৃকে!
 কপোলে আমার মিশায়ে কপোল
 নাচ্ নাচ্ নাচ্ সুখে!
 বড় দুখ মনে, বনের বিহগ,
 কিছ্ তুই বদ্বিলি না!
 এমন কপোল অমিয়মাথা
 চুমিলি, তবুও ঝাপটি পাখা
 উড়িতে চাহিস্ কি না!
 প্রতি পাখা তোর উঠে নি শিহরি?
 পদকে হরষে মরমেতে মরি
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে
 পদতলে পড়িলি না?
 নাচ্ নাচ্ তালে তালে!
 বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
 এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
 নাচ্, শ্যামা, তালে তালে!

- দামিনী। শুনোছিস সখি, বিবাহসভায়
 বিনোদ আসিবে আজ!
 ভালো কোরে কর্ সাজ!
- নলিনী। আহা মরে যাই কি কথা বলিলি,
 শুনিয়া যে হয় লাজ!
 বিনোদ আসিবে আজ?
 এ বারতা দিয়ে কেন, লো সজনি,
 মাথায় হানিলি বাজ?
 সারাখন মোর সাথে সাথে ফিরে
 ক্ষান্ত নহে একটুক,
 মুখখানা তার দেখিবারে পাই
 যে দিকে ফিরাই মুখ!
 এক-দৃষ্টে হেন রহে সে তাকায়ে
 থেকে থেকে ফেলে শ্বাস,
 মুখেতে আঁচল চাপিয়া চাপিয়া
 রাখিতে পারি নে হাস!
- লীলা। শুনোছি প্রমোদ আসিবে, যাহারে
 ড্রমর বলিয়া ডাকি—
 যাহারে হেরিলে হরষে তোমার
 উজলিয়া উঠে আঁখি।
- নলিনী। গা ছুয়ে আমার বল্, লো সজনি,
 সত্য সে আসিবে নাকি?
 দেখ্ দেখি সখি, অভাগীর তরে
 কোথাও নিস্তার নাই,
 মরি মরি কিবা ড্রমর আমার!

ভ্রমরের মৃথে ছাই!

সে ছাড়া ভ্রমর আর কি নাই?

তা হলে এখনি—সখি রে, এখনি

নলিনী-জনম ঘুচাতে চাই!

চারুশীলা। লুকাস্ নে মোরে, আমি জানি সখি,

কে তোমার মনোচোর।

বলিব? বলিব? হেথা আয় তবে,

বলি কানে কানে তোর!

[কানে কানে কথা]

নলিনী। জ্বালাস্ নে চারু, জ্বালাস্ নে মোরে,

করিস্ নে নাম তার!

সুরেশ?—তাহার জ্বালায়, সজনি,

বেঁচে থাকা হ'ল ভার!

কে জানিত আগে বল্ ত, সখি লো,

রূপের যাতনা অতি?

সাধ যায় বড় কুরূপা হইয়া

লভি শান্তি এক রতি!

[লীলার প্রতি জনান্তিকে]

মাধবী। শোন্ বলি লীলা, জানি কারে সখি

মনে মনে ভাল বাসে।

দেখিন্ সেদিন বিজয়ের সাথে

বসি আছে পাশে পাশে।

মৃদু হাসি হাসি কত কহে কথা,

কভু লাজে শির নত,

কভু ল'য়ে কেশ বেণী ফেলি খুলে—

জড়ায়ে জড়ায়ে মৃগাল আঙুলে

আনুমনে খেলে কত!

কখন বা শূনে অতি একমনে

বিজয়ের কথাগুলি,

শূনিতে শূনিতে শির নত করি

তুলি কঁড়ি এক কতখন ধরি

খুলি খুলি দেয় মৃদিত পাপড়ি,

ফুটাইয়া তারে তুলি।

কভু বা সহসা উঠিয়া যায়,

কভু বা আবার ফিরিয়া চায়—

মৃদু মৃদু স্বরে গদ্গদ কোরে

উঠে এক গান গেয়ে!

এমন মধুর অধীরতা তার!

এমন মোহিনী মেয়ে!

বিনো। সখি লো, তা নয়, কতবার আমি

দেখিয়াছি লুকাইয়া

- অশোকের সাথে বসি আছে একা
 প্রমোদকাননে গিয়া!
 জানি আমি তারে হেরিলে সখীর
 স্নেহে নেচে উঠে হিয়া।
- নলিনী। হেথা আয় তোরা, দে দেখি সাজায়
 শ্যামা পাখীটিরে মোর!
 দুটি ফুল বসা দুইটি ডানায়,
 বেলকুণ্ডি-মালা কেমন মানায়
 স্নেহগোল গলায় ওর!
 ঐ দেখ্ সখি! দেখি নি কখনো
 এমন দূরন্ত পাখী!
 যতগুলি ফুল দিলেম পরায়ে
 সবগুলি দেখ্ ফেলেছে ছড়ায়ে,
 শত শত ভাগে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া
 একটি রাখে নি বাকী!
 ভাল, পাখী যদি না চায় সাজিতে
 আমারে সাজা লো তবে।
- চারু। তোর সাজ ফুরাইবে কবে?
 লীলা। সখি, আবার কিসের সাজ!
 সুরুচি। দেখ্, এসেছে হইয়া সাঁঝ।
 নলিনী। দেখ্ লো সুরুচি, লীলা ভাল কোরে
 বাঁধিতে পারে নি চুল—
 এই দেখ্ হেথা পরায়ে দিয়াছে
 অলকে শূকানো ফুল।
 বেণী খুলে চুল বেঁধে দে আবার,
 কানে দে পরায়ে দুল।
- সুরুচি। না লো সখি, দেখ্, আঁধার হতেছে,
 দেরি হয়ে যায় ঢের—
 চল্ ভরা করে যাই দেখিবারে
 ফুলশয্যা অনিলের।
- অলকা। এত খনে, সখি, এসেছে সেথায়
 যতেক গ্রামের লোক।
- দামিনী। [হাসিয়া] এসেছে বিনোদ!
 লীলা। [হাসিয়া] এসেছে প্রমোদ!
 বিনো। [হাসিয়া] এসেছে সেথা অশোক!
 মাধবী। [হাসিয়া] এসেছে বিজয়!
 চারু। [চিবুক ধরিয়া] সুরেশ রয়েছে
 পথ চেয়ে তোর তরে!
- অলকা। আয় তবে ভরা করে!
 নলিনী। ভাল, সখি, ভাল, চল্ তবে চল্—
 জ্বালাস্ নে আর মোরে!

১য় সর্গ

মদুরলা ও অনিল

অনিল। ও হাসি কোথায় তুই শিখিছিলি বোন?
 বিষন্ন অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
 অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ।
 অতি ঘন মেঘমালা ভেদি স্তরে স্তরে, বাল্য
 সায়াহ্ন জলদপ্রান্তে দেয় যথা দেখা
 শ্লান তপনের মদু কিরণের রেখা।
 কত ভাবনার স্তর ভেদ করি পর পর
 ওই হাসিটুকু আসি পহুছে অধরে!
 ও হাসি কি অশ্রুজলে সিস্ত থরে থরে?
 ও হাসি কি বিষাদের গোখলির হাস?
 ও হাসি কি বরষার সুরুমারী লতিকার
 ধৌতরেণু ফুলটির অতি মদু বাস?
 মদুরলা রে, কেন আহা, এমন তু' হলি!
 এত ভালবাসা করে দিলি জলাঞ্জলি?
 যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
 আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
 দিনরাত যেই জন শূন্যে খেলা করে,
 শূন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি
 মূর্ছিতেছে আঁকিতেছে—শতবার দেখিতেছে—
 সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—
 সদা যে বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে,
 আঁখি যার অনিমেষ আকাশের প্রায়,
 মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়—
 ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে
 অভাগিনী, লুটাইয়া পড়িলি কি বোলে?
 সে কি রে, অবোধ মেয়ে বারেক দেখিবে চেয়ে?
 জানিতেও পারিবে না, যাইবে সে চ'লে
 যুথিকাহৃদয় তোর ধূলি-সাথে দ'লে।
 এত ভালবাসা তারে কেন দিলি হায়?
 সাগর-উদ্দেশ-গামী তটিনীর পায়
 না ভাবিয়া না চিন্তিয়া যথা অবহেলে
 ক্ষুদ্র নিষ্করিণী দেয় আপনারে ঢেলে।
 নিশীথের উদাসীন পথিক সমীর
 শূন্য হৃদয়ের তাপে হইয়া অধীর
 কুসুমকানন দিয়া যায় যবে বয়ে
 আকুল রজনীগন্ধা কথাটি না কয়ে
 প্রাণের সুরভি সব দিয়া তার পায়
 পূরদিন বৃন্ত হতে ঝরে পড়ে যায়।
 মেঘের দৃঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন

কাঁদিয়া কাটিবে কি রে সারাটি যৌবন?
কেঁদে কেঁদে প্রান্ত হয়ে দীন অতিশয়—
আপনার পানে তবে চাহিয়া দেখিবি যবে
দেখিবি জীবনদিন সন্ধ্যা হয় হয়।
যে মেঘ-মাঝারে থাকি উর্দিলি প্রভাতে
সেই মেঘমাঝে থাকি অস্ত গেলি রাতে।

মুরলা ।

কি জানি কেমন

মুরলার সুখের কি দুঃখের জীবন!
সুখ দুঃখ দিনরাত মিলিয়া উভয়ে
রেখেছে সায়াহ করি এ শান্ত হৃদয়ে।
হেন আলিঙ্গনে তারা রয়েছে সদাই
যেন তারা দুটি সখা, যেন দুটি ভাই।
জোছনা ও যামিনীতে প্রণয় যেমন
তেমনি মিলিয়া তারা রয়েছে দুজন।
সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা,
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা।
একা যবে বসে থাকি স্তম্ভ জোছনায়,
বহে বাতায়ন-পানে নিশীথের বায়,
বড় সাধ যায় মনে যারে ভালবাসি
একবার মূহূর্ত সে বসে কাছে আসি,
দুটি শূদ্ধ কথা কহে—একটু আদর—
সেই স্তম্ভ জোছনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায়
মরিয়া যাই গো তারি বুকের উপর।
যখনি কবিরে দেখি সব যাই ভুলে,
কিছুই চাহি না আর—কিছুই ভাবি না আর—
শূদ্ধ সেই মুখে চাই দুটি আঁখি ভুলে।
দেখি দেখি—কি যে দেখি, কি বলিব কি সে!
হৃদয় গলিয়া যায় জোছনায় মিশে।
জোছনার মত সেই বিগলিত হিয়া
প্রাণের ভিতরে ধরি একেবারে মগ্ন করি
কবিরে চোঁদিকে যেন থাকে আবারিয়া।
মনে মনে মন যেন কাঁদিয়া দু-করে
কবির চরণ দুটি জড়াইয়া ধরে,
আঁখি মূদি “কবি! কবি!” বলে শতবার—
শতবার কেঁদে বলে “আমার! আমার!”
“আমার আমার” যেন বলিতে বলিতে
চাহে মন একেবারে জীবন ত্যজিতে!
সুখেতে কি দুখে যেন ফেটে যায় বুক—
সুখ বলে দুখ আমি, দুখ বলে সুখ।
কোথা কবি, কোথা আমি! সে যে গো দেবতা—
তারে কি কহিতে পারি প্রণয়ের কথা?
কবি যদি ভুলে কভু মোরে ভালবাসে

তা হলে যে ম'রে যাব সঙ্কেচে উল্লাসে।
 চাই না চাই না আমি প্রণয় তাহার,
 যাহা পাই তাই ভাল স্নেহসুধাধার।
 শূকতারা স্নেহমাখা করুণ নয়ানে
 চেয়ে থাকে অস্তমান যামিনীর পানে,
 তেমন চাহেন যদি কবি স্নেহভরে
 মুরলার ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের 'পরে
 তাহা হলে নয়নের সামনে তাহার
 হাসিয়ে ফুরিয়ে যাবে জীবন আমার।
 অর্নিল। স্বার্থপর, আপনারি ভাবভরে ভোর,
 আজিও সে দেখিল না হৃদয়টি তোর?
 সর্বস্ব তাহারি পদে দিয়া বিসর্জন
 কাঁদিয়া মরিছে এক দীনহীন মন,
 ইহাও কি পড়িল না নয়নে তাহার?
 আপনারে ছাড়া কেহ নাহি দেখিবার?
 নিশ্চয় দেখেছে, তবু দেখেও দেখে নি।
 দেখেছে সে—নিরুপায় নিতান্তই অসহায়
 ভালবাসিয়াছে এক অভাগা রমণী।
 দেখেছে—হৃদয় এক ফাটিয়া নীরবে
 একান্ত মরিবে, তবু কথা নাহি কবে!
 দেখেও দেখে নি তবু, পশু সে নিন্দর!
 ভাঙ্গিয়া দেখিতে চাহে রমণীহৃদয়।
 শতধা করিতে চায় মন রমণীর,
 দেখিবারে হৃদয়ের শির উপশির।
 এমন সুন্দর মন মুরলা তোমার—
 এমন কোমল, শান্ত, গভীর, উদার—
 ও মহান্ হৃদয়েতে প্রেমজলধির
 নাই রে দিগন্ত বৃষ্টি, নাই তার তীর।
 করিস নে, করিস নে ও হৃদি বিনাশ!
 যৌবনেই প্রণয়েতে হোস নে উদাস!
 কহিগে প্রণয় তোর কবির সকাশে,
 শূধাইগে ভাল তোরে বাসে কি না বাসে।
 ভাল যদি নাই বাসে কেন সেই জন
 মিছা স্নেহ দেখাইয়া বেঁধে রাখে মন?
 না যদি করিতে পারে তোরে আপনার,
 আপনার মত কেন করে ব্যবহার?
 কথা নাহি কহে যেন, না করে আদর,
 পরের মতন থাকে—দেখে তোরে পর!
 নিরদয়-দয়া তোরে নাই বা করিল!
 শত্রুতার ভালবাসা নাই বা বাসিল!
 মৃদুসুখের তোরে দিয়া প্রলোভন
 অসুখী করিবে কেন সারাটি জীবন?

দুঃ-দণ্ডের আদরেতে কভু ভুলিস না!
 আধেক সুখেতে কভু পূরে না বাসনা।
 এখনি চলিনু তবে তার কাছে যাই,
 ভাল বাসে কি না বাসে শুধাইতে চাই।
 মনে কোরেছিঁনু, ভাই, এ প্রাণের কথা
 কাহারেও বলিব না যত পাই ব্যথা।
 সেদিন সায়াহকালে উচ্ছ্বসি উঠিয়া
 বড় নাকি কেন্দ্রে মোর উঠেছিল হিয়া,
 তাই আমি পাগলের মত একেবারে
 ছুটিয়া তোমার কাছে গেনু কাঁদিবারে।
 উচ্ছ্বসি বলিনু যত কাহিনী আমার!
 কেন রে বলিলি হা রে, দুর্বল, অসার?
 ভালবাসিতেই যদি করিলি সাহস,
 লুকাতে নারিস তাহা হা হৃদি অবশ?
 পরের চোখের কাছে না ফেলিলে জল
 আশ কি মেটে না তোর রে আঁখি দুর্বল?
 মরলা রে, অভাগী রে, কেন ভাল বাসিলি রে?
 যদি বা বাসিলি ভাল কেন তোর মন
 হ'ল হেন নীচ হীন, দুর্বল এমন?
 একটি মিনিতি আজি রাখ গো আমার!
 সহস্র যাতনা পাই আর কখন ত, ভাই,
 ফেলিব না তব কাছে অশ্রুবিরিধার—
 যেও না কবির কাছে ধরি তব পায়,
 ভুলে যাও যত কথা কহেছি তোমায়!
 দয়া করে আরেকটি কথা মোর রাখ,
 যদি গো কবির 'পরে রোষ করে থাক
 মোর কাছে কভু আর কোরো নাক নাম তাঁর—
 সে নাম ঘৃণার স্বরে কভু সহিব না!
 জানালেম এই মোর প্রাণের প্রার্থনা!

অনিল। তবে কি এমনি শূন্য মিছে ভালবেসে
 শূন্য এ জীবন তোর ফুরাইবে শেষে!

মরলা। যায় যদি যাক্ ভাই, ফুরায় ফুরাক,
 প্রভাতে তারার মত মিশায় মিশাক—
 মরলার মত ছায়া কত আসে কত যায়,
 কি হয়েছে তায়!

অবোধ বালিকা আমি, মিছে কষ্ট পাই—
 এ জীবনে মরলার কোন কষ্ট নাই!
 স্নেহের সমুদ্র সেই কবি গো আমার—
 অনন্ত স্নেহের ছায়ে আমারে রেখেছে পায়,
 তাই যেন চিরকাল থাকে মরলার!
 সে স্নেহের কোলে শূন্য কাটায় জীবন!
 সে স্নেহের কোলে প্রাণ করে বিসর্জন!

কুসুমিত সে অনন্ত স্নেহরাজ্য-পরে
 তিল স্থান থাকে যেন মুরলার তরে!
 ষত দিন থাকে প্রাণ— ব্যাপি সেইটুকু স্থান
 মাটিতে মিশায়ে রবে হৃদয় আমার।
 কোন—কোন—কোন সুখ নাহি চাহি আর।

চতুর্থ সর্গ

কবি

প্রথম গান

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই,
 প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
 লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে
 একটি মধুর মুখ।
 চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল,
 কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
 দূয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া,
 দূয়েকটি আছে কপোলে নুঁইয়া,
 কেহ বা এলায়ে চেতনা হারিয়ে
 চুমিয়া আছে চিবুক।
 বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে
 মৃথানি মধুর অতি!
 অধর দুটির শাসন টুটিয়া
 রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
 দুটি আঁখি-পরে মেলিছে মিশিছে
 তরল চপল জ্যোতি।

দ্বিতীয় গান

প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া,
 দেখি সেই মৃথখানি—
 কুসুমমাঝারে রয়েছে ফুটিয়া
 কুসুমগর্দলির রাণী!
 আপনা-আপনি উঠে আঁখি মোর
 সেই জানালার পানে,
 আনমন হয়ে রহি দাঁড়াইয়া
 কিছূখন সেইখানে।

আর কিছ্ নহে, এ ভাব আমার
 কবির সৌন্দর্য্যতৃষা,
 কলপনা-সুধা-বিভল কবির
 মনের মধুর নেশা!
 গোলাপের রূপ, বকুলের বাস,
 পাঁপয়ার বনগান,
 সৌন্দর্য্যমদিরা দিবস রজনী
 করিয়া করিয়া পান,
 শিথিল হইয়া পড়েছে হৃদয়—
 নয়নে লেগেছে ঘোর—
 বিকশিত রূপ বড় ভাল লাগে
 মৃগধ নয়নে মোর!

তৃতীয় গান

প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি?
 আলিঙ্গিতে গ্রীবা তার লতাগর্দলি চারি ধার
 আছে শত বাহু তুলি শত ফুলহারে সাজি।
 দূর-বন হতে ছুটি আসিয়া প্রভাতবায়
 সে বয়ান না দেখিয়া শূন্য বাতায়ন দিয়া
 প্রবেশি আঁধার গৃহে করিতেছে হায় হায়!
 কত খন—কত খন— কত খন ভ্রমি একা,
 গণিনু ফুলের দল, মাটিতে কাটিনু রেখা।
 কত খন—কত খন— গেল চলি কত খন—
 খনে খনে দেখি চাহি, তবু না পাইনু দেখা!
 ফিরিনু আলয়মুখে, চলিনু আপন মনে,
 চলিতে চলিতে ধীরে ভুলে ভুলে ফিরে ফিরে
 বার বার এসে পড়ি সেই—সেই বাতায়নে!
 নিরাশ-আশার মোহে চেয়ে দেখি বার বার,
 শূন্য—শূন্য—শূন্য সব বাতায়ন অন্ধকার!
 ফুলময় বাহু দিয়া আঁধারকে বন্ধে নিয়া
 আঁধারকে আলিঙ্গিয়া রয়েছে সে লতাগর্দলি,
 তবু ফিরি ফিরি সেথা আসিলাম ভুলি ভুলি!
 তেমনি সকলি আছে— বাতায়ন ফুলে সাজি,
 দুলিছে তেমনি করি বাতাসে কুসুমরাজি!
 শুধু এ মনে আমার এক কথা বার বার
 এক সুরে মাঝে মাঝে উঠিতেছে বাজি বাজি—
 “প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি?
 কেন না দেখিনু তারে, কেন না দেখিনু আজি?”
 অতিধীর পদক্ষেপে আলেয়ে আসিনু ফিরি,
 শতবার আনমনে বলিলাম ধীরি ধীরি—
 “প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি?”

চতুর্থ গান

কাল যবে দেখা হ'ল পথে যেতে যেতে ঢলি
 মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি?
 অজানা পথিকে হেরি এত কি সরম হবে?
 কি যেন গো কথা আছে, আটকিয়া রহিয়াছে!
 আধ-মুদা দুটি আঁখি কি যেন রেখেছে ঢাকি,
 খুলিলে আঁখির পাতা প্রকাশ তা হয় পাছে!
 সরম না হয় যদি, এ ভাব কিসের তবে?
 কাল তাই বোসে বোসে ভাবিয়াছি সারাক্ষণ,
 স্বপনে দেখেছি তার ঢলে-পড়া দু-নয়ন!
 প্রভাতে বসিয়া আজ ভাবিতেছি নিরিবিলি—
 “মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি?”

পঞ্চম গান

সত্য কি তাহারে ভালবাসি?
 ভুলিনু কি শুধু তার দেখে রূপরাশি?
 স্বপনে জানি না তার হৃদয় কেমন,
 সহসা আপনা ভুলে— শুধু কি রূপসী বলে
 জীবন্তপদ্মলী-পদে বিসর্জিনু মন?

ষষ্ঠ গান

মোর এ যে ভালবাসা রূপমোহ এ কি?
 ভাল কি বেসেছি শুধু তার মুখ দেখি?
 মুখেতে সৌন্দর্য তার হেরিনু যখন
 তখন কি মন তার দেখিতে পাই নি?
 মধুর মুখেতে তার আঁখি-দরপণে
 মনচ্ছায়া হেরিয়াছি কম্পনানয়নে!
 সেই সে মৃথানি তার মধুর-আকার
 বেড়াতেছে খেলাইয়া হৃদয়ে আমার!
 কত কথা কহিতেছে হরষে বিভোর,
 কত হাসি হাসিতেছে গলা ধরে মোর!
 কি করিয়া হাসে আর কি ক'রে সে কয়,
 কি ক'রে আদর করে ভালবাসায়,
 মৃথানি কেমন হয় মৃদু অভিমানে,
 সকলি হৃদয় মোর না জানিয়া জানে!
 যেন তারে জানি কত বর্ষ অগগন,
 এ হৃদয়ে কিছুর তার নহে গো নূতন!
 মুখ দেখে শুধু ভাল বেসেছি কি তারে?
 মন তার দেখি নি কি মৃথের মাঝারে?

সপ্তম গান

দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা-পারে!
 কবিতা আমার যত সূধীরে শুনাই তারে!
 দৌঁছে মিলি একপ্রাণ গাহিতেছি এক গান,
 দু জনের ভাবে ভাবে একেবারে গেছে মিশে,
 দু জনে দু জন-পানে চেয়ে থাকি অনিমিষে,
 দু জনের আঁখি হতে দু জনে মদিরা দিয়া
 আসিবে অবশ হয়ে দৌঁহার বিভল হিয়া!
 মুখে কথা ফুটিবে না, আঁখিপাতা উঠিবে না,
 আমার কাঁধের পরে নোয়াবে মাথাটি তার—
 দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা-পার!

অষ্টম গান

শুনোছি—শুনোছি কি নাম তাহার—
 শুনোছি—শুনোছি তাহা!
 নলিনী—নলিনী—নলিনী—নলিনী—
 কেমন মধুর আহা!
 নলিনী—নলিনী—বাজিছে শ্রবণে
 বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম!
 কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
 নলিনী—নলিনী—নলিনী নাম!
 বালার খেলার সখীরা তাহারে
 নলিনী বলিয়া ডাকে,
 স্বজনেরা তার নলিনী—নলিনী—
 নলিনী বলে গো তাকে!
 নামেতে কি যায় আসে?
 রূপেতে কি যায় আসে?
 হৃদয় হৃদয় দেখিবারে চায়
 যে যাহারে ভালবাসে!
 নলিনীর মত হৃদয় তাহার
 নলিনী যাহার নাম—
 কোমল—কোমল—কোমল অতি—
 যেমন কোমল নাম!
 যেমন কোমল তেমনি বিমল,
 তেমনি সুরভধাম!
 নলিনীর মত হৃদয় তাহার
 নলিনী যাহার নাম!

পঞ্চম সর্গ

কানন

রাত্রি

অনিল ললিতা। নলিনী ও সখীগণ। বিজয় সুরেশ বিনোদ প্রমোদ অশোক নীরদ

কাননের এক পাশে ললিতার প্রতি অনিলের গান

বউ! কথা কও!

সারাদিন বনে বনে ভ্রমোছি আপন মনে,
সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত বড়—বউ, কথা কও!
শুন লো, বকুল-ডালে লুকায়ে পল্লবজালে
পিক-সহ পিকবধু মুখে মুখ মিলায়ে
দু জনেতে এক প্রাণ গাহিতেছে এক গান,
রাশি রাশি স্বরসুধা বাতাসেরে বিলায়ে।
সারাদিন তপনের কিরণেতে তাপিয়া
সন্ধ্যাকালে নীড়ে ফিরে আসিয়াছে পাতিয়া।
প্রিয়ারে না দেখি তার ঢালিতেছে স্বরধার
অধীর বিলাপ তার লতাপাতা-ভিতরে,
গলি সে আকুল ডাকে বসি অতি দূর-শাখে
প্রাণের বিহগী তার “যাই যাই” উতরে।
অতি উচ্চ শাখে উঠি দেখ লো কপোত দুটি
মুখে মুখে কানে কানে কত কথা বলিছে,
বুকে বুকে মিলাইয়া চঞ্চুপুট বুলাইয়া,
কপোতী সে কপোতের আদরেতে গলিছে!
এস প্রিয়ে, এস তবে মধুর—মধুর রবে
জুড়াও শ্রবণ মোর—বউ! কথা কও!
যদি বড় হয় লাজ আমার বুকের মাঝ
পাথর ভিতরে মুখ লুকাও তোমার!
অতি ধীরে মৃদু-মৃদু, বুকের কাছেতে, বধু,
দু-চারিটি কথা শুধু বল একবার!

[কিছুক্ষণ থামিয়া] তবে কি কবে না কথা, পুরাবে না আশা?
ভাল ভাল, কোয়ো নাকো, মুখ ফিরাইয়া থাকো,
বুঝিনু আমার 'পরে নাই ভালবাসা।

ললিতা। [স্বগত] কি কহিব কথা সখা? কহিতে না জানি!
বুঝি নাই, ক্ষুদ্র নারী—ফুটেনাকো বাণী।
মনে কত ভাব যুঝে, হৃদয় নিজে না বুঝে,
প্রকাশ করিতে গিয়া কথা না যোগায়।
হৃদয়ে যে ভাব উঠে হৃদয়ে মিলায়।
তবে কি কহিব কথা—ভেবে নাহি পাই—
কথা কহিবার, সখা, ক্ষমতা যে নাই!

কি এমন কথা কব ভাল যা লাগিবে তব?
 তুমি গো শূনাও মোরে কাহিনী বিরলে,
 এক মনে শূনি আমি বসি পদতলে।
 মাথার উপর দিয়া তারাগর্দল যত
 একটি একটি করি হবে অস্তগত।
 শ্রান্তি তৃপ্তি নাহি জানি ও মৃথের প্রতি বাণী
 তৃষিত শ্রবণে মোর শূন্যতে শূন্যতে
 কখন প্রভাত হ'ল নারিব জানিতে।

অনিলা। জান ত—জান ত, সখি, মানুষ্যের মন?
 যে কথা সে ভালবাসে শত শতবার তা সে
 ঘুরে ফিরে শূনিবারে চায় প্রতিক্ষণ।
 জানি ভালবাস তুমি, ললিতা, আমারে—
 তবু, সখি, প্রতিক্ষণে বড় সাধ যায় মনে
 বাহিরে সে প্রেমের প্রকাশ দেখিবারে।
 দু-দিনে নীরব প্রেম হয় পুরাতন।
 বিচিহ্নতা নাহি তায়, শ্রান্ত হয় মন।
 আদরতরঙ্গ-মালা নিয়ত যে করে খেলা,
 তাইতে দেখায় প্রেম নিয়ত-নতন।
 নিত্য নব নব উঠি আদরের নাম
 নিয়ত নবীন রাখে প্রণয়ের ধাম।
 আদর প্রেমের, সখি, বরষার জল—
 না পেলো আদর-ধারা হয় সে যে বলহারে,
 ভূমে নুয়াইয়া পড়ে মৃদু মৃদু বিকল।
 ওঁকি বালা, কেন হেন কাতর নয়ানে
 এক দৃষ্টে চেয়ে আছ ভূমিতল-পানে!
 হাসিতে হাসিতে, সখি, দুটা ক্ষুদ্র কথা
 কহিনু, তা'তেই মনে পেয়েছ কি ব্যথা?

ললিতা। [স্বগত] একা বসে ভাবিয়াছি কত—কতবার,
 কোন গুণ নাই মোর, কি হবে আমার?
 হা ললিতা! কি করিস্—দেখিস্ না চেয়ে?
 শুধু দুটা কথা হা—রে— পারিস্ না কহিবারে?
 দুটা আদরের কথা—বৃন্দীহীন মেয়ে!
 দেখিস্ না—দুটা কথা কহিলি না ব'লে,
 আদরের ধন তোর—প্রাণের সর্বস্ব তোর
 হারায়—হারায় বৃদ্ধি—যায় বৃদ্ধি চলে।
 শুধু দুটা কথা তুই কহিলি না ব'লে!
 কি কহিবি? হা অবোধ, ভাবনা কি তায়!
 মৃদুকণ্ঠে বল্ মন যা বলিতে চায়!
 মনের গোপন ধামে ডাকিস যে শত নামে
 সেই নাম মৃথ ফুটে ডাক্ রে তাহারে!
 একবার প্রাণ খুলে বল্ প্রাণেশ্বরে—
 'মোর প্রেম, চিন্তা, আশা সব তোমা-পরে';

নিষেধ নিগূণ বলে—নাথ—স্বামী—প্রভু,
 অসহায় অবলারে ত্যজিও না কভু!
 দিবস রজনী তুলি বদকে তারে রাখ তুলি,
 ‘ভালবাসি’ ‘ভালবাসি’ বল শতবার,
 আলিঙ্গনে বেঁধে বেঁধে হৃদয় তাহার!
 কিন্তু লজ্জা?—দূর হ রে—লজ্জা, দূর হ রে—
 বিষময় বাহু তোর বাঁধি বাঁধি শত ডোর
 জীর্ণ করিয়াছে মোর মন স্তরে স্তরে!
 আর না—আর না লজ্জা—দূর হ এখন!
 চূর্ণ চূর্ণ ভেঙ্গে আর ফেলিস না মন!
 শিথিল করে দে তোর শতেক বন্ধন-ডোর,
 মৃদুস্তের তরে মৃদু তুলি একবার—
 বন্ধনজঞ্জির মন শূন্য রে মৃদুস্ত ক্ষণ
 বাহিরে বাতাসে গিয়া বাঁচুক আবার!
 অনিল। আজি শূভদিনে ওকি অশ্রুবরিপাত?
 অশ্রুজলে কাটাবে কি ফুলশয্যা-রাত?

[কাননের অপর পার্শ্বে]

অভিমান করিয়া বিজয়ের প্রতি।

নলিনী। মিছে বোলোনাকো মোরে ভালবাস ভালবাস!
 নয়নেতে ঝরে বারি হৃদয়ে হৃদয়ে হাস!
 সারহীন—ভারহীন দুটা লঘু কথা বলে—
 হেসে দুটা মিষ্ট হাসি, দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলে,
 শূন্য রসিকতা করি দুই দণ্ড কাল হরি'
 সরলহৃদয় চাহ লভিবারে অবহেলে!
 অবশেষে আড়ালেতে কহ হাসি হাসি কত
 রমণীর ক্ষুদ্র মন লঘু তৃণটির মত!
 ভালবাসা খেলা নয়, খেলেনা নহে গো হৃদি,
 নারী বলে মন তার দলিতে সৃজে নি বিধি!
 ভাল যদি বাস, তবে ভালবাস প্রাণপণে—
 ক্ষুদ্র মনে ক'রে খেলা করিও না মোর সনে!
 হৃদয়ের অশ্রু ফেল দিবানিশি পদতলে,
 মিছা হাসিও না হাসি—কথা কহিও না ছলে!

বিজয়। কেন বালা, আমি ত লো দিনরাত্রি ভুলে
 অশ্রু ঢালিয়াছি তব প্রেমতরুমূলে,
 আজিও ত কিছুর তার হয় নিকো ফল,
 ব্যর্থ হইয়াছে মোর এত অশ্রুজল!

নলিনী। ওই যে সূর্য্যুচি হোথায় আছে,
 যাই একবার তাহার কাছে!

[দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া] দেখি নি এমন জ্বালা!
 হাত হতে খসি পড়েছে কোথায়
 বেল ফুলে গাঁথা বালা!

[সহসা উপরে চাহিয়া]

ওই দেখ হোথা কামিনী-শাখায়
ফুটেছে কামিনীগর্দল—
পাতাগর্দল সাথে দ্ব-চারিটি, সখা,
দাও-না আমারে তুলি!

বিজয়। কি পাইব পুরস্কার?
নলিনী। পুরস্কার?—মরি লাজে!

একটি কুসুম যদি ঠাই পায়
আমার অলকমাঝে—
একটি কুসুম নদীয়ে পড়ে যদি
এ মোর কপোল-পরে,
একটি পাপড়ি ছিঁড়ে পড়ে পায়ে
শুদ্ধ মদহৃৎের তরে,
ভুলে যদি রাখি একটি কুসুম
রচিত এ কণ্ঠহার—
তার চেয়ে বল আছে ভাগ্যে তব
আর কিবা পুরস্কার!

[বিজয়ের ফুল তুলিয়া দেওন ও তাহা
চরণে দলিয়া]

নলিনী । এই তব পুরস্কার !
 অনুগ্রহ করি এ চরণ দিয়া
 ফুলগুণি তব দিলাম দলিয়া,
 এই তব পুরস্কার !

বিজয় । আহা ! আমি যদি হতেন, সজনি,
একটি কুসুম ওর—
ওই পদতলে দলিত হইয়া
ত্যাগিতাম দেহ মোর !

[গাছের দিকে চাহিয়া নলিনীর
মৃদুস্বরে গান]

খেলা কর্—খেলা কর্—
তোরা কামিনী-কুসুমগদলি!
দেখ্, সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া
কুসুমগদলির চিবুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার—ফিরায়ে ও ধার
দইটি কপোল চুমে বার বার
মুখানি উঠায়ে তুলি!
তোরা খেলা কর্—তোরা খেলা কর্
কামিনী-কুসুমগদলি!
কভু পাতা-মাঝে লুকা রে মুখ,
কভু বায়ু-কাছে খুলে দে বুক—

মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ্ কভু নাচ্
 বায়ু-কোলে দুলি দুলি!
 দনু-দণ্ড বাঁচিবি—খেলা' তবে খেলা',
 প্রতি নিমেষেই ফুরাইছে বেলা,
 বসন্তের কোলে খেলা-শ্রান্ত প্রাণ
 ত্যোজিবি ভাবনা ভুলি!

অশোক।

[দূর হইতে দেখিয়া]
 ওই যে হোথায় নলিনী রয়েছে
 বসি বিজয়ের সাথে!
 কত কাছাকাছি!—কত পাশাপাশি!
 হাত রাখি তার হাতে!
 অসার হৃদয়, লঘু, হীন মন
 কোন গুণ নাই যার—
 শূন্য ধন দেখে বিকাবি, নলিনী,
 তারে দেহ আপনার?
 কতবার, প্রেম, যাস্ পলাইয়া
 ভয়ে ফুলডোর দেখি—
 ধনের সোনার শিকল হেরিয়া
 আজ ধরা দিলি একি?

সুরেশ।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাই না দেখিতে
 নলিনী কোথায় আছে।
 ওই যে হোথায় লতাকুঞ্জতলে
 বসিয়া বিজয়-কাছে!
 কি ভয় হৃদয়! জানি গো নিশ্চয়
 সে আমারে ভালবাসে,
 মন তার আছে আমারি কাছেতে
 থাকুক সে যার পাশে!

বিনোদ।

কথা শুনে তার—ভাব দেখে তার
 কতবার ভাবি মনে—
 নলিনী আমার—আমারেই বুঝি
 ভালবাসে সঙ্গোপনে!
 সত্য হয় যদি আহা!
 সে আশ্বাসবাণী, সে হাসি মধুর,
 সত্য যদি হয় তাহা!

নীরদ।

কে আমার সংশয় মিটায়!
 কে বলি দিবে সে ভাল বাসে কি আমার?
 তার প্রতি দৃষ্টি হাসি তুলিছে তরঙ্গরাশি
 এক মৃদুহৃৎকের শান্তি কে দিবে গো হয়!
 পারি নে পারি নে আর বহিতে সংশয়ভার,
 চরণে ধরিয়া তার শূন্যইব গিয়া,
 হৃদয়ের এ সংশয় দিব মিটাইয়া!
 কিন্তু এ সংশয়ও ভাল, পাছে গো সত্যের আলো

ভাঙে এ সাধের স্বপ্ন বড় ভয় গণি—
হানে এ আশার শিরে দারুণ অশনি!

[নলিনীর নিকট হইতে বিজয়ের দূরে গমন, ও নলিনীর
নিকটে গিয়া প্রমোদের গান]

অঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি
বিজন বনে, মালতীবাদা,
আছিস কেন ফুটিয়া?
শূন্যতে তোরে মনের ব্যথা
শূন্যতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া!

মলয় তব প্রণয়-আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাথা মুখানি!
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি-শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি!

নলিনী। [হাসিয়া] শূন্যিয়া ধীরে মালতীবাদা
কহিল কথা সুরভি-ঢালা,—
‘অঁধার বনে আছি গো ভাল,
অধিক আশা রাখি না!
তোদের চিনি চতুর অলি,
মনো-ভুলানো বচন বলি
ফুলের মন হরিয়া লয়ে
রাখিয়া যাস যাতনা!
অবলা মোরা কুসুমবাদা
সহিব মিছা মনের জ্বালা
চিরটি কাল, তাহার চেয়ে
রহিব হেথা লুকায়ে!
অঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভিরাশি,
অঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শূন্যকায়ে!’

[অশোকের নিকটে গিয়া]

অশোক, হোথায় দূরে কেন তুমি
দাঁড়াইয়া এক ধার?

কত দিন হ'ল আমার কাছেতে
 আস নি ত একবার!
 ভুলেছ যে প্রেম, ভুলেছ যে মোরে,
 তোমার কি দোষ আছে?
 এ মূখ আমার এ রূপ আমার
 পুরাতন হইয়াছে?
 ভাল, সখা, ভাল, প্রেম না থাকিলে
 আসিতে নাই কি কাছে?
 যেচে প্রেম কভু পাওয়া নাহি যায়,
 বন্ধুত্ব কি দোষ আছে?
 যদি সারাদিন রহিয়া তোমার
 প্রাণের রূপসী-সাথে
 কোনো সন্ধ্যাবেলা মৃদুভক্তির তরে
 অবকাশ পাও হাতে,
 আমাদের যেন পড়ে গো স্মরণে—
 এসো একবার তবে!
 দূ-চারিটা গান গাব সবে মিলি
 দূ-চারিটা কথা হবে!

অশোক । [স্বগত] পাষাণে বাঁধিয়া মন মনে করি যতবার
 কাছে তার যাবনাকো মূখ দেখিব না আর,
 তার মূখ হতে তিল আঁখি ফিরায়েছি যবে—
 দূরে যেতে এক পদ শূদ্ধ বাড়ায়েছি সবে,
 অমনি সে কাছে ঢ'লে দূ একটি কথা ব'লে
 পাষাণ প্রতিজ্ঞা মোর ধূলিসাৎ করিয়াছে!
 শূদ্ধ দুটি কথা ব'লে, একবার এসে কাছে!
 জানি না কি শূদ্ধ সে গো মন ভোলাবার কথা?
 সে হাসি—সে মিষ্ট হাসি—নিদারুণ কপটতা?
 জানে জানে সব জানে— তবু মন নাহি মানে,
 প্রতিবার ঘুরে ফিরে তবুও সে যায় তথা।
 জেনে শূনে তবু তার ভাল লাগে কপটতা,
 সেই মিষ্ট হাসি, সেই মন ভোলাবার কথা!
 যবে ভোলাবার তরে কপট আদর করে,
 মোর মূখপানে চেয়ে গাহে প্রণয়ের গীত,
 সাধ করে মন যেন হতে চায় প্রতারিত!
 হা হৃদয়! লঘু, নীচ, হীন—হীন অতি—
 খেলেনার 'পরে তোর এতই আরতি?
 কখনো না—কখনো না—হোক যা হবার,
 এই যে ফিরানু মূখ ফিরিব না আর!
 ধিক্—ধিক্—শিশু-হৃদি! ধিক্ ধিক্ তোরে—
 লজ্জার পাথারে আর ডুবাস্ নে মোরে!
 কপট রমণী এক, অধম, চপল,
 নিন্দার, হৃদয়হীন, অসার দুর্বল—

দূর্বল হাতে সে তার যেথা ইচ্ছা সেই ধার
 টলাইয়ে নড়াইবে এ মোর হৃদয় ?
 তৃণ—শব্দক পত্র এক—দূর্বলতা-ময় ?
 কাঁদাইবে, হাসাইবে— দূরে যেতে নাহি দিবে—
 নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবে প্রতিজ্ঞা আমার !
 ইচ্ছা, সাধ, চিন্তা, আশা— দঃখ, সঃখ, ভালবাসা
 সমস্ত রাখিবে চাপি পদতলে তার !
 শিকলি—পশুর সম— বাঁধিবে গলায় মম,
 মৃদুহৃৎ নাহিবে শক্তি মাথা তুলিবার—
 ধূলিতে পড়িবে লুটি এ মাথা আমার !
 হা হৃদয়, কি করিলি ? তুই কি উন্মাদ হলি ?
 সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসর্জন !
 ধন, মান, যশ, আশা— সখাদের ভালবাসা,
 লুটিতে শুধু কি এক নারীর চরণ ?
 নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার উঠিতে পড়িতে ?
 কাঁদিতে হাসিতে তার কটাক্ষে ইঞ্জিতে ?
 খেলেনা হইতে তার অঁকুটি-হাসির ?
 কেন এত গেলি গ'লে ! শুধু রূপ আছে বলে ?
 ক্ষণস্থায়ী জড়রূপ গঠিত মাটির !
 কুণ্ডিত-কুন্তল তার, আরক্ত কপোল,
 সুদীর্ঘ নয়ন তার কটাক্ষ বিলোল,
 তাই কি ত্যজিলি তুই সমস্ত সংসার ?
 জীবনের উদ্দেশ্য করিলি ছারখার ?
 সমস্ত জগৎ হাসে ধিক্ ধিক্ বলি—
 প্রতিক্ষণে আত্মগ্লানি উঠে জ্বলি জ্বলি—
 তবু তার পদতলে লুটাইবি গিয়া
 শুধু তার আঁখি দুটি সুদীর্ঘ বলিয়া ?
 কি মদিরা আছে, বালা, নয়নে তোমার !
 ফেলেছ বিহ্বল করি হৃদয় আমার !
 ফিরাও ফিরাও আঁখি— পাতা দিয়া ফেল ঢাকি—
 হৃদয়েরে দূরে যেতে দাও একবার !
 করেছি দারুণ পণ করিবারে পলায়ন,
 নিষ্ঠুর মধুর বাক্যে ফিরায়ে না আর !
 ও অনল হতে সাধ দূরে থাকিবার—
 ফিরায়ে না মোরে, সখি, ফিরায়ে না আর !

ষষ্ঠ সর্গ

কবি ও মুরলা

কবি। উন্মাদিনী, কল্লোলিনী—ক্ষুদ্র এক নিৰ্বরিণী
 শিলা হতে শিলান্তরে লুটিয়া লুটিয়া,
 নেচে নেচে, অটুহেসে, ফেনময় মৃদুকেশে
 প্রশান্ত হৃদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া!
 শূদ্র মৃদুভের তরে তিল বিচলিত করে
 সে প্রশান্ত সলিলের শূদ্র এক পাশ—
 উনমত্ত কোলাহল অধীর তরঙ্গদল
 মৃদুভের মাঝে সব পায় গো বিনাশ!
 দেখ, সখি, গৃহমাঝে দেখ গো চাহিয়া,
 নাচ, গান, বাদ্য হাসি— আমোদ কল্লোলরাশি—
 নিশীথপ্রশান্তি-মাঝে পড়িছে ঝাঁপিয়া!
 আলোকে আলোকে গৃহ উঠেছে মাতিয়া,
 স্ফটিকে স্ফটিকে আলো নাচে বিদ্যুতিয়া,
 শত রমণীর পদ পড়ে তালে তালে।
 চরণের আভরণ নেচে নেচে প্রতিফল
 শত আলোকের বাণ হানে এককালে,
 মৃচ্ছিয়া পড়িছে আলো হীরকে হীরকে!
 শতকৃষ্ণ আঁখিতারা হানিছে আলোকধারা—
 শত হৃদে পড়ে গিয়া ঝলকে ঝলকে!
 চারি দিকে ছুটিতেছে আলোকের বাণ,
 চারি দিকে উঠিতেছে হাসি বাদ্য গান।
 কিন্তু হেথা চেয়ে দেখ কি শান্ত যামিনী!
 কি শূদ্র জোছনা ভায়! কি শান্ত বহিছে বায়!
 কেমন ঘুমন্ত আছে প্রশান্ত তটিনী!
 বল, সখি, পূর্ণিমা কি আমোদের রাত?
 এস তবে দৃষ্ট জনে বসি হেথা এক সনে,
 করি আপনার মনে রজনী প্রভাত!

গান

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
 ধীরে ধীরে অতিধীরে—অতিধীরে গাও গো!
 ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
 রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুরকণ্ঠ মিলাও গো!
 নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
 নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
 নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
 অতি—অতি—অতিধীরে কর সখি গান!
 নিশার কুহক-বলে নীরবতাসিন্ধুতলে

মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর—
 প্রশান্ত সাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন
 অধীর-উচ্ছ্বাস-ময় সঙ্গীতের স্বর!
 তিটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
 বাতাসের মৃদুহস্ত-পরশে এগনি,
 ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
 সে চুম্বনধ্বনি শূনে চমকে আপনি!
 তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো,
 রজনীর কণ্ঠ-সাথে স্নকণ্ঠ মিলাও গো!

[মুরলার প্রতি]

কেন লো মলিন, সখি, মৃথানি তোমার?
 কাছে এস, মোর পাশে বোসো একবার!
 কেন, সখি, বল্ মোরে, যখন দেখেছি তোরে
 মাটি-পানে নত দুটি বিষণ্ণ নয়ান!
 আননের দুই পাশ অবশ্ব কুন্তলরাশ—
 করুণ ও মৃথখানি বড়, সখি, শ্লান!

মুরলা। সত্য শ্লান কি গো, কবি, এ মৃথ আমার?
 নিশীথবাতাস লাগি মনে কত উঠে জাগি
 নিস্তব্ধ জোছনারাতে ভাবনার ভার!

[স্বগত] আহা কি করুণ, সখা, হৃদয় তোমার!
 কবি গো! বুক যে যায়—ভেঙ্গে যায়, ফেটে যায়—
 অশ্রুজল রুধিবারে পারিনাক আর!
 পারি নে—পারি নে সখা, পারি নে গো আর!
 ভেঙ্গে বুঝি ফেলে তারা মর্ম্কারাগার!
 একবার পায়ে ধরে কেন্দ্রে নিই প্রাণ ভরে—
 একবার শুধু, কবি, শুধু একবার!
 যুঝিছে বুকের মাঝে শত অশ্রুধার!

কবি। একটি প্রাণের কথা রয়েছে গোপনে,
 বলিব বলিব তোরে করিতেছি মনে!
 আজ জোছনার রাতে বিপাশার তীরে
 কাছে আয়, সে কথাটি বলি ধীরে ধীরে!

মুরলা। কি কথা সে? বল কবি! করহ প্রকাশ!

কবি। কে জানে উঠেছে হৃদে কিসের উচ্ছ্বাস!
 খেলিছে মর্মের মাঝে অধীর উল্লাস!
 অথচ, উল্লাস সেই স্নকুমার হেন,
 শিশিরের বাষ্প দিয়ে গঠিত সে যেন!
 হৃদয়ে উঠেছে যেন বন্যা জোছনার,
 মধুর অশান্তিময় হৃদয় আমার।
 স্নকুমার আবরণ, গাথা সন্ধ্যামেঘস্তরে,
 পড়িয়াছে যেন মোর নয়নের 'পরে!
 কিছ, যেন দেখেও দেখে না আঁখিবয়,

সকলি অক্ষুট, যেন সন্ধ্যাবর্ণময়!
শোন্ বলি, মুরলা লো, আরো আয় কাছে—
শূন্য এ হৃদয় মোর ভাল বাসিয়াছে!

মুরলা। ভালবাসে? কারে কবি? কারে সখা? কারে?

কবি। মধুর নলিনী-সম নলিনী বালারে!

মুরলা। নলিনী? নলিনী সখা! নলিনী বালারে?

কবি মোর! সখা মোর! ভালবাস তারে?

কবি। হাঁ মুরলা, সেই নলিনী বালারে,

তারে তুমি জান না কি?

এমন মধুর মুখভাব তার?

এমন মধুর আঁখি!

এত রাশি রাশি খেলাইছে হাসি

হৃদয়ের নিরালায়—

নয়ন অধর ভাসাইয়া দিয়া

উথলি পড়িয়া যায়!

যে দিকে সে চায় হাসিময় চোখে

হাসি উঠে চারি ধার,

যে দিকে সে যায়—অধর মূছিয়া

চলে জ্যোতি-ছায়া তার!

তার সে-নয়ন-নিবর হইতে

হাসি স্খারশি করি,

এই হৃদয়ের আকাশ পাতাল

রেখেছে জোছনা করি!

মুরলা। [স্বগত] দেবি গো করুণাময়ী,
কোথা পাই ঠাই মা গো—কোথা গিয়ে কাঁদি!
দুর্বল এ মন দে মা পাশাগেতে বাঁধি!

[প্রকাশ্য] আহা, কবি, তাই হোক—সুখে তুমি থাক।
এ নব প্রণয়ে মন পূর্ণ করে রাখ!
নয়নের জল তব কিছতে মোছে নি,
হৃদয়-অভাব তব কিছতে ঘোচে নি—
আজ, কবি, ভালবেসে সুখী যদি হও শেষে,
আজ যদি থামে তব নয়নের ধার,
দেবতা গো, তাই করো! চিরজন্ম সুখী করো
কবিরে আমার, বাল্য-সখারে আমার!

কবি। মূছ অশ্রুজল, সখি, কেঁদো না অমন—

যে হাসির কিরণেতে পূর্ণ হ'ল মন

একেলা বিজনে বসি কবিরে তোমার

কাঁদিতে দেখিতে, সখি, হবে নাক আর!

আজ হতে মিলাবে না হাসি এ অধরে,

বিষন্ন হবে না মূখ মূহুর্তের তরে।

আয় সখি, আয় তবে, কাছে আয় মোর—

মুছাইয়া দিই আহা অশ্রুজল তোমার!

মুরলা । অশ্রু মদ্বায়ে না আর— বহুক যা বহিবার—
এখনি আপনা হতে থামিবে উচ্ছ্বাস!
এ অশ্রু মদ্বাতে, কবি, কিসের প্রয়াস!
ক্ষুদ্র হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ
আপনি সে জাগি উঠে— আপনি শূন্যায় ফুটে,
চেয়েও দেখে না কেহ উঠুক-পড়ুক!
এস সখা, ওই কাঁধে রাখি এই মূখ
একে একে সব কথা कह গো আমারে—
বড় ভাল বাস কি সে নলিনী বালারে?

কবি । শূন্য যদি বলি, সখি, ভাল বাসি তায়
এ মনের কথা যেন তাহে না ফুরায়।
ভালবাসা ভালবাসা সবাই ত কর,
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময়!
প্রতি কাজে প্রতি পলে সবাই যে কথা বলে
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয়!
মনে হয় যেন, সখি, এত ভালবাসা
কেহ করে বাসে নাই কারো মনে আসে নাই—
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষ্যের ভাষা!

মুরলা । তাই হোক, ভাল তারে বাস প্রাণপণে!
তারে ছাড়া আর কিছু না থাকুক মনে!

কবি । সে আমার ভালবাসা যদি না পুরায়!
যেই প্রেম-আশা লয়ে রয়েছি উন্মত্ত হয়ে,
বিশ্ব দেখি হাস্যময় যাহার মায়ায়,
যদি সখি, ফিরে নাহি পাই ভালবাসা—
শ্লিয়মাণ হয়ে পড়ে সেই প্রেম-আশা—
মৃদু মৃদু আশার সেই গুরু দেহভার
সমস্ত জগৎ-ময় বহিয়া বেড়াতে হয়—
শ্রান্ত হৃদি দিবানিশি করে হাহাকার!
অসুস্থ আশার সেই মৃদু মৃদু-নিশ্বাসে
যদি এ হৃদয় হয় শূন্য মরুভূমিময়,
হৃদয়ের সব বৃত্তি শূন্যকায় আসে—
দিনরাত্রি মৃত ভার করিয়া বহন
শ্লিয়মাণ হয়ে যদি পড়ে এই মন!

মুরলা । ও কথা বোলো না, কবি, ভেবোনাক আর;
নিশ্চয় হইবে পূর্ণ প্রণয় তোমার।
কি-জানি-কি-ভাবময় ওই তব মূখ—
ওই তব সুধাময়—প্রেমময়—স্নেহময়—
সুকুমার—সুকোমল—করুণ ও মূখ—
হাসি আর অশ্রুজলে মাখানো ও মূখ—
রাখিতে প্রাণের কাছে এমন কে নারী আছে
পেতে না দিবেক তার প্রেমময় বুক!

শত ভাব উথলিছে ওই আঁখি দিয়া,
 শত চাঁদ ওই খানে আছে ঘুমাইয়া—
 মদুছাইতে ও মধুর নয়নের ধার
 কোন্ নারী দিবেনাক আঁচল তাহার!
 মধুময় তব গান দিবারাত করি পান
 ঘুমাইয়া পড়িবে সে হৃদয়ে তোমার।
 বসি ওই পদমূলে মদুধ আঁখিপাতা তুলে
 দিন রাত্রি চেয়ে রবে ওই মদুখপানে
 সূর্যমুখী ফুল-সম অবাক নয়ানে!
 হেন ভাগ্যবতী নারী কে আছে ধরায়
 যেজন কবির প্রেম না চাহিয়া পায়!

[স্বগত] মুরলা রে, কোন আশা পূরিল না তোর—
 কাঁদে তুই অভাগিনী এ জীবন-ভোর!
 এ জনমে তোর অশ্রু মদুছাবে না কেহ,
 এ জনমে ফুটিবে না তোর প্রেম স্নেহ!
 কেহ শুনবে না আর তোর মর্ম্মব্যথা,
 ভালবেসে তোর বকে রাখিবে না মাথা!
 বড় যদি শ্রান্ত হয়ে পড়ে তোর মন
 কেহ নাহি কহিবারে আশ্বাসবচন!
 মাতৃহারা শিশু-মত কেঁদে কেঁদে অবিরত
 পথের ধুলার পরে পড়িবি ঘুমায়ে—
 একটি স্নেহের নেত্র দেখিবে না চেয়ে?

[নলিনীর প্রবেশ]

[দূর হইতে] কবি। পূর্ণিমারূপিণী বালা! কোথা যাও, কোথা যাও!
 একবার এই দিকে মদুখানি তুলিয়া চাও!
 কি আনন্দ ঢেলেছ যে, কি তরঙ্গ তুলেছ যে
 আমার হৃদয়মাঝে একবার দেখে যাও!
 দিবানিশি চায়, বালা, অধীর ব্যাকুল মন
 ও হাসি-সমুদ্র-মাঝে করে আত্মবিসর্জন!
 হেরি ওই হাসিময় মধুময় মদুখপানে
 উন্মত্ত অধীর হৃদি তিল দূর নাহি মানে—
 চায়, অতি কাছে গিয়া ওই হাত দুটি ধরি
 অচেতনে কাটাইয়া দেয় দিবা বিভাবরী!
 একটি চেতনা শূন্য জাগি রবে অনিবার—
 সে চেতনা তুমি-ময়—ওই মিষ্ট হাসি-ময়—
 ওই সূখামদুখ-ময়—কিছু—কিছু নহে আর!
 আমার এ লঘু-পাখা কল্পনার মেঘগর্দলি
 তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি—
 তোমার চরণ-জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ-পরে
 শত শত ইন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে!

তোমার প্রতিমা লয়ে কিরণে-কিরণে-ভরা
 উড়েছে কল্পনা, কোথা ফেলিয়ে রেখেছে ধরা!
 হরিত-আসন-পরে নন্দনবনের কাছে
 ফুলবাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে,
 ঘুমন্ত সে বসন্তের কুসুমিত কোল-পরে
 তোমারে কল্পনারাগী বসায়েছে সমাদরে—
 চারি দিকে জুইফুল চারি দিকে বেলফুল—
 ঘিরে ঘিরে রাহিয়াছে অজস্র কুসুমকুল,
 শাখা হতে নুয়ে পড়ে পরিশিয়া এলো চুল
 শতেক মালতীকলি হেসে হেসে ঢলাঢলি,
 কপালে মারিছে ঊর্ধ্বক, কপোলে পড়িছে ঝড়কি
 ওই মুখ দেখিবারে কোতূহলে সমাকুল,
 অজস্র গোলাপ-রাশি পড়িয়া চরণতলে
 না জানি কি মনোদুখে আকুল শিশিরজলে!
 তোমার প্রতিমা লয়ে কল্পনা এমনি করি
 খেলাইয়া বেড়াইছে, নাহি দিবা বিভাবরী—
 কভু বা তারার মাঝে কভু বা ফুলের 'পরে
 কভু বা উষার কোলে কভু সন্ধ্যামেঘস্তরে;
 কত ভাবে দেখিতেছে, কত ছবি আঁকিতেছে—
 প্রফুল্ল-আনন কভু হরষের হাসি-মাখা,
 অভিমান-নত আঁখি কভু অশ্রুজলে ঢাকা।
 কাছে এস, কাছে এস, একবার মুখ দেখি—
 তোল গো নলিনীবালা, হাসিভারে নত আঁখি!
 মর্মভেদী আশা এক লুকানো হৃদয়তলে,
 ওই হাতে হাত দিয়ে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
 বসন্তের বায়ু সেবি কুসুমের পরিমলে
 নীরব জোছনা রাতে বিপাশা তটিনীতীরে
 ফুলপথ মাড়াইয়া দোঁহে বেড়াইব ধীরে!
 আকাশে হাসিবে চাঁদ, নয়নে লাগিবে ঘোর,
 ঘুমময় জাগরণে করিব রজনী ভোর!
 আহা সে কি হয় সুখ! কল্পনায় ভাবি মনে
 বিহবল আঁখির পাতা মূদে আসে দূ-নয়নে!

মুরলা।

[স্বগত] হৃদয় রে!

এ সংসারে আর কেন রয়েছে আমরা?
 তুচ্ছ হতে তুচ্ছ আমাদেরো তরে আজ
 তিলমাত্র স্থান কি রে রাখিয়াছে ধরা
 এখনো কি আমাদের ফুরায় নি কাজ?
 হৃদয় রে! হৃদয় রে! ওরে দম্ব মন!
 আমাদের তরে ধরা হয় নি সৃজন!

কবি।

মুরলা লো! চেয়ে দেখ্—চেয়ে দেখ্ হোথা!
 বল্ দেখি এত হাসি এত মিষ্ট সুধারাশি
 হেন মুখ হেন আঁখি দেখেছিহু কোথা?

মুরলা । এমন সুন্দরী আহা কভু দেখি নাই—
 কবির প্রেমের যোগ্য আর কিবা চাই!
 কবিতার উৎস-সম ও নয়ন হতে
 ঝরিবে কবিতা তব হৃদে শত-স্রোতে!
 হাসিময় সৌন্দর্যের কিরণ-পরশে
 বিহঙ্গম-হৃদি তব গাহিবে হরষে—
 মধুর সঙ্গীতে বিশ্ব করিবে প্লাবন!
 সুখে থাকো পূর্ণ মনে, ভালবাসো প্রাণপণে
 প্রেমযোগ্য নারী যবে পেয়েছ এমন!

[স্বগত] কেন এত অশ্রু আজি করি বরিষণ
 কেন রে কিসের দুখ? কেন এত ফাটে বুক?
 কিসের যন্ত্রণা মর্ম্ম করিছে দংশন?
 কখনো ত কবির অমূল্য ভালবাসা
 অভাগিনী মনে মনে করি নাই আশা!
 জানিতাম চিরদিন, রূপহীন, গুণহীন,
 তুচ্ছ মুরলার এই ক্ষুদ্র ভালবাসা
 পূরাতে নারিবে তাঁর প্রণয়পিপাসা;
 মোরে ভালবেসে কবি সুখী হইবে না;
 তবু আজ কিসের গো, কিসের যাতনা!
 আজ কবি মূছেছেন অশ্রুবিরিধার,
 বহুদিনকার আশা পূরেছে তাঁহার!
 আহা কবি, সুখে থাকো—আর কিছুর চাই নাকো,
 এই মৃচ্ছিলাম অশ্রু, আর কাঁদিব না,
 কিসের যাতনা মোর, কিসের ভাবনা!

কবি । ওই দেখ্, ফুল তুলে আঁচলটি ভরি,
 কামিনীর শাখা লয়ে ওই দেখ্ ভয়ে ভয়ে
 অতি যত্নে রাখিয়াছে নোয়াইয়া ধরি,
 পাছে কুসুমের দল ভূঁয়ে পড়ে ঝরি!
 ওই দেখ্—উচ্চ শাখে ফুটিয়াছে ফুল,
 তুলিবার তরে আহা কতই আকুল!
 কিছুর্তে তুলিতে নারে কত চেষ্টা করি,
 শাখাটি ধরিয়া শেষে নাড়িছে মধুর রোষে,
 কুসুম শতধা হোয়ে পড়িতেছে ঝরি;
 বিফল হইয়া শেষে সখীদের কোলে
 ওই দেখ্ হেসে হেসে পড়িতেছে ঢলে!

মুরলা ।

[স্বগত]

আমি যদি হইতাম হাস্যোজ্জ্বলময়!
 নিৰ্ঝরিণী, বরষার নবোচ্ছ্বাসময়!
 হরষেতে হেসে হেসে কবির কাছেতে এসে
 ডুবাতেম ভালবেসে আদরে আদরে!
 যদি কভু দেখিতাম মৃহদন্তের তরে
 বিষাদ ছাইছে পাখা কবির অধরে,

হাসিয়া কত-না হাসি—ঢালিয়া সঙ্গীতরাশি,
 মৃদু অভিমান করি, মৃদু রোষভরে—
 মৃদু হেসে মৃদু কেন্দ্রে—বাহুতে বাহুতে বেঁধে
 দিতেম বিষাদভার সব দূর করে!
 কিন্তু আমি অভাগিনী ছেলেবেলা হতে
 এ গম্ভীর মূখে মম অন্ধকার ছায়া-সম
 রহিয়াছি সতত কবির সাথে সাথে!
 আমি লতা গুরুভার মেলি শাখা অন্ধকার
 হেন ঘন আলিঙ্গনে করোঁছি বেষ্টন,
 উন্নত মাথায় তাঁর পড়িতে দিই না আর
 চাঁদের হাসির আলো, রবির কিরণ!
 হা মূরলা, মূরলা রে—এমনি করেই হা রে
 হারালি—হারালি বৃষ্টি ভালবাসা ধন!
 বৃক, ফেটে যা রে, অশ্রু কর্ বরিষণ—
 কবি তোর অশ্রু-ধার দেখিতে পাবে না আর,
 যে কিরণে আছে ডুবি তাঁহার নয়ন!
 দুর্বল—দুর্বল হৃদি! আবার! আবার!
 আবার ফেলিস্ তুই অশ্রুবিরিধার?
 আবার আবার কেন হৃদয়দুয়ারে হেন
 পাষাণে পাষাণে গাঁথা—কে যেন হানিছে মাথা,
 কে যেন উন্মাদ-সম করে হাহাকার—
 সমস্ত হৃদয়ময় ছুটিয়া আমার।
 থাম্ থাম্, থাম্ হৃদি, মোছ্ অশ্রুধার!
 কবি যদি সুখী হয় কি ভাবনা আর!
 আহা কবি, সুখী হও! তুমি কবি সুখী হও!
 আমি কে সামান্য নারী?—কি দুঃখ আমার!
 তুমি যদি সুখী হও কি দুঃখ আমার!
 ও চাঁদের কলঙ্কও হতে নাই পারি
 এত ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ আমি নারী!

[চপলার প্রবেশ ও গান]

সখি, ভাবনা কাহারে বলে?

সখি, যাতনা কাহারে বলে?

তোমরা যে বল দিবস রজনী

ভালবাসা ভালবাসা,

সখি, ভালবাসা কারে কয়?

সে কি কেবলি যাতনাময়?

তাহে কেবলি চোখের জল?

তাহে কেবলি দুঃখের শ্বাস?

লোকে তবে করে কি সুখের তরে

এমন দুঃখের আশ?

জীবনের খেলা খেলিছে বিধাতা,

আমরা তাহার খেলেনা,
 আমাদের কিবা সুখ!
 সখি, আমাদের কিবা দুখ!
 সখি, আমাদের কিবা যাতনা!
 তোমাদের চোখে হেরিলে সলিল
 ব্যথা বড় বাজে বৃকে—
 তবু ত, সজনি, বৃষ্টিতে পারি নে
 কাঁদ যে কিসের দুখে!
 আমার চোখেতে সকলি শোভন—
 সকলি নবীন—সকলি বিমল—
 সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
 বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
 সকলি আমারি মত!
 কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
 হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
 না জানে বেদন, না জানে রোদন,
 না জানে সাধের যাতনা যত!
 ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
 জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
 হাসিতে হাসিতে আলোকসাগরে
 আকাশের তারা তেয়াগে কায়!
 আমার মতন সুখী কে আছে!
 আয় সখি, আয় আমার কাছে!
 সুখী হৃদয়ের সুখের গান
 শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ,
 প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
 একদিন নয় হাসিবি তোরা,
 একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
 সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা!

[মুরলার প্রতি]

এই যে আমার সখীর অধরে
 ফুটেছে মৃদুল হাসি,
 আয়, সখি, মোরা দুজনে মিলিয়া
 ললিতারে দেখে আসি।
 মালতী সেথায়—মাধবী সেথায়,
 সখীরা এসেছে সবে,
 এতখনে সেথা ফাটিছে আকাশ
 কমলার হাসি-রবে।
 চল্ সখি, চল্ তবে।

মুরলা।

সপ্তম সর্গ

অনিল ললিতা

অনিল।

[গাহিতে গাহিতে]

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি,
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না!
কখনো বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে, মন উঠে উঠে না!
রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না;
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজ-বাঁধ তবু টুটে টুটে না!
যখন ঘুমায়ে থাকি মৃথপানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না!
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না!
লাজময়ি! তোর চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে,
প্রেমবারিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না!

ললিতা।

[স্বগত]

পাষাণে বাঁধিয়া মন আজ করেছি নু পণ
কাছে যাব—কথা কব—যাচিব আদর আজ!
ওরে মন, ওরে মন, কার কাছে তোর লাজ?
আপনার চেয়ে যারে করেছি স্ আপনার
তার কাছে বল্ দেখি কিসের শরম আর?
অনিল। ফুল তুলিবার ছলে ওই যে ললিতা আসে,
মনে মনে জানা আছে এলেই আমার কাছে
অমনি হাতটি ধরি বসাব আমার পাশে।
অন্য দিক-পানে আমি চাহিয়া রহিব আজ,
দেখিব কেমন করি কোথা তার থাকে লাজ?

ললিতা।

[ফুল তুলিতে তুলিতে]

নাহয় বসিনু কাছে—কি তাহাতে দোষ আছে?
বসিব নাথের পাশে তাহাতে কি আসে যায়?
আর, লজ্জা—লজ্জা নয়—লজ্জারে করিব জয়—
নাহয় বসিনু কাছে কিসের শরম তায়!
কোথা লজ্জা—লজ্জা কোথা? এই ত বসিনু হেথা—
এই ত করিনু জয়, এই ত বসিনু কাছে—
বসিব নাথের পাশে কি তাহাতে দোষ আছে?
এখনো—এখনো মোরে দেখিতে পান নি তবে—
তবে কি গো আরো কাছে—আরো কাছে যেতে হবে?
আর নয়—আরো কাছে যাইব কেমন করে?
হেথা তবে বসে থাকি, মালাগদলি গঞ্জে রাখি,

এখনি ভাবনা ভাঙ্গি দেখিতে পাইবে মোরে!
 যদিবা দেখিতে পায় কি তবে করিবে মনে?
 যদি গো বুঝিতে পারে দেখিতে এসেছি তারে,
 মিছে মালা-গাঁথা ছলে বসে আছি এইখানে?
 অনিল। এই যে ললিতা হোথা—ফুরালো কি মালা গাঁথা?
 আরেকটু কাছে এসে নাহয় গাঁথিতে মালা!
 এই হেথা কাছে আয়—কিসের শরম তায়?
 কেমন গাঁথিলি ফুল একবার দেখি বালা!
 আদরিণী—আদরিণী—দেখি হাতখানি তোর!
 এমনি করিয়া সখি বাঁধ্ লো হৃদয় মোর!
 একবার দেখি সখি, কাছে আন্ মৃথখানি—
 এমনি করিয়া রাখ্ বৃকের মাঝারে আনি!
 কেন, লাজ এত কেন—আঁখি দুটি নত কেন?
 কি করেছি? একটি শব্দ চুম্বন বহিত নয়!
 আরেকটি এই লও—আরেকটি এই লও—
 আর নয় করিব না বড় যদি লাজ হয়!
 নাহয় কুম্ভল দিয়ে ঢেকে দিই মৃথখানি!
 দেখিতে আনন তোর ওই চন্দ্র ভাবে-ভোর
 এক দৃষ্টে চেয়ে, সখি, রয়েছে অবাক্ মানি!
 ওই দেখ্ তারাগুলি সহস্র নয়ন খুলি
 ওই মৃথটির তরে খুঁজিছে সমস্ত ধরা,
 উচিত কি হয় সখি তাদের নিরাশ করা?
 নয়নে নয়ন রাখি একবার মেল আঁখি,
 মিশাও কপোলে মোর ললিত কপোল তব;
 কথা কও কানে কানে, মৃদু প্রণয়ের গানে
 জাগাও ঘুমন্ত হৃদে সুখস্বপ্ন নব নব!
 মনে আছে সেই রাতে কত সাধনার পরে
 একটি সঙ্গীত, সখি, গিয়াছিলে গাহিবারে—
 আরম্ভ করেই সবে অমনি থামালে গীত,
 নিজের কণ্ঠের স্বরে নিজে হয়ে সচকিত!
 সেই আরম্ভের কথা এখনো রয়েছে কানে,
 সেই আরম্ভের সুর এখনো বাজিছে প্রাণে!
 সে আরম্ভ শেষ, বালা, আজিকে করিতে চাই!
 বড় কি হতেছে লাজ? ভাল সখি কাজ নাই!

ললিতা।

[স্বগত] কি কহিব? বড়, সখা, মনে মনে পাই বাথা,
 না জানি গাহিতে গান, না জানি কহিতে কথা!
 কত আজ বেছে বেছে তুলেছি কুসুম-ভার,
 কতখন হতে আজ ভেবেছি ভুলিয়া লাজ
 নিশ্চয় এ ফুলগুলি দিব তাঁরে উপহার!
 হাতটি এগিয়ে আজ গিয়েছিন্দু কতবার,
 অমনি পিছায়ে হাত লইয়াছি শতবার;
 সহস্র হউক লাজ, এ কুসুমগুলি আজ

নিশ্চয় দিব গো তাঁরে না হবে অন্যথা তার!
কিন্তু কি বলিয়া দিব? কি কথা বলিতে হবে?
বলিব কি—‘ফুলগদুলি যতনে এনেছি তুলি
যদি গো গলায় পর’ মালা গেঁথে দিই তবে’?
ছি ছি গো বলি কি করে—সরমে যে ঘাব ম’রে—
নাইবা বলিনু কিছু, শুধু দিই উপহার,
দিই তবে? দিই তবে? দিই তবে এইবার?
দূর হোক, কি করিব? বড় যে গো লজ্জা করে।
থাক্ গো এখন থাক্—দিব আরেকটু পরে!
কি হয়েছে? দিতে কি লো চাস্ ফুল-উপহার?
দে-না লো গলায় গেঁথে, কিসের শরম তার?
একটি দাও ত সখি, পরাই তোমার চুলে,
আর দুটি দাও সখি, পরাইব কণ-মূলে।
মোরে দাও সবগদুলি গাঁথিব ফুলের বালা,
গলায় দুলান্নে দিব গাঁথিয়া চাঁপার মালা;
আসন রচিয়া দিব দিল্লো শত শতদল,
তা হ’লে কি দিব মোরে—বল্ সখি, বল্ বল্—
যতগদুলি ফুল গাঁথি যত তার দল আছে
ততেক চুম্বন আমি লইব তোমার কাছে,
যত দিন না পারিব শূন্যে চুম্বন-ধার
এ ভুজে রহিব বন্ধ এই বন্ধকারাগার!
দিবানিশি সজ্জনি লো রেখে দেব চোখে চোখে,
বল্ তবে—ফুলসাজে সাজান্নে দেব কি তোকে?
বলিব না? ভাল সখি দুইটি চুম্বন দাও—
নাই একটি দিও, মহাঘর্ষ হল কি তাও?

ললিতা।

[স্বগত]

আরেকটি বার, সখা, কর গো চুম্বন মোরে—
আরেকটি বার, সখা, রাখ গো বুকিতে ধরে!
জান আমি মূখ ফুটে শরমে বলিতে নারি,
তাই কি সহিতে হবে? এত শাস্তি সখা তারি?
আদরে হৃদয়ে যদি রাখ এ মাথাটি মোর,
আদরে চুম গো যদি আঁখির পাতাটি মোর,
তাহাতে আমার, সখা, অসাধ কি হতে পারে?
তবে কেন ব্যথা দিতে শূন্যইছ বারে বারে?
আকুল ব্যাকুল হৃদি মিলিবারে তব পাশে
শতবার ধায়, সখা, শতবার ফিরে আসে!
দীন আপনারে হেরে এমন সে লাজ পায়
তোমার কাছেতে সখা সজ্জাচে না যেতে চায়,
সখা, তারে ডেকে নাও—তুমি তারে ডেকে নাও—
তোমারি সে মূখ চেয়ে দাঁড়াইয়া একধার,
একটু আদর পেলে স্বর্গ হাতে পাবে তার!

অনিল । ডুবিলে চতুর্থী চাঁদ বিপাশার নীরে,
 আয় সখি, আয় মোরা ঘরে যাই ফিরে ।
 অধারে কানন-পথ দেখা নাহি যায়,
 আর তবে আরো কাছে—আরো কাছে আয় ।
 হাতখানি রাখ্ মোর হাতের উপর,
 শ্রান্ত যদি হোস্ মোর কাঁধে দিস্ ভর ।
 দেখিস্, বাধে না যেন চরণ লতায়—
 আঁচল না ছিঁড়ে যায় গাছের কাঁটায় !
 চমকি উঠিলি কেন? কিছ্ নাই ভয়—
 বাতাসের শব্দ শুধ্, আর কিছ্ নয় !
 এই দিকে পথ, বালা, এই দিকে আয়,
 বাম পাশে বিপাশার স্রোত বহে যায় ।
 শ্রান্তি কি হতেছে বোধ? লজ্জা কেন প্রিয়ে?
 বেষ্টন কর না মোর স্কন্ধ বাহ্ দিয়ে !
 কিসের তরাস এত—ও কি বালা ও কি?
 ঝরিয়া পড়েছে শুধ্ শব্দক পত্র সখি !
 ওই গেল গেল চাঁদ, ওই ডোবে ডোবে—
 একটু জোছনারেখা এখনো যেতেছে দেখা,
 আর নাই—আর নাই—ওই গেল ডুবে !

অষ্টম সর্গ

মদুরলা ও চপলা

চপলা । দেখ্, সখি মোর, সত্য কহি তোরে
 প্রাণে বড় ব্যথা বাজে—
 চপলার কেহ সখী নাই হেথা
 এত বালিকার মাঝে !
 তোদের ও মুখ হেরিলে মলিন
 হৃদয় কাঁদিয়া উঠে,
 আকুল হইয়া শূধাবার তরে
 তাড়াতাড়ি আসি ছুটে ।
 শতবার করে শূধাই তোদের,
 কথা না কহিস্ তব্—
 ভাবিস চপলা অবোধ বালিকা
 কিছ্ সে বুঝে না কভু !
 চোখের জলের কাহিনী বুঝে না,
 বুঝে না সে ভালবাসা,

পড়িতে পারে না প্রাণের লিখন
 দুখের সুখের ভাষা!
 ভাল, সখি, ভাল, নাইবা বুঝিল
 তাহাতে কি যায় আসে?
 চপলা কি শুধু হাসিতেই জানে,
 কাদিতে কি জানে না সে?
 মরুলা আমার, তোরে আমি এত
 ভালবাসি প্রাণ ভরে—

তবু একদিন তোর তরে, সখি,
 কাদিতে দিবি নে মোরে?
 মরুলা । চপলাটি মোর, হাসিরাশি মোর,
 আমার প্রাণের সখি!
 নিজের হৃদয় নিজেই বুঝি না,
 অপরে তা বুঝাব কি?
 বাহাদের সুখে আমি সুখে রই
 সকলেই সুখী তারা—
 তবে কেন আমি একেলা বসিয়া
 ফেলি এ নয়নধারা?
 সকলেই যদি সুখে থাকে, সখি,
 আমি থাকিব না কেন?
 প্রমোদ তেয়াগি বিজনে আসিয়া
 কেন বা কাদিব হেন?
 নিজের মনেরে বুঝানু কতই,
 কিছুই না পেনু সাড়া—
 মরুলার কথা শুধাস্ নে আর,
 মরুলা জগত-ছাড়া!

চপলা । এত দিনে দেখি কবির অধরে
 হরষকিরণ জ্বলে—
 যেন আঁখি তার ডুবিয়া গিয়াছে
 সুখের স্বপনতলে!
 জোছনা উদিলে কুসুমকাননে
 একেলা ভ্রমিয়া ফিরে,
 ভাবে-মাতোয়ারা আপনার মনে
 গান গাহে ধীরে ধীরে।
 নয়নে অধরে মলয়-আকুল
 বসন্ত বিরাজ করে,
 মধুর অথচ উদাস হরষ
 ঘুমায় মুখের 'পরে!
 হেন ভাব কেন হেরি লো তাহার
 শুধাইব তোর কাছে।
 বড়ই সে সুখে আছে।

- মদুরলা । চপলা, সখি লো, দেখেছিস তারে?
 বড় কি সে সুখে আছে?
 কেমনে বদ্বিলাল বল্ তাহা বল্
 বল্ সখি মোর কাছে!
 বড় কি সে সুখে আছে?
- চপলা । হাঁ লো, সখি, হাঁ লো—শোন্ বলি তোরে—
 আয়, সখি, মোর পাশে—
 কবি আমাদের নলিনীবালারে
 মনে মনে ভালবাসে।
 সত্য কহি তোরে, নলিনীরে বড়
 ভাল নাহি লাগে মোর—
 শুনিয়াছি নাকি পাষণ হতেও
 মন তার সুকঠোর!
- মদুরলা । সে কি কথা বালা! মদুখখানি তার
 নহে কি মধুর অতি?
 নয়নে কি তার দিবস রজনী
 খেলে না মধুর জ্যোতি?
- চপলা । শুনোছি সে জ্যোতি আলোয়ার চেয়ে
 কপট, চপল নাকি—
 পথিকের পথ ভুলাবারি তরে
 জ্বলি উঠে থাকি থাকি!
 শুনোছি সে বালা সারাটি জীবন
 চাড়িয়া পাষণরথে
 চাকায় দলিয়া চলিবারে চায়
 হৃদয়-বিছানো পথে!
 শুনোছি সে নাকি একটি একটি
 হৃদয় গণিয়া রাখে—
 কি কুথনে, আহা, কবি আমাদের
 ভাল বাসিয়াছে তাকে!
- মদুরলা । চপলা, চপলা, পায়ে ধরি তোর,
 ক'স্ নে অমন করে।
 তুই লো বালিকা হৃদয় তাহার
 চিনিবি কেমন করে?
- চপলা । কে জানে, সজনি, বদ্বিহিতে পারি নে
 কেন যে হইল হেন—
 তাহারে হেরিলে মদুখ ফিরাইতে
 সাধ যায় মোর যেন?
 সেদিন যখন দেখিনু নলিনী
 বাসিয়া কবির সাথে,
 শরমের বেশে লাজহীন হাসি,
 খেলিছে আঁখির পাতে,

দেখিনু কপোল ঢাকিয়া তাহার
 অলক পড়েছে ঝুলি,
 আঁচলেতে গাঁঠ বাঁধি শতবার
 শতবার ফেলে ঝুলি,
 কে জানে আমার ভাল না লাগিল
 চলে এনু ত্বরা করে—
 কপট শরম দেখিলে, সজনি,
 শরমেতে যাই ম'রে!
 মুরলা আমার, অমন করিয়া
 কেন লো রহিলি বসি!
 দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া
 এসেছে ও মুখশশী!
 ভাবিস্ নে, সখি, কমলা করেছে
 কাল মোর কাছে এসে
 পাষাণহৃদয়া নলিনীও নাকি
 ভালবাসে কবিরে সে।
 শুনোছি নলিনী কবিরে দেখিতে
 নদীতীরে যায় নাকি।
 কবিরে দেখিলে ঢ'লে পড়ে তার
 অনুরাগ-নত আঁখি।

মুরলা। নলিনীবালারে ভালবেসে যদি
 কবি মোর সুখে থাকে
 তাহা হলে, সখি, বল্ দেখি মোরে
 কেন না বাসিবে তাকে?
 মোরা তাহা লয়ে ভাবি কেন এত?
 চপলা লো, আমরা কে?

চপলার গান

যে ভাল বাসুক—সে ভাল বাসুক—
 সজনি লো, আমরা কে!
 দীনহীন এই হৃদয় মোদের
 কাছেও কি কেহ ডাকে?
 তবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
 কে কাহারে ভালবাসে,
 আমাদের কিবা আসে যায় বল
 কেবা কাঁদে, কেবা হাসে!
 আমাদের মন কেহই চাহে না,
 তবে মনখানি লুকান' থাক্,
 প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
 যদি, সখি, কেহ ভুলে
 মনখানি লয় তুলে,
 উলটি-পালটি দৃ-দৃন্ড ধরিয়্যা

পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদারুণ উপেক্ষায়!
কাজ কি লো, মন লুকান' থাক্,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্!

নবম সর্গ

নলিনী ও সখীগণ

নলিনী।

[গাহিতে গাহিতে]

কি হল আমার? বুঝি বা সজনি
হৃদয় হারিয়েছি!

প্রভাতকিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে—
সহসা, সজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা, সজনি, দেখিনু চাহিয়া
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয়মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি!

পথের মাঝাতে খেলাতে খেলাতে
হৃদয় হারিয়েছি!

যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!
তার 'পর দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে—
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!

আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহে নি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহে নি ভ্রমরচরণ-ভর!

চিরদিন সখি বাতাসে খেলিত,
জোছনা-আলোকে নয়ন মেলিত,
হাসিপরিমলে অধর ভরিয়া
লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া
ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে—
কাছে এলে তারে দিত না বসিতে—

সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি।
এখনো যদি গো খুঁজিয়া পাই
এখনো তাহারে কুড়ায়ে আনি—
এখনো তাহারে দলে নাই কেহ,
আমার সাধের কুসুমখানি।
এখনো, সজনি, একটি পাপড়ি
ঝরে নি তাহার জানি লো জানি।
শুধু হারায়েছে, খুঁজিয়া পাইলে
এখনি তাহারে কুড়ায়ে আনি।
ত্বরা কর্ তবে, ত্বরা কর্ তোরা,
হৃদয় খুঁজিতে যাই—
শুকাবার আগে ছিঁড়িবার আগে
হৃদয় আমার চাই!

[সখীদের প্রতি]

বিপাশাতীরের পথে, সখি, আয়
আয়, ত্বরা করে আয়!
জানিস্ কি, সখি, নদীতীরে কবি
কখন বেড়াতে যায়?
জানিস্ ত, সখি, পথের ধারেতে
একটি অশোক আছে,
বনলতা কত ফুলে ফুলে ভরা
উঠিয়াছে সেই গাছে—
সেই খানে, সখি, সেই গাছতলে
বসিয়া থাকিতে হবে।
সেই পথ দিয়া যাইবে ত কবি?
আয় ত্বরা করে তবে।
বল্ দিখি তোরা হল কি আমার!
যখন কবির সন্মুখে থাকি
একটিও কথা পারি নে বলিতে,
পারি নে তুলিতে আনত আঁখি!
কতবার, সখি, করিয়াছি মনে
পরিহাস করি কহিব কথা—
নিদারুণ হাসি হাসিয়া হাসিয়া
হৃদয়ে হৃদয়ে দিব গো ব্যথা,
কৃষ্ণ-হীরা সম কৃষ্ণ আঁখি-তারা
আঁধার-আগার হতে আলো-ধারা
হানিবে হেথায়, হানিবে হোথায়
আকুলিয়া দশ দিশ—
মুদরিয়া তার পড়িবেক মন,
মুদিয়া আসিবে অবশ নয়ন,

যতই ঢালিব এ অধর হতে
 মিষ্ট সুধাময় বিষ!
 কিন্তু কি করে সে চেয়ে থাকে, সখি,
 না জানি নয়নে কি আছে জ্যোতি!
 এমন সে গান গায় ধীরে ধীরে,
 কথা কয়, সখি, মৃদুল অতি—
 মুখেতে আমার কথা নাহি ফুটে,
 চাহিতে পারি নে আঁখির পানে,
 হাসির লহরী খেলে না অধরে,
 নয়নে তড়িৎ নাহিক হানে!
 আয় ঘুরা করে—বেলা হয়ে এল,
 অস্তাচলে যায় রবি,
 পথের ধারেতে বসি রব' মোরা
 সেই পথে যাবে কবি!

দশম সর্গ

মুরলা

যার কোন রূপ নাই, যার কোন গুণ নাই,
 তবুও যে হতভাগ্য ভালবাসে মনে,
 দুই দিন বেঁচে থাকে, কেহ নাহি জানে তাকে,
 ভালবাসে, দুঃখ সহ্যে, মরে গো বিজনে!
 ক্ষুদ্র তৃণফুল এক জন্মে অন্ধকারে,
 দুই দণ্ড বেঁচে থাকে কীটের আগার;
 শুকায়ে পড়ে সে নিজ কাঁটার মাঝারে,
 নিজের কাঁটার মাঝে সমাধি তাহার।
 কি কথা কোন্ রে তুই অকৃতজ্ঞ মন!
 স্নেহময় দয়াময় কবি সে আমার,
 এই তৃণফুলেরে কি করে নি যতন?
 এরেও কি রাখে নাই হৃদয়ে তাহার?
 ছেলেবেলা হতে মোরে রেখেছেন পাশে।
 যখন পূরিত মন নব গীতোচ্ছ্বাসে
 আমারেই তাড়াতাড়ি শুনাতেন তিনি,
 এত তাঁর ছিল সঙ্গী আছিল সঙ্গিনী!
 এত যে পাইনু, তাঁরে কি পারিনু দিতে?
 মুরলার যাহা কিছু ছিল—ভালবাসা—
 ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা!
 একটু পারি নি তাঁরে সান্ধনা করিতে,

মূছাই নি এক বিন্দু নয়নের ধার—
 যাহা কিছু সাধ্য ছিল করেছি আমার!
 আমি যদি না হতেন বাল্যসখী তাঁর,
 নলিনীবালারে যদি পেতেন সঞ্জিনী,
 করিতে হত না তাঁরে এত হাহাকার—
 কতই না সুখী আহা হতেন গো তিনি!
 বিধাতা! বিধাতা! যদি তাই গো করিতে!
 মূরলা জন্মিল কেন নলিনী থাকিতে!
 এখনো কেন গো তার হয় না মরণ?
 এ সংসারে মূরলারে কার প্রয়োজন?
 ওই আসিছেন কবি!—এস কবি!—এস কবি!
 একবার অতি কাছে এস মূরলার!
 তুমি যবে কাছে থাক কবি গো আমার—
 আপনারে ভুলে যাই— ওই মূখপানে চাই
 তোমা ছাড়া কিছু মনে নাহি থাকে আর!
 তুমি যবে দূরে থাক, কবি গো, তখন
 আপনারি ক্ষুদ্র দুঃখে থাকি অচেতন!
 বড় যে দুর্বল দীন মূরলা তোমার!
 যদ্বিতে মনের সাথে পারে না সে আর!
 থেকো না, থেকো না দূরে থেকো না গো প্রভু,
 মূরলারে ত্যাগ করে যেও না গো কভু!
 শ্রান্ত ক্লান্ত অতি দীন— বলহীন রক্তহীন
 ধূলায় লুণ্ঠিত এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
 তোমার মনের ছায়ে দেহ এরে স্থান!
 আমারে লুকায়ে রাখ প্রসারিয়া পাখা,
 তোমারি বন্ধুর কাছে রব আমি ঢাকা!
 নহিলে দুর্বল এই দীন অসহায়
 পথ হারাইয়া কোথা ভ্রমিয়া বেড়ায়?
 তুমি, কবি, ছিলে নাকো—একেলা বিজনে
 নিজ হাতে বসি হেথা দুঃখের কণ্টকলতা
 রোপিতেছিলাম, কবি, আপনারি মনে।
 তাই নিয়ে অনুক্ষণ যেন আদরের ধন
 আত্মদাহী কল্পনায় খেলায়েছি কত,
 যতনে ঢেলেছি তার অশ্রুধারা শত,
 এবে প্রতি মূল তার হৃদয়ের চারি ধার
 দংশে শত বাহু মেলি বৃশ্চিকের মত!
 তুমি, সখা, এস কাছে—মরিতেছি জ্বলি—
 ও চরণ দিয়ে কবি ফেল সব দলি—
 প্রতি শাখা—প্রতি পত্র—প্রতি মূল তার!
 এস কবি বল দাও— এ হৃদয়ে বল দাও—
 আর কভু বর্ষিব না অশ্রুবারিধার!

[কবির প্রবেশ]

কবি। সকাল হইতে, মদুরলা সখি লো,
 খুঁজিয়া বেড়াই তোরে,
 বড়ই অধীর-হরষে আমার
 হৃদয় গিয়েছে ভরে।
 পারি নে রাখিতে প্রাণের উচ্ছ্বাস,
 আকুল ব্যাকুল করিতে প্রকাশ,
 অধীর হইয়া সকাল হইতে
 খুঁজিয়া বেড়াই তোরে।
 তোরে না कहিলে হৃদয়ের কথা
 মন শান্তি নাহি মানে;
 কেন, সখি, তুই বসে রয়েছিস্
 একা একা এই খানে?
 দেখ, সখি, আজ গিয়েছিনু আমি
 প্রমোদকাননে তার,
 গাছের ছায়াতে আপনার মনে
 বসেছিনু একধার।—
 মদুরলা, হেথায় অন্ধকার ঘোর,
 দেখিতে পাই নে মুখখানি তোর,
 এত অন্ধকার ভাল নাহি লাগে,
 ওই খানে যাই উঠে।
 ওখানে পড়েছে রবির কিরণ,
 সমুখে সরসী হাসিছে কেমন,
 গাছের উপরে শাখা শাখা ভরে
 বকুল রয়েছে ফুটে।
 এই খানে আয়, এই খানে বোস্!
 শোন্ সখি তার পরে—
 গাছের তলায় ছিলাম বসিয়া
 মগন ভাবনা-ভরে।
 গীতস্বর শুনি চমকি উঠিনু,
 শুনিনু মধুর বাঁশরী বাজে।
 গীতের প্লাবনে আকাশ পাতাল
 ডুবিয়া গেল গো নিমেষমাঝে।
 আকাশব্যাপিনী জোছনার, সখি,
 মরমে মরমে পশিল গান!
 পৃথিবী-ডুবান' জোছনারে, সখি,
 ডুবায়ে দিল সে মধুর তান!
 একটি একটি করি কথা তার
 পশিতে লাগিল শ্রবণে যত,
 শোণিত লাগিল উঠিতে পড়িতে,
 হৃদয় হইল পাগল-মত।

একটি একটি একটি করিয়া
 গাঁথিতে লাগিনু কথা,
 গান গাওয়া তার ফুরাল' যখন
 ফুরাল' আমার গাঁথা।
 মুরলা, সখি লো, বল্ দেখি মোরে
 কি গান গাহিতেছিল মধুস্বরে
 বিশ্ব করি বিমোহিত!
 আমারি রচিত—আমারি রচিত—
 আমারি রচিত গীত!
 মুরলা, সখি লো, বল্ দেখি মোরে
 কে গান গাহিতেছিল মধুস্বরে
 উনমাদ করি মন!
 আমারি নলিনী—আমারি নলিনী—
 আমারি হৃদয়ধন।
 সখি, মোর সেই মনের কথা,
 সখি, মোর সেই গানের কথা,
 দিয়াছে মাজিয়া তার স্বর দিয়া—
 প্রতি কথা তার উঠে উজলিয়া
 মেঘে রবিকর যথা।
 শূনিবি কি গান গাহিতেছিল সে
 অমৃতমধুর রবে?
 শোন' মন দিয়ে তবে।

গান

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার?
 ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙে গেল—গেল বুক—
 যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর!
 তোমার সৌন্দর্য্যভারে দুর্ব্বল হৃদয় হা রে
 অভিভূত হয়ে যেন পড়েছে আমার!
 এস তবে হৃদয়েতে, রেখেছি আসন পেতে—
 ঘুচাও এ হৃদয়ের সকল আঁধার!
 তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার—
 না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
 নাই বা দিলে তা বালা, থাক' হৃদি করি আলা,
 হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার!

একাদশ সর্গ

অনিল

অনিল।

কিছুই ত হল না!

সেই সব—সেই সব— সেই হাহাকাররব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা!

কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা-কিছু চাই!

ভাল ত গো বাসিলাম—ভালবাসা পাইলাম,
এখনো ত ভালবাসি—তবুও কি নাই!

তবুও কেন রে হৃদি শিশুর মতন
দিবানিশি নিরজনে করিছে রোদন!

মনোমত হয় নি বা যা কিছু পেয়েছে,
সকলেরি মাঝে বৃষ্টি অভাব রয়েছে!

আশ মিটাইয়া বৃষ্টি ভালবাসি নাই,
ভালবাসা পাই নি বা যতখানি চাই!

যেন গো যাহার তরে মন ব্যগ্র আছে
অশরীরী ছায়া তার দাঁড়াইয়া কাছে;

দুই বাহু বাড়াইয়া করি প্রাণপণ

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে করি আলিঙ্গন—

ছায়া শূন্য—ছায়া শূন্য হৃদয় না পূরে—

তা চেয়ে রহে না কেন শত ক্রোশ দূরে?

আমার এ উদ্ধবাসে পিপাসিত মন

নাহি অনুভবে তার হৃদয়স্পন্দন।

মন চায় হাতে তার রাখি মোর হাত

বুকে তার মাথা রাখি করি অশ্রুপাত!

সেই ত ধরিনু হাত বুকে মাথা রাখি,

দৃঢ় আলিঙ্গন তারে করি থাকি থাকি—

কিন্তু এ কি হল দায়, এ কিসের মায়া?

কিছু না ছুঁইতে পাই, ছায়া সব ছায়া!

তাই ভাবি, মন মোর যা কিছু পেয়েছে

সকলেরি মাঝে বৃষ্টি অভাব রয়েছে!

তৃষিত হৃদয় চায় ভালবাসা যত

ললিতা ফিরায়ে বৃষ্টি দেয় নাকো তত!

আমি চাই এক সূরে দুই হৃদি বাজে,

আবরণ নাহি রয় দুজনার মাঝে!

সমুদ্র চাহিয়া থাকে আকাশের পানে,

আকাশ সমুদ্রে চায় অবাক্ নয়ানে,

তেমনি দৌহার হৃদি হেরিবে দৌহার—

পড়িবে উভের ছায়া উভয়ের গায়!

কিন্তু কেন, ললিতার এত কেন লাজ!

এত কেন ব্যবধান দুজনার মাঝে?
মিলিবার তরে যাই হইয়া অধীর,
মাঝেতে কেন রে হেন লৌহের প্রাচীর?
আমি যাই তাড়াতাড়ি করিতে আদর,
তারে হেরে উল্লাসেতে নাচে গো অন্তর,
মিলিবারে অর্ধপথে সে আসে না ছুটে—
তার মূখে একটিও কথা নাহি ফুটে!
জানি গো ললিতা মোরে ভালবাসে মনে,
যাতে আমি ভাল থাকি করে প্রাণপণে—
কিন্তু তাহে কিছুতেই তৃপ্ত নহে প্রাণ!
দুজনার মাঝে কেন এত ব্যবধান?
যেমন নিজের কাছে লাজ নাহি থাকে
তেমনিই মনে কেন করে না আমাকে?
কিছুই গো হল না!
সেই সব, সেই সব— সেই হাহাকাররব
সেই অশ্রুবারিধারা হৃদয়বেদনা!

[ললিতার প্রবেশ]

ললিতা। কেন গো বিষণ্ণ হেরি নাথের বদন?
না জেনে কি দোষ কিছু করেছি এমন?
একবার কাছে গিয়ে ধরি দুটি হাত
শুধাব কি—‘হয়েছে কি? অবোধ ললিতা সে কি
না বন্ধে হৃদয়ে তব দিয়েছে আঘাত?’
সেদিন ত শুধালেন নাথ যবে আসি
‘একবার বল ত রে ভাল কি বাসিস মোরে?’
মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলাম ‘নাথ, ভালবাসি!’
একেবারে সব লজ্জা দিন বিসর্জন,
বন্ধে তাঁর মুখ রেখে করেছি রোদন—
কাঁদিয়ে কহেছি কথা, জানায়েছি সব ব্যথা
যত কথা রুদ্ধ ছিল মরমতলেতে,
এত দিন বলি বলি পারি নি বলিতে!
সেদিন ত কোন লজ্জা ছিল নাকো আর,
কিন্তু গো আবার কেন উদিল আবার!
হেথায় দাঁড়ায়ে আমি রহি এক ধারে—
এখনি দেখিতে নাথ পাবেন আমারে!
ডাকিলেই কাছে গিয়ে সব লজ্জা বিসর্জিয়ে
একেবারে পায়ে ধরে কেঁদে গিয়ে কব,
‘বল নাথ, কি করেছি? কি হয়েছে তব?’

অনিল। এমন বিষণ্ণ হয়ে বসে আছি হেথা
তবুও সে দূরে আছে— তবুও সে এল না কাছে,
তবুও সে শুধালে না একটিও কথা!
পাশাপাশি বসে গড়া এ লজ্জা তাহার

প্রেমবারিষার নদী ভাঙিতে নারিল যদি,
 দয়াতেও ভাঙিবে না হেরি অশ্রুধার?
 লজ্জার একাধিপত্য যে নিষ্ঠুর মনে,
 প্রেম দয়া যে হৃদয়ে বাস করে ভয়ে ভয়ে,
 চরণে শৃঙ্খল বাঁধা লজ্জার শাসনে—
 অনিল, কি করিবি রে লয়ে হেন মন?
 তুই চাস মুখে তোর হেরিলে বিবাদ ঘোর
 অশ্রুজলে অশ্রুজল করিবে বর্ষণ!
 কত না আদরে তোর মুছাবে নয়ন!
 তুই কি চাস রে হেন পাষণমুরতি
 দূরে দাঁড়াইয়া রবে— একটি কথা না কবে,
 সাম্বন্যের তরে যবে তুই ব্যগ্র অতি?
 হায় রে অদৃষ্ট মোর, কিছই হল না—
 সেই সব, সেই সব— সেই হাহাকাররব
 সেই অশ্রুবারিধারা হৃদয়বেদনা!

[অনিলের বেগে প্রস্থান]

ললিতা।

[স্বগত]

নয়নে আঁধার হেরি, ঘুরিছে সংসার,
 মা গো মা—কোথায় মা গো—পারি নে মা আর!

[বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া]

গেলে তবে গেলে চলি নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর—
 ললিতা যে এক ধারে দাঁড়ায়ে রয়েছে হা রে
 একটু আদর-তরে হয়ে তুষাতুর!
 কখন ডাকিবে বলে আছে মুখ চেয়ে,
 একটু ইঙ্গিতে পায়ে পড়িত গো ধৈয়ে—
 দেখেও, দেখেও তারে গেলে গো চলিয়া?
 একবার ডাকিলে না ললিতা বলিয়া?
 দোষ কি করেছি কিছু সখা গো আমার?
 তার লাগি কেন না করিলে তিরস্কার?
 একবার চাহিলে না, ফিরেও গো দেখিলে না,
 এমন কি অপরাধ পারি করিবারে?
 তবে কেন, কেন, নাথ, বল নি আমারে?
 যদি সখা, পায়ে ধ'রে শত-শতবার ক'রে
 শূধাই গো, বলিবে কি, কি দোষ করেছি?
 অভাগিনী যদি, নাথ, যদি ম'রে যাই—
 মরণশয্যায় শূয়ে শেষ ভিক্ষা চাই,
 চরণদুখানি ধুয়ে শেষ অশ্রুজলে,
 দুখিনী ললিতা তব কোঁদে কোঁদে বলে,
 তবুও কি ফিরিবে না? তবুও কি চাহিবে না?
 তবুও কি বলিবে না কি দোষ করেছি!
 তবুও কি সখা তুমি যাইবে চলিয়া?
 একবার ডাকিবে না 'ললিতা' বলিয়া?

দ্বাদশ সর্গ

নলিনী বিজয় বিনোদ প্রমোদ অশোক সুরেশ নীরদ ও অনিল
সুরেশ। যাইতে বলিছ বালা, কোথা যাব আর ?

দিশির্বাদিক হারাইয়া, ও রূপ-অনলে গিয়া
এ পতঙ্গ পাখা দুটি পুড়িয়েছে তার !
রূপসী, ক্ষমতা আর নাই উড়িবার !

নলিনী। রূপ কিছুর মোর না যদি থাকিত

বড় হইতাম সুখী,
দেখিতাম যত পতঙ্গ তোমরা
আসিতে কি লোভ দেখি !
রূপ—রূপ—রূপ—পোড়া রূপ ছাড়া
আর কিছুর মোর নাই ?

তোমাদের মত পতঙ্গের দল
চারি দিকে ঘিরে করে কোলাহল,
দিবস রজনী করে জ্বালাতন
ঝাঁপিয়ে পড়ে গো, না মানে বারণ—
পোড়া রূপ থেকে এই যদি হল
হেন রূপ নাহি চাই !

হেন কেহ নাই হয়
শুদ্ধ ভালবাসে নলিনীবালারে,
আর কিছুর নাহি চায় !

[অশোকের প্রতি]

এই যে অশোক ! ওই দেখ সখা—
দিবে কি আমারে দিবে কি তুলে
বন্ধ হতে মোর ফুল উড়ে গিয়ে
পড়েছে তোমার চরণমূলে !
যদি সখা ওটি রাখিতে চাও
তোমারি কাছেতে রাখিয়া দাও—
দুদণ্ডেই ওটি যাইবে শুকায়ে,
শুকায়ে গেলেই দিও গো ফেলে !
যতখন ওটি নাহি পড়ে ঝরে
ততখনো যদি মনে রাখ মোরে,
ততখনো যদি না থাক ভুলে,
তা হলেও সখা বড় ভাগ্য মানি
চিরকাল মনে সে কথা রবে !
যদি সখা নাহি লইতে চাও
এখনি ভূতলে ফেলিয়া দাও,
চরণে দলিয়া ফেল গো তবে !
কত শত হেন অভাগা কুসুম

আপনি পড়েছে চরণে আসি,
কত শত লোক চেয়েও দেখে নি,
চরণে দলিয়া গিয়াছে হাসি!
তবে আর কেন, ফেল গো দলিয়া—
কিসের শরম আমার কাছে?
যে কুসুম, সখা, শাখা হতে ঝরে
চরণের নীচে পড়ে সাধ করে,
কে না জানে বল তাহার কপালে
চরণে দলিয়া মরণ আছে!

[নীরদের প্রতি]

এই যে নীরদ, এনেছ গাঁথিয়া
গোলাপ ফুলের হার!
ভুলে গেছ কেন বাছিয়া ফেলিতে
কাঁটাগুলি, সখা, তার?
তবে গো পরায়ে দাও—
নাহয় কাঁটায় ছিঁড়িবে হৃদয়,
নাহয় এ বুক হবে রক্তময়,
এনেছ গাঁথিয়া গোলাপ যখন
তবে গো পরায়ে দাও!
কতই না কাঁটা বিধিয়াছে হেথা
রাখিতে গোলাপ বৃকের কাছে,
জ্বলুক্ হৃদয়—বহুক্ শোণিত—
তা বলে গোলাপ ফেলিতে আছে?

[প্রমোদের প্রতি]

চাই নে তোমার ফুল-উপহার,
যাও—হেথা হতে যাও!
দুটি ফুল দিয়ে, ফুলবিনিময়ে
হাসি কিনিবারে চাও!
নলিনী, নলিনী, কেন রে হালি নি
পাষণকঠিন-মন?
দুটো কথা শুন, দুটো ফুল পেয়ে
ভাঙ্গে কেন তোর পণ?
পলকে পলকে ভাঙ্গিস গড়িস—
ভাঙ্গে যায় মৃদু শ্বাসে,
যার 'পরে তুই করিস লো মান
সেই মনে মনে হাসে!
দেখি আজ তুই কেমন পারিস
থাকিবারে অভিমানে?

কহিস নে কথা, হাসিস নে হাসি,
 চাহিস নে তার পানে!
 বিনোদ। একাটি কথাও কহিল না মোরে,
 পাশ দিয়া গেল ঢলি!
 গম্বভারগদরু প্রতি পদক্ষেপে
 মরমে মরমে দলি।
 কেন গো, কেন গো—কি আমি করেছি—
 কিছুর ত না পড়ে মনে!
 কহেছে ত কথা প্রমোদের সাথে,
 অশোক নীরদ-সনে!
 গেল যে হৃদয়—কত দিন আর
 রবে সে এমন করি
 কখনো উঠিয়া আকাশের 'পরে
 কখনো পাতালে পড়ি!

অনিল। [দূর হইতে দেখিয়া]
 না জানি কিসের জ্যোতি নয়নে আছে গো বালা!
 যে দিকে চাহিয়া দেখ সে দিক করিছ আলা।
 অন্ধকারভেদী এক হাসিময় তারা-সম
 প্রাণের ভিতর-পানে চাহিয়া রয়েছ মম!
 ফিরায়ে লইনু মুখ, তবুও কেন গো দেখি
 চাহিছে হৃদয়-পানে দুটি হাসিমাখা আঁখি!
 আঁখি দুদি, তবু কেন হেরি গো প্রাণের কাছে
 দুটি আঁখি চেয়ে আছে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে!
 হেথা না পাইবি ঠাই—দূর হ তুই রে তারা—
 চন্দ্রমা জোছনা করি এ হৃদি রেখেছে ভরি,
 তুই তারা সে আলোকে হইবি আপনাহারা!
 দূর হ রে—দূর হ রে—দূর হ রে ক্ষুদ্র তারা!
 কিন্তু কি মধুর মুখ ভাবভরে ঢলঢল!
 কোমলকুসুমসম সমীরণে টলমল!
 দেখি নি এহেন মুখ সুমধুর ভাবময়!
 কেন? ললিতার মুখ এ হতে কি ভাল নয়?
 আহা সে মধুর বড় ললিতার মুখখানি—
 আঁখি কত কথা কয়, মুখেতে নাইক বাণী,
 বাহির হইতে চায় তার সেই মৃদু হাসি—
 অধরের চারি ধারে কতবার উঁকি মারে,
 লজ্জায় মরিয়া যায় কেবল দুই পা আসি!
 তার মুখ পূর্ণরাকা শরমের মেখে ঢাকা,
 মধুর মুখানি তার আমি বড় ভালবাসি!
 ললিতার চেয়ে কি গো মুখখানি ভাল এর?
 উভেরই মধুর মুখ—দুই ভাব দু-জনের—
 ললিতা সে লাজময়ী মুখেতে নাইক কথা,
 মাটি-পানে চেয়ে আছে যেন লজ্জাবতী লতা।

নলিনী, নলিনীসম কেমন রয়েছে ফুটি,
 বরষার নদীজল করিতেছে টলমল
 হোলি দুলি লহরীতে পড়িতেছে লুটি লুটি।
 উভেরই মধুর মুখ ললিতার, নলিনীর—
 অধীর সৌন্দর্য্য কারো, কারো বা প্রশান্ত স্থির!
 কিন্তু নলিনীর মুখ ভাবের খেলার গেহ—
 সেথা ভাবশিশুগুলি করিতেছে কোলাকুলি,
 কেহ বা অধরে হাসে, নয়নে নাচিছে কেহ,
 এই যে অধরে ছিল এই সে নয়নে গেছে,
 দূ-দণ্ড খেলায়ে কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!
 কভু বা দূ-তিন জনে নাচিতেছে এক সনে,
 পলক পড়িতে চোখে আর ত তাহারা নাই—
 নলিনীর মুখখানি ভাবের খেলার ঠাই!
 নলিনীর মুখপানে যতই চাহিয়া থাকি
 নতন নতন শোভা দেখিতে পায় যে আঁখি!
 কিন্তু ললিতার মুখ কখনো এমন নয়।
 এত সে কয় না কথা, এত ভাব নাই সেথা,
 নহে গো এমনতর অধীরমাধুর্য্যময়!
 নাই বা এমন হ'ল তাহাতে কি আছে হানি?
 নাহয় দেখিতে ভাল নলিনীর মুখখানি!
 তবু ললিতারে মোর ভাল আমি বাসি ত রে!
 তবু ত সৌন্দর্য্য তার এ হৃদি রয়েছে ভ'রে!
 রূপেতে কি যায় আসে? রূপ কেবা ভাল বাসে?
 ললিতা নলিনী-কাছে নাহয় রূপেতে হারে—
 ভালবাসি—ভালবাসি—তবু আমি ললিতারে!

নলিনী।

[বিনোদের কাছে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া।]

কেন হেন আহা মলিন আনন,

আঁখি নত মাটি-পানে!

তোমারে বিনোদ পাই নি দেখিতে

দাঁড়াইয়া এইখানে!

শিথিল হইয়া পড়েছে ঝুলিয়া

ফুলের বলয় মোর,

দাও-না গো সখা দাও-না তুলিয়া,

বাঁধ গো আঁটিয়া ডোর!

নলিনীর গান

এস মন, এস, তোমাতে আমাতে

মিটাই বিবাদ যত!

আপনার হয়ে কেন মোরা দাঁহে

রহি গো পরের মত?

আমি যাই এক দিকে, মন মোর!
 তুমি যাও আর দিকে—
 যার কাছ হতে ফিরাই নয়ন
 তুমি চাও তার দিকে!
 তার চেয়ে এস দুজনে মিলিয়ে
 হাত ধরে যাই এক পথ দিয়ে,
 আমারে ছাড়িয়ে অন্য কোনখানে
 যেও না কখনো আর!
 পারি না কি মোরা দুজনে থাকিতে,
 দোঁহে হেসে খেলে কাল কাটাইতে?
 তবে কেন তুই না শূনে বারণ
 যাস্ রে পরের দ্বার?
 তুমি আমি মোরা থাকিতে দুজন,
 বল্ দেখি, হৃদি, কিবা প্রয়োজন
 অন্য সহচরে আর?
 এত কেন সাধ বল্ দেখি, মন,
 পর-ঘরে যেতে যখন তখন—
 সেথা কি রে তুই আদর পাস্?
 বল্ ত কত-না সহিস যাতনা?
 দিবানিশি কত সহিস লাঞ্ছনা?
 তবু কি রে তোর মিটে নি আশ?
 আয়, ফিরে আয়, মন, ফিরে আয়—
 দোঁহে এক সাথে করিব বাস!
 অনাদর আর হবে না সহিতে,
 দিবস রজনী পাষণ বহিতে,
 মরমে দহিতে, মদখে না কহিতে,
 ফেলিতে দুখের শ্বাস!
 শূনিলি নে কথা? আসিলি নে হেথা?
 ফিরিলি নে একবার?
 সখি লো, দূরন্ত হৃদয়ের সাথে
 পেরে উঠি নে ত আর!
 ‘নয় রে দুখের খেলা ভালবাসা!’
 কত বুঝালেম তায়—
 হেরিয়া চকণ সোনার শিকল
 খেলাইতে যায় হৃদয় পাগল,
 খেলাতে খেলাতে না জেনে না শূনে
 জড়ায় নিজের পায়!
 বাহিরিতে চায়, বাহিরিতে নারে,
 করে শেষে হায় হায়!
 শিকল ছিঁড়িয়ে এসেছে ক’বার,
 আবার কেন রে যায়?

চরণে শিকল বাঁধিয়া কাঁদিতে
 না জানি কি সুখ পায়!
 তিলেক রহে না আমার কাছেতে
 যতই কাঁদিয়া মরি,
 এমন দূরন্ত হৃদয় লইয়া
 সজনি, বল্ কি করি?

অনিল। ওঠ্ হেথা হতে—চল্ চল্ যাই,
 কি কারণে হেথা আছিহ্ আর!
 মৃদিয়া আসিছে মনের নয়ন,
 মনের চরণে পড়িছে ভার!
 ললিতা আমার, না থাকুক্ রূপ,
 নাই বা গাহিতে পারিলি গান,
 ভালবাসি তোরে, ভালবাসিব রে
 যত দিন দেহে রহিবে প্রাণ!

[নলিনী ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান]

নলিনী। পারি নে ত আর, বসি এই খানে,
 ওই যে এ দিকে আসিছে কবি!
 কথা আজ মোরে কহিতে হইবে,
 র'ব না বসিয়া অচল ছবি!
 কি কথা বলিব? ভাবিতেছি মনে,
 কিছই ত ভেবে নাহিক পাই!
 বলিব কি তারে—‘তোমরা কবি গো,
 তোমাদের ভাল বাসিতে নাই!
 বন্ধিতে পার না আপনার মন,
 দিবাশিখা বৃথা কর গো শোক!
 ভালবাসা-তরে আকুল হৃদয়,
 ভালবাসিবার পাও না লোক!
 মনে তোমাদের সৌন্দর্য্য জাগিছে
 ধরায় তেমন পাও না খুঁজে,
 তবুও ত ভাল বাসিতেই হবে
 নাহিলে কিছতে মন না বন্ধে।
 অবশেষে কারে পাও দেখিবারে
 নেশায় আপনা ভুলি,
 সাজাইয়া দেয় কলপনা তারে
 নিজের গহনা খুলি।
 আসি কলপনা কুহকিনীবালা
 নয়নে কি দেয় মায়া,
 কলপনা তারে ঢেকে রাখে নিজে
 দিয়ে নিজ জ্যোতিছায়া।

কল্পনাকুহকে মায়া মদুখ চোকে
 কি দেখিতে দেখে কিবা,
 অপরূপ সেই প্রতিমা তাহার
 পূজ মনে নিশি দিবা।
 যত যায় দিন, যত যায় দিন,
 যত পাও তারে পাশে,
 দেবীর জ্যোতি সে হারায় তাহার
 মানুষ হইয়া আসে!
 ভালবাসা যত দূরে চলি যায়
 হাহাকার কর মনে,
 কল্পনা কাঁদে ব্যথিত হইয়া
 আপনার প্রতারণে!
 আমি গো অবলা—কবির প্রণয়
 অত নাহি করি আশা,
 আমি চাই নিজ মনের মানুষ
 সাদাসিদে ভালবাসা!
 এমনি করিয়ে বাতাসের 'পরে
 মিছে অভিমান বাঁধি
 অকারণে তার করিব লাঞ্ছনা
 অভিমানে কাঁদি কাঁদি।
 কিছতে সান্ধ্বনা না আমি মানিব,
 দূরেতে যাইব চলে—
 কাছেতে আসিতে করিব বারণ
 করুণ চোখের জলে!

দ্বয়োদশ সর্গ

অনিল ও ললিতা

ললিতা। ভেঙেছে ভেঙেছে যত লজ্জা ললিতার।
 মদুস্তকণ্ঠে শূন্য হইছে, সখা, বার বার—
 কি করিব বল দেখি তোমার লাগিয়া?
 কি করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া?
 এই পেতে দিন বদক— রাখ, সখা, রাখ মদুখ—
 ঘুমাও তুমি গো, আমি রহিব জাগিয়া!
 খুলে বল, বল সখা, কি দঃখ তোমার!
 অশ্রুজলে মিশাইব অশ্রুজলধার।
 একদিন বলিছিলে মোর ভালবাসা
 পেলেই পরিবে তব প্রণয়পিপাসা।
 বলিছিলে সব তব করিছে নির্ভর
 পৃথিবীর সখ দঃখ আমারি উপর।

কই সখা? প্রাণ মন করেছি ত সমর্পণ,
 দিয়েছি ত যাহা কিছু ছিল আপনার—
 তবু কেন শূন্যকাল না অশ্রুবারিধার?
 অনিল। ললিতা রে, ললিতা রে, আমার কিসের দুখ
 হৃদয়ে জাগিছে যবে ওই তোর মধুমুখ!
 জীবননিশীথ মোর ও রবিকিরণে তোর
 একেবারে মিশিয়েছি আপনারে পাশরিয়া—
 মাঝে মাঝে হৃদাকাশে যদিও বা মেঘ আসে,
 ভিতরে তবুও হাসে সে রবিকিরণ প্রিয়া!
 ওই স্মিত আঁখি দুটি হৃদয়ে রহিয়া ফুটি
 রেখেছে ফুল ফুটায়ে প্রাণের বিজন বনে!
 তব প্রেমসুধাধারা ঝরিয়া নিব্বার-পারা
 তুলেছে হরিত করি এই মরুভূমি-মনে।
 তব হাসি জ্যোৎস্না-সম এ মৃগ্য নয়নে মম
 সারা জগতের মুখে ফুটায়ে রেখেছে হাসি।
 তুমি সদা আছ কাছে তাই দিবালোক আছে,
 নহিলে জগতে মোর কাঁদিত আঁধাররাশি।
 আয় সখি, বৃকে আয়, উলসি উঠেছে প্রাণ—
 ছুরা ক'রে যা লো বালা, বাঁশি আন্, বীণা আন্!
 আজি এ মধুর সাঁঝে রাখি এ বৃকের মাঝে
 মধুর মুখানি তোর, ধীরে ধীরে কর্ গান।
 ললিতা। না সখা, মনের ব্যথা কোরো না গোপন!
 যবে অশ্রুজল হয় উচ্ছ্বসি উঠিতে চায়,
 রুদ্ধিয়া রেখো না তাহা আমারি কারণ।
 চিনি সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি,
 ওর চেয়ে কত ভাল অশ্রুজলরাশি।
 মাথা খাও, অভাগীরে কোরো না বণ্ডনা,
 ছদ্মবেশে আবরিয়া রেখো না যন্ত্রণা!
 মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে,
 ভাল যদি বাস তবে রাখ এ প্রার্থনা!

চতুর্দশ সর্গ

মুরলী ও কবি

কবি। কত দিন দেখিয়াছি তোরে, লো মুরলে,
 একেলা কাঁদিতেছিস বসিয়া বিরলে।
 করতলে রাখি মুখ— কি জানি কিসের দুখ—
 বড় বড় আঁখিদুটি মগ্ন অশ্রুজলে!

বড়, সখি, ব্যথা লাগে হেরি তোর মুখ!
 এমন করুণ আহা! ফেটে যায় বুক।
 ভাল কি বাসিস করে? কত দিন বল
 পোষণ করিবি হৃদে হৃদয়-অনল?
 যত তোর কথা আছে বলিস আমার কাছে,
 এত স্নেহ কোথা পারি—এত অশ্রুজল?
 মুরলা। করে বা ভাল বাসিব কি গো আমার?
 ভালবাসা সাজে কি গো এই মুরলার?
 সখা, এত আমি দীন, এতই গো গুণহীন,
 ভালবাসিতে যে করি, মরি গো লজ্জায়।
 যদি ভুলি আপনারে, যদি ভালবাসি করে,
 সে জন ফিরেও কভু দেখে কি আমার?
 যদি বা সে দয়া ক'রে আদর করে গো মোরে,
 সঙ্কাচেতে দিবানিশি দহি না কি তবু?
 তাই করি বলি তাই— ভাল যে বাসিতে নাই,
 ভালবাসা মুরলারে সাজে কি গো কভু?
 দূর হোক—মুরলার কথা দূর হোক—
 মুরলার দুখজ্বালা মুরলার র'ক—
 বল করি গেছিলে কি নলিনীর কাছে?
 নলিনীর কথা কিছু বলিবার আছে?
 কবি। সখি লো, বড়ই মনে পাইয়াছি ব্যথা!
 কাল আমি সন্ধ্যাকালে গিয়েছিলাম সেথা—
 পথপার্শ্বে সেই বনে নীরবে আপনমনে
 দেখিতেছিলাম একা বসি কতক্ষণ
 সন্ধ্যার কপোল হতে সূর্যের কেমন
 মিলায়ে আসিতেছিল সরমের রাগ—
 একটি উঠেছে তারা, বিপাশা হরষে হারা
 ছায়া বৃকে লয়ে কত করিছে সোহাগ!
 কতক্ষণ পথ চেয়ে রয়েছি বসিয়া—
 এমন সময়ে হেরি সখীদের সঙ্গে করি
 আসিছে নলিনীবালা হাসিয়া হাসিয়া!
 নাচিয়া উঠিল মন হরষে উল্লাসে,
 রহিন্দু অধীর হয়ে মিলনের আশে।
 কিন্তু নলিনীর কেন চরণ উঠে না যেন,
 দুই পা চলিয়া যেন পারে না চলিতে!
 কেহ যেন তার তরে বসে নাই আশা ক'রে,
 সে যেন কাহারো সাথে আসে নি মিলিতে!
 কোন কাজ নাই তাই এসেছে খেলিতে!
 যেতে যেতে পথমাঝে যদি হেরে ফুল
 করতালি দিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি যায় ছুটে—
 আনে তুলে, পরে চুলে, হেসেই আকুল!
 কভু হেরি প্রজাপতি কোতূহলে ব্যগ্র অতি

ধীরে ধীরে পা টিপিয়া যায় তার কাছে।
 কভু কহে, 'চল্ সখি, সেই চাঁপা গাছে
 আজিকে সকাল বেলা কুঁড়ি দেখেছিন্দু মেলা,
 এতক্ষণে বৃষ্টি তারা উঠিয়াছে ফুটে,
 চল্ সখি একবার দেখে আসি ছুটে!'

কত-না বিলম্ব পথে করিল এমন,
 বড়ই অধীর হয়ে উঠিল গো মন।
 কতক্ষণ পরে শেষে গান গেয়ে হেসে হেসে
 যেথা আমি বসেছিন্দু আসিল সেথায়—
 চলিয়া গেল সে, যেন দেখে নি আমায়!
 একেলা বসিয়া আমি রহিন্দু অঁধারে
 সমস্ত রজনী, সখি, সেই পথধারে।
 কেন সখি, এত হাসি, এত কেন গান?
 কিসের উল্লাসে এত পূর্ণ ছিল প্রাণ?
 মন এক দলিবার আছে গো ক্ষমতা,
 যখন তখন খুসী দিতে পারে ব্যথা,
 তাই গর্বে কোন দিকে ফিরেও না চায়?
 তাই এত হাসে হাসি, এত গান গায়
 কৃপাণ যে হাসি হাসে ঝলসি নয়ন,
 বিদ্যুৎ যে হাসি হাসে অশ্রুনিদান!
 অথবা হয়ত, সখি, আমারই ভুল;
 হয়ত সে মনে মনে কল্পনায় অকারণে
 প্রণয়ে সন্দেহ করে হয়েছে আকুল!
 অভিমানে জানাইতে চায় মোর কাছে—
 রাখে না আমার আশা, নাই কিছু ভালবাসা,
 ভাল না বেসেও মোরে বড় সুখে আছে!
 যখন গাহিতেছিল মরমে দহিতেছিল—
 হাসি সে মুখের হাসি আর কিছু নয়,
 গোপনে কাঁদিতেছিল অশান্ত হৃদয়!
 আজ আমি তার কাছে যাই একবার—
 শূন্যই, অমন করে কেন সে নিষ্ঠুরা মোরে
 দিয়াছে বেদনা দলি হৃদয় আমার?

[কবির প্রস্থান

মুরলা। আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে নিস্তব্ধ গভীর—
 তারা নাহি দেখা যায় কুয়াশা-ভিতরে,
 একটি একটি করে পড়িছে শিশির
 মুরলার মাথার শুকানো ফুল-পরে!
 জীর্ণ শাখা শীতবায়ু উঠে শিহরিয়া,
 গাছের শুকানো পাতা পড়িছে ঝরিয়া!
 ওঠ্ লো মুরলা, ওঠ্, দিন হল শেষ,
 পর্ লো মুরলা, পর্ সন্ধ্যাসিনীবেশ।
 মুরলা? মুরলা কোথা? গেছে সে মরিয়া—

সেই যে দুখিনী ছিল বিষন্ন মলিন,
 সেই যে ভাল বাসিত হৃদয় ভরিয়া,
 সেই যে কাঁদিত বনে আসি প্রতিদিন,
 সে বালা মরিয়া গেছে, কোথায় সে আর ?
 ছিন্ন বস্ত্র, শ্লান মুখ, লয়ে দুঃখভার,
 তাহার সে বৃকের লুকানো কথা লয়ে
 মরেছে সে বালা আজ সন্ধ্যার উদয়ে !
 তবে এ কাহারে হেরি নিশীথে শ্মশানে ?
 ও একটি উদাসিনী সন্ন্যাসিনী যায়—
 করেও বাসে না ভাল, করেও না জানে,
 আপনার মনে শূদ্ধ ভ্রমিয়া বেড়ায় !
 একটি ঘটনা ওর ঘটে নি জীবনে,
 একটি পড়ে নি রেখা ওর শূন্য মনে !
 পথ ছাড়, পান্থ, কিবা শূধাইছ আর
 জীবনে কাহিনী কিছু নাই বলিবার !
 মূরলা, সত্যই তবে হলি সন্ন্যাসিনী ?
 সত্যই ত্যজিলি তোর যত কিছু আশা ?
 তবে রে বিলম্ব কেন, বসিয়া আছিস হেন ?
 এখনো কি—এখনো কি সব ফুরায় নি ?
 এখনো কি মনে মনে চাস ভালবাসা ?
 বড় মনে সাধ ছিল রহিব হেথায়—
 কষ্ট পাই দুঃখ পাই রব তাঁরি সাথে,
 আজন্ম কালের তাঁর সহচরী হায়
 আমরণ বেড়াইব ধরি তাঁরি হাত !
 কিছুতে নারিন্দু অশ্রু করিতে দমন,
 কিছুতে এল না হাসি বিষন্ন বদনে,
 সদাই এড়াতে হ'ত কবির নয়ন,
 কাঁদিতে আসিতে হ'ত এ আঁধার বনে !
 আজিকে সুখের দিন কবির আমার,
 হৃদয়ে তিলেক নাই বিষাদ-আঁধার,
 নতুন প্রণয়ে মগ্ন তাহার হৃদয়
 বিশ্বচরাচর হেরে হাস্যসুধাময় !
 এখন, মূরলা আমি, কেন রহি আর ?
 যেখানেই যান কবি হর্ষে হাসি হাসি
 সেথাই দেখিতে পান এ মুখ আমার—
 বিষাদের প্রতিমূর্তি অন্ধকাররাশি !
 ওঠ্ লো মূরলা তবে—দিন হ'ল শেষ !
 পরু লো মূরলা তবে সন্ন্যাসিনীবেশ !
 বেড়াইবি তীর্থে তীর্থে, ত্যজিবি সংসার—
 ভুলে যাবি যত কিছু আছে আপনার !
 কত শত দিন কত বর্ষ যাবে চলি—
 তখন কপালে তোর পড়েছে দ্রবলী,

নয়ন হইয়া তোর গেছে জ্যোতিহীন,
 কত কত বর্ষ গেছে, গেছে কত দিন—
 এই গ্রামে ফিরিয়া আসিবি একবার,
 যাইবি মাগিতে ভিক্ষা কবির দুরার,
 দেখিবি আছেন স্নেহে নলিনীরে লয়ে
 দুইজনে একমন একপ্রাণ হয়ে!
 কত-না শুনাইছেন কবিতা তাহারে!
 কত-না সাজাইছেন কুসুমের হারে!
 মোরে হেরে কবি মোর অবাক্ নয়নে
 মোর মুখপানে চেয়ে রহিবেন কত,
 মনে পড়ি পড়ি করি পড়িবে না মনে
 নিশীথের ভূলে-যাওয়া স্বপনের মত!
 কতক্ষণ মুখপানে চেয়ে থেকে থেকে
 সবিষ্ময়ে নলিনীরে কহিবেন ডেকে,
 ‘যেন হেন মুখ আমি দেখেছি নু প্রিয়া!
 কিছুতেই মনে তবু পড়িছে না আর!’
 অমনি নলিনীবালা উঠিবে হাসিয়া—
 কহিবে, ‘কল্পনা, কবি, কল্পনা তোমার!’
 শুনিয়া হাসিবে কবি, ফিরাবে নয়ন,
 নলিনীর পাখীটিরে করিবে আদর—
 আমিও সেখান হতে করিব গমন
 ভ্রমিয়া বেড়াতে পুনঃ দূর দেশান্তরে!
 ওঠ্ লো মুরলা তবে—দিন হ’ল শেষ
 পর্ লো মুরলা তবে সম্ম্যাসিনীবেশ!
 থাক্ থাক্, আজ থাক্, আজ থাক্ আর!
 কবিরে দেখিতে হবে আরেকটি বার!
 কাল হব সম্ম্যাসিনী, বরিব বিরাগে—
 দেখিব আরেক বার যাইবার আগে।

পঞ্চদশ সর্গ

কবি ও মুরলা

মুরলা। কবি গো আমার, যদি আমি ম’রে যাই
 তা হ’লে কি বড় কষ্ট হয় গো তোমার?
 কবি। ওকি কথা মুরলা লো, বলিতে যে নাই!
 তুই ছেলেবেলাকার সঙ্গিনী আমার!
 কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না, মোহ অশ্রুধার!
 আহা, সখি, বড় স্নেহী হই আমি মনে
 যদি দেখি প্রেমে তুই পড়েছিস্ কার,
 স্নেহেতে আছিস্ তোরা মিলি দুইজনে!

নিরাশ্রয় মনে আসে কত কি ভাবনা,
 কিছতে অধীর হৃদি মানে না সান্ধনা—
 সজনি, অমন সব ভাবনা-আঁধার
 ভাবিস্ নে কখনো লো, ভাবিস্ নে আর!
 মরলা। কবি গো, রজনীগন্ধা ফুটেছিল গাছে—
 তুমি ভালবাস ব'লে আপনি এনেছি তুলে,
 নেবে কি এ ফুলগদলি, রাখবে কি কাছে?
 কবি। সখি লো, নলিনী কাল দুটি চাঁপা তুলে
 পরায়ে দেছিল মোর দুই কণমূলে;
 পরশিতে দলগদলি পড়িছে ঝরিয়া,
 এখনো সুবাস তার যায় নি মরিয়া!
 মরলা। দেখি সখা, একবার দেখি হাতখানি—
 এ হাত কাহারে, কবি, করিবে অর্পণ?
 কত ভাল তোমারে সে বাসিবে না জানি!
 না জানি, তোমারে কত করিবে যতন!
 কিসে তুমি রবে সুখী সকলি সে জানিবে কি?
 দেখিবে কি প্রতি ক্ষুদ্র অভাব তোমার?
 তোমার ও মুখ দেখি অমনি সে বুঝিবে কি
 কখন পড়েছে হৃদে একটু আঁধার!
 অমনি কি কাছে গিয়ে কত-না সান্ধনা দিয়ে
 দূর করি দিবে সব বিষাদ তোমার?
 তাই যেন হয়, কবি, আর কিবা চাই—
 তা হ'লেই সুখী হব রহি না যেথাই।
 কবি। মরলা, সখি লো,
 কেন আজ মন মোর উঠিছে কাঁদিয়া?
 বিষাদ ভুজঙ্গসম কেন রে হৃদয় মম
 দলিতেছে চারি দিকে বাঁধিয়া বাঁধিয়া?
 ছেলেবেলা হতে যেন কিছুই হল না,
 যত দিন বেঁচে রব কিছুই হবে না,
 এমনি করেই যেন কাটিবেক দিন,
 কাঁদিয়া বেড়াতে হবে সুখশান্তিহীন!
 কেহ যেন নাই মোর, রবে নাকো কেহ—
 ধরায় নাইক যেন বিপ্রামের গেহ।
 কিছু হারাই নি তবু খুঁজিয়া বেড়াই,
 কিছুই চাই না তবু কি যেন কি চাই!
 কোন আশা না করিয়া নৈরাশ্যেতে দাঁহি,
 কোন কষ্ট না পাইয়া তবু কষ্ট সহি!
 কেন রে এমন কেন হল আজ মন?
 দিয়েছি ত, পেয়েছি ত ভালবাসা-ধন!
 তুই কাছে আয় দেখি, আয় একবার,
 মুখ তোর রাখ্ দেখি বুকেতে আমার!
 দেখি তাহে এ হৃদয় শান্তি পায় যদি!

কে জানে উচ্ছ্বাস কেন উঠিতেছে হৃদি!
 দেখি তোর মৃথখানি সখি, তোর মৃথখানি—
 বন্ধে মোর মৃথ চাপি—কেন, সখি, কেন
 সহসা উচ্ছ্বাস কাঁদি উঠিল রে হেন?
 যেন বহুক্ষণ হতে যদ্বিয়া যদ্বিয়া
 আর পারিল না, হৃদি গেল গো ভাঙিয়া!
 কি হয়েছে বল্ মোরে, বল্, সখি, বল্—
 লুকাস্ নে, লুকাস্ নে দুখ-অশ্রুজল!
 পৃথিবীতে কেহ যদি নাহি থাকে তোর
 এই হেথা এই আছে এই বন্ধ মোর!
 এ আশ্রয় চিরকাল রহিবে তোমার,
 এ আশ্রয় কখনোই হারাবি নে আর!
 কাঁদিবি যখন চাস্ হেথা মৃথ ঢাকি,
 তোর সাথে বরষিবে অশ্রু মোর আঁখি!
 তুমি সুখী হও কবি এই আমি চাই—
 তুমি সুখী হলে মোর কোন দুঃখ নাই।
 কবি। আমি সুখী নই সখি, সুখী কেবা আর?
 বল্ দেখি মুরলা লো কি দুঃখ আমার!
 অমন নলিনী মোর হৃদয়ের ধন
 সে আমার—সে আমার আছে গো যখন,
 পেয়েছি যখন আমি তার ভালবাসা,
 তখন আমার আর কিসের বা আশা?
 পেয়েছি যখন আমি তোর মত সখী—
 দুখে মোর দুখ পায়, সুখে মোর সুখী—
 তবে বল্ দেখি, সখি, কি দুঃখ আমার?
 তবে যে উঠেছে মনে বিষাদ-আঁধার
 শরতের মেঘসম দ্বন্দ্ব-মিলাবে,
 কোথা হতে আসিয়াছে কোথায় বা যাবে!
 এখনি নলিনী-কাছে যাই একবার,
 এখনি ঘুচিবে এই বিষাদের ভার!
 মুরলা সখি লো, তুই থাকিস্ হেথাই,
 ফিরে এসে পুনঃ যেন দেখিবারে পাই!

[কবির প্রস্থান]

মুরলা। ফিরে এসে মুরলারে পাবে না দেখিতে!
 কবি মোর, আরেকটু যদি গো থাকিতে!
 নলিনী ত চিরজন্ম রহিবে তোমার,
 আমি যে ও মৃথ কড়ু হেরিব না আর!
 ও মৃথ কি আর কড়ু পাব না দেখিতে
 যত দিন হবে মোরে বাঁচিয়া থাকিতে?
 পল যাবে, দণ্ড যাবে, দিন যাবে, মাস যাবে,
 বর্ষ বর্ষ করি যাবে জীবন আমার—
 ও মৃথ দেখিতে তবু পাব নাকো আর?

মরুলা, পারিবি তুই? পারিবি থাকিতে?
 দারুণ পাশাণে মন বাঁধিয়া রাখিতে?
 না, না, না, মরুলা তুই যাইবি কোথায়?
 অসীম সংসারে তোর কে আছে রে হায়?
 হবে যা অদৃষ্টে আছে, থাকিস কবির কাছে—
 কবি তোর সুখ শান্তি হৃদয়ের ধন,
 থাকিস জড়ায়ে ধরি কবির চরণ,
 কবির চরণে শেষে ত্যজিস জীবন!
 কিন্তু স্বার্থপর তুই কি করিয়া রাবি?
 বিষন্ন ও মৃদু তোর নিরখিয়া কবি
 এখনো কাঁদেন যদি, এখনো তাঁহার হৃদি
 পুরানো বিষাদ যদি করে গো স্মরণ?
 সেই ছেলেবেলাকার বিষাদযন্ত্রণাভার
 আমি যদি তাঁর মনে জাগাইয়া রাখি—
 তবে, রে হতভাগিনী, কি বলিয়া থাকি!
 তবে আমি যাই, তবে যাই, তবে যাই—
 কেহ মোর ছিল নাকো, কেহ মোর নাই!
 মরুলা বলিয়া কেহ আছে কি ভুবনে?
 মরুলা বলিয়া যারে ভাবিতেছি মনে
 সে একটি নিশীথের স্বপ্ন মোহময়,
 দেখিব স্বপ্ন ভাঙি মরুলা সে নয়!
 নাই তার সুখ দুখ, নাই ভালবাসা,
 নাই কবি—নাই কেহ—নাই কোন আশা!
 কেহই সে নয়, আর কেহ তার নাই,
 তবে কি ভাবনা আর—যেথা ইচ্ছা যাই!
 কিন্তু কবি মোর, আহা ভালবাসাময়,
 আমারে না দেখে যদি তাঁর কষ্ট হয়?
 থাম্ থাম্, মরুলা রে, কেন মিছে বারে বারে
 মনেরে প্রবোধ দিস ও কথা বলিয়া!
 শুনিলে জগৎ যে রে উঠিবে হাসিয়া!
 চল্ তুই, চল্ তুই— যেথা ইচ্ছা চল্ তুই,
 কেহ নাই তোর লাগি কাঁদিবার তরে!
 তবে চলিলাম, কবি, দূর দেশান্তরে!
 অন্তর্যামী দেবতা গো, শুন একবার,
 যদি আমি ভালবাসি কবিরে আমার
 কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়—
 সখারে আমার আমি ভালবাসি যত
 নলিনীবালাও যেন ভালবাসে তত!
 নলিনীবালার যত আছে দুখজ্বালা
 সব যেন মোর হয়, সুখে থাক্ বালা!
 তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম—
 মরুলা করিছে এই বিদায়প্রণাম!

ষোড়শ সর্গ

ললিতা

কে জানে নাথের কেন হ'ল গো এমন?
 জানি না কি ভাবিবারে যান বিপাশার ধারে,
 ললিতার চেয়ে ভাল বাসেন বিজন!
 কভুবা আছেন যবে বিরলে বসিয়া
 আমি যদি যাই কাছে হাসিয়া হাসিয়া
 বিরক্তিতে ভুরু কেন আকুণ্ঠিয়া উঠে যেন,
 বিরক্তি জাগিয়া উঠে অধরখানিতে,
 আপনি যেন গো তাহা নারেন জানিতে!
 সহসা চমকি উঠি কি যেন হয়েছে দ্রুটি
 আমারে কাছেতে এনে ডাকিয়া বসান,
 কি কথা ভাবিতেছেন বদ্বাইতে চান,
 না পারেন বদ্বাইতে— সরমে আকুল চিতে
 কি কথা বলিতে হবে ভাবিয়া না পান!
 কেন ত্যজি ললিতারে এলেন বিপাশাপারে
 শতেক সহস্র তার কারণ দেখান,
 তা লাগি করেছি যেন কত অভিমান!
 আপনি বলেন আসি 'ভালবাসি ভালবাসি',
 সন্দেহ করেছি যেন প্রণয়ে তাঁহার,
 তা লাগি করেছি যেন কত তিরস্কার!
 সহসা কাননে এলে আমারে দেখিতে পেলে
 লদ্বাইয়া দ্রুত পদে পালান চকিতে
 মনে ভাবি' আমি তাঁরে পাই নি দেখিতে!
 কি করি! কি হবে মোর! বড় হয় ভয়!
 লজ্জা ক'রে ললিতা রে হারালি প্রণয়!
 লজ্জা কই, ললিতার লজ্জা কোথা আজ?
 ভেঙেছে ত ললিতা সে ভেঙেছে ত লাজ!

[ক্লম্ব হইয়া]

ধিক্ রে! এই কি লজ্জা ভাঙিবার কাল?
 ভেঙেছে শরম যবে ভেঙেছে কপাল!
 আর কিছদ্ দিন আগে ঘোচে নাই ভ্রম?
 আর কিছদ্ দিন আগে ভাঙে নি শরম?
 কাঁদিতে বসিলি আজ শিশুটির মত?
 কিছদ্ দিন আগে কেন ভাবিলি নে এত?
 মিছা কি মনেরে তুই দিস রে প্রবোধ?
 দেখি নি তো' হতে আর অধম অবোধ!
 তুই যদি কষ্ট পাস দোষ দিব কার?
 তোর মত অবোধের কষ্ট পদরস্কার!

যত কষ্ট আছে তুই সব কর্ ভোগ—
 অশ্রুজলে তোর দিন অবসান হোক!
 নিজের চরণ দিয়া নিজহৃদি বিদালিয়া
 হৃদয়ের রক্তবিন্দু গোন্ দিন রাত!
 হারিয়ে সর্বস্ব ধন কর্ অশ্রুপাত!
 আগে কেন বদ্বিলি নে, আগে কেন ভাবিলি নে,
 কিছু দিন আগে লজ্জা নারিলি ভাগিতে!
 মিছা হৃদয়েরে আজ চাস প্রবোধিতে!
 যেমন করিলি কাজ ফল ভোগ কর্ আজ,
 পর হোক যেই জন ছিল আপনার—
 তুই যদি কষ্ট পাস দোষ দিব কার?

সপ্তদশ সর্গ

মুরলী। প্রান্তরে

যার কেহ নাই তার সব আছে,
 সমস্ত জগৎ মদুস্ত তার কাছে—
 তারি তরে উঠে রবি শশী তারা,
 তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
 একটি বাহার নাইক আলয়
 সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর,
 একটি যাহার নাই সখা সখী
 কেহই তাহার নহেক পর!
 আর কি সে চায়? রয়েছে যখন
 আপনি সে আপনার,
 কিসের ভাবনা তার?
 কিন্তু যে জনের প্রাণের মনের
 একজন শূন্য আছে,
 রবি শশী তার সেই এক জন,
 সেই তার প্রাণ, সেই তার মন,
 সেই সে জগৎ তাহার কাছে—
 জগৎ সেজন-ময়,
 আর কেহ কেহ নয়!
 পৃথিবীর লোক সেই এক জন—
 যদি সে হারায় তাকে
 আর তার তরে রবি নাহি উঠে,
 আর তার তরে ফুল নাহি ফুটে,
 কিছু তার নাহি থাকে!

বহিছে তটিনী, বহিছে তটিনী,
 তটিনী বহিছে না—
 গাহিছে বিহগ, গাহিছে বিহগ,
 বিহগ গাহিছে না।
 সমস্ত জগৎ গেছে ধ্বংস হয়ে,
 নিভেছে তপন শশী—
 সারা জগতের শ্মশানমাঝারে
 সে শুধু একেলা বসি!
 কি একটি বালু-কণার উপরে
 তাহার সমস্ত জগৎ ছিল!
 নিশ্বাস লাগিতে খসিল বালুকা,
 নিমেষে জগৎ মিশায়ে গেল!
 হা রে হা অবোধ, জীবন লইয়া
 হেন ছেলেখেলা করিতে আছে।
 ক্ষণস্থায়ী ওই তিলেকের 'পরে
 সমস্ত জগৎ গড়িতে আছে!
 মূহুর্তকালের ক্ষীণমুষ্টিমাঝে
 তোর চিরকাল রাখিতে আছে!
 রাখ রে ছড়ায়ে হৃদয়টি তোর
 সমস্ত জগৎময়!
 জগৎসাগরে বিম্ব যত আছে
 কেহই কাহারো নয়!
 সে বিম্বের 'পরে রাখিস্ নে তুই
 কোন আশা মন মোর!
 সহসা দেখিবি বিম্বটির সাথে
 ভেঙেছে সর্বস্ব তোর।
 ওরে মন, তোর অগাধ বাসনা
 সমস্ত জগৎ করুক গ্রাস!
 সমস্ত জগৎ ঘেরিয়া রাখ রে,
 হৃদয় রে, তোর স্নেহের আশ।
 সন্ন্যাসিনী তুই, কাঁদিস রে কেন?
 কেন রে ফেলিস দ্বন্দ্বের শ্বাস?
 গেছে ভেঙে তোর একটি জগৎ
 আরেক জগতে করিবি বাস।
 সে জগৎ তোর তরে হয় নি রে,
 অদৃষ্টের ভুলে গেছিল সেথা—
 সেথায় আলয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া
 কতই না তুই পাইলি ব্যথা!
 তোর নিজদেশে এসেছিস এবে,
 কেহ নাই তোরে কহিতে কথা—
 আদর কাহারো পাস নে কখনো,
 আদর কাহারো চাস নে হেথা।

এখনো ত এই নতুন জীবনে
 স্নেহ দ্বন্দ্ব কিছু ঘটে নি তোরা—
 দিবসের পরে আসিছে দিবস,
 রজনীর পরে রজনী ভোর!
 দিবস রজনী নীরব চরণে
 যেমন যেতেছে তেমনি যাক—
 কাঁদিস নে তুই, হাসিস নে তুই
 যেমন আছিস তেমনি থাক!
 সে জগতে ছিল কাহারো বা দ্বন্দ্ব
 কারো বা স্নেহের রাশি,
 এ জগতে যত নিবাসী জনের
 নাইক রোদন হাসি—
 সকলেই চায় সকলের মনে,
 শ্রদ্ধায় না কেহ কথা—
 নাইক আশ্রয়, চলেছে সকলে
 মন যার যায় যেথা!

অষ্টাদশ সর্গ

ললিতা

আদর করিয়া কেন না পাই আদর?
 লজ্জা নাই কিছু নাই, না ডাকিতে কাছে যাই—
 সঙ্কোচে চরণ যেন করে থর থর—
 ধীরে ধীরে এক পাশে বসি পদতলে!
 বড় মনে সাধ যায় মন্থখানি তুলে চায়,
 বারেক হাসিয়া কাছে বসিবারে বলে!
 বড় সাধ কাছে গিয়ে মন্থখানি তুলে নিয়ে
 চাপিয়া ধরি গো এই বন্ধুর মাঝার,
 মন্থপানে চেয়ে চেয়ে কাঁদি একবার!
 সে কেন বারেক চেয়ে কথাও না কয়,
 পাশে গঠিত যেন, স্থির হয়ে রয়!
 যেন রে ললিতা তার কেহ নয়—কেহ নয়—
 দাসীর দাসীও নয়, পথের পথিকো নয়!
 যেন একেবারে কেহ—কেহ নাই কাছে,
 ভাবনা লইয়া তার একেলা সে আছে!
 কি যেন দেখিছে ছবি আকাশের পটে,
 মন্থহৃৎের তরে যেন মনে মনে ভাবে হেন—
 ‘ললিতা এসেছে বন্ধি, বসেছে নিকটে,
 সে এমন মাঝে মাঝে এসে থাকে বটে!’
 মাঝে মাঝে আসে বটে, পারে না যে নাথ—

সখা গো, নিতান্ত তাই কথাটি শূদ্রাতে নাই?
 বারেক করিতে নাই স্নেহনেত্রপাত?
 নিতান্তই পদতলে পড়ে থাকে বটে!
 সখা, তাই কি গো তারে তুলিয়া উঠাবে না রে,
 বারেক রাখিবে নাকি বৃকের নিকটে!
 লতা আজ লুটাইয়া আছে পদমূলে,
 মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে—আপনারে ভুলে—
 প্রাণপণে ভালবেসে জড়িয়ে জড়িয়ে শেষে
 এক দিন উঠিবে সে বৃকে মাথা তুলে,
 শাখাটি বাঁধিতে দিবে আলিঙ্গনে তার,
 দুখিনীর সে আশা কি বড় অহঙ্কার?
 কি করেছি অপরাধ বৃঝিতে না পারি!
 দিন রাত্রি, সখা, আমি রয়েছি তোমারি—
 কিসে তুমি ভাল রবে, কিসে তুমি সুখী হবে,
 দিন রাত সে ভাবনা জাগিছে অন্তরে!
 মৃহদুর্ভাগিণী ভাবি না আমি আপনার তরে।
 তারি বিনিময়ে কি গো এত অনাদর!
 শতখানা ফেটে যায় বৃকের ভিতর।
 সখা, আমি অভিমান কভু করি নাই—
 মনে করিতেও তাহা লাজে মরে যাই।
 ধীরে ধীরে এনে কাছে মনে মনে হাস পাছে—
 ‘দুখিনী ললিতা সেও অভিমান করিয়াছে!’
 তাই অভিমান কভু মনেও না ভায়,
 অশ্রুজল হেরে পাছে হাসি তব পায়!
 বৃকে বড় ব্যথা বাজে, তাই ভাবি মাঝে মাঝে
 ভিক্ষুকের মত গিয়া পড়ি তব পায়—
 কেঁদে গিয়ে ভিক্ষা করি করিয়া বিনয়,
 ‘সর্বস্ব দিয়েছি ওগো—পরাণ হৃদয়—
 হৃদয় দিয়েছি বলে হৃদয় চাহি না ভুলে—
 একটু ভালবাসিও, আর কিছু নয়!’
 পাছে গো চাহিলে ভিক্ষা, ধরিলে চরণে,
 বিরক্ত বা হও তাই ভয় করি মনে।
 তবে গো কি হবে মোর! জানাব কি করে?
 এমন ক’দিন আর রব প্রাণ ধরে?
 হা দেবি! হা ভগবতি! জীবন দুর্ভাগ্যের অতি!
 কিছতে কি পাব নাকো ভালবাসা তাঁর?
 তবে নে মা, কোলে নে মা, কোথাও আশ্রয় দে মা—
 একটু স্নেহের ঠাই দেখা মা আমার!

[চপলার প্রবেশ]

চপলা। ললিতাও হলি নাকি মুরলীর মত!
 তেমনি বিষাদময় আঁখি দুটি নত।

তেমনি মলিন মুখে আছিস কিসের দুখে,
 তোদের একি এ হল ভাবি লো কেবল—
 চপলারে তোরা বদ্বি করিবি পাগল!
 ছেলেবেলা বেশ ছিলি, ছিল না ত জ্বালা—
 সদা মৃদুহাসিময়ী লাজময়ী বালা।
 এক দিন—মনে পড়ে? সরসীর তীরে
 বসেছিলি নিরিবিলা, কেবল দেখিতেছিলি
 নিজের মুখের ছায়া পড়েছিল নীরে।
 বদ্বি মেতে গিয়েছিলি রূপে আপনার!
 (তোমর মত গরিবিনী দেখি নি ত আর!)
 সহসা পিছন হ'তে ডাকিলাম তোরে,
 কি দারুণ শরমেতে গিয়েছিলি ম'রে?
 আজ তোমর হ'ল কি লো ললিতা আমার?
 সে সব লাজের ভাব নাই যে লো আর!
 শূদ্ধ বিষাদের হাসি, মুরলার মত!
 বল্ তোরা হ'লি একি? পৃথিবীর মাঝে দেখি
 কেবল চপলা সুখী, দুঃখী আর যত!
 মোরে কিছুর বলিবি নে?—আহা ম'রে যাই!—
 অনিল সে কত ক'রে আদর করে যে তোরে
 লুকায়ে লুকায়ে আমি যেন দেখি নাই!
 ভাল, ভাল, বলিস নে, আমার কি তায়?
 চল্ তুই, ললিতা লো, মুরলা যেথায়!
 যাহা তোমর মনে আছে কহিস তাহারি কাছে,
 তা হলে ঘুচিয়া যাবে হৃদয়ের ভার।
 স্মরা করে চল্ তবে ললিতা আমার!

[কবির প্রবেশ]

চপলা। [কবির প্রতি]
 চল, কবি, মুরলার কাছে—
 বড় সে মনের দুঃখে আছে!
 তুমি, কবি, তারে দেখো— সদা কাছে কাছে রেখো,
 তুমি তারে ভাল ক'রে করিও যতন!
 তুমি ছাড়া কে তাহার আছে বা ম্বজন!
 কবি। মুরলার মুখ দেখে প্রাণে বড় বাজে—
 কিসের যে দুঃখ তার শূধ্যায়েছি কতবার,
 কিছুর্তে আমার কাছে প্রকাশে না লাজে!
 কত দিন হতে মোরা বাঁধা এক ডোরে—
 যাহা কিছুর থাকে কথা, যাহা কিছুর পাই বাথা,
 দুজনে তখন তাহা বলি দুজনেই।
 কিছুর দিন হতে একি হ'ল মুরলার,
 আমারে মনের কথা বলে না সে আর!

মাঝে মাঝে ভাবি তাই— বড় মনে ব্যথা পাই—
 বৃষ্টি মোর 'পরে নাই প্রণয় তাহার!
 এত কথা বলি তারে এত ভালবাসি,
 সে কেন আমারে কিছুর কহে না প্রকাশি!

উনবিংশ সর্গ

অনিল

উহু, কি না করিলাম হৃদয়ের সাথ!
 ঘোর উন্মত্তের মত সবলে যুঝি নু কত,
 অশান্তির বিপ্লাবনে গেছে দিন রাত!
 নিশীথে গিয়েছি ছুটে দারুণ অধীর—
 নয়নেতে নিদ্রা নাই, চোখে না দেখিতে পাই,
 হাহা করে ভ্রমিয়াছি বিপাশার তীর!
 করেছে দারুণ ঝড় বজ্রদন্ত কড়মড়,
 চারি দিকে অন্ধকার সম্মুখে পশ্চাতে—
 মাথার উপরে চাই— একটিও তারা নাই,
 সৃষ্টি যেন ঠাই নাহি পেতেছে দাঁড়াতে!
 সাধ গেছে, ঝটিকার রুদ্ধদেবগণ
 বিশাল চরণ দিয়া দলি যায় এই হিয়া—
 নিষ্পেষিত করি ফেলে কীটের মতন।
 চূর্ণ হয়ে একেবারে মিশে ধূলিরাশে
 উড়ে পড়ে চারি দিকে বাতাসে বাতাসে!
 অশান্তির এক উপদেবতার মত
 নিজের হৃদয়-সাথে যুঝিয়াছি কত!
 করি অশ্রুবারিপাত গেছে চলি দিনরাত,
 অবশেষে আপনি হলেম পরাভূত!
 ইচ্ছা করে ছিঁড়ি ছিঁড়ি হৃদয় আমার
 শকুনী গৃধিনীদের যোগাই আহার!
 এহেন অসার দীন হৃদি অতি বলহীন,
 যোগ্য শুধু শিশুর খেলেনা গড়িবার।
 এ হৃদি কি বলবান পুরুষের মন—
 সামান্য বহিলে বায় সঘনে কাঁপবে কায়,
 মাটিতে নোয়াবে মাথা লতার মতন!
 কেন ধরা, কেন ওরে, জন্ম দিয়েছিলাম মোরে?
 এমন অসার লঘু দুর্বল এ প্রাণ?
 এখনি গো শ্বিধা হও, লও মোরে কোলে লও!
 এ হীন জীবনশিখা কর গো নিৰ্ব্বাণ!

আর একবার দেখি, যদি এ হৃদয়
 পারি আমি বজ্রবলে করিবারে জয়!
 কিন্তু হায় কে আমরা? ভাগ্যের খেলেনা,
 প্রচণ্ড অদৃষ্টস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণকণা!
 অন্তরে দুন্দুর্ভীম হৃদি পড়িছে উঠিছে,
 বাহিরে চৌদিক হতে ঝটিকা ছুটিছে
 যা কিছু ধরিতে চাই কিছুই খুঁজে না পাই,
 স্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মত
 দিগ্বিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞানহত।
 চোখে না দেখিতে পাই, কানে না শুনিতে পাই,
 তীব্রবেগে বহে বায়ু বধির শ্রবণ—
 চারি দিকে টলমল তরঙ্গের কোলাহল,
 আকাশে ছুটিছে তারা উল্কার মতন—
 ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে পড়ি গো আবর্তে এসে,
 চৌদিকে ফেনায়ে উঠে উন্মির পর্ষত;
 মস্তক ঘুরিয়া উঠে, সম্মুখে শোণিত ছুটে,
 ঘুরিতে ঘুরিতে যাই কোথায় ভেবে না পাই—
 তলায়ে তলায়ে যাই পাতালের পথ—
 অঁধারে দেখিতে নারি এন্‌ কোন্‌ ঠাই,
 উন্মের হাত তুলি কিছু ধরিতে না পাই—
 ঘুরি ঘুরি রাত্রি দিন হয়ে পড়ি জ্ঞানহীন,
 নিম্নে কে চরণ ধরি করে আকর্ষণ!
 কোথায় দাঁড়াব গিয়ে কে জানে তখন!
 তবে আর কি করিব! যাই—যাই ভেসে—
 পাষণ বজ্রের মত অদৃষ্টের মুষ্টি শত
 হৃদয়েরে আকর্ষিছে ধরি তার কেশে!
 কি করিতে পারি বল আমি ক্ষুদ্র নর!
 অদৃষ্টের সাথে কভু সাজে কি সমর!
 দিন রাত্রি তুষানলে মরি তবে জ্বলে জ্বলে—
 হাসুক সমস্ত ধরা তীর ঘৃণাহাসি,
 সে মোরে করুক ঘৃণা যারে ভালবাসি!
 আপনার কাছে সদা হয়ে থাকি দোষী,
 হৃদয়ে ঘনাতে থাক্‌ কলঙ্কের মসী!
 যায় ভালবাসা-তরে আকুল হৃদয়,
 যার লাগি সহি জ্বালা তীর অতিশয়—
 তারে ভালবাসি ব'লে, তারি লাগি কাঁদি ব'লে,
 তারি লাগি সহি ব'লে এতেক যাতনা—
 সেই মোরে ঘৃণা ক'রে ভালবাসিবে না!
 তাই হোক, তাই হোক, ভাগ্য, তাই হোক—
 অভাগার কাছ হতে সবে দূরে র'ক।
 যাই যাই ভেসে যাই— যা হবার হবে তাই—
 কে আছে আমার তরে করিবারে শোক?

[ললিতার প্রবেশ]

এই যে, এই যে হেথা, ললিতা আমার,
 আয়, আয়, মুখখানি দেখি একবার!
 আসিবি কি ফিরে যাবি তাই যেন ভাবি ভাবি
 অতি ধীর মৃদুগতি সঙ্কেচে তোমার—
 আয় বৃকে ছুটে আয়, ভাবিস নে আর!
 কেন লো ললিতারাগি, বিষণ্ণ ও মুখখানি?
 কেন লো অধরে নাই হাসির আভাস?
 নয়ন এ মুখে কেন চাহিতে চাহে না যেন—
 কি কথা রয়েছে মনে, বলিতে না চাস্!
 অপরাধ করেছি কি প্রেয়সী আমার?
 বল্ লো কি শাস্তি মোরে দিতে চাস তার!
 যা দিবি তাহাই সব, মাথায় পাতিয়া লব,
 তাহে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয় লো তাহার!
 সজনি, জানিস্ হা রে, ভাল তু বাসিস যারে
 মন তার অতি নীচ, অতি অন্ধকার!
 অপরাধ করিবে সে, আশ্চর্য্য কি তার?
 সখি লো, মাঝ্জানা তুই করিস নে তারে,
 চিরকাল ঘৃণা কর্ হৃদয়মাঝারে!
 সখি, তুই কেন ভাল বাসিলি আমার
 তাই ভেবে দিবানিশি মরি যাতনায়!
 কেন, সখি, দু-জনের দেখা হ'ল আমাদের,
 দারুণ মিলন হেন কেন হল হায়?
 জানি যে রে এ হৃদয়, দারুণ কলঙ্কময়!
 কি বলে দিব এ হৃদি চরণে তোমার!
 চরণে ফেল লো দলি হেন উপহার!
 সতত শরমে বিন্ধি লুকাতে চাহি এ হৃদি—
 এ হৃদে বাসিলে ভাল মরে যাই লাজে,
 হেন নীচ হৃদয়েরে ভালবাসা সাজে!
 ভাল আমি বাসি তোরে, চিরকাল বাসিব রে,
 তবু চাহি নাকো আমি তোর ভালবাসা—
 লয়ে তোর নিজ মন সুখে থাক্ অনুরক্ষণ,
 হেন নীচ হৃদয়ের রাখিস নে আশা!
 বল লো কিসের ব্যথা পেয়েছিস মনে?
 থাক্, থাক্, কাজ নেই, থাক্ তা গোপনে—
 হয়েছে ত যা হবার, বলে তা কি হবে আর!
 হয়ত আমিই কিছ্ করিয়াছি দোষ!
 কাজ কি সে কথা তুলে, সে-সব যা না লো ভুলে,
 একবার কাছে আয় এইথেনে বোস্!
 আধেক অধর-ভরা দেখি সেই হাসি,
 ঢাল্ লো ত্বষিত নেত্রে সুধা রাশি রাশি!
 সখি মুখ তুলে চা' লো, একটি কথা ক' না লো—

ললিতা রে, মৌন হয়ে থাকিস নে আর!
একবার দয়া করে কর্ তিরস্কার!
সন্ধ্যা হয়ে আসিয়াছে গেল দিনমান—
একটি রাখিব কথা? গাহিব কি গান?

ললিতার গান

বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙ্গেছে প্রণয়,
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয়?
ও শূন্য বাড়ায় ব্যথা— সে-সব পুরাণো কথা
মনে করে দেয় শূন্য, ভাঙে এ হৃদয়।
প্রতি হাসি, প্রতি কথা, প্রতি ব্যবহার—
আমি যত বুঝি তব কে বুঝিবে আর!
প্রেম যদি ভুলে থাক সত্য ক'রে বলনাকো,
করিব না মৃহদন্তের তরে তিরস্কার!
আমি তো বলেই ছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী,
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আর কারে ভালবেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভালবেসো নাথ, না করি বারণ।
মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা,
পুরাণো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ!

অনিল। [স্বগত]

কি!—শেষে এই হ'ল, এই হ'ল হয়!
কি করেছি যার লাগি এ গান সে গায়?
তবে সে সন্দেহ করে প্রণয়ে আমার!
বিশ্বাস নাইক তবে মোর 'পরে আর!
বিশ্বাস নাইক তবে? তাই হবে, তাই হবে—
এত করে এই তার হ'ল পুরস্কার!
সন্দেহ করিবে কেন? কি আমি করেছি হেন!
সন্দেহ করিতে তার কোন্ অধিকার?
আমি কি রে দিন রাত রহি নি তাহারি সাথ?
সতত করি নি তারে আদর যতন?
বার বার তারে কি রে শূন্যই নি ফিরে ফিরে
মৃহদন্তের তরে হেরি বিষন্ন আনন?
একটি কথার তরে কত-না শূন্যই তারে—
একটি হেরিতে হাসি রজনী পোহাই!
তাই কি রে এই হল? শেষে কি রে এই হল?
তাইতে সংশয় এত? অবিশ্বাস তাই?
কল্পনায় অকারণে সে যদি কি করে মনে,
আমি কেন তার লাগি সব' তিরস্কার?
তবে কি সে মনে করে ভাল বাসি নাকো তারে!

সকলি কপট তবে প্রণয় আমার?
 না হয় ভাল না বাসি, দোষ তাহে কার?
 কখনো সে কাছে এসে করেছে আদর?
 কখনো সে মদুছায়েছে অশ্রুবারি মোর?
 আমি তারে যত্ন যত করেছি সতত
 বিনিময় আমি তার পেয়েছি কি তত?
 করেছি ত আমার যা ছিল করিবার;
 সহিতে হয় নি কভু অনাদর তার!
 তবু সে কি করে আশা! হৃদয়ের ভালবাসা?
 আদরেই ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ,
 তবু সে করিবে কেন মোরে অবিশ্বাস?

[প্রস্থান

ললিতা। আর কেন অনুক্ষণ রহি তার পাশে
 নিতান্তই যদি মোরে ভাল নাহি বাসে?
 বিরক্তিতে ওষ্ঠ তার কাঁপিতেছে বার বার,
 তবুও ললিতা তার পায়ে পড়ে আছে!
 সঙ্গ তার তেয়াগিয়া আছেন বিরলে গিয়া,
 সেথাও ললিতা ছুটে গেছে তাঁর কাছে!
 এই মুখে হাসি ছিল তারে দেখি মিলাইল,
 তবু সে রয়েছে বসি পদতলে তাঁর!
 যেখানেই তিনি যান সেথাই দেখিতে পান
 এই এক পুরাতন মুখ ললিতার!
 প্রমোদ-আগারে বসি—সেথা এই মুখ!
 বিরলে ভাবনা-মগ্ন—সেথা এই মুখ!
 বিজনে বিষাদভরে নয়নে সলিল ঝরে,
 সেথাও সমুখে আছে এই—এই মুখ!
 কি আছে এ মুখে তোর ললিতা অভাগী?
 ওই মুখ—ওই মুখ দিবানিশি ওই মুখ
 যেথা যান সেথা লয়ে যাস্ রে কি লাগি?
 ছিন্দু ওই পদতলে প'ড়ে দিন রাত—
 করেছিন্দু পথরোধ. দিয়েছ তাহার শোধ—
 ভালই করেছ, সখা, করেছ আঘাত!
 মনে করেছিন্দু, সখা, প্রণয় আমার
 ফুলময় পথ হবে, তোমারে বুকতে লবে—
 চরণে কঠিন মাটি বাজিবে না আর!
 কিন্তু যদি ও পদের কাঁটা হয়ে থাকি
 এখনিই তুলে ফেল, এখনিই দ'লে ফেল—
 এমন পথের বাধা কি হবে গো রাখি?
 আজ হতে দিবানিশি রব নাকো কাছে?
 নিতান্তই ফাটে বুক, অশ্রুবারি আছে—
 বিজনে কাঁদিতে পারি— একেলা ভাবিতে পারি—
 আর কি করি গো আশা? হবে যা হবার,

না ডাকিলে কাছে কভু যাবে নাকো আর!
 এক দিন, দুই দিন, চলে যাবে কত দিন,
 তবু যদি ললিতারে না পান দেখিতে—
 যে ললিতা দিন রাত রহিত গো সাথে সাথ,
 সতত রাখিত তাঁরে আঁখিতে আঁখিতে,
 বহু দিন যদি তারে না দেখেন আর
 তবু কি তাহারে মনে পড়ে নাকো তাঁর?
 ভাবেন কি একবার— ‘তারে যে দেখি না আর?
 ললিতা কোথায় গেল? কোথায় সে আছে?’
 হয়ত গো একবার ডাকিবেন কাছে—
 দেখিবেন ললিতার মুখে হাসি নাই আর,
 কেঁদে কেঁদে আঁখি গেছে জ্যোতিহীন হয়ে—
 একবার তবু কি রে আদর করেন মোরে
 অতি শীর্ণ মূখ মোর বুক তুলে লয়ে?
 তখন কাঁদিয়া কব পা-দুখানি ধরে
 ‘বড় কষ্ট পেয়েছি গো, আর, সখা, সহে নাকো!
 মাঝে মাঝে একবার দেখা দিও মোরে!’

বিংশ সর্গ

নলিনী

গান

সখি লো, শোন্ লো তোরা শোন্,
 আমি যে পেয়েছি এক মন!
 সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুধার,
 সমস্ত আমার কাছে তার—
 পেয়েছি পেয়েছি আমি, সখি,
 একটি সমগ্র মন প্রাণ!
 লাজ ভয় কিছু নাই তার,
 নাই তার মান অভিমান!
 রয়েছে তা আমারি মূঠিতে,
 সাধ গেলে পারি তা টুটিতে,
 যা ইচ্ছা করিতে পারি তাই—
 সাধ গেলে হাসাই কাঁদাই,
 সাধ গেলে ফেলে তারে দিই,
 সাধ গেলে তুলে তারে রাখি,
 ইচ্ছা হয় তাড়াইতে পারি,
 ইচ্ছা হয় কাছে তারে ডাকি!

জানে না সে রোষ করিবারে,
 ফিরে যেতে নাহি পারে আর,
 শূন্য জানে হাসিতে কাঁদিতে—
 আর কিছুর সাধ্য নাই তার!
 সখি লো, এমন মন এক
 পেয়েছি—পেয়েছি তোরা দেখ্!
 আমি কভু চাই নি এ মন,
 ইহাতে মোর কি প্রয়োজন?
 পথিক সে, পথে যেতে যেতে
 দেখা হ'ল চোখেতে চোখেতে—
 মনখানা হাতে ক'রে নিয়ে
 আপনি সে রেখে গেল পায়,
 চলে গেল দূর দূরান্তরে
 মন পড়ে রহিল ধূলায়।
 দূ-দৃষ্ট চাহিয়া দেখিলাম,
 ভাবিনু “মোর কি প্রয়োজন!”
 আঁখি দুটি লইনু তুলিয়া,
 দূরে যেতে ফিরানু বদন!
 অমনি সে নৃপদরের মত
 চরণ ধরিল জড়াইয়া,
 সাথে সাথে এল সারা পথ
 রূপু বদনু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
 সখি, আমি শুধাই তোদের
 সত্য ক'রে মোরে বল্ দেখি,
 পায়ে স্বর্ণভূষণের চেয়ে
 হৃদয়ের নৃপদর শোভে কি?
 কি করিব বল্ দেখি তাহা—
 আপনি সে গেল যদি রেখে!
 আমি ত চাই নি তারে ডেকে!
 আমারেই দিলে কেন আসি,
 রূপসী ত ছিল রাশি রাশি!
 সুহাসি কমলা ছিল না কি?
 শূন্যে মধুর তার আঁখি!
 বিনোদিনী ছিল ত সেথায়,
 রূপ তার ধরে না ধরায়!
 তবে কেন মনখানি তার
 আমারে সে দিল উপহার?
 দেব কি ইহায়ে দূরে ফেলে,
 অথবা রাখিব কাছে ক'রে,
 তাই ভাবিতেছি মনে মনে—
 কি করিব বল্ তাহা মোরে।

একবিংশ সর্গ

অনিল

কেমন? এখন তোর ঘুচেছে ত ভ্রম?
 ভেঙে দিলি হাল তুই, তুলে দিলি পাল তুই,
 করিলি প্রবৃত্তিপ্লোতে আত্মবিসর্জনে—
 ভেবেছিলি যাবি ভেসে কোন ফুলময় দেশে
 চাঁদের চুম্বনে যেথা ঘুমায়ে গোলাপ
 স্নেহের স্বপনে কহে সুরভিপ্রলাপ!
 কিন্তু রে ভাগিণি তরী কঠিন শৈলের 'পরি,
 কিছুতেই পারিলি নে সামালিতে আর!
 এখন কি করিবি রে ভাব্ একবার!
 ভগ্নকাণ্ঠ বকে ধরি উন্মত্ত সাগর-'পরি
 উলটিয়া পালটিয়া যাবি ভেসে ভেসে—
 নাই দ্বীপ, নাই তীর, উনমত্ত জলধির
 ফেনজটা উর্মি যত নাচে অটু হেসে।
 কেমন? এখন তোর ঘুচেছে ত ভ্রম?
 এই ত নলিনী তোর? প্রাণের দেবতা তোর?
 ছি ছি রে, কোথায় গিয়ে ঢাকিবি শরম?
 নীচ হতে নীচ অতি—হীন হতে হীন—
 পথের ধুলার চেয়ে অসার মলিন।
 এই এক ধূলিমুষ্টি কিনিয়া রাখিতে
 সমস্ত জগৎ তোর চেয়েছিলি দিতে!
 রাজপথে মনের দোকান খুলিয়াছে—
 রঙ্গ মাখাইয়া কত ঝুটা মন শত শত
 সাজাইয়া রেখেছে সে দয়ারের কাছে,
 যে কোন পথিক আসে ডাকি তারে লয় পাশে,
 হৃদয়ের ব্যবসায় করে সে রমণী—
 আমায়েও প্রতারণা করেছে এমনি!
 যে মন কিনিয়াছিনু কিছুই সে নয়,
 রঙ্গ-করা দুটা হাসি দুটা কথা-ময়!
 প্রতি পিপাসিত আঁখি যে হাসি লুটিছে,
 প্রতি শ্রবণের কাছে যে কথা ফুটিছে,
 যে হাসির নাই বাস, নাই অন্তঃপুর,
 চরণে যে বেঁধে রাখে মধুর নুপুর,
 যে হাসি দিবস রাতি ভিক্ষার অঞ্জলি পাতি
 প্রতি পথিকের কাছে নাচিয়া বেড়ায়—
 অনিল রে! তারি তরে কেন্দেছিল হায়!
 যে কথা, পথের ধারে পঙ্কের মতন,
 জড়াইয়া ধরে প্রতি পান্থের চরণ,
 সেই একটি কথা-তরে হৃদয় আমার,
 দিবানিশি ছিলি পড়ে দয়ারে তাহার!

হৃদয়ের হত্যা করা যার ব্যবসায়
 সেই মহা পার্শ্বস্তার তুলনা কোথায়?
 শরীর ত কিছু নয়, সে ত শুধু ধূলা—
 ধূলির মূর্ছির সাথে হয় তার তুলা—
 সমস্ত জগৎ তুল্য হৃদয়ের পাশে
 সাধ ক'রে হেন হৃদি যেজন বিনাশে,
 তোর মাথা পরশিল তাহারি চরণ!
 তারেই দেবতা ব'লে করিল বরণ!
 তারি পদতলে তুই সর্পিপলি হৃদয়—
 তোর হৃদি—যার কাছে কিছুই সে নয়!
 শতেক সহস্র হেন নলিনী আসুক কেন
 মনের পথের তোর ধূলিও না হয়!
 বিধাতা, এ সৃষ্টি তব সব বিড়ম্বনা,
 সত্য ব'লে যাহা কিছু পরশিতে গেছি পিছু
 ছুঁয়েছি যেমনি আর কিছুই রয়ে না!
 হৃদে হৃদে ভালবাসা করেছ সগার,
 অথচ দাও নি লোক ভালবাসিবার!
 সমস্ত সংসার এই খুঁজিয়া দেখিলে
 দুটি হৃদি একরূপ কেন নাহি মিলে?
 ওই-যে ললিতা হেথা আসিছে আবার!
 করেছে সমস্ত মধু বিষগ্ন আধার!
 কেন? তার হয়েছে কি ভেবে ত না পাই
 যা লাগি বিষগ্ন হয়ে রয়েছে সদাই!
 চায় কি সে দিন রাগি বৃকে তারে রাখি,
 অবাক্ মূখেতে তার তাকাইয়া থাকি?
 দিবানিশি বলি তারে শত শত বার
 “ভালবাসি—ভালবাসি প্রেমসী আমার”!
 তবেই কি মধু তার হইবে উজ্জ্বল?
 তবেই মূর্ছিবে তার নয়নের জল?
 এত ভাল কত জন বাসে এ ধরায়?
 নিঃশব্দে সংসার তবু চ'লে কি না যায়!
 ঘরে ঘরে অশ্রুবারি ঝরিত নহিলে,
 জগৎ ভাসিয়া যেত নয়নসলিলে!
 দিনরাত অশ্রুবারি আর ত সহিতে নারি—
 দূর হোক, হেথা হতে লইব বিদায়,
 অদৃষ্টের অত্যাচার সহ্য নাহি যায়!

[অনিলের প্রস্থান]

[ললিতার প্রবেশ]

ললিতা। এমনি ক'রেই তোর কাটিবে কি দিন?
 ললিতা রে, আর ত সহ্য না!
 এ জীবন আর ত রয়ে না!

বিধাতা, বিধাতা, তোর ধরি রে চরণ—
 বল্ মোরে কবে মোর হইবে মরণ?
 নাইক সুখের আশা— চাই নাকো ভালবাসা—
 সুখসম্পদের আশা দুরাশা আমার—
 কপালে নাইক যাহা চাই না তা আর!
 এক ভিক্ষা মাগি ওরে— তাও কি দিবি নে মোরে?
 সে নহে সুখের ভিক্ষা—মরণ—মরণ!—
 মরণ—মরণ দে রে— আর কিছ্ চাহি নে রে,
 আর কোন আশা নাই—মরণ মরণ!—
 এখনি মর্দিলে আঁখি যদি রে আর না থাকি,
 অমনি বায়ুর স্রোতে মিশাইয়া যাই—
 এখনি এখনি আহা হয় যদি তাই!

[অনিলের প্রবেশ]

ললিতা। কোথা যাও, কোথা যাও, সখা, তুমি কোথা যাও—
 একবার চেয়ে দেখ এই দিক-পানে!
 কহি গো চরণ ধরে— ফেলিয়া যেও না মোরে!
 আর ত যাতনা, সখা, সহে না এ প্রাণে।
 ভালবাসা চাই না ত, সখা গো, তোমার—
 একটুকু দয়া শূন্য কোরো একবার!
 একটুকু কোরো, সখা, মূখের ষতন—
 মূহূর্ত্তের তরে, সখা, দিও দরশন!
 নিতান্ত সহিতে নারি যবে পা-দুখানি ধরি
 আঘাত করিয়া, সখা, ফেলিও না দূরে—
 এইটুকু দয়া শূন্য কোরো তুমি মোরে!
 কোথা যাও বল বল, কোথা যাও চলে!
 যেতেছ কি হেথা হ'তে আমি আছি বলে?
 গভীর রজনী এবে যদুমেতে মগন সবে—
 বল, সখা, কোথা যাও, চাও কি করিতে?

অনিল। মরিতে! মরিতে বালা! যেতেছি মরিতে!
 ললিতা, বিধবা তুই আজ হতে হলি!
 ফেল্ অনিলের আশা মন হতে দলি!
 আর তুই সাথে সাথে আসিস নে মোর,
 হেথা রহি যাহা ইচ্ছা করিস রে তোর!
 আবার! আবার!
 থাক্ ওইথেনে তুই, এগোস নে আর!
 শত শত বার ক'রে বলিতে কি হবে তোরে?
 দাঁড়া হোথা, এক পদ আসিস নে আর!
 আসিস নে বলি তোরে, বলি বার বার!
 শান্তিতে মরিব যে রে তাও তুই দিবি নে রে!
 মরিতে যেতেছি, তবু রাহুর মতন
 পদে পদে সাথে সাথে করিবি গমন?

দাঁড়া হোথা, সাথে সাথে আসিস নে আর,
এই তোরে 'পরে শেষ আদেশ আমার!

[অনিলের প্রস্থান ও ললিতার মর্চ্ছিত হইয়া পতন]

দ্বাবিংশ সর্গ

নলিনীর প্রতি বিনোদের গান

তুই রে বসন্ত সমীরণ,
তোরে নহে সুখের জীবন।
কিবা দিবা কিবা রাতি পরিমলমদে মাতি
কাননে করিস বিচরণ—
নদীরে জাগায়ে দিস লতারে রাগায়ে দিস
চুপিচুপি করিয়া চুম্বন।
তোরে নহে সুখের জীবন!
যেথা দিয়া তুই যাস পদতলে চারি পাশ
ফুলেরা খুলিয়া দেয় প্রাণ!
বৃকের উপর দিয়া যাস তুই মাড়াইয়া,
কিছু না করিস অবধান।
শূন্যে মূখের কথা আকুল হইয়া লতা
কত তোরে সাধাসাধি করে—
দুটা কথা শূন্যি বা, দুটা কথা বলিলি বা,
চলে যাস দূর দূরান্তরে!

পাখীরা খুলিয়া প্রাণ করে তোরে গুণগান,
চারি দিকে উঠে প্রতিধ্বনি :
বকুলের বালিকারা হইয়া আপন-হারা
ঝরি পড়ে সুখেতে অমনি!
তবু রে বসন্ত সমীরণ,
তোরে নহে সুখের জীবন!

আছে যশ, আছে গান, আছে শত মন প্রাণ—
শুধু এ সংসারে তোরে নাই
এক তিল দাঁড়াবার ঠাই!
তাই রে জোছনারাতে অথবা বসন্তপ্রাতে
গাস যবে উল্লাসের গান,
সে রাগিণী মনোমাঝে বিষাদের সুরে বাজে,
হাহাকার করে তাহে প্রাণ!
শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়—

শ্যামল বাহুর ডোরে বাঁধিয়া রাখিব তোরে
ছোট সেই কুঞ্জটির ছায়!
তুই সেথা র'স যদি তবে সেথা নিরবধি
মধুর বসন্ত জেগে রবে,
প্রতি দিন শত শত নব নব ফুল যত
ফুটিবেক, তোরি সব হবে।
তোরি নাম ডাকি ডাকি একটি গাহিবে পাখী,
বাহিরে যাবে না তার স্বর!
সে কুঞ্জেতে অতি মৃদু মাণিক ফুটাবে শূদ্ধ
বাহিরের মধ্যাহ্নের কর।
নিভৃত নিকুঞ্জছায় হেলিয়া ফুলের গায়
শুনিয়া পাখীর মৃদু গান
লতার-হৃদয়ে-হারা সুখে-অচেতন-পারা
ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ!
তাই বলি, বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়!
অতৃপ্ত মনের আশ লুটিয়া সুখের রাশ,
কেন রে করিস্ হায় হায়!

ত্রয়োবিংশ সর্গ

কবি

মুরলা কোথায়?

সে বালা কোথায় গেল? কোথায়? কোথায়?
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, কিন্তু রে মুরলা কই?
খুঁজে খুঁজে ভ্রমি তারে হেথায় হোথায়?
সে মোর সন্ধ্যার দীপ, কোথা গেল বল!
একটি আঁধার ঘরে একাকী সে জ্বলিত রে
সন্ধ্যার দীপের মত বিষন্ন উজ্জ্বল।
সন্ধ্যা হ'লে ধীরে ধীরে আসিতাম ঘরে ফিরে
শ্রান্ত পদক্ষেপে অতি মৃদু গান গেয়ে,
সুদূর প্রান্তর হতে দেখিতাম চেয়ে—
মোর সে বিজন ঘরে শূন্য বাতায়ন-পরে
একটি সন্ধ্যার দীপ আলো করে আছে—
আমারি—আমারি তরে পথ চেয়ে আছে—
আমারেই স্নেহভরে ডাকিতেছে কাছে।
হা মুরলা, কোথা গেলি, মুরলা আমার?
ওই দেখ্ ক্রমশই বাড়িছে আঁধার!

সমস্ত দিনের পরে কবি তোর এল ঘরে—
 প্রশান্ত মূখানি কেন দেখি না তোমার?
 ওই ত দ্বারের কাছে দীপটি জ্বালানো আছে,
 আসন আমার ওই রেখেছিস পেতে—
 আমি ভালবাসি ব'লে যতনে আনিয়া তুলে
 রজনীগন্ধার মালা দিয়েছিস গেথে!
 কিন্তু রে দেখি না কেন তোর মূখখানি?
 শত শত বার ক'রে ভ্রমিতেছি ঘরে ঘরে—
 কোথাও বসিতে নারি, শান্তি নাই মানি!
 হুহু করি উঠিতেছে সন্ধ্যার বাতাস,
 প্রতি ঘরে ভ্রমিতেছে করি হাহুতাশ!
 কাঁপে দীপশিখা তাহে, নিভিয়া যাইতে চাহে—
 প্রাচীরে চমকি উঠে ছায়ার আঁধার!
 সে মূখ দেখি নে কেন? সে স্বর শুনি নে কেন?
 প্রাণের ভিতরে কেন করে হাহাকার?
 জানি না হৃদয়খানা ফাটিয়া কেন রে
 আঁখি হতে শতধারে অশ্রুবারি ঝরে?
 কে যেন প্রাণের কাছে কি-জানি-কি বলিতেছে,
 কি-জানি-কি ভাবিতেছি ভাবিয়া না পাই!
 কোথা যাই—কোথা যাই—বল্ কোথা যাই!
 মূরলা রে—মূরলা, কোথায়?
 কোথায় গেলি রে বালা? কোথায়? কোথায়?

[চপলার প্রবেশ]

চপলা । কবি গো, কোথায় গেল মূরলা আমার?
 দারুণ মনের জ্বালা আর সহিল না বালা—
 বৃষ্টি চ'লে গেল তাই, ফিরিবে না আর!
 বৃষ্টি সে মূরলা মোর, সমস্ত হৃদয়
 তোমারে সর্পিপয়াছিল—আর কারে নয়।
 বৃষ্টি বা সে ভাল ক'রে পেলে না আদর,
 কাঁদিয়া চলিয়া গেল দূর দেশান্তর।
 চল কবি, মূরলারে খুঁজিবারে যাই—
 আরেকটি বার যদি তার দেখা পাই,
 ভাল ক'রে তারে তুমি করিও যতন,
 কবি গো কহিও তারে স্নেহের বচন।
 করুণ মূখানি তার বদকে তুলে নিও,
 অশ্রুজলধারা তার মূছাইয়া দিও!

চতুর্বিংশ সর্গ

নলিনী

সে জন চলিয়া গেল কেন?
 কি আমি করেছি বল্ হেন!
 সে মোরে দেছিল ভালবাসা,
 আমি তারে দিয়েছিঁন্দু আশা।
 হেসেছি তাহার পানে চেয়ে,
 তুষেছি তাহারে গান গেয়ে!
 এক সাথে বসেছি হেথায়,
 তবে বল' আর কি সে চায়?
 চায় কি সঁপিব তারে প্রাণ,
 করিব জগৎ মোর দান?
 মোর অশ্রুজল—মোর হাসি—
 আমার সমস্ত রূপরাশি?
 কে তার হৃদয় চেয়েছিল?
 আপনি সে এনে দিয়েছিল।
 পাছে তার মন ব্যথা পায়,
 জ্ব'লে মরে প্রেম-উপেক্ষায়,
 দয়া ক'রে হেসেছিঁন্দু তাই—
 তাই তার মৃথপানে চাই।
 দয়া ক'রে গান গেয়েছিঁন্দু,
 দয়া ক'রে কথা কয়েছিঁন্দু।

একি তবে মন-বিনিময়?
 হৃদয়ের বিসর্জন নয়?

সখি, তোরা বল্ দেখি, সত্য চ'লে গেল সে কি?
 ফিরায়ে কি লইল হৃদয়?
 এবার যদি সে আসে যাইব তাহার পাশে,
 ভাল করে কথা কব হেসে—
 গান গাব তার কাছে এসে?
 এত দূরে গেছে তার মন,
 গলাতে কি নারিব এখন?

পঞ্চবিংশ সর্গ

মদুরলা

ওই ধীরে সন্ধ্যা হয়-হয়!
 গ্রামের কানন হল অন্ধকারময়!
 যতই ঘনায়ে আসে সন্ধ্যার আঁধার—

কাঁদিয়া ওঠে গো কেন হৃদয় আমার?
 দৃঃখ যেন অতিশয় ধীরে ধীরে আসে—
 পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, বসে মোর পাশে!
 মরমেতে আঁখি রাখে, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে,
 কি মন্ত্র পড়িতে থাকে বৃকের উপরে!
 কেন গো এমন হয় প্রাণের ভিতরে?
 সন্ধ্যাদীপ ঘরে ঘরে উঠিল জ্বলিয়া—
 বাহিরে যে দিকে চাই কিছু না দেখিতে পাই—
 আঁধার বিশালকায়া আছে ঘুমাইয়া!
 ভিতরে কুণ্ডের বৃকে নিভতে মনের সূখে
 ছোট ছোট আলোগুলি রয়েছে জাগিয়া!
 আমার আলয় নাই— ভাই নাই, বন্ধু নাই,
 কেহ নাই এক তিল করিবারে স্নেহ—
 দিবস ফুরায়ে এলে মোর তরে কেহ
 জ্বালায়ে রাখে না কভু প্রদীপটি ঘরে,
 পথপানে চেয়ে কেহ নাই মোর তরে!
 দিবসের শ্রমে ক্লান্ত—সন্ধ্যা যবে হয়
 কোথায় যে যাব, নাই স্নেহের আলয়!
 বিরাম বিশ্রাম নাই— আদর যতন নাই—
 পথপ্রান্তে ধূলি'পরে করি গো শয়ন,
 চেয়ে দেখিবার লোক নাই এক জন।
 অন্ধকার শাখা মেলি শৃঙ্খ বৃক্ষ যত
 কি ক'রে যে চেয়ে থাকে অবাকের মত!
 তারকার স্নেহশূন্য লক্ষ লক্ষ আঁখি
 এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে দূরাকাশে থাকি!
 স্নেহের অভাব মনে জেগে উঠে কেন?
 আশ্রয়ের তরে মন হুহু করে যেন!
 এত লক্ষ লক্ষ আছে সুখের কুটীর,
 একটিও নহে ওর এই অভাগীর!
 সারাদিন নিরাশ্রয় ঘুরিয়া বেড়াই,
 সন্ধ্যায় যে কোথা যাব তারো নাই ঠাই!
 কত শত দিন হ'ল ছেড়েছি আলয়—
 আজো কেন ফিরে যেতে তবু সাধ হয়?
 ঘুরে ঘুরে পথশ্রান্ত, নাই দিগ্বিদিক—
 আকাশ মাথার 'পরে চেয়ে অনিমিত্ত!
 লক্ষ্য নাই, আশা নাই, কিছু নাই চিতে—
 এমন ক'দিন আর পারিব থাকিতে?

আহা সে চপলা মোর, থাকিত সে কাছে।
 হয়ত তাহার মনে ব্যথা লাগিয়াছে!
 আমি কোথা হ'তে এক আসিয়া আঁধার
 মলিন করিয়া দিনু হৃদয় তাহার।

সদাই সে থাকে আহা প্রমোদের ভরে,
 মদহর্ষ সে মোর তরে কাঁদবে কেন রে?
 এতক্ষণে কবি মোর এসেছে ভবনে,
 কে রয়েছে তাঁর তরে বসি বাতায়নে?
 পদশব্দ শুননি তাঁর দ্বারায় অমনি
 দিতেছে দ্বার খুলি কে গো সে রমণী!
 প্রতিদিন মালা গণ্ঠে দিতাম যেমন,
 আজো কি তেমনি কেহ করে গো রচন?
 হয়ত আলায় তাঁর রয়েছে আঁধার,
 হয়ত কেহই নাই বাতায়নে তার।
 হয়ত গো কবি মোর ম্লিয়মাণ মন,
 কেহ নাই যার সাথে কথাটিও কন!
 হয়ত গো মুরলার তরে মাঝে মাঝে
 করুণ হৃদয়ে তাঁর ব্যথা বড় বাজে!
 হা নিষ্ঠুর মুরলা রে, কেন ছেড়ে এলি তাঁরে
 নিতান্ত একেলা ফেলি কবিরে আমার—
 হয়ত রে তোর তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর!
 বড় স্বার্থপর তুই, নয় দুঃখে তোর
 কাঁদিয়া কাঁটিয়া হ'ত এ জীবন ভোর,
 তাই কি ফেলিয়া আসে কবিরে একেলা!
 ফিরে চল্ মুরলা রে, চল্ এই বেলা!
 হা অভাগী, সন্ন্যাসিনী, আবার, আবার?
 কোথা কবি? কোন্ কবি? কে গো সে তোমার?
 মাঝে মাঝে দেখিস রে একি স্বপ্ন মিছে!
 স্বপনের অশ্রুজল দ্বারা ফেল্ মূছে!
 জীবনের স্বপ্ন তোর ভাঙিবে দ্বারায়—
 জীবনের দিন তোর ফুরায়-ফুরায়!
 ওই দেখ্ মৃত্যু তোর সম্মুখে বসিয়া
 কঙ্কালের ক্রোড় তার আছে প্রসারিয়া!
 সম্বন্ধ হয়েছে তোর মরণের সাথে,—
 দে রে তোর হাত তার অস্থিময় হাতে!
 এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালবাসে
 সে কেবল ওই মৃত্যু—ওই রে আকাশে!
 গুরুভার রক্তহীন হিমহস্তে তার
 আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার!
 হে মরণ! প্রিয়তম—স্বামী গো, জীবন মম,
 কবে আমাদের সেই সন্মিলন হবে?
 জীবনের মৃত্যুশয্যা তৈয়াগিব কবে?

ষড়্বিংশ সর্গ

নলিনী

আজ তার সাথে দেখা হ'ল,
 মুখ ফিরাইয়া চ'লে গেল!
 হা অদৃষ্ট, কাল মোরে হেরিয়া যে জন
 নলিনী নলিনী বলি হ'ত অচেতন,
 নিমেষ ভুলিত আঁখি, পূরিত না আশ—
 আমার সৌন্দর্যরাশি করিত যে গ্রাস,
 মোর রাঙা চরণের ধূলি হইবার
 হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
 ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
 মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন!
 আঁখির পিপাসা তার হৃদয়ের আশা তার
 নলিনীরে দেখে সেও ফিরালে নয়ন!
 পাশ দিয়া চ'লে গেল স্পর্শিতগমন?
 বিশ্বাসঘাতক যদি কাল পুন আসে
 নলিনী নলিনী বলি ফিরে পাশে পাশে,
 ভালবাসা ভালবাসা করে দিন রাত,
 তাহার পানে কি আর ফিরে চাই একবার!
 করি না কি বজ্রসম কটাক্ষনিপাত!
 হাসির ছুরিকা দিয়ে বির্পা তার মন
 দারুণ ঘৃণার বিষে করি অচেতন!
 ভিখারী বালক সেই দিবস রজনী যেই
 একটি হাসির তরে ছিল মুখ চেয়ে,
 একটি ইঞ্জিত পেলে আসিত যে ধৈর্যে,
 আজ মোরে—নলিনীরে—হেরি সেই জন
 চ'লে গেল একেবারে ফিরায়ে নয়ন!
 যেন আজ, আমি রে নলিনী নই আর—
 কাল যাহা ছিল আজ কিছূ নাই তার!
 এ হৃদে আঘাত দিবে মনে করে সে কি!
 সে যদি ফিরে না চায়, সে যদি চলিয়া যায়,
 তাহা হ'লে নলিনী এ কে'দে মরিবে কি!
 এই যে উড়াই ধূলা চরণের ঘায়
 বায়ুভরে এও ত পশ্চাতে চ'লে যায়,
 তাই নলিনীর আঁখি অশ্রু বরিষিবে না কি!
 হা কপাল, এও সে কি ছিল মনে ক'রে
 কথা না कहিয়া সেও ব্যথা দিবে মোরে!
 এ যে হাসিবার কথা— সেও মোরে দিবে ব্যথা,
 কাল যারে নিতান্ত করেছি অবহেলা,
 কৃপা ক'রে দেখিতাম যার প্রেমখেলা,

সেও আজ ভাবিয়াছে ব্যাথবে এ মন
শব্দ কথা না কহিয়া, ফিরায়ে নয়ন!

সপ্তবিংশ সর্গ

কবি

মরলা রে—মরলা কোথায়?
দেশে দেশে ভ্রমিতেছে কোথায়—কোথায়?
সম্মুখে বিশাল মাঠ ধূধূ করিতেছে,
সে মাঠেতে অন্ধকার— বিস্তারিয়া বাহু তার
ভূমিতে রাখিয়া মূখ কেন্দ্রে মরিতেছে!
কোথা তুই—কোথা মরলা রে,
কোথা তুই গেলি বল—শুধাইব কারে?
উদিল সন্ধ্যার তারা ওই রে গগনে!
ওই তারা কত দিন দেখেছি দুজনে!
তা কি তোর মরলা রে মনে আর পড়ে না রে?
সে সকল কথা তুই ভুলিলি কেমনে?
কত দিন—কত কথা—কত সে ঘটনা—
মনের ভিতরে কি রে আকুলি ওঠে না?
তবে তুই কি পাবাণে বেধেছিলি হিয়া?
কেমনে কবিরে তোর গেলি তেয়াগিয়া?
বিজন আকাশে মোর ছিলি রে সতত
স্থিরজ্যোতি ওই সন্ধ্যাতারাটির মত,
যদি রে মূহূর্ত্ত-তরে আপনারে ভুলে
মেঘখন্ড রেখে থাকি এ হৃদয়ে তুলে,
তাই কি রে অভিমানে অস্ত যেতে হয়?
এ জনমে আর কি রে হবি নে উদয়?
আজ আমি লক্ষ্যহীন দিক হারাইয়া!
অসীম সংসারে কোথা বেড়াই ভাসিয়া!
দেখিতে যে পাব নাকো তোরে একেবারে—
সে কথা পারি নে কভু মনে করিবারে!
শব্দ কোন শুনিলেই আপনারে ছলি
মুদিয়া নয়ন-দুটি মনে মনে বলি—
“যদি এই শব্দ তারি পদশব্দ হয়!
যদি খুলিলেই আঁখি— অমনি তাহারে দেখি!
সম্মুখে সে মূখ আসি হয় রে উদয়!”
কোথায় মরলা! দেখা দে রে একবার,
খুঁজিয়া বেড়াতে হবে কত দূর আর?
মরলা রে—মরলা কোথায়!
একেলা ফেলিয়া মোরে গেলি রে কোথায়!

অষ্টবিংশ সর্গ

নলিনী

ভাল ক'রে সাজায়ে দে মোরে।
 বদ্বি রূপ পড়িতেছে ঝ'রে!
 করিতে করিতে খেলা জীবনের সন্ধ্যাবেলা
 বদ্বি আসে তিল তিল করে!
 বড় ভয় হয় প্রতিক্ষণ
 নলিনী হতেছে পুরাতন,
 একে একে সবে তারে তেয়গি যেতেছে হা রে—
 কেন, সখি, হতেছে এমন!
 ভুলে যে আমার কাছে আসে
 তখনি ত যাই তার পাশে,
 দ্বিগুণ আদরে ডাকি, হাসি, গাই, কাছে থাকি,
 তবুও কেন লো থাকে না সে!
 ছিল ত আমার রূপরাশ
 একেবারে পেলো কি বিনাশ?
 সংসারে কেবলি তবে রূপের কাঙাল সবে?
 কাঁচি মদুখানির সবে দাস?
 ভালবাসা ব'লে কিছু নাই?
 স্বার্থপর পদরুষ সবাই?
 চির-আত্মবিসর্জন করে যে ভকতমন
 হেন মন কোথা, সখি, পাই?
 মদুখেরই রাজত্ব যদি তবে
 এ মদুখ সাজায়ে দে লো তবে!

উনবিংশ সর্গ

ললিতা

সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্তর্বিষয়া
 ভ্রমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে—
 তাই বলি একবার আমারে ঘুমাতে দাও—
 শীতল করি এ হৃদি বিরামের স্নিগ্ধ জলে!
 শ্রান্ত এ জীবনে মোর আসুক নিশীথকাল,
 বিস্মৃতি-অধারে ডুবি ভুলি সব দুখজ্বালা,
 নিঃস্বপ্ন নিদ্রার কোলে ঘুমাতে গিয়াছে সাধ,
 মিশাতে মহাসমুদ্রে জীবনের স্রোতোমালা!
 শরীর অবশ অতি—নয়ন মূদিয়া আসে
 মৃত্যুর দ্বারের কাছে বসিয়া সন্ধ্যার বেলা,
 চৌদিকে সংসার-পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি—

আধ' স্বপ্নে আধ' জেগে দেখি গো মায়ার খেলা!
 কত শত লোক আছে—কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
 কেহ ঘৃণা করে, কেহ প্রাণপণে ভালবাসে—
 একটি কথার তরে কেহ বা কাঁদিয়া মরে,
 একটি চাহনি-তরে চেয়ে আছে কত মাস—
 একটি হাসির ঘায়ে কেহ বা কাঁদিয়া উঠে,
 একটি হেরিয়া অশ্রু কারো মুখে ফুটে হাস!
 কেহ বসে, কেহ ওঠে—কেহ থাকে, কেহ যায়—
 জীবনের খেলা দেখি মরণের দ্বারে শূন্যে—
 হাসি নাই, অশ্রু নাই—সুখ নাই, দুঃখ নাই—
 হাসি অশ্রু সুখ দুঃখ দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে।
 শূন্য শ্রান্তি, শূন্য শ্রান্তি—আর কিছু, কিছু নহে—
 নহে তৃষা, নহে শোক, নহে ঘৃণা, ভালবাসা—
 দারুণ শ্রান্তির পরে আসে যে দারুণ ঘুম
 সেই ঘুম ঘুমাইব—আর কোন নাই আশা!

প্রিংশ সর্গ

নলিনী

বড় সাধ গেছে মনে ভালবাসিবারে—
 সখি, তোরা বল্ দেখি ভালবাসি কারে?
 বসন্তে নিকুঞ্জবনে বেষ্টিত সহস্র মনে
 নলিনী প্রাণের খেলা শূন্য খেলিয়াছে,
 খেলা ছাড়া সত্যকার জীবন কি আছে?
 সে জীবন দেখিবারে বড় সাধ গেছে!
 মনেতে মিশায়ে মন সচেতনে অচেতন
 জগত হইয়া আসে মৃদু ছায়াময়,
 দুটি মন চেয়ে থাকে, দোঁহে দোঁহা ঢেকে রাখে—
 সজনি লো, সে বড় সুখের মনে হয়!
 সে সুখ কি পাই যদি ভালবাসি কারে?
 বড় সাধ যায়, সখি, ভালবাসিবারে!
 এত যে হৃদয় আছে, ভ্রমে নলিনীর কাছে—
 নলিনীর নহে কি গো একটিও তার?
 যদি কারো দ্বারে যাই, কাঁদিয়া আশ্রয় চাই,
 কেহই কি খুলিবে না হৃদয়ের দ্বার?
 হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া
 খেলোছি মনের খেলা সকলে মিলিয়া—
 সিংহাসন নিরমিত, আমারে বসিয়ে দিত,
 পদতলে ফুল তুলে দিত সবে আনি—
 গরবে উন্মত্তহিয়া আপনারে বিসরিয়া

ভাবিতাম আমি বৃষ্টি হৃদয়ের রাণী?
চারি দিকে আমার হৃদয়-রাজধানী!
দিবস সায়াহ্ন হ'ল, বসন্ত ফুরায়,
খেলাবার দিন যবে অবসান-প্রায়,
মাথায় পড়িল বাজ— সহসা দেখিনু আজ
আমি কেহ নই, শুধু খেলাবার রাণী—
বালুকার 'পরে গড়া খেলা-রাজধানী!
নিতান্ত ভিখারী আজ দীনহীন বেশে সাজি
দুয়ারে দুয়ারে আমি আগ্রয়ের তরে,
সবাই ফিরায় মুখ উপেক্ষার ভরে।
খেলা যবে ফুরাইল কে কোথায় চলে গেল—
তাই বড় সাধ যায় ভালবাসিবারে।
সখি, তোরা বল দেখি ভালবাসি কারে?

একত্রিংশ সর্গ

অনিল ও কবি

অনিল। একবার এস তুমি, চল গো হোথায়—
দেখে যাও কি হৃদয় দোলেছে দূ-পায়!
যখন কোরক সবে, খোলে নাই আঁখি,
তখন হৃদয়ে তার বসিয়া একাকী
দিনরাত—দিনরাত বিষদন্ত বিঁধি
আহা সেই সুকুমার কিশলয়হৃদি
বিন্দু বিন্দু রক্ত তার করেছে শোষণ!
কথাটি সে বলে নাই— মুখটি সে তুলে নাই,
হৃদয়ঘাতীয়ে হৃদে দিয়েছে আসন!
আজ সে যৌবনে যবে খুলিল নয়ন—
দেখিল হৃদয়ে তার নাই রক্তলেশ,
যৌবনের পরিমল হয়েছে নিঃশেষ!
কথাটি সে বলিল না— মুখটি সে তুলিল না,
দুর্বল মাথাটি আহা পড়িল গো নুয়ে
মাটিতে মিশাবে কবে, চেয়ে আছে ভুয়ে!
এস তবে বিষকীট, দেখ'সে আসিয়া—
হলাহলময় হাসি মরিও হাসিয়া—
একটু একটু করি কি করে যেতেছে মরি,
একটি একটি দল পড়িছে খসিয়া!
বিষাক্ত নিশ্বাসে তব বিষাক্ত চুম্বনে
কি রোগ পশিল তার সুকোমল মনে?
তার চেয়ে কেন তীর অশনি আসিয়া
দারুণ চুম্বনে তারে ফেলে নি নাশিয়া!

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে জ্বর জ্বর হলাহলে
 মম্মে মম্মে শিরে শিরে হ'ত না দহিতে,
 মনের ব্যথার 'পরে দংশন সহিতে!
 মৃহদন্তের আলিঙ্গনে মরিত, ফুরাত—
 মৃহদন্ত জ্বলিয়া শেষে সকল জুড়াত!
 যে কোশলে ধীরে ধীরে হৃদয়ের শিরে শিরে
 দারুণ মৃত্যুর রস করেছে সঞ্চার,
 সে কোশল সফল যে হয়েছে তোমার!
 তাই একবার এস— দেখ'সে স্বরায়
 কেমন করিয়া তার জীবন ফুরায়!
 নিদারুণ বিষ তব ফলে কি করিয়া,
 জ্বরিয়া মরিতে হ'লে মরে কি করিয়া!
 সে বালা, আসন্ন তার দেখিয়া মরণ,
 কাঁদিয়া তোমার কাছে করেছে প্রেরণ!
 এখনো চাও গো যদি, শেষ রক্তে তার
 দিবে গো সে প্রক্ষালিয়া চরণ তোমার।
 নিতান্ত দুর্বল বৃকে করিবে ধারণ
 ওই তব নিরদয় কঠিন চরণ!
 রক্তময় পদতলে বৃক ফাটি গিয়া
 নিতান্ত মরিবে বালা কথা না কহিয়া!
 তবে এস, তার কাছে এস একবার
 আরম্ভ করিলে যাহা শেষ দেখ তার!

দ্বাত্রিংশ সর্গ

নলিনী

আজ আমি নিতান্ত একাকী—
 কেহ নাই, কেহ নাই হায়!
 শূন্য বাতায়নে বসি পথপানে চেয়ে থাকি,
 সকলেই গৃহমুখে চ'লে যায়—চ'লে যায়!
 নলিনীর কেহ নাই হায়!
 পুরাণো প্রণয়ী-সাথে চোখে চোখে দেখা হ'লে
 সরমে আকুল হ'য়ে তাড়াতাড়ি যায় চ'লে।
 প্রণয়ের স্মৃতি শূন্য অন্ততাপ-রূপে জাগে,
 ভুলিবারে চাহে যেন ভাল যে বাসিত আগে।
 বিবাহ করেছে তারা, সুখেতে রয়েছে কিবা—
 ভাই বন্ধু মিলি সবে কাটাইছে নিশি দিবা।
 সকলেই সুখে আছে যে দিকে ফিরিয়া চাই,
 আমি শূন্য করিতেছি 'কেহ নাই—কেহ নাই'।

তাদের প্রেয়সী যদি মোরে দেখিবারে পায়
 হাসিয়া লুকানো হাসি মোর মুখ-পানে চায়—
 অবাক হইয়া তারা ভাবে কত মনে মনে,
 “এই কি নলিনী সেই মুখে যার হাসি নেই,
 বিষাদ-আঁধার জাগে জ্যোতিহীন দু-নয়নে!
 এই কি নাথের মন হয়েছিল একেবারে!”
 কিছতে সে কথা যেন বিশ্বাস করিতে পারে!
 হয়ত সে অভিমানে তুলিয়া পুরাণো কথা
 নাথের হৃদয়ে তার দিতে চায় মনোব্যথা।
 অমনি সে সসঙ্কেচে যেন অপরাধী-মত
 মরমে মরিয়া গিয়া বুঝাইতে চায় কত!
 সেদিন খেলিতেছিল নীরদের ছেলে দুটি,
 ক’চি মুখে আধ’ আধ’ কথা পড়িতেছে ফুটি,
 অযতনে কপালেতে পড়ে আছে চুলগুলি—
 চুপিচুপি কাছে গিয়ে কোলেতে লইনু তুলি।
 বুকেতে ধরিনু চাপি, হৃদয় ফাটিয়া গিয়া
 পড়িতে লাগিল অশ্রু দর দর বিগলিয়া!
 ডাগর নয়ন তুলি মুখপানে চেয়ে চেয়ে
 কিছখন পরে তারা চলিয়া গেল গো ধৈয়ে!
 আজ মোর কেহ নাই হয়,
 সকলেরি গৃহ আছে, গৃহমুখে চ’লে যায়—
 নলিনীর কিছ নাই হয়!

ত্রয়সিংশ সর্গ

পর্ণশয্যা শয়ান মুরলা। চপলা

চপলা। কি করিয়া এত তুই হ’লি রে নিষ্ঠুর,
 ললিতা সে, এত ভাল বাসিতিস যারে,
 কি করিয়া ফেলি তারে যাবি দূর—দূর—
 এতদিনকার প্রেম ছিঁড়ি একেবারে!
 কবি তোরে এত ভাল বাসে যে মুরলে,
 তারেও কি তুই, সখি, ফেলে যাবি চ’লে?

[কবি ও অনিলের প্রবেশ]

কবি। কি করিলি বল্ দেখি! কি করেছি তোর?
 মুরলা রে, মুরলা রে, মুরলা আমার, হা—রে,
 কি করেছি এত তুই হ’লি যে কঠোর?
 প্রাণ মোর, মন মোর, হৃদয়ের ধন মোর,
 সমস্ত হৃদয় মোর, জগৎ আমার—
 একবার বল্ বালা, বল্ একবার

ছাড়িয়ে যাবি নে মোরে ফেলি এ সংসার-ঘোরে,
নিতান্ত এ হৃদয়েরে রাখি অসহায়।
আয়, সখি, বন্ধুকে থাক, এই হেথা মাথা রাখ,
হৃদয়ের রক্ত ফেটে বাহিরিতে চায়।
মরলা, এ বন্ধু তুই ত্যজিস্ নে আর—
চিরদিন থাক, সখি, হৃদয়ে আমার!

মরলা। লও কবি, এই লও, এই মাথা তুলে লও—
অবসন্ন এ মাথা যে পারি নে তুলিতে,
একবার রাখ সখা, রাখ ও কোলেতে!
নিতান্তই স্বার্থপর হৃদয় আমার,
অতি নীচ হীন হৃদি এই মরলার—
নির্দয়—নির্দয় বড়—পাষণ হতেও দড়,
ধূলি হ'তে লঘুতর হৃদয় আমার!
নাহিলে কি ক'রে আমি, কবি, কবি মোর,
(হৃদয়ে ঘনায়ে ছিল কি মোহের ঘোর!)
স্নেহময় তোমারেও ত্যজি অনায়াসে
কি ক'রে আইনু চলি এ দূর প্রবাসে?
ও করুণ নয়নের অশ্রুব্যবধার
একবারো মনে নাহি পড়িল আমার?
অমন স্নেহের পানে ফিরে না চাহিয়ে
পারিনু আঘাত দিতে ও কোমল হিয়ে?
মার্জনা করিও এই অপরাধ তার,
কবি মোর, শেষ ভিক্ষা এই মরলার!
এমন দুর্বল হৃদি, এত নীচ, হীন,
এমন পাষণে গড়া, এতই সে দীন,
এ যে চিরকাল ধ'রে ছিল তব কাছে
এ অপরাধের, কবি, মার্জনা কি আছে?
সখা, অপরাধ সারা অস্তিত্ব তাহার—
মরণে করিবে আজি প্রায়শ্চিত্ত তার!
কেন আজ মুখখানি শীর্ণ ও মলিন—
বড় যেন শ্রান্ত দেহ, অতি বলহীন—
রাখ কবি, মাথা রাখ, এই বন্ধু মাথা রাখ,
একটু বিশ্রাম কর হৃদয়ে আমার!
ছি ছি সখা, কেঁদো নাকো, মরলার কথা রাখো
ও মুখে দেখিতে নারি অশ্রুব্যবধার!

কবি। এত দিন এত কাছে ছিনু এক ঠাই,
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত ভাগ্যে, সখি, ঘটিবে এমন
মরণের উপকূলে হইবে মিলন!

মরলা। কি যে সুখ পেতেছি তা বলিব কি ক'রে—
বল সখা, এখনি কি যাব আমি ম'রে?

এই মরণের দিন না যদি ফুরায়
 মরিতে মরিতে যদি বেঁচে থাকা যায়—
 দিন যায়, দিন যায়, মাস চলে যায়,
 তবু মরণের দিন না যদি ফুরায়!
 সখা ওগো, দাও মোরে, দাও মোরে জল—
 সুখেতে হয়েছি শ্রান্ত, অতি দূরবল।
 কবি। বিবাহ হইবে, সখি, আজ আমাদের—
 দারুণ বিরহ ওই আসিবার আগে, সই,
 অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের!
 আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা,
 উহারা অনন্ত সাক্ষী হবে বিবাহের!
 আজি এই দুটি প্রাণ হইল অভেদ,
 মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ।
 হোক তবে, হোক, সখি, বিবাহ সুখের—
 চিতায় বাসরশয্যা হোক আমাদের!
 মুরলা। তবে তুলে আন ত্বরা রাশি রাশি ফুল!
 চিতাশয্যা হোক আজি কুসুমের আকুল!
 রজনীগন্ধার মালা গাঁথ গো ত্বরায়,
 সে মালা বদল করি দিও এ গলায়—
 সেই মালা প'রে আমি তোমার সমুখে, স্বামি,
 করিব শয়ন সুখে সুখের চিতায়!
 সেই মালা প'রে যেন দগ্ধ হয় কায়!

[অনিলের ফুল অনিতে প্রস্থান]

কবি গো, বড়ই সাধ ছিল মনে মনে
 এক দিন কেঁদে নেব ধরি ও চরণে—
 দেখি, কবি, পা-দুখানি দেখি একবার,
 বড় সাধ গেছে মনে সুখে কাঁদিবার!
 কই, ফুল এল না ত, আসিবে কখন?
 এখনি ফুরায়ে পাছে যায় এ জীবন!
 আরো কাছে এস কবি, আরো কাছে মোর—
 রাখ হাত দুইখানি হাতের উপর!
 কবি গো, স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই কভু
 শেষদিনে এত সুখ হবে মোর প্রভু।
 এখনো এল না ফুল! সখা গো আমার,
 বড় যে হতেছি শ্রান্ত, পারি নে যে আর!

[ফুল লইয়া অনিলের প্রবেশ]

[অনিলের প্রতি] ললিতা কেমন আছে বল ভাই বল!
 অনিল। ললিতা কেমন আছে? সে আছে রে ভাল!
 মুরলা। চিরকাল ভাল যেন থাকে আদরিণী,
 চিরকাল পতিসুখে থাকে সোহাগিনী!
 কথা ক' চপলা, সখি, মাথা খা আমার—
 নীরবে নীরবে বসি কাঁদিস না আর!

মরণের দিনে দুঃখ র'য়ে গেল চিতে
হাসিখুশি মৃদু তোর পেন্দু না দেখিতে!
সুখে থাক্—সখি, তুই চিরসুখে থাক্—
হাসিয়া খেলিয়া তোর এ জীবন যাক্!
ওই-যে এসেছে মালা—কবি গো, স্বরায়
পরায় দাও গো তাহা এ মোর গলায়।
এই লও হাত মোর রাখ তব হাতে—
ছেলেবেলা হতে মোরে কত দয়া স্নেহ ক'রে
রেখেছ এ হাত ধরি তব সাথে সাথে,
আবার মোদের যবে হইবে মিলন
এ হাত আমার, কবি, করিও গ্রহণ—
যেথা যাবে সেথা রব, দুই জনে এক হব,
অনন্ত বাঁধনে রবে অনন্ত জীবন!

কবি। বিবাহ মোদের আজ হল এই তবে,
ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে!

মুরলা। [কবিকে] এস কবি, বন্ধু এস!

[অনিলকে] এস ভাই, কাছে বস!

[চপলাকে] একটি চুম্বন, সখি,—বন্ধি প্রাণ যায়,
এই শেষ দেখা এই দুখের ধরায়!
আসিছে আঁধার ঘোর— কবি, কোথা তুমি মোর!
আরো কাছে, আরো কাছে, এস গো হেথায়!
আজ তবে বিদায়, বিদায়!
স্বামি, প্রভু, কবি, সখা, আবার হইবে দেখা,
আজ তবে বিদায় বিদায়!

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

শয্যায় শয়ান ললিতা। অনিলের প্রবেশ

ললিতার গান

বায়দু! বায়দু! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা
কৌতুকে আকুল!

আমি একটি জুই ফুল!

সারা রাত এ মাথায় প'ড়েছে শিশির—
গণেছি কেবল!

প্রভাতে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত, হে সমীর,
অতি হীনবল!

ভাঙা বৃন্তে ভর করি রয়েছি জীবন ধরি
জীবনে উদাস!

ওগো উষার বাতাস!

শ্রান্ত মাথা পড়ে নুয়ে— চাহিয়া রয়েছে ভুঁয়ে
 মর'-মর' একটি জুঁই ফুল।
 কাছেতে এস না স'রে— এখনি পড়িবে ঝ'রে
 সুকুমার একটি জুঁই ফুল!
 ও ফুল গোলাপ নয় সুষমাসুন্দরভিময়,
 নহে চাঁপা, নহে গো বকুল!
 ও নহে গো মৃণালিনী তপনের আদরিণী,
 ও শুধু একটি জুঁই ফুল!
 ওরে আসিয়াছ দিতে কি সংবাদ হয়
 হে প্রভাতবায়?
 প্রভাতে নলিনী আজি হাসিছে সরসে?
 হাসুক সরসে!
 শিশিরে গোলাপগুলি কাঁদিছে হরষে?
 কাঁদুক হরষে!
 ও এখনি বৃন্ত হ'তে কঠিন মাটিতে
 পড়িবে ঝরিয়া—
 শান্তিতে মরে গো যেন মরিবার কালে,
 যাও গো সরিয়া!
 মুখখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে
 দাঁড়াইয়া কাছে—
 দেখিবারে— ক্ষুদ্র জুঁই মুখ নত করি
 অভিমান ক'রে বুদ্ধি আছে!
 নয় নয়, তাহা নয়, সে সকল খেলা নয়—
 ফুরায় জীবন!
 তবে যাও, চ'লে যাও— আর কোন ফুলে যাও
 প্রভাতপবন!
 ওরে কি শুধাতে আছে প্রেমের বারতা
 মর'-মর' যবে?
 একটি কহে নি কথা, অনেক সহেছে—
 মরমে মরমে কীট অনেক বহেছে—
 আজ মরিবার কালে শুধাইছ কেন?
 কথা নাহি ক'বে!
 ও যখন মাটি-'পরে পড়িবে ঝরিয়া
 ওরে ল'য়ে খেলাস নে তুই!
 উড়ায়ে হাস নে ল'য়ে হেথা হ'তে হোথা!
 ক্ষুদ্র এক জুঁই!
 যেথাই খসিয়া পড়ে সেথা যেন থাকে প'ড়ে,
 ঢেকে দিস শুকানো পাতায়!
 ক্ষুদ্র জুঁই ছিল কিনা কেহই ত জানিত না,
 মরিলেও জানিবে না তায়!
 কাননে হাসিত চাঁপা, হাসিত গোলাপ
 আমি যবে মরিতাম কাঁদি,

আজো হাসিবেক তারা শাখায় শাখায়
হাতে হাতে বাঁধি!
সে অজস্র হাসি-মাঝে সে হরষরাশি-মাঝে
ক্ষুদ্র এই বিষাদের হইবে সমাধি!

সমাপ্ত

ବୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା

ପ୍ରକାଶ : ୧୯୮୧

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ৰণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবারি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই—
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্য—পৰ্ব্বতগৃহা। রাত্রি

কালভৈরবের প্রতিমার সম্মুখে রুদ্রচন্দ্র

রুদ্রচন্দ্র।

মহাকালভৈরব-মুরতি,

শূন, দেব, ভক্তের মিনতি!

কটাক্ষে প্রলয় তব,

চরণে কাঁপছে ভব,

প্রলয়গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্রিলোচন।

তোমার বিশাল কায়া

ফেলেছে আঁধার ছায়া,

অমাবস্যারাত্রি-রূপে ছেয়েছে ভুবন।

জটার জলদরাশি

চরাচর ফেলে গ্রাসি,

দশনবিদ্যুত-বিভা দিগন্তে খেলায়।

তোমার নিশ্বাসে খসি

নিভে রবি, নিভে শশী,

শত লক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।

প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে,

জগতের শ্মশানেতে

প্রেতসহচরগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে—

নিদারুণ অট্টহাসে

প্রতিধ্বনি কাঁপে ত্রাসে,

ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুপ্তে করপুটে।

প্রলয়মুরতি ধর',

থরহর সদর নর,

চারি পাশে দানবেরা করুক বিহার—

মহাদেব, শূন শূন

নিবেদিন্দ পুনঃ পুন্

আমি রুদ্রচন্দ্র, চন্দ্র, সেবক তোমার।

যে সঙ্কল্প আছে মনে

সম্পিন্দ তা ও চরণে,

কৃপা করি লও দেব, লও তাহা তুলে।

এ দারুণ ছুরিখানি

অঘ্যরূপে দিন্দ আনি,

দন্দ-দণ্ড এ ছুরিকাটি রাখ পদমূলে।

কৃপা তব হবে কবে

মনোআশা পূর্ণ হবে,

মন হ'তে নেবে যাবে প্রতিজ্ঞা-পাষণ!

সঙ্কল্প হইলে সিদ্ধ

এ হৃদি করিয়া বিন্ধ

নিজের শোণিত দিব উপহারদান!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য—অরণ্য। রত্নচন্দ ও অমিয়া

রত্নচন্দ।

বার বার ক'রে আমি ব'লেছি, অমিয়া, তোরে
 কবিতা আলাপ-তরে নহে এ কুটীর,
 তবু তোরা বার বার মিছা কি প্রলাপ গাহি
 বনের আঁধার চিন্তা দিস্ ভাঙাইয়া!
 পাতালের গদ্যতম অন্ধতম অন্ধকার!
 অধিকার কর' এর বালিকা-হৃদয়,
 ও হৃদের সুখ আশা ও হৃদের উষালোক
 মৃদুহাসি মৃদুভাব ফেল গো গ্রাসিয়া!
 হিমাদ্রিপাষণ চেয়ে গুরুভার মন মোর,
 তেমনি উহার মন হোক গুরুভার!
 হিমাদ্রিতুষার চেয়ে রক্তহীন প্রাণ মোর,
 তেমনি কঠিন প্রাণ হউক উহার!
 কুটীরের চারি দিকে ঘনঘোর গাছপালা
 আঁধারে কুটীর মোর রেখেছে ডুবায়ে—
 এই গাছে, কতবার দেখেছি, অমিয়া তুই,
 লতিকা জড়ায়েছিস আপনার মনে—
 ফুলন্ত লতিকা যত ছিঁড়িয়া ফেলেছি রোষে,
 এ সকল ছেলেখেলা পারি নে দেখিতে!
 আবার কহি রে তোরে, বসি চাঁদ কবি-সনে
 এ অরণ্যে করিস নে কবিতা-আলাপ!

অমিয়া।

যাহা যাহা বলিয়াছ সব শুনিয়াছি পিতা—
 আর আমি আনমনে গাহি না ত গান,
 আর আমি তরুদেহে জড়ায়ে দিই না লতা,
 আর আমি ফুল তুলে গাঁথি না ত মালা!
 কিন্তু পিতা, চাঁদ কবি, এত তারে ভালবাসি,
 সে আমার আপনার ভায়ের মতন—
 বল মোরে বল পিতা, কেন দেখিব না তারে!
 কেন তার সাথে আমি কহিব না কথা!
 সেকি পিতা? তারে তুমি দেখেছ ত কত বার,
 তবু কি তাহারে তুমি ভালবাস নাই!
 এমন মূরতি আহা, সে যেন দেবতা-সম,
 এমন কে আছে তারে ভাল যে না বাসে!
 এই যে আঁধার বন তার পদার্পণ হ'লে
 এও যেন হেসে ওঠে মনের হরষে!

এই যে কুটীর, এও কোল বাড়াইয়া দেয়,
অত্যাধনা করে নি যে কোন অতিথিরে!
দ্রুতকূটি কোরো না পিতা, ওই দ্রুতকূটির ভয়ে
সমস্ত তোমার আজ্ঞা করেছি পালন।
পায়ে পড়ি ক্ষমা কর— এই ভিক্ষা দাও পিতা,
এ ভালবাসায় মোর করিও না রোষ!

রুদ্রচন্দ্র। মাতৃস্তন্য কেন তোর হয় নাই বিষ!
অথবা ভূমিস্টমশয্যা চিতাশয্যা তোর!
অমিয়া। তাই যদি হ'ত পিতা, বড় ভাল হ'ত!
কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বার্ষিক্য সহস্রধারে অশ্রুজলরাশি,
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ!
আগে ত লাগিত ভালো জোছনার আলো,
ফটন্ত ফুলের গন্ধ, বকুলতলাটি—
দ্রুতকূটির ভয়ে তব ডরিয়া ডরিয়া
তাহাদেরো 'পরে মোর জন্মেছে বিরাগ!
শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে
বড়ই হরষে পিতা সব যাই ভুলে,
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয়
দেহ ছাড়ি তাড়াতাড়ি বাহিরিতে চায়!
সে আইলে তার কাছে যেতে দিও মোরে!
সে যে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই!

রুদ্রচন্দ্র। বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই!
শত তীক্ষ্ণ বজ্র তার পড়ুক মস্তকে,
চিরজীবী হউক সে অগ্নিকুণ্ডমাঝে!
মুখ ঢাকিস নে তুই, শোন্ তোরে বলি,
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই—
চাঁদ করি এ কাননে করে পদার্পণ
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার
তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন!

অমিয়া। ও কথা বোল' না পিতা—

রুদ্রচন্দ্র। চুপ্, শোন্ বলি;
জীবন্তে ছুরিকা দিয়া বিধিয়া বিধিয়া
শত খণ্ড করি তার ফেলিব শরীর,
পান্ডুবর্ণ আঁখি-মুদা ছিন্ন মুণ্ড তার
ওই বৃক্ষশাখা-'পরে দিব টাঙাইয়া,
ভিজিবে বর্ষার জলে পড়িবে তপনে
যতদিনে বাহিরিয়া না পড়ে কঙ্কাল!
শুনিয়া কাঁপিতেছি, দেখিবি যখন
মস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি!

আপনার ভাই তোর! কে সে চাঁদ কবি!
 হতভাগ্য পৃথ্বীরাজ, তারি সভাসদ!
 সে পৃথ্বীরাজের হীন জীবন মরণ
 এই ছুরিকার 'পরে রয়েছে ঝুলান'!
 অমিয়া। থাম পিতা, থাম থাম, ও কথা বোলো না!
 শত শত অভাগার শোণিতের ধারা
 তোমার ছুরিকা ওই করিয়াছে পান,
 তবুও—তবুও ওর মিটে নি পিপাসা?
 কত বিধবার আহা কত অনাথার
 নিদারুণ মর্মভেদী হাহাকারধ্বনি
 তোমার নিষ্ঠুর কণ করিয়াছে পান,
 তবুও তবুও ওর মিটে নি কি তৃষা?

রুদ্রচন্দ্র।

[আপনার মনে]—
 মিটে নাই, মিটে নাই! মোরে নির্ব্বাসন!
 রাজ্য ছিল, ধন ছিল, সব ছিল মোর,
 আরো কত শত আশা ছিল এই হৃদে—
 রাজ্য গেল, ধন গেল, সব গেল মোর,
 কূলে এসে ডুবে গেল যত আশা ছিল!
 শূন্য এই ছুরি আছে, আর এই হৃদি
 আগ্নেয় গিরির চেয়ে জ্বলন্ত গহ্বর!
 মোরে নির্ব্বাসন! হায়, কি বলিব পৃথ্বী,-
 এ নির্ব্বাসনের ধার শূন্যতাম আমি
 পৃথ্বীতে থাকিত যদি এমন নরক
 যন্ত্রণা জীবন যেথা এক নাম ধরে,
 জীবননিদাঘে যেথা নাই মৃত্যুছায়া!
 মোরে নির্ব্বাসন! কেন, কোন্ অপরাধে?
 অপরাধ! শতবার লক্ষবার আমি
 অপরাধ করি যদি কে সে পৃথ্বীরাজ!
 বিচার করিতে তার কোন্ অধিকার!
 নাইয় দুরাশা মোর করিতে সাধন
 শত শত মানুষের লয়েছি মস্তক—
 তুমি কর নাই? তোমার দুরাশাযজ্ঞে
 লক্ষ মানবের রক্ত দাও নি আহুতি?
 লক্ষ লক্ষ গ্রাম দেশ কর নি উচ্ছিন্ন?
 লক্ষ লক্ষ রমণীরে কর নি বিধবা?
 শূন্য অভিমান তব তৃপ্ত করিবারে—
 ভ্রাতা তব জয়চাঁদ, তার রাজ্য দেশ
 ভূমিসাৎ করিতে কর নি আয়োজন?
 পৃথ্বীতেই তোমার কি হবে না বিচার?
 নরকের অধিষ্ঠাতৃদেব, শূন্য তুমি,
 এই বাহু যদি নাহি হয় গো অসাড়,
 রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী,

তবে এই ছুরিকাটি এই হস্তে ধরি
উরসে খোদাব তার মরণের পথ!
হৃদয় এমন মোর হয়েছে অধীর
পারি নে থাকিতে হেথা স্থির হ'য়ে আর!
চলিন্দু আমি, আমি—তুই থাক্ হেথা,
চলিন্দু গুহায় আমি করিগে ভ্রমণ।
শোন, শোন, শোন বলি, মনে আছে তোর—
চাঁদ কবি পুনঃ যদি আসে এ কুটীরে
জীবন লইয়া আর যাবে না সে ফিরে!

[প্রস্থান]

অমিয়া। বড় সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী
স্তম্ভ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
অঁধার ভ্রুকুটিময় এই এ কানন,
সংকীর্ণহৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রুকুটির সমুখেতে দিনরাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া—
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন!
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
পাখী যদি হইতাম, দৃ-দৃন্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া উষার আলোকে
একবার প্রাণ ভ'রে দিতেম সাঁতার!
আহা, কোথা চাঁদ কবি, ভাই গো আমার!
এ রুদ্ধ অরণ্য-মাঝে তোমারে হেরিলে
দৃ-দৃন্ড যে আপনারে ভুলে থাকি আমি!

[রুদ্ধচন্দ্রের প্রবেশ]

না—না পিতা, পায়ে পড়ি, পারিব না তাহা,
আর কি তাহারে কভু দেখিতে দিবে না?
কোন অপরাধ আমি করেছি তোমার
অভাগীরে এত কষ্ট দিতেছ যা লাগি!
কে জানে বৃকের মধ্যে কি যে করিতেছে!
দাও পিতা, ওই ছুরি বিপ্ধিয়া বিপ্ধিয়া
ভেঙ্গে ফেল যাতনার এ আবাসখানা!
ওই ছুরি কত শত বীরের শোণিতে
মাথা তার ডুবায়েছে হাসিয়া হাসিয়া,
ক্ষুদ্র এই বালিকার শোণিত বর্ষিতে
ও দারুণ ছুরি তব হবে না কুণ্ঠিত!
হেসো না অমন করি, পায়ে পড়ি তব,

রত্নচন্দ্র ।

ওর চেয়ে রোষদীপ্ত ভ্রুকুটিকুটিল
 রত্ন মৃথপানে তব পারি নেহারিতে !
 ঘুমাগে ঘুমাগে তুই অমিয়া, ঘুমাগে—
 একটু রহিব একা, তাও কি দিবি না ?
 আজ আমি ঘুমাব না, একেলা হেথায়
 ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রাতি করিব যাপন ।
 এনে দে কুঠার মোর, কাটিয়া পাদপ
 এ দীর্ঘ সময় আমি দিব কাটাইয়া ।
 বিশ্রাম আমার কাছে দারুণ যন্ত্রণা !
 বিশ্রাম কালের প্রতি মূহূর্ত্ত যেমন
 দংশন করিতে থাকে হৃদয় আমার ।
 মরুভূমিপথমাঝে পথিক যখন
 দূর গম্য-দেশে তার করিতে গমন
 যত অগ্রসর হয়, দিগন্তবিস্তৃত
 নব নব মরু যদি পড়ে দৃষ্টিপথে,
 তাহার হৃদয় হয় যেমন অধীর,
 তেমনি আমার সেই উদ্দেশ্যের মাঝে
 প্রত্যেক মূহূর্ত্তকাল, প্রত্যেক নিমেষ
 অস্থির করিয়া তুলে হৃদয় আমার !

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

চাঁদ কবি ও অমিয়া

চাঁদ কবি ।

কেন লো অমিয়া, তোরা কচি মৃথখানি
 অমন বিষন্ন হেরি, অমন গম্ভীর ?
 আয়, কাছে আয়, বোন, শোন তোরে বলি,
 গান শিখাইব বলে দুটি গান আমি
 আপনি রচনা ক'রে এনেছি অমিয়া !
 বনের পাখীটি তুই, গান গেয়ে গেয়ে
 বেড়াইবি বনে বনে এই তোরে সাজে—

অমিয়া ।

চুপ কর, ওই বৃষ্টি পদশব্দ শুনি !
 বৃষ্টি আসিছেন পিতা ! না না, কেহ নয় !
 শোন ভাই, এ বনে এস না তুমি আর !
 আসিবে না ? তা হ'লে কি অমিয়ার সাথে
 আর দেখা হবে নাকি ? হবে না কি আর ?

চাঁদ কবি ।

কি কথা বলিতেছিস অমিয়া, বালিকা !

অমিয়া ।

পিতা যে কি বলেছেন, শোন নাই তাহা—
 বড় ভয় হয় শ্রুত, প্রাণ কেঁপে ওঠে !

কাজ নাই ভাই, তুমি যাও হেথা হতে!
 যেমন করিয়া হোক, কাটিবেক দিন—
 অমিয়ার তরে করি, ভেবোনাক তুমি।
 চাঁদ করি। আমি গেলে বল্ দেখি, বোনটি আমার,
 কার কাছে ছুটে যাবি মনে ব্যথা পেলে?
 আমি গেলে এ অরণ্যে কে রহিবে তোরে!
 অমিয়া। কেহ না, কেহ না চাঁদ! আমি বলি ভাই,
 পিতারে বদ্বায়ে তুমি বোলো একবার!
 বোলো তুমি অমিয়ারে ভালবাস বড়,
 মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে!
 আর কিছ্ নয়, শুধু এই কথা বোলো!
 তুমি যদি ভাল করে বোলো বদ্বাইয়া,
 নিশ্চয় তোমার কথা রাখিবেন পিতা!
 বলিবে?
 চাঁদ করি। বলিব বোন! ও কথা থাকুক!—
 সে দিন যে গান তোরে দেখিনু শিখায়ে,
 সে গানটি ধীরে ধীরে গা' দেখি অমিয়া!

গান

রাগিণী—মিশ্র ললিত

অমিয়া। বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
 প্রথম মেলিল আঁখি তার,
 চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
 সৌন্দর্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
 সহসা জগৎ প্রকাশিল,
 প্রভাত সহসা বিভাসিল
 বসন্তলাবণ্যে সাজি গো—
 একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!
 উষারাগী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
 দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা,
 হরষে কপোল তাঁর রাঙা!
 কুসুমভগিনীগণ চারি দিক হতে
 আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে,
 কখন ফুটিবে চোখ ছোট বোনটির
 জাগিবে সে কাননের মেয়ে।

আকাশ সুনীল আজি কিবা,
 অরুণনয়নে হাস্যবিভা,
 বিমল শিশিরধৌত তনু
 হাসিছে কুসুমরাজি গো—
 একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!

মধুকর গান গেয়ে বলে,
 'মধু কই, মধু দাও দাও !'
 হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
 ফুল বলে, 'এই লও লও !'
 বায়ু আসি কহে কানে কানে,
 'ফুলবালা, পরিমল দাও !'
 আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল,
 'যাহা আছে সব লয়ে যাও !'
 হরষ ধরে না তার চিতে,
 আপনারে চায় বিলাইতে,
 বালিকা আনন্দে কুটিকুটি,
 পাতায় পাতায় পড়ে লুটি—
 নতন জগত দেখি রে
 আজিকে হরষ একি রে!

অমিয়া । সত্য সত্য ফুল যবে মেলে আঁখি তার,
 না জানি সে মনে মনে কি ভাবে তখন !
 চাঁদ কবি । অমিয়া তুই তা, বল্, বুঝিবি কেমনে !
 তুই সুকুমার ফুল যখন ফুটিলি,
 যখন মেলিলি আঁখি, দেখিলি চাহিয়া—
 শূন্য জীর্ণ পত্রহীন অতি সুকঠোর
 বজ্রাহত শাখা-পরে তোর বৃন্ত বাঁধা
 একটিও নাই তোর কুসুমভগিনী,
 আঁধার চৌদিক হতে আছে গ্রাস করি—
 যেমনি মেলিলি আঁখি অমনি সভয়ে
 মৃদিতে চাহিলি বুঝি নয়নটি তোর ।
 না দেখিলি রবিকর, জোছনার আলো,
 না শুনিলি পাখীদের প্রভাতের গান !
 আহা বোন, তোরে দেখে বড় হয় মায়া !
 মাঝে মাঝে ভাবি বসে কাজ-কর্ম ভুলি,
 'এতক্ষণে অমিয়া একেলা বসে আছে,
 বিশাল আঁধার বনে কেহ তার নাই !'
 অমনি ছুটিয়া আসি দেখিবারে তোরে !
 আরেকটি গান তোরে শিখাইব আজি,
 মন দিয়ে শোন দেখি অমিয়া আমার !

গান

রাগিণী—মিশ্র গৌড়-সারণ্য

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
 মৃদিয়া আসিছে আঁখি তার,
 চাহিয়া দেখিল চারি ধার ।

শুদ্ধ তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর।
নিরদয় অসীম সংসার।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা?
কেহ না—কেহ না!
মধুকর কাছে এসে বলে,
'মধু কই, মধু চাই চাই।'
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে, 'কিছু নাই নাই।'
'ফুলবালা, পরিমল দাও'
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
গলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে, 'আর কিবা আছে!'
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে
থর দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে,
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

অমিয়া। ওই আসিছেন পিতা, লুকাও লুকাও,
পায়ে পড়ি—লুকাও লুকাও এই বেলা,
একটি আমার কথা রাখ চাঁদ কবি!
সময় নাইক আর—ওই আসিছেন,
কি হবে? কি হবে ভাই? কোথা লুকাইবে?

[রুদ্রচন্দ্রের প্রবেশ]

পিতা, পিতা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে;
আপনি এসেছি আমি চাঁদ কবি কাছে.
চাঁদের কি দোষ তাহে বল পিতা, বল!
এসেছিন্দু, কিছুতেই পারি নি থাকিতে—
নিজে এসেছিন্দু আমি, চাঁদের কি দোষ?
অভাগিনী!

রুদ্রচন্দ্র।

চাঁদ কবি।

অমিয়া।

রুদ্রচন্দ্র, শোন মোর কথা।

থাম চাঁদ, কোন কথা বোলো না পিতারে,
থাম থাম।

চাঁদ কবি।

অমিয়া।

রুদ্রচন্দ্র, শোন মোর কথা!

পিতা, পিতা, এই পায়ে পড়িলাম আমি,
যাহা ইচ্ছা কর তাই এখনি—এখনি।
চেয়ো না চাঁদের পানে অমন করিয়া।

চাঁদ কবি।

দাঁড়ান্দু কৃপাণ এই পরশ করিয়া—
সূর্য্যদেব, সাক্ষী রহ, আমি চাঁদ কবি
আজ হতে অমিয়ার হনু পিতা মাতা।

তোর সাথে আমিয়ার সমস্ত বন্ধন
এ মৃদুহৃৎ হতে আজ ছিন্ন হয়ে গেল।
মোর আমিয়ার কেশ স্পর্শ কর যদি
রুদ্রচন্দ, তোর দিন ফুরাইবে ভবে!

[আমিয়ার মর্চ্ছিত হইয়া পতন

উভয়ের ম্বল্লম্বন্ধ ও রুদ্রচন্দের পতন]

রুদ্রচন্দ। সম্বর সম্বর অসি, থাম চাঁদ, থাম!
কি! হাসিছ বদ্বি! বদ্বি ভাবিতেছ মনে,
মরণেরে ভয় করি আমি রুদ্রচন্দ!
জানিস নে মরণের ব্যবসায়ী আমি!
জীবন মাগিতে হ'ল তোর কাছে আজ
শত বার মৃত্যু এই হইল আমার!
রুদ্রচন্দ যে মৃদুহৃৎ ভিক্ষা মাগিয়াছে
রুদ্রচন্দ সে মৃদুহৃৎ গিয়াছে মরিয়া!
আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম লয়ে
কেবল শরীর তার, কহিতেছি তোরে—
এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন!
এখনো—এখনো আছে! এখনো আমার
সঙ্কল্প রয়েছে হ'য়ে দারুণ তৃষিত!
রুদ্রচন্দ তোর কাছে ভিক্ষা মাগিতেছে
আর কি চাহিস চাঁদ? দিবি মোরে প্রাণ?

[অশ্বারোহী দূতের প্রবেশ

চাঁদ কবির প্রতি]

দূত। মহাশয়, আসিতেছি রাজসভা হতে!
নিমেষ ফেলিতে আর নাই অবসর!
প্রতি মৃদুহৃৎের 'পরে অতি ক্ষীণ সূত্রে
রাজত্বের শূভাশুভ করিছে নির্ভর!
প্রশ্নোত্তর করিবার নাইক সময়!

[সম্বর উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রুদ্রচন্দ

রুদ্রচন্দ । অনগ্রহ ক'রে মোরে চ'লে গেল চাঁদ !
 গৃহে ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্নবদনে
 রুদ্রচন্দ বাঁচালেম অনগ্রহ ক'রে ?
 অনগ্রহ ! রুদ্রচন্দ অনগ্রহ করা !
 এ অনগ্রহের ছুঁরি মন্মের মাঝারে
 —যত দিন বেঁচে রব—রহিবে নিহিত !
 দিনরাতি রক্ত মোর করিবে শোষণ ।
 দগ্ধপোষ্য শিশু চাঁদ—তার অনগ্রহ !
 ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয় !
 এ হীন প্রাণের কাজ যখন ফুরাবে
 তখন ধুলায় এরে করিব নিক্ষেপ,
 চরণে দলিয়া এরে চূর্ণ ক'রে দেব' ।

[অমিয়ার প্রবেশ]

আবার রাক্ষসি, তুই আবার আইলি !
 এ সংসারে আছে যত আপনার ভাই—
 সকলেরে ডেকে আন, পিতার জীবন
 সে কুকুরদের মূখে করিস নিক্ষেপ ।
 পিতার শোণিত দিয়ে পুঁষিস তাদের ।
 দূর হ রাক্ষসি, তুই এখনি দূর হ ।
 অমিয়া । পিতা, পিতা, পায়ে পড়ি, শতবার আমি
 দূর হয়ে যাইতেছি এ কুটীর হ'তে—
 বোলো না অমন ক'রে বোলো না আমারে ।
 বুদ্ধিতে পারি নে যে গো কি আমি করেছি ।
 চাঁদের সহিত দুটি কথা কয়েছি—
 কেন পিতা, তার তরে এত শাস্তি কেন ?

রুদ্রচন্দ । চূপ কর, 'কেন, কেন' শ্রদ্ধাস নে আর ।
 'দূর হ রাক্ষসি' এই আদেশ আমার !
 দিনরাতি, পাপীয়সি, 'কেন কেন' করি
 করিস নে মোর আদেশের অপমান ।

অমিয়া । কোথা যাব পিতা, আমি পথ যে জানি নে ।
 কারেও চিনি নে আমি—কি হবে আমার !
 পিতা গো, জান ত তুমি, অমিয়া তোমার
 নিতান্ত নিষ্পেষে মেয়ে কিছুর সে বুদ্ধে না-
 না বুদ্ধে করেছে দোষ ক্ষমা কর তারে ।

রুদ্রচন্দ । হতভাগী !

অমিয়া । ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা !
 আজ রাতে দূর ক'রে দিও না আমারে,
 এক রাতি ভরে দাও কুটীরে থাকিতে ।

রুদ্রচন্দ্র । শিশুর হৃদয় এ কি পেয়েছিল তুই!
 দুই ফোঁটা অশ্রু দিয়ে গলাতে চাইস!
 এখনি ও অশ্রুজল মুছে ফেল্ তুই।
 অশ্রুজলধারা মোর দৃ-চক্ষের বিষ।
 আর নয়, শোন শেষ আদেশ আমার—
 দূর হ রে—

অমিয়া । ধর পিতা, ধর গো আমার—

রুদ্রচন্দ্র । ছুঁস্ নে, ছুঁস্ নে মোরে, রাক্ষসি, ছুঁস্ নে—

[অমিয়ার মুচ্ছিত হইয়া পতন ও তাহাকে তুলিয়া লইয়া
 বনান্ত-উদ্দেশে রুদ্রচন্দ্রের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

অমিয়া । রাজপথে প্রাসাদসম্মুখে

অমিয়া । আর ত পারি না, শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর।
 সঘনে ঘুরিছে মাথা, টলিছে চরণ।
 বাহিছে বহুক ঝড়, পড়ুক অশনি,
 ঘোর অন্ধকার মোরে ফেলুক গ্রাসিয়া।
 এ কি এ বিদ্যুৎ মাগো! অন্ধ হ'ল আঁখি।
 চাঁদ, চাঁদ, কোথা গেলে ভাইটি আমার!
 সারাদিন উপবাসে পথে পথে ভ্রমি
 'চাঁদ চাঁদ' বলে আমি খুঁজেছি তোমায়।
 কোথাও পেন্দু না কেন ভাই গো আমার?
 অতি ভয়ে ভয়ে গেছি পান্থদের কাছে—
 শূন্যেছি, কেহ কেন বলে নি আমারে?
 এ প্রাসাদ যদি হয় তাহারি আলায়!
 যদি গো এখনি চাঁদ বাহিরিয়া আসে,
 হেথা মোরে দেখিয়া কি করেন তা হ'লে?
 হয়ত আছেন তিনি, যাই একবার।
 উহু কি বাতাস! শীতে কাঁপি থর থর!
 যদি না থাকেন তিনি, আর কেহ এসে
 যদি কিছু বলে মোরে, কি করিব তবে?
 কে আছে গো, দ্বার খোল—আমি নিরাশ্রয়,
 অমিয়া আমার নাম, এসেছি দুয়ারে।

দ্বার খুলিয়া একজন । কে তুই?

অমিয়া । [সভয়ে] অমিয়া আমি।

দ্বাররক্ষক । হেথা কেন এলি?

অমিয়া । চাঁদ কবি ভাই মোর আছেন কি হেথা?
 বড় শ্রান্ত ক্লান্ত আমি চাই গো আশ্রয়।

দ্বাররক্ষক। এ রাতে দুরারে মিছা করিস নে গোল।
হেথা ঠাই মিলিবে না, দূর হ' ভিখারী।

[দ্বাররোধন। একটি পান্থের প্রবেশ]

পান্থ। উঃ! একি মূহূর্মূহূ হানিছে বিদ্যুৎ!
এ দুর্যোগে পথপার্শ্বে কে বসিয়া হোথা?
এমন বাহিছে ঝড়, গজ্জিছে অশনি,
আজ রাতে গৃহ ছেড়ে পথে কে রে তুই!

[কাছে আসিয়া]

একি বাছা, হেথা কেন একেলা বসিয়া?
পিতা মাতা কেহ তোর নাই কি সংসারে?

অমিয়া। [কাঁদিয়া উঠিয়া]

ওগো পান্থ, কেহ নাই, কেহ নাই মোর।
অমিয়া আমার নাম, বড় শ্রান্ত আমি,
সারাদিন পথে পথে করেছি ভ্রমণ।

পান্থ। আর মা, আমার সাথে আর মোর ঘরে।
অরণ্যে আমার কুঁড়ে, বেশি দূর নয়।
আহা দাঁড়াবার বল নাই যে চরণে।
আর, তোরে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে যাই।

অমিয়া। চাঁদ কবি, ভাই মোর, তারে জান তুমি?
কোথায় থাকেন তিনি পার কি বলিতে?

পান্থ। জানি নে মা, কোথাকার কে সে চাঁদ কবি।
আমরা বনের লোক, কাঠ কেটে খাই,
নগরে কে কোথা থাকে জানিব কি ক'রে?
চল্ মা, আজি এ রাতে মোর ঘরে চল্।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চাঁদ কবি। শিবির

চাঁদ কবি। সহস্র থাকুক কাজ, আজ একবার
অমিয়ারে না দেখিলে নারিব থাকিতে।
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আহা!
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ অত্যাচার।
তোর দুঃখ গেনু আমি দূর করিবারে,
ফেলিনু দ্বিগুণ কষ্টে অমিয়া আমার।
জানিলি নে, অভাগিনী, সুখ করে বলে!
শাসনের অন্ধকারে, অরণ্যবিজনে,

পিতা নামে নিরদয় শমনের কাছে
 দারুণ কটাক্ষে তার থরথর কাঁপি
 দিনরাতি রয়েছি সন্নিয়মাণ হয়ে।
 প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখী—
 কবে এ অঁধার রাতি ফুরাইবে তোর?
 ওই মৃদুখানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে
 গান গাবি, খেলাইবি প্রশান্ত হরষে!
 এই যুদ্ধ শেষ হলে, অভাগিনী তোরে
 আনিব রে নিষ্ঠুর পিতার গ্রাস হতে।
 আপনার ঘরে আনি রাখিব যতনে,
 এতদিনকার দুঃখ দিব দূর করে।
 রাজপুত্র ক্ষত্রিয়েরে করিবি বিবাহ,
 ভালবেসে দুই জনে কাটাৰি জীবন।
 অন্ধকার অরণ্যের রুদ্ধ বাল্যকাল
 দুঃস্বপ্নের মত শূন্য পড়িবেক মনে।

[দূতের প্রবেশ]

মহাশয়, এসেছে এসেছে শত্রুগণ,
 তিন ক্রোশ দূরে তারা ফেলেছে শিবির।
 রাত্রিযোগে অলক্ষ্যেতে এসেছে তাহারা,
 সহসা প্রভাতে আজি পেলেম বারতা।
 চাঁদ। চল তবে—বাজাও বাজাও রণভেরী।
 সৈন্যগণ, অস্ত্র লও, উঠাও শিবির।
 দূয়ারে এসেছে শত্রু, বিলম্ব সহে না।
 দাও মোরে বশ্ম দাও, অশ্ব ল'য়ে এস।
 ছুরা কর, বাজাও বাজাও রণভেরী।

[কোলাহল]

সপ্তম দৃশ্য

বন

[একজন দূতের প্রবেশ]

দূত। একি ঘোর স্তম্ভ বন, একি অন্ধকার!
 চারি দিকে ঝোপঝাপ, পথ নাই কোথা!
 ওই বদ্বি হবে তার অঁধার কুটীর,
 ওইখানে রুদ্ধচন্ড বাস করে বদ্বি!

[রুদ্রচন্দ্রের প্রবেশ]

- দত্ত। প্রণাম!
- রুদ্র। কে তুই!
- দত্ত। আগে কুটীরেতে চল!
একে একে সব কথা করি নিবেদন!
- রুদ্র। পথ ভুলে বদ্বি তুই এসেছিস্ হেথা?
আমি রুদ্রচন্দ্র, এই অরণ্যের রাজা।
নগরনিবাসী তোরা হেথা কেন এলি?
ঐশ্বর্য্যমাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস,
ননীর পুতুল যত ললনারে লয়ে
আবেশে মৃদিত আঁখি, গদ গদ ভাষা,
ফুলের পাপড়ি 'পরে পড়িলে চরণ
ব্যথায় অধীর হয়ে উঠিস যে তোরা—
নগরফুলের কীট হেথা তোরা কেন?
আমি পৃথ্বীরাজ নই, আমি রুদ্রচন্দ্র।
মৃদু মিষ্ট কথা শুনি আহ্লাদে গলিয়া
রাজ্যধন উপহার দিই নাক আমি!
বিশাল রাজসভার ব্যাধি তোরা যত
আমার অরণ্যে কেন করিলি প্রবেশ?
পুষ্টদেহ ধনী তোরা, দেখিতে এলি কি
কুটীরে কি ক'রে থাকে অরণ্যের লোক?
মনে কি করিলি এই অরণ্যবাসীরে
দুটা অনগ্রহবাক্যে কিনিয়া রাখিবি?
তাই আজ প্রাতঃকালে স্বর্ণময় বেশে
বিশাল উষ্ণীষ এক বাঁধিয়া মাথায়
এলি হেথা ধাঁধিবারে দরিদ্রনয়ন?
জানিস কি, বনবাসী এই রুদ্রচন্দ্র—
যতেক উষ্ণীষধারী আছেয়ে নগরে
সবার উষ্ণীষে করে শত পদাঘাত!
- দত্ত। রুদ্রচন্দ্র, মিছা কেন করিতেছ রোষ!
উপকার করিতেই এসেছি হেথায়!
- রুদ্র। বটে বটে, উপকার করিতে এসেছি!
তোমরা নগরবাসী স্ফীতদেহ সবে
উপকার করিবারে সদাই উদ্যত!
তোমাদের নগরের বালক সে চাঁদ
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা,
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে!
এত উপকার তিনি করেছেন মোর
আর কারো উপকারে আবশ্যক নাই!
- দত্ত। রুদ্রচন্দ্র, বদ্বি তুমি ভ্রমে পড়িয়াছ,
আমি নহি পৃথ্বীরাজ-রাজ-সভাসদ।

রাজরাজ মহারাজ মহম্মদ ঘোরী
 তিনিই আমারে হেথা করেন প্রেরণ—
 অধীর হোয়ো না, সব শোন একে একে—
 পৃথবীরাজে আক্রমিতে আসিছেন তিনি,
 বহুদূর পথটিনে শ্রান্ত সৈন্যদল—
 থাম রুদ্র, বলি আমি, কথা মোর শোন—
 আজ এক রাত্রি-তরে এ অরণ্যমাঝে
 রাজরাজ মহারাজ চাহেন আশ্রয়!

রুদ্র। কি বলিলি দূত! তোর মহম্মদ ঘোরী,
 পৃথবীরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা!

দূত। এ বনে ত লোক নাই? ধীরে কথা কও!

রুদ্র। ধীরে ক'ব! যাব আমি নগরে নগরে,
 উদ্ধবকণ্ঠে কব আমি রাজপথে গিয়া,
 'ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
 তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ!'

দূত। শোন রুদ্র, পৃথবী তব রাজ্যধন কেড়ে
 নিব্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে!

রুদ্র। সংবাদের-আবজ্জনা-ভিক্ষুক কুক্কুর,
 এ সংবাদ কোথা হতে করিলি সংগ্রহ?

দূত। ধৈর্য ধর। পৃথবী তব রাজ্যধন লয়ে
 নিব্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে!
 প্রতিহিংসা সাধিবার সাধ থাকে যদি
 এই তার উপযুক্ত হয়েছে সময়।
 মহম্মদ ঘোরী হেথা—

রুদ্র। মহম্মদ ঘোরী?
 কেন, আমার কি কাছে ছুরি নাই মূঢ়!
 এত দিন বক্ষে তারে করিনু পোষণ,
 প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস।
 আজ কোথা হতে আসি মহম্মদ ঘোরী
 তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া?
 যেমন পৃথবীর শত্রু মহম্মদ ঘোরী
 তেমনি আমারো শত্রু করি তোর দূত!
 পৃথবীর রাজত্ব প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
 সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে।
 এখনি নগরে যাব করি তোর আমি।
 অশুভ বারতা এই করিব প্রচার।

[কৃপাণ খুলিয়া রুদ্রচন্দ্রকে দূতের সহসা আক্রমণ
 উভয়ের মৃত্যু ও দূতের পতন]

অষ্টম দৃশ্য

দৃশ্য। পথ

[নেপথ্যে গান]

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
 মৃদিয়া আসিছে আঁখি তার।
 চাহিয়া দেখিল চারি ধার!
 শূঙ্ক তুণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
 চারি দিকে কেহ নাই আর,
 নিরদয় অসীম সংসার।
 কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
 এক বিন্দু শিশিরের কণা!
 কেহ না, কেহ না!
 মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে
 খরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিত্তে—
 ফুলটির মৃদুপ্রাণ হায়
 ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

[নেপথ্যে]

উত্তরের পথ দিয়া চল সৈন্যগণ!

[সেনাপতিগণ সৈন্যগণ ও চাঁদ কবির প্রবেশ]

চাঁদ কবি। অমিয়ার কণ্ঠ যেন শুনিন্দু সহসা,
 এ মধ্যাহ্নে রাজপথে সে কেন আসিবে?
 সেনাপতি। সৈন্যগণ হেথা এসে দাঁড়াইলে কেন?
 বিশ্রাম করিতে কভু এই কি সময়?
 দ্বিতীয় সেনাপতি। শুনিন্দু যবনগণ যদ্বৈ প্রাণপণে—
 অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দু সৈন্য যত।
 এখনো রয়েছে তারা সাহায্যের আশে,
 নিতান্ত নিরাশ হবে বিলম্ব হইলে।
 চাঁদ কবি। তবে চল, চল দ্বরা, আর দেরি নয়!

[গমনোদ্যম। অমিয়ার প্রবেশ]

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ—ভাই মোর—
 সৈন্যগণ। কে তুই! দূর হ!
 সেনাপতি। স'রে দাঁড়া, পথ ছাড়, চল সৈন্যগণ!
 চাঁদ কবি। [স্তম্ভিত হইয়া] অমিয়া রে—
 সেনাপতি। চাঁদ কবি, এই কি সময়!

আমাদের মূখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
 ছেলেখেলা পেন্দু একি পথের ধারেতে?
 চল চল, বাজাও, বাজাও রণভেরী!

চাঁদ। [যাইতে যাইতে] অমিয়া রে, ফিরে এসে—
সেনাপতি। বাজাও দুন্দুভি!

রণবাদ্য। প্রস্থান
[অমিয়ার অবসন্ন হইয়া পতন]

নবম দৃশ্য

নগর। রুদ্রচন্দ

রুদ্র। বেধেছে তুমুল রণ; কোথা পৃথ্বীরাজ!
ওরে রে সংগ্রামদৈত্য শোণিতপিপাসী,
সমস্ত হস্তিনা তুই করিস রে গ্রাস,
পৃথ্বীরাজে রেখে দিস এ ছুরিকা-তরে।
পৃথ্বীরাজ আছে কোন্ শিবিরে না জানি!
ভ্রমিতেছি তার তরে প্রভাত হইতে।
আজ তার দেখা পেলো পুরাইব সাধ।
একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে,
সম্মুখে, দক্ষিণে বামে সহস্র বর্ষের
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!
চারি দিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন,
বাতায়ন হতে চেয়ে শত শত আঁখি!
এত লোক, এত গোল সহ্য নাই হয়!

[একজন পান্থের প্রতি]

কে গো তুমি মহাশয়, মূখপানে মোর
একেবারে চেয়ে আছ অবাক্ হইয়া?
কখন কি দেখ নাই মানুষের মূখ?
যেথা যাই শত আঁখি মোর মূখ চেয়ে,
আঁখিগুলো বৃষ্টি মোরে পাগল করিবে!
যেথা হেরি চারি দিকে সূর্য্যের আলোক,
নয়ন বিধিছে মোর বাণের মতন!
একটু আড়াল পাই, একটু অঁধার,
বাঁচি তবে দুই দণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া!
একি হেরি? উদ্ধবাসে নাগরিকগণ
কোথায় ছুটেছে সব অস্ত্র শস্ত্র লয়ে?
ওগো পান্থ, বল মোরে ত্বরা ক'রে বল!
মরেছে কি পৃথ্বীরাজ? ত্বরা ক'রে বল!
পান্থ। কে তুই অসভ্য বন্য, কোথা হতে এলি?

অকল্যাণ বাণী যদি উচ্চারিস মূখে
রসনা পড়াব তোর জ্বলন্ত অঙ্গারে!

[প্রস্থান

রুদ্র। [আর একজনের প্রতি]
শোন পান্থ, বল মোরে কোথা যাও সবে,
রণক্ষেত্রে অমঙ্গল ঘটে নি ত কিছু!

[উত্তর না দিয়া পান্থের প্রস্থান

রুদ্র। [একজন পান্থকে ধরিয়া]
অসভ্য বর্ষর যত, বল মোরে বল!
ছাড়িব না, যতক্ষণ না দিবি উত্তর!
বল শূদ্ধ পৃথ্বীরাজ রয়েছে বাঁচিয়া!

[বলপূর্বক ছাড়াইয়া লইয়া পান্থের প্রস্থান

রুদ্র। নগরকুক্কুর যত মরুক—মরুক!
হীন অপদার্থ যত বিলাসীর পাল,
যুদ্ধের হুঙ্কার শুনে ডরিয়া মরুক!
নবনীগঠিত যত স্নেহের শরীর—
নিজের অস্ত্রের ভারে পিষিয়া মরুক!
ঐশ্বর্যধূলায় অন্ধ নগরের কীট
নিজের গরবে ফেটে মরুক—মরুক!

দশম দৃশ্য

অমিয়া। পথ

অমিয়া। চ'লে গেল!—সকলেই চ'লে গেল গো!
দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ
এক মুহূর্তের তরে দেখা হল যদি,
চ'লে গেল? একবার কথা কহিল না?
একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া?
স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো?
অমিয়া রে, এত কি নির্বোধ তুই মেয়ে?
সকলেরি কাছে কি করিস অপরাধ?
পিতা তোরে জন্মতরে করিলেন ত্যাগ,
চাঁদ কবি ভাই তোর স্নেহের সাগর
তাঁরো কাছে আজ কি রে হ'লি অপরাধী?
তিনিও কি তোরে আজ করিলেন ত্যাগ?
কেহ তোর রহিল না অকূল সংসারে?
কে আছে গো, ক্ষুদ্র এই শ্রান্ত বালিকারে
একবার নেবে গো স্নেহের কোলে তুলে?

এই ত এসেছি সেই অরণ্যের পথে।
 যাব কি পিতার কাছে? যদি রুগ্ন হন!
 আবার আমারে যদি দেন তাড়াইয়া!
 যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাঁরি কাছে যাই!
 ধরিয়া চরণ তাঁর রহিব পড়িয়া!
 মা গো মা, হৃদয় বন্ধি ফেটে গেল মোর!
 প্রাণের বন্ধন বন্ধি ছিঁড়ে গেল সব!
 চাঁদ, চাঁদ, ভাই মোর, দেখা হল যদি,
 একবার ডাকিলে না 'অমিয়া' বলিয়া!

[প্রস্থান]

একাদশ দৃশ্য

নাগরিকগণ

প্রথম। সমাচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া—
 শুনিতোছি পরাজয় হয়েছে মোদের।
 দ্বিতীয়। অস্ত্রভার তুলিবারে সক্ষম যাহারা
 আয় সবে ছুরা ক'রে, সময় যে নাই!
 নগরদুয়ারে গিয়া দাঁড়াই আমরা।
 সকলে। এখনি—এখনি চল যে আছ যেখানে!
 তৃতীয়। চিতানল গৃহে গৃহে জ্বালাইতে বল,
 নগরশ্মশানে আজ রমণীরা যত
 প্রাণবিনিময়ে মান রাখিবে তাহারা!
 চতুর্থ। মরণ-উৎসব আজ হইবে নগরে।
 চিতার মশাল জ্বালি শোণিতমদিরা
 যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান।

[দূতের প্রবেশ]

দূত। শোন, শোন, পৃথবীরাজ বন্দী হয়েছেন।
 সকলে। বন্দী?
 প্রথম। রাজরাজ মহারাজ বন্দী আজি?
 দ্বিতীয়। লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে!
 তৃতীয়। ভেঙে ফেল অট্টালিকা!
 চতুর্থ। ভস্ম কর গ্রাম,
 সকলে। সমভূমি ক'রে ফেল হস্তিনানগরী।

দ্বাদশ দৃশ্য

রুদ্রচন্দ

রুদ্রচন্দ । এখনো ত কিছু তার পেন্দু না সংবাদ
পৃথবীরাজ মরেছে কি রয়েছে বাঁচিয়া ।
হীন প্রাণ, কবে তোর ফুরাইবে কাজ !
ঋণ-করা প্রাণ আর বহিতে পারি না,
কবে তোরে ত্যাগ করে বাঁচিব আবার !
ছিছি, তোর লাগি আমি ভিক্ষা করিলাম,
জীবন নামেতে এক মরণ পাইনু !
অদৃষ্ট রে, আরো কি চাহিস করিবারে ?
অনুগ্রহ 'পরে মোর জীবন রাখিলি !
অনুগ্রহ—শিশু চাঁদ, তার অনুগ্রহ !

[একটি দূতের প্রবেশ]

দূত । বন্দী পৃথবীরাজ আজ হত হয়েছেন ।
রুদ্রচন্দ । [চমকিয়া]—
হত ? সে কি কথা ? মিথ্যা বলিস নে মূঢ় !
মরে নি সে, মরে নি, মরে নি পৃথবীরাজ ।
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথবীরাজ ।
কোথা যাস বল্ তুই এখনো সে আছে !
দূত । সহসা উন্মাদ আজি হলে নাকি তুমি ?
বন্দীভাবে পৃথবীরাজ হত হয়েছেন
যারে বলি সেই মোরে মারিতে উদ্যত,
কিন্তু হেন রোষ আমি দেখি নি ত কারো ।

[প্রস্থান]

রুদ্রচন্দ । [ছুরি নিক্ষেপ করিয়া]—
মুহুর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হ'য়ে গেল ।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন !
পৃথবীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচন্দ, আর কেহ নয় ।
যে দূরন্ত দৈত্যশিশু দিন রাতি ধ'রে
হৃদয়মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
এ মুহুর্তে মরে গেল সেই বৎস মোর !
তারি নাম রুদ্রচন্দ, আমি কেহ নই ।
আয়, ছুরি, আয় তবে, প্রভু গেছে তোর—
এ শূন্য আসন তাঁর ভেঙ্গে ফেল্ তবে ।

[বিংধাইয়া বিংধাইয়া]

ভেঙ্গে ফেল্, ভেঙ্গে ফেল্, ভেঙ্গে ফেল্ তবে।

[অমিয়ার প্রবেশ]

অমিয়া। পিতা, পিতা, অমিয়ারে ক্ষমা কর পিতা!

[চমকিয়া স্তম্ভ]

রুদ্রচন্দ্র। আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা!
 এত দিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে,
 আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।
 অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোর!
 আহা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে!
 আর তোরে দুঃখ পেতে হবে না, বালিকা,
 পাষন্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন।

অমিয়া। [রুদ্রচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া]—
 ও কথা বোলো না পিতা, বোলো না, বোলো না—
 অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আর।
 তাড়িয়ে দিয়েছে মোরে সমস্ত সংসার,
 এসেছি পিতার কোলে বড় শান্ত হয়ে।
 যেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে,
 যা তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিব,
 তোমারে তিলেক-তরে ছাড়িব না আর।

রুদ্রচন্দ্র। আয় মা আমার তুই থাক্ বৃকে থাক্।
 সমস্ত জীবন তোরে কত কষ্ট দিন্দু!
 এখন সময় মোর ফুরায়ে এসেছে,
 আজ তোরে কি করিয়া সুখী করি বাছা?
 আশীর্বাদ করি, বাছা, জন্মান্তরে যেন
 এমন নিষ্ঠুর পিতা তোর নাহি হয়!
 অমিয়া মা, কাঁদিস্ নে, থাক্ বৃকে থাক্!

ত্রয়োদশ দৃশ্য

চাঁদ কবি

ভ্রমিব সম্রাসীবেশে শ্মশানে শ্মশানে।
 অদৃষ্ট রে, একি তোর নিদারুণ খেলা,
 এক দিনে করিলি কি ওলটপালট!
 কিছুর রাখিলি নে আজ, কাল যাহা ছিল!
 পৃথিবীরাজ, রাজদন্ড, দোমদন্ড প্রতাপ,

হাসি-কান্না-লীলা-ময় নগর নগরী,
 অচল অটল কাল ছিল বর্তমান,
 আজ তার কিছু নাই! চিহ্ন মাত্র নাই!
 এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত,
 এই যে মানুষগণ করে কোলাহল,
 এঁকি সব শ্মশানেতে মরীচিকা আঁকা!
 মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে মিলাইয়া যায়,
 জগতের শ্মশান বাহির হ'য়ে পড়ে!
 চিতার কোলের পরে অস্থিভস্মমাঝে
 মানুষেরা নাট্যশালা করেছে স্থাপন!
 সন্ন্যাসী, কোথায় যাস্ শ্মশানে ভ্রমিতে!
 নগর নগরী গ্রাম সকলি শ্মশান!
 পৃথিবীরাজ, তুমি যদি গেলে গো চলিয়া,
 কবির বীণায় নাম রহিবে তোমার!
 যত দিন বেঁচে রব' যশোগান তব
 দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াব গাহিয়া।
 কুটীরের রমণীরা কাঁদিবে সে গানে,
 বালকেরা ঘেরি মোরে শুনাবে অবাক!
 দেশে দেশে সে গান শিখাবে কত লোক,
 মুখে মুখে তব নাম করিবে বিরাজ,
 দিশে দিশে সে নামের হবে প্রতিধ্বনি!
 এই এক রত শূদ্ধ রহিল আমার,
 জীবনের আর সব গেছে ধ্বংস হ'য়ে!
 আহা সে আঁমিয়া মোর, সে কি বেঁচে আছে?
 তার তরে প্রাণ বড় হয়েছে অধীর!
 চৌদিকে উঠিছে যবে রণকোলাহল,
 চৌদিকে চলেছে যবে মরণের খেলা,
 করুণ সে মুখখানি, দীনহীন বেশ,
 আঁখির সামনে ছিল ছবির মতন!
 আকাশের পটে আঁকা সে মুখ হেরিয়া
 ভীষণ সমরক্ষেত্রে কাঁদিয়াছি আমি!
 তার সেই 'চাঁদ' 'চাঁদ' স্নেহের উচ্ছ্বাস,
 কানেতে বাজিতেছিল আকুল সে স্বর!
 একটি কথাও তারে নারিন্দু বলিতে?
 মুখের কথাটি তার মুখে র'য়ে গেল,
 একটি উত্তর দিতে পেন্দু না সময়?
 চাহিয়া পাষণদৃষ্টি আইনু চলিয়া!
 পাব কি দেখিতে তারে কোথায় সে গেল?
 যাই সে অরণ্যমাঝে যাই একবার!

চতুদ্দশ দৃশ্য

চাঁদ কবি

চাঁদ কবি।

উহু, কি নিস্তব্ধ বন, হাহা করে বায়ু,
পদশব্দে প্রতিধ্বনি উঠিছে কাঁদিয়া!
আশঙ্কায় দেহ যেন উঠিছে শিহরি,
অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিঃশ্বাস!
এই যে কুটীর সেই, সাড়াশব্দ নাই,
গোপন কি কথা ল'য়ে স্তব্ধ আছে যেন!
কাঁপিছে চরণ মোর! বাব কি ভিতরে?

[দ্বার উন্মোচন]

গৃহমধ্যে রুদ্ধচন্দ্রের মৃতদেহ ও মৃদুমর্দু অমিয়া।

অমিয়া।

অমিয়া, অমিয়া মোর, স্নেহের প্রতিমা!
চাঁদ কবি, ভাই তোর এসেছে হেথার।
চাঁদ, চাঁদ, আইলে কি? এস কাছে এস—
কখন আসিবে তুমি সেই আশা চেয়ে
বুঝি এতক্ষণ প্রাণ যায় নি চলিয়া!
কত দিন কত রাত্রি পথে পথে খুঁজি
দেখা হল, ছুটে গেনু ভায়ের কাছেতে,
একবার দাঁড়ালে না? চলে গেলে চাঁদ?
না জানি কি অপরাধ করেছে অমিয়া!
আজ, চাঁদ, জীবনের শেষ দণ্ড মোর
শূন্যে ব্যাকুল বড় সে কি অপরাধ!
দেখিতে পাই নে কেন? কোথা তুমি ভাই?
সংসার চোখের পরে আসিছে মিলায়ে।
ত্বরা করে বল চাঁদ, সময় যে নাই,
একবার দাঁড়ালে না, চলে গেলে ভাই?

[মৃত্যু]

চাঁদ কবি।

একি হ'ল, একি হ'ল, অমিয়া, অমিয়া,
এক মৃহুস্তের তরে রহিলি না তুই?
করুণ অন্তিম প্রশ্ন মুখে রয়ে গেল,
উত্তর শূন্যে তার দাঁড়ালি নে বোন?
যত দিন বেঁচে রব ওই প্রশ্ন তোর
কানেতে বাজবে মোর দিবস রজনী,
জীবনের শেষ দণ্ডে ওই প্রশ্ন তোর
শূন্যে শূন্যে বালা মৃদিব নয়ন!
অমিয়া, অমিয়া মোর, ওঠ একবার।

প্রশ্ন শূন্যাবারে শূন্য বেঁচেছিল বোন,
এক দণ্ড রহিলি নে উত্তর শূন্যিতে?
ভাল বোন, দেখা হবে আর-এক দিন,
সে দিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ
দুজনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা।

সমাপ্ত

କାଳ-ଯୁଗରା

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ୧୯୮୨

প্রথম দৃশ্য

তপোবন

[ঋষিকুমারের প্রবেশ]

মিশ্র ভূপালী—যং

বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি।
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।
কোথা সে লীলা গেল কোথায়!
লীলা লীলা, খেলাবি আর।

[লীলার প্রবেশ]

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি

লীলা। ও ভাই, দেখে যা,
কত ফুল তুলেছি!
ঋষিকুমার। তুই আয় রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি!
তোর হাতে মৃণাল-বালা,
তোর কানে চাঁপার দুল।
তোর মাথায় বেলের সিঁথি,
তোর খোঁপায় বকুল ফুল!

মিশ্র খাম্বাজ—আড়ধেমটা

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মত
ফুল কত ফুটেছে।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়—
ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,
দিস নে দলে পায়!

মিশ্র বিভাস—আড়ধেমটা

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা
যাব নদীর কূলে—
শিব গড়িয়ে করব পূজো,
আনব কুসুম তুলে।
ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়,

বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
 বকুলের তলায়।
 লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
 নিয়ে বাব ধরে,
 মা বলেছে ঋষির সাজে
 সাজিয়ে দেবে তোরে!
 ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,
 এখন যাই ফিরে—
 একলা আছেন অন্ধ পিতা
 আঁধার কুটীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীগণ

মিশ্র সিন্ধু—টিমে তেতাল

প্রথম। সমুখেতে বহিছে তিটিনী,
 দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
 দ্বিতীয়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
 তৃতীয়। সাঁঝের অধর হতে
 ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।
 চতুর্থ। দিবস বিদায় চাহে,
 সরস্বি বিলাপ গাহে,
 সায়াহ্নের রাঙা পায়ে
 কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া!
 সকলে। এস সবে এস সখি,
 মোরা হেথা বসে থাকি।
 প্রথম। আকাশের পানে চেয়ে
 জলদের খেলা দেখি!
 সকলে। আঁখি-পরে তারাগুলি
 একে একে উঠিবে ফুটিয়া।

রাগিনী মিশ্র কেদারা—একতাল

সকলে। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বার,
 তিটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যার!
 পিক কিবা কুঞ্জ কুঞ্জ কুহু কুহু কুহু গায়,
 কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হায়!

ছায়ানট—আধবা

প্রথম। নেহার' লো সহচারি,
কানন আঁধার করি,
ওই দেখে বিভাবরী আসিছে।

দ্বিতীয়। দিগন্ত ছাইয়া
শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।

তৃতীয়। আয়, সখি, এই বেলা
মাধবী মালতী বেলা
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা।

চতুর্থ। ওই দেখে নলিনী উথলিত সরসে
অফুট-মুকুল-মুখী মৃদু মৃদু হাসিছে।

সকলে। আসিবে ঋষিকুমার কুসুমচরনে,
ফুটাইয়ে রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে।
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগদলি,
কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে!

তৃতীয় দৃশ্য

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

বেদপাঠ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধো ন জীৰ্যতি দিশো হস্য শ্রুতয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এব
কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্ ॥

তস্য প্রাচী দিগ্ জুহুর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং
বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্র রোদং রৌদ্দিত সোহহমেতমেবং বায়ুং দিশাং
বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

অন্ধ ঋষি। জল এনে দে রে বাছা তৃষিত কাতরে।
শুকায়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে।

[মেঘগজ্জর্জন]

দেশ—টিমে তেতালা

না না কাজ নাই, যেও না বাছা,—
গভীরা রজনী, ঘোর ঘন গরজে,
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে!

কেহ নাই, কেহ নাই—
 তুই শূন্য রয়েছিস হৃদয় জুড়িয়ে—
 তোরেও কি হারাব বাছা রে,
 সে ত প্রাণে স'বে না!

খাম্বাজ—টিমে তেতাল্লা

ঋষিকুমার। আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা, ভেবো না।
 অদরে সরষা বহে, দরে যাব না।
 পথ যে সরল অতি,
 চপলা দিতেছে জ্যোতি,
 তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
 অদরে সরষা বহে, দরে যাব না।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বন

বনদেবতা

গোড়মল্লার—কাওয়ালি

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
 স্তিমিত দশ দিশি,
 স্তম্ভিত কানন,
 সব চরাচর আকুল—
 কি হবে কে জানে,
 ঘোরা রজনী,
 দিক-ললনা ভয়বিভলা।
 চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
 চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী
 থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়ে।
 ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী,
 গুরু গুরু নীরদগরজনে
 স্তম্ভ অধার ঘুমাইছে—
 সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
 কড় কড় বাজ!

[প্রস্থান

[বনদেবীগণের প্রবেশ]

মল্লার— কাওয়ালি

সকলে। ঝন্ ঝন্ ঘন ঘন রে বরষে।
দ্বিতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা—
তৃতীয়। ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে!
সকলে। দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত—
প্রথম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!

মল্লার— কাওয়ালি

সকলে। আয় লো সজনি, সবে মিলে!
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গজর্জন,
এ বরষা-দিনে,
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকাদোলায় দুলে!
প্রথম। ফুটাব বতনে কেতকী কদম্ব অগণন।
দ্বিতীয়। মাথাব বরণ ফুলে ফুলে।
তৃতীয়। পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা—
চতুর্থ। লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
প্রথম। বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মৃকুতাকণা
পল্লবশ্যাম-দুকূলে।
দ্বিতীয়। নাচিব, সখি, সবে নবঘন-উৎসবে
বিকচ বকুলতরু-মূলে!

[ঋষিকুমারের প্রবেশ]

গায়— কাওয়ালি

ঋষিকুমার। কি ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা!
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা।
যাই, ভরা করে যেতে হবে
সরযুতটিনী-তীরে—
কোথায় সে পথ!
ওই কল কল রব!
আহা, তুষিত জনক মম,
যাই তবে যাই ভরা।
বনদেবীগণ। এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস!
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে!
স্নেহের পদতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে!
কি জানি কি হবে, বনে হবি পথহারা!
ঋষিকুমার। না, কোরো না মানা, যাব ভরা।

পিতা আমার কাতর ভূষায়,
যেতেছি তাই সরস্বতীতীরে।

মিশ্র বেলাওল—একতাল
‘ বনদেবীগণ। মানা না মানিলি, তবুও চলিলি,
কি জানি কি ঘটে!
অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে!
রাখ রে কথা রাখ, বারি আনা থাক,
যা ঘরে যা ছুটে!
অয়ি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয়স্নেহছায়ায়!
অয়ি বিভাবরী, রাখ বুকু ধরি
ভয় অপহরি রাখ এ জনায়!
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
এ যে একেলা অসহায়!

পঞ্চম দৃশ্য

[শিকারীগণের প্রবেশ]

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি
বনে বনে সবে মিলে চল হো! চল হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়!
এমন রজনী বহে যায় রে!
ধনু বাণ বল্লম লয়ে হাতে
আয়, আয়, আয়, আয় রে!
বাজা শিঙা ঘন ঘন—
শব্দে কাঁপবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে,
চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে—
চারি দিক ঘিরে যাব পিছে পিছে
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

[দশরথের প্রবেশ]

সিন্দূড়া

শিকারীগণ। জয়তি জয় জয় রাজন্ বন্দি তোমারে,
কে আছে তোমা সমান।

দ্বিভুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে,
তোমাতে করি প্রণাম!
দশরথ । [শিকারীদের প্রতি]

বাহার

গহনে গহনে যা রে তোরা,
নিশি ব'হে যায় যে!
তন্ন তন্ন করি অরণ্য
করী বরাহ খোঁজ্ গে!
এই বেলা যা রে!
নিশাচর পশু সবে
এখনি বাহির হবে—
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ছুরা চল্ ।
জ্বালায়ে মশাল আলো
এই বেলা আয় রে!

[প্রস্থান]

অহং—কাওয়ালি

প্রথম শিকারী । চল চল, ভাই,
ছুরা ক'রে মোরা আগে যাই ।
দ্বিতীয় । প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন, সে বন ।
তৃতীয় । চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই ।
প্রথম । না না ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছ্ নাই—কিছ্ নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছ্ পাই ।
তৃতীয় । বরা'! বরা'!
প্রথম । আরে দাঁড়া দাঁড়া,
অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার ।
চুপিচুপি আয়, চুপিচুপি আয়
অশথতলায়—
এবার ঠিক্ঠাক্ হয়ে সবে থাক্—
সাবধান, ধর বাণ, সাবধান, ছাড় বাণ—
২।৩ জন । গেল গেল ওই ওই পালায় পালায়—
চল্ চল্—
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ছুরা যাই ।

[প্রস্থান]

[বিদ্রোহের সভয়ে প্রবেশ]

দেশ—থেমটা

প্রাণ নিয়ে ত সট্কেছি রে,
ওরে বরা, করবি এখন কি!
বাবা রে!

আমি চূপ ক'রে এই
 আমড়াতলায় লুকিয়ে থাকি।
 এই মরদের মুরদখানা,
 দেখেও কি রে ভড়্কালা না—
 বাহবা, সাবাস তোরে,
 সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।
 গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে
 ব্রাহ্মণীয়ে ঘরে ফেলে
 কোথা এলেম এ ঘোর বনে!
 মনে আশা ছিল মস্ত
 চলবে ভাল দক্ষিণ হস্ত—
 হা রে রে পোড়া কপাল,
 তাও যে দেখি কেবল ফাঁকি!

[শিকারীগণের প্রবেশ]

শঙ্করা

শিকারীগণ। ঠাকুরমশয়, দেরি না সর—
 তোমার আশায় সবাই ব'সে।
 শিকারেতে হবে যেতে,
 মিহি কোমর বাঁধ ক'ষে!
 বন বাদাড় সব ঘেঁটেঘুটে,
 আমরা মরি খেটেখুটে,
 তুমি কেবল লুটেপুটে
 পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে!
 বিদূষক। কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
 আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি!
 শিকার করতে যায় কে মরতে—
 ঢুঁসিয়ে দেবে বরা' মোষে!
 ঢুঁ খেয়ে ত পেট ভরে না,
 সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে।

[হাসিতে হাসিতে শিকারীগণের প্রস্থান]

মিশ্র সিদ্ধ

বিদূষক। আঃ, বেঁচেছি এখন!
 শর্ম্মা ও দিকে আর নন।
 গোলেমালে ফাঁকিতালে সটকেছি কেমন।
 বাবা! দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
 লেগেছিল দাঁত-কপাটি,
 পড়ল খসে হাতের লাঠি
 কে জানে কখন।
 চুলগুলা সব ঘাড়ে খাড়া,
 চক্ষুদুটো মশাল-পারা,

গোঁ ভরে হেঁট-মুখে তাড়া
 কল্লে সে যখন—
 রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
 পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
 চুপসে গেল ফাঁপা ভুঁড়ি
 শঙ্কাতে তখন।

[প্রস্থান]

[শিকার স্কন্ধে শিকারীগণের প্রবেশ]

এনেছি মোরা এনেছি মোরা
 রাশি রাশি শিকার!
 করেছি ছারখার,
 সব করেছি ছারখার!
 বনবাদাড় তোলপাড়,
 করেছি রে উজাড়!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান]

[বনদেবীদের প্রবেশ]

মিশ্র মল্লার—পোস্ত

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
 সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
 মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
 বিমল সরোবর মন্দিয়া,
 ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
 সঘনে খর শর সন্দিয়া!
 তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
 স্থলিত চরণে ছুটিছে!
 স্থলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
 করুণনয়নে চাহিছে।
 আকুল সরসী, সারস সারসী
 শরবনে পশি কাঁদিছে।
 তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
 বিপদ ঘনছায়া ছাইয়া।
 কি জানি কি হবে, আজি এ নিশীথে,
 তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া!

[প্রস্থান]

[দশরথের প্রবেশ]

থাম্বাজ—কাওয়ালি

না জানি কোথা এলুম, এ যে ঘোর বন।
 কোথা গেল সে করিশিশু, কোথা লুকাল!
 একে ত জটিল বন, তাহে অধার ঘন!

যাক্-না যাবে সে কত দূর, কত দূর—
 যাব পিছে পিছে—
 না না না না, ও কি শূনি!
 ওই সে সরস্বতীতে করিছে সলিল পান
 শব্দ শূনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ!

নেপথ্যে বনদেবীগণ

ভৈরবী

হায় কি হ'ল! হায় কি হ'ল!

[বাণাহত ঋষিকুমারের নিকট দশরথের গমন]

বেহাগ— আড়াঠেকা

কি করিনু হায়!

এ ত নয় রে করিশিশু, ঋষির তনয়!
 নিষ্ঠুর প্রথর বাণে রুধিরে আগ্নেতকায়
 কার রে প্রাণের বাছা ধূলাতে লুটায়!
 কি কুলগ্নে না জানি রে ধরিলাম বাণ,
 কি মহাপাতকে কার বধিলাম প্রাণ!
 দেবতা, অমৃতনীরে হারা-প্রাণ দাও ফিরে,
 নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায়!

[মৃখে জলসিঞ্জন]

খট— ঝাঁপতাল

ঋষিকুমার ।

কি দোষ করেছি তোমার,
 কেন গো হানিলে বাণ!
 একই বাণে বধিলে যে
 দুটি অভাগার প্রাণ!
 শিশু বনচারী আমি
 কিছই নাহিক জানি—
 ফল মূল তুলে আনি,
 করি সামবেদ গান!
 জন্মান্ধ জনক মম
 তুষায় কাতর হয়ে
 রয়েছেন পথ চেয়ে—
 কখন যাব বারি লয়ে।
 মরণান্তে নিয়ে যেও,
 এ দেহ তাঁর কোলে দিও—
 দেখো, দেখো ভুলোনাকো,
 কোরো তাঁরে বারিদান!
 মার্জনা করিবেন পিতা,
 তাঁর যে দয়ার প্রাণ!

[মৃত্যু]

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি

মিশ্র ঝর্ণিঝর্ট খাম্বাজ—মধ্যমান

অন্ধঋষি।

আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে—

হা তাত, একবার আয় রে!

ঘোরা রজনী, একাকী

কোথা রহিলে এ সময়ে!

প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে—

কী হবে কে জানে!

[লীলার প্রবেশ]

রামকেলী—কাওয়ালি

বল বল পিতা, কোথা সে গিয়েছে!

কোথা সে ভাইটি মম, কোন্ কাননে!

কেন তাহারে নাহি হেরি!

খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,

তবু কেন এখন না এল?

বনে বনে ফিরি 'ভাই' 'ভাই' করিয়ে,

কেন গো সাড়া পাই নে!

বেহাগ—কাওয়ালি

অন্ধ।

কে জানে কোথা সে!

প্রহর গণিয়া গণিয়া বিরলে

তারি লাগি বসে আছি!

একা হেথা, কুটীরদ্বারারে—

বাছা রে এলি নে!

ত্বরা আয়, ত্বরা আয়, আয় রে—

জল আনিয়ে কাজ নাই.

তুই যে আমার পিপাসার জল!

কেন রে জাগিছে মনে ভয়!

কেন আজি তোরে,

হারাই হারাই মনে হয়!

কে জানে!

[লীলার প্রস্থান]

[মৃতদেহ লইয়া দশরথের প্রবেশ]

সিন্ধু—চৌতাল

অন্ধ।

এতক্ষণে বুঝি এলি রে!

হৃদিমাঝে আয় রে, বাছা রে!

কোথা ছিঁলি বনে, এ ঘোর রাতে,
এ দুর্যোগে. অন্ধ পিতারে ভুলি!
আছি সারানিশি হায় রে
পথ চাহিয়ে, আছি তুষায় কাতর—
দে মদুখে বারি, কাছে আয় রে!

দশরথ। অজ্ঞানে কর হে ক্ষমা, তাত, ধরি চরণে—
কেমনে কহিব, শিহরি আতঙ্কে!
আঁধারে সন্ধানি শর খরতর
করী-ভ্রমে বধি তব পুত্রবর,
গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে!

[দশরথ-কর্তৃক ঋষির নিকটে
ঋষিকুমারের মৃতদেহ-স্থাপন]

বাহার—টিমে তেতালা

অন্ধ। কি বলিলে, কি শুনিলাম, একি কভু হয়!
এই যে জল আনিবারে গেল সে সরযুতীরে—
কার সাধ্য বধে, সে যে ঋষির তনয়!
সুকুমার শিশু সে যে, স্নেহের বাছা রে,
আছে কি নিষ্ঠুর কেহ বধিবে যে তারে!
না না না, কোথা সে আছে—এনে দে আমার কাছে,
সারা নিশি জেগে আছি বিলম্ব না সয়!
এখনো যে নিরন্তর—নাহি প্রাণে ভয়!
রে দুরাত্মা—কী করিলি—

[অভিশাপ]

পুত্রবাসনজং দুঃখং
ষদেতন্মম সাংপ্রতম্।
এবং হুং পুত্রশোকেন
রাজন্ কালং করিষ্যসি।

দশরথ। মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালি
ক্ষমা কর মোরে তাত,
আমি যে পাতকী ঘোর,
না জেনে হয়েছি দোষী,
মার্জনা নাহি কি মোর!
ও! সহে না যাতনা আর,
শান্তি পাইব কোথায়—
তুমি কৃপা না করিলে
নাহি যে কোন উপায়!

আমি দীন হীন অতি—
ক্ষম ক্ষম কাতরে,
প্রভু হে, করহ দ্বাগ
এ পাপের পাথারে।

কাফি—আড়াঠেকা

অন্ধ। আহা, কেমনে বধিল তোরে!
তুই যে স্নেহের পদতলি, স্নেহকুমার শিশু ওরে!
বড় কি বেজেছে বন্ধুকে, বাছা রে,
কোলে আয়, কোলে আয় একবার—
ধূলাতে কেন লুটায়, রাখিব বন্ধুকে ক'রে!

[কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও অবশেষে
উঠিয়া দাঁড়াইয়া দশরথের প্রতি]

নটনারায়ণ

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে!

[পদ্যের প্রতি]

প্রভাতী

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পার্শরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি!
যাও রে অনন্তধামে, অমৃতনিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদারপ্রাণে!
দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে এক তানে!
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে,
শুদ্ধ সেই চিরবিমল পদ্য কিরণে—
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পদ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে!

[যবনিকাপতন]

[পুনরুত্থান]

[ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘেরিয়া বনদেবীদের গান]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতাল

সকাল ফুরাল স্বপনপ্রায়,
কোথা সে লুকাল, কোথা সে হায়!

কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,
পাখীরা কেন রে গাহে না গান,

ও! সব হেরি শূন্যায়,
কোথা সে হায়!

কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল,
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,

ও! সে আর আসিবে না,
কোথা সে হায়!

যবনিকাপতন

সমাপ্ত

ନଳିନୀ

ପ୍ରକାଶ : ୧୪୪୫

প্রথম দৃশ্য

অপরাহ্ন

কানন

নীরদ

গান

পিলদ—কাওয়ালি

হা কে ব'লে দেবে

সে ভালবাসে কি মোরে!

কভু বা সে হেসে চায়, কভু মৃদু ফিরায়ে লয়,

কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,

যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধ'রে!

নলিনী ও বালিকা ফুলির প্রবেশ

নীরদ। (স্বগত) এ রকম সংশয়ে ত আর থাকা যায় না! এমন ক'রে আর কত দিন কাটবে! এত দিন অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি—ওগো, একবার হৃদয়ের দুয়ার খোল, আমাকে এক পাশে একটু আশ্রয় দাও—যে লোক এত দিন ধ'রে প্রত্যাশা ক'রে চেয়ে আছে তাকে কি একটবার প্রাণের মধ্যে আহ্বান করবে না? আজকের কাছে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব! যদি একেবারে বলে—না! আচ্ছা, তাই বলুক—আমার এ সুখ দুঃখের যা হয় একটা শেষ হয়ে যাক! (কাছে গিয়া) নলিনী!—

নলিনী। ফুলি, ফুলি, তুই ওথেনে ব'সে ব'সে কি করিচিস, ফুল তুলতে হবে মনে নেই! আয়, শীগগির ক'রে আয়! ও কি করিচিস, কুঁড়িগুলো তুলেচিস কেন—আহা ওগুদি কাল কেমন ফুটত! চল্ ঐদিকে গোলাপ ফুটেচে যাই। আজ এখনো নবীন এল না কেন?

ফুলি। তিনি এখনি আসবেন।

নীরদ। আমার কথায় কি একবার কর্ণপাতও করলে না? আমি মনে করতুম, প্রাণপণ আগ্রহকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। নলিনীর কি এতটুকুও হৃদয় নেই যে আমার অতখানি আগ্রহকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারলে? নাঃ—হয়ত ফুল তুলতে অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শুনতেও পায় নি! আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। নলিনী!—

নলিনী। ফুলি, কাল এই বেলফুলের গাছগুলোতে মেলাই কুঁড়ি দেখেছিলাম, আজ ত তার একটিও দেখাচি নে! চল্ দেখি, ঐদিকে যদি ফুল পাই ত তুলে নিয়ে আসি! (অন্তরালে) দেখ্ ফুলি, নীরদ আজ কেন এমন বিষন্ন হয়ে আছেন তুই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আয় না! তুই ঠুঁর কাছে গিয়ে একটু গান-টান গেয়ে শোনাতে উনি ভাল থাকেন। তাই তুই যা, আমি ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

ফুলি। কাকা, তোমার কি হয়েছে!

নীরদ। কি আর হবে ফুলি!

ফুলি। তবে তুমি এমন ক'রে আছ কেন কাকা?

নীরদ। (কোলে টানিয়া লইয়া) কিছুই হয় নি বাছা!

ফুলি। কাকা, তুমি গান শুনবে?

নীরদ। না রে, এখন গান শুনতে বড় ইচ্ছে করচে না!

ফুলি। তবে তুমি ফুল নেবে?

নীরদ। আমাকে ফুল কে দেবে ফুলি?

ফুলি। কেন, নলিনী ঐথেনে ফুল তুলচে, ঐদিকে ঢের ফুলেচে—ঐথেনে চল না কেন? (নলিনীর কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া) কাকাকে কতকগুলি ফুল দাও না ভাই, উনি ফুল চাচ্ছেন!

নলিনী। তুই কি চোকে দেখতে পাস নে? দেখ্ দেখি গাছের তলায় কি ক'রে দিলি? অমন সুন্দর বকুলগুলি সব মাড়িয়ে দিয়েচিস! হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুলি, আমরা যে সে দিন সেই ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসায় সেই পাখীর ছানাগুলিকে দেখেছিলুম, আজ তাদের চোক ফুলেচে, তারা কেমন পিট্‌পিট্‌ ক'রে চাচ্ছে! তাদের মা খাবার আনতে গেছে, এই বেলা আয়, আমরা তাদের একটি একটি ক'রে ঘাসের ধান খাওয়াই গে!

ফুলি। কোথায় সে, কোথায় সে, চল না। (উভয়ের দ্রুত গমন)

নলিনী। (কিছু দূর গিয়া ফুলির প্রতি) ঐ যা, তোর কাকাকে ফুল দিয়ে আসতে ভুলে গেচি! তুই ছুটে যা, এই ফুল দুটি তাঁকে দিয়ে আয় গে। আমার নাম করিস নে যেন!

ফুলি। (নীরদের কাছে আসিয়া) এই নাও কাকা, ফুল এনেছি।

নীরদ। (চুম্বন করিয়া) আমি ভেবেছিলেম আমাকে কেউ ফুল দেবে না। শেষ কালে তোর কাছ থেকে পেলেম!

নলিনী। (দূর হইতে) ফুলি, তুই আবার গেলি কোথায়? ঝট্ ক'রে আয় না, বেলা ব'য়ে যায়।

ফুলি। এই যাই। (ছুটিয়া যাওন)

নীরদ। (স্বগত) এ যেন রূপের ঝড়ের মত, যেথেন দিয়ে বয়ে যায় সেথেনে তোলপাড় ক'রে দেয়। এতটা আমি ভালবাসি নে! আমার প্রাণ শ্রান্ত পাখীটির মত একটি গাছের ছায়া চায়, প্রচ্ছন্ন সুখের কুলায় চায়। আমি ত এত অধীরতা সহিতে পারি নে। একটুখানি বিরাম, একটুখানি শান্তি কোথায় পাব? (নলিনীর কাছে গিয়া) নলিনী, তুমি আমার একটি কথার উত্তর দেবে না?

নভীশিরা নলিনীর স্তম্ভভাবে আঁচলের ফুল-গণনা

কখন তুমি আমার সঙ্গে একটি কথা কও নি—আজ তোমাকে বেশী কিছু বলতে হবে না, একবার কেবল আমার নামটি ধ'রে ডাক, তোমার মুখে একবার কেবল আমার নামটি শোনবার সাধ হয়েছে। আমার এইটুকু সাধও কি মিটবে না? না হয় একবার বল যে, না! বল যে, মিটবে না! বল যে, তোমাকে আমার ভাল লাগে না, তুমি কেন আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াও! আমার এই দুর্বল ক্ষীণ আশাটুকুকে আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখব? তোমার একটি কঠিন কথায় তাকে একেবারে বধ ক'রে ফেল, আমার যা হবার হোক।

(নলিনীর আঁচল শিথিল হইয়া ফুলগুলি সব পড়িয়া গেল ও নলিনী মাটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে একে একে কুড়াইতে লাগিল।)

নীরদ। তাও বলবে না! (নিশ্বাস ফেলিয়া দূরে গমন)

ফুলি। (ছুটিয়া নলিনীর কাছে আসিয়া) দেখ'সে, নেবুগাছে একটা মোঁচাক দেখতে পেয়েছি!—ও কি ভাই, তুমি মধু ঢেকে অমন ক'রে বসে আছ কেন? ও কি তুমি কাঁদচ কেন ভাই?

নলিনী। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কই, কাঁদচি কই?

ফুলি। আমি মনে করেছিলুম, তুমি কাঁদচ!

নবীর প্রবেশ

নলিনী। ঐ যে নবীন এয়েচে, চল্ ওর কাছে যাই! (কাছে আসিয়া) আজ যে তুমি এত দৌর ক'রে এলে?

নবীন। (হাসিয়া) একটুখানি তিরস্কার পাবার ইচ্ছে হয়েছিল। আমি দৌর ক'রে এলে তোমারও বে দৌর মনে হয় এটা মাঝে মাঝে শুনতে ভাল লাগে।

নলিনী! বটে! তিরস্কারের সুখটা একবার দেখিয়ে দেব। দে ত ফুলি, ওর গায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দে ত।

নবীন। ও যন্ত্রণাটা ভাই এক রকম সওয়া আছে। ওতে আর বেশী কি হ'ল? ওটা ত আমার দৈনিক পাওনা! যতগুলি কাঁটা এইখানে ফুটিয়েছ, সবগুলি যত্ন ক'রে প্রাণের ভিতর বিঁধিয়ে রেখেচি—তার একটিও ওপড়ায় নি, আর যায়গা কোথায়?

নলিনী। ও বড্ড কথা কছে ফুলি—দে ত ওকে সেই গানটা শুনিয়ে।

ফুলির গান

পিলু

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে

ওলো সজনি!

হাসি খেলি রে মনের সুখে,

ও কেন সাথে ফেরে আঁধারমুখে

দিন রজনী!

নবীন। আমারও ভাই একটা গান আছে, কিন্তু গলা নেই। কি দুঃখ! প্রাণের মধ্যে গান আকুল হয়ে উঠেছে, কেবল গলা নেই ব'লে কেউ একদণ্ড মন দিয়ে শুনবে না! কিন্তু গলাটাই কি সব হ'ল? গানটা কি কিছুই নয়? গানটা শুনতেই হবে।

কাল্যাণ্ডা

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে

কেন সে দেখা দিল!

মধু অধরের মধুর হাসি

প্রাণে কেন বরষিল!

দাঁড়িয়েছিলেম পথের ধারে,

সহসা দেখিলেম তারে—

নয়ন দুটি তুলে কেন

মুখের পানে চেয়ে গেল!

নলিনী। আর ভাল লাগচে না। (স্বগত) মিছিমিছি কথা কাটাকাটি ক'রে আর পারি নে। একটু একলা হ'লে বাঁচি। (ফুলির প্রতি) আয় ফুলি, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি গে।

[প্রস্থান]

নীরদ। এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এমনতর চপলতা কি কিছুমাত্র শোভা পায়! সন্ধ্যার এমন শান্তিময় স্তব্ধতার সঙ্গে ঐ গান বাজনা হাসি তামাসা কি কিছুমাত্র মিশ খায়? একটু হৃদয় থাকলে কি এমন সময়ে এমনতর চপলতা প্রকাশ করতে পারত? আমোদ প্রমোদের কি একটুও বিরাম নেই? দিনের আলো যখন নিবে এসেছে, পাখীগুলি তাদের নীড়ে তাদের একমাত্র সঙ্গিনী-দের কাছে ফিরে এসেছে, দূরে কুণ্ডেঘরগুলিতে সন্ধের প্রদীপ জ্বলেচে—তখন কি ঐ চপলার এক মুহূর্তের তরেও আর একটি হৃদয়ের জন্যে প্রাণ কাঁদে না? এক মুহূর্তের জন্যেও কি ইচ্ছে যায় না—এই কোলাহলশূন্য জগতের মধ্যে আর একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দুজনের পানে চেয়ে থাকি। গভীর শান্তিপূর্ণ সেই সন্ধ্যা-আকাশে দুটিমাত্র স্তব্ধ হৃদয় স্তব্ধ আনন্দে বিরাজ করি। দুটি সন্ধ্যাতারার মত আলোয় আলোয় কথা হয়! হয় এ কি কল্পনা! এ কি দুরাশা!

নবীর প্রবেশ

নবীন। এ কি ভাই, তুমি যে একলা এখানে বসে আছ? আমাদের সঙ্গে যে যোগ দাও নি?

নীরদ। এমন মধুর সন্ধে বেলায় কেমন ক'রে যে তুমি ঐ মূর্ত্তিমতী চপলতার সঙ্গে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছিলে আমি তাই বসে ভাবছিলাম। সন্দের কি একটা পবিত্রতা নেই? ঐ সময়ে হৃদয়হীন চটুলতা দেখলে কি তার সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছে করে?

নবীন। তোমরা কবি মানুষ, তোমাদের কথা আমরা ঠিক বঝতে পারি নে। আমার ত খুব ভাল লাগছিল। আর তোমাদের কবিত্বের চোখেই বা ভাল লাগবে না কেন তাও আমি ঠিক বঝতে পারি নে! সরলা বালিকা, মনে কোন চিন্তা নেই, প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে সন্ধ্যার কোলে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে এই বা দেখতে খারাপ লাগবে কেন?

নীরদ। তা ঠিক বলেচ! (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু যার কোন চিন্তা নেই, সে মন কি মন? যে হৃদয় আর কোন হৃদয়ের জন্যে ভাবে না, আপনাকে নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট আছে, তাকে কি স্বার্থপর বলব না!

নবীন। তুমি নিজে স্বার্থপর বলেই তাকে স্বার্থপর বলেচ! যে হৃদয় তোমার হৃদয়ের জন্যে ভাবে না তার আনন্দ তার হাসি তোমার ভাল লাগে না, এর চেয়ে স্বার্থপরতা আর কি আছে! আমি ত, ভাই, সে ধাতের লোক নই। সে আমাকে হৃদয় দিক আর নাই দিক আমার তাতে কি আসে যায়? আমি তার যতটুকু মধুর তা উপভোগ করব না কেন? তার মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা পেতে আপত্তি কি আছে!

নীরদ। স্বার্থপরতা? ঠিক কথাই বটে। এত দিনে আমার মনের ভাব ঠিক বঝতে পারলুম। ঐ সরলা বালা আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে তাতে আমার মনে মনে তিরস্কার করবার কি অধিকার আছে। আমি কোথাকার কে! আমি অনবরত তাকে অপরাধী করি কেন!

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। আমাকে মাঝ্জানা কর।

নবীন। (তাড়াতাড়ি) আবার ও সব কথা কেন? বড় বড় হৃদয়ের কথা বলে বালিকার সরল মনকে ভারগ্রস্ত করবার দরকার কি? (হাসিয়া নলিনীর প্রতি) নলিনী, আজ বিদায় হবার আগে একটি ফুল চাই!

নলিনী। বাগানে ত অনেক ফুল ফুটেছে, যত খুশি তুলে নাও না!

নবীন। ফুলগুলিকে আগে তোমার হাসি দিয়ে হাসিয়ে দাও, তোমার স্পর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে দাও! ফুলের মধ্যে আগে তোমার রূপের ছায়া পড়ুক, তোমার স্মৃতি জড়িয়ে থাক—তার পরে তাকে ঘরে নিয়ে যাব।

নলিনী। (হাসিয়া) বড় তোমার মুখ ফুটেছে দেখি! দিনে দুপুরে কবিতা বলতে আরম্ভ করেচ!

নবীন। আমি কি সাধে বলিচি! তুমি যে জোর ক'রে আমাকে কবিতা বলাচ্চ। তোমার ঐ দৃষ্টির পরেশ-পাথরে আমার ভাবগুলি একেবারে সোনা-বাঁধানো হয়ে বেরিয়ে আসচে।

নলিনী। তুমি ও কি হেস্যালি বলেচ আমি কিছুই বঝতে পারিচি নে।

নীরদ। আমি ত নবীর মত এ রকম ক'রে কথা কইতে পারি নে! আর মিছিমিছি এ রকম উত্তর প্রত্যুত্তর ক'রে যে কি সুখ আমি কিছুই ত বঝতে পারি নে! কিন্তু আমার সুখ হয় না বলে কি আর কারও সুখ হবে না? আমি কি কেবল একলা বসে বসে পরের সুখ দেখে তাদের তিরস্কার করতে থাকব, এই আমার কাজ হয়েছে? যে যাতে সুখী হয় হোক না, আমার তাতে কি? আমার যদি তাতে সুখ না হয়, আমি অন্যত্র চলে যাই।

নবীন। (নলিনীর প্রতি) দেখতে দেখতে তোমার হাসিটি মিলিয়ে এল কেন ভাই? কি যেন একটা কালো জিনিষ প্রাণের ভিতর নরকিয়ে রেখেচ, সেটা হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেচ, কিন্তু হাসি

যে আর থাকে না! আমি ত বলি প্রকাশ করা ভাল! (কোন উত্তর না পাইয়া) তুমি বিরক্ত হয়েচ! না? মনের ভিতর একজন লোক হঠাৎ উঁকি মারতে এলে বড় ভাল লাগে না বটে! কিন্তু একটু বিরক্ত হ'লে তোমাকে বড় সুন্দর দেখায়! সেই জন্যে তোমাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে!

নলিনী। (হাসিয়া) বটে! তোমার যে বড় জাঁক হয়েছে দেখছি! তুমি কি মনে কর তুমিও আমাকে বিরক্ত করতে, কষ্ট দিতে পার! সেও অনেক ভাগ্যের কথা! কিন্তু সে ক্ষমতাটুকুও তোমার নেই।

নবীন। (সহাস্যে) আমার ভুল হয়েছিল।

নীরদ। নবীনের সঙ্গেই নলিনীর ঠিক মিলেচে! এ আমার জন্যে হয় নি! আমি এদের কিছুই বুঝতে পারি নে! এদের হাসি এদের কথা আমার প্রাণের সঙ্গে কিছুই মেলে না! তবে কেন আমি এদের মধ্যে একজন বেগানা লোকের মত ব'সে থাকি! আমি পর, আমার এখানে কোন অধিকার নেই! এদের অন্তঃপুরের মধ্যে আমি কেন? আমার এখান থেকে যাওয়াই ভাল! আমি চ'লে গেলে কি এদের একটুও কষ্ট হবে না? একবারও কি মনে করবে না, আহা, সে কোথায় গেল? না—না—আমি গেলে হয়ত এরা আরাম বোধ করবে! এখানে আর থাকব না। আজই বিদেশে যাব! এত দিনের পরে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি যে আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।

ফুলি। (আসিয়া) (নলিনীর প্রতি) মা তোমাদের ডাকতে পাঠালেন।

নলিনী। তবে যাই।

[প্রস্থান]

নবীন। আমিও তবে বিদায় হই।

[প্রস্থান]

নীরদ। (ফুলিকে ধরিয়া) আয় ফুলি, একবার আমার কোলে আয়! আমার বুকে আয়!

ফুলি। ও কি কাকা, তোমার চোখে জল কেন?

নীরদ। ও থাক্। জল একটু পড়ুক। (কিছুক্ষণ পরে) অন্ধকার হয়ে এল, এখন তবে বাড়ি যা।

ফুলি। তুমি বাড়ি যাবে না কাকা?

নীরদ। না বাছা!

ফুলি। তুমি তবে কোথায় যাবে?

নীরদ। আমি আর এক জায়গায় চলেম। নলিনীর সঙ্গে তুমি বাড়ি যা!

[প্রস্থান]

নলিনী। (আসিয়া) তোর কাকা তোকে কি বলছিলেন ফুলি?

ফুলি। কিছুই না!

নলিনী। আমার কথা কি কিছু বলছিলেন?

ফুলি। না।

নলিনী। আয় বাড়ি আয়।

ফুলি। কিন্তু কাকা কাঁদছিলেন কেন?

নলিনী। কি, তিনি কাঁদছিলেন?

ফুলি। হাঁ।

নলিনী। কেন কাঁদছিলেন ফুলি?

ফুলি। আমি ত জানি নে!

নলিনী। তোকে কিছুই বলেন নি?

ফুলি। না।

নলিনী। কিছুই বলেন নি?

ফুলি। না।

নলিনী। তবে সেই গানটা গা!

বেহাগড়া—কাওয়ালি

মনে রয়ে গেল মনের কথা—

শুদ্ধ চোখের জল, প্রাণের ব্যথা!

মনে করি দুটি কথা বলে যাই,

কেন মূখের পানে চেয়ে চলে যাই,

সে যদি চাহে মরি যে তাহে—

কেন মূদে আসে আঁখির পাতা!

ম্লান মূখে সখি সে যে চলে যায়,

ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,

বুঝিল না সে যে কোঁদে গেল—

ধূলায় লুটাইল হৃদয়লতা!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

নবীন। নীরদ বিদেশে যাবার পর থেকে নলিনীর এ কি হ'ল? সে উল্লাস নেই, সে হাসি নেই। বাগানে তার আর দেখা পাই নে। দিনরাত ঘরের মধ্যেই একলা ব'সে থাকে। নলিনী নীরদকেই বাস্তবিক ভালবাসত! এইটে আর আগে বুঝতে পারি নি! এমনি অন্ধ হয়েছিলেম। নীরদের সম্মুখে সে যেন নিজের প্রেমের ভারে নিজে ঢাকা পড়ে যেত! তাকে ঠিক দেখা যেত না। নীরদের সম্মুখে সে এমনি অভিভূত হয়ে পড়ত যে আমাদের কাছে পেল সে যেন আশ্রয় পেত, সে যেন আমাদের পাশে আপনাকে আড়াল ক'রে তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করতে চেষ্টা করত। নীরদের পূর্ণদৃষ্টির সূর্যালোকে পাছে তার প্রাণের সমস্তটা একেবারে দেখা যায় এই ভয়ে সে নীরদের সম্মুখে অস্থির হয়ে পড়ত; কি ভুলই করেছি! যাই, তাকে একবার খুঁজে আসি গে! আজ তার সে করুণ মূখখানি দেখলে বড় মায়া করে। তার মূখের সেই সরল হাসিখানি যেন নিরাশ্রয় হয়ে আমার চোখের সম্মুখে কোঁদে কোঁদে বেড়াচ্ছে! আবার কবে সে হাসবে?

[প্রস্থান

নলিনীর গৃহে প্রবেশ ও জানালার কাছে উপবেশন

নলিনী। (স্বগত) আমাকে একবার ব'লেও গেলেন না? আমি তাঁর কি করেছিলেম? আমাকে যদি তিনি ভালবাসতেন তবে কি একবার ব'লে যেতেন না?

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। বাগানে বেড়াতে যাবে না?

নলিনী। আজকের থাক্ ফুলি, আর এক দিন যাব।

ফুলি। তোর কি হয়েছে দিদি, তুই অমন ক'রে থাকিস কেন?

নলিনী। কিছ্ হয় নি বোন, আমার এই রকমই স্বভাব।

ফুলি। আগে ত তুই অমন ছিলি নে!

নলিনী। কি জানি আমার কি বদল হয়েছে!

ফুলি। আচ্ছা দিদি, কাকাকে আর দেখতে পাই নে কেন? কাকা কোথায় চ'লে গেছেন?

নলিনী। (ফুলিকে কোলে লইয়া, কাঁদিয়া উঠিয়া) তুই বল্ না তিনি কোথায় গেছেন! যাবার সময় তিনি ত কেবল তোকেই ব'লে গেছেন! আমাদের কাউকে কিছ্ ব'লে যান নি!

ফুলি। (অবাক্ হইয়া) কই, আমাকে ত কিছু বলেন নি!

নলিনী। তোকে তিনি বড় ভালবাসতেন। না ফুলি? আমাদের সকলের চেয়ে তোকে তিনি বেশী ভালবাসতেন!

ফুলি। তুমি কাঁদচ কেন দিদি? কাকা হয়ত শীগগির ফিরে আসবেন।

নলিনী। শীগগির কি আসবেন? তুই কি ক'রে জানলি?

ফুলি। কেনই বা আসবেন না?

নলিনী। ফুলি, তুই আমার জন্য এক ছড়া মালা গাথে নিয়ে আয় গে! আমি একটু একলা ব'সে থাকি।

ফুলি। আচ্ছা।

[প্রস্থান

নবীনীর প্রবেশ

নবীন। নলিনী, তুমি কি সমস্ত দিন এই রকম জানালার কাছে ব'সে ব'সেই কাটাবে?

নলিনী। আমার আর কি কাজ আছে? এইখানটিতে ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগে।

নবীন। আগেকার মত আজ একবার বাগানে বেড়াই গে চল না।

নলিনী। না, বাগানে আর বেড়াব না!

নবীন। নলিনী, কি করলে তোমার মন ভাল থাকে আমাকে বল। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

নলিনী। এইখানে আমি একটুখানি একলা ব'সে থাকতে চাই। তা হ'লেই আমি ভাল থাকব।

নবীন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

এক প্রতিবোধিনীর প্রবেশ

প্র। তোর কি হ'ল বল্ দেখি বোন্‌ঝি, আর যে বড় আমাদের ও দিকে ঘাস নে।

নলিনী। কি বলব মাসী, শরীরটা বড় ভাল নেই।

প্র। আহা, তাই ত লো, তোর মূখখানি বড় শুকিয়ে গেছে! চোখের গোড়ায় কালি পড়ে গেছে! মূখে হাসিটি নেই! তা, এমন ক'রে ব'সে আছিস কেন লো! আমার সঙ্গে আয়, দুজনে একবার পাড়ায় বেড়িয়ে আসি গে।

নলিনী। আজকের থাক্ মাসী!

প্র। কেনে লা! আমার দিদির বাড়ি নতুন বোঁ এসেচে, তাকে একবার দেখাবি চ।

নলিনী। আর এক দিন দেখব এখন মাসী, আজকের থাক্। আজ আমি বড় ভাল নেই।

প্র। আহা, থাক্ তবে। যে শরীর হয়ে গেছে, বাতাসের ভর সয় কি না সয়! আজ তবে আসি মা, ঘরকন্নার কাজ পড়ে রয়েছে।

[প্রস্থান

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। মা বলেচেন, সারাদিন তুমি ঘরে ব'সে আছ, আজ একটুবার আমাদের বাড়িতে চল।

নলিনী। না বোন, আজকের আমি পারব না!

ফুলি। তবে তুমি বাগানে চল। একলা মালা গাথতে আমার ভাল লাগচে না। একবারটি চল না বাগানে!

নলিনী। তোর পায়ে পড়ি ফুলি, আমাকে আর বাগানে যেতে বলিস নে, আমাকে একটু একলা থাকতে দে!

ফুলি। আমাদের সেই মাধবীলতাটি শুকিয়ে এসেচে, তাতে একটু জল দিবি নে?

নলিনী। না।

ফুলি। আমাদের সেই পোষ-মানা পাখীর ছানাটি আজকের একটু একটু উড়ে বেড়াচ্ছে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করচে না?

নীরজা। না না—আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি! যা হবার তা হবে, আমি তোমার সাথের সাথী রইলেম—ডুবি ত-দুজনে মিলে ডুবব। যদি এমন দিন আসে তুমি আমাকে ভাল-বাসতে না পার, তোমার সঙ্গে আমার যদি বিচ্ছেদ হয় ত—

নীরদ। ও কি কথা নীরজা? ও কথা মনেও আনতে নেই! দুঃখ এসে যাদের মিলন করে দেয়, চোখের জলের মস্তুর মালা যারা বদল করেছে, তাদের সে মিলন পবিত্র—জন্মে জন্মে তাদের আর বিচ্ছেদ হয় না। হাসি খেলার চপলতার মধ্যে আমাদের মিলন হয় নি, আমাদের ভয় কিসের?

নীরজা। নীরদ, দেখি তোমার হাতখানি, তোমাকে একবার স্পর্শ করে দেখি, ভাল করে ধরে রাখি, কেউ যেন ছিঁড়ে না নেয়!

নীরদ। এই নাও আমার হাত। আজ থেকে তবে আর আমরা বিচ্ছিন্ন হব না? আজ থেকে তবে সুদীর্ঘ জীবনের পথে আমরা দুজনে মিলে যাত্রা করলেম?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আজ থেকে তবে তুমি আমার বিষাদের সঙ্গিনী হ'লে, অশ্রুজলের সাথী হ'লে?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আমার বিষাদের গোধূলির মধ্যে তুমি সন্দের তারটির মত ফুটে থাকবে। তোমাকে আমি কখন হারাব না—চোখে চোখে রেখে দেব!

চতুর্থ দৃশ্য

দেশ

নীরদ নীরজা

নীরদ। এই ত আবার সেই দেশে ফিরে এলুম। মনে করি নি আর কখনো ফিরব। তোমাকে যদি না পেতুম তবে আর দেশে ফিরতুম না।

নীরজা। এমন সুন্দর দেশ আমি কোথাও দেখি নি। এ যেন আমার সব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। এত পাখী, এত শোভা আর কোথায় আছে।

নীরদ। কিন্তু নীরজা, এদেশে কেবল শোভাই আছে, এদেশে হৃদয় নেই।

নীরজা। তা হতেই পারে না। এত সৌন্দর্যের মধ্যে হৃদয় নেই এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না!

নীরদ। সৌন্দর্যকে দেখবামাত্রই লোকে তাকে বিশ্বাস করে ফেলে এই জনোই ত পৃথিবীতে এত দুঃখ-যন্ত্রণা! সে কথা যাক—নলিনীর বাড়িতে আজ বসন্ত-উৎসব—আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, একটু শীগ্গির শীগ্গির যেতে হবে।

নীরজা। আমার একাটি কথা রাখবে? আমি বলি ভাই, সেখানে আমাদের না যাওয়াই ভাল।

নীরদ। কেন?

নীরজা। কেন, তা জানি নে, কিন্তু কে জানে, আমার মনে হচ্ছে সেখানে আজ না গেলেই ভাল!

নীরদ। নীরজা, তুমি কি আমার ভালবাসার প্রতি সন্দেহ কর?

নীরজা। প্রিয়তম, এ প্রশ্ন যদি তোমার মনে এসে থাকে—তবে থাক—তবে আর আমি অধিক কিছু বলব না—তুমি চল!

নীরদ। আমি ত যাওয়াই ভাল বিবেচনা করি! আজ আমার কি গর্বের দিন! তোমাকে সঙ্গে করে যখন নিয়ে যাব, নলিনী দেখবে আমাকে ভালবাসবারও এক জন লোক আছে।

পঞ্চম দৃশ্য

নলিনীর উদ্যানে বসন্ত-উৎসব

নীরদ নীরজা

নীরদ। আমরা বড় সকাল সকাল এসেছি। এখনো এক জনো লোক আসে নি। (স্বগত) সেই ত সব তেমনিই রয়েছে! সেই সব মনে পড়ে! এই বকুলের তলায় ফুলগুন্ডির উপর সে খেলা ক'রে বেড়াত! সূর্যের আলো তার সঙ্গে সঙ্গে যেন নৃত্য করত! তার হাসিতে গানেতে, তার সেই সরল প্রাণের আনন্দ-হিজলোলে গাছের কুঁড়িগুন্ডি যেন ফুটে উঠত। আমি কি ঘোর স্বার্থপর! সে হাসি, সে গান আমার কেন ভাল লাগত না! সেই জীবন্ত সৌন্দর্য্যরাশি আমি কেন উপভোগ করতে পারতুম না। এক দিন মনে আছে সকাল বেলায় ঐ কামিনী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সুকুমার হাতটি বাড়িয়ে সে অনামনস্ক কামিনী ফুল তুলছিল, আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ চমকে উঠে তার আঁচল থেকে ফুলগুন্ডি পড়ে গেল, তার সেই চকিত নেত্র তার সেই লজ্জাবনত মুখখানি আমি যেন চোখের সামনে স্পর্শ দেখতে পাচ্ছি। আহা, তাকে আর একবার তেমনি ক'রে দেখতে ইচ্ছে করছে! এই পরিচিত গাছপালাগুন্ডির মধ্যে সূর্যালোকে সে তেমনি ক'রে বেড়াক, আমি এইখানে চুপ ক'রে বসে বসে তাই দেখি! আমি তাকে আর ভালবাসি নে বটে, কিন্তু তাই বলে তার যতটুকু সুন্দর তা আমার ভাল না লাগবে কেন? আহা, সে পুরনো দিনগুন্ডি কোথায় গেল?

নীরজা। এ বাগানটি কি সুন্দর!

নীরদ। তুমি কেবল এর সৌন্দর্য্য দেখছ—আমি আরো অনেক দেখতে পাচ্ছি। এই বাগানের প্রত্যেক গাছের ছায়ায় প্রত্যেক লতাকুঞ্জে আমার জীবনের এক একটি দিন, এক একটি মুহূর্ত বসে রয়েছে! বাগানের চার দিকে তারা সব ঘিরে রয়েছে! তারা কি আমাকে দেখে আজ চিনতে পারছে? অপরিচিত লোকের মত আমাকে তারা কি আজ কৌতূহলদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে! এমন এক কাল গিয়েছে, যখন প্রতিদিন আমি এই বাগানে আসতুম, গাছপালাগুন্ডি প্রতিদিন আমার জন্যে যেন অপেক্ষা ক'রে থাকত, আমি এলে আমাকে যেন এস এস বলে ডাকত। আজ কি তারা আর আমাকে সে রকম ক'রে ডাকছে? তারা হয়ত বলছে, তুমি কে এখানে এলে?

--ও কি নীরজা, তোমার মুখখানি অমন মলিন হয়ে এল কেন?

নীরজা। প্রিয়তম, তোমার সেই পুরনো দিনগুন্ডির মধ্যে আমি ত একেবারেই ছিলাম না! এমন এক দিন ছিল যখন তুমি আমাকে একেবারেই জানতে না, একেবারেই আমি তোমার পর ছিলাম—তখন যদি কেউ গল্পচ্ছলে আমার কথা তোমার কাছে বলত তুমি হয়ত একটিবার মন দিয়ে শুনতে না, যদি কেউ বলত আমি ম'রে গেছি, তোমার চোখে একটি ফোঁটা জল পড়ত না! এককালে যে আমি তোমার কেউই ছিলাম না এ মনে করলে কেমন প্রাণে ব্যথা বাজে! অনন্তকাল হ'তে আমাদের মিলন হয় নি কেন?

নীরদ। কেন হয় নি নীরজা? এই মধুর গাছপালাগুন্ডি তোমার স্মৃতির সঙ্গে কেন জড়িয়ে যায় নি? আর এক জনের কথা কেন মনে পড়ে? আহা, যদি সেই জীবনের প্রভাতকালে তোমার ঐ প্রশান্ত মুখখানি দেখতে পেতাম! তোমার এই উদার মমতা, গভীর প্রেম, অতলস্পর্শ হৃদয়—

নীরজা। থাক্ থাক্ ও-সব কথা থাক্—ঐ বৃষ্টি সব গ্রামের লোকেরা আসছে! ঐ শোন বাঁশি বেজে উঠেছে! তবে বৃষ্টি উৎসব আরম্ভ হ'ল! এখন আর আমাদের এ মলিন মুখ শোভা পায় না! এস আমরাও এ উৎসবে যোগ দিই।

নীরদ। হাঁ চল। একটা গান গাই।

আমরা বড় ইচ্ছে এখনি একবার নলিনী এসে তোমাকে দেখে! তোমার সঙ্গে তার কতখানি

প্রভেদ! সে গাছের ফুল, আর তুমি গাছের ছায়া! সে দূর দণ্ডের শোভা, আর তুমি চিরকালের আশ্রয়।

নীরজা। দেখ দেখ, ছায়ার মত শীর্ণ মলিন ও রমণী কে?

নীরদ। (চমকিয়া) তাই ত, ও কে?

দূরে নলিনীর প্রবেশ

নীরদ। এ কি নলিনী, না নলিনীর স্বপ্ন?

নীরজা। (নলিনীর কাছে গিয়া) তুমি কাদের বাছা গা? আজ এ উৎসবের দিনে তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন?

নলিনী। আমি নলিনী।

নীরজা। (সচকিতে) তোমার নাম নলিনী?

নলিনী। হাঁ।

নীরজা। (স্বগত) আহা, এর মুখখানি কি হয়ে গেছে! নলিনী, আমি তোমার মনের দুঃখ বুঝেছি! তাঁকে একবার এর কাছে ডেকে নিয়ে আসি!

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। (দ্রুতবেগে আসিয়া) কাকা, কাকা!

নীরদ। (বুকে টানিয়া লইয়া) মা আমার, বাছা আমার!

ফুলি। এত দিন কোথায় ছিলে কাকা?

নীরদ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে ফুলি! আবার আমি তোদের কাছে এসেছি, আর আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যাব না!

ফুলি। কাকা, একবার দিদির কাছে চল!

নীরদ। কেন ফুলি!

ফুলি। একবার দেখ'সে দিদি কি হয়ে গেছে!

নবীনের প্রবেশ

নবীন। এই যে নীরদ, এসেছ? আমরা সব স্বার্থপর কি অন্ধ হয়েই ছিলাম নীরদ! একবার নলিনীর কাছে চল।

নীরদ। কেন নবীন!

নবীন। একবার তার সঙ্গে একটি কথা কও'সে! তোমার একটি কথা শোনবার জন্য সে আজ কত দিন ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছে! কত দিন কত মাস ধ'রে জানলার কাছে ব'সে সে পথের পানে চেয়ে আছে, তোমার দেখা পায় নি! তার সে খেলাধুলা কিছুই নেই, একেবারে ছায়ার মত হয়ে গেছে! কত দিন পরে আজ আবার সে এই বাগানে এয়েছে, কিন্তু তার সেই হাসিটি কোথায় রেখে এল? এ বাগানের মধ্যে তার অমন করুণ ম্লান মুখ কি চোখে দেখা যায়! এই বাগানেই তোমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, এই বাগানেই বৃষ্টি শেষ দেখা হবে!

(তাড়াতাড়ি নলিনীর কাছে আসিয়া)

নীরদ। নলিনী!

(নলিনী অতি ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল)

নীরদ। নলিনী!

নলিনী। (ধীরে) কি নীরদ!

নীরদ। (নলিনীর হাত ধরিয়া) আর কিছু দিন আগে কেন আমার সঙ্গে কথা কইলে না

নলিনী! আর কিছু দিন আগে কেন ঐ সুধামাথা দ্বরে আমার নাম ধরে ডাক নি! আজ—আজ এই অসময়ে কেন ডাকলে? নলিনী নলিনী—

(নলিনীর মূর্ছিত হইয়া পতন)

নীরজা। এ কি হ'ল, এ কি হ'ল!

ফুলি। (তাড়াতাড়ি) দিদি—দিদি!—কাকা, দিদির কি হ'ল?

(নীরজা। নলিনীর মাথা কোলে রাখিয়া বাতাস-করণ।
নলিনীর মূর্ছাভঙ্গ্য)

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন—আর বেশী দিন তোকে দুঃখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।

নলিনী। (নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি কে গা, তুমি কাঁদচ কেন?

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন!

ষষ্ঠ দৃশ্য

মুমূর্ষু নীরজা। পার্শ্ব নীরদ

নবীন

নীরজা। একবার নলিনীকে ডেকে দাও। বৃষ্টি সময় চলে গেল।

[নবীনের প্রস্থান]

আমি চলেম ভাই—আমার সঙ্গে কেন তোমার দেখা হ'ল? আমি হতভাগিনী কেন তোমাদের মাঝখানে এলেম? প্রিয়তম, আমি যেন চিরকাল তোমার দুঃখের স্মৃতির মত জেগে না থাকি! আমাকে ভুলে যেয়ো।

নলিনীকে লইয়া নবীনের প্রবেশ

নলিনী। বোন আমার, তোদের আজ মিলন হোক, আমি দেখে যাই। (পরস্পরের হাতে হাত সমর্পণ) (নলিনীকে চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া) তবে আমি চলেম বোন!

নলিনী। (নীরজাকে আলিঙ্গন করিয়া) দিদি তুই আমার আগে চলে গেলি? আমিও আর বেশী দিন থাকব না, আমিও শীগ্গির তোর কাছে যাবি!

প্রথম ছত্রের সূচী

নাটকের অন্তর্ভুক্ত গান, কবিতা, শ্লোক, মন্তের প্রথম ছত্র এই সূচীর অন্তর্গত

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
অজানা সুর কে দিয়ে যার কানে কানে। তাসের দেশ	৩৪৪
অদ্যা দেবা উদ্দিতা সূর্যস্য। তপতী	৭৯৪, ৭৯৫
অধিবাসে তু নো ভন্তে ভোজনং পরিকম্পিতং। নটীর পূজা	১৬০
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তিভিঃ। তপতী	৭৮৯, ৭৯৫
অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাঙ্কী। চিরকুমার-সভা	৬৮
অভয় দাও তো বলি আমার wish কী। চিরকুমার-সভা	১২
অরি কুরঙ্গ তপোবনবিভ্রমাং। চিরকুমার-সভা	৯৯
অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে। অরূপরতন	৫৮৬
অর্জুন! তুমি অর্জুন। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪১০
অলকে কুসুম না দিয়ে। চিরকুমার-সভা	৯৩
অলি বারবার ফিরে যায়। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬৯
অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসন্তের। চিরকুমার-সভা	৫৪
অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজ্বালা। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২০
অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে। শেষ বর্ষণ	১৮২
অহো কী দঃসহ স্পর্ধা। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪১০
আকাশধরা রবিরে ঘিরি। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২৮
আগুনে হল আগুনময়। অরূপরতন	৫৭৩
আজ খেলা-ভাঙার খেলা। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬৪
আজ তোমারে দেখতে এলেম। পরিদ্রাণ	৭১০
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়। ঋণশোধ	৬২৪
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনোঁছিস বল্। শেষ বর্ষণ	১৮১
আজি দখিন-দুয়ার খোলা। অরূপরতন	৫৬৯
আজি দখিন দুয়ার খোলা। শাপমোচন	৫৯৯
আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে। ঋণশোধ	৬১৮
আঁধার শাখা উজল করি। ভগ্নহৃদয়	৮৩৩
আন্ গো তোরা কার কী আছে। নবীন	২৪০
আনতাজ্জী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার। চিরকুমার-সভা	৭১
আন্মনা গো আন্মনা। শাপমোচন	৫৯৮
আমরা চাষ করি আনন্দে। গুরু	৫৩৫
আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র। তাসের দেশ	৩৩৬
আমরা নূতন যৌবনেরই দূত। তাসের দেশ	৩৩৭
আমরা বসব তোমার সনে। পরিদ্রাণ	৭১৯
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা। ঋণশোধ	৬৪০
আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল। বাঁশরি	৩৮০
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই। অরূপরতন	৫৬২
আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন। পরিদ্রাণ	৭২০
আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২৮
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো। নটীর পূজা	১৭৩
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪১৬
আমার অভিমানের বদলে আজ। অরূপরতন	৫৮৩
আমার আর হবে না দেরি। অরূপরতন	৫৮৩
আমার এই রিক্ত ডালি। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪১৫
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছে দান। শ্যামা	৪৭২
আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে। অরূপরতন	৫৬৯

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
আমার নয়ন তোমার নয়নতলে। পরিগ্রাণ	৭১৪
আমার নয়ন-ভুলানো এলে। ঋণশোধ	৬৪১, ৬৪৫
আমার নিখিল ভুবন হারালেম। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬০
আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো। পরিগ্রাণ	৭০৩
আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫২
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে। অরূপরতন	৫৬৩
আমার মন বলে, 'চাই চাই গো। তাসের দেশ	৩৩২
আমার মালার ফুলের দলে। নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা	৪৩১
আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে। শেষ বর্ষণ	১৮৯
আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা। শেষরক্ষা	৬৭৩
আমার সকল নিয়ে বসে আছি। অরূপরতন	৫৮২
আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে। ঋণশোধ	৬২৫
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেঁপিয়ে বেড়ায়। পরিগ্রাণ	৭২২
আমি এলেম তোমার দ্বারে। শাপমোচন	৫৯৭
আমি কেবল ফুল জোগাব। চিরকুমার-সভা	১৬
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে। ঋণশোধ	৬২৮
আমি তারেই জানি তারেই জানি। চন্ডালিকা	৩১৩
আমি তোমারি মাটির কন্যা। চন্ডালিকা	৩১৯
আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব নারে। পরিগ্রাণ	৭৪৩
আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে। তাসের দেশ	৩৪৩
আমি যখন ছিলাম অন্ধ। অরূপরতন	৫৫৬
আমি রূপে তোমায় ভোলাব না। অরূপরতন	৫৭৪
আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়। নবীন	২৪৩
আর কিছু দাও বা না-দাও। শেষরক্ষা	৬৭১
আর নহে, আর নহে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬৩
আর রেখো না আঁধারে আমায়। নটীর পূজা	১৬৩
আরো প্রভু, আরো আরো। পরিগ্রাণ	৭১৮
আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই। তপতী	৭৭১
আসে তো আসুক রাত, আসুক বা দিবা। চিরকুমার-সভা	৬৪
আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা। অরূপরতন	৫৭২
ইচ্ছে। সেই তো ভাঙছে। তাসের দেশ	৩৫০
ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী। চিরকুমার-সভা	২৩
উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল। শোধবোধ	১২৭
উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে। তাসের দেশ	৩৪৫
উত্তমঞ্জন বন্দেহং পাদপংসুবরভূষণং। নটীর পূজা	১৬৯
উদ্‌ ত্যং জাতবেদসং দেবং বহ্নিস্তি কেতবঃ। তপতী	৭৮৯, ৭৯৫
এ তো খেলা নয়, খেলা নয়। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫৮
এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে। গুরু	৫৩৪
এ শূদ্ধ অলস ময়া—এ শূদ্ধ মেঘের খেলা। শাপমোচন	৫৯১
এই অ্যালবম শূন্য রইল সবি। শোধবোধ	১১০
একলা বসে বাদলশেষে শূনি কত কণী। শেষ বর্ষণ	১৮৫
এখনো গেল না আঁধার। অরূপরতন	৫৭৯
এতদিন তুমি সখা, চাহ নি কিছু। শ্যামা	৪৭২
এবার অবগুষ্ঠন খোলো। শেষ বর্ষণ	১৮৮
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী। পরিশোধ	৪৮৮
এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে। শেষরক্ষা	৬৯০
এলেম নতুন দেশে। তাসের দেশ	৩৩৩
এসেছি গো এসেছি। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫৪
এসো আমার ঘরে। শাপমোচন	৫৯৭

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
এসো এসো পদ্রুপোত্তম। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২৫
এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২৬
এসো এসো বসন্ত ধরাতলে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬২
এসো এসো হে তৃষ্ণার জল। শাপমোচন	৫৯৩
এসো নীপবনে ছায়াবর্ষিতলে। শেষ বর্ষণ	১৮০
এসো নীপবনে ছায়াবর্ষিতলে। শ্রাবণগাথা	৩৯৪
এসো শরতের অমল মহিমা। শেষ বর্ষণ	১৮৭
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে। শেষ বর্ষণ	১৮৪
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে। শ্রাবণগাথা	৩৯১
ও অকুলের কুল, ও অগতির গতি। গদ্রু	৫৪০
ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে। শাপমোচন	৫৯৩
ও আমার ধ্যানেরই ধন। চিরকুমার-সভা	৫২
ও কি এল, ও কি এল না। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬২
ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না। শাপমোচন	৬০১
ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে। নলিনী	৯৬১
ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার। রক্তকরবী	২১৩
ও ভোলা মন, বল্ দেখি ভাই। শেষরক্ষা	৬৫৩
ও নমো বদ্বন্দ্যায় গদ্রবে। নটীর পূজা	১৫৩
ওই বদ্বন্দ্য বর্ষিণী বাজে বনমাঝে কি মনোমাঝে। শাপমোচন	৬০১
ওকে বলো সখী বলো। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫৫
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর। অরুণপরতন	৫৭৬
ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না। নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা	৪৩৫
ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি। চন্ডালিকা	৩১২
ওগো, তোরা কে যাবি পারে। চিরকুমার-সভা	৩২
ওগো দয়াময়ী চোর! এত দয়া মনে তোরা। চিরকুমার-সভা	৫০
ওগো, শান্ত পাষণমূর্তি সুন্দরী। তাসের দেশ	৩৪০
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা। শেষ বর্ষণ	১৮৭
ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার। শ্রাবণগাথা	৩৯৬
ওরা অকারণে চণ্ডল। নবীন	২৪৩
ওরা অকারণে চণ্ডল। শ্রাবণগাথা	৪০০
ওরে আগুন আমার ভাই। পরিগ্রাণ	৭৩৪
ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে। গদ্রু	৫৩১
ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্। নবীন	২৪২
ওরে চিত্ররেখাডোরে বর্ষিণী কে। শাপমোচন, সংযোজন	৬০৭
ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার। শ্রাবণগাথা	৩৯৬
ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪১১
ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এসো বন। মর্ন্তির উপায়	৫১১
ওরে শিকল, তোমায় অঙ্গে ধরে। পরিগ্রাণ	৭৩৫
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক। চিরকুমার-সভা	৬৩
ওলো, রেখে দে সখী, রেখে দে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫৪
ওলো শেফালি। শেষ বর্ষণ	১৮৬
কখন দিলে পরায়ে। নবীন	২৪৭
কখন দিলে পরায়ে স্বপনে ব্যথার মালা বরণমালা। শাপমোচন	৫৯৪
কত কাল রবে বলো ভারত রে। চিরকুমার-সভা	১৩
কত দিন একসাথে ছিন্দু ঘুমঘোরে। ভগ্নহৃদয়	৮১৪
কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে। শেষরক্ষা	৬৬৭
কবীন্দ্রানাং চেতঃ কমলবনমালা তপস্বিচিং। চিরকুমার-সভা	৬৭
কপূর ইব দম্ভাহপি শক্তিমান্ যো জনে জনে। উপতী	৭৬৪, ৭৯৫
কাছে আছে দেখিতে না পাও। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫২

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
কাছে তার যাই যদি। ভগ্নহৃদয়	৮৪৫
কাছে থেকে দূর রিচিল কেন গো আঁধারে। শাপমোচন, সংযোজন	৬০৮
কাছে যবে ছিল, পাশে। শেষরক্ষা	৬৫৫
কাদাম্বিনী যেমনি আমার প্রথম দেখিলে। শেষরক্ষা	৬৬৭
কাদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে। পরিচাণ	৭০৫
কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে। শেষ বর্ষণ	১৮৯
কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে। অরূপরতন	৫৭১
কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ। চিরকুমার-সভা	২০
কি করিব বল দেখি তোমার লাগিয়া। ভগ্নহৃদয়	৮৬৭
কিছুই তো হল না। ভগ্নহৃদয়	৮৫৮
কী জানি কী ভেবেছ মনে। চিরকুমার-সভা	৫
কুঞ্জকুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর। চিরকুমার-সভা	৫৪
কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি। চিরকুমার-সভা	৫৫
কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দরবার। ভগ্নহৃদয়	৮৫৭
কে বলেছে তোমায় বন্ধু, এত দৃঃখ সহিতে। পরিচাণ	৭২০
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২০
কেন ধরে রাখা, ও-যে যাবে চলে। নবীন	২৪৫
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়। তাসের দেশ	৩৪৮
কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না। ঋণশোধ	৬২৫
কেন সারা দিন ধীরে ধীরে। চিরকুমার-সভা	৯৪
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়। অরূপরতন	৫৫৯
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়। শাপমোচন	৫৯৭
কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী। শেষ বর্ষণ	১৮১
কোন গহন অরণ্যে তারে এলেম হারিয়ে। শাপমোচন, সংযোজন	৬০৯
কোন দেবতা সে, কী পরিহাসে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪১৮
কোন সে ঝড়ের ভুল। নৃত্যনাট্য মায়াবর খেলা	৪৬২
কোপো যত্ন দ্রুতকীর্তিচনা নিগ্রহো যত্ন মৌনং। চিরকুমার-সভা	১৮
ক্লান্ত যখন আশ্রুকলির কাল। নবীন	২৪৭
ক্লমা কর মোরে, সখি, শুধায়ো না। ভগ্নহৃদয়	৮০৮
খর বায়ু বয় বেগে। তাসের দেশ	৩২৭
খেলা কর—খেলা কর। ভগ্নহৃদয়	৮৩১
খোলা খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর। অরূপরতন	৫৫৭
গগনে গগনে যায় হাঁকি। তাসের দেশ	৩৪৯
গতং তদগাম্ভীর্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ। চিরকুমার-সভা	৯৯
গন্ধ-সম্ভার-যুগ্মেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা। নটীর পূজা	১৬০
গান আমার যায় ভেসে যায়। শেষ বর্ষণ	১৯০
গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে। নবীন	২৪১
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে।	
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪১০
গুরুচরণ করো শরণ-অ। মূর্ত্তির উপায়	৪৯৮
গুরুপদে মন করো অর্পণ। মূর্ত্তির উপায়	৫০৩
গেরুয়া ফাঁদ পাতা ভুবনে। মূর্ত্তির উপায়	৫০২
গোপন কথাটি রবে না গোপনে। তাসের দেশ	৩৩০
গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ। পরিচাণ	৭৪০
ঘনসারস্পদিস্তেন দীপেন তমধংসিনা। নটীর পূজা	১৬০
ঘরেতে ভ্রমর এল গদগদনিয়ে। তাসের দেশ	৩৪৩
ঘুমের ঘন গহন হতে। নৃত্যনাট্য চন্দালিকা	৪৪৬
চক্ৰ-পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে। চিরকুমার-সভা	৬৮
চক্রে আমার তৃষ্ণা। চন্দালিকা	৩১১

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
চক্ষু আমার তৃষ্ণা। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	৪৩৮
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে। পরিশোধ	৪৮৮
চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন। নবীন	২৪৫
চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া। চিরকুমার-সভা	৫০
চলো নিয়ম-মতে। তাসের দেশ	৩৩৮
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। পরিগ্রাণ	৭৩৯
চিড়েতন, হতর্ন, ইস্কাবন। তাসের দেশ	৩৩৯
চির-পুরানো চাঁদ। চিরকুমার-সভা	১৮
চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো। অরুপরতন, প্রস্তাবনা	৫৫৩
ছি ছি, মরি লাজে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬৩
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬৩
জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না। শেষরক্ষা	৬৯৪
জয় জয় তাসবংশ-অবতংস। তাসের দেশ	৩৩৯
জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব। চিরকুমার-সভা	২৪
জল দিবে অথবা বজ্র। শেষরক্ষা	৬৭১
জাগরণে যায় বিভাবরী। শাপমোচন	৫৯২
জাগো জাগো আলসশয়নবিলস্ন। তপতী	৭৮৯
জাগো হে রুদ্র জাগো। তপতী	৭৭২
জীবনে আজ কি প্রথম। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫১
জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫৩
জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা। শ্যামা	৪৬৯
জ্বলে নি আলো অন্ধকারে। চিরকুমার-সভা	৫৭
ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে। নবীন	২৪৭
ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর। শ্রাবণগাথা	৩৯৪
ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর-বাদর। শেষ বর্ষণ	১৮০
ডাকিল মোরে জাগার সাথী। শেষরক্ষা	৬৫০
ডেকো না আমারে ডেকো না—ডেকো না। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬১
তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে। শ্রাবণগাথা	৩৯৩
তবে শেষ করে দাও শেষ গান। নবীন	২৪৬
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়। চিরকুমার-সভা	৭৮
তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল। রুদ্রচন্দ	৯২২, ৯৩১
তস্মাৎ স্বমুদ্রিত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব। বাঁশরি	৩৬৯
তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫৫
তুই রে বসন্ত সমীরণ। ভগ্নহৃদয়	৮৯২
তুমি আমায় করবে মস্ত লোক। চিরকুমার-সভা	১১
তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে। নটীর পূজা	১৫৪
তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা। শাপমোচন	৫৯৩
তুমি কিছুর দিয়ে যাও। নবীন	২৪৮
তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে। নবীন	২৪৩
তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে। চিরকুমার-সভা	২০
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না। গুরুর	৫২৩
তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া। পরিগ্রাণ	৭০১
তুমি সুন্দর যৌবনঘন। নবীন	২৪০
তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন। পরিগ্রাণ	৭০৩
তৃষ্ণার শান্তি। শ্রাবণগাথা	৩৯৮
তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২৬
তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ। রক্তকরবী	২১২

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে। চিরকুমার-সভা ...	৮৪
তোমায় সাজাব যতনে কুসুমরতনে। শাপমোচন, সংযোজন ...	৬০৫
তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল গো। শাপমোচন ...	৫৯৫
তোমায় আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো। তপতী ...	৭৮৩
তোমার নাম জানি নে সুর জানি। শেষ বর্ষণ ...	১৮৮
তোমার পায়ে তলায় যেন গো রঙ লাগে। তাসের দেশ ...	৩৪৫
তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ। ঋণশোধ ...	৬৩৭
তোরে প্রাণের রস তো শূন্যকিয়ে গেল ওরে। রক্তকরবী ...	২০৭
তোলন নামন। তাসের দেশ ...	৩৩৪
দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া। চিরকুমার-সভা ...	৫৭
দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে। তপতী ...	৭৮২
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার। চণ্ডালিকা ...	৩১৭
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ...	৪৪৪
দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৬৪
দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে। শাপমোচন, সংযোজন ...	৬০৭
দে তোরা আমায় নৃতন করে দে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ...	৪১৩
দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে। শাপমোচন ...	৫৯৪
দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৫৩
দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া। ঋণশোধ ...	৬৩৬
দেখব কে তোর কাছে আসে। চিরকুমার-সভা ...	১০
দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা। শ্রাবণগাথা ...	৩৯৯
দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়। শ্রাবণগাথা ...	৪০২
দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়। শেষ বর্ষণ ...	১৮৬
দোষী করো, দোষী করো। চণ্ডালিকা ...	৩১৪
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে। শেষ বর্ষণ ...	১৮৩
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে। শ্রাবণগাথা ...	৩৯৫
ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই। শ্যামা ...	৪৭০
ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর। চিরকুমার-সভা ...	৬৪
নববসন্তের দানের ডালি। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ...	৪৩১
নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে। বাঁশরি ...	৩৬৯
নমো নমো নমো করুণাঘন নমো হে। শ্রাবণগাথা ...	৩৯৩
নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়। নটীর পূজা ...	১৬৩
নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ...	৪৪১
নমো নমো শচীচিতরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন। শাপমোচন, সংযোজন ...	৬০৫
না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। বাঁশরি ...	৩৭০
না, না গো, না। চিরকুমার-সভা ...	৯
না না, ডাকব না, ডাকব না। চণ্ডালিকা ...	৩১২
না ব'লে যায় পাছে সে। চিরকুমার-সভা ...	৮
না ব'লে যেয়ো না চলে মিনতি করি। পরিগ্রাণ ...	৭১৪
না বৃদ্ধে করে তুমি ভাসালে আঁখিজলে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৬১
না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো। শাপমোচন ...	৬০০
না সখা, মনের ব্যথা কোরো না গোপন। ভগ্নহৃদয় ...	৮৬৮
নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে। পরিগ্রাণ ...	৭০২
নাচ, শ্যামা, তালে তালে। ভগ্নহৃদয় ...	৮১৬
নারীর ললিত লোভন লীলায়। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ...	৪২৩
নিবিড় অমা-তিমির হতে। নবীন ...	২৪২
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ। চিরকুমার-সভা ...	৬১
নিশীথে কী কয়ে গেল মনে। নটীর পূজা ...	১৪৯, ১৫২
নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নত্যাঙ্গা নয়নম্বয়ং। চিরকুমার-সভা ...	৭০

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়। ভগ্নহৃদয়	৮৩৬
নোটগুলো সব ঝুটো। মৃষ্টির উপায়	৫০৫
পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫১
পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে। শেষ বর্ষণ	১৮৩
পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন-অঙ্গনে। শ্রাবণগাথা	৪০০
পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে। নটীর পূজা	১৬৬
পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়। চণ্ডালিকা	৩২০
পথের সাথী, নমি বারংবার। অরূপরতন	৫৮২
পাছে চেয়ে বসে আমার মন। চিরকুমার-সভা	৫
পাছে সদর ভুলি এই ভয় হয়। শাপমোচন	৫৯১
পাতাখানি শূন্য রাখিলাম। শোধবোধ	১০৯
পিনাকেতে লাগে টংকার। বাঁশরি	৩৮৭
পদ্ব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি। শেষ বর্ষণ	১৮২
পদ্রুঘের বেশে হরিলে পদ্রুঘের মন। শেষরক্ষা	৬৭১
পদ্বর্গগনভাগে। নটীর পূজা, সূচনা	১৪৫
পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিদেয়াঃ শান্তিঃ। তপতী	৭৯৪, ৭৯৫
পোড়া মনে শূন্য পোড়া মূখখানি জাগে রে। চিরকুমার-সভা	১৮
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চলে। রক্তকরবী	২০২
প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য। বাঁশরি	৩৭৯
প্রভাতের আদ্যিম আভাস। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, ভূমিকা	৪০৭
প্রভু, বলো বলো কবে। অরূপরতন	৫৫৭
প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে। তপতী	৭৭৬
ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ার। নবীন	২৪১
ফাগুনের নবীন আনন্দে। নবীন	২৪৫
ফুল তুলিতে ভুল করেছি। পরিচয়	৭১৫
ফুল বলে, ধন্য আমি। চণ্ডালিকা	৩১১
ফুল বলে, ধন্য আমি। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	৪৩৬
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে। কালমৃগয়া	৯৪৪
ফুল শাখা যেমন মধুমতী। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২৮
বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে। তপতী	৭৭৫
বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে। নটীর পূজা	১৬২
বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা। শেষ বর্ষণ	১৮২
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান। শ্রাবণগাথা	৪০১
বড়ো থাকি কাছাকাছি। চিরকুমার-সভা	৬
বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে। শাপমোচন	৬০২
বন্ধ-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং। নটীর পূজা	১৬০
বন্ধ, কোন্ আলো লাগল চোখে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪১১
বন্ধ, কোন্ মায়ী লাগল চোখে। শাপমোচন, সংযোজন	৬০৬
বন্ধ, রহো রহো সাথে। শেষ বর্ষণ	১৮৩
বরমসৌ দিবসো ন পদ্বর্নিশা। চিরকুমার-সভা	৬৩
বলে দাও জল, দাও জল। চণ্ডালিকা	৩১০
বলেছিল ধরা দেব না, শূন্যেছিল সেই বড়াই। বাঁশরি	৩৫৯
বলো, সখী, বলো তারি নাম। তাসের দেশ	৩৪১
বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ। অরূপরতন	৫৭৭
বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল। রত্নচন্দ	৯২১
বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক। নবীন	২৪৬
বাকি আমি রাখব না কিছুই। শ্রাবণগাথা	৩৯২
বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে। শাপমোচন	৫৯৪
বাজে করুণ সুরে (হায় দুরে)। নবীন	২৪৮

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
বাজো রে বাঁশরি বাজো। শাপমোচন	৫৯৬
বাতাসের চলার পথে যে মৃকুল পড়ে ঝরে। নবীন	২৪৪
বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর। শ্রাবণগাথা	৪০২
বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। তাসের দেশ	৩৫২
বাঁধন কেন ভূষণ বেশে তোরে ভোলায়। নটীর পূজা	১৫০
বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে। নটীর পূজা	১৬০
বায়ুরনিলমম তথদং ভস্মান্তং শরীরম্। তপতী	৭৯৪, ৭৯৫
বাম্পীয় শকটে চাঁড়ি নারীচুড়ামণি। চিরকুমার-সভা	২০
বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী। নবীন	২৩৯
বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন। শাপমোচন	৫৯৯
বাহিরে ভুল হানবে যখন। অরুপরতন	৫৬৯
বিজয়মালা এনো আমার লাগি। তাসের দেশ	৩৪৫
বিদায় দিয়ে মোরে প্রসন্ন আলোকে। নবীন	২৪৫
বিধিয়া দিয়া আঁখিবাণে। চিরকুমার-সভা	৭১
বিনা সাজে সাজি। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	৪২৪
বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে ঘাই। ভগ্নহৃদয়	৮২৪
বিরহযামিনী কেমনে যাপিবে। চিরকুমার-সভা	২০
বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ। চিরকুমার-সভা	৮১
বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং। চিরকুমার-সভা	৫৫
বুঝেছি বুঝেছি সখা। ভগ্নহৃদয়	৮৮৫
বৃন্দং সরণং গচ্ছামি। নটীর পূজা	১৫৩
বৃন্দো সুসুন্দো করুণামহান্নবো। চণ্ডালিকা	৩২১
বৃন্দো সুসুন্দো করুণামহান্নবো। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	৪৪৮
বেদনা কী ভাষায় রে। নবীন, পরিশিষ্ট	২৫৩
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা। শোধবোধ	১১০
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো। বাঁশরি	৩৭৯
ভবতু সম্বলং রক্তং সর্বদেবতা। নটীর পূজা	১৫৫
ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়। শাপমোচন	৫৯২
ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু। তপতী	৭৫২
ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে। নলিনী	৯৬১
‘ভালোবাসি ভালোবাসি’। রক্তকরবী	২১৭
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৫৬
ভুল করেছিন্দু, ভুল ভেঙেছে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬০
ভুল কোরো না গো, ভুল কোরো না, ভুল। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৪৬০
ভুলে ভুলে আজ ভুলময়। চিরকুমার-সভা	৯৮
ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়। গদরু	৫৪৮
ভেবেছিলেম আসবে ফিরে। শ্রাবণগাথা	৩৯৭
ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান। অরুপরতন	৫৮৫
মন যে বলে, চিনি চিনি। তপতী	৭৬৩
মনে রয়ে গেল মনের কথা। নলিনী	৯৬৪
মনোমন্দির সুন্দরী। চিরকুমার-সভা	৫২
মন্দং নির্ধোঁহি চরণৌ পরিধোঁহি নীলং। চিরকুমার-সভা	৬৪
মম চিন্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে। শ্রাবণগাথা	৩৯৯
মম চিন্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে। অরুপরতন	৫৬৯
মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিনী। শ্রাবণগাথা	৪০১
মম রুদ্র মৃকুলদলে এসো। চণ্ডালিকা	৩২০
মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সম্বপাণিনং। নটীর পূজা	১৫৩
মায়াবনবিহারিণী হরিণী। শ্যামা	৪৬৯
মায়াবন-বিহারিণী হরিণী। শাপমোচন, সংযোজন	৬০৮
মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে। শেষরক্ষা	৬৯৪

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
মুগ্ধাঙ্গিনীমুগ্ধবিদগ্ধলব্ধ মধুরৈলোলৈঃ কটাক্ষৈরলং। চিরকুমার-সভা ...	২১
মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি। শ্রাবণগাথা ...	৩৯৭
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে। ঋণশোধ ...	৬২১
মোর পাখিকে রে বন্ধি এনেছ এবার। নবীন ...	২৪৪
মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে বাজি। শাপমোচন ...	৬০২
মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে। রক্তকরবী ...	২০৬
মোরা জলে স্থলে কত ছলে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৫১
মোহিনী মায়া এল। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ...	৪০৯
যখন এসেছিলে অন্ধকারে। শাপমোচন ...	৬০০
যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি। নবীন ...	২৪৬
যখন সারা নিশি ছিলেম শূন্যে। ঋণশোধ ...	৬২০
যা ছিল কালো ধলো। অরুপরতন ...	৫৭১
যাও যদি যাও তবে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ...	৪১২
যাক ছিঁড়ে যাক ছিঁড়ে যাক। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৬৩
যাবই আমি যাবই ওগো। তাসের দেশ ...	৩৩১
যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে। শেষরক্ষা ...	৬৫২
যায় যদি যাক সাগরতীরে। চন্ডালিকা ...	৩১৬
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে। শেষরক্ষা ...	৬৯৭
যারে মরণদশায় ধরে। চিরকুমার-সভা ...	১৯
যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই। রত্নচন্ড, উপহার ...	৯১৩
যুগে যুগে বন্ধি আমায় চেয়েছিল সে। রক্তকরবী ...	২১৮
যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক। চন্ডালিকা ...	৩০৯
যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ। শেষ বর্ষণ ...	১৮৭
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৬১
যে দেশে বায়ু না মানে। তাসের দেশ ...	৩৪৯
যে ভাল বাসুক—সে ভাল বাসুক। ভগ্নহৃদয় ...	৮৫১
যেতে দাও গেল যারা। চিরকুমার-সভা ...	৫০
যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে। শেষরক্ষা ...	৬৮৬
যেয়ো না, যেয়ো না। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৫৪
যো সন্নিহিতো। নটীর পূজা ...	১৬০
যো সন্নিহিতো। নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা ...	৪৩৩
রইল বলে রাখলে কারে। পরিচয় ...	৭২৩
রসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে। শেষরক্ষা ...	৬৪৯
রাগিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে। শাপমোচন ...	৫৯৬
রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে! ঋণশোধ ...	৬৩৩
রোদন-ভরা এ বসন্ত। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ...	৪১৩
লজ্জা, ছি ছি লজ্জা। নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা ...	৪৪৩
লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি। শাপমোচন ...	৫৯৬
লুকালে বলেই খুঁজে বাহির-করা। শেষরক্ষা ...	৬৯১
লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া। ঋণশোধ ...	৬৪১
লোকসুপ পাপপুণিকলেসঘাতকো। চন্ডালিকা ...	৩১৫
লোচনে হরিণগর্বমোচনে। চিরকুমার-সভা ...	৭১
শান্ত যেই জন। তাসের দেশ ...	৩৫০
শূনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ...	৪১২
শুভমিলনলগনে বাজুক বাঁশি। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৬৩
শুভ্র নবশঙ্খ তব গগন ভরি বাজে। তপতী ...	৭৯৪
শেষ ফলনের ফুল এয়ার। রক্তকরবী ...	২২৬
শোন রে শোক আমার হৃদয় ...	৫১৩

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
শ্যামল কোমল চিকণ রূপের নবীন শোভা—দেখে যা। নবীন ...	২৪৩
শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে। শেষ বর্ষণ ...	১৮৫
সকল কলুষতামসহর। নটীর পূজা ...	১৭০
সকল ভয়ের ভয় যে তারে। পরিদ্রাণ ...	৭৪০
সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৫৯
সকলি ভুলেছে ভোলা মন। চিরকুমার-সভা ...	১৯
সখি, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন। ভগ্নহৃদয় ...	৮১৪
সখি, ভাবনা কাহারে বলে। ভগ্নহৃদয় ...	৮৪৩
সখী, অঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না। শাপমোচন ...	৬০০
সখী প্রতিদিন হয় এসে ফিরে যায়। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৫৯
সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৫৩
সখী, সে গেল কোথায়। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৫৩
সন্ত্রাসের বিহবলতা নিজেরে অপমান। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ...	৪২২
সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই। গুরু ...	৫৩৭
সমুখেতে বহিছে তটিনী। কালমৃগয়া ...	৯৪৪
সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ। তপতী ...	৭৫১
সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু। চিরকুমার-সভা ...	১০২
সুখে আছি, সুখে আছি। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৫৬
সুরের গুরু, দাওগো সুরের দীক্ষা। নবীন ...	২৩৯
সে আমার গোপন কথা, শুনে যা ও সখী। শোধবোধ ...	১০৫
সে গান্ধীর্ষ গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা। চিরকুমার-সভা ...	৯৯
সে-যে কাছে এসে চলে গেল তবু জাগি নি। নবীন ...	২৪৭
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা। শাপমোচন ...	৫৯৫
সোনা ছাই, সোনা ছাই। মৃষ্টির উপায় ...	৫০৪
সোনার স্বপন ধরুক-না রূপ। শেষরক্ষা ...	৬৫৪
স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ...	৪১৭
স্বয়ং বিশীর্ণ দুঃখপর্ণবৃত্তিতা। চিরকুমার-সভা ...	১০
স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে। চিরকুমার-সভা ...	১৯
স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ...	৪৩৬
হতা লোচনবিশিষ্টৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী। চিরকুমার-সভা ...	৭১
হরিণগর্ভ মোচন লোচনে। চিরকুমার-সভা ...	৭১
হা-আ-আ-আই। তাসের দেশ ...	৩৩৬
হা কে বলে দেবে। নলিনী ...	৯৫৯
হা রে, রে রে, রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে। শ্রাবণগাথা ...	৪০১
হাঁচ্ছোঃ, ভয় কী দেখাচ্ছ। তাসের দেশ ...	৩৩৭
হায় রে, ওরে যায় না কি জানা। শাপমোচন ...	৫৯৮
হায় রে, ওরে যায় না কি জানা। শেষরক্ষা ...	৬৫১
হায় হতভাগিনী। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ...	৪৬১
হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান। নটীর পূজা ...	১৭০
হিংসায় উন্মত্ত পৃথবী, নিত্য নিষ্ঠুর শব্দ। নটীর পূজা ...	১৬৫
হৃদয় আমার, ওই বুকি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে। নবীন, পরিশিষ্ট ...	২৫২
হৃদয়ে ছিলে জেগে। ঋণশোধ, [প্রবেশক] ...	৬১৩
হৃদয়ে মন্দির ডমরু গুরুগুরু। চণ্ডালিকা ...	৩১৬
হৃদয়ে মন্দির ডমরু গুরুগুরু। শ্রাবণগাথা ...	৩৯৬
হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত। ভগ্নহৃদয়, উপহার ...	৮০৩
হে ঋণিকের অতিথি। শেষ বর্ষণ ...	১৮৯
হে নবীনা, হে নবীনা। তাসের দেশ ...	৩৩১
হে বিরহী, হায়, চণ্ডল হিয়া তব। শাপমোচন, সংযোজন ...	৬০৫
হে মহাজীবন, হে মহামরণ। নটীর পূজা ...	১৬৯
হে মহাদুঃখ, হে রুদ্ধ, হে ভয়ংকর। চণ্ডালিকা ...	৩১৮

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

হে মাধবী, শ্বিধা কেন—আসিবে কি ফিরিবে কি। নবীন
হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে। শাপমোচন, সংযোজন

...

২৪৩

...

৬০৬

In such a night as this। চিরকুমার-সভা
Love's golden dream is done। শোধবোধ

...

৬৭

...

১০৫